শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পূর্ব্বকথা ও বাল্যজীবন

ভূমিকা

ঈশ্বরকৃপায় আবির্ভাব-প্রয়োজনের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বাল্যজীবনের সবিস্তার বিবরণ প্রকাশিত হইল। নানা লোকের মুখ হইতে তাঁহার ঐ কালের ঘটনাসমূহ অসম্বদ্ধভাবে শ্রবণ করিয়া আমাদিগের চিত্তে যে চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে, পাঠককে তাহার সহিত পরিচিত করিতেই আমরা ইহাতে সচেষ্ট হইয়াছি। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় ও ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ব্যক্তিগণ আমাদিগকে ঘটনাবলীর সময়নিরূপণে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদান করিলেও কোন কোন স্থলে উহার ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিয়া গিয়াছে। কারণ, তাঁহারা আমাদিগকে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পিতা ও অগ্রজ প্রভৃতির জন্মকোষ্ঠীসকল প্রদান করিতে পারেন নাই ; কিন্তু 'শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকালে তাঁহার পিতার বয়স ৬১।৬২ বৎসর ছিল' 'তাঁহার অগ্রজ রামকুমার তাঁহা অপেক্ষা ৩১।৩২ বৎসরের বড ছিলেন', এইভাবে সময় নিরূপণ করিয়া বলিয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম সম্বন্ধে যে সন ও তারিখ আমরা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিলাম, তৎসম্বন্ধে যে কোন ব্যতিক্রমের সম্ভাবনা নাই, ইহা পাঠক 'মহাপুরুষের জন্মকথা' নামক এই গ্রন্থের পঞ্চমাধ্যায় পাঠ করিয়া নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারিবেন। তাঁহার স্বীয় উক্তি হইতেই আমরা উহা নিরূপণে সক্ষম হইয়াছি, সুতরাং ঐ বিষয়ের জন্য তিনিই স্বরূপতঃ সর্বসাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন

হইয়াছেন। গ্রন্থস্থ ঘটনাবলীর অনেকগুলিই আমরা তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছিলাম। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের লীলাবলী লিপিবদ্ধ করিবার প্রারম্ভে আমরা তাঁহার বাল্য ও যৌবনের ঘটনাসমূহকে যে এত বিশদ এবং সম্বদ্ধভাবে লিপিবদ্ধ করিতে পারিব, এরূপ আশা করি নাই। সুতরাং, যিনি মূককে বাগ্মী করিতে এবং পঙ্গুকে বিশালগিরি-উল্লঙ্ঘন-সামর্থ্য-প্রদানে সক্ষম, একমাত্র তাঁহার কৃপাতেই উহা সম্ভবপর হইল ভাবিয়া আমরা তাঁহাকে বারংবার প্রণাম করিতেছি। উপসংহারে ইহাও বক্তব্য যে, পাঠক বর্তমান গ্রন্থ পাঠ করিবার পরে 'সাধকভাব' ও 'গুরুভাব' গ্রন্থ পাঠ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মকাল হইতে সন ১২৮৭ সাল বা ইংরাজী ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তাঁহার জীবনেতিহাস ধারাবাহিকভাবে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন। ইতি—

প্রণত

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

ঠাকুরের বাটীর নক্সা

ঠাকুরের কামারপুকুরের বাটীর নক্সার পরিচয়

১। পশ্চিম দিকের দক্ষিণদ্বারী ঘর। কামারপুকুরে অবস্থানকালে ঠাকুর এই ঘরে থাকিতেন। উহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৫ ফুট ১০ ইঞ্চি; প্রস্থ ১২ ফুট ১০ ইঞ্চি। ভিতরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৩ ফুট; প্রস্থ ৮ ফুট ৮ ইঞ্চি; ঘরের সম্মুখের দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট ১০ ইঞ্চি; প্রস্থ ৫ ফুট।

২। ৺রঘুবীরের পূর্বদ্বারী ঘর। ১ নম্বর চিহ্নিত ঠাকুরের ঘরের দাওয়া হইতে ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি দক্ষিণে এই ঘর অবস্থিত। উহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ৮ ফুট ৫ ইঞ্চি; প্রস্থ ৮ ফুট ৫ ইঞ্চি। সম্মুখের দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ৯ ফুট ১০ ইঞ্চি; প্রস্থ ৪ ফুট।

৩। ১ নম্বর চিহ্নিত ঘর হইতে ৪ ফুট ৪ ইঞ্চি দূরে পূর্বদিকে এই দক্ষিণদ্বারী ঘর অবস্থিত। ইহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ৮ ইঞ্চি; প্রস্থ ১১ ফুট ৯ ইঞ্চি। ভিতরের মাপ—দৈর্ঘ্য ১৬ ফুট ৮ ইঞ্চি; প্রস্থ ৭ ফুট ৯ ইঞ্চি। সম্মুখের দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ২০ ফুট ৮ ইঞ্চি; প্রস্থ ৫ ফুট ৩ ইঞ্চি।

৪। ৩ নম্বর চিহ্নিত ঘরের ৩ ফুট ৭ ইঞ্চি দূরে পূর্বদিকে বৈঠকখানা ঘর। ইহার বাহিরের মাপ—উত্তর দিকের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ২২ ফুট ৮ ইঞ্চি; দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ১৯ ফুট ৫ ইঞ্চি। পূর্ব-পশ্চিম দিকের দেওয়ালের দৈর্ঘ্য ১২ ফুট ৪ ইঞ্চি। ভিতরের মাপ—মেঝের উপর দিকের দৈর্ঘ্য ১৮ ফুট ৫ ইঞ্চি; দক্ষিণ দিকের দৈর্ঘ্য ১৭ ফুট ৭ ইঞ্চি; প্রস্থ ৮ ফুট ২ ইঞ্চি। এই ঘরখানি সমচতুষ্কোণ নহে।

৫। বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিবার দ্বার। ইহা বৈঠকখানার পশ্চিম-দক্ষিণ কোণ হইতে ৯ ফুট দক্ষিণে অবস্থিত। এই দরজা হইতে ১৩ ফুট দক্ষিণে রন্ধনগৃহের দাওয়া আরম্ভ। উক্ত দাওয়ার মাপ—দৈর্ঘ্য ২৫ ফুট; প্রস্থ ৫ ফুট। উহা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত।

৬। রন্ধন-গৃহ। ইহা পূর্ব ও পশ্চিমদ্বারী দুইটি ঘরে বিভক্ত। ইহার বাহিরের মাপ—দৈর্ঘ্য ২৬ ফুট ৬ ইঞ্চি; প্রস্থ ১১ ফুট ২ ইঞ্চি।

৭। ৺রঘুবীরের (২ নম্বর চিহ্নিত) ঘরের দক্ষিণে গোলকচিহ্নিত স্থানে কয়েকটি পুষ্পবৃক্ষ।

৮। উঠান—পূর্বে অবস্থিত প্রাচীর হইতে ৺রঘুবীরের গৃহের দাওয়ার নিম্ন পর্যন্ত। ইহার দৈর্ঘ্যের মাপ ৩২ ফুট এবং রন্ধনগৃহের দাওয়ার নিম্ন হইতে উত্তরে অবস্থিত দাওয়ার নিম্ন পর্যন্ত প্রস্থের মাপ কোন স্থানে ১৭ ফুট ৬ ইঞ্চি ও কোন স্থানে ১৭ ফুট।

৯। পূর্বদিকের প্রাচীর—বৈঠকখানার নৈর্ঋত কোণ হইতে আরম্ভ করিয়া রন্ধনগৃহের অগ্নিকোণ পর্যন্ত ইহার মাপ ৩৮ ফুট ৬ ইঞ্চি।

১০, ১১, ১২, ১৩। বাটীর চতুঃসীমা—উত্তরে ১০ ফুট চওড়া পাকা রাস্তা, পশ্চিম ও দক্ষিণে লাহাবাবুদের পতিত জায়গা, পূর্বে লাহাবাবুদের ছোট পুষ্করিণী।

১৪। বৈঠকখানা ঘরের অগ্নিকোণে গোলক-চিহ্নিত স্থানে ঠাকুরের স্বহস্ত-রোপিত আম্রবৃক্ষ।

১৫। রন্ধন-গৃহের উত্তরে গোলক-চিহ্নিত স্থানে ঠাকুরের জন্মস্থান। পূর্বে এই স্থানে ঢেঁকিশাল ছিল।

১৬। খিড়কি-দরজা।

১৭। রাস্তার দিকে বৈঠকখানা-প্রবেশের দরজা।

১৮। বাটীর ভিতরের দিকে বৈঠকখানা-প্রবেশের দরজা।

১৯। যুগীদের শিবমন্দির।

প্রতি ঘরের সম্মুখে - - - চিহ্নিত স্থানে ঐ ঘরের দাওয়া এবং ▭ চিহ্নিত স্থানে জানালা বুঝিতে হইবে।
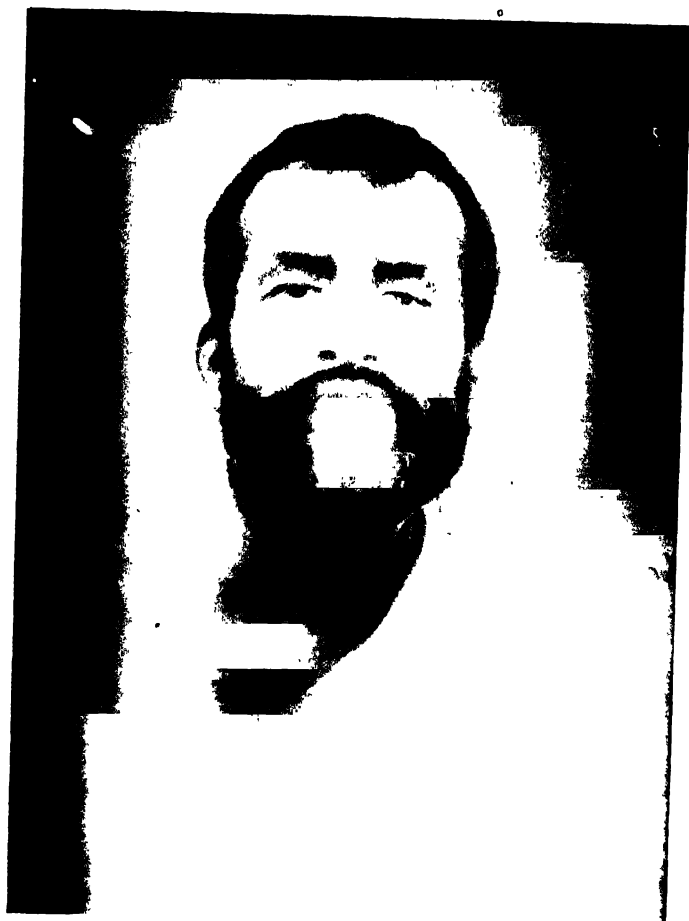
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

পূর্বকথা ও বাল্যজীবন

অবতরণিকা

ভারত ও তদিতর দেশসমূহের আধ্যাত্মিক ভাব ও বিশ্বাসসকল তুলনায় আলোচনা করিলে, উহাদিগের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ উপলব্ধি হয়। দেখা যায়, ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল প্রভৃতি ইন্দ্রিয়াতীত বস্তুসকলকে ধ্রুবসত্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ করিতে অতি প্রাচীনকাল হইতে ভারত নিজ সর্বস্ব নিয়োজিত করিয়াছে এবং ঐরূপ সাক্ষাৎকার বা উপলব্ধিকেই ব্যক্তিগত এবং জাতিগত স্বার্থের চরম সীমারূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছে। উহার সমগ্র চেষ্টা এক অপূর্ব আধ্যাত্মিকতায় চিরকালের জন্য রঞ্জিত হইয়া রহিয়াছে।

ধর্মই ভারতের সর্বস্ব

ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়সকলে ঐরূপ একান্ত অনুরাগ কোথা হইতে উপস্থিত হইল, এ কথার মূল-অন্বেষণে বুঝিতে পারা যায়, দিব্যগুণ এবং প্রত্যক্ষসম্পন্ন পুরুষ-সকলের ভারতে নিয়ত জন্মগ্রহণ করাই উহার একমাত্র কারণ। তাঁহাদিগের বিচিত্র দর্শন ও অসাধারণ শক্তি-প্রকাশ সর্বদা প্রত্যক্ষ এবং আলোচনা করিয়াই সে ঐসকলে দৃঢ়বিশ্বাস এবং অনুরাগ-সম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ভারতের জাতীয় জীবন ঐরূপে বহু

মহাপুরুষ-সকলের ভারতে প্রতিনিয়ত জন্মগ্রহণই ঐরূপ হইবার কারণ

প্রাচীনকাল হইতে আধ্যাত্মিকতার সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়া, প্রত্যক্ষ ধর্মলাভরূপ লক্ষ্যে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অদৃষ্টপূর্ব, অভিনব সমাজ এবং সামাজিক প্রথাসকল সৃজন করিয়াছিল। জাতি এবং সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ প্রকৃতিগত গুণাবলম্বনে দৈনন্দিন কর্মসকলের অনুষ্ঠানপূর্বক ক্রমশঃ উন্নীত হইয়া যাহাতে চরমে ধর্মলাভ বা ঈশ্বরকে সাক্ষাৎ করিতে পারে, ভারতের সমাজ একমাত্র সেইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া নিয়ম এবং প্রথাসকল যন্ত্রিত করিয়াছিল। পুরুষানুক্রমে বহুকাল পর্যন্ত ঐসকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া আসাতেই ভারতে ধর্ম-ভাবসকল এখনও এতদূর সজীব রহিয়াছে, এবং তপস্যা, সংযম ও তীব্র ব্যাকুলতা-সহায়ে প্রত্যেক ব্যক্তিই যে জগৎকারণ ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে এবং তাঁহার সহিত নিত্য-যুক্ত হইতে পারে, ভারতের প্রত্যেক নরনারী এ কথায় এখনও দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়া রহিয়াছে।

ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শনের উপরে ভারতের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত— উহার প্রমাণ

শ্রীভগবানের দর্শনলাভের উপরেই যে ভারতের ধর্ম প্রতিষ্ঠিত, একথা সহজেই অনুমিত হয়। ধর্মসংস্থাপক আচার্যগণকে বৈদিক যুগ হইতে আমরা যে-সকল পর্যায়ে নির্দেশ করিয়াছি, সেইসকল বাক্যের অর্থ অনুধাবন করিলেই ঐ কথা হৃদয়ঙ্গম হইবে, যথা—ঋষি, আপ্ত, অধিকারী বা প্রকৃতি-লীন পুরুষ ইত্যাদি। অতীন্দ্রিয় পদার্থের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া অসাধারণ শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, বলিয়াই যে তাঁহারা ঐসকল নামে নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন, একদা নিঃসন্দেহ

অবতরণিকা

বৈদিক যুগের ঋষিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া পৌরাণিক যুগের অবতার-প্রথিত পুরুষসকলের প্রত্যেকের সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত কথা সমভাবে বলিতে পারা যায়।

ভারতে অবতারবিশ্বাস উপস্থিত হইবার কারণ ও ক্রম। সাংখ্যদর্শনোক্ত 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর'

আবার বৈদিক যুগের ঋষিই যে, কালে পৌরাণিক যুগে ঈশ্বরাবতার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। বৈদিক যুগে মানব কতকগুলি পুরুষকে ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থসকল দর্শন করিতে সমর্থ বলিয়া বুঝিতে পারিলেও, তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে ঐ বিষয়ের শক্তির তারতম্য উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদের প্রত্যেককে একমাত্র 'ঋষি'-পর্যায়ে নির্দেশ করিয়াই সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু কালে মানবের বুদ্ধি ও তুলনা করিবার শক্তি যত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইল, ততই সে উপলব্ধি করিতে লাগিল—ঋষিগণ সকলেই সমশক্তিসম্পন্ন নহেন; আধ্যাত্মিক জগতে তাঁহাদিগের কেহ সূর্যের ন্যায়, কেহ চন্দ্রের ন্যায়, কেহ উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায়, আবার কেহ বা সামান্য খদ্যোতের ন্যায় দীপ্তি প্রদানপূর্বক জ্যোতিষ্মান হইয়া রহিয়াছেন। তখন ঋষিগণকে শ্রেণীবদ্ধ করিতে মানবের চেষ্টা উপস্থিত হইল এবং তাঁহাদিগের মধ্যে কতিপয়কে সে আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশে বিশেষ সামর্থ্যবান বা ঐ শক্তির বিশেষভাবে অধিকারী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিল। ঐরূপে দার্শনিক যুগে কয়েকজন ঋষি 'অধিকারি-পুরুষ'-পর্যায়ে অভিহিত হইলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বে সন্দেহবান সাংখ্যকার আচার্য কপিল পর্যন্ত ঐরূপ পুরুষসকলের অস্তিত্বে সন্দেহ করিতে

পারেন নাই ; কারণ, সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষকে কে কবে সন্দেহ করতে পারে ? সুতরাং শ্রীভগবান কপিল ও তৎপদানুসারী সাংখ্যাচার্যগণের গ্রন্থে 'অধিকারি-পুরুষ'-সকলকে 'প্রকৃতি-লীন'-পর্যায়ে অভিহিত হইয়া স্থান প্রাপ্ত হইতে দেখা গিয়া থাকে। ঐরূপ অসাধারণ শক্তিশালী পুরুষসকলের উৎপত্তিবিষয়ে কারণ নির্ণয় করিতে যাইয়া তাঁহারা বলিয়াছেন—

পবিত্রতা, সংযমাদিগুণে ভূষিত হইয়া পূর্ণজ্ঞানলাভে সমর্থ হইলেও ঐরূপ পুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধন-বাসনা তীব্রভাবে জাগরিত থাকে, সেজন্য তাঁহারা অনন্তমহিমামণ্ডিত স্ব-স্বরূপে কিয়ৎকাল লীন হইতে পারেন না ; কিন্তু ঐ বাসনাবশে সর্বশক্তিমতি প্রকৃতির অঙ্গে লীন হইয়া তাঁহারা তাঁহার শক্তিসমূহকে নিজ শক্তিরূপে প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, এবং ঐরূপে ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন হইয়া এক কল্পকাল পর্যন্ত অশেষ প্রকারে জনকল্যাণসাধনপূর্বক পরিণামে স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন।

'প্রকৃতি-লীন' পুরুষসকলের মধ্যে শক্তির তারতম্যানুসারে সাংখ্যাচার্যগণ আবার দুই শ্রেণীর নির্দেশ করিয়াছেন, যাহা—'কল্পনিয়ামক ঈশ্বর' ও 'ঈশ্বর-কোটি'।

ভক্তি-যুগের বিরাট ব্যক্তিত্ববান ঈশ্বর

দার্শনিক যুগের অন্তে ভারতে ভক্তি-যুগের বিশেষভাবে আবির্ভাব হইয়াছিল। বেদান্তের তীব্র নির্ঘোষে ভারত-ভারতী তখন সর্ব ব্যক্তির সমষ্টীভূত এক বিরাট ব্যক্তিত্ববান ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া কেবলমাত্র অনন্যভক্তিসহায়ে তাঁহার উপাসনায় জ্ঞান এবং যোগের পূর্ণতাপ্রাপ্তি-বিষয়ে শ্রদ্ধাবান হইয়াছে। সুতরাং সাংখ্য-

অবতরণিকা

দর্শনোক্ত 'কল্পনিয়ামক ঈশ্বরকে' তখন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাববিশিষ্ট বিরাট ব্যক্তিত্ববান ঈশ্বরের আংশিক বা পূর্ণ প্রকাশে পরিণত করিতে বিলম্ব হইল না। ঐরূপেই পৌরাণিক যুগে অবতার-বিশ্বাসের উৎপত্তি এবং বৈদিক যুগের বিশিষ্টগুণশালী ঋষির ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতি অনুমিত হয়। অতএব, স্পষ্ট বুঝা যায়, অসাধারণ আধ্যাত্মিকশক্তিসম্পন্ন পুরুষসকলের আবির্ভাবদর্শনেই ভারত ক্রমে ঈশ্বরাবতারত্বে বিশ্বাসবান হইয়াছিল, এবং ঐরূপ মহাপুরুষসকলের অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অনুভবাদির উপরেই ভারতীয় ধর্মের সুদৃঢ় সৌধ ধীরে ধীরে উত্থিত হইয়া তুষারমণ্ডিত হিমাচলের ন্যায় গগন স্পর্শ করিয়াছিল। ঐরূপ পুরুষসকলকে ভারত মনুষ্যজীবনের সর্বোচ্চ উদ্দেশ্যলাভে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া 'আপ্ত'-সংজ্ঞায় নির্দেশপূর্বক তাঁহাদিগের বাণীসমূহে জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা দেখিয়া 'বেদ' শব্দে অভিহিত করিয়াছিল।

অবতারবিশ্বাসের অন্য কারণ—গুরূপাসনা।

বিশিষ্ট ঋষিগণের ঈশ্বরাবতারত্বে পরিণতির অন্য প্রধান কারণ—ভারতের গুরু-উপাসনা। বেদোপনিষদের যুগ হইতেই ভারত-ভারতী বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞানদাতা আচার্য গুরুর উপাসনা করিতেছিল। ঐ পূজোপাসনাই তাহাদিগকে কালে দেখাইয়া দেয় যে, মানবের ভিতর অতীন্দ্রিয় ঐশী শক্তির আবির্ভাব না হইলে সে কখনও গুরুপদবীগ্রহণে সমর্থ হয় না। সাধারণ মানবজীবনের স্বার্থপরতা এবং যথার্থ গুরুগণের অহেতুক করুণায় লোকহিতাচরণ তুলনায় আলোচনা করিয়া তাহারা তাঁহাদিগকে প্রথমে এক বিভিন্ন উচ্চশ্রেণীর মানবজ্ঞানে পূজা

করিতে থাকে। পরে আস্তিক্য, শ্রদ্ধা ও ভক্তি তাহাদিগের মনে ঘনীভূত হইয়া যথার্থ গুরুগণের অলৌকিক শক্তিপ্রকাশ তাহারা যত প্রত্যক্ষ করিয়াছিল, তাঁহাদিগের দেবত্বে তাহারা ততই দৃঢ়বিশ্বাসী হইয়াছিল। তাহারা বুঝিয়াছিল যে, ভবরোগ হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাহারা এতকাল ধরিয়া শ্রীভগবানের করুণাপূর্ণ দক্ষিণামূর্তির নিকট যে সহায়তা প্রার্থনা করিতেছিল—"রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যং"—গুরুগণের ভিতর দিয়া তাহাই এখন তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়াছে, শ্রীভগবানের করুণাই মূর্তিমতী গুরুশক্তিরূপে তাহাদিগের সমক্ষে প্রকাশিত রহিয়াছে।

আবার গুরূপাসনায় মানবমন যখন এতদূর অগ্রসর হইল, তখন যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ঐ শক্তির বিশেষ লীলা প্রকটিত হইতে লাগিল, তাঁহাদিগকে শ্রীভগবানের জ্ঞানপ্রদা দক্ষিণামূর্তির সহিত অভিন্নভাবে দেখিতে তাহার বিলম্ব হইল না। ঐরূপে আচার্যোপাসনা কালে ভারতে অবতারবাদের আনয়নে ও পরিপুষ্টিতে সহায়তা করিয়াছিল বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে। অতএব, অবতারবাদের স্পষ্ট অভিব্যক্তি পৌরাণিক যুগে উপস্থিত হইলেও, উহার মূল যে বৈদিক যুগ পর্যন্ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে, ইহা আর বলিতে হইবে না। বেদ, উপনিষদ্ এবং দর্শনের যুগে মানব ঈশ্বরের গুণ, কর্ম ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে-সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিল, পৌরাণিক যুগে সেই সকলই স্পষ্ট আকার ধারণ করিয়া অবতারবিশ্বাসরূপে অভিব্যক্ত হইবে। অথবা, সংযম

বেদ এবং সমাধি-প্রসূত দর্শনের উপর অবতারবাদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত

তপস্যাদিসহায়ে ঔপনিষদিক যুগে মানব 'নেতি নেতি'-মার্গে অগ্রসর হইয়া নিগুর্ণব্রহ্মোপাসনায় সাফল্যলাভপূর্বক সমাধিরাজ্য হইতে বিলোমমার্গাবলম্বনে অবতরণ করিয়া সমগ্র জগৎকে ব্রহ্মপ্রকাশ বলিয়া যখন দেখিতে সমর্থ হইল, তখনই সগুণ বিরাট ব্রহ্ম বা ঈশ্বরের প্রতি তাহার প্রেম-ভক্তি উপস্থিত হইয়া, সে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল—এবং তখনই সে তাঁহার গুণ, কর্ম, স্বভাবাদি সম্বন্ধে একটা স্থিরসিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার বিশেষভাবে অবতীর্ণ হওয়ায় বিশ্বাসবান হইল।

পূর্বে বলা হইয়াছে, পৌরাণিক যুগেই ভারতে অবতারবিশ্বাস বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছিল। ঐ যুগের আধ্যাত্মিক বিকাশে নানা দোষ উপলব্ধ হইলেও, একমাত্র অবতার-মহিমা-প্রকাশে উহার বিশেষত্ব এবং মহত্ত্ব স্পষ্ট হৃদয়ঙ্গম হয়। কারণ, অবতার-বিশ্বাস আশ্রয় করিয়াই মানব সগুণব্রহ্মের নিত্যলীলাবিলাস বুঝিতে সমর্থ হইয়াছে। উহা হইতেই সে বুঝিয়াছে যে, জগৎকারণ ঈশ্বরই আধ্যাত্মিক জগতে তাহার একমাত্র পথপ্রদর্শক; এবং উহা হইতেই তাহার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে যে, সে যতকাল পর্যন্ত যতই দুর্নীতিপরায়ণ হউক না কেন, শ্রীভগবানের অপার করুণা তাহাকে কখনই চিরদিন বিনাশের পথে অগ্রসর হইতে দিবে না—কিন্তু বিগ্রহবতী হইয়া উহা যুগে যুগে আবির্ভূত হইবে এবং তাহার প্রকৃতির উপযোগী নব নব আধ্যাত্মিক পথসমূহ আবিষ্কারপূর্বক তাহার পক্ষে ধর্মলাভ সুগম করিয়া দিবে।

ঈশ্বরের করুণার উপলব্ধি হইতেই পৌরাণিক যুগে অবতারবাদ-প্রচার

অমিতগুণসম্পন্ন অবতারপুরুষসকলের দিব্যজন্মকর্মাদি সম্বন্ধে স্মৃতি ও পুরাণসকলে যাহা লিপিবদ্ধ আছে, তাহার সারসংক্ষেপ এখানে উল্লেখ করিলে মন্দ হইবে না। তাঁহারা বলেন, অবতারপুরুষ ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান। জীবের ন্যায় কর্মবন্ধনে তিনি কখনও আবদ্ধ হয়েন না। কারণ, জন্মাবধি আত্মারাম হাওয়ায় পার্থিব ভোগসুখলাভের জন্য জীবের ন্যায় স্বার্থচেষ্টা তাঁহার ভিতর কখনও উপস্থিত হয় না, শরীরধারণপূর্বক তাঁহার সমগ্র চেষ্টা অপরের কল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হয়। আবার, মায়ার অজ্ঞানবন্ধনে কখনও আবদ্ধ না হওয়ায় পূর্ব পূর্ব জন্মে শরীরপরিগ্রহ করিয়া তিনি যে-সকল কর্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সেই সকলের স্মৃতি তাঁহাতে লুপ্ত হয় না।

অবতারপুরুষের দিব্যস্বভাব-সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তির সারসংক্ষেপ

প্রশ্ন হইতে পারে, ঐরূপ অখণ্ড স্মৃতি কি তবে তাঁহাতে আশৈশব বিদ্যমান থাকে? উত্তরে পুরাণকার বলেন, অন্তরে বিদ্যমান থাকিলেও শৈশবে তাঁহাতে উহার প্রকাশ থাকে না; কিন্তু শরীর-মনোরূপ যন্ত্রদ্বয় সর্বাঙ্গসম্পন্ন হইবামাত্র স্বল্প বা বিনায়াসে উহা তাঁহাতে উদিত হইয়া থাকে। তাঁহার প্রত্যেক চেষ্টাসম্বন্ধেই ঐকথা বুঝিতে হইবে; কারণ, মনুষ্যশরীরধারণ করায় তাঁহার সকল চেষ্টা সর্বথা মনুষ্যের ন্যায় হয়।

অবতারপুরুষের অখণ্ড স্মৃতিশক্তি

ঐরূপে শরীর-মন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইবামাত্র অবতারপুরুষ তাঁহার বর্তমান জীবনের উদ্দেশ্য সম্যক্ অবগত হন। তিনি বুঝিতে পারেন

যে, ধর্মসংস্থাপনের জন্যই তাঁহার আগমন হইয়াছে। আবার ঐ উদ্দেশ্য সফল করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন হয়, তাহা কোথা হইতে অচিন্ত্য উপায়ে তাঁহাদিগের নিকট স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়। মানবসাধারণের নিকট যে পথ সর্বদা অন্ধকারময় বলিয়া উপলব্ধ হয়, তিনি সেই মার্গে উজ্জ্বল আলোক দেখিতে পাইয়া অকুতোভয়ে অগ্রসর হন এবং উদ্দেশ্যলাভে কৃতার্থ হইয়া জনসাধারণকে সেই পথে প্রবর্তিত করেন। ঐরূপে মায়াতীত ব্রহ্মস্বরূপের এবং জগৎকারণ ঈশ্বরের উপলব্ধি করিবার অদৃষ্টপূর্ব নূতন পথসমূহ তাঁহার দ্বারা যুগে যুগে পুনঃ পুনঃ আবিষ্কৃত হয়।

অবতারপুরুষের নবধর্মস্থাপন

অবতারপুরুষের গুণ, কর্ম, স্বভাবাদির ঐরূপে নির্ণয় করিয়াই পুরাণকারেরা ক্ষান্ত হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার আবির্ভাবকাল পর্যন্ত স্পষ্ট নিরূপণ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, সনাতন সর্বজনীন ধর্ম যখন কালপ্রভাবে গ্লানি-যুক্ত হয়, যখন মায়াপ্রসূত অজ্ঞানের অনির্বচনীয় প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া মানব ইহকাল এবং পার্থিব ভোগসুখলাভকেই সর্বস্ব জ্ঞানপূর্বক জীবন অতিবাহিত করিতে থাকে এবং আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি প্রভৃতি অতীন্দ্রিয় নিত্য পদার্থ-সকলকে কোন এক ভ্রমান্ধ যুগের স্বপ্নরাজ্যের কবিকল্পনা বলিয়া ধারণা করিয়া বসে—যখন ছলে-বলে-কৌশলে পার্থিব সর্বপ্রকার সম্পদ ও ইন্দ্রিয়সুখ লাভ করিয়াও সে প্রাণের অভাব দূর করিতে না পারিয়া অশান্তির অন্ধতমসাবৃত অকূল প্রবাহে নিপতিত হয় এবং যন্ত্রণায় হাহাকার করিতে থাকে—তখনই শ্রীভগবান স্বকীয়

অবতারপুরুষের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্তি

মহিমায় সনাতন ধর্মকে রাহুগ্রাসমুক্ত শশধরের ন্যায় উজ্জ্বল করিয়া তুলেন এবং দুর্বল মানবের প্রতি কৃপায় বিগ্রহবান হইয়া তাহার হস্তধারণপূর্বক তাহাকে পুনরায় ধর্মপথে প্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ না থাকিলে কার্যের উৎপত্তি কখন সম্ভবপর নহে—তদ্রূপ সর্বজনীন অভাব দূরীকরণরূপ প্রয়োজন না থাকিলে ঈশ্বরও কখন লীলাচ্ছলে শরীরপরিগ্রহ করেন না। কিন্তু ঐরূপ কোন অভাব যখন সমাজের প্রতি অঙ্গকে অভিভূত করে, শ্রীভগবানের অসীম করুণাও তখন ঘনীভূত হইয়া তাঁহাকে জগদ্গুরুরূপে আবির্ভূত হইতে প্রযুক্ত করে। ঐরূপ প্রয়োজন দূর করিতে ঐরূপ লীলাবিগ্রহের বারংবার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়াই যে পুরাণকারেরা পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য।

অতএব দেখা যাইতেছে, নবীন ধর্মের আবিষ্কর্তা, জগদ্গুরু, সর্বজ্ঞ অবতারপুরুষ যুগ-প্রয়োজন সাধনের জন্যই আবির্ভূত হন।

বর্তমানকালে অবতারপুরুষের পুনরাগমন

ধর্মক্ষেত্র ভারত নানা যুগে বহুবার তাঁহার পদাঙ্ক হৃদয়ে ধারণ করিয়া পবিত্রীকৃত হইয়াছিল। যুগ-প্রয়োজন উপস্থিত হইলে, অমিতগুণসম্পন্ন অবতারপুরুষের শুভাবির্ভাব এখনও তাহাতে দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিঞ্চিদূর্ধ্ব চারিশত বৎসরমাত্র পূর্বে ঐরূপে শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভারতীয় অদৃষ্টপূর্ব মহিমায় শ্রীহরির নামসংকীর্তনে উন্মত্ত হইবার কথা লোকপ্রসিদ্ধ। আবার কি সেই কাল উপস্থিত হইয়াছে? আবার কি বিদেশীর ঘৃণাস্পদ, নষ্টগৌরব, দরিদ্র ভারতে যুগ-প্রয়োজন উপস্থিত হইয়া শ্রীভগবানের করুণায় বিষম

অবতরণিকা

উত্তেজনা আনয়নপূর্বক তাঁহাকে বর্তমানকালে শরীরপরিগ্রহ করাইয়াছে? হে পাঠক, অশেষকল্যাণগুণসম্পন্ন যে মহাপুরুষের কথা আমরা তোমাকে বলিতে বসিয়াছি, তাঁহার জীবনালোচনায় বুঝিতে পারা যাইবে, ঘটনা ঐরূপ হইয়াছে—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণাদিরূপে পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি আবির্ভূত হইয়া সনাতন ধর্ম সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, বর্তমানকালের যুগ-প্রয়োজন সাধিত করিতে তাঁহার শুভাগমন প্রত্যক্ষ করিয়া ভারত পুনরায় ধন্য হইয়াছে।

প্রথম অধ্যায়

যুগ-প্রয়োজন

বিদ্যা, সম্পদ ও পুরুষকার-সহায়ে মানবজীবন বর্তমানকালে পৃথিবীর সর্বত্র কতদূর প্রসার লাভ করিতেছে, তাহা অতি স্থূলদর্শী ব্যক্তিরও সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়। মানব যেন কোন ক্ষেত্রেই একটা গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ হইয়া এখন আর থাকিতে চাহিতেছে না। স্থলে জলে যথেচ্ছ পরিভ্রমণ করিয়া সুখী না হইয়া সে এখন অভিনব যন্ত্রাবিষ্কারপূর্বক গগনচারী হইয়াছে; তমসাবৃত সমুদ্রতলে ও জ্বালাময় আগ্নেয়গিরিগর্ভে অবতীর্ণ হইয়া সে নিজ কৌতূহলনিবৃত্তি করিয়াছে; চিরহিমানী-মণ্ডিত পর্বত ও সাগরপারে গমনপূর্বক সে ঐসকল প্রদেশের যথাযথ রহস্য-অবলোকনে সমর্থ হইয়াছে; পৃথিবীস্থ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যাবতীয় লতা, ওষধি ও পাদপের ভিতর সে আপনার ন্যায় প্রাণস্পন্দনের পরিচয় পাইয়াছে এবং সর্বপ্রকার প্রাণিজাতকে নিজ প্রত্যক্ষ ও বিচারচক্ষুর অন্তর্ভুক্ত করিয়া জ্ঞানসিদ্ধিরূপ স্বকীয় উদ্দেশ্যে অগ্রসর হইতেছে। ঐরূপে ক্ষিত্যপ্‌তেজাদি ভূত-পঞ্চের উপর আধিপত্য স্থাপনপূর্বক সে এখন জড়া পৃথিবীর প্রায় সমস্ত কথা জানিয়া লইয়াছে এবং তাহাতেও সন্তুষ্ট না থাকিয়া সুদূরাবস্থিত গ্রহনক্ষত্রাদির সম্যক্ সংবাদ লইবার জন্য

মানব বর্তমান-কালে কতদূর উন্নত ও শক্তি-শালী হইয়াছে

উদ্‌গ্রীব হইয়া ক্রমে উহাতেও কৃতকার্য হইতেছে। অন্তর্জগৎ-পরিদর্শনেও তাহার উদ্যমের অভাব লক্ষিত হইতেছে না। ভূয়োদর্শন এবং গবেষণা-সহায়ে ঐ ক্ষেত্রেও মানব নূতন তত্ত্বসকল এখন নিত্য আবিষ্কার করিতেছে। জীবনরহস্য অনুশীলন করিতে যাইয়া সে একজাতীয় প্রাণীর অন্য জাতিত্বে পরিণতির বা ক্রমাভিব্যক্তির কথা জানিতে পারিয়াছে; শরীর ও মনের স্বভাব আলোচনাপূর্বক আত্মস্তবান সূক্ষ্ম জড়োপাদানে মনের গঠনরূপে তত্ত্ব-নির্ণয়ে সক্ষম হইয়াছে; জড়জগতের ন্যায় অন্তর্জগতের প্রত্যেক ঘটনা অলঙ্ঘ্য নিয়মসূত্রে গ্রথিত বলিয়া জানিতে পারিয়াছে এবং আত্মহত্যাদি অসম্বন্ধ মানসিক ব্যাপারসকলের মধ্যেও সূক্ষ্ম নিয়মশৃঙ্খলের পরিচয় পাইয়াছে। আবার ব্যক্তিগত জীবনের চিরাস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ নিশ্চয় প্রমাণলাভে সমর্থ না হইলেও, ইতিহাসালোচনায় মানব তাহার জাতিগত জীবনের ক্রমোন্নতি প্রত্যক্ষ করিয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের সার্থকতা ঐরূপে জাতিগত জীবনে দেখিতে পাইয়া সে এখন উহার সাফল্যের জন্য বিজ্ঞান ও সংহতচেষ্টা-সহায়ে অজ্ঞানের সহিত চিরসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছে এবং অনন্ত সংগ্রামে অনন্ত উন্নতি কল্পনাপূর্বক বহিরন্তর-রাজ্যের দুর্লক্ষ্য প্রদেশসমূহে পৌঁছিবার জন্য অনন্ত বাসনাপ্রবাহে আপন জীবনতরী ভাসাইয়া দিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্য মানবকে অবলম্বন করিয়া পূর্বোক্ত জীবন-প্রসার বিশেষভাবে উদিত হইলেও ভারতপ্রমুখ প্রাচ্যদেশসকলেও উহার প্রভাব স্বল্প লক্ষিত হইতেছে না। বিজ্ঞানের অদম্য শক্তিতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য প্রদেশ প্রতিদিন যত নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইতেছে,

প্রাচ্য মানবের প্রাচীন জীবনসংস্কারসমূহ ততই পরিবর্তিত হইয়া পাশ্চাত্ত্য মানবের ভাবে গঠিত হইয়া উঠিতেছে। পারস্য, চীন, জাপান, ভারত প্রভৃতি দেশসমূহের বর্তমান অবস্থার আলোচনায় ঐ কথা বুঝিতে পারা যায়। ফলাফল ভবিষ্যতে যেরূপই হউক না কেন, প্রাচ্যের উপর পাশ্চাত্ত্যের ঐরূপে ভাববিস্তার সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ থাকে না, এবং সমগ্র পৃথিবীর কালে পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত হওয়া অবশ্যম্ভাবী বলিয়া বোধ হইয়া থাকে।

ঐ উন্নতি ও শক্তির কেন্দ্র পাশ্চাত্ত্য হইতে প্রাচ্যে ভাববিস্তার

পূর্বোক্ত প্রসারের ফলাফল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদিগকে পাশ্চাত্ত্যকেই প্রধানতঃ অবলম্বন করিতে হইবে। বিচারসহায়ে পাশ্চাত্ত্য মানবের জীবন বিশ্লেষণ করিয়া দেখিতে হইবে—ঐ প্রসারের মূল কোথায় এবং উহা কীদৃশ স্বভাববিশিষ্ট, উহার প্রভাবে পাশ্চাত্ত্য জীবনের পূর্বতন উত্তমাধম ভাবসকলের কতদূর উন্নতি ও বিলোপ সাধিত হইয়াছে এবং উহার ফলে পাশ্চাত্ত্যে ব্যক্তিগত মানবমনে সুখ ও দুঃখ পূর্বাপেক্ষা কত অধিক বা অল্প পরিমাণে উপস্থিত হইয়াছে। ঐরূপে ব্যষ্টি ও সমষ্টীভূত পাশ্চাত্ত্য-জীবনে উহার ফলাফল একবার নির্ণীত হইলে, দেশকালভেদে ঐ বিষয় অন্যত্র নির্ণয় করা কঠিন হইবে না।

পাশ্চাত্ত্য মানবের জীবন দেখিয়া উন্নতির ভবিষ্যৎ ফলাফল নির্ণয় করিতে হইবে

ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে নির্দেশ করিতেছে, দুঃসহ শীতের প্রকোপ অতি প্রাচীনকাল হইতে পাশ্চাত্ত্য মানবমনে দেহ-

বুদ্ধির দৃঢ়তা আনয়ন করিয়া তাহাকে একদিকে যেমন স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছিল, অপরদিকে তেমনি আবার সংহত চেষ্টায় স্বার্থসিদ্ধি—একথা সহজেই বুঝাইয়া উহাতে স্বজাতিপ্রীতির আবির্ভাব করিয়াছিল। ঐ স্বার্থপরতা এবং স্বজাতিপ্রীতিই তাহাকে, কালে অদম্য উৎসাহে অপর জাতি-সকলকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে ধনসম্পদে নিজ জীবন ভূষিত করিতে প্ররোচিত করে। উহার ফলে যখন সে নিজ জীবনযাত্রার কতকটা সুসার করিতে পারিল, তখনই তাহাতে ধীরে ধীরে অন্তর্দৃষ্টির আবির্ভাব হইয়া তাহাকে ক্রমে বিদ্যা ও সদ্গুণ-সম্পদ হইতে প্রবৃত্ত করিল। ঐরূপে জীবনসংগ্রাম ভিন্ন উচ্চ বিষয়-সকলে তাহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবামাত্র সে দেখিতে পাইল—ঐ লক্ষ্যে অগ্রসর হইবার পথে ধর্মবিশ্বাস এবং পুরোহিতকুলের প্রাধান্য তাহার অন্তরায়স্বরূপে দণ্ডায়মান। দেখিল, বিদ্যাশিক্ষায় শ্রীভগবানের অপ্রসন্নতালাভে অনন্তনিরয়গামী হইতে হইবে, কেবলমাত্র ইহা বলিয়াই পুরোহিতকুল নিশ্চিন্ত নহেন; কিন্তু ছলে বলে কৌশলে তাহাকে ঐ পথে অগ্রসর হইতে বাধা প্রদান করিতে বদ্ধপরিকর। তখন স্বার্থসাধন-তৎপর পাশ্চাত্ত্য মানবের কর্তব্য-নির্ধারণে বিলম্ব হইল না। সবলহস্তে পুরোহিতকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া সে আপন গন্তব্যপথে অগ্রসর হইল। ঐরূপে ধর্মযাজকের সহিত শাস্ত্র ও ধর্মবিশ্বাসকে দূরে পরিহার করিয়া পাশ্চাত্ত্য নবীন পথে নিজ জীবন পরিচালিত করে; এবং পঞ্চেন্দ্রিয়গ্রাহ্যতারূপ নিশ্চিত প্রমাণপ্রয়োগ না করিয়া কোন

পাশ্চাত্ত্য মানবের উন্নতির কারণ ও ইতিহাস

বিষয় কখন বিশ্বাস বা গ্রহণ করিবে না, ইহাই তাহার নিকট মূলমন্ত্র হইয়া উঠে।

ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের উপর দণ্ডায়মান হইয়া বিচারানুমানাদিপূর্বক বিষয়-বিশেষের সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হইবে, ইহা নিশ্চয় করিয়া পাশ্চাত্ত্য এখন হইতে যুষ্মদ্‌প্রত্যয়গোচর বিষয়ের উপাসক হইয়া পড়ে এবং অস্মদ্‌প্রত্যয়গোচর বিষয়ীকে বিষয়-সকলের মধ্যে অন্যতম ভাবিয়া উহার স্বভাবাদিও পূর্বোক্ত প্রমাণপ্রয়োগে জানিতে অগ্রসর হয়। গত চারিশত বৎসর সে ঐরূপে জাগতিক প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে পঞ্চেন্দ্রিয়সহায়ে পরীক্ষাপূর্বক গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং ঐ কালের ভিতরেই বর্তমান যুগের জড়বিজ্ঞান শৈশবের জড়তা এবং অসহায়তা হইতে মুক্ত হইয়া যৌবনের উদ্যম, আশা, আনন্দ ও বলোন্মত্ততায় উপস্থিত হইয়াছে।

আত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্য মানবের মূর্খতা উহার কারণ; এবং ঐজন্য তাহার মনের অশান্তি

কিন্তু জড়বিজ্ঞানের সবিশেষ উন্নতিসাধন করিতে পারিলেও, পূর্বোক্ত নীতির আত্মবিজ্ঞানসম্বন্ধে পাশ্চাত্ত্যকে পথ দেখাইতে পারে নাই। কারণ সংযম, স্বার্থহীনতা এবং অন্তর্মুখতাই ঐ বিজ্ঞানলাভের একমাত্র পথ এবং নিরুদ্ধবৃত্তি মনই আত্মোপলব্ধির একমাত্র যন্ত্র। অতএব, বহির্মুখ পাশ্চাত্ত্যের ঐ বিষয়ে পথ হারাইয়া দিন দিন দেহাত্মবাদী নাস্তিক হইয়া উঠায় কিছুমাত্র আশ্চর্য নাই। সেজন্য ঐহিকের ভোগসুখই পাশ্চাত্ত্যের নিকট এখন সর্বস্বরূপে পরিগণিত এবং তল্লাভেই সে সবিশেষ যত্নশীল; এবং তাহার

বিজ্ঞানলব্ধ পদার্থজ্ঞান ঐ বিষয়েই প্রধানতঃ প্রযুক্ত হইয়া তাহাকে দিন দিন দাম্ভিক ও স্বার্থপর করিয়া তুলিয়াছে। ঐজন্যই দেখিতে পাওয়া যায়, পাশ্চাত্ত্যে স্ববর্ণগত জাতিবিভাগ, প্রলয়বিষাণনাদী করাল কামানবন্দুকাদি, অসামান্য শ্রীর পার্শ্বে দারিদ্র্যজাত অসীম অসন্তোষ এবং ভীষণধনপিপাসা, পরদেশাধিকার ও পরজাতি-প্রপীড়নাদি। ঐজন্যই আবার দেখিতে পাওয়া যায়, ভোগসুখের চরমে উপস্থিত হইয়াও পাশ্চাত্ত্য নরনারীর আত্মার অভাব ঘুচিতেছে না এবং মৃত্যুর পারে জাতিগত অস্তিত্বে বিশ্বাসমাত্র-অবলম্বনে তাহারা কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছে না। বিশেষ অনুসন্ধানের ফলে পাশ্চাত্ত্য এখন বুঝিয়াছে যে, পঞ্চেন্দ্রিয়জনিত জ্ঞান তাহাকে দেশকালাতীত বস্তুতত্ত্বাবিষ্কারে কখন সমর্থ করিবে না। বিজ্ঞান তাহাকে ঐ বস্তুর ক্ষণিক আভাসমাত্র প্রদানপূর্বক উহাকে ধরা বুঝা তাহারি সাধ্যাতীত বলিয়া নিবৃত্ত হয়। অতএব যে দেবতার বলে সে আপনাকে এতকাল বলীয়ান ভাবিয়াছিল, যাঁহার প্রসাদে তাহার যাবতীয় ভোগশ্রী ও সম্পদ, সেই দেবতার পরাভবে পাশ্চাত্ত্য মানবের আন্তরিক হাহাকার এখন দিন দিন বর্ধিত হইতেছে এবং আপনাকে সে নিতান্ত নিরুপায় ভাবিতেছে।

পাশ্চাত্ত্য জীবনের পূর্বোক্ত ইতিহাসালোচনায় আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, উহার প্রসারভিত্তির মূলে বিষয়প্রবণতা, স্বার্থপরতা এবং ধর্মবিশ্বাসরাহিত্য বিদ্যমান। অতএব ব্যক্তিগত বা জাতিগত জীবনে পাশ্চাত্ত্যের অনুরূপ ফললাভ করিতে হইলে স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অপরকে ঐ ভিত্তির উপরেই

নিজ জীবন প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। সেজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, জাপানী প্রভৃতি যে-সকল প্রাচ্য জাতি পাশ্চাত্ত্যের ভাবে জাতীয় জীবনগঠনে তৎপর হইয়াছে, স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির সহিত তাহাদিগের মধ্যে পূর্বোক্ত দোষসকলেরও আবির্ভাব হইতেছে। পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত হওয়ার উহাই বিষম দোষ। পাশ্চাত্ত্যসংসর্গে ভারতের জাতীয় জীবনে যে অবস্থার উদয় হইয়াছে, তাহার অনুশীলনে ঐ কথা আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

পাশ্চাত্ত্যের ন্যায় উন্নতিলাভ করিতে হইলে স্বার্থপর ও ভোগলোলুপ হইতে হইবে

এখানে প্রথমেই প্রশ্ন উঠিবে—পাশ্চাত্ত্যসংসর্গে আসিবার পূর্বে 'জাতীয় জীবন' বলিয়া একটা কথা ভারতে বিদ্যমান ছিল কি না। উত্তরে বলিতে হইবে, কথা না থাকিলেও ঐ কথার লক্ষ্য যাহা, তাহা যে এক-ভাবে ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কারণ, তখনও সমগ্র ভারত শ্রীগুরু, গঙ্গা, গায়ত্রী ও গীতায় শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিল, তখনও গোকুলের পূজা উহার সর্বত্র লক্ষিত হইত, তখনও ভারতের আবালবৃদ্ধনরনারী রামায়ণ ও মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থসকল হইতে একই ভাবতরঙ্গ হৃদয়ে বহন করিয়া জীবন পরিচালিত করিত এবং উহার বিভিন্ন বিভাগের বুধমণ্ডলী আপন আপন মনোভাব দেবভাষায় পরস্পরের নিকটে ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইতেন। ঐরূপ আরও অনেক একতাসূত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে এবং ধর্মভাব ও ধর্মানুষ্ঠান যে ঐ একতার শ্রেষ্ঠ অবলম্বন ছিল, একথা নিঃসংশয়ে বুঝিতে পারা যায়।

ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের ভিত্তি

যুগ-প্রয়োজন

ভারতের জাতীয় জীবন ঐরূপে ধর্মাবলম্বনে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া উহার সভ্যতা এক অপূর্ব বিভিন্ন উপাদানে গঠিত হইয়াছিল। এক কথায় বলিতে হইলে, সংযমই ঐ সভ্যতার প্রাণস্বরূপ ছিল। ব্যক্তি এবং জাতি উভয়কেই ভারত সংযম-সহায়ে নিজ নিজ জীবন নিয়মিত করিতে শিক্ষা প্রদান করিত। ত্যাগের জন্য ভোগের গ্রহণ এবং পরজীবনের জন্য এই জীবনের শিক্ষা—একথা সকলকে সর্বাবস্থায় স্মরণ করাইয়া ব্যক্তি ও জাতির ব্যবহারিক জীবন সে সর্বদা উচ্চতম লক্ষ্যে পরিচালিত করিত। সেজন্যই উহার বর্ণ বা জাতিবিভাগ এতকাল পর্যন্ত কোন শ্রেণীর স্বার্থে আঘাত করিয়া তাহাদিগের বিষম অসন্তোষের কারণ হয় নাই। কারণ, সমাজের যে শ্রেণী বা স্তরে মানব জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই স্তরের কর্তব্য নিষ্কামভাবে করিতে পারিলেই সে যখন অন্যের সহিত সমভাবে মানব-জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য জ্ঞান ও মুক্তির অধিকারী হইবে, তখন তাহার অসন্তোষের কারণ আর কি হইতে পারে? শ্রেণীবিশেষের ভোগসুখের তারতম্যকে অধিকার করিয়া পাশ্চাত্ত্যসমাজের ন্যায় ভারতের সমাজে যে প্রাচীনকালে বিরোধ উপস্থিত হয় নাই, তাহার কারণ—জীবনের উচ্চতম লক্ষ্যে সমাজস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির সমানাধিকার ছিল বলিয়া। প্রাচীন ভারতের জাতীয় জীবন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথাগুলি স্মরণে রাখিয়া দেখা যাউক, পাশ্চাত্ত্য-সংসর্গে উহার জীবনে কীদৃশ পরিবর্তনসকল এখন উপস্থিত হইয়াছে।

উহা ধর্মে প্রতিষ্ঠিত ছিল বলিয়া ভোগ-সাধন লইয়া ভারতের সমাজে কখন বিবাদ উপস্থিত হয় নাই

পাশ্চাত্ত্যের ভারতাধিকার ও তাহার ফল

পাশ্চাত্ত্যের ভারতাধিকারের দিন হইতে ভারতের জাতীয় ধনবিভাগপ্রণালীতে যে একটা বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হইবে, ইহা স্বাভাবিক এবং অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু ভারতের জাতীয় জীবনের ঐ ভাগ মাত্র পরিবর্তিত করিয়াই পাশ্চাত্ত্যপ্রভাব নিবৃত্ত হয় নাই। প্রাচীনকাল হইতে যে-সকল মূল সংস্কার লইয়া ভারত-ভারতী ব্যক্তি ও জাতিগত জীবন পরিচালিত করিতেছিল, সেই সকলের মধ্যে ঐ প্রভাব এক অপূর্ব ভাব-পরিবর্তন উপস্থিত করিল। পাশ্চাত্ত্য বুঝাইল, ত্যাগের জন্য ভোগ—একথা পুরোহিতকুলের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য উদ্ভূত হইয়াছে। পরজীবনের ও আত্মার অস্তিত্বস্বীকার এক প্রকাণ্ড কবিকল্পনা, সমাজের যে স্তরে মানব জন্মগ্রহণ করিয়াছে, সেই স্তরেই সে আমরণ নিবদ্ধ থাকিবে—ইহা অপেক্ষা অযুক্তিকর, অন্যায় নিয়ম আর কি হইতে পারে? ভারতও ক্রমে তাহাই বুঝিল এবং ত্যাগ ও সংযম-প্রধান পূর্ব জীবন-লক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া অধিকতর ভোগলাভের জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠিল। ঐরূপে উহাতে পূর্ব শিক্ষাদীক্ষার লোপ হইল এবং নাস্তিক্য, পরানু-করণপ্রিয়তা ও আত্মবিশ্বাসরাহিত্যের উদয় হইয়া উহাকে মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর তুল্য নিতান্ত নির্বীর্য করিয়া তুলিল। ভারত বুঝিল, সে এতকাল ধরিয়া যাহা হৃদয়ে বহন করিয়া যত্নে অনুষ্ঠান করিয়াছে, তাহা নিতান্ত ভ্রমসঙ্কুল; বিজ্ঞানবলে বলীয়ান পাশ্চাত্ত্য তাহার সংস্কারসমূহকে অমার্জিত ও অর্ধবর্বর বলিয়া যেরূপ নির্দেশ করিতেছে [illegible] সত্য। ভোগ-

লালসামুগ্ধ ভারত নিজ পূর্বেতিহাস ও পূর্বগৌরব বিস্মৃত হইল। স্মৃতিভ্রংশ হইতে তাহার বুদ্ধিনাশ উপস্থিত হইল এবং উহা তাহার জাতীয় অস্তিত্বের বিলোপসাধন করিবার উপক্রম করিল। আবার ঐহিক ভোগলাভের জন্য তাহাকে এখন হইতে পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হওয়ায় উহার লাভও তাহার ভাগ্যে দূরপরাহত হইল। ঐরূপে যোগ ও ভোগ উভয় মার্গ হইতে ভ্রষ্ট হইয়া কর্ণধারশূন্য তরণীর ন্যায় সে পরানুকরণ করিয়া বাসনাবাত্যাভিমুখে যথা-ইচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে লাগিল।

পাশ্চাত্ত্যভাব-সহায়ে নির্জীব ভারতকে সজীব করিবার চেষ্টা ও তাহার ফল

তখন চারিদিক হইতে রব উঠিল, ভারতের জাতীয় জীবন কোনকালেই ছিল না। পাশ্চাত্ত্যের কৃপায় এতদিনে তাহার ঐ জীবনের উন্মেষ হইতেছে, কিন্তু উহার পূর্ণবিভাগের পথে এখনও অনেক অন্তরায় বিদ্যমান। ঐ যে উহার দুর্নিবার্য ধর্মসংস্কার, উহাই উহার সর্বনাশ করিয়াছে। ঐ যে অসংখ্য দেবদেবীর পূজা—ঐ পৌত্তলিকতাই তাহাকে এতদিন উঠিতে দেয় নাই। উহার বিনাশ কর, উচ্ছেদ কর, তবেই ভারত-ভারতী সজীব হইয়া উঠিবে। ঈশাহি ধর্ম এবং তদনুকরণে একেশ্বরবাদ প্রচারিত হইতে লাগিল। পাশ্চাত্ত্যানুকরণে সভাসমিতি গঠিত হইয়া প্রাণহীন ভারতকে রাজনীতি, সমাজতত্ত্ব, বিধবাবিবাহ ও স্ত্রী-স্বাধীনতার উপকারিতা প্রভৃতি নানা কথা শ্রবণ করান হইল—কিন্তু তাহার অভাববোধ ও হাহাকার নিবৃত্ত না হইয়া প্রতিদিন বর্ধিত হইতে লাগিল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার যত কিছু সাজসরঞ্জাম একে একে ভারতে উপস্থিত

করা হইল, কিন্তু বৃথা চেষ্টা—সে ভাবপ্রেরণায় ভারত সজীব ছিল, তাহার অনুসন্ধান এবং পুনঃপ্রবর্তনের চেষ্টা ঐ সকলে কিছুমাত্র হইল না। ঔষধ যথাস্থানে প্রযুক্ত হইল না, রোগের উপশম হইবে কিরূপে? ধর্মপ্রাণ ভারতের ধর্ম সজীব না হইলে সে সজীব হইবে কিরূপে? পাশ্চাত্ত্যের ভাবপ্রসারে তাহাতে যে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, নাস্তিক পাশ্চাত্ত্যের তাহা দূর করিবার সামর্থ্য কোথায়? স্বয়ং অসিদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্ত্য অপরকে সিদ্ধ করিবে কিরূপে?

ভারতের প্রাচীন জাতীয় জীবনের দোষ-গুণ-বিচার

পাশ্চাত্ত্যাধিকারের পূর্বে ভারতের জাতীয় জীবনে যে কিছুমাত্র দোষ ছিল না, একথা বলা যায় না। কিন্তু জাতীয় শরীর সজীব থাকায় ঐ দোষনিবারণের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টাও উহাতে সর্বদা লক্ষিত হইত। জাতি এবং সমাজের ভিতর এখন সেই চেষ্টার বিলোপ দেখিয়া বুঝিতে হইবে, পাশ্চাত্ত্যভাব-প্রসাররূপ ঔষধ-প্রয়োগ রোগের সহিত রোগীকেও সরাইতে বসিয়াছে।

পাশ্চাত্ত্যভাব-বিস্তারে ভারতের বর্তমান ধর্মগ্লানি

অতএব দেখা যাইতেছে, পাশ্চাত্ত্যের ধর্মগ্লানি ভারতেও অধিকার বিস্তার করিয়াছে। বাস্তবিক ঐ গ্লানি বর্তমানকালে পৃথিবীর সর্বত্র কতদূর প্রবল হইয়াছে, তাহা ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ধর্ম বলিয়া যদি কোন বাস্তব পদার্থ থাকে এবং বিধাতার নির্দেশে তল্লাভ যদি মানবের সাধ্যায়ত্ত হয়, তাহা হইলে বর্তমান যুগের ভোগপরায়ণ মানবজীবন যে উহা হইতে বহুদূরে বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, একথা নিঃসন্দেহ। বিজ্ঞান-সহায়ে

যুগ-প্রয়োজন

মানবের বর্তমান জীবন-প্রসার মানবকে বিচিত্র ভোগসাধনলাভে সমর্থ করিলেও, তাহাকে যে শান্তির অধিকারী করিতে পারিতেছে না, তাহা ঐজন্য। কে উহার প্রতিকার করিবে? পৃথিবীর ঐ অশান্তি ও হাহাকার কাহার প্রাণে নিরন্তর ধ্বনিত হইয়া তাহাকে সর্বভোগসাধন উপেক্ষাপূর্বক যুগোপযোগী নূতন ধর্মপথাবিষ্কারে প্রযুক্ত করিবে? প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের ধর্মগ্লানি দূর করিয়া শান্তিময় নূতন পথে জীবন পরিচালিত করিতে মানবকে পুনরায় কে শিক্ষা প্রদান করিবে?

গীতামুখে শ্রীভগবান প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, জগতে ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইলেই তিনি নিজ মায়াশক্তি অবলম্বনপূর্বক শরীরধারিরূপে প্রকাশিত হইবেন এবং ঐ গ্লানি দূর করিয়া পুনরায় মানবকে শান্তির অধিকারী করিবেন। বর্তমান যুগ-প্রয়োজন কি তাঁহার করুণায় বিষম উত্তেজনা আনয়ন করিবে না? বর্তমান অভাববোধ ও অশান্তি কি তাঁহাকে শরীরপরিগ্রহ করিতে প্রযুক্ত করিবে না?

ঐ গ্লানি নিবারণের জন্য ঈশ্বরের পুনরায় অবতীর্ণ হওয়া

হে পাঠক! যুগ-প্রয়োজন ঐ কার্য সম্পন্ন করিয়াছে—শ্রীভগবান জগদ্‌গুরুরূপে সত্য সত্যই পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছেন। আশ্বস্তহৃদয়ে শ্রবণ কর, তাঁহার পূত আশীর্বাণী—"যত মত তত পথ", "সর্বান্তঃকরণে যাহাই অনুষ্ঠান করিবে, তাহা হইতেই তুমি শ্রীভগবানকে লাভ করিবে।" মুগ্ধ হইয়া মনন কর—পরাবিদ্যা পুনরানয়নের জন্য তাঁহার অলৌকিক ত্যাগ ও তপস্যা!—এবং তাঁহার কামগন্ধহীন পুণ্যচরিত্রের যথাসাধ্য আলোচনা ও ধ্যান করিয়া আইস, আমরা উভয়ে পবিত্র হই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

দরিদ্রগৃহে ঈশ্বরের অবতীর্ণ হইবার কারণ

ঈশ্বরাবতার বলিয়া যে সকল মহাপুরুষ জগতে অদ্যাপি পূজিত হইতেছেন, শ্রীভগবান রামচন্দ্র ও শাক্যসিংহের কথা ছাড়িয়া দিলে, তাঁহাদিগের সকলেরই পার্থিব জীবন দুঃখদারিদ্র্য, সংসারের অসচ্ছলতা এবং এমনকি কঠোরতার ভিতর আরম্ভ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—ক্ষত্রিয়রাজকুল অলঙ্কৃত করিলেও শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণের কারাগৃহে জন্ম ও আত্মীয়-স্বজন হইতে দূরে, নীচ গোপকুলমধ্যে বাল্যজীবন অতিবাহিত হইয়াছিল; শ্রীভগবান ঈশা পান্থশালায় পশুরক্ষাগৃহে দরিদ্র পিতামাতার ক্রোড় উজ্জ্বল করিয়াছিলেন; শ্রীভগবান শঙ্কর দরিদ্র বিধবার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; শ্রীভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নগণ্য সাধারণ ব্যক্তির গৃহে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন; ইস্‌লামধর্ম-প্রবর্তক শ্রীমৎ মহম্মদের জীবনেও ঐ কথার পরিচয় পাওয়া যায়। ঐরূপ হইলেও কিন্তু যে দুঃখ-দারিদ্র্যের ভিতর সন্তোষের সরসতা নাই, যে অসচ্ছল সংসারে নিঃস্বার্থতা ও প্রেম নাই, যে দরিদ্র পিতামাতার হৃদয়ে ত্যাগ, পবিত্রতা ও কঠোর মনুষ্যত্বের সহিত কোমল দয়াদাক্ষিণ্যাদি ভাবসমূহের মধুর সামঞ্জস্য নাই, সেস্থলে তাঁহারা কখনও জন্মগ্রহণ করেন নাই।

কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

ভাবিয়া দেখিলে, পূর্বোক্ত বিধানের সহিত তাঁহাদিগের ভাবী জীবনের একটা গূঢ় সম্বন্ধ লক্ষিত হয়। কারণ, যৌবনে ও প্রৌঢ়ে যাঁহাদিগকে সমাজের দুঃখী, দরিদ্র এবং অত্যাচারিতদিগের নয়নাশ্রু মুছাইয়া হৃদয়ে শান্তিপ্রদান করিতে হইবে, তাঁহারা ঐসকল ব্যক্তির অবস্থার সহিত পূর্ব হইতে পরিচিত ও সমানুভূতি-সম্পন্ন না হইলে ঐ কার্যসাধন করিবেন কিরূপে? শুধু তাহাই নহে। আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি সংসারে ধর্মগ্লানি-নিবারণের জন্যই অবতারপুরুষসকলের অভ্যুদয় হয়। ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে পূর্বপ্রচারিত ধর্মবিধানসকলের যথাযথ অবস্থার সহিত প্রথমেই পরিচিত হইতে হয় এবং ঐ সকল প্রাচীন বিধানের বর্তমান গ্লানির কারণ আলোচনাপূর্বক তাহাদিগের পূর্ণতা ও সাফল্যস্বরূপ দেশকালোপযোগী নূতন বিধান আবিষ্কার করিতে হয়। ঐ পরিচয়লাভের বিশেষ সুযোগ দরিদ্রের কুটির ভিন্ন ধনীর প্রাসাদ কখনও প্রদান করে না। কারণ, সংসারের সুখভোগে বঞ্চিত দরিদ্র ব্যক্তিই ঈশ্বর এবং তাঁহার বিধানকে জীবনের প্রধান অবলম্বনরূপে সর্বদা দৃঢ়ালিঙ্গন করিয়া থাকে। অতএব সর্বত্র ধর্মগ্লানি উপস্থিত হইলেও পূর্ব পূর্ব বিধানের যথাযথ কিঞ্চিদাভাস দরিদ্রের কুটিরকে তখনও উজ্জ্বল করিয়া রাখে; এবং ঐজন্যই বোধ হয়, জগদ্গুরু মহাপুরুষসকল জন্মপরিগ্রহকালে দরিদ্র পরিবারেই আকৃষ্ট হইয়া থাকেন।

যে মহাপুরুষের কথা আমরা বলিতে বসিয়াছি, তাঁহার জীবনারম্ভও পূর্বোক্ত নিয়ম অতিক্রম করে নাই।

হুগলি জেলার উত্তর-পশ্চিমাংশ যেখানে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর

জেলাদ্বয়ের সহিত মিলিত হইয়াছে, সেই সন্ধিস্থলের অনতিদূরে তিনখানি গ্রাম ত্রিকোণমণ্ডলে পরস্পরের সন্নিকট অবস্থিত আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মভূমি কামারপুকুর

গ্রামবাসীদিগের নিকটে ঐ গ্রামত্রয় শ্রীপুর, কামারপুকুর ও মুকুন্দপুররূপে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত থাকিলেও উহারা পরস্পর এত ঘন সন্নিবেশে অবস্থিত যে, পথিকের নিকটে একই গ্রামের বিভিন্ন পল্লী বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকে। সেজন্য চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে উহারা একমাত্র কামারপুকুর নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। স্থানীয় জমিদারদিগের বহুকাল ঐ গ্রামে বাস থাকাতেই বোধ হয় কামারপুকুরের পূর্বোক্ত সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেইকালে কামারপুকুর শ্রীযুক্ত বর্ধমান মহারাজের গুরুবংশীয়দিগের লাখরাজ, জমিদারিভুক্ত ছিল এবং তাঁহাদিগের বংশধর শ্রীযুক্ত গোপীলাল, সুখলাল প্রভৃতি গোস্বামিগণ* ঐ গ্রামে বাস করিতেছিলেন

* ৺হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় আমাদিগকে সুখলালের স্থলে অনুপ গোস্বামীর নাম বলিয়াছিলেন; কিন্তু বোধ হয়, উহা সমীচীন নহে। গ্রামের বর্তমান জমিদার লাহাবাবুদের নিকটে শুনিয়াছি, উক্ত গোস্বামীজীর নাম সুখলাল ছিল এবং ইঁহার পুত্র কৃষ্ণলাল গোস্বামীর নিকট হইতেই তাঁহারা প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে কামারপুকুরের অধিকাংশ জমি ক্রয় করিয়া লইয়াছিলেন। আবার গ্রামে প্রবাদ আছে, ৺গোপেশ্বর নামক বৃহৎ শিবলিঙ্গ গোপীলাল গোস্বামী প্রতিষ্ঠিত করেন। অতএব উক্ত গোপীলাল গোস্বামী সুখলালের কোন পূর্বতন পুরুষ ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। অথবা এমনও হইতে পারে, সুখলালের অন্য নাম গোপীলাল ছিল।

কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

কামারপুকুর হইতে বর্ধমান শহর প্রায় বত্রিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। উক্ত শহর হইতে আসিবার বরাবর পাকা রাস্তা আছে। কামারপুকুরে আসিয়াই ঐ রাস্তার শেষ হয় নাই ; ঐ গ্রামকে অর্ধবেষ্টন করিয়া উহা দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে ৺পুরীধাম পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। পাদচারী দরিদ্র যাত্রী এবং বৈরাগ্যবান সাধুসকলের অনেকে ঐ পথ দিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদর্শনে গমনাগমন করেন।

কামারপুকুরের প্রায় ৯।১০ ক্রোশ পূর্বে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রসিদ্ধ মন্দির অবস্থিত। ঐ স্থান হইতে দ্বারকেশ্বর নদের তীরবর্তী জাহানাবাদ বা আরামবাগের মধ্য দিয়া কামারপুকুরে আসিবার একটি পথ আছে। তদ্ভিন্ন উক্ত গ্রামের প্রায় নয় ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত ঘাটাল হইতে এবং প্রায় তের ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত বন-বিষ্ণুপুর হইতেও এখানে আসিবার প্রশস্ত পথ আছে।

কামারপুকুর অঞ্চলের পূর্ব-সমৃদ্ধি ও বর্তমান অবস্থা

১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ম্যালেরিয়াপ্রসূত মহামারীর আবির্ভাবের পূর্বে কৃষিপ্রধান বঙ্গের পল্লীগ্রামসকলে কি অপূর্ব শান্তির ছায়া অবস্থান করিত, তাহা বলিবার নহে। বিশেষতঃ, হুগলি জেলার এই গ্রামাঞ্চলের বিস্তীর্ণ ধান্যপ্রান্তরসকলের মধ্যগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামগুলি বিশাল হরিৎসাগরে ভাসমান দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় প্রতীত হইত। জমির উর্বরতায় খাদ্যদ্রব্যের অভাব না থাকায় এবং নির্মল বায়ুতে নিত্য পরিশ্রমের ফলে গ্রামবাসীদিগের দেহে স্বাস্থ্য ও সবলতা এবং মনে প্রীতি ও সন্তোষ সর্বদা

পরিলক্ষিত হইত। বহুজনাকীর্ণ গ্রামসকলে আবার কৃষি ভিন্ন ছোটখাট নানাপ্রকার শিল্পব্যবসায়েও লোকে নিযুক্ত থাকিত। ঐরূপে উৎকৃষ্ট জিলাপি, মিঠাই ও নবাত প্রস্তুত করিবার জন্য কামারপুকুর এই অঞ্চলে চিরপ্রসিদ্ধ এবং আবলুস কাষ্ঠ-নির্মিত হুঁকার নল নির্মাণপূর্বক ঐ গ্রাম কলিকাতার সহিত কারবারে এখনও বেশ দু'পয়সা অর্জন করিয়া থাকে। সূতা, গামছা ও কাপড় প্রস্তুত করিবার জন্য এবং অন্য নানা শিল্পকার্যেও কামারপুকুর এককালে প্রসিদ্ধ ছিল। বিষ্ণু চাপড়ি প্রমুখ কয়েকজন বিখ্যাত বস্ত্রব্যবসায়ী এই গ্রামে বাস করিয়া তখন কলিকাতার সহিত অনেক টাকার কারবার করিতেন। প্রতি শনি ও মঙ্গলবারে গ্রামে এখনও হাট বসিয়া থাকে। তারাহাট, বদনগঞ্জ, সিহড, দেশড়া প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকল হইতে লোকে সূতা, বস্ত্র, গামছা, হাঁড়ি, কলসী, কুলা, চেঙ্গারি, মাতুর, চেটাই প্রভৃতি সংসারের নিত্যব্যবহার্য পণ্য ও ক্ষেত্রজ দ্রব্যসকল হাটবারে কামারপুকুরে আনয়নপূর্বক পরস্পরে ক্রয়বিক্রয় করিয়া থাকে। গ্রামে আনন্দোৎসবের অভাব এখনও লক্ষিত হয় না। চৈত্রমাসে মনসাপূজা ও শিবের গাজনে এবং বৈশাখ বা জ্যৈষ্ঠে চব্বিশপ্রহরীয় হরিবাসরে কামারপুকুর মুখরিত হইয়া উঠে। তদ্ভিন্ন জমিদারবাটীতে বারমাস সকলপ্রকার পালপার্বণ এবং প্রতিষ্ঠিত দেবালয়সকলে নিত্যপূজা ও পার্বণাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অবশ্য দারিদ্র্য-জনিত অভাব বর্তমানে ঐ সকলের অনেকাংশে লোপসাধন করিয়াছে।

৺ধর্মঠাকুরের পূজায়ও এখানে এককালে বিশেষ আড়ম্বর ছিল। কিন্তু এখন আর সেই কাল নাই; বৌদ্ধ ত্রিরত্নের অন্যতম শ্রীধর্ম এখন কূর্মমূর্তিতে পরিণত হইয়া এখানে এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে সামান্য পূজামাত্রই পাইয়া থাকেন। ব্রাহ্মণগণকেও সময়ে সময়ে ঐ মূর্তির পূজা করিতে দেখা গিয়া থাকে।

ঐ অঞ্চলে ৺ধর্মঠাকুরের পূজা

উক্ত ধর্মঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন নাম বিভিন্ন গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। যথা, কামারপুকুরের ধর্মঠাকুরের নাম—'রাজাধিরাজ ধর্ম'; শ্রীপুরে প্রতিষ্ঠিত উক্ত ঠাকুরের নাম—'যাত্রাসিদ্ধিরায় ধর্ম' এবং মুকুন্দপুরের সন্নিকটে মধুবাটী নামক গ্রামে প্রতিষ্ঠিত ধর্মের নাম—'সন্ন্যাসীরায় ধর্ম'। কামারপুকুরের প্রতিষ্ঠিত ধর্মের রথযাত্রাও এককালে মহাসমারোহে সম্পন্ন হইত। নবচূড়া-সমন্বিত সুদীর্ঘ রথখানি তখন তাঁহার মন্দিরপার্শ্বে নিত্য নয়নগোচর হইত। ভগ্ন হইবার পরে ঐ রথ আর নির্মিত হয় নাই। ধর্মমন্দিরটিও সংস্কারাভাবে ভূমিসাৎ হইতে বসিয়াছে দেখিয়া ধর্মপণ্ডিত যজ্ঞেশ্বর তাঁহার নিজ বাটীতে ঠাকুরকে এখন স্থানান্তরিত করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, তাঁতী, সদ্গোপ, কামার, কুমার, জেলে, ডোম প্রভৃতি উচ্চনীচ সকলপ্রকার জাতিরই কামারপুকুরে বসতি আছে। গ্রামে তিন-চারিটি বৃহৎ পুষ্করিণী আছে। তন্মধ্যে হালদার-পুকুরই সর্বাপেক্ষা বড়। তদ্ভিন্ন ক্ষুদ্র পুষ্করিণী অনেক আছে। তাহাদিগের কোন কোনটি আবার শতদল

হালদারপুকুর, ভূতীর খাল, আম্রকানন প্রভৃতির কথা

কমল, কুমুদ ও কহ্লারশ্রেণী বক্ষে ধারণ করিয়া অপূর্ব শোভা বিস্তার করিয়া থাকে। গ্রামে ইষ্টক নির্মিত বাটীর ও সমাধির অসদ্ভাব নাই। পূর্বে উহার সংখ্যা অনেক অধিক ছিল। রামানন্দ শাঁখারীর ভগ্ন দেউল, ফকির দত্তের জীর্ণ রাস-মঞ্চ, জঙ্গলাকীর্ণ ইষ্টকের স্তূপ এবং পরিত্যক্ত দেবালয়-সমূহ নানাস্থানে বিদ্যমান থাকিয়া ঐ বিষয়ের এবং গ্রামের পূর্বসমৃদ্ধির পরিচয় প্রদান করিতেছে। গ্রামের ঈশান ও বায়ুকোণে 'বুধুই মোড়ল' ও ভূতীর খাল' নামক দুইটি শ্মশান বর্তমান। শেষোক্ত স্থানের পশ্চিমে গোচর-প্রান্তর, মানিকরাজা-প্রতিষ্ঠিত সর্বসাধারণের উপভোগ্য আম্রকানন এবং আমোদর নদ বিদ্যমান আছে। ভূতীর খাল দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া গ্রামের অনতিদূরে উক্ত নদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে।

ভুরসুবোর মানিকরাজা

কামারপুকুরের অর্ধক্রোশ উত্তরে ভুরসুবো নামক গ্রাম। শ্রীযুক্ত মানিকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক বিশেষ ধনাঢ্য ব্যক্তির তথায় বাস ছিল। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলে ইনি 'মানিকরাজা' নামে পরিচিত ছিলেন। পূর্বোক্ত আম্রকানন ভিন্ন 'সুখসায়ের', 'হাতিসায়ের' প্রভৃতি বৃহৎ দীর্ঘিকাসকল এখনও ইঁহার কীর্তি ঘোষণা করিতেছে। শুনা যায়, ইঁহার বাটীতে লক্ষ ব্রাহ্মণ অনেকবার নিমন্ত্রিত হইয়া ভোজন করিয়াছিলেন।

কামারপুকুরের দক্ষিণ-পূর্ব বা অগ্নিকোণে মান্দারণ গ্রাম। চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসকলকে শত্রুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার

গড় মান্দারণ

নিমিত্ত পূর্বে কোনকালে এখানে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ প্রতিষ্ঠিত ছিল। পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্রকায় আমোদর নদের গতি কৌশলে পরিবর্তিত করিয়া উক্ত গড়ের পরিখায় পরিণত করা হইয়াছিল।

মান্দারণ দুর্গের ভগ্ন তোরণ, স্তূপ ও পরিখা এবং উহার অনতিদূরে শৈলেশ্বর মহাদেবের মন্দির এখনও বর্তমান থাকিয়া পাঠানদিগের রাজত্বকালে এইসকল স্থানের প্রসিদ্ধি সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতেছে। গড় মান্দারণের পার্শ্ব দিয়াই বর্ধমানে গমনাগমন করিবার পূর্বোক্ত পথ প্রসারিত রহিয়াছে। ঐ পথের দুইধারে অনেকগুলি বৃহৎ দীর্ঘিকা নয়নগোচর হয়। উক্ত গড় হইতে প্রায় নয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত উচালন

উচালনের দীঘি ও মোগলমারির যুদ্ধক্ষেত্র

নামক স্থানের দীঘিকাই তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। উক্ত পথের একস্থানে একটি ভগ্ন হস্তিশালাও লক্ষিত হইয়া থাকে। ঐসকল দর্শনে বুঝিতে পারা যায়, যুদ্ধবিগ্রহের সৌকর্যার্থেই এই পথ নির্মিত হইয়াছিল। মোগলমারির প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র পথিমধ্যে বিদ্যমান থাকিয়া ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

কামারপুকুরের পশ্চিমে প্রায় একক্রোশ দূরে সাতবেড়ে, নারায়ণপুর ও দেরে নামক তিনখানি গ্রাম পাশাপাশি অবস্থিত আছে। এই গ্রামসকল এককালে সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। দেরের দীর্ঘিকা ও তৎপার্শ্ববর্তী দেবালয় এবং অন্যান্য নানা বিষয় দেখিয়া ঐ কথা অনুমিত হয়। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি,

সেই সময়ে উক্ত গ্রামত্রয় ভিন্ন জমিদারিভুক্ত ছিল এবং উহার জমিদার রামানন্দ রায় সাতবেড়ে নামক গ্রামে বাস করিতেছিলেন। এই জমিদার বিশেষ ধনাঢ্য না হইলেও বিষম প্রজাপীড়ক ছিলেন। কোন কারণে কাহারও উপর কুপিত হইলে, ইনি ঐ প্রজাকে সর্বস্বান্ত করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হইতেন না। ইঁহার পুত্রকন্যাদির মধ্যে কেহই জীবিত ছিল না। লোকে বলে, প্রজাপীড়ন-অপরাধেই ইনি নির্বংশ হইয়াছিলেন এবং মৃত্যুর পরে ইঁহার বিষয়-সম্পত্তি অপরের হস্তগত হইয়াছিল।

দেরে গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায়ের কথা

প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে মধ্যবিত্ত-অবস্থাসম্পন্ন ধর্মনিষ্ঠ এক ব্রাহ্মণপরিবারের দেরে গ্রামে বাস ছিল। ইঁহারা সদাচারী, কুলীন এবং শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক ছিলেন। ইঁহাদিগের প্রতিষ্ঠিত শিবালয়সমন্বিত পুষ্করিণী এখনও 'চাটুয্যে পুকুর' নামে খ্যাত থাকিয়া ইঁহাদিগের পরিচয় প্রদান করিতেছে। উক্তবংশীয় শ্রীযুক্ত মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়ের তিন পুত্র এবং এক কন্যা হইয়াছিল। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ক্ষুদিরাম সম্ভবতঃ সন ১১৮১ সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তৎপরে রামশীলা নাম্নী কন্যার এবং নিধিরাম ও কানাইরাম নামক পুত্রদ্বয়ের জন্ম হইয়াছিল।

দেরে গ্রামের মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বয়ঃপ্রাপ্তির সহিত অর্থকরী কোনরূপ বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন কি-না জানা যায় না। কিন্তু সত্যনিষ্ঠা, সন্তোষ, ক্ষমা, ত্যাগ প্রভৃতি যে গুণসমূহ

কামারপুকুর ও পিতৃপরিচয়

সদ্‌ব্রাহ্মণের স্বভাবসিদ্ধ হওয়া কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রনির্দিষ্ট আছে, বিধাতা তাঁহাকে ঐ সকল গুণ প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি দীর্ঘ ও সবল ছিলেন, কিন্তু স্থূলকায় ছিলেন না; গৌরবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। বংশানুগত শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি তাঁহাতে বিশেষ প্রকাশ ছিল এবং তিনি নিত্যকৃত্য সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপন করিয়া প্রতিদিন পুষ্পচয়নপূর্বক ৺রঘুবীরের পূজান্তে জলগ্রহণ করিতেন। শূদ্রের নিকট হইতে দানগ্রহণ দূরে থাকুক, শূদ্রযাজী ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ তিনি কখনও গ্রহণ করেন নাই এবং যে-সকল ব্রাহ্মণ পণগ্রহণ করিয়া কন্যাসম্প্রদান করিত, তাহাদিগের হস্তে জলগ্রহণ পর্যন্ত করিতেন না। ঐরূপ নিষ্ঠা ও সদাচারের জন্য গ্রামবাসীরা তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি ও সম্মানের চক্ষে দর্শন করিত।

তৎপুত্র ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কথা

পিতার মৃত্যুর পরে সংসার ও বিষয়সম্পত্তির তত্ত্বাবধান শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের স্কন্ধেই পতিত হইয়াছিল এবং ধর্মপথে অবিচলিত থাকিয়া তিনি ঐ সকল কার্য যথাসাধ্য সম্পন্ন করিতেছিলেন। ইতিপূর্বে বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিলেও তাঁহার পত্নী অল্প বয়সেই মৃত্যুমুখে পতিত হন। সুতরাং আন্দাজ পঁচিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তিনি পুনরায় দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। তাঁহার এই পত্নীর নাম শ্রীমতী চন্দ্রমণি ছিল; কিন্তু বাটীতে ইঁহাকে সকলে 'চন্দ্রা' বলিয়াই সম্বোধন করিত। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর পিত্রালয় সরাটিমায়াপুর নামক গ্রামে অবস্থিত

ক্ষুদিরাম-গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী

ছিল। তিনি সুরূপা, সরলা ও দেবদ্বিজপরায়ণা ছিলেন। কিন্তু হৃদয়ের অসীম শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসাই তাঁহার বিশেষ গুণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে এবং ঐ সকলের জন্যই তিনি সংসারে সকলের প্রিয় হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১১৯৭ সালে শ্রীমতী চন্দ্রমণি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং সন ১২০৫ সালে বিবাহের সময় তাঁহার বয়ঃক্রম আট বৎসর মাত্র ছিল। সম্ভবতঃ সন ১২১১ সালে তাঁহার প্রথম পুত্র রামকুমার জন্মগ্রহণ করে। উহার প্রায় পাঁচ বৎসর পরে শ্রীমতী কাত্যায়নী নাম্নী কন্যার এবং সন ১২৩২ সালে দ্বিতীয় পুত্র রামেশ্বরের মুখাবলোকন করিয়া তিনি আনন্দিতা হইয়াছিলেন।

ধর্মপথে থাকিয়া সংসারযাত্রানির্বাহ করা যে কতদূর কঠিন কার্য, তাহা শ্রিযুক্ত ক্ষুদিরামের হৃদয়ঙ্গম হইতে বিলম্ব হয় নাই।

জমিদারের সহিত বিবাদে ক্ষুদিরামের সর্বস্বান্ত হওয়া

সম্ভবতঃ তাঁহার কন্যা কাত্যায়নীর জন্মপরিগ্রহের কিঞ্চিৎকাল পরে তিনি বিষম পরীক্ষায় নিপতিত হইয়াছিলেন। গ্রামের জমিদার রামানন্দ রায়ের প্রজাপীড়নের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। দেরেপুরের কোন ব্যক্তির প্রতি অসন্তুষ্ট হইয়া তিনি এখন মিথ্যাপবাদে আদালতে মকদ্দমা আনয়ন করিলেন এবং বিশ্বস্ত সাক্ষীর প্রয়োজন দেখিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে তাঁহার পক্ষে সাক্ষ্যপ্রদান করিতে অনুরোধ করিলেন। ধর্মপরায়ণ ক্ষুদিরাম আইন-আদালতকে সর্বদা ভীতির চক্ষে দেখিতেন এবং ঘটনা সত্য হইলেও ইতিপূর্বে কখন কাহারও বিরুদ্ধে উহাদিগের আশ্রয় লইতেন না। সুতরাং জমিদারের পূর্বোক্ত অনুরোধে আপনাকে বিশেষ

বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কিন্তু মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান না করিলে জমিদারের বিষম কোপে পতিত হইতে হইবে, একথা স্থির জানিয়াও তিনি উহাতে কিছুতেই সম্মত হইতে পারিলেন না। অগত্যা এস্থলে যাহা হইয়া থাকে, তাহাই হইল ; জমিদার তাঁহারও বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ প্রদানপূর্বক নালিশ রুজু করিলেন এবং মকদ্দমায় জয়ী হইয়া তাঁহার সমস্ত পৈতৃক সম্পত্তি নিলাম করিয়া লইলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেরেপুরে থাকিবার বিন্দুমাত্র স্থান রহিল না। গ্রামবাসী সকলে তাঁহার দুঃখে যথার্থ কাতর হইলেও তাঁহাকে জমিদারের বিরুদ্ধে কোনই সহায়তা করিতে পারিল না।

ক্ষুদিরামের দেরে-গ্রাম পরিত্যাগ

ঐরূপে প্রায় চল্লিশ বৎসর বয়ঃক্রমকালে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এককালে নিঃস্ব হইলেন। পিতৃপুরুষদিগের অধিকারিস্বত্বে ও নিজ উপার্জনের ফলে যে সম্পত্তি* তিনি এতকাল ধরিয়া সঞ্চয় করিয়াছিলেন, বায়ুতাড়িত ছিন্নাভ্রের ন্যায় উহা এখন কোথায় এককালে বিলীন হইল! কিন্তু ঐ ঘটনা তাঁহাকে ধর্মপথ হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিতে সক্ষম হইল না। তিনি ৺রঘুবীরের শ্রীপাদপদ্মে একান্ত শরণ গ্রহণ করিলেন এবং স্থিরচিত্তে নিজ কর্তব্য অবধারণপূর্বক দুর্জনকে দূরে পরিহার করিবার নিমিত্ত পৈতৃক ভিটা ও গ্রাম হইতে চিরকালের নিমিত্ত বিদায়গ্রহণ করিলেন।

* হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট শুনিয়াছি, দেরেপুরে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের প্রায় দেড়শত বিঘা জমি ছিল।

কামারপুকুরের শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামীজীর কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সমস্বভাববিশিষ্ট ছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সহিত ইঁহার পূর্ব হইতে বিশেষ সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। বন্ধুর ঐরূপ বিপদের কথা শুনিয়া তিনি বিশেষ বিচলিত হইলেন এবং নিজ বাটীর একাংশে কয়েকখানি চালাঘর চিরকালের জন্য ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাকে কামারপুকুরে আসিয়া বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পাঠাইলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম উহাতে অকূলে কূল পাইলেন এবং শ্রীভগবানের অচিন্ত্য লীলাতেই পূর্বোক্ত অনুরোধ উপস্থিত হইয়াছে ভাবিয়া কৃতজ্ঞহৃদয়ে কামারপুকুরে আগমনপূর্বক তদবধি ঐ স্থানেই বাস করিতে লাগিলেন। বন্ধুপ্রাণ সুখলাল উহাতে বিশেষ আনন্দিত হইলেন এবং ধর্মপরায়ণ ক্ষুদিরামের সংসারযাত্রানির্বাহের জন্য এক বিঘা দশ ছটাক ধান্যজমি তাঁহাকে চিরকালের জন্য প্রদান করিলেন।

সুখলাল গোস্বামীর আমন্ত্রণে ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে আগমন ও বাস

ঈশানকোণে অবস্থিত পুষ্করিণীর পার হইতে ৺খদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের কামারপুকুরের কুঠির

তৃতীয় অধ্যায়

কামারপুকুরে ধর্মের সংসার

প্রায় দশ বৎসরের পুত্র রামকুমার ও চারি বৎসরের কন্যা কাত্যায়নীকে সঙ্গে লইয়া সস্ত্রীক ক্ষুদিরাম যেদিন কামারপুকুরে আসিয়া পর্ণকুটিরে বাস করিলেন, তাঁহাদিগের সেদিনকার মনোভাব বলিবার নহে। ঈর্ষাদ্বেষপূর্ণ সংসার সেদিন তাঁহাদিগের নিকট অন্ধতমসাবৃত বিকট শ্মশানতুল্য; স্নেহ, ভালবাসা, দয়া, ন্যায়-পরতা প্রভৃতি সদ্‌গুণনিচয় তথায় মধ্যে মধ্যে ক্ষীণালোক বিস্তার করিয়া হৃদয়ে সুখাশার উদয় করিলেও, পরক্ষণেই উহা কোথায় বিলীন হয় এবং যে অন্ধকার সেই অন্ধকারই সেখানে বিরাজ করিতে থাকে। পূর্বাবস্থার সহিত বর্তমান অবস্থার তুলনা করিয়া ঐরূপ নানাকথা যে তাঁহাদের মনে উদিত হইয়াছিল, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। কারণ দুঃখ-দুর্দিনে পড়িয়াই মানব সংসারের অসারতা ও অনিত্যতা সম্যক্ উপলব্ধি করে। অতএব শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের প্রাণে এখন যে বৈরাগ্যের উদয় হইবে, ইহাতে বিচিত্র কিছুই নাই। আবার, পূর্বোক্ত অযাচিত ও অপ্রত্যাশিতভাবে আশ্রয়লাভের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার ধর্মপ্রাণ অন্তর যে এখন ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও নির্ভরতায় পূর্ণ হইয়াছিল, একথা বলিতে হইবে না। সুতরাং,

কামারপুকুরে আসিয়া ক্ষুদিরামের বানপ্রস্থের ন্যায় জীবনযাপন করিবার কারণ

৺রঘুবীরের হস্তে পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণপূর্বক পুনরায় সংসারের উন্নতিসাধনে উদাসীন হইয়া তিনি যে এখন শ্রীভগবানের সেবা-পূজাতে দিন কাটাইতে থাকিবেন, ইহাতে আশ্চর্যের কি আছে? বাস্তবিক সংসারে থাকিলেও তিনি এখন হইতে অসংসারী হইয়া প্রাচীন কালের বানপ্রস্থসকলের ন্যায় দিনযাপন করিতে লাগিলেন।

অদ্ভুত উপায়ে ক্ষুদিরামের ৺রঘুবীর-শিলা লাভ

এই সময়ের একটি ঘটনায় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ধর্মবিশ্বাস অধিকতর গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল। কার্যবশতঃ একদিন তাঁহাকে গ্রামান্তরে যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে ফিরিবার কালে তিনি শ্রান্ত হইয়া পথিমধ্যে বৃক্ষতলে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। জনশূন্য বিস্তীর্ণ প্রান্তর তাঁহার চিন্তাভারাক্রান্ত মনে শান্তি প্রদান করিল এবং নির্মল বায়ু ধীরে প্রবাহিত হইয়া তাঁহার শরীর স্নিগ্ধ করিতে লাগিল। তাঁহার শয়নেচ্ছা বলবতী হইল এবং শয়ন করিতে না-করিতে তিনি নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি স্বপ্নাবেশে দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার অভীষ্টদেব নবদূর্বাদল-শ্যাম-তনু ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যেন দিব্য বালকবেশে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন এবং স্থান বিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিতেছেন, "আমি এখানে অনেকদিন অযত্নে অনাহারে আছি, আমাকে তোমার বাটীতে লইয়া চল, তোমার সেবাগ্রহণ করিতে আমার একান্ত অভিলাষ হইয়াছে।" ঐ কথা শুনিয়া ক্ষুদিরাম একেবারে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহাকে বারংবার প্রণাম-পূর্বক বলিতে লাগিলেন, "প্রভু, আমি ভক্তিহীন ও নিতান্ত

দরিদ্র, আমার গৃহে আপনার যোগ্য সেবা কখনই সম্ভবে না, অধিকন্তু সেবাপরাধী হইয়া আমাকে নিরয়গামী হইতে হইবে, অতএব ঐরূপ অন্যায় অনুরোধ কেন করিতেছেন?' বালক-বেশী শ্রীরামচন্দ্র তাহাতে প্রসন্নমুখে তাঁহাকে অভয় প্রদানপূর্বক বলিলেন, "ভয় নাই, আমি তোমার ত্রুটি কখনও গ্রহণ করিব না, আমাকে লইয়া চল।" ক্ষুদিরাম শ্রীভগবানের ঐরূপ অযাচিত কৃপায় আর আত্মসংবরণ করিতে পারিলেন না, প্রাণের আবেগে ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

জাগরিত হইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভাবিতে লাগিলেন—এ কি অদ্ভুত স্বপ্ন! হায়, হায়, কখনও কি তাঁহার সত্য সত্য ঐরূপ সৌভাগ্যের উদয় হইবে? ঐরূপ ভাবিতে ভাবিতে সহসা তাঁহার দৃষ্টি নিকটবর্তী ধান্যক্ষেত্রে পতিত হইল এবং বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, ঐ স্থানটিই তিনি স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন। কৌতূহল-পরবশ হইয়া তিনি তখন গাত্রোত্থান করিলেন এবং ঐ স্থানে পৌঁছিবামাত্র দেখিতে পাইলেন, একটি সুন্দর শালগ্রামশিলার উপরে এক ভুজঙ্গ ফণা বিস্তার করিয়া রহিয়াছে! তখন শিলা হস্তগত করিতে তাঁহার মনে প্রবল বাসনা উপস্থিত হইল এবং তিনি দ্রুতপদে ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, ভুজঙ্গ অন্তর্হিত হইয়াছে এবং তাহার বিবরমুখে শালগ্রামটি পড়িয়া রহিয়াছে। স্বপ্ন অলীক নহে ভাবিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের হৃদয় তখন বিষম উৎসাহে পূর্ণ হইল এবং আপনাকে দেবাদিষ্টজ্ঞানে তিনি ভুজঙ্গদংশনের ভয় না রাখিয়া 'জয় রঘুবীর' বলিয়া চীৎকারপূর্বক শিলা গ্রহণ করিলেন। অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম শিলার লক্ষণসকল নিরীক্ষণ করিয়া বুঝিলেন,

বাস্তবিকই উহা 'রঘুবীর' নামক শিলা। তখন আনন্দে ও বিস্ময়ে অধীর হইয়া তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং যথাশাস্ত্র সংস্কার-কার্য সম্পন্ন করিয়া উহাকে নিজ গৃহদেবতারূপে প্রতিষ্ঠাপূর্বক নিত্য পূজা করিতে লাগিলেন। ৺রঘুবীরকে ঐরূপ অদ্ভুত উপায়ে পাইবার পূর্বে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নিজ অভীষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের পূজা ভিন্ন, ঘট প্রতিষ্ঠাপূর্বক ৺শীতলাদেবীকে নিত্য পূজা করিতেছিলেন।

সাংসারিক কষ্টের মধ্যে ক্ষুদিরামের অবিচলতা ও ঈশ্বরনির্ভরতা

একের পর এক করিয়া দুর্দিন চলিয়া যাইতে লাগিল, ক্ষুদিরামও সর্বপ্রকার দুঃখকষ্টে উদাসীন থাকিয়া একমাত্র ধর্মকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয়পূর্বক হৃষ্টচিত্তে কাল কাটাইতে লাগিলেন। সংসারে কোন কোনদিন এককালে অন্নাভাব হইয়াছে, পতিপ্রাণা চন্দ্রাদেবী ব্যাকুলহৃদয়ে ঐ কথা স্বামীকে নিবেদন করিয়াছেন; শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিয়াছেন, "ভয় কি, যদি ৺রঘুবীর উপবাসী থাকেন, তাহা হইলে আমরাও তাঁহার সহিত উপবাসী থাকিব।" সরল-প্রাণা চন্দ্রাদেবী তাহাতে স্বামীর ন্যায় ৺রঘুবীরের উপর একান্ত নির্ভর করিয়া গৃহকর্মে নিরতা হইয়াছেন—আহার্যের সংস্থানও সেদিন কোনরূপে হইয়া গিয়াছে।

লক্ষ্মীজলায় ধান্যক্ষেত্রে

ঐরূপ একান্ত অন্নাভাব কিন্তু শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার বন্ধু শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামী তাঁহাকে লক্ষ্মীজলা নামক স্থানে যে এক বিঘা দশ ছটাক ধান্য-জমি প্রদান করিয়াছিলেন,

৺রঘুবীরের প্রসাদে তাহাতে এখন হইতে এত ধান্য হইতে লাগিল যে, উহাতে তাঁহার ক্ষুদ্র সংসারের অভাব সংবৎসরের জন্য নিবারিত হওয়া ভিন্ন কিছু কিছু উদ্বৃত্ত হইয়া অতিথি-অভ্যাগতের সেবাও চলিয়া যাইতে লাগিল। কৃষাণদিগকে পারিশ্রমিক দিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম উক্ত জমিতে চাষ করাইতেন এবং ক্ষেত্র কর্ষিত হইয়া বপনকাল উপস্থিত হইলে ৺রঘুবীরের নাম গ্রহণপূর্বক স্বয়ং কয়েক গুচ্ছ ধান উহাতে প্রথমে রোপণ করিতেন, পরে কৃষকদিগকে ঐ কার্য নিষ্পন্ন করিতে বলিতেন।

ক্ষুদিরামের ঈশ্বরভক্তির বৃদ্ধি ও দিব্য দর্শনলাভ। প্রতিবেশিগণের তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা

দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে দুই-তিন বৎসর কাটিয়া গেল এবং ৺রঘুবীরের মুখ চাহিয়া প্রায় আকাশবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকিলেও শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সংসারে মোটা অন্নবস্ত্রের অভাব হইল না। কিন্তু ঐ দুই-তিন বৎসরের কঠোর শিক্ষাপ্রভাবে তাঁহার হৃদয়ে এখন যে শান্তি, সন্তোষ ও ঈশ্বর-নির্ভরতা নিরন্তর প্রবাহিত থাকিল, তাহা স্বল্প লোকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে। অন্তর্মুখ অবস্থায় থাকা তাঁহার মনের স্বভাব হইয়া উঠিল এবং উহার প্রভাবে তাঁহার জীবনে নানা দিব্যদর্শন সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। প্রতিদিন প্রাতে ও সায়ংকালে সন্ধ্যা করিতে বসিয়া যখন তিনি ৺গায়ত্রীদেবীর ধ্যানাবৃত্তিপূর্বক তচ্চিন্তায় মগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার বক্ষঃস্থল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিত এবং মুদ্রিত নয়ন অবিরল প্রেমাশ্রুবর্ষণ করিত। প্রত্যূষে যখন তিনি

সাজিহস্তে ফুল তুলিতে যাইতেন, তখন দেখিতেন তাঁহার আরাধ্যা ৺শীতলাদেবী যেন অষ্টমবর্ষীয়া কন্যারূপিণী হইয়া রক্তবস্ত্র ও নানা অলঙ্কার ধারণপূর্বক হাসিতে হাসিতে তাঁহার সঙ্গে যাইতেছেন এবং পুষ্পিত বৃক্ষের শাখাসকল নত করিয়া ধরিয়া তাঁহাকে ফুল তুলিতে সহায়তা করিতেছেন! ঐ সকল দিব্যদর্শনে তাঁহার অন্তর এখন সর্বদা উল্লাসে পূর্ণ হইয়া থাকিত এবং তাঁহার অন্তরের দৃঢ় বিশ্বাস ও ভক্তি বদনে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে এক অপূর্ব দিব্যাবেশে নিরন্তর পরিবৃত করিয়া রাখিত। তাঁহার সৌম্য শান্ত মুখদর্শনে গ্রামবাসীরা উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া তাঁহাকে ক্রমে ঋষির ন্যায় ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে লাগিল। তাঁহাকে আগমন করিতে দেখিলে তাহারা বৃথালাপ পরিত্যাগপূর্বক সসম্ভ্রমে উত্থান ও সম্ভাষণ করিত; তাঁহার স্নানকালে সেই পুষ্করিণীতে অবগাহন করিতে তাহারা সঙ্কোচ বোধ করিয়া সসম্ভ্রমে অপেক্ষা করিত; তাঁহার আশীর্বাণী নিশ্চিত ফলদান করিবে ভাবিয়া তাহারা বিপদে সম্পদে উহার প্রত্যাশী হইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইত।

শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীকে প্রতিবেশিগণ যে চক্ষে দেখিত

স্নেহ ও সরলতার মূর্তি শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীও নিজ দয়া ও ভালবাসায় তাহাদিগকে মুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের মাতৃভক্তির যথার্থই অধিকারিণী হইলেন। কারণ সম্পদ বা আপৎকালে তাঁহার ন্যায় হৃদয়ের সহানুভূতি তাহারা আর কোথাও পাইত না। দরিদ্রেরা জানিত, শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর নিকট

তাহারা যখনই উপস্থিত হইবে, তখন শুষ্ক যে এক মুঠা খাইতে পাইবে, তাহা নহে ; কিন্তু উহার সহিত এত অকৃত্রিম যত্ন ও ভালবাসা পাইবে যে, তাহাদিগের অন্তর পরম পরিতৃপ্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিবে। ভিক্ষুক সাধুরা জানিত, এ বাটীর দ্বার তাহাদিগের নিমিত্ত সর্বদা উন্মুক্ত আছে। প্রতিবেশী বালক-বালিকারা জানিত, চন্দ্রাদেবীর নিকটে তাহারা যে-বিষয়ের জন্যই আবদার করুক না কেন, তাহা কোন না কোন উপায়ে পূর্ণ হইবেই হইবে। ঐরূপে প্রতিবেশীদিগের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের পর্ণকুটিরে যখন-তখন আসিয়া উপস্থিত হইত এবং দুঃখদারিদ্র্য বিদ্যমান থাকিলেও উহা এক অপূর্ব শান্তির আলোকে নিরন্তর উদ্ভাসিত হইয়া থাকিত।

ক্ষুদিরামের ভগিনী শ্রীমতী রামশীলার কথা

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের রামশীলা নাম্নী এক ভগিনী এবং নিধিরাম ও কানাইরাম বা রামকানাই নামক দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। দেরেপুরের জমিদারের সহিত বিবাদ উপস্থিত হইয়া যখন তিনি সর্বস্বান্ত হইলেন তখন তাঁহার উক্ত ভগিনীর বয়স আন্দাজ পঁয়ত্রিশ বৎসর এবং ভ্রাতৃদ্বয়ের ত্রিশ ও পঁচিশ বৎসর হইবে। তাঁহারা সকলেই তখন বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিয়াছেন। কামারপুকুরের প্রায় ছয় ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত ছিলিমপুরে ৺ভাগবত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত শ্রীমতী রামশীলার বিবাহ হইয়াছিল এবং রামচাঁদ নামক এক পুত্র ও হেমাঙ্গিনী নাম্নী এক

কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। উক্ত বিপদের সময় রামচাঁদের বয়স আন্দাজ একুশ বৎসর এবং হেমাঙ্গিনীর ষোল বৎসর ছিল। শ্রীযুক্ত রামচাঁদ তখন মেদিনীপুরে মোক্তারি করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনীর দেরেপুরে মাতুলালয়েই জন্ম হইয়াছিল এবং ভ্রাতা অপেক্ষাও তিনি মাতুলদিগের অধিকতর স্নেহলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ইঁহাকে কন্যানির্বিশেষে পালন করিয়া বিবাহকাল উপস্থিত হইলে কামারপুকুরের প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত শিহড় গ্রামের শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে স্বয়ং সম্প্রদান করিয়াছিলেন। যৌবনে পদার্পণ করিয়া তিনি ক্রমে রাঘব, রামরতন, হৃদয়রাম ও রাজারাম নামে চারি পুত্রের জননী হইয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের ভ্রাতৃদ্বয়ের কথা

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের নিধিরাম নামক ভ্রাতার কোন সন্তান হইয়াছিল কি না, তাহা আমরা জানিতে পারি নাই; কিন্তু সর্বকনিষ্ঠ কানাইরামের রামতারক ওরফে হলধারী এবং কালিদাস নামে দুই পুত্র হইয়াছিল। কানাইরাম ভক্তিমান ও ভাবুক ছিলেন। এক সময়ে কোন স্থানে ইনি যাত্রা শুনিতে গিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের বনগমনের অভিনয় হইতেছিল। উহা শুনিতে শুনিতে তিনি এমন তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, কৈকেয়ীর শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার মন্ত্রণাচেষ্টাদিকে সত্য জ্ঞান করিয়া ঐ ভূমিকার অভিনেতাকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, পৈতৃক সম্পত্তি হারাইবার পরে নিধিরাম ও কানাইরাম দেরেপুর পরিত্যাগ করিয়া সম্ভবতঃ যে

যে গ্রামে তাঁহাদিগের শ্বশুরালয় ছিল, সেই সেই গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের ভাগিনেয় রামচাঁদ

শ্রীমতী রামশীলার পুত্র শ্রীযুক্ত রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেদিনীপুরে মোক্তারি করিবার কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ব্যবসায়সূত্রে ইনি ক্রমে মেদিনীপুরে বাস করিয়া বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতে লাগিলেন। তখন মাতুলদিগের দুরবস্থার কথা স্মরণ করিয়া ইনি শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে মাসিক পনর টাকা এবং নিধিরাম ও কানাইরামের প্রত্যেককে মাসিক দশ টাকা করিয়া সাহায্য করিতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভাগিনেয়ের কিছুকাল সংবাদ না পাইলেই চিন্তিত হইয়া মেদিনীপুরে উপস্থিত হইতেন এবং দুই-চারিদিন তাঁহার আলয়ে কাটাইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাবর্তন করিতেন। একবার ঐরূপে মেদিনীপুর আগমনকালে তাঁহার সম্বন্ধে একটি বিশেষ ঘটনা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। ঘটনাটি শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের আন্তরিক দেবভক্তির পরিচায়ক বলিয়া আমরা উহার এখানে উল্লেখ করিলাম।

ক্ষুদিরামের দেবভক্তির পরিচায়ক ঘটনা

কামারপুকুরের প্রায় চল্লিশ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে মেদিনীপুর অবস্থিত। রামচাঁদ ও তাঁহার পরিবারবর্গের কুশল-সংবাদ অনেক দিন না পাওয়ায় চিন্তিত হইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম একদিন ঐ স্থানে যাইবার জন্য বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তখন মাঘ বা ফাল্গুন মাস হইবে। বিল্ববৃক্ষের পত্রসকল এই সময়

ঝরিয়া পড়ে এবং যতদিন না নবপত্রোদ্গম হয়, ততদিন লোকের ৺শিবপূজা করিবার বিশেষ কষ্ট হয়। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ঐ কষ্ট কিছুদিন পূর্ব হইতে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছিলেন।

অতি প্রত্যূষে বহির্গত হইয়া তিনি প্রায় দশ ঘটিকা পর্যন্ত অবিশ্রান্ত পথ চলিয়া একটি গ্রামে পৌঁছিলেন এবং তথাকার বিল্ববৃক্ষসকল নবীন পত্রাভরণে ভূষিত দেখিয়া তাঁহার প্রাণ উল্লসিত হইয়া উঠিল। তখন মেদিনীপুর যাইবার কথা এককালে বিস্মৃত হইয়া তিনি গ্রাম হইতে একটি নূতন ঝুড়ি ও একখানি গামছা ক্রয় করিয়া নিকটস্থ পুষ্করিণীর জলে বেশ করিয়া ধৌত করিলেন। পরে নবীন বিল্বপত্রে ঝুড়িটি পূর্ণ করিয়া ভিজা গামছাখানি উহার উপর চাপা দিয়া অপরাহ্ণ প্রায় তিন ঘটিকার সময় কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। বাটী পৌঁছিয়াই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম স্নানসমাপনপূর্বক ঐ পত্রসকল লইয়া মহানন্দে ৺মহাদেব ও ৺শীতলামাতার বহুক্ষণ পর্যন্ত পূজা করিলেন; পরে স্বয়ং আহারে বসিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তখন অবসর লাভ করিয়া তাঁহাকে মেদিনীপুর না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন এবং আদ্যোপান্ত সকল কথা শ্রবণ করিয়া বিল্বপত্রে দেবার্চনা করিবার লোভে এতটা পথ অতিবাহন করিয়াছেন জানিয়া যারপরনাই বিস্মিতা হইলেন। পরদিন প্রত্যূষে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম পুনরায় মেদিনীপুর যাত্রা করিলেন।

এক, দুই করিয়া ক্রমে কামারপুকুরে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ছয় বৎসর অতিবাহিত হইল। তাঁহার পুত্র রামকুমার এখন ষোড়শ বর্ষে এবং কন্যা কাত্যায়নী একাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে দেখিয়া তিনি এখন পাত্রের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন এবং কামারপুকুরের উত্তরে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত আনুড় গ্রামের শ্রীযুক্ত কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়কে কন্যা সম্প্রদানপূর্বক কেনারামের ভগিনীর সহিত নিজ পুত্র রামকুমারের উদ্বাহকার্য সম্পন্ন করিলেন। রামকুমার নিকটস্থ গ্রামের চতুষ্পাঠীতে ইতিপূর্বে ব্যাকরণ ও সাহিত্যপাঠ সমাপ্ত করিয়া এখন স্মৃতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিতেছিলেন।

রামকুমার ও কাত্যায়নীর বিবাহ

ক্রমে আরও তিন-চারি বৎসর অতিক্রান্ত হইল। ৺রঘুবীরের প্রসাদে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সংসারে এখন পূর্বাপেক্ষা অনেক সুবন্দোবস্ত হইয়াছে এবং তিনিও নিশ্চিন্তমনে শ্রীভগবানের আরাধনায় নিযুক্ত আছেন। ঘটনার মধ্যে ঐ চারি বৎসরে শ্রীযুক্ত রামকুমার স্মৃতি-অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া সংসারের আর্থিক উন্নতিকল্পে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের পরম বন্ধু সুখলাল গোস্বামী উহার কোন সময়ে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন। হিতৈষী বন্ধু শ্রীযুক্ত সুখলালের মৃত্যুতে যে তিনি বিশেষ ব্যথিত হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য।

সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যু ইত্যাদি

রামকুমার মানুষ হইয়া সংসারের ভার গ্রহণ করিয়াছেন দেখিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নিশ্চিন্ত হইয়া এখন অন্য বিষয়ে

মন দিবার অবসর লাভ করিলেন। তীর্থ-দর্শনের জন্য তাঁহার অন্তর এখন ব্যাকুল হইয়া উঠিল। অনন্তর সম্ভবতঃ সন ১২৩০ সালে তিনি পদব্রজে ৺সেতুবন্ধ-রামেশ্বরদর্শনে গমন করিলেন এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশের তীর্থসকল পর্যটন করিয়া প্রায় এক বৎসর পরে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলেন। ৺সেতুবন্ধ হইতে এই সময়ে তিনি একটি বাণলিঙ্গ কামারপুকুরে আনয়নপূর্বক নিত্য পূজা করিতে থাকেন। ৺রামেশ্বর নামক ঐ বাণলিঙ্গটিকে এখনও কামারপুকুরে ৺রঘুবীর-শিলার ও ৺শীতলাদেবীর ঘটের পার্শ্বে দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী বহুকাল পরে পুনরায় এই সময়ে গর্ভধারণ করিয়া সন ১২৩২ সালে এক পুত্র প্রসব করিয়াছিলেন। ৺রামেশ্বর তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া এই পুত্র লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ইহার নাম রামেশ্বর রাখিয়াছিলেন।

ক্ষুদিরামের ৺সেতুবন্ধতীর্থ-দর্শন ও রামেশ্বর-নামক পুত্রের জন্ম

এই ঘটনার পরে প্রায় আট বৎসর কাল পর্যন্ত কামারপুকুরের এই দরিদ্র সংসারে জীবন-প্রবাহ প্রায় সমভাবেই বহিয়াছিল। শ্রীযুক্ত রামকুমার স্মৃতির বিধান দিয়া এবং শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্ম করিয়া এখন উপার্জন করিতেছিলেন; সুতরাং সংসারে এখন আর পূর্বের ন্যায় কষ্ট ছিল না। শান্তি-স্বস্ত্যয়নাদি কর্মে রামকুমার বিশেষ পটু হইয়াছিলেন। শুনা যায়, তিনি ঐ বিষয়ে দৈবী শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। শাস্ত্র-

রামকুমারের দৈবী শক্তি

অধ্যয়নের ফলে তিনি ইতিপূর্বে আদ্যাশক্তির উপাসনায় বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়াছিলেন এবং উপযুক্ত গুরুর নিকট ৺দেবীমন্ত্রও গ্রহণ করিয়াছিলেন। অভীষ্টদেবীকে নিত্য পূজা করিবার কালে একদিন তাঁহার অপূর্ব দর্শনলাভ হয় এবং তিনি অনুভব করিতে থাকেন যেন ৺দেবী নিজ অঙ্গুলি দ্বারা তাঁহার জিহ্বাগ্রে জ্যোতিষশাস্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য কোন মন্ত্রবর্ণ লিখিয়া দিতেছেন। তদবধি রোগী ব্যক্তিকে দেখিলেই তিনি বুঝিতে পারিতেন, সে আরোগ্যলাভ করিবে কি-না এবং ঐ ক্ষমতাপ্রভাবে তিনি এখন যে রোগীর সম্বন্ধে যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহাই ফলিয়া যাইতে লাগিল। ঐরূপে ভবিষ্যদ্বক্তা বলিয়া তাঁহার এইকালে এতদঞ্চলে সামান্য প্রসিদ্ধিলাভ হইয়াছিল। শুনা যায়, তিনি এই সময়ে কঠিন পীড়াগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া তাহার নিমিত্ত স্বস্ত্যয়নে নিযুক্ত হইতেন এবং জোর করিয়া বলিতেন, এই স্বস্ত্যয়ন-বেদীতে যে শস্য ছড়াইতেছি, তাহাতে কলার উদ্গম হইলেই এই ব্যক্তি আরোগ্যলাভ করিবে। ফলেও বাস্তবিক তাহাই হইত। তাঁহার পূর্বোক্ত ক্ষমতার উদাহরণস্বরূপে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত শিবরাম চট্টোপাধ্যায় আমাদিগের নিকটে নিম্নলিখিত ঘটনাটি উল্লেখ করিয়াছিলেন—

কার্যোপলক্ষে রামকুমার কলিকাতায় আগমন করিয়া একদিন গঙ্গায় স্নান করিতেছিলেন। কোন ধনী ব্যক্তি ঐ সময়ে সপরিবারে তথায় স্নান করিতে আসিলেন এবং উক্ত ব্যক্তির স্ত্রীর স্নানের জন্য শিবিকা গঙ্গাগর্ভে লইয়া যাওয়া

হইলে, উহার মধ্যে বসিয়াই ঐ যুবতী স্নানসমাপন করিতে থাকিলেন। পল্লীগ্রামবাসী রামকুমার স্নানকালে স্ত্রীলোকদিগের ঐরূপে আবরুরক্ষা কখন নয়নগোচর করেন নাই। সুতরাং বিস্মিত হইয়া উহা দেখিতে দেখিতে শিবিকামধ্যে অবস্থিত যুবতীর মুখকমল ক্ষণেকের নিমিত্ত দেখিতে পাইলেন এবং পূর্বোল্লিখিত দৈবীশক্তিপ্রভাবে তাঁহার মৃত্যুর কথা জানিতে পারিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিয়া ফেলিলেন—"আহা! আজ যাহাকে এত আদবকায়দায় স্নান করাইতেছে, কাল তাহাকে সর্বজনসমক্ষে গঙ্গায় বিসর্জন দিবে!" ধনী ব্যক্তি ঐ কথা শুনিতে পাইয়া ঐ বাক্য পরীক্ষা করিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমারকে নিজালয়ে সাগ্রহে আহ্বান করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার মনোগত অভিপ্রায় ছিল, ঘটনা সত্য না হইলে রামকুমারকে বিশেষরূপে অপমানিত করিবেন। যুবতী সম্পূর্ণ সুস্থ থাকায় ঐরূপ ঘটনা হইবার কোন লক্ষণও বাস্তবিক তখন দেখা যায় নাই; কিন্তু ফলে শ্রীযুক্ত রামকুমার যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছিল এবং ঐ ব্যক্তিও তাঁহাকে মান্যের সহিত বিদায়দান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

ঐ শক্তির পরিচায়ক ঘটনাবিশেষ

নিজ স্ত্রী-ভাগ্য দর্শন করিয়াও শ্রীযুক্ত রামকুমার এক সময়ে বিষম ফল নির্ণয় করিয়াছিলেন এবং ঘটনাও কিছুকাল পরে ঐরূপ হইয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার স্ত্রী বিশেষ সুলক্ষণসম্পন্না ছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২২৬ সালে শ্রীযুক্ত রামকুমার পাণিগ্রহণ করিয়া যেদিন তাঁহার সপ্তমবর্ষীয়া পত্নীকে

কামারপুকুরে আনয়ন করিয়াছিলেন, সেইদিন হইতে তাঁহার ভাগ্যচক্র উন্নতির পথে আরোহণ করিয়াছিল। তাঁহার পিতার দরিদ্র সংসারেও সেইদিন হইতে ঐরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের মেদিনীপুরনিবাসী ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মাসিক সাহায্য ঐ সময় হইতে আসিতে আরম্ভ হয়। স্ত্রী বা পুরুষ কোন ব্যক্তির সংসারে প্রথম প্রবেশকালে ঐরূপ শুভফল উপস্থিত হইলে হিন্দুপরিবারে সকলে তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও ভালবাসার চক্ষে দেখিয়া থাকে, একথা বলিতে হইবে না। বিশেষতঃ, রামকুমারের বালিকা পত্নী তখন আবার এই দরিদ্র সংসারে একমাত্র পুত্রবধূ। সুতরাং বালিকা যে সকলের বিশেষ আদরের পাত্রী হইবে, ইহাতে আশ্চর্যের কিছুই নাই। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপ অতিমাত্রায় আদরযত্ন পাইয়া তাহার নানা সদ্গুণের সহিত অভিমান ও অনাশ্রবতারূপ দোষদ্বয় প্রশ্রয় পাইয়াছিল। ঐ দোষ সকলের চক্ষে পড়িলেও কেহ কিছু বলিতে বা সংশোধনের চেষ্টা করিতে সাহসী হইত না। কারণ, সকলে ভাবিত সামান্য দোষ থাকিলেও তাহার আগমনকাল হইতেই কি সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই? সে যাহা হউক, কিছুকাল পরে শ্রীযুক্ত রামকুমার তাঁহার প্রাপ্তযৌবনা স্ত্রীকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "সুলক্ষণা হইলেও গর্ভধারণ করিলেই ইহার মৃত্যু হইবে!" পরে বহুকাল গত হইলেও যখন পত্নীর গর্ভ হইল না, তখন তিনি তাহাকে বন্ধ্যা ভাবিয়া

ঐ শক্তিব পরিচাযক বামকুমাবেব স্ত্রী সম্বন্ধীয ঘটনা।

নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু পঞ্চত্রিশ বৎসর বয়সকালে তাঁহার পত্নী প্রথম ও শেষবার গর্ভবতী হইয়া সন ১২৫৫ সালে ছত্রিশ বৎসরে এক পরম রূপবান পুত্র-প্রসবান্তে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন। এই পুত্রের নাম অক্ষয় রাখা হইয়াছিল। উহা অনেক পরের ঘটনা হইলেও সুবিধার জন্য পাঠককে এখানেই বলিয়া রাখিলাম।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ধর্মের সংসারে স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই একটা বিশেষত্ব ছিল। অনুধাবন করিলে স্পষ্ট বুঝা যায়, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের অন্তর্গত ঐ বিশেষত্ব আধ্যাত্মিক রাজ্যের সূক্ষ্ম শক্তিসকলের অধিকার হইতে সর্বথা সমুদ্ভূত হইত। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পত্নীর ভিতর ঐরূপ বিশেষত্ব অসাধারণভাবে প্রকাশিত ছিল বলিয়াই বোধ হয় উহা তাঁহাদিগের সন্তানসন্ততিসকলে অনুগত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে উক্ত-বিষয়ক অনেক কথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। শ্রীমতী চন্দ্রমণি সম্বন্ধে এখন ঐরূপ একটি বিষয়ের উল্লেখ অযোগ্য হইবে না। ঘটনাটিতে স্পষ্ট বুঝা যাইবে, স্বামীর ন্যায় শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীতেও দিব্যদর্শনশক্তি সময়ে সময়ে প্রকাশিত থাকিত। ঘটনাটি রামকুমারের বিবাহের কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল। পঞ্চদশবর্ষীয় রামকুমার তখন চতুষ্পাঠীতে অধ্যয়ন ভিন্ন যজমানবাটীসকলে পূজা করিয়া সংসারে যথাসাধ্য সাহায্য করিত।

ক্ষুদিরামের পরিবারস্থ সকলের বিশেষত্ব

আশ্বিন মাসে কোজাগরী লক্ষ্মীপূজার দিনে রামকুমার

ভূরস্থবো নামক গ্রামে যজমানগৃহে উক্ত পূজা করিতে গিয়াছিল। অর্ধরাত্রি অতীত হইলেও পুত্র গৃহে ফিরিতেছে না দেখিয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী বিশেষ উৎকণ্ঠিতা হইলেন এবং গৃহের বাহিরে আসিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ ঐরূপে কাটিবার পরে তিনি দেখিতে পাইলেন, প্রান্তরপথ অতিবাহিত করিয়া ভূরস্থবোর দিক হইতে কে একজন কামারপুকুরে আগমন করিতেছে। পুত্র আসিতেছে ভাবিয়া তিনি উৎসাহে কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। কিন্তু আগন্তুক ব্যক্তি নিকটবর্তী হইলে দেখিলেন সে রামকুমার নহে, এক পরমা সুন্দরী রমণী নানালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া একাকিনী চলিয়া আসিতেছেন। পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কায় শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তখন বিশেষ আকুলিতা, সুতরাং ভদ্রবংশীয়া যুবতী রমণীকে গভীর রজনীতে ঐরূপে পথ অতিবাহন করিতে দেখিয়াও বিস্মিতা হইলেন না। সরলভাবে তাঁহার নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?" রমণী উত্তর করিলেন, "ভূরস্থবো হইতে।" শ্রীমতী চন্দ্রা তখন ব্যস্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার পুত্র রামকুমারের সঙ্গে কি তোমার দেখা হইয়াছিল? সে কি ফিরিতেছে?" অপরিচিতা রমণী তাঁহার পুত্রকে চিনিবেন কিরূপে, একথা তাঁহার মনে একবারও উদিত হইল না। রমণী তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদানপূর্বক বলিলেন, "হাঁ, তোমার পুত্র যে-বাটীতে পূজা করিতে গিয়াছে, আমি সেই বাটী হইতেই এখন আসিতেছি। ভয়

চন্দ্রাদেবীর দিব্যদর্শন সম্বন্ধীয় ঘটনা

নাই, তোমার পুত্র এখনই ফিরিবে।” শ্রীমতী চন্দ্রা এতক্ষণে আশ্বস্তা হইয়া অন্য বিষয় ভাবিবার অবসর পাইলেন এবং রমণীর অসামান্য রূপ, বহুমূল্য পরিচ্ছদ ও নূতন ধরনের অলঙ্কার-সকল দেখিয়া এবং মধুর বচন শুনিয়া বলিলেন, “মা, তোমার বয়স অল্প; এত গহনা-গাঁটি পরিয়া এত রাত্রে কোথা যাইতেছ? তোমার কানে ও কি গহনা?” রমণী ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, “উহার নাম কুণ্ডল, আমাকে এখনও অনেক দূরে যাইতে হইবে।” শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তখন তাঁহাকে বিপন্না ভাবিয়া সস্নেহে বলিলেন, “চল না, আমাদের ঘরে আজ রাত্রের মত বিশ্রাম করিয়া কাল যেখানে যাইবার, যাইবে এখন।” রমণী বলিলেন, “না মা, আমাকে এখনি যাইতে হইবে, তোমাদের বাড়ীতে আমি অন্য সময়ে আসিব।” রমণী ঐরূপ বলিয়া তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর বাটীর পার্শ্বেই লাহাবাবুদের অনেকগুলি ধান্যের মরাই ছিল, তদভিমুখে চলিয়া যাইলেন। রাস্তা না ধরিয়া লাহাবাবুদের বাটীর দিকে তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া চন্দ্রাদেবী বিস্মিতা হইলেন এবং রমণী পথ ভুলিয়াছে ভাবিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া চারিদিকে তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়াও তাঁহাকে আর দেখিতে পাইলেন না। তখন রমণীর বাক্যসকল স্মরণ করিতে করিতে সহসা তাঁহার প্রাণে উদয় হইল স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিলাম নাকি? অনন্তর কম্পিতহৃদয়ে স্বামীর পার্শ্বে গমনপূর্বক তাঁহাকে আদ্যোপান্ত সমস্ত কথা খুলিয়া বলিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম সমস্ত শ্রবণ করিয়া ‘শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবীই তোমাকে কৃপা করিয়া দর্শন

দিয়াছেন' বলিয়া তাঁহাকে আশ্বস্তা করিলেন। রামকুমারও কিছুক্ষণ পরে বাটীতে ফিরিয়া জননীর নিকট ঐ কথা শুনিয়া যারপরনাই বিস্মিত হইলেন।

ক্রমে সন ১২৪১ সাল সমাগত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের জীবনে এই সময়ে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

ক্ষুদিরামের ৺গয়াতীর্থে গমন

তীর্থদর্শনে তাহার অভিলাষ পুনরায় প্রবল ভাব ধারণ করায়, পিতৃপুরুষদিগের উদ্ধারকল্পে তিনি এখন গয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন। ষাট-বৎসরে পদার্পণ করিলেও তিনি পদব্রজে ঐ ধামে গমন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইলেন না। তাঁহার ভাগিনেয়ী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় তাঁহার গয়াধাম যাওয়ার কারণ সম্বন্ধে একটি অদ্ভুত ঘটনা আমাদিগের নিকটে উল্লেখ করিয়াছিলেন।

নিজ দুহিতা শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীর বিশেষ পীড়ার সংবাদ পাইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এই সময়ে একদিন আনুর গ্রামে

ক্ষুদিরামের গয়া-গমন সম্বন্ধে হৃদয়রাম-কথিত ঘটনা

তাঁহাকে দেখিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। শ্রীমতী কাত্যায়নীর বয়স তখন আন্দাজ পঁচিশ বৎসর হইবে। পীড়িতা কন্যার হাবভাব ও কথাবার্তায় তাঁহার নিশ্চয় ধারণা হইল, তাঁহার শরীরে কোন ভূতযোনির আবেশ হইয়াছে। তখন সমাহিতচিত্তে শ্রীভগবানকে স্মরণ করিয়া তিনি কন্যা-শরীরে প্রবিষ্ট জীবের উদ্দেশে বলিলেন, "তুমি দেবতা বা উপদেবতা যাহাই হও, কেন আমার কন্যাকে এরূপ কষ্ট দিতেছ? অবিলম্বে ইহার শরীর ছাড়িয়া অন্যত্র

গমন কর।" তাঁহার ঐ কথা শ্রবণ করিয়া উক্ত জীব ভীত ও সঙ্কুচিত হইয়া শ্রীমতী কাত্যায়নীর শরীরাবলম্বনে উত্তর করিল, "গয়ায় পিণ্ডদানে প্রতিশ্রুত হইয়া যদি আপনি আমার বর্তমান কষ্টের অবসান করেন, তাহা হইলে আমি আপনার দুহিতার শরীর এখনি ছাড়িতে স্বীকৃত হইতেছি। আপনি যখনি ঐ উদ্দেশ্যে গৃহ হইতে বাহির হইবেন, তখন হইতে ইহার আর কোন অসুস্থতা থাকিবে না, একথা আমি আপনার নিকটে অঙ্গীকার করিতেছি।" অনন্তর শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ঐ জীবের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "আমি যত শীঘ্র পারি ৺গয়াধামে গমন-পূর্বক তোমার অভিলাষ সম্পাদন করিব এবং পিণ্ডদানের পরে তুমি যে নিশ্চয় উদ্ধার হইলে, ঐ সম্বন্ধে কোনরূপ নিদর্শন পাইলে বিশেষ সুখী হইব।" তখন প্রেত বলিল, "ঐ বিষয়ের নিশ্চিত প্রমাণস্বরূপে সম্মুখস্থ নিম্ব-বৃক্ষের বৃহত্তম ডালটি আমি ভাঙ্গিয়া যাইব, জানিবেন।" হৃদয়রাম বলিতেন, উক্ত ঘটনাই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে ৺গয়াধামে যাত্রা করিতে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল এবং উহার কিছুকাল পরে উক্ত বৃক্ষের ডালটি সহসা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায়, সকলে ঐ প্রেতের উদ্ধার হইবার কথা নিঃসংশয়ে জানিতে পারিয়াছিল। শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবীও তদবধি সম্পূর্ণরূপে নীরোগ হইয়াছিলেন। হৃদয়রাম-কথিত পূর্বোক্ত ঘটনাটি কতদূর সত্য বলিতে পারি না, কিন্তু শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম যে এই সময়ে ৺গয়াদর্শনে গমন করিয়াছিলেন, একথায় কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সন ১২৪১ সালের শীতের কোন সময়ে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম

বারাণসী* ও ৺গয়াধামদর্শন করিতে গমন করিয়াছিলেন। প্রথমোক্ত স্থানে ৺বিশ্বনাথকে দর্শন করিয়া যখন তিনি গয়াক্ষেত্রে পৌঁছিলেন, তখন চৈত্রমাস পড়িয়াছে। মধুমাসে ঐ ক্ষেত্রে পিণ্ডপ্রদানে পিতৃপুরুষসকলের অক্ষয় পরিতৃপ্তি হয় জানিয়াই বোধ হয় তিনি ঐ মাসে গয়ায় আগমন করিয়াছিলেন। প্রায় এক মাসকাল তথায় অবস্থানপূর্বক তিনি যথাবিহিত ক্ষেত্রকার্য সকলের অনুষ্ঠান করিয়া পরিশেষে ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মে পিণ্ড প্রদান করিলেন। ঐরূপে যথাশাস্ত্র পিতৃকার্য সম্পন্ন করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের বিশ্বাসী হৃদয়ে ঐ দিন যে কতদূর তৃপ্তি ও শান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। পিতৃঋণ যথাসাধ্য পরিশোধ করিয়া তিনি যেন আজ নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন এবং শ্রীভগবান তাঁহার ন্যায় অযোগ্য ব্যক্তিকে ঐ কার্য সমাধা করিতে শক্তি প্রদান করিয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞ অন্তর অভূতপূর্ব দীনতা ও প্রেমে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। দিবাভাগে তো কথাই নাই, রাত্রিকালে নিদ্রার সময়েও ঐ শান্তি ও উল্লাস তাঁহাকে ত্যাগ করে নাই। কিছুক্ষণ নিদ্রা যাইতে না যাইতে তিনি স্বপ্নে দেখিতে

৺গয়াধামে ক্ষুদিরামের দেবস্বপ্ন

* কেহ কেহ বলেন, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বহুপূর্বে এক সময়ে দেরেপুর হইতে তীর্থগমনপূর্বক শ্রীবৃন্দাবন, ৺অযোধ্যা, ও ৺বারাণসী দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন এবং উহার কিছুকাল পরে তাঁহার পুত্র ও কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে তিনি ঐ তীর্থযাত্রার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদিগের রামকুমার ও কাত্যায়নী নামকরণ করিয়াছিলেন। শেষবারে তিনি কেবলমাত্র ৺গয়াধামদর্শন করিয়াই বাটী ফিরিয়াছিলেন।

লাগিলেন, তিনি যেন শ্রীমন্দিরে ৺গদাধরের শ্রীপাদপদ্মসম্মুখে পুনরায় পিতৃপুরুষসকলের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করিতেছেন এবং তাঁহারা যেন দিব্য জ্যোতির্ময় শরীরে উহা সানন্দে গ্রহণপূর্বক তাঁহাকে আশীর্বাদ করিতেছেন! বহুকাল পরে তাঁহাদিগের দর্শনলাভ করিয়া তিনি যেন আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছেন না; ভক্তিগদ্গদচিত্তে রোদন করিতে করিতে তাঁহাদিগের পাদস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিতেছেন। পরক্ষণেই আবার দেখিতে লাগিলেন, যেন অদৃষ্টপূর্ব দিব্য জ্যোতিতে মন্দির পূর্ণ হইয়াছে এবং পিতৃপুরুষগণ সসম্ভ্রমে, সংযতভাবে দুই পার্শ্বে করজোড়ে দণ্ডায়মান থাকিয়া মন্দিরমধ্যে বিচিত্র সিংহাসনে সুখাসীন এক অদ্ভুত পুরুষের উপাসনা করিতেছেন। দেখিলেন, নবদূর্বাদল-শ্যাম, জ্যোতির্মণ্ডিত-তনু ঐ পুরুষ স্নিগ্ধপ্রসন্নদৃষ্টিতে তাঁহার দিকে অবলোকনপূর্বক হাস্যমুখে তাঁহাকে নিকটে যাইবার জন্য ইঙ্গিত করিতেছেন! যন্ত্রের ন্যায় পরিচালিত হইয়া তিনি যেন তখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং ভক্তিবিহ্বলচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণামপূর্বক হৃদয়ের আবেগে কতপ্রকার স্তুতি ও বন্দনা করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ঐ দিব্য পুরুষ যেন তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া বীণানিস্যন্দি মধুর স্বরে তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, "ক্ষুদিরাম, তোমার ভক্তিতে পরম প্রসন্ন হইয়াছি, পুত্ররূপে তোমার গৃহে অবতীর্ণ হইয়া আমি তোমার সেবা গ্রহণ করিব!" স্বপ্নেরও অতীত ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার যেন আনন্দের অবধি রহিল না, কিন্তু পরক্ষণেই চিরদরিদ্র তিনি তাঁহাকে কি খাইতে দিবেন; কোথায় রাখিবেন ইত্যাদি ভাবিয়া গভীর বিষাদে পূর্ণ হইয়া রোদন করিতে করিতে তাঁহাকে বলিলেন,

"না, না প্রভু, আমার ঐরূপ সৌভাগ্যের প্রয়োজন নাই ; কৃপা করিয়া আপনি যে আমাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিলেন এবং ঐরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, ইহাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ; সত্য সত্য পুত্র হইলে দরিদ্র আমি আপনার কি সেবা করিতে পারিব !" এই অমানব পুরুষ যেন তখন তাঁহার ঐরূপ করুণ বচন শুনিয়া অধিকতর প্রসন্ন হইলেন এবং বলিলেন, "ভয় নাই, ক্ষুদিরাম, তুমি যাহা প্রদান করিবে তাহাই আমি তৃপ্তির সহিত গ্রহণ করিব ; আমার অভিলাষ পূরণ করিতে আপত্তি করিও না।" শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এই কথা শুনিয়া যেন আর কিছুই বলিতে পারিলেন না ; আনন্দ, দুঃখ প্রভৃতি পরস্পরবিপরীত ভাবসমূহ তাঁহার অন্তরে যুগপৎ প্রবাহিত হইয়া তাঁহাকে এককালে স্তম্ভিত ও জ্ঞানশূন্য করিল। এমন সময়ে তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল।

কামারপুকুরে প্রত্যাগমন

নিদ্রাভঙ্গ হইলে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম কোথায় রহিয়াছেন, তাহা অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুঝিতে পারিলেন না। পূর্বোক্ত স্বপ্নের বাস্তবতা তাঁহাকে এককালে অভিভূত করিয়া রাখিল। পরে ধীরে ধীরে তাঁহার যখন স্থূল জগতের জ্ঞান উপস্থিত হইল, তখন শয্যাত্যাগ করিয়া তিনি ঐ অদ্ভুত স্বপ্ন স্মরণ করিয়া নানা কথা ভাবিতে লাগিলেন। পরিণামে তাঁহার বিশ্বাসপ্রবণ হৃদয় স্থিরনিশ্চয় করিল, দেবস্বপ্ন কখনও বৃথা হয় না—নিশ্চয় কোন মহাপুরুষ তাঁহার গৃহে শীঘ্রই জন্মপরিগ্রহ করিবেন—বৃদ্ধ বয়সে নিশ্চয় তাঁহাকে পুনরায় পুত্রমুখ অবলোকন করিতে হইবে। অনন্তর ঐ অদ্ভুত স্বপ্নের সাফল্য পরীক্ষা না করিয়া কাহারও

নিকট তদ্বিবরণ প্রকাশ করিবেন না, এইরূপ সঙ্কল্প তিনি মনে মনে স্থির করিলেন এবং কয়েক দিন পরে ৺গয়াধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সন ১২৪২ সালের বৈশাখে কামারপুকুরে উপস্থিত হইলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

চন্দ্রাদেবীর বিচিত্র অনুভব

জগৎপাবন মহাপুরুষসকলের জন্মপরিগ্রহ করিবার কালে তাঁহাদিগের জনক-জননীর জীবনে অসাধারণ আধ্যাত্মিক অনুভব ও দর্শনসমূহ উপস্থিত হইবার কথা পৃথিবীস্থ সকল জাতির ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। ভগবান শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ, মায়াদেবীতনয় বুদ্ধ, মেরী-নন্দন ঈশা, শ্রীভগবান শঙ্কর, মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভৃতি যে-সকল মহামহিম পুরুষপ্রবর মানব-মনের ভক্তিশ্রদ্ধাপূত পূজার্ঘ্য অদ্যাবধি প্রতিনিয়ত প্রাপ্ত হইতেছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকের জনক-জননীর সম্বন্ধেই ঐরূপ কথা শাস্ত্রনিবদ্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। প্রমাণস্বরূপে নিম্নলিখিত কয়েকটি কথা এখানে স্মরণ করিলেই যথেষ্ট হইবে—

অবতারপুরুষের আবির্ভাবকালে তাঁহার জনক-জননীর দিব্য অনুভবাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রকথা

যজ্ঞাবশিষ্ট পাত্রাবশেষ বা চরু ভোজন করিয়া ভগবান শ্রীরামচন্দ্রপ্রমুখ ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের জননীগণের গর্ভধারণের কথা কেবলমাত্র রামায়ণপ্রসিদ্ধ নহে, কিন্তু ভূমিষ্ঠ হইবার পূর্বে ও পরে তাঁহারা যে বহুবার উক্ত ভ্রাতৃচতুষ্টয়কে জগৎপাতা শ্রীভগবান্ বিষ্ণুর অংশসম্ভূত ও দিব্যশক্তিসম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারিয়াছিলেন, একথাও উহাতে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের জনক-জননী তাঁহার গর্ভপ্রবেশকালে, এবং

ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে তাঁহাকে ষড়ৈশ্বর্যসম্পন্ন মূর্তিমান ঈশ্বররূপে অনুভব করিয়াছিলেন; তদ্ভিন্ন তাঁহার জন্মগ্রহণের পরক্ষণ হইতে প্রতিদিন তাঁহাদিগের জীবনে নানা অদ্ভুত উপলব্ধির কথা শ্রীমদ্ভাগবতাদি পুরাণসকলে লিপিবদ্ধ আছে।

শ্রীভগবান্ বুদ্ধদেবের গর্ভপ্রবেশকালে শ্রীমতী মায়াদেবী দর্শন করিয়াছিলেন, জ্যোতির্ময় শ্বেত হস্তীর আকার ধারণপূর্বক কোন পুরুষপ্রবর যেন তাঁহার উদরে প্রবেশ করিতেছেন এবং তাঁহার সৌভাগ্যদর্শনে ইন্দ্রপ্রমুখ যাবতীয় দেবগণ যেন তাঁহাকে বন্দনা করিতেছেন।

শ্রীভগবান্ ঈশার জন্মগ্রহণকালে তজ্জননী শ্রীমতী মেরী অনুভব করিয়াছিলেন, নিজ স্বামী শ্রীযুত যোসেফের সহিত সঙ্গতা হইবার পূর্বেই যেন তাঁহার গর্ভ উপস্থিত হইয়াছে—অননুভূতপূর্ব দিব্য আবেশে আবিষ্ট ও তন্ময় হইয়াই তাঁহার গর্ভলক্ষণ প্রকাশ পাইয়াছে।

শ্রীভগবান্ শঙ্করের জননী অনুভব করিয়াছিলেন, দেবাদিদেব মহাদেবের দিব্যদর্শন ও বরলাভেই তাঁহার গর্ভধারণ হইয়াছে।

শ্রীভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের জননী শ্রীমতী শচীদেবীর জীবনেও পূর্বোক্ত প্রকার নানা দিব্য অনুভব উপস্থিত হইবার কথা 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত'প্রমুখ গ্রন্থসকলে লিপিবদ্ধ আছে।

হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান প্রভৃতি যাবতীয় ধর্ম ঈশ্বরের সপ্রেম উপাসনাকেই মুক্তিলাভের সুগম পথ বলিয়া মানবের নিকট নির্দেশ করিয়াছে; তাহাদিগের সকলেই ঐরূপে ঐ বিষয়ে একমত হওয়ায় নিরপেক্ষ বিচারকের মনে স্বতই প্রশ্নের উদয় হয়, উহার ভিতর

বাস্তবিক কোন সত্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে কি-না এবং মহাপুরুষগণের জীবনেতিহাসে বর্ণিত ঐসকল আখ্যায়িকার ভিতর কতটা গ্রহণ এবং কতটা বা ত্যাগ করা বিধেয়।

যুক্তি অন্যপক্ষে মানবকে ইঙ্গিত করিয়া থাকে যে, কথাটার ভিতর কিছু সত্য থাকিলেও থাকিতে পারে। কারণ, বর্তমান যুগের বিজ্ঞান যখন উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন পিতামাতারই উদার চরিত্রবান্ পুত্রোৎপাদনের সামর্থ্য স্বীকার করিয়া থাকে, তখন শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও ঈশাদির ন্যায় মহাপুরুষগণের জনক-জননী যে বিশেষ সদ্গুণসম্পন্ন ছিলেন, একথা গ্রহণ করিতে হয়। তৎসঙ্গে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, ঐ সকল পুরুষোত্তমকে জন্মপ্রদানকালে তাঁহাদিগের মন সাধারণ মানবাপেক্ষা অনেক উচ্চ ভূমিতে অবস্থান করিয়াছিল এবং ঐরূপে উচ্চ ভূমিতে অবস্থানের জন্যই তাঁহারা ঐ কালে অসাধারণ দর্শন ও অনুভবাদির অধিকারী হইয়াছিলেন।

ঐ শাস্ত্রকথার যুক্তিনির্দেশ

কিন্তু পুরাণেতিহাস ঐ বিষয়ক নানা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেও এবং যুক্তি ঐকথা ঐরূপে সমর্থন করিলেও, মানবমন উহাতে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী হইতে পারে না। কারণ, উহা সর্বোপরি নিজ প্রত্যক্ষের উপরেই বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সেজন্য আত্মা, ঈশ্বর, মুক্তি, পরকাল প্রভৃতি বিষয়সকলেও অপরোক্ষানুভূতির পূর্বে কখন নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিতে পারে না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু নিরপেক্ষ বিচার-বুদ্ধি অসাধারণ বা

সহজে বিশ্বাস-গম্য না হইলেও ঐসকল কথা মিথ্যা বলিয়া ত্যাজ্য নহে

অলৌকিক বলিয়াই কোন বিষয়কে ত্যাজ্য মনে করে না—কিন্তু স্বয়ং সাক্ষিস্বরূপ থাকিয়া স্থিরভাবে তদ্বিষয়ে স্বপক্ষ ও বিপক্ষ প্রমাণসকল সংগ্রহে অগ্রসর হয় এবং উপযুক্ত কালে তদ্বিষয় মিথ্যা বলিয়া ত্যাগ অথবা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক, যে মহাপুরুষের জীবনেতিহাস আমরা লিখিতে বসিয়াছি, তাঁহার জন্মকালে তাঁহার জনক-জননীর জীবনেও নানা দিব্যদর্শন ও অনুভবসমূহ উপস্থিত হইয়াছিল, একথা আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি। সুতরাং সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। পূর্ব অধ্যায়ে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সম্বন্ধে ঐরূপে কয়েকটি কথা পাঠককে বলিয়াছি। বর্তমান অধ্যায়ে শ্রীমতী চন্দ্রমণি সম্বন্ধে ঐরূপ সকল কথা আমরা এখানে লিপিবদ্ধ করিলাম।

গয়া হইতে ফিরিয়া ক্ষুদিরামের চন্দ্রাদেবীর ভাবপরিবর্তন দর্শন

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ৺গয়াধামে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম যে অদ্ভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছিলেন, গৃহে ফিরিয়া তাহার কথা কাহাকেও না বলিয়া তিনি নীরবে উহার ফলাফল লক্ষ্য করিয়াছিলেন। ঐ বিষয়ে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর স্বভাবের অদ্ভুত পরিবর্তন প্রথমেই তাঁহার নয়নে পতিত হইয়াছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, মানবী চন্দ্রা এখন যেন সত্য সত্যই দেবীত্ব পদবীতে আরূঢ়া হইয়াছেন! কোথা হইতে একটা সর্বজনীন প্রেম আসিয়া তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া সংসারের বাসনাময় কোলাহল

হইতে তাঁহাকে যেন অনেক উচ্চে তুলিয়া রাখিয়াছে। আপনার সংসারের চিন্তা অপেক্ষা শ্রীমতী চন্দ্রার মনে এখন অভাবগ্রস্ত প্রতিবেশিসকলের সংসারের চিন্তাই প্রবল হইয়াছে। নিজ সংসারের কর্তব্যপালন করিতে করিতে তিনি দশবার ছুটিয়া যাইয়া তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া আসেন এবং আহার্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুসকলের ভিতর যাহার যে বস্তুর অভাব দেখেন, আপন সংসার হইতে লুকাইয়া লইয়া যাইয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঐসকল তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকেন। আবার ৺রঘুবীরের সেবা সারিয়া স্বামিপুত্রাদিকে ভোজন করাইয়া বেলা তৃতীয় প্রহরে স্বয়ং ভোজনে বসিবার পূর্বে শ্রীমতী চন্দ্রা পুনরায় তাহাদিগের প্রত্যেকের বাটীতে যাইয়া সংবাদ লইয়া আসেন, তাহাদিগের সকলের ভোজন হইয়াছে কি-না। যদি কোন দিন দেখিতে পান যে, কোন কারণে কাহারও আহার জুটে নাই, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ তাহাকে সাদরে বাটীতে আনয়নপূর্বক নিজের অন্ন ধরিয়া দিয়া স্বয়ং হৃষ্টচিত্তে সামান্য জলযোগমাত্র করিয়া দিন কাটাইয়া দেন।

শ্রীমতী চন্দ্রা প্রতিবেশী বালকবালিকাগণকে চিরকাল অপত্য-নির্বিশেষে ভালবাসিতেন। ক্ষুদিরাম দেখিলেন, তাঁহার সেই অপত্যস্নেহ এখন যেন দেবতাসকলের উপরও প্রসারিত হইয়াছে। কুলদেবতা ৺রঘুবীরকে তিনি এখন আপন পুত্রগণের অন্যতমরূপে সত্য সত্যই দর্শন করিতেছেন এবং ৺শীতলাদেবীর ও ৺রামেশ্বর বাণলিঙ্গটিও যেন তাঁহার হৃদয়ে ঐরূপ স্থান অধিকার করিয়াছে।

চন্দ্রাদেবীর অপত্যস্নেহের প্রসার-দর্শন

ঐসকল দেবতার সেবা পূজাকালে ইতিপূর্বে তাঁহার অন্তর শ্রদ্ধাপূর্ণ ভয়ে সর্বদা পূর্ণ থাকিত; ভালবাসা আসিয়া সেই ভয়কে যেন এখন কোথায় অন্তর্হিত করিয়াছে। দেবতাগণের নিকটে তাঁহার এখন আর ভয় নাই, সঙ্কোচ নাই, লুকাইবার এবং চাহিবার যেন কিছুই নাই! আছে কেবল তৎস্থলে আপনার হইতে আপনার বলিয়া তাঁহাদিগকে জ্ঞান করা, তাঁহাদিগকে সুখী করিবার জন্য সর্বস্বপ্রদানের ইচ্ছা এবং তাঁহাদিগের সহিত চিরসম্বন্ধ হওয়ার অনন্ত উল্লাস।

ক্ষুদিরাম বুঝিলেন, ঐরূপ নিঃসঙ্কোচ দেবভক্তি ও নির্ভর-প্রসূত উল্লাসই সরলহৃদয়া চন্দ্রাকে এখন অধিকতর উদারস্বভাবা করিয়াছে। উহাদিগের প্রভাবেই তিনি এখন কাহাকেও অবিশ্বাস করিতে বা পর ভাবিতে পারিতেছেন না। কিন্তু স্বার্থপর পৃথিবীর লোক তাঁহার এই অপূর্ব উদারতার কথা কি কখনও যথাযথভাবে গ্রহণ করিবে?—কখনই না। তাঁহাকে অল্পবুদ্ধি বা 'পাগল' বলিবে, অথবা কঠোরতর ভাষায় তাঁহাকে নির্দেশ করিবে। ঐরূপ ভাবিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার অবসর খুঁজিতে লাগিলেন।

তদ্দর্শনে ক্ষুদিরামের চিন্তা ও সঙ্কল্প

ঐরূপ অবসর আসিতে বিলম্বও হইল না। সরলপ্রাণা চন্দ্রা স্বামীর নিকট নিজ চিন্তাটি পর্যন্ত কখনও গোপন করিতে পারিতেন না। বয়স্যাদিগের নিকটেই তিনি অনেক সময় মনের সকল কথা বলিয়া ফেলিতেন, তা পৃথিবীর সকলের অপেক্ষা যাঁহার সহিত তাঁহার

চন্দ্রাদেবীর দেব-স্বপ্ন

নিকট সম্বন্ধ ঈশ্বর স্থাপন করিয়া দিয়াছেন, তাঁহার নিকট ঐসকল গোপন করিবেন কিরূপে? অতএব ৺গয়াদর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম বাটী ফিরিলেই কয়েকদিন ধরিয়া চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে তাঁহার অনুপস্থিতিকালে যাহা কিছু ঘটিয়াছিল, দেখিয়াছিলেন, অথবা অনুভব করিয়াছিলেন—সেই সমস্ত কথা সুবিধা পাইলেই যখন তখন বলিতে লাগিলেন। ঐরূপ অবসরে একদিন বলিলেন, "দেখ, তুমি যখন ৺গয়া গিয়াছিলে, তখন একদিন রাত্রিকালে এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম। দেখিলাম, যেন এক জ্যোতির্ময় দেবতা আমার শয্যাধিকার করিয়া শয়ন করিয়া আছেন। প্রথমে ভাবিয়াছিলাম তুমি, কিন্তু পরে বুঝিয়াছিলাম কোন মানবের ঐরূপ রূপ হওয়া সম্ভবপর নহে। সে যাহা হউক, ঐরূপ দেখিয়া নিদ্রাভঙ্গ হইল। তখনও মনে হইতে লাগিল তিনি যেন শয্যায় রহিয়াছেন। পরক্ষণে মনে হইল, মানুষের নিকট দেবতা আবার কোন্ কালে ঐরূপে আসিয়া থাকেন? তখন মনে হইল, তবে বুঝি কোন দুষ্ট লোক কোন মন্দ অভিসন্ধিতে ঘরে ঢুকিয়াছে এবং তাহার পদশব্দাদির জন্য আমি ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। ঐকথা মনে হইয়াই বিষম ভয় হইল। তাড়াতাড়ি উঠিয়া প্রদীপ জ্বালিলাম; দেখিলাম, কেহ কোথাও নাই, গৃহদ্বার যেমন অর্গলবদ্ধ তেমনি রহিয়াছে। তত্রাচ ভয়ে সে রাত্রে আর নিদ্রা যাইতে পারিলাম না। ভাবিলাম, কেহ হয়তো কৌশলে অর্গল খুলিয়া গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল এবং আমাকে জাগরিতা হইতে দেখিয়াই পলাইয়া পুনরায় কৌশলে অর্গলবদ্ধ করিয়া গিয়াছে। প্রভাত হইতে না হই

ধনী কামারনী ও ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নকে ডাকাইলাম এবং তাহাদিগকে সকল কথা বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তোমরা কি বুঝ বল দেখি, সত্য সত্যই কি কোন লোক আমার গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল? আমার সহিত পল্লীর কাহারও বিরোধ নাই, কেবল মধু যুগীর সহিত সেদিন সামান্য কথা লইয়া কিছু বচসা হইয়াছিল—সেই কি আড়ি করিয়া ঐরূপে গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল?' তখন তাহারা দুইজনে হাসিতে হাসিতে আমাকে অনেক তিরস্কার করিল। বলিল, 'মর মাগী, বুড়ো হয়ে তুই কি পাগল হলি নাকি যে, স্বপ্ন দেখে এইরূপে ঢলাচ্ছিস্' অপর লোকে একথা শুন্‌লে বল্‌বে কি বল্ দেখি? তোর নামে একেবারে অপবাদ রটিয়ে দেবে। ফের যদি ওকথা কাউকে বল্‌বি তো মজা দেখতে পাবি।' তাহারা ঐরূপ বলাতে ভাবিলাম, তবে স্বপ্নই দেখিয়াছিলাম। আর ভাবিলাম একথা আর কাউকে বলিব না, কিন্তু তুমি ফিরিয়া আসিলে তোমাকে বলিব।

"আর একদিন যুগীদের শিবমন্দিরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া ধনীর সহিত কথা কহিতেছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম, ৺মহাদেবের শ্রীঅঙ্গ হইতে দিব্যজ্যোতি নির্গত হইয়া মন্দির পূর্ণ করিয়াছে এবং বায়ুর ন্যায় তরঙ্গাকারে উহা আমার দিকে ছুটিয়া আসিতেছে! আশ্চর্য হইয়া ধনীকে ঐ কথা বলিতে যাইতেছি, এমন সময় সহসা উহা নিকটে আসিয়া আমাকে যেন ছাইয়া ফেলিল এবং আমার ভিতরে প্রবল বেগে প্রবেশ করিতে লাগিল। ভয়ে বিস্ময়ে স্তম্ভিতা হইয়া এককালে মূর্ছিতা হইয়া পড়িয়া

শিবমন্দিরে চন্দ্রাদেবীর দিব্যদর্শন ও অনুভব

ঠাকুরের বাটীর সম্মুখে অবস্থিত যুগীদের শিবমন্দির

গেলাম। পরে ধনীর শুশ্রূষায় চৈতন্য হইলে তাহাকে সকল কথা বলিলাম। সে শুনিয়া প্রথমে অবাক হইল, পরে বলিল, 'তোমার বায়ুরোগ হইয়াছে।' আমার কিন্তু তদবধি মনে হইতেছে ঐ জ্যোতি যেন আমার উদরে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে এবং আমার যেন গর্ভসঞ্চারের উপক্রম হইয়াছে! ঐ কথাও ধনী এবং প্রসন্নকে বলিয়াছিলাম। তাহারা শুনিয়া আমাকে 'নির্বোধ' 'পাগল' ইত্যাদি কত কি বলিয়া তিরস্কার করিল এবং মনের ভ্রম হইতে অথবা বায়ুগুল্ম নামক ব্যাধি হইতে ঐরূপ অনুভব হইতেছে, এইরূপ নানা কথা বুঝাইয়া ঐ অনুভবের কথা কাহাকেও বলিতে নিষেধ করিল। তোমাকে ভিন্ন ঐ কথা আর কাহাকেও বলিব না নিশ্চয় করিয়া তদবধি এতদিন চুপ করিয়া আছি। আচ্ছা তোমার কি মনে হয়? ঐরূপ দর্শন কি আমার দেবতার কৃপায় হইয়াছে, অথবা বায়ুরোগে হইয়াছে? এখনও আমার কিন্তু মনে হয়, আমার যেন গর্ভসঞ্চার হইয়াছে।"

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ৺গয়ায় নিজ স্বপ্নের কথা স্মরণ করিতে করিতে শ্রীমতী চন্দ্রার সকল কথা শুনিলেন এবং উহা রোগজনিত নাও হইতে পারে, এই কথা বলিয়া তাঁহাকে নানা-ভাবে বুঝাইয়া বলিলেন, "এখন হইতে ঐরূপ দর্শন ও অনুভবের কথা আমাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বলিও না; শ্রীশ্রীরঘুবীর কৃপা করিয়া যাহাই দেখান তাহা কল্যাণের জন্য, এই কথা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিবে। ৺গয়াধামে অবস্থানকালে শ্রীশ্রীগদাধর আমাকেও অলৌকিক উপায়ে জানাইয়াছেন, আমাদিগকে পুনরায় পুত্রমুখ

ঐসকল কথা কাহাকেও না বলিতে চন্দ্রাদেবীকে ক্ষুদিরামের সতর্ক করা

দর্শন করিতে হইবে।" শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী দেবপ্রতিম স্বামীর ঐরূপ কথা শুনিয়া আশ্বস্তা হইলেন এবং তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া এখন হইতে পূর্ণভাবে শ্রীশ্রীরঘুবীরের মুখাপেক্ষিণী হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন আসিয়া ব্রাহ্মণদম্পতির পূর্বোক্ত কথোপকথনের পরে ক্রমে তিন-চারি মাস অতীত হইল। তখন সকলে নিঃসন্দেহে বুঝিতে পারিল, পঁয়তাল্লিশ বৎসর বয়সে ক্ষুদিরাম-গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী সত্য সত্যই পুনরায় অন্তর্বত্নী হইয়াছেন। গর্ভধারণ করিবার কালে রমণীর রূপলাবণ্য সর্বত্র বর্ধিত হইতে দেখা যায়। চন্দ্রাদেবীরও তাহাই হইয়াছিল। ধনী-প্রমুখ তাঁহার প্রতিবেশিনীগণ বলিত, এইবার গর্ভধারণ করিয়া তিনি যেন অন্যান্য বার অপেক্ষা অধিক রূপলাবণ্যশালিনী হইয়াছেন। তাহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ আবার উহা দেখিয়া জল্পনা করিত, 'বুড়ো বয়সে গর্ভবতী হইয়া মাগীর এত রূপ! বোধ হয় ব্রাহ্মণী এবার প্রসবকালে মৃত্যুমুখে পতিতা হইবে।'

সে যাহা হউক, গর্ভবতী হইয়া শ্রীমতী চন্দ্রার দিব্যদর্শন ও অনুভবসকল দিন দিন বর্ধিত হইয়াছিল। শুনা যায়, এই সময়ে তিনি প্রায় নিত্যই দেবদেবীসকলের দর্শনলাভ করিতেন, কখন বা অনুভব করিতেন, তাঁহাদিগের শ্রীঅঙ্গনিঃসৃত পুণ্যগন্ধে গৃহ পূর্ণ হইয়াছে; কখনও বা দৈববাণী শ্রবণ করিয়া বিস্মিতা হইতেন। আবার শুনা যায়, সকল দেব-দেবীর উপরেই তাঁহার মাতৃস্নেহ যেন এইকালে উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছিল। শুনা যায়, এইকালে তিনি প্রায় প্রতিদিন ঐসকল দর্শন ও অনুভবের কথা নিজ স্বামীর নিকটে বলিয়া কেন তাঁহার ঐরূপ হইতেছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন করিতেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে নানাভাবে বুঝাইয়া ঐসকলের জন্য শঙ্কিতা হইতে নিষেধ করিতেন। ঐ কালের একদিনের ঘটনা আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, এখানে বিবৃত করিতেছি। শ্রীমতী চন্দ্রা তাঁহার স্বামীর নিকটে সেদিন ভয়-চকিতা হইয়া এইরূপ নিবেদন করিয়াছিলেন, দেব, শিবমন্দিরের সম্মুখে জ্যোতিদর্শনের দিন হইতে মধ্যে মধ্যে কত যে দেব-দেবীর দর্শন পাইয়া থাকি, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাঁহাদিগের অনেকের মূর্তি আমি ইতিপূর্বে কখনও ছবিতেও দেখি নাই। আজ দেখি, হাঁসের উপর চড়িয়া একজন আসিয়া উপস্থিত। দেখিয়া ভয় হইল; আবার রৌদ্রের তাপে তাহার মুখখানি রক্তবর্ণ হইয়াছে দেখিয়া মন কেমন করিতে লাগিল। তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, 'ওরে বাপ্ হাঁসেচড়া ঠাকুর রৌদ্রে তোর মুখখানি যে শুকাইয়া গিয়াছে; ঘরে আমানি পান্তা আছে, দুটি খাইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যা! সে ঐ কথা শুনিয়া হাসিয়া যেন হাওয়ায় মিলাইয়া গেল! আর দেখিতে পাইলাম না। ঐরূপ কত মূর্তি দেখি! পূজা বা ধ্যান করিয়া নহে—সহজ অবস্থায়, যখন তখন দেখিয়া থাকি। কখন কখন আবার দেখিতে পাই, তাহারা যেন মানুষের মত হইয়া সম্মুখে আসিতে আসিতে বায়ুতে মিলাইয়া গেল। কেন ঐরূপ সব দেখিতে পাই, বল দেখি? আমার কি কোন রোগ হইল? সময়ে সময়ে ভাবি আমাকে গোসাঁইয়ে* পাইল না কি?" শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম

চন্দ্রাদেবীর পুনরায় গর্ভধারণ ও ঐকালে তাঁহার দিব্য দর্শনসমূহ

* শ্রীযুক্ত সুখলাল গোস্বামীর মৃত্যুর পরে নানা দৈব উৎপাত উপস্থিত হওয়ায় পল্লীবাসিগণের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, উক্ত গোস্বামী বা তাঁহার বংশীয়

তখন তাঁহাকে ৺গয়ায় দৃষ্ট নিজ স্বপ্নের কথা বলিয়া বুঝাইতে লাগিলেন যে, অশেষ সৌভাগ্যের ফলে তিনি এবার পুরুষোত্তমকে গর্ভে ধারণ করিয়াছেন এবং তাঁহার পুণ্যসংস্পর্শেই তাঁহার ঐরূপ দিব্য দর্শনসমূহ উপস্থিত হইতেছে। স্বামীর উপর অসীম বিশ্বাসশালিনী চন্দ্রার হৃদয় তাঁহার ঐসকল কথা শুনিয়া দিব্য ভক্তিতে পূর্ণ হইল এবং নবীন বলে বলশালিনী হইয়া তিনি নিশ্চিন্তা হইলেন।

ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পূতস্বভাবা গৃহিণী শ্রীশ্রীরঘুবীরের একান্ত শরণাগত থাকিয়া যাহার শুভাগমনে তাঁহাদিগের জীবন ঐশী ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছে, সেই মহাপুরুষ-পুত্রের-মুখদর্শন-আশায় কাল কাটাইতে লাগিলেন।

কোন ব্যক্তি মরিয়া প্রেত হইয়া গোস্বামীদিগের বাটীর সম্মুখে যে বৃহৎ বকুল গাছ ছিল, তাহাতে অবস্থান করিতেন। ঐ বিশ্বাসপ্রভাবেই লোকে ঐ সময়ে কাহারও কোনরূপ দিব্যদর্শন উপস্থিত হইলে বলিত, 'উহাকে গোসাঁইয়ে পাইয়াছে।' সরলহৃদয়া চন্দ্রাদেবী সেইজন্যই এই সময়ে ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

মহাপুরুষের জন্মকথা

শরৎ, হেমন্ত ও শীত অতীত হইয়া ক্রমে ঋতুরাজ বসন্ত উপস্থিত হইল। শীত ও গ্রীষ্মের সুখসম্মিলনে মধুময় ফাল্গুন স্থাবরজঙ্গমের ভিতর নবীন প্রাণ সঞ্চারিত করিয়া আজ ষষ্ঠ দিবস সংসারে সমাগত। জীবজগতে একটা বিশেষ উৎসাহ, আনন্দ ও প্রেমের প্রেরণা সর্বত্র লক্ষিত হইতেছে। শাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মানন্দের এক কণা সকলের মধ্যে নিহিত থাকিয়া তাহাদিগকে সরস করিয়া রাখিয়াছে—ঐ দিব্যোজ্জ্বল আনন্দকণার কিঞ্চিদধিক মাত্রা পাইয়াই কি এই কাল সংসারের সর্বত্র এত উল্লাস আনয়ন করিয়া থাকে ?

চন্দ্রাদেবীর আশঙ্কা ও স্বামীর কথায় আশ্বাসপ্রাপ্তি

৺রঘুবীরের ভোগ রাঁধিতে রাঁধিতে আসন্নপ্রসবা শ্রীমতী চন্দ্রা প্রাণে আজ দিব্য উল্লাস অনুভব করিতেছিলেন, কিন্তু শরীর নিতান্ত অবসন্ন জ্ঞান করিতে লাগিলেন। সহসা তাঁহার মনে হইল, শরীরের যেরূপ অবস্থা তাহাতে কখন কি হয় ; এখনই যদি প্রসবকাল উপস্থিত হয় তাহা হইলে গৃহে এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি নাই যে, অদ্যকার ঠাকুরসেবা চালাইয়া লইবে। তাহা হইলে উপায় ? ভীতা হইয়া তিনি ঐকথা স্বামীকে নিবেদন করিলেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, "ভয় নাই, তোমার গর্ভে যিনি শুভাগমন করিয়াছেন, তিনি ৺রঘুবীরের পূজাসেবায় বিঘ্নোৎপাদন করিয়া কখনই সংসারে

প্রবেশ করিবেন না—ইহা আমার ধ্রুব বিশ্বাস ;' অতএব নিশ্চিন্তা হও, অদ্যকার মত ঠাকুরসেবা তুমি নিশ্চয় চালাইতে পারিবে ; কল্য হইতে আমি উহার জন্য ভিন্ন বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছি, এবং ধনীকেও বলা হইয়াছে যাহাতে সে অদ্য হইতে রাত্রে এখানেই শয়ন করিয়া থাকে।" শ্রীমতী চন্দ্রা স্বামীর ঐরূপ কথায় দেহে নবীন বলসঞ্চার অনুভব করিলেন এবং হৃষ্টচিত্তে পুনরায় গৃহকর্মে ব্যাপৃতা হইলেন। ঘটনাও ঐরূপ হইল—৺রঘুবীরের মধ্যাহ্ন-ভোগ এবং সান্ধ্যশীতলাদি কর্ম পর্যন্ত সেদিন নির্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া গেল। রাত্রে আহারাদি সমাপন করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও রামকুমার শয়নকক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং ধনী আসিয়া চন্দ্রাদেবীর সহিত এক কক্ষে শয়ন করিয়া রহিল। ৺রঘুবীরের ঘর ভিন্ন বাটীতে বসবাসের জন্য দুইখানি চালাঘর ও একখানি রন্ধনশালা মাত্র ছিল, এবং অপর একখানি ক্ষুদ্র চালাঘরে একপার্শ্বে ধান্য কুটিবার জন্য একটি ঢেঁকি এবং উহা সিদ্ধ করিবার জন্য একটি উনান বিদ্যমান ছিল। স্থানাভাবে শেষোক্ত চালাখানিই শ্রীমতী চন্দ্রার সূতিকাগৃহরূপে নির্দিষ্ট রহিল।

রাত্রি-অবসান হইতে প্রায় অর্ধদণ্ড অবশিষ্ট আছে, এমন সময়ে চন্দ্রাদেবীর প্রসবপীড়া উপস্থিত হইল। ধনীর সাহায্যে তিনি পূর্বোক্ত ঢেঁকিশালে গিয়া শয়ন করিলেন এবং অবিলম্বে এক পুত্রসন্তান প্রসব করিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রার জন্য ধনী তখন তৎকালোপযোগী ব্যবস্থা করিয়া জাতককে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়া দেখিল, ইতিপূর্বে তাহাকে যেখানে রক্ষা করিয়াছিল, সেই স্থান হইতে সে কোথায় অন্তর্হিত

গদাধরের জন্ম

হইয়াছে! ভয়ত্রস্তা হইয়া ধনী প্রদীপ উজ্জল করিল এবং অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিতে পাইল, রক্তক্লেদময় পিচ্ছিল ভূমিতে ধীরে ধীরে হড়কাইয়া ধান্য সিদ্ধ করিবার চুল্লীর ভিতর প্রবেশপূর্বক সে বিভূতিভূষিতাঙ্গ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে, অথচ কোন শব্দ করে নাই। ধনী তখন তাহাকে যত্নে উঠাইয়া লইল এবং পরিষ্কৃত করিয়া দীপালোকে ধরিয়া দেখিল, অদ্ভূত প্রিয়দর্শন বালক যেন ছয় মাসের ছেলের মত বড়। প্রতিবেশী লাহাবাবুদের বাটী হইতে তখন প্রসন্নপ্রমুখ চন্দ্রাদেবীর দুই-চারিজন বয়স্যা সংবাদ পাইয়া তথায় উপস্থিত হইয়াছে—ধনী তাহাদিগের নিকটে এ সংবাদ ঘোষণা করিল এবং পূতগম্ভীর ব্রাহ্মমুহূর্তে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের তপস্বী দরিদ্র কুটির শুভ শঙ্খারাবে পূর্ণ হইয়া মহাপুরুষের শুভাগমনবার্তা সংসারে প্রচার করিল।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞ ক্ষুদিরাম নবাগত বালকের জন্মলগ্ন নিরূপণ করিতে যাইয়া দেখিলেন, জাতক বিশেষ শুভক্ষণে সংসারে প্রবেশ করিয়াছে। দেখিলেন—

ঐদিন সন ১২৪২ সালের অথবা ১৭৫৭ শকাব্দের ৬ই ফাল্গুন, ইংরাজী ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি, শুক্লপক্ষ, বুধবার। রাত্রি একত্রিশ দণ্ড অতীত হইয়া অর্ধদণ্ডমাত্র অবশিষ্ট থাকিতে বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। শুভা দ্বিতীয়া তিথি ঐ সময়ে পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রের সহিত সংযুক্তা হইয়া সংসারে সিদ্ধিযোগ আনয়ন করিয়াছিল। বালকের জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র ও বুধ একত্র মিলিত রহিয়াছে এবং শুক্র, মঙ্গল ও শনি তুঙ্গস্থান অধিকার-

গদাধরের শুভ জন্মমুহূর্ত সম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্রের কথা

পূর্বক তাঁহার অসাধারণ জীবনের পরিচায়ক হইয়া রহিয়াছে। আবার মহামুনি পরাশরের মত অবলম্বনপূর্বক দেখিলে রাহু ও কেতু গ্রহদ্বয়কে তাঁহার জন্মকালে তুঙ্গস্থ দেখিতে পাওয়া যায়। তদুপরি, বৃহস্পতি তুঙ্গাভিলাষিরূপে বর্তমান থাকিয়া বালকের অদৃষ্টের উপর বিশেষ শুভ প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে।

গদাধরের বাল্যাশ্রিত নাম

অতঃপর বিশিষ্ট জ্যোতির্বিদ্গণ নবজাত বালকের জন্মক্ষণ পরীক্ষাপূর্বক তাঁহাকে বলিলেন, জাতক যেরূপ উচ্চলগ্নে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধে জ্যোতিষশাস্ত্র নিঃসন্দেহে নির্দেশ করে যে, 'ঐরূপ ব্যক্তি ধর্মবিৎ ও মাননীয় হইবেন এবং সর্বদা পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠানে রত থাকিবেন। বহুশিষ্যপরিবৃত হইয়া ঐ ব্যক্তি দেবমন্দিরে বাস করিবেন; এবং নবীন ধর্ম সম্প্রদায় প্রবর্তিত করিয়া নারায়ণাংশসম্ভূত মহাপুরুষ বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধিলাভপূর্বক সর্বত্র সকল লোকের পূজ্য হইবেন।'* শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের মন উহাতে বিস্ময়পূর্ণ হইল। তিনি

ধর্মস্থানাধিপে তুঙ্গে ধর্মস্থে তুঙ্গখেচরে।
গুরুণা দৃষ্টিসংযোগে লগ্নেশে ধর্মসংস্থিতে॥
কেন্দ্রস্থানগতে সৌম্যে গুরৌ চৈব তু কোণভে।
* 'স্থিরলগ্নে যদা জন্ম সম্প্রদায়প্রভুঃ হি সঃ।'
ধর্মবিন্মাননীয়স্তু পুণ্যকর্মরতঃ সদা।
দেবমন্দিরবাসী চ বহুশিষ্যসমন্বিতঃ॥

কৃতজ্ঞহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন, ৺গয়াধামে তিনি যে দেবস্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা সত্য সত্যই পূর্ণ হইল। অনন্তর জাতকর্ম সমাপনপূর্বক বালকের রাশ্যাশ্রিত নাম শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র স্থির করিলেন এবং ৺গয়াধামে অবস্থানকালে নিজ বিচিত্র স্বপ্নের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে সর্বজনসমক্ষে শ্রীযুক্ত গদাধর নামে অভিহিত করিতে মনস্থ করিলেন।

গদাধরের জন্মকুণ্ডলী

পাঠকের বোধসৌকর্যার্থে আমরা শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিচিত্র জন্মকুণ্ডলীর* সহিত তাঁহার কোষ্ঠীর কিয়দংশ নিম্নে প্রদান করিতেছি। জ্যোতিষশাস্ত্রাভিজ্ঞ পাঠক তদ্দৃষ্টে বুঝিতে পারিবেন, উহা ভগবান শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীশঙ্কর ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাদি অবতার-প্রথিত পুরুষসকলের অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে।

> মহাপুরুষসংজ্ঞোঽয়ং নারায়ণাংশসম্ভবঃ।
> সর্বত্র জনপূজ্যশ্চ ভবিষ্যতি ন সংশয়ঃ॥
> ইতি ভৃগুসংহিতায়াং সম্প্রদায়প্রভুযোগঃ তৎফলঞ্চ।

শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূষণ-কৃত ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী হইতে উক্ত বচন উদ্ধৃত হইল।

* ঠাকুরের জন্মকাল সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আমরা এখানে পাঠককে বলা আবশ্যক বিবেচনা করিতেছি। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট যাতায়াত করিবার কালে আমরা অনেকে তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছিলাম, 'তাঁহার যথার্থ জন্মপত্রিকা হারাইয়া গিয়াছে এবং উহার স্থলে বহুকাল পরে যে জন্মপত্রিকা করান হইয়াছে, তাহা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ।' তাঁহার নিকটে আমরা একথাও বহুবার শুনিয়াছি যে, তাঁহার জন্ম 'ফাল্গুন মাসের শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া তিথিতে হইয়াছিল, ঐদিন বুধবার ছিল।'

"শুভমস্তু। শক-নরপতেরতীতাব্দাদয়ঃ ১৭৫৭।১০।৫।৫৯।২৮।২৯ সন ১২৪২ সাল, ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, রাত্রি-অবসানে (অর্ধদণ্ড রাত্রি থাকিতে) কুম্ভলগ্নে প্রথম নবাংশে জন্ম। কুম্ভরাশি, পূর্ব-ভাদ্রপদ নক্ষত্রের প্রথম পাদে জন্ম। রাত্রিজাত দণ্ডাদিঃ ৩১।০।১৪,

তাঁহার কুম্ভরাশি এবং তাঁহার 'জন্মলগ্নে রবি, চন্দ্র ও বুধ ছিল।' 'লীলাপ্রসঙ্গ' লিখিবার কালে তাঁহার জীবনের ঘটনাবলীর যথাযথ সাল-তারিখ-নির্ণয়ে অগ্রসর হইয়া আমরা শেষোক্ত জন্মপত্রিকাখানি আনাইয়া দেখি, উহাতে তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে এইরূপ লেখা আছে—'শক ১৭৫৬।১০।৯।৫৯।১২ ফাল্গুনস্য দশমদিবসে বুধবাসরে গৌরপক্ষে দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ পূর্বভাদ্রনক্ষত্রে' তাঁহার জন্ম হইয়াছিল। ঐ সালের পঞ্জিকা আনাইয়া দেখা গেল, উক্ত কোষ্ঠীতে উল্লিখিত সালের ঐ দিবসে কৃষ্ণপক্ষ নবমী তিথি এবং শুক্রবার হয়। সুতরাং উক্ত জন্মপত্রিকাখানিকে ঠাকুর কেন ভ্রমপূর্ণ বলিতেন, তাহা বুঝিতে পারিয়া উহা পরিত্যাগপূর্বক পুরাতন পঞ্জিকা-সকলে অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম, কোন্ শকের ফাল্গুন মাসের শুক্লা দ্বিতীয়ায় বুধবার এবং রবি, চন্দ্র ও বুধ কুম্ভরাশিতে একত্র মিলিত হইয়াছে। অনুসন্ধানের ফলে ঐরূপ দুইটি দিন পাওয়া গেল, একটি ১৭৫৪ শকে এবং দ্বিতীয়টি ১৭৫৭ শকে। তন্মধ্যে প্রথমটিকে আমরা ত্যাগ করিলাম। কারণ ১৭৫৪ শক ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে, তাঁহার মুখে তাঁহার বয়স সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, তদপেক্ষা ৩ বৎসর ২ মাস বাড়াইয়া তাঁহার আয়ুগণনা করিতে হয়। পক্ষান্তরে, ১৭৫৭ শককে তাঁহার জন্মকাল বলিয়া নির্ণয় করিলে তাঁহার জীবৎকালে দক্ষিণেশ্বরে ভক্তগণ তাঁহার যে জন্মোৎসব করিতেন, তৎকালে তিনি নিজ বয়স সম্বন্ধে যেরূপ নির্ণয় করিতেন, তাহা বৃদ্ধি করিয়া তাঁহার পরমায়ু গণনা করিতে হয় না। শুধু তাহাই নহে, আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, ঠাকুরের বিবাহকালে তাঁহার বয়স ২৪ বৎসর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর
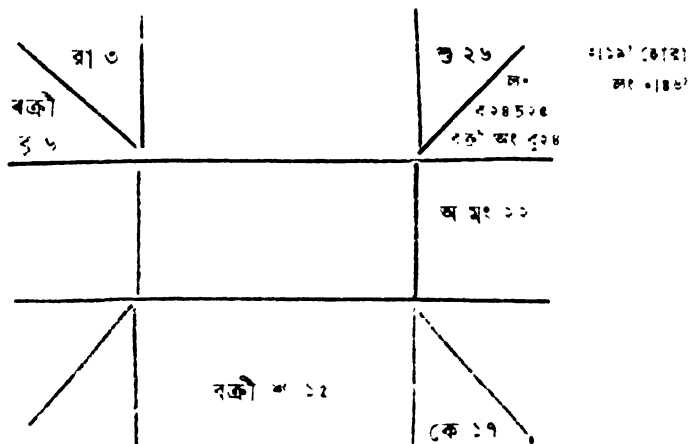
তস্য ভোগ্যদণ্ডাদিঃ ৫২।১২।৩১

ভুক্ত-দণ্ডাদিঃ ৮।২।২৯

(শকাব্দা ১৭৫৭), এতচ্ছকীয় সৌর-ফাল্গুনস্য ষষ্ঠ-দিবসে, বুধ-বাসরে, শুক্লপক্ষীয়-দ্বিতীয়ায়াং তিথৌ, পূর্বভাদ্রপদ-নক্ষত্রস্য প্রথম-

কোনরূপ পরিবর্তনের আবশ্যক হয় নাই। ঐসকল কারণে আমরা ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া অবধারিত করিলাম।

ঐরূপ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই; কিন্তু কলিকাতা, বহুবাজার, ২ নম্বর রাসবিহারী ঠাকুর লেন-নিবাসী শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্যের নষ্ট কোষ্ঠী-উদ্ধারের অসাধারণ ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়া তাঁহার নিকটে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মকুণ্ডলী প্রেরণ করি এবং তদ্দৃষ্টে গণনা করিয়া ঠাকুরের জন্মকুণ্ডলী নির্ণয় করিয়া দিতে অনুরোধ করি। তিনিও ঐ বিষয় গণনাপূর্বক ১৭৫৭ শককেই ঠাকুরের জন্মকাল বলিয়া স্থির করেন।

ঐরূপে ১৭৫৭ শকে বা সন ১২৪২ সালেই ঠাকুরের জন্ম হইয়াছিল, এ কথায় দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমরা শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতির্ভূষণ মহাশয়কে তদনুসারে ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী গণনা করিয়া দিতে অনুরোধ করি এবং তিনি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া উহা সম্পন্ন করিয়া আমাদিগকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেন।

ঠাকুরের ব্রাহ্মমুহূর্তে জন্মের কথা আমরা কেবলমাত্র কোষ্ঠীগণনায় স্থির করি নাই; কিন্তু ঠাকুরের পরিবারবর্গের মুখে শ্রুত নিম্নলিখিত ঘটনা হইতেও নির্ণয় করিয়াছি। তাঁহারা বলেন, ঠাকুর জন্মগ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরে হড়কাইয়া সূতিকাগৃহে অবস্থিত ধান্য সিদ্ধ করিবার চুল্লীর ভিতর পড়িয়া ভস্মাচ্ছাদিত হইয়াছিলেন। সদ্যোজাত শিশুর যে ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহা অন্ধকারে বুঝিতে পারা যায় নাই। পরে আলোক আনিয়া অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাকে উক্ত চুল্লীর ভিতর হইতে বাহির করা হইয়াছিল।

চরণে, সিদ্ধিযোগে, বালবকরণে এবং পঞ্চাঙ্গ-সংশুদ্ধৌ, রাত্রি চতুর্দশ-বিপলাধিকৈকত্রিংশদ্দণ্ড-সময়ে অয়নাংশোদ্ভব-শুভ-কুম্ভলগ্নে (লগ্নস্ফুট-রাশ্যাদি ১০।৩।১৯।৫৩।২০‴), শনৈশ্চরস্য ক্ষেত্রে, সূর্যস্য হোরায়াং সূর্যসুতস্য দ্রেক্কাণে, শুক্রস্য নবাংশে, বৃহস্পতের্দ্বাদশাংশে, কুজস্য ত্রিংশাংশে এবং ষড়্‌-বর্গ পরিশোধিতে পূর্বভাদ্রপদনক্ষত্রাশ্রিতকুম্ভ-

গদাধরের জন্মপত্রিকার কিয়দংশ

রাশিস্থিতে চন্দ্রে বুধস্য যামার্ধে, জীবস্য দণ্ডে, কোণস্থে গুরৌ কেন্দ্রস্থে বুধে চন্দ্রে চ, লগ্নস্থে চন্দ্রে, ত্রিগ্রহযোগে, ধর্মকর্মাধিপয়োঃ শুক্রভৌময়োঃ তুঙ্গস্থিতয়োঃ, বর্গোত্তমস্থে লগ্নাধিপে শনৌ চ তুঙ্গে, পরাশরমতেন তু রাহুকেতোস্তুঙ্গস্থয়োঃ (যতঃ উক্তং, 'রাহোস্ত বৃষভং কেতোর্বৃশ্চিকং তুঙ্গসজ্ঞিতম্' ইত্যাদিপ্রমাণাৎ) অতএব উচ্চস্থে গ্রহপঞ্চকে, অসাধারণ পুণ্যভাগ্যযোগে, শুক্লপক্ষে নিশি-জন্মহেতোঃ বিংশোত্তরী দশাধিকারে জন্ম, এতেন বৃহস্পতের্দশায়াং, তথা দেশভেদেন দশাধিকারনিয়মাচ্চ অষ্টোত্তরীয়-রাহোর্দশায়াং,

সে যাহা হউক, ১৭৫৭ শকের ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয়ায় ঠাকুরের জন্ম যেরূপ অদ্ভুত লগ্নে হইয়াছিল, তাহা শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূষণ-কৃত তাঁহার কোষ্ঠি দেখিয়া সম্যক্ উপলব্ধি হয়। সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-ঘটনাসমূহ কোষ্ঠীর সহিত মিলাইয়া দেখিয়া ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্র যথার্থই সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত।

পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, ঠাকুরের ভ্রমপূর্ণ পুরাতন কোষ্ঠি, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূষণ-কৃত তাঁহার বিশুদ্ধ কোষ্ঠি এবং শ্রীযুক্ত শশিভূষণ ভট্টাচার্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর জন্মকুণ্ডলীদর্শনে গণনাপূর্বক ঠাকুরের যে জন্মকুণ্ডলী প্রস্তুত করিয়া দেন, সে সমস্ত বেলুড় মঠে সযত্নে রক্ষিত আছে।

অশেষগুণালঙ্কৃত-স্বধর্মনিষ্ঠ-ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায়-মহোদয়স্য (সহধর্মিণী দয়াবতী-চন্দ্রমণি-দেবী-মহোদয়ায়াঃ গর্ভে) শুভ তৃতীয়পুত্রঃ সমজনি। তস্য রাশ্যাশ্রিতং নাম শম্ভুরাম দেবশর্মা। প্রসিদ্ধ-নাম গদাধর চট্টোপাধ্যায়ঃ। সাধনাসিদ্ধিপ্রাপ্ত-জগদ্বিখ্যাতনাম শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব-মহোদয়ঃ।"*

অনন্তর প্রিয়দর্শন পুত্রের মুখ দর্শন এবং তাহার অসাধারণ ভাগ্যের কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও শ্রীমতী চন্দ্রমণি আপনাদিগকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিলেন এবং যথাকালে তাহার নিষ্ক্রামণ ও নামকরণাদি সম্পন্ন করিয়া অশেষ যত্নের সহিত তাহার লালনপালনে মনোনিবেশ করিলেন।

* শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র জ্যোতিভূর্ষণ-কৃত ঠাকুরের জন্মকোষ্ঠী হইতে পূর্বোক্তাংশ উদ্ধৃত হইল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বাল্যকথা ও পিতৃবিয়োগ

শাস্ত্রে আছে, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অবতারপুরুষসকলের জনক-জননী, তাঁহাদিগের জন্মগ্রহণ করিবার পূর্বে ও পরে নানারূপ দিব্যদর্শন লাভ করিয়া তাঁহাদিগকে দেবরক্ষিত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিলেও পরক্ষণেই অপত্যস্নেহের বশবর্তী হইয়া ঐ কথা ভুলিয়া যাইতেন এবং তাঁহাদিগের পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকেন। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও তদীয় গৃহিণী শ্রীমতী চন্দ্রা-দেবীর সম্বন্ধেও ঐ কথা বলিতে পারা যায়। কারণ, তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মুখকমল দেখিয়া ৺গয়াক্ষেত্রের দেবস্বপ্ন, শিবমন্দিরের দিব্যদর্শন প্রভৃতির কথা এখন অনেকাংশে ভুলিয়া যাইলেন এবং তাহার যথাযথ পালন ও রক্ষণের জন্য চিন্তিত হইয়া নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিলেন। উপার্জনক্ষম ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত রামচাঁদের নিকটে মেদিনীপুরে পুত্রের জন্মসংবাদ প্রেরিত হইল। মাতুলের দরিদ্র সংসারে দুগ্ধের অভাব হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি একটি দুগ্ধবতী গাভী প্রেরণ করিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ঐ চিন্তা নিবারণ করিলেন। ঐরূপে নবজাত শিশুর জন্য যখন যে বস্তুর প্রয়োজন হইতে লাগিল, তখনই তাহা নানাদিক হইতে অভাবনীয় উপায়ে পূর্ণ হইলেও শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও

রামচাঁদের গাভীদান

চন্দ্রাদেবীর চিন্তার বিরাম হইল না। এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল।

এদিকে নবজাত বালকের চিত্তাকর্ষণ-শক্তি দিন দিন বর্ধিত হইয়া জনক-জননীর উপরে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, পরন্তু পরিবারস্থ সকলের এবং পল্লী-বাসিনী রমণীগণের উপরেও নিজ আধিপত্য ধীরে ধীরে স্থাপন করিয়া বসিল। পল্লীরমণীগণ অবসরকালে শ্রীমতী চন্দ্রাকে এখন নিত্য দেখিতে আসিতেন এবং কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'তোমার পুত্রটিকে নিত্য দেখিতে ইচ্ছা করে, তা কি করি বল; নিত্যই আসিতে হয়!' নিকটবর্তী গ্রামসকল হইতে আত্মীয়া রমণীগণও ঐ কারণে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দরিদ্র কুটিরে এখন হইতে পূর্বাপেক্ষা ঘন ঘন আসিতে লাগিলেন। এইরূপে সকলের আদরযত্নে সুখপালিত হইয়া নবাগত শিশু ক্রমে পঞ্চমাস অতিক্রম করিল এবং তাহার অন্নপ্রাশনের কাল উপস্থিত হইল।

গদাধরের মোহিনী শক্তি

পুত্রের অন্নপ্রাশনকার্যে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম নিজ অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থাই প্রথমে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, শাস্ত্রবিহিত ক্রিয়া সমাপনপূর্বক ৺রঘুবীরের প্রসাদী অন্ন পুত্রের মুখে প্রদান করিয়া ঐ কার্য শেষ করিবেন এবং তদুপলক্ষে দুই-চারি জন নিকট আত্মীয়কেই নিমন্ত্রণ করিবেন—কিন্তু ঘটনা অন্যরূপ হইয়া দাঁড়াইল। তাঁহার পরম বন্ধু গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার গুপ্ত প্রেরণায় পল্লীর প্রবীণ ব্রাহ্মণ-

অন্নপ্রাশনকালে ধর্মদাস লাহার সাহায্য

সজ্জনগণ আসিয়া তাঁহাকে সহসা ধরিয়া বসিলেন, পুত্রের অন্ন-প্রাশন দিবসে তাঁহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুরোধে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম আপনাকে বিশেষ বিপন্ন জ্ঞান করিলেন। কারণ, পল্লীর সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতেন, এখন তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকে রাখিয়া কাহাকে আমন্ত্রণ করিবেন তাহা তিনি ভাবিয়া পাইলেন না। আবার তাঁহাদিগের সকলকে বলিতে তাঁহার সামর্থ্য কোথায়? সুতরাং 'যাহা করেন ৺রঘুবীর' বলিয়া তিনি শ্রীযুক্ত ধর্মদাসের সহিত পরামর্শ করিয়া ঐ বিষয়ে স্থির করিতে আসিলেন এবং বন্ধুর অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাঁহারই উপর উক্ত কার্যভার প্রদান-পূর্বক গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। শ্রীযুক্ত ধর্মদাসও হৃষ্টচিত্তে অনেকাংশে আপন ব্যয়ে সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া উক্ত কার্য সুসম্পন্ন করিয়া দিলেন। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপে গদাধরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে পল্লীর ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সকল জাতিই শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের কুটিরে আসিয়া ৺রঘুবীরের প্রসাদভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে অনেক দরিদ্র ভিক্ষুকও ঐরূপে পরিতৃপ্তি লাভ করিয়া তাঁহার তনয়ের দীর্ঘজীবন ও মঙ্গলকামনা করিয়া গিয়াছিল।

দিন যাইবার সঙ্গে সঙ্গে গদাধরের বালচেষ্টাসমূহ মধুরতর হইয়া উঠিয়া চন্দ্রাদেবীর হৃদয়কে আনন্দ ও ভয়ের পুণ্য-প্রয়াগে পরিণত করিল। পুত্র জন্মিবার পূর্বে যিনি দেবতাদিগের নিকটে কোন বিষয় প্রার্থনা করিয়া লইবার জন্য ব্যগ্র হইতেন না, সেই তিনিই এখন প্রতিদিন তনয়ের কল্যাণকামনায় শতবার;

সহস্রবার জ্ঞাত ও অজ্ঞাতসারে তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সকরুণ নিবেদন তাঁহাদিগের চরণে অর্পণ করিয়াও সম্পূর্ণ নিশ্চিন্তা হইতে পারিতেন না। ঐরূপে তনয়ের কল্যাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ শ্রীমতী চন্দ্রার ধ্যান-জ্ঞান হইয়া তাঁহার ইতিপূর্বের দিব্যদর্শনশক্তিকে যে এখন ঢাকিয়া ফেলিবে, একথা সহজে বুঝিতে পারা যায়। তথাপি ঐ শক্তির সামান্য প্রকাশ তাঁহাতে এখনও মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কখন বিস্ময়ে এবং কখন বা পুত্রের ভাবী অমঙ্গল-আশঙ্কায় পূর্ণ করিত। ঐ বিষয়ক একটি ঘটনা যাহা আমরা অতি বিশ্বস্তসূত্রে শুনিয়াছি, এখানে বলিলে পাঠক পূর্বোক্ত কথা সহজে বুঝিতে পারিবেন। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল—

চন্দ্রাদেবীর দিব্যদর্শনশক্তির বর্তমান প্রকাশ

গদাধরের বয়ঃক্রম তখন সাত-আট মাস হইবে। শ্রীমতী চন্দ্রা একদিন প্রাতে তাহাকে স্তন্যদানে নিযুক্তা ছিলেন। কিছুক্ষণ পরে পুত্রকে নিদ্রিত দেখিয়া মশক-দংশন হইতে রক্ষা করিবার জন্য তিনি তাহাকে মশারির মধ্যে শয়ন করাইলেন; অনন্তর ঘরের বাহিরে যাইয়া গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিলেন। কিছুকাল গত হইলে প্রয়োজনবশতঃ ঐ ঘরে সহসা প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, মশারির মধ্যে পুত্র নাই, তৎস্থলে এক দীর্ঘকায় অপরিচিত পুরুষ মশারি জুড়িয়া শয়ন করিয়া রহিয়াছে। বিষম আশঙ্কায় চন্দ্রা চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং দ্রুতপদে গৃহের বাহিরে আসিয়া স্বামীকে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তিনি উপস্থিত হইলে তাঁহাকে ঐ

ঐ বিষয়ক ঘটনা—গদাধরকে বড় দেখা

কথা বলিতে বলিতে উভয়ে পুনরায় গৃহে প্রবেশপূর্বক দেখিলেন কেহ কোথাও নাই, বালক যেমন নিদ্রা যাইতেছিল তেমনি নিদ্রা যাইতেছে। শ্রীমতী চন্দ্রার তাহাতেও ভয় দূর হইল না। তিনি পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিলেন, "নিশ্চয়ই কোন উপদেবতা হইতে ঐরূপ হইয়াছে; কারণ আমি স্পষ্ট দেখিয়াছি পুত্রের স্থলে এক দীর্ঘাকার পুরুষ শয়ন করিয়াছিল; আমার কিছুমাত্র ভ্রম হয় নাই এবং সহসা ঐরূপ ভ্রম হইবার কোন কারণও নাই; অতএব শীঘ্র একজন বিজ্ঞ রোজা আনাইয়া সন্তানকে দেখাও, নতুবা কে জানে, এই ঘটনায় পুত্রের কোন অনিষ্ট হইবে কি-না!" শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম তাহাতে তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক কহিলেন, "যে পুত্রের জন্মের পূর্ব হইতে আমরা নানা দিব্যদর্শন লাভে ধন্য হইয়াছি, তাহার সম্বন্ধে এখনও ঐরূপ কিছু দেখা বিচিত্র নহে; অতএব উহা অপদেবতাকৃত—একথা তুমি মনে কখনও স্থান দিও না, বিশেষতঃ, বাটীতে ৺রঘুবীর স্বয়ং বিদ্যমান; উপদেবতাসকল এখানে কি কখন সন্তানের অনিষ্ট করিতে সক্ষম? অতএব নিশ্চিন্ত হও এবং একথা অন্য কাহাকেও আর বলিও না। জানিও ৺রঘুবীর সন্তানকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন।" শ্রীমতী চন্দ্রা স্বামীর ঐরূপ বাক্যে তখন আশ্বস্তা হইলেন বটে, কিন্তু পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কার ছায়া তাঁহার মন হইতে সম্পূর্ণ অপসৃত হইল না। তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহার প্রাণের বেদনা সেদিন অনেকক্ষণ পর্যন্ত কুলদেবতা ৺রঘুবীরকে নিবেদন করিলেন।

ঐরূপে আনন্দে, আবেগে, উৎসাহে, আশঙ্কায় শ্রীযুক্ত গদাধরের জনক-জননীর দিন যাইতে লাগিল এবং বালক প্রথম দিন হইতে তাঁহাদিগের ও অন্য সকলের মনে যে মধুর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, তাহা দিন দিন দৃঢ় ও ঘনীভূত হইতে থাকিল। ক্রমে চারি-পাঁচ বৎসর অতীত হইল; ঘটনার ভিতর ঐ কালের মধ্যে কোন সময়ে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের সর্বমঙ্গলা নাম্নী কনিষ্ঠা কন্যা জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।

গদাধরের কনিষ্ঠা ভগ্নী সর্বমঙ্গলা

বয়োবৃদ্ধির সহিত বালক গদাধরের অদ্ভুত মেধা ও প্রতিভার বিকাশ শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এইকালে বিস্ময় ও আনন্দে অবলোকন করিয়াছিলেন। কারণ চঞ্চল বালককে ক্রোড়ে করিয়া তিনি যখন নিজ পূর্বপুরুষদিগের নামাবলী, দেবদেবীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তোত্র ও প্রণামাদি, অথবা রামায়ণ, মহাভারত হইতে কোন বিচিত্র উপাখ্যান তাহাকে শুনাইতে বসিতেন, তখন দেখিতেন, একবার মাত্র শুনিয়াই সে উহার অধিকাংশ আয়ত্ত করিয়াছে! আবার বহুদিন পরে তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখিতেন, সে ঐসকল সমভাবে আবৃত্তি করিতে সক্ষম। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এবিষয়েও পরিচয় পাইয়াছিলেন যে, বালকের মন কতকগুলি বিষয়কে যেমন আগ্রহের সহিত গ্রহণ ও ধারণা করে, অপর কতকগুলি বিষয়ের সম্বন্ধে আবার তেমনি উদাসীন থাকে—সহস্র চেষ্টাতেও ঐসকলে তাহার অনুরাগ অঙ্কুরিত হয় না। গণিতশাস্ত্রের নামতা প্রভৃতি শিখাইতে যাইয়া তিনি ঐ বিষয়ের আভাস পাইয়া ভাবিয়াছিলেন, চপলমতি

গদাধরের বিদ্যারম্ভ

বালককে এত অল্প বয়সে ঐসকল শিখাইবার জন্য পীড়ন করিবার আবশ্যকতা নাই। কিন্তু সে অত্যধিক চঞ্চল হইতেছে দেখিয়া পঞ্চম বর্ষেই তিনি তাহার যথাশাস্ত্র বিদ্যারম্ভ করাইয়া দিলেন এবং তাহাকে পাঠশালে পাঠাইতে লাগিলেন। বালক তাহাতে সমবয়স্ক সঙ্গীদিগের সহিত পরিচিত হইয়া বিশেষ সুখী হইল এবং সপ্রেম ব্যবহারে শীঘ্রই তাহাদিগের এবং শিক্ষকের প্রিয় হইয়া উঠিল।

লাহাবাবুদের পাঠশালা

গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটীর সম্মুখস্থ বিস্তৃত নাট্যমণ্ডপে পাঠশালার অধিবেশন হইত এবং প্রধানতঃ তাঁহাদিগের ব্যয়েই একজন সরকার বা গুরুমহাশয় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহাদিগের ও নিকটস্থ গৃহস্থসকলের বালকগণকে অধ্যয়ন করাইতেন। ফলতঃ পাঠশালাটি লাহাবাবুরাই একরূপ পল্লীবালকগণের কল্যাণার্থ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের কুটিরের অনতিদূরে অবস্থিত ছিল। প্রাতে ও অপরাহ্নে দুইবার করিয়া প্রতিদিন পাঠশালা খোলা হইত। ছাত্রগণ প্রাতে আসিয়া দুই-তিন ঘণ্টা পাঠ করিয়া স্নানাহার করিতে যে যাহার বাটীতে চলিয়া যাইত এবং অপরাহ্নে তিন-চারি ঘটিকার সময় পুনরায় সমবেত হইয়া সন্ধ্যার পূর্ব পর্যন্ত পাঠাভ্যাস করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিত। গদাধরের ন্যায় তরুণবয়স্ক ছাত্রগণের অবশ্য এত অধিককাল পাঠাভ্যাস করিতে হইত না, কিন্তু তথায় হাজির থাকিতে হইত। সুতরাং পাঠের সময় পাঠাভ্যাস করিয়া তাহারা সেখানে বসিয়া থাকিত এবং কখন বা সঙ্গীদিগের সহিত ঐ স্থানের সন্নিকটে ক্রীড়ায়

রত হইত। পাঠশালার পুরাতন ছাত্রেরা আবার নূতন ছাত্রদিগকে পাঠ বলিয়া দিত এবং তাহারা পুরাতন পাঠ নিত্য অভ্যাস করে কি-না, তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিত।

এইরূপে একজন মাত্র শিক্ষক নিযুক্ত থাকিলেও পাঠশালার কার্য সুচারুরূপে চলিয়া যাইত। গদাধর যখন পাঠশালে প্রথম প্রবেশ করে, তখন শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার তথায় শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলেন। উহার কিছুকাল পরে তিনি নানা কারণে ঐকার্য হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ সরকার নামক এক ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া পাঠশালার কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

বালকের বিচিত্র চরিত্র সম্বন্ধে ক্ষুদিরামের অভিজ্ঞতা

বালকের জন্মিবার পূর্বে তাহার মহৎ জীবনের পরিচায়ক-স্বরূপে শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম যে-সকল অদ্ভুত স্বপ্ন ও দর্শনাদি লাভ করিয়াছিলেন, সেই সকল তাঁহার মনে চিরকালের নিমিত্ত দৃঢ়াঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। সুতরাং বালকসুলভ চপলতায় সে এখন কোনরূপ অশিষ্টাচরণ করিতেছে দেখিলেও তিনি তাহাকে মৃদু-বাক্যে নিষেধ করা ভিন্ন কখনও কঠোরভাবে দমন করিতে সক্ষম হইতেন না। কারণ, সকলের ভালবাসা পাইয়াই হউক বা নিজ স্বভাবগুণেই হউক, তাহাতে তিনি এখন সময়ে সময়ে অনাশ্রবতার পরিচয় পাইয়াছিলেন। কিন্তু ঐজন্য অপর পিতা-মাতাসকলের ন্যায় তাহাকে কখনও তাড়না করা দূরে থাকুক, তিনি ভাবিতেন, উহাই বালককে ভবিষ্যতে বিশেষরূপে উন্নত করিবে। ঐরূপ ভাবিবার যথেষ্ট কারণও বিদ্যমান ছিল।

কারণ, তিনি দেখিতেন, দুরন্ত বালক কখন কখন পাঠশালায় না যাইয়া সঙ্গিগণকে লইয়া গ্রামের বহির্ভাগে ক্রীড়ায় রত থাকিলে অথবা কাহাকেও না বলিয়া নিকটবর্তী কোন স্থলে যাত্রাগান শুনিতে যাইলেও যখন যাহা ধরিত, তাহা সম্পন্ন না করিয়া ক্ষান্ত হইত না ; মিথ্যাসহায়ে নিজকৃত কোন কর্ম কখনও ঢাকিতে প্রয়াস পাইত না এবং সর্বোপরি তাহার প্রেমিক হৃদয় তাহাকে কখনও কাহারও অনিষ্টসাধন করিতে প্রবৃত্ত করিত না। ঐরূপ হইলেও কিন্তু এক বিষয়ের জন্য শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম কিছু চিন্তিত হইয়াছিলেন। তিনি দেখিয়াছিলেন, হৃদয় স্পর্শ করে এমনভাবে কোন কথা না বলিতে পারিলে উহা বিধি বা নিষেধ যাহাই হউক-না-কেন, বালক উহার কিছুমাত্র গ্রহণ করা দূরে থাকুক, সর্বদা তদ্বিপরীতাচরণ করিয়া বসে। উহা তাহার সকল বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসার পরিচায়ক হইলেও সংসারের সর্বত্র বিপরীত রীতির অনুষ্ঠান দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, কেহই বালককে ঐরূপে সকল বিষয়ের কারণ নির্দেশ করিয়া তাহার কৌতূহল পরিতৃপ্ত করিবে না এবং তজ্জন্য অনেক সময়ে তাহার সদ্‌বিধিসকল মান্য না করিয়া চলিবার সম্ভাবনা। এই সময়ের একটি ক্ষুদ্র ঘটনায় শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের মনে বালকের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত চিন্তাসকল উদিত হইয়াছিল এবং এখন হইতে তিনি তাহার মনের ঐরূপ প্রকৃতি বুঝিয়া তাহাকে সতর্কভাবে শিক্ষা প্রদান করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। ঘটনাটি ইহাই—

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের বাটীর একরূপ পার্শ্বেই হালদারপুকুর নামক সুবৃহৎ পুষ্করিণী বিদ্যমান। পল্লীর সকলে উহার স্বচ্ছ

সলিলে স্নান, পান ও রন্ধনাদি কার্য করিত। অবগাহনের জন্য স্ত্রী ও পুরুষদিগের নিমিত্ত দুইটি বিভিন্ন ঘাট নির্দিষ্ট ছিল। গদাধরের ন্যায় তরুণবয়স্ক বালকেরা স্নানার্থ স্ত্রীলোক-দিগের জন্য নির্দিষ্ট ঘাটে অনেক সময়ে গমন করিত। দুই-চারিজন বয়স্যের সহিত গদাধর একদিন ঐ ঘাটে স্নান করিতে আসিয়া জলে উল্লম্ফন-সন্তরণাদি দ্বারা বিষম গণ্ডগোল আরম্ভ করিল। উহাতে স্নানের জন্য সমাগতা স্ত্রীলোকদিগের অসুবিধা হইতে লাগিল। সন্ধ্যাহ্নিককর্মে নিযুক্তা বর্ষীয়সী রমণীগণের অঙ্গে জলের ছিটা লাগায় নিষেধ করিয়াও তাঁহারা বালকদিগকে শান্ত করিতে পারিলেন না। তখন তাঁহাদিগের মধ্যে একজন বিরক্ত হইয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন, "তোরা এ ঘাটে কি করতে আসিস্? পুরুষদিগের ঘাটে যাইতে পারিস্ না? এ ঘাটে স্ত্রীলোকেরা স্নানান্তে পরিধেয় বসনাদি ধৌত করে। জানিস্ না, স্ত্রীলোকদিগকে উলঙ্গিনী দেখিতে নাই?" গদাধর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন দেখিতে নাই?" তিনি তাহাতে সে বুঝিতে পারে, এমন কোন কারণ নির্দেশ না করিয়া তাহাকে অধিকতর তিরস্কার করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিরক্ত হইয়াছেন এবং বাটীতে পিতামাতাকে বলিয়া দিবেন ভাবিয়া বালকগণ তখন অনেকটা নিরস্ত হইল। গদাধর কিন্তু উহাতে মনে মনে অন্যরূপ সঙ্কল্প করিল। সে দুই-তিনদিন রমণীগণের স্নানের সময় পুষ্করিণীর পাড়ে বৃক্ষের আড়ালে লুক্কায়িত থাকিয়া তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিতে লাগিল। অনন্তর পূর্বোক্ত বর্ষীয়সী

ঐ বিষয়ক ঘটনা

রমণীর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহাকে বলিল, "পরশু চারিজন রমণীকে স্নানকালে লক্ষ্য করিয়াছি, কাল ছয়জনকে এবং আজ আটজনকে ঐরূপ করিয়াছি, কিন্তু কই আমার কিছুই তো হইল না।" বর্ষীয়সী রমণী তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর নিকটে আগমনপূর্বক হাসিতে হাসিতে ঐ কথা বলিয়া দিলেন। শ্রীমতী চন্দ্রা তাহাতে গদাধরকে অবসরকালে নিকটে পাইয়া মিষ্টবাক্যে বুঝাইয়া বলিলেন, "ঐরূপ করিলে তোমার কিছু হয় না, কিন্তু রমণীগণ আপনাদিগকে বিশেষ অপমানিতা জ্ঞান করেন, তাঁহারা আমার সদৃশা, তাঁহাদিগকে অপমান করিলে আমাকেই অপমান করা হয়। অতএব আর কখনই ঐরূপে তাঁহাদিগের সম্মানের হানি করিও না। তাঁহাদিগের ও আমার মনে পীড়া দেওয়া কি ভাল?" বালকও তাহাতে বুঝিয়া তদবধি ঐরূপ আচরণ আর কখনও করিল না।

গদাধরের শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার

সে যাহা হউক, পাঠশালে যাইয়া গদাধরের শিক্ষা মন্দ অগ্রসর হইতে লাগিল না। সে অল্পকালের মধ্যেই সামান্যভাবে পড়িতে এবং লিখিতে সমর্থ হইল। কিন্তু অঙ্কশাস্ত্রের উপর তাহার বিদ্বেষ চিরদিন প্রায় সমভাবেই রহিল। অন্যদিকে বালকের অনুকরণ ও উদ্ভাবনী-শক্তি দিন দিন নানা নূতন দিকে প্রসারিত হইতে লাগিল। গ্রামের কুম্ভকারগণকে দেবদেবীর মূর্তি গঠন করিতে দেখিয়া বালক তাহাদিগের নিকট যাতায়াত ও জিজ্ঞাসা করিয়া বাটীতে ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিতে লাগিল, এবং উহা তাহার ক্রীড়ার অন্যতমরূপে পরিগণিত হইল। পটব্যবসায়িগণের সহিত

মিলিত হইয়া সে ঐরূপে চিত্র অঙ্কন করিতে আরম্ভ করিল। গ্রামের কোথাও পুরাণকথা অথবা যাত্রাগান হইতেছে শুনিলেই সে তথায় গমন করিয়া শাস্ত্রোপাখ্যানসকল শিখিতে লাগিল এবং শ্রোতাদিগের নিকটে ঐসকল কিরূপে প্রকাশ করিলে তাহাদিগের বিশেষ প্রীতিকর হয়, তাহা তন্ন তন্ন ভাবে লক্ষ্য করিতে লাগিল। বালকের অপূর্ব স্মৃতি ও মেধা তাহাকে ঐসকল বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিতে লাগিল।

আবার সদানন্দ বালকের রঙ্গরসপ্রিয়তা তাহার অদ্ভুত অনুকরণশক্তিসহায়ে প্রবৃদ্ধ হইয়া একদিকে যেমন তাহাকে নর-নারীর বিশেষ বিশেষ হাবভাব অভিনয় করিতে এই বয়স হইতেই প্রবৃত্ত করিল, অন্যদিকে তেমনি তাহার মনের স্বাভাবিক সরলতা ও দেবভক্তি তাহার জনক-জননীর দৈনন্দিন অনুষ্ঠানসকলের দৃষ্টান্তে দ্রুতপদে উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া চিরজীবন ঐকথা যে কৃতজ্ঞহৃদয়ে স্মরণ ও স্বীকার করিয়াছে, তাহা দক্ষিণেশ্বরে আমাদের নিকটে উক্ত নিম্নলিখিত কথাগুলি হইতে পাঠক বিশেষরূপে প্রণিধান করিতে পারিবেন—'আমার জননী মূর্তিমতী সরলতাস্বরূপা ছিলেন। সংসারের কোন বিষয় বুঝিতেন না; টাকাপয়সা গণনা করিতে জানিতেন না। কাহাকে কোন্ বিষয় বলিতে নাই, তাহা না জানাতে আপনার পেটের কথা সকলের নিকটেই বলিয়া ফেলিতেন, সেজন্য লোকে তাঁহাকে 'হাউড়ো' বলিত এবং তিনি সকলকে আহার করাইতে বড় ভালবাসিতেন। আমার জনক কখনই শূদ্রের দান গ্রহণ করেন নাই; পূজা, জপ, ধ্যানে

দিনের ভিতর অধিককাল যাপন করিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা করিবার কালে 'আয়াহি বরদে দেবি' ইত্যাদি গায়ত্রীর আবাহন উচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহার বক্ষ স্ফীত ও রক্তিম হইয়া উঠিত এবং নয়নের অশ্রুধারায় ভাসিয়া যাইত; আবার, যখন পূজাদিতে নিযুক্ত না থাকিতেন, তখনও তিনি ৺রঘুবীরকে সাজাইবার জন্য সূচ সূতা ও পুষ্প লইয়া মালা গাঁথিয়া সময়ক্ষেপ করিতেন। মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার ভয়ে তিনি পৈতৃক ভিটা ত্যাগ করিয়াছিলেন। গ্রামের লোকে তাঁহাকে ঋষির ন্যায় মান্য ভক্তি করিত।"

বালকের সাহস

বালকের অসীম সাহসের পরিচয়ও দিন দিন পাওয়া যাইতেছিল। বয়োবৃদ্ধেরাও যেখানে ভূত-প্রেতাদির ভয়ে জড়-সড় হইত, বালক সেখানে অকুতোভয়ে গমনা-গমন করিত। তাহার পিতৃষ্বসা শ্রীমতী রামশীলার উপর কখন কখন ৺শীতলাদেবীর ভাবাবেশ হইত। তখন তিনি যেন ভিন্ন এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন। কামারপুকুরে ভ্রাতার নিকটে এই সময়ে অবস্থানকালে একদিন তাঁহার সহসা ঐরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া পরিবারস্থ সকলের মনে ভয় ও ভক্তির উদয় করিয়াছিল। তাঁহার ঐরূপ অবস্থা শ্রদ্ধার সহিত সন্দর্শন করিলেও কিন্তু গদাধর উহাতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হয় নাই। সে তাঁহার সন্নিকটে অবস্থানপূর্বক তন্ন তন্ন করিয়া তাঁহার ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়াছিল এবং পরে বলিয়াছিল, "পিসীমার ঘাড়ে যে আছে, সে যদি আমার ঘাড়ে চাপে তো বেশ হয়।"

কামারপুকুরের অর্ধক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ভূরস্থবো অথবা ভূরশোভা নামক গ্রামের বিশিষ্ট দাতা ও ভক্ত জমিদার মানিক-রাজার কথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্বে বলিয়াছি। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ধর্মপরায়ণতায় আকৃষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার সহিত বিশেষ সৌহৃদ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। ছয় বৎসরের বালক গদাধর পিতার সহিত একদিন মানিকরাজার বাটীতে যাইয়া সকলের প্রতি এমন চিরপরিচিতের ন্যায় নিঃসঙ্কোচে মধুর ব্যবহার করিয়াছিল যে, সেইদিন হইতেই সে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল। মানিকরাজার ভ্রাতা শ্রীযুক্ত রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় সেদিন বালককে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামকে বলিয়াছিলেন, "সখা, তোমার এই পুত্রটি সামান্য নহে, ইহাতে দেব-অংশ বিশেষভাবে বিদ্যমান বলিয়া জ্ঞান হয়! তুমি যখন এদিকে আসিবে, বালককে সঙ্গে লইয়া আসিও, উহাকে দেখিলে পরম আনন্দ হয়।" শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ইহার পরে নানা কারণে মানিকরাজার বাটীতে কিছুদিন যাইতে পারেন নাই। মানিকরাজা উহাতে নিজ পরিবারস্থ একজন রমণীকে সংবাদ লইতে এবং সুস্থ থাকিলে গদাধরকে কিছুক্ষণের জন্য ভূরস্থবো গ্রামে আনয়ন করিতে পাঠান। বালক তাহাতে পিতার আদেশে সানন্দে উক্ত রমণীর সহিত আগমন করিয়াছিল এবং সমস্ত দিবস তথায় থাকিয়া সন্ধ্যার পূর্বে নানাবিধ মিষ্টান্ন এবং কয়েকখানি অলঙ্কার উপহার লইয়া কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিল। গদাধর ক্রমে এই ব্রাহ্মণ-পরিবারের এত প্রিয় হইয়া উঠে যে, তাহাকে সঙ্গে লইয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভূরস্থবো যাইতে কয়েক দিন

বালকের অপরের সহিত মিলিত হইবার শক্তি

বিলম্ব করিলেই তাঁহারা লোক পাঠাইয়া তাহাকে লইয়া যাইতেন। ঐরূপে দিন, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া বালক ক্রমে সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিল এবং শৈশবের মাধুর্য ঘনীভূত হইয়া তাহাকে এখন দিন দিন সকলের অধিকতর প্রিয় করিয়া তুলিল। পল্লীবাসিনী রমণীগণ বাটীতে কোনরূপ সুখাদ্য প্রস্তুত করিবার সময় তাহাকে উহার কিয়দংশ কেমন করিয়া ভোজন করাইবেন সেই কথাই অগ্রে চিন্তা করিতেন, সমবয়স্ক বালক-বালিকাগণ তাহাদিগের ভোজ্যাংশ তাহার সহিত ভাগ করিয়া খাইয়া আপনাদিগকে অধিকতর পরিতৃপ্ত বোধ করিত এবং প্রতিবেশী সকলে তাহার মধুর কথা, সঙ্গীত ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাহার বালকসুলভ দৌরাত্মসকল হৃষ্টচিত্তে সহ্য করিত। এই কালের একটি ঘটনায় বালক তাহার জনকজননী এবং বন্ধুবর্গকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়াছিল। ঈশ্বর-কৃপায় গদাধর সুস্থ ও সবল শরীর লইয়া সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াছিল এবং জন্মাবধি একাল পর্যন্ত তাহার বিশেষ কোনও ব্যাধি হয় নাই। বালক সেজন্য গগনচারী বিহঙ্গের ন্যায় অপূর্ব স্বাধীনতা ও চিত্তপ্রসাদে দিন যাপন করিত। শরীরবোধরাহিত্যই পূর্ণ স্বাস্থ্যের লক্ষণ বলিয়া প্রসিদ্ধ ভিষকগণ নির্দেশ করিয়া থাকেন। বালক জন্মাবধি ঐরূপ স্বাস্থ্যসুখ অনুভব করিতেছিল। তদুপরি তাহার স্বাভাবিক একাগ্র চিত্ত বিষয়বিশেষে যখন নিবিষ্ট হইত, তখন তাহার শরীরবুদ্ধির অধিকতর হ্রাস হইয়া তাহাকে যেন এককালে ভাবময় করিয়া তুলিত। বিশুদ্ধ-বায়ু-আন্দোলিত প্রান্তরের হরিৎ-সুন্দর ছবি,

গদাধরের ভাবুকতার অসাধারণ পরিণাম

নদীর অবিরাম প্রবাহ, বিহঙ্গের কলগান এবং সর্বোপরি সুনীল অম্বর ও তন্মধ্যগত প্রতিক্ষণ-পরিবর্তনশীল অভ্রপুঞ্জের মায়ারাজ্য প্রভৃতি যখন যে পদার্থ আপন রহস্যময় প্রতিকৃতি তাহার মনের সম্মুখে আপন মহিমা প্রসারিত করিয়া উহাকে আকৃষ্ট করিত, বালক তখনই তাহাকে লইয়া আত্মহারা হইয়া ভাব-রাজ্যের কোন এক সুদূর নিভৃত প্রদেশে প্রবিষ্ট হইত! বর্তমান ঘটনাটিও তাহার ভাবপ্রবণতা হইতে উপস্থিত হইয়াছিল।* প্রান্তরমধ্যে যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিতে করিতে বালক নবজলধর-ক্রোড়ে বলাকাশ্রেণীর শ্বেতপক্ষবিস্তারপূর্বক সুন্দর স্বাধীন পরিভ্রমণ দেখিয়া এতদূর তন্ময় হইয়াছিল যে, তাহার নিজ শরীরের ও জাগতিক অন্য সকল পদার্থের বোধ এককালে লোপ হইয়াছিল এবং সংজ্ঞাশূন্য হইয়া সে প্রান্তর-পথে পড়িয়া গিয়াছিল। বয়স্যগণ তাহার ঐরূপ অবস্থা দর্শনে ভীত ও বিপন্ন হইয়া তাহার জনক-জননীকে সংবাদ প্রদান করে এবং তাহাকে ধরাধরি করিয়া প্রান্তর হইতে বাটীতে তুলিয়া লইয়া যাওয়া হয়। চেতনালাভের কিছুক্ষণ পরেই কিন্তু সে আপনাকে পূর্বের ন্যায় সুস্থ বোধ করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী যে এই ঘটনায় বিষম ভাবিত হইয়াছিলেন এবং আর যাহাতে তাহার ঐরূপ অবস্থা না হয়, সেজন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। ফলতঃ তাঁহারা উহাতে বালকের মূর্ছারূপ বিষম ব্যাধির সূচনা অবলোকন করিয়া ঔষধাদি-প্রয়োগে

* ঠাকুর এই ঘটনাসম্বন্ধে নিজমুখে যেরূপ বলিয়াছিলেন তজ্জন্য 'সাধকভাব, দ্বিতীয় অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

এবং শান্তিস্বস্ত্যয়নাদিতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। বালক গদাধর কিন্তু তাঁহাদিগকে ঐ ঘটনাসম্বন্ধে পুনঃপুনঃ বলিয়াছিল, তাহার মন এক অভিনব অদৃষ্টপূর্ব ভাবে লীন হইয়াছিল বলিয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছিল এবং বাহিরে অন্তরূপ দেখিলেও তাহার ভিতরে সংজ্ঞা এবং একপ্রকার অপূর্ব আনন্দের বোধ ছিল। সে যাহা হউক, তাহার ঐরূপ অবস্থা তখন আর না হওয়াতে এবং তাহার স্বাস্থ্যের কোনরূপ ব্যতিক্রম না দেখিয়া শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ভাবিয়াছিলেন, উহা কোনরূপ বায়ুর প্রকোপে সাময়িক উপস্থিত হইয়াছিল, এবং শ্রীমতী চন্দ্রা স্থিরনিশ্চয় করিয়াছিলেন, উপদেবতার নজর লাগিয়া তাহার ঐরূপ হইয়াছিল। কিন্তু ঐ ঘটনার জন্য তাঁহারা বালককে পাঠশালায় কিছুকাল যাইতে দেন নাই। বালক তাহাতে প্রতিবেশিগণের গৃহে এবং গ্রামের সর্বত্র যদৃচ্ছা পরিভ্রমণ করিয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর ক্রীড়াকৌতুকপরায়ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

ঐরূপে বালকের সপ্তম বর্ষের অর্ধেক কাল অতীত হইয়া ক্রমে সন ১২৪৯ সালের শারদীয়া মহাপূজার সময় উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের কৃতী ভাগিনেয় রামচাঁদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। কর্মস্থল বলিয়া মেদিনীপুরে বৎসরের অধিক সময় অতিবাহিত করিলেও সেলামপুর নামক গ্রামেই তাঁহার পৈতৃক বাসস্থান ছিল; এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ঐ স্থানেই বাস করিত। শ্রীযুক্ত রামচাঁদ ঐ গ্রামে প্রতিবৎসর শারদীয়া মহাপূজার অনুষ্ঠান করিয়া অনেক

রামচাঁদের বাটীতে ৺দুর্গোৎসব

টাকা ব্যয় করিতেন। হৃদয়রামের নিকট শুনিয়াছি, পূজার সময় রামচাঁদের সেলামপুরের ভবন অষ্টাহকাল গীতবাদ্যে মুখরিত হইয়া থাকিত এবং ব্রাহ্মণভোজন, পণ্ডিতবিদায়, দরিদ্রভোজন ও তাহাদিগকে বস্ত্রদান প্রভৃতি কার্যে তথায় আনন্দের স্রোত ঐকালে নিরন্তর প্রবাহিত হইত। শ্রীযুক্ত রামচাঁদ এতদুপলক্ষে তাঁহার পরম শ্রদ্ধাস্পদ মাতুলকে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া এই সময়ে কিছুকাল তাঁহার সহিত আনন্দে অতিবাহিত করিতেন। বর্তমান বৎসরেও শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম ও তাঁহার পরিবারবর্গ রামচাঁদের সাদর নিমন্ত্রণ যথাসময়ে প্রাপ্ত হইলেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম এখন অষ্টষষ্টিতমবর্ষ প্রায় অতিক্রম করিতে বসিয়াছেন এবং কিছুকাল পূর্ব হইতে মধ্যে মধ্যে অজীর্ণ ও গ্রহণীরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার সুদৃঢ় শরীর এখন বলহীন হইয়াছিল। সেজন্য প্রিয় ভাগিনেয় রামচাঁদের সাদরাহ্বানে তাঁহার ভবনে যাইতে ইচ্ছা হইলেও তিনি ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। নিজ দরিদ্র কুটির এবং পরিবারবর্গকে, বিশেষতঃ গদাধরকে কয়েক দিনের জন্য ছাড়িয়া যাইতেও তিনি অন্তরে একটা কারণশূন্য অথচ প্রবল অনিচ্ছা অনুভব করিতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, শরীর যেরূপ দুর্বল হইয়া পড়িতেছে, তাহাতে এ বৎসর না যাইলে আর কখনও যাইতে পারিবেন কিনা তাহা কে বলিতে পারে? অতএব স্থির করিলেন, গদাধরকে সঙ্গে লইয়া যাইবেন। পরক্ষণে নিশ্চয় করিলেন, গদাধরকে সঙ্গে লইলে শ্রীমতী চন্দ্রা বিশেষ উদ্বিগ্না থাকিবেন। অগত্যা

ক্ষুদিরাম ও রামকুমারের রামচাঁদের বাটীতে গমন

জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের সহিত যাইয়া পূজার কয়টা দিন রামচাঁদের নিকটে কাটাইয়া আসিবেন, ইহাই স্থির করিলেন এবং ৺রঘুবীরকে প্রণামপূর্বক সকলের নিকট বিদায়গ্রহণ এবং গদাধরের মুখচুম্বন করিয়া তিনি পূজার কিছুদিন পূর্বে সেলামপুর যাত্রা করিলেন। রামচাঁদ পূজাই মাতুল ও ভ্রাতা রামকুমারকে নিকটে পাইয়া বিশেষ আনন্দলাভ করিলেন।

এখানে পৌঁছিবার পরেই কিন্তু শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের গ্রহণীরোগ পুনরায় দেখা দিল এবং তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। ষষ্ঠী, সপ্তমী ও অষ্টমী দিন মহানন্দে কাটিয়া গেল, কিন্তু নবমীর দিনে আনন্দের হাটে নিরানন্দ উপস্থিত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ব্যাধি প্রবলভাব ধারণ করিল। রামচাঁদ উপযুক্ত বৈদ্যগণ আনিয়া এবং ভগ্নী হেমাঙ্গিনী ও রামকুমারের সাহায্যে সযত্নে তাঁহার সেবা করিতে লাগিলেন। কিন্তু পূর্ব হইতে সঞ্চিত রোগের উপশম হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। নবমীর দিন ও রাত্রি কোনরূপে কাটিয়া যাইয়া হিন্দুর বিশেষ পবিত্র সম্মেলনের দিন বিজয়াদশমী সমাগত হইল। শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম অদ্য এত দুর্বল হইয়া পড়িলেন যে, বাঙ্‌নিষ্পত্তি করা তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিল।

ক্ষুদিরামের ব্যাধি ও দেহত্যাগ

ক্রমে অপরাহ্ন সমাগত হইলে রামচাঁদ প্রতিমা বিসর্জন-পূর্বক সত্বর মাতুলের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলেন তাঁহার অন্তিমকাল উপস্থিতপ্রায়। তিনি জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরাম অনেকক্ষণ হইতে নির্বাক হইয়া ঐরূপ

জ্ঞানশূন্যের ন্যায় পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন রামচাঁদ অশ্রুবিসর্জন করিতে করিতে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "মামা, তুমি যে সর্বদা 'রঘুবীর, রঘুবীর' বলিয়া থাক, এখন বলিতেছ না কেন?" ঐ নাম শ্রবণ করিয়া সহসা শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের চৈতন্য হইল। তিনি ধীরে ধীরে কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কে, রামচাঁদ? প্রতিমাবিসর্জন করিয়া আসিলে। তবে আমাকে একবার বসাইয়া দাও।" অনন্তর রামচাঁদ, হেমাঙ্গিনী ও রামকুমার তাঁহাকে ধরাধরি করিয়া অতি সন্তর্পণে শয্যায় উপবেশন করাইয়া দিবামাত্র তিনি গম্ভীরস্বরে তিনবার ৺রঘুবীরের নামোচ্চারণপূর্বক দেহত্যাগ করিলেন। বিন্দু সিন্ধুর সহিত মিলিত হইল—৺রঘুবীর ভক্তের পৃথক জীবনবিন্দু নিজ অনন্ত জীবনে সম্মিলিত করিয়া তাহাকে অমর ও পূর্ণ শান্তির অধিকারী করিলেন। পরে গভীর নিশীথে উচ্চ সঙ্কীর্তনে গ্রাম মুখরিত হইয়া উঠিল এবং শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেহ নদীকূলে আনীত হইলে উহাতে অগ্নিসংস্কার করা হইল। পরদিন ঐ সংবাদ অগ্রসর হইয়া কামারপুকুরের আনন্দধাম নিরানন্দে পূর্ণ করিল।

অনন্তর অশৌচান্তে শ্রীযুক্ত রামকুমার শাস্ত্রবিধানে বৃষোৎসর্গ এবং বহু ব্রাহ্মণভোজন করাইয়া পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পূর্ণ করিলেন। শুনা যায়, মাতুলের শ্রাদ্ধক্রিয়ায় শ্রীযুক্ত রামচাঁদ পাঁচ শত টাকা সাহায্য করিয়াছিলেন।

সপ্তম অধ্যায়

গদাধরের কৈশোরকাল

শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেহাবসানে তাঁহার পরিবারবর্গের জীবনে বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত হইল। বিধাতার বিধানে শ্রীমতী চন্দ্রা দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বৎসর সুখে দুঃখে তাঁহাকে জীবন-সহচররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, অতএব তাঁহাকে হারাইয়া তিনি যে এখন জগৎ শূন্য দেখিবেন এবং প্রাণে একটা চিরস্থায়ী অভাব প্রতিক্ষণ অনুভব করিবেন, ইহা বলিতে হইবে না। সুতরাং শ্রীশ্রীরঘুবীরের পাদপদ্মে শরণগ্রহণে চিরাভ্যস্ত তাঁহার মনের গতি এখন সংসার ছাড়িয়া সেইদিকেই নিরন্তর প্রবাহিত থাকিল। কিন্তু মন ছাড়িতে চাহিলেও যতদিন না কাল পূর্ণ হয়, ততদিন সংসার তাঁহাকে ছাড়িবে কেন? সাত বৎসরের পুত্র গদাধর এবং চারি বৎসরের কন্যা সর্বমঙ্গলার চিন্তার ভিতর দিয়া প্রবেশলাভ করিয়া আবার সংসার তাঁহাকে দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখে ধীরে ধীরে ফিরাইয়া আনিতে লাগিল। সুতরাং ৺রঘুবীরের সেবায় এবং কনিষ্ঠ পুত্রকন্যার পালনে নিযুক্তা থাকিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার দুঃখের দিন কোনরূপে কাটিতে লাগিল।

ক্ষুদিরামের মৃত্যুতে তৎ-পরিবারবর্গের জীবনে যে-সকল পরিবর্তন উপস্থিত হইল

অন্যদিকে পিতৃবৎসল রামকুমারের স্কন্ধে এখন সংসারের সমগ্র

ভার পতিত হওয়ায় তাঁহার বৃথা শোকে কালক্ষেপ করিবার অবসর রহিল না। শোকসন্তপ্তা জননী এবং তরুণবয়স্ক ভ্রাতা ও ভগ্নী যাহাতে কোনরূপ অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট না পায়, অষ্টাদশবর্ষীয় মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর যাহাতে স্মৃতি ও জ্যোতিষাদি অধ্যয়ন শেষ করিয়া উপার্জনক্ষম হইয়া সংসারে সাহায্য করিতে পারে, স্বয়ং যাহাতে পূর্বাপেক্ষা আয়বৃদ্ধি করিয়া পারিবারিক অবস্থার উন্নতি-সাধন করিতে পারেন—ঐরূপ শত চিন্তা ও কার্যে ব্যাপৃত থাকিয়া তাঁহার এখন দিন যাইতে লাগিল। তাঁহার কর্মকুশলা গৃহিণীও চন্দ্রাদেবীকে অসমর্থা দেখিয়া পরিবারবর্গের আহারাদি এবং অন্যান্য গৃহকর্মের বন্দোবস্তের অধিকাংশ ভার গ্রহণ করিলেন।

ঐ ঘটনায় গদাধরের মনের অবস্থা

বিজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, শৈশবে মাতৃবিয়োগ, কৈশোরে পিতৃ-বিয়োগ এবং যৌবনে স্ত্রীবিয়োগ জীবনে যত অভাব আনয়ন করে এত বোধ হয় অন্য কোন ঘটনা করে না। মাতার আদরযত্নই শৈশবে প্রধান অবলম্বন থাকে, সেজন্য পিতার দেহান্ত হইলেও শিশু তাঁহার অভাব তখন উপলব্ধি করে না। কিন্তু বুদ্ধির উন্মেষের সহিত কৈশোরে উপস্থিত হইয়া সেই শিশু যখন পিতার অমূল্য ভালবাসার দিন দিন পরিচয়লাভ করিতে থাকে, স্নেহময়ী জননী তাহার যে-সকল অভাব পূর্ণ করিতে অসমর্থা, পিতার দ্বারা সেই সকল অভাব মোচিত হইয়া তাহার হৃদয় যখন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, সে-সময়ে পিতৃবিয়োগ উপস্থিত হইলে তাহার জীবনে অভাববোধের পরিসীমা

থাকে না। পিতৃবিয়োগে গদাধরের ঐরূপ হইয়াছিল। প্রতিদিন নানা ক্ষুদ্র ঘটনা তাহাকে পিতার অভাব স্মরণ করাইয়া তাহার অন্তরের অন্তর বিষাদের গাঢ় কালিমায় সর্বদা রঞ্জিত করিয়া রাখিত। কিন্তু তাহার হৃদয় ও বুদ্ধি এই বয়সেই অন্যাপেক্ষা অধিক পরিপক্ক হওয়ায় মাতার দিকে চাহিয়া সে উহা বাহিরে কখনও প্রকাশ করিত না। সকলে দেখিত, বালক পূর্বের ন্যায় সদানন্দে হাস্য-কৌতুকাদিতে কালযাপন করিতেছে। ভূতির খালের শ্মশান, মানিকরাজার আম্রকানন প্রভৃতি গ্রামের জনশূন্য স্থানসকলে তাহাকে কখন কখন একাকী বিচরণ করিতে দেখিলেও বালসুলভ চপলতা ভিন্ন অন্য কোন কারণে সে তথায় উপস্থিত হইয়াছে, একথা কাহারও মনে উদয় হইত না। বালক কিন্তু এখন হইতে চিন্তাশীল ও নির্জনপ্রিয় হইয়া উঠিতে এবং সংসারের সকল ব্যক্তিকে তাহার চিন্তার বিষয় করিয়া তাহাদিগের আচরণ তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল।

চন্দ্রাদেবীর প্রতি গদাধরের বর্তমান আচরণ

সমসমান অভাববোধই মানবকে সংসারে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিয়া থাকে। সেইজন্যই বোধ হয় বালক তাহার মাতার প্রতি এখন একটা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়াছিল। সে পূর্বাপেক্ষা অনেক সময় এখন তাঁহার নিকটে থাকিতে এবং দেবসেবা ও গৃহকর্মাদিতে তাঁহাকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। সে নিকটে থাকিলে জননী নিজ জীবনের অভাববোধ

যে অনেকটা ভুলিয়া থাকেন, একথা লক্ষ্য করিতে বালকের বিলম্ব হয় নাই। কিন্তু মাতার প্রতি বালকের আচরণ এখন কিছু ভিন্নাকার ধারণ করিয়াছিল। কারণ, পিতার মৃত্যুর পর বালক কোন বিষয়লাভের জন্য চন্দ্রাদেবীকে পূর্বের ন্যায় আবদার করিয়া কখনও ধরিত না। সে বুঝিত, জননী ঐ বিষয়-দানে অসমর্থা হইলে তাঁহার শোকাগ্নি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষ যন্ত্রণা অনুভব করাইবে। ফলতঃ, পিতৃবিয়োগে মাতাকে সর্বদা রক্ষা করিবার ভাব তাহার হৃদয়ে জাগরিত হইয়া উঠিল।

গদাধর পাঠশালায় যাইয়া পূর্বের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করিতে থাকিল, কিন্তু পুরাণ-কথা ও যাত্রাগান শ্রবণ করা এবং দেব-দেবীর মূর্তিসকল গঠন করা তাহার নিকট এখন অধিকতর প্রিয় হইয়া উঠিল। পিতার অভাববোধ ঐ সকল বিষয়ের আনুকূল্যে অনেকাংশে বিস্মৃত হইতে পারা যায় দেখিয়াই বোধ হয় সে উহাদিগকে এখন বিশেষরূপে অবলম্বন করিয়াছিল। বালকের অসাধারণ স্বভাব তাহাকে এইকালে অন্য এক অভিনব বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়াছিল। গ্রামের অগ্নিকোণে পুরী যাইবার পথের উপর জমিদার লাহাবাবুরা যাত্রীদের সুবিধার জন্য একটি পান্থনিবাস প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ৺জগন্নাথদর্শনে যাইবার ও তথা হইতে আসিবার কালে সাধু-বৈরাগীরা অনেক সময় উহাতে আশ্রয় গ্রহণপূর্বক গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন। গদাধর সংসারের অনিত্যতার কথা ইতিপূর্বে

গদাধরের এই কালের চেষ্টা ও সাধুদিগের সহিত মিলন

শ্রবণ করিয়াছিল এবং পিতার মৃত্যুতে ঐ বিষয়ের সাক্ষাৎ পরিচয়ও এখন লাভ করিয়াছিল। সাধু-বৈরাগীরা অনিত্য সংসার পরিত্যাগপূর্বক শ্রীভগবানের দর্শনাকাঙ্ক্ষী হইয়া কালযাপন করেন এবং সাধুসঙ্গ মানবকে চরম শান্তিদানে কৃতার্থ করে, পুরাণমুখে একথা জানিয়া বালক সাধুদিগের সহিত পরিচিত হইবার আশায় উক্ত পান্থনিবাসে এখন হইতে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিতে লাগিল। প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে ধুনিমধ্যগত পবিত্র অগ্নি উজ্জ্বল করিয়া তাঁহারা যেভাবে ভগবদ্ধ্যানে নিমগ্ন হন, ভিক্ষালব্ধ সামান্য আহার নিজ ইষ্টদেবতাকে নিবেদনপূর্বক যেভাবে তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে প্রসাদগ্রহণ করেন, ব্যাধির প্রবল প্রকোপে পড়িলে যেভাবে তাঁহারা শ্রীভগবানের মুখাপেক্ষী থাকিয়া উহা অকাতরে সহ্য করিতে চেষ্টা করেন, আপনার বিশেষ প্রয়োজনসিদ্ধির জন্যও তাঁহারা যেভাবে কাহাকেও উদ্বিগ্ন করিতে পরাঙ্মুখ হন, আবার তাঁহাদিগের ন্যায় বেশভূষাকারী ভণ্ড ব্যক্তিগণ যেভাবে সর্বপ্রকার সদাচারের বিপরীতাচরণ করিয়া স্বার্থসুখসাধনের নিমিত্ত জীবনধারণ করে—ঐসমস্ত বিষয় বালকের এখন অবসরকালে লক্ষ্যের বিষয় হইল। ক্রমে সে যথার্থ সাধুগণকে দেখিলে রন্ধনাদির জন্য কাষ্ঠসংগ্রহ, পানীয় জল আনয়ন প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কার্যে সহায়তা করিয়া তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিতে লাগিল। তাঁহারাও প্রিয়দর্শন বালকের মধুর আচরণে পরিতৃপ্ত হইয়া তাহাকে ভগবদ্ভজন শিখাইতে, নানাভাবে সদুপদেশ প্রদান করিতে এবং প্রসাদী ভিক্ষান্নের কিয়দংশ তাহাকে দিয়া তাহার সহিত মিলিত

হইয়া ভোজন করিতে আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। অবশ্য যেসকল সাধু পান্থনিবাসে কোন কারণে অধিককাল বাস করিতেন, তাঁহাদিগের সহিতই বালক ঐভাবে মিশিতে সমর্থ হইত।

গদাধরের অষ্টমবর্ষ বয়ঃক্রমকালে কয়েকজন সাধু অত্যধিক পথশ্রমনিবারণের জন্য অথবা অন্য কোন কারণে লাহাবাবুদের পান্থনিবাসে ঐরূপে অধিককাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বালক তাঁহাদিগের সহিত পূর্বোক্তভাবে মিলিত হইয়া শীঘ্রই তাঁহা-দিগের প্রিয় হইয়া উঠিল। তাঁহাদিগের সহিত তাহার ঐরূপে মিলিত হইবার কথা প্রথম প্রথম কেহই জানিতে পারিল না, কিন্তু বালক যখন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ হইয়া তাঁহাদিগের সহিত অধিককাল কাটাইতে লাগিল, তখন ঐ কথা কাহারও জানিতে বাকি রহিল না। কারণ, কোন কোন দিন সে তাঁহাদিগের নিকটে প্রচুর আহার করিয়া বাটীতে ফিরিয়া আর কিছুই খাইল না এবং চন্দ্রাদেবী কারণ জিজ্ঞাসা করায় তাঁহাকে সমস্ত কথা নিবেদন করিল। শ্রীমতী চন্দ্রা উহাতে প্রথম প্রথম উদ্বিগ্না হইলেন না, বালকের প্রতি সাধুগণের প্রসন্নতা আশীর্বাদস্বরূপে গ্রহণ করিয়া তিনি তাহাকে দিয়া তাঁহাদিগকে প্রচুর খাদ্যদ্রব্যাদি পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু বালক যখন পরে কোনদিন বিভূতিভূষিতাঙ্গ হইয়া, কোনদিন তিলক ধারণ, আবার কোনদিন বা নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন করিয়া সাধু-দিগের ন্যায় কৌপীন ও বহির্বাস পরিয়া গৃহে ফিরিয়া 'মা,

সাধুদিগের সহিত মিলনে চন্দ্রাদেবীর আশঙ্কা ও তন্নিরসন

সাধুরা আমাকে কেমন সাজাইয়া দিয়াছেন, দেখ' বলিয়া তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন চন্দ্রাদেবীর মন বিষম উদ্বিগ্ন হইল। তিনি ভাবিলেন, সাধুরা তাঁহার পুত্রকে কোনও দিন ভুলাইয়া সঙ্গে লইয়া যাইবে না তো? উক্ত আশঙ্কার কথা গদাধরকে বলিয়া তিনি একদিন নয়নাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন। বালক উহাতে তাঁহাকে নানাভাবে আশ্বস্তা করিয়াও শান্ত করিতে পারিল না। তখন সাধুদিগের নিকটে আর কখন যাইবে না বলিয়া সে মনে মনে সঙ্কল্প করিল এবং জননীকে ঐকথা বলিয়া নিশ্চিন্তা করিল। অনন্তর পূর্বোক্ত সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার পূর্বে গদাধর শেষ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্য সাধুদিগের নিকটে উপস্থিত হইল এবং ঐরূপ করিবার কারণ জিজ্ঞাসিত হইলে জননীর আশঙ্কার কথা নিবেদন করিল। তাঁহারা তাহাতে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে বালকের সহিত আগমনপূর্বক তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া বলিলেন যে, গদাধরকে ঐরূপ সঙ্গে লইবার সঙ্কল্প তাঁহাদিগের মনে কখনও উদিত হয় নাই এবং পিতামাতার অনুমতি ব্যতিরেকে ঐরূপ অল্পবয়স্ক বালককে সঙ্গে লওয়া তাঁহারা অপহরণরূপ সাধুবিগর্হিত বিষম অপরাধ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকেন। চন্দ্রাদেবীর মনে তাহাতে পূর্বাশঙ্কার ছায়ামাত্র রহিল না এবং সাধুদিগের প্রার্থনায় তিনি বালককে তাঁহাদিগের নিকটে পূর্বের ন্যায় যাইতে অনুমতি প্রদান করিলেন।

এইকালের অন্য একটি ঘটনাতেও শ্রীমতী চন্দ্রা গদাধরের জন্য বিষম চিন্তিতা হইয়াছিলেন। ঐ ঘটনা সহসা উপস্থিত

হইয়াছে বলিয়া সকলে ধারণা করিলেও বুঝা যায়, বালকের ভাবপ্রবণতা এবং চিন্তাশীলতা প্রবৃদ্ধ হইয়াই উহাকে আনয়ন করিয়াছিল। কামারপুকুরের একক্রোশ আন্দাজ উত্তরে অবস্থিত আনুড় নামক গ্রামের সুপ্রসিদ্ধা দেবী ৺বিশালাক্ষীকে একদিন দর্শন করিতে যাইয়া পথিমধ্যে সে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া গিয়াছিল। ধর্মদাস লাহার পূতস্বভাবা কন্যা শ্রীমতী প্রসন্নময়ী সেদিন বালকের ঐরূপ অবস্থা ভাবাবেশে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন। চন্দ্রাদেবী কিন্তু ঐকথা বিশ্বাস না করিয়া উহা বায়ুরোগ হইতে বা অন্য কোন কারণে হইয়াছে বলিয়া চিন্তিতা হইয়াছিলেন।* বালক কিন্তু এবারও পূর্বের ন্যায় বলিয়াছিল যে, ৺দেবীর চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে মন লয় হইয়াই তাহার ঐরূপ অবস্থার উদয় হইয়াছিল।

গদাধরের দ্বিতীয়বার ভাবসমাধি

ঐরূপে দুই বৎসরের অধিককাল অপগত হইল এবং বালক ক্রমে পিতার অভাব ভুলিয়া নিজ দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখে ব্যাপৃত থাকিতে অভ্যস্ত হইল। গদাধরের পিতৃবন্ধু শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। তাঁহার পুত্র গয়াবিষ্ণুর সহিত বালকের এই-কালে সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। একত্র পাঠ ও বিহারে বালকদ্বয় পরস্পরের প্রতি আসক্ত হইয়া ক্রমে পরস্পরকে সেঙাত বলিয়া সম্বোধন করিতে আরম্ভ করিল ও

গদাধরের সেঙাত গয়াবিষ্ণু

---

* এই ঘটনার সবিস্তার বৃত্তান্তের জন্য 'সাধকভাব—২য় অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

প্রতিদিন অনেক সময় একত্র কাটাইতে লাগিল এবং পল্লী-বাসিনী রমণীগণ গদাধরকে পূর্বের ন্যায় স্নেহে বাটীতে আহ্বান ও ভোজন করাইবার কালে সে এখন নিজ সেঙাতকে সঙ্গে লইতে কখন ভুলিত না। বালকের ধাত্রী কামারকন্যা ধনী মিষ্টান্ন-মোদকাদি সযত্নে প্রস্তুত করিয়া তাহাকে উপহার প্রদান করিলে সে সেঙাতকে উহার অংশ প্রদান না করিয়া কখনও ভোজন করিত না। বলা বাহুল্য, শ্রীযুক্ত ধর্মদাস এবং গদাধরের অভিভাবকেরা বালকদ্বয়ের মধ্যে ঐরূপ সখ্য দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

সে যাহা হউক, গদাধর নবম বর্ষ উত্তীর্ণ হইতে চলিয়াছে দেখিয়া শ্রীযুক্ত রামকুমার এখন তাহার উপনয়নের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। কামারকন্যা ধনী ইতিপূর্বে এক সময়ে বালকের নিকটে প্রার্থনা করিয়াছিল, সে যেন উপনয়নকালে তাহার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া তাহাকে মাতৃসম্বোধনে কৃতার্থ করে।

গদাধরের উপনয়নকালের বৃত্তান্ত

বালকও তাহাতে তাহার অকৃত্রিম স্নেহে মুগ্ধ হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিতে অঙ্গীকার করিয়াছিল। দরিদ্রা ধনী তাহাতে বালকের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া তদবধি যথাসাধ্য অর্থাদি সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া সাগ্রহে ঐকালের প্রতীক্ষা করিতেছিল। সেই কাল উপস্থিত দেখিয়া গদাধর এখন নিজ অগ্রজকে ঐকথা নিবেদন করিল। কিন্তু বংশে কখনও ঐরূপ প্রথার অনুষ্ঠান না হওয়ায় শ্রীযুক্ত রামকুমার উহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন। বালকও নিজ অঙ্গীকার স্মরণ করিয়া ঐ বিষয়ে বিষম জেদ করিতে

লাগিল। সে বলিল, ঐরূপ না করিলে তাহাকে সত্যভঙ্গের অপরাধে অপরাধী হইতে হইবে এবং মিথ্যাবাদী ব্যক্তি ব্রাহ্মণোচিত যজ্ঞসূত্রধারণে কখন অধিকারী হইতে পারে না। উপনয়নের কাল সন্নিকট দেখিয়া ইতিপূর্বেই সকল বিষয়ের আয়োজন করা হইয়াছিল, বালকের পূর্বোক্ত জেদে ঐ কর্ম পণ্ড হইবার উপক্রম হইল। ক্রমে ঐ কথা শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার কর্ণে প্রবেশ করিল। তখন উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিতে যত্নপর হইয়া তিনি শ্রীযুক্ত রামকুমারকে বলিলেন, ঐরূপ অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের বংশে ইতিপূর্বে না হইলেও উহা অন্যত্র বহু সদ্‌ব্রাহ্মণপরিবারে দেখা গিয়া থাকে। অতএব উহাতে তাঁহাদিগের যখন নিন্দাভাগী হইতে হইবে না, তখন বালকের সন্তোষ ও শান্তির জন্য ঐরূপ করিতে দোষ নাই। প্রবীণ পিতৃসুহৃৎ ধর্মদাসের কথায় তখন রামকুমার প্রভৃতি ঐ বিষয়ে আর আপত্তি করিলেন না এবং গদাধর হৃষ্টচিত্তে যথাবিধানে উপবীতধারণ করিয়া সন্ধ্যাপূজাদি ব্রাহ্মণোচিত কার্যে মনোনিবেশ করিল। কামারকন্যা ধনীও তখন বালকের সহিত ঐভাবে সম্বদ্ধা হইয়া আপনার জীবন ধন্য জ্ঞান করিতে লাগিল। উহার স্বল্পকাল পরেই বালক দশম বর্ষে পদার্পণ করিল।

উপনয়ন হইবার কিছুকাল পরে একটি ঘটনায় গদাধরের অসাধারণ দিব্য প্রতিভার পরিচয় পাইয়া পল্লীবাসী সকলে যারপরনাই বিস্মিত হইয়াছিল।* গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের

* এই ঘটনার বিস্তৃত বিবরণের জন্য 'গুরুভাব, পূর্বার্ধ—৪র্থ অধ্যায়' দ্রষ্টব্য।

বাটীতে কোনও বিশেষ শ্রাদ্ধবাসরে এক মহতী পণ্ডিতসভা আহূত হইয়াছিল এবং পণ্ডিতগণ ধর্মবিষয়ক কোন জটিল প্রশ্নের সম্বন্ধে বাদানুবাদ করিয়া সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেছিলেন না। বালক গদাধর ঐসময়ে তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ের এমন সুমীমাংসা করিয়া দিয়াছিল যে, পণ্ডিতগণ তচ্ছ্রবণে তাহার ভূয়সী প্রশংসা ও তাহাকে আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

পণ্ডিতসভায় গদাধরের প্রশ্ন সমাধান

সে যাহা হউক উপনয়ন হইবার পরে গদাধরের ভাবপ্রবণ হৃদয় নিজ প্রকৃতির অনুকূল অন্য এক বিষয় অবলম্বনের অবসর পাইয়া আনন্দিত হইয়াছিল। পিতাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া জীবন্ত বিগ্রহ ৺রঘুবীর কিরূপে কামারপুকুরের ভবনে প্রথমে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহার শুভাগমনের দিবস হইতে লক্ষ্মীজলার ক্ষুদ্র জমিখণ্ডে প্রচুর ধান্য উৎপন্ন হইয়া কিরূপে সংসারের অভাব দূরীভূত হইয়াছিল এবং করুণাময়ী চন্দ্রাদেবী অতিথি-অভ্যাগতদিগকেও নিত্য অন্নদানে সমর্থা হইয়াছিলেন—ঐসকল কথা শুনিয়া বালক পূর্ব হইতেই উক্ত গৃহদেবতাকে বিশেষ ভক্তি ও শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিত। সেই দেবতাকে স্পর্শ ও পূজা করিবার অধিকার এখন হইতে প্রাপ্ত হইয়া বালকের হৃদয় নবানুরাগে পূর্ণ হইয়াছিল। সন্ধ্যা-বন্দনাদি সমাপ্ত করিয়া সে এখন নিত্য তাঁহার পূজা ও ধ্যানে বহুক্ষণ অতিবাহিত করিতে লাগিল এবং যাহাতে তিনি প্রসন্ন হইয়া পিতার ন্যায় তাহাকেও সময়ে সময়ে দর্শন ও আদেশ-দানে কৃতার্থ করেন, তজ্জন্য বিশেষ নিষ্ঠা ও ভক্তির

গদাধরের ধর্মপ্রবৃত্তির পরিণতি ও তৃতীয়বার ভাবসমাধি

সহিত তাঁহার সেবা করিতে লাগিল। রামেশ্বরশিব এবং ৺শীতলা-মাতাও বালকের ঐ সেবার অন্তর্ভুক্ত হইলেন। ঐরূপ সেবা পূজার ফলও উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। বালকের পূত হৃদয় উহাতে একাগ্র হইয়া স্বল্পকালেই তাহাকে ভাবসমাধি বা সবিকল্প সমাধির অধিকারী করিল এবং ঐ সমাধিসহায়ে তাহার জীবনে নানা দিব্যদর্শনও সময়ে সময়ে উপস্থিত হইতে লাগিল। ঐরূপ সমাধি ও দর্শনের বিকাশ এই বৎসর শিবরাত্রিকালে তাহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল।* বালক সেদিন যথারীতি উপবাসী থাকিয়া বিশেষ নিষ্ঠার সহিত দেবাদিদেব মহাদেবের পূজা করিতেছিল। তাহার বন্ধু গয়াবিষ্ণু এবং অন্য কয়েকজন বয়স্যও সেদিন ঐ উপলক্ষে উপবাসী ছিল এবং প্রতিবেশী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের বাটীতে শিবমহিমাসূচক যাত্রার অভিনয় হইবে জানিয়া উহা শুনিয়া রাত্রিজাগরণ করিতে মনস্থ করিয়াছিল। প্রথম প্রহরের পূজা সমাপ্ত করিয়া গদাধর যখন তন্ময় হইয়া বসিয়াছিল, তখন সহসা তাহার বয়স্যগণ আসিয়া তাহাকে সংবাদ দিল, পাইনদের বাটীতে তাহাকে শিব সাজিয়া কয়েকটি কথা বলিতে হইবে। কারণ, যাত্রার দলে যে শিব সাজিত, সে পীড়িত হইয়া ঐ ভূমিকা-গ্রহণে অসমর্থ হইয়াছে। বালক উহাতে পূজার ব্যাঘাত হইবে বলিয়া আপত্তি করিলেও তাহারা কিছুতেই ছাড়িল না। বলিল, শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিলে তাহাকে সর্বক্ষণ শিবচিন্তাই করিতে হইবে, উহা পূজা করা অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে। অধিকন্তু ঐরূপ না করিলে কত লোকের আনন্দের হানি হইবে তাহা ভাবিয়া

* 'সাধকভাব'—দ্বিতীয় অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

দেখা উচিত; তাহারা সকলে উপবাসী রহিয়াছে এবং ঐরূপে রাত্রিজাগরণে ব্রত পূর্ণ করিবে মনস্থ করিয়াছে। গদাধর অগত্যা সম্মত হইয়া শিবের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আসরে নামিয়াছিল। কিন্তু জটা, রুদ্রাক্ষ ও বিভূতি-ভূষিত হইয়া সে শিবের চিন্তায় এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিল যে, তাহার কিছুমাত্র বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না। পরে বহুক্ষণ অতীত হইলেও তাহার চেতনা হইল না দেখিয়া সে রাত্রির মত যাত্রা বন্ধ করিতে হইয়াছিল।

এখন হইতে গদাধরের ঐরূপ সমাধি মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইতে লাগিল। ধ্যান করিবার কালে এবং দেবদেবীর মহিমা-সূচক সঙ্গীতাদি শুনিতে শুনিতে সে এখন হইতে তন্ময় হইয়া যাইত এবং তাহার চিত্ত স্বল্প বা অধিক ক্ষণের জন্য নিজাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বহির্বিষয়সকল-গ্রহণে বিরত থাকিত। ঐ তন্ময়তা যেদিন প্রগাঢ় হইত, সেই দিনই তাহার বাহ্যসংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইয়া সে জড়ের ন্যায় কিছুকাল অবস্থান করিত। ঐ অবস্থানিবৃত্তির পরে কিন্তু সে জিজ্ঞাসিত হইলে বলিত, যে দেব অথবা দেবীর ধ্যান বা সঙ্গীতাদি যে শ্রবণ করিতেছিল, তাঁহার সম্বন্ধে অন্তরে কোনরূপ দিব্যদর্শন লাভ করিয়া সে আনন্দিত হইয়াছে। চন্দ্রাদেবীপ্রমুখ পরিবারস্থ সকলে উহাতে অনেক দিন পর্যন্ত সাতিশয় ভীত হইয়াছিলেন, কিন্তু উহাতে বালকের স্বাস্থ্যের কিছুমাত্র হানি হইতে না দেখিয়া এবং তাহাকে সর্বকর্মকুশল হইয়া সদানন্দে কাল কাটাইতে দেখিয়া তাঁহাদিগের ঐ আশঙ্কা ক্রমে অপগত হইয়াছিল। বারংবার ঐরূপ অবস্থায়

গদাধরের পুনঃপুনঃ ভাবসমাধি

উদয় হওয়ায় বালকেরও ক্রমে উহা অভ্যস্ত ও প্রায় ইচ্ছাধীন হইয়া গিয়াছিল এবং উহার প্রভাবে তাহার সূক্ষ্ম বিষয়সকলে দৃষ্টি প্রসারিত ও দেবদেবীবিষয়ক নানা তত্ত্ব উপলব্ধ হওয়ায় উহার আগমনে সে আনন্দিত ভিন্ন কখনও শঙ্কিত হইত না। সে যাহা হউক, বালকের ধর্মপ্রবৃত্তি এখন হইতে বিশেষভাবে প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং সে হরিবাসর, শিবের ও মনসার গাজন, ধর্মপূজা প্রভৃতি গ্রামের যেখানে যে ধর্মানুষ্ঠান হইতে লাগিল, সেখানেই উপস্থিত হইয়া সর্বান্তঃকরণে যোগদান করিতে লাগিল। বালকের মহদুদার ধর্মপ্রকৃতি তাহাকে বিভিন্ন দেবদেবীর উপাসকদিগের প্রতি বিদ্বেষশূন্য করিয়া তাঁহাদিগকে এখন হইতে আপনার করিয়া লইল। গ্রামের প্রচলিত প্রথা তাহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল, সন্দেহ নাই। কারণ বিষ্ণূপাসক, শিবভক্ত, ধর্মপূজক প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিগণ অন্য গ্রামসকলের ন্যায় না হইয়া এখানে পরস্পরের প্রতি দ্বেষশূন্য হইয়া বিশেষ সদ্ভাবে বসবাস করিত।

গদাধরের বিদ্যার্জনে উদাসীনতার কারণ

ঐরূপে ধর্মপ্রবৃত্তির পরিণতি হইলেও কিন্তু গদাধরের বিদ্যাভ্যাসে অনুরাগ এখন প্রবৃদ্ধ হয় নাই। পণ্ডিত ও ভট্টাচার্যাদি উপাধিভূষিত ব্যক্তিসকলের ঐহিক ভোগসুখ ও ধনলালসা দেখিয়া সে বরং তাঁহাদিগের ন্যায় বিদ্যার্জনে দিন দিন উদাসীন হইয়াছিল। কারণ, বালকের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহাকে এখন সকল ব্যক্তির কার্যের উদ্দেশ্যনিরূপণে প্রথমেই অগ্রসর করিত এবং তাঁহার পিতার বৈরাগ্য, ঈশ্বরভক্তি, সত্য, সদাচার ও ধর্মপরায়ণতাদি গুণসকলকে আদর্শরূপে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাদিগের

আচরণের মূল্যনির্দেশে প্রবৃত্ত করিত। ঐরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বালক সংসারে প্রায় সকল ব্যক্তিরই অন্তরূপ উদ্দেশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। আবার অনিত্য সংসারকে নিত্যরূপে গ্রহণ করিয়া তাহারা সর্বদা দুঃখে মুহ্যমান হয় দেখিয়া সে ততোধিক বিমর্ষও হইয়াছিল। ঐরূপ দেখিয়া শুনিয়া ভিন্নভাবে নিজ জীবন পরিচালিত করিতে যে তাহার মনে সঙ্কল্পের উদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। পাঠক হয়তো পূর্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া বলিবেন, একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকের সূক্ষ্মদৃষ্টি ও বিচার-শক্তির এতদূর বিকাশ হওয়া কি সম্ভবপর? উত্তরে বলা যাইতে পারে, সাধারণ বালকসকলের ঐরূপ হয় না সত্য, কিন্তু গদাধর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিল না। অসাধারণ প্রতিভা, মেধা ও মানসিক সংস্কারসমূহ লইয়া সে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। সুতরাং অল্প বয়স হইলেও তাহার পক্ষে ঐরূপ কার্য বিচিত্র নহে। সেজন্য ঐরূপ হওয়া আমাদিগের নিকটে যেরূপই প্রতীয়মান হউক না কেন, আমরা অনুসন্ধানে ঘটনা যেরূপ জানিয়াছি, সত্যের অনুরোধে আমাদিগকে উহা তদ্রূপই বলিয়া যাইতে হইবে।

সে যাহা হউক, প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসে ক্রমশঃ উদাসীন হইতে থাকিলেও গদাধর এখনও পূর্বের ন্যায় নিয়মিতরূপে পাঠশালায় যাইতেছিল এবং মাতৃভাষায় লিখিত মুদ্রিত গ্রন্থসকল পড়িতে এবং লিখিতে বিশেষ পটু হইয়া উঠিয়াছিল। বিশেষতঃ রামায়ণ, মহাভারতাদি ধর্মগ্রন্থসকল সে এখন ভক্তির সহিত এমন সুন্দর ভাবে পাঠ করিত যে, লোকে তচ্ছ্রবণে মুগ্ধ হইত। গ্রামের

• গদাধরের শিক্ষা এখন কতদূর অগ্রসর হইয়াছিল

সরলচিত্ত অজ্ঞ ব্যক্তিরা সেজন্য তাহার মুখে ঐসকল গ্রন্থ শ্রবণ করিতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত। বালকও তাহাদিগের তৃপ্তিসম্পাদনে কখনও পরাঙ্মুখ হইত না। ঐরূপে সীতানাথ পাইন, মধু যুগী প্রভৃতি অনেকে ঐজন্য তাহাকে নিজ নিজ বাটীতে আহ্বান করিয়া লইয়া যাইত এবং স্ত্রী-পুরুষ সকলে মিলিত হইয়া তাহার মুখে প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবোপাখ্যান অথবা রামায়ণ-মহাভারতাদি হইতে অন্য কোন উপাখ্যান ভক্তিভরে শ্রবণ করিত।

রামায়ণ-মহাভারতাদি ভিন্ন কামারপুকুরে এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধ দেব-দেবীদিগের প্রকট কাহিনীসমূহ গ্রাম্য কবিদিগের দ্বারা সরল পদ্যে লিপিবদ্ধ হইয়া প্রচলিত আছে। ঐরূপে ৺তারকেশ্বর মহাদেবের প্রকট হইবার কথা, যোগাদ্যার পালা, বন-বিষ্ণুপুরের ৺মদনমোহনজীর উপাখ্যান প্রভৃতি অনেক দেব-দেবীর অলৌকিক চরিত্র এবং সাধু ভক্তদিগের নিকট স্ব-স্বরূপ প্রকাশ করিবার বৃত্তান্ত সময়ে সময়ে গদাধরের শ্রবণগোচর হইত। বালক নিজ শ্রুতিধরত্বগুণে ঐসকল শুনিয়া আয়ত্ত করিয়া রাখিত এবং ঐরূপ উপাখ্যানের মুদ্রিত গ্রন্থ বা পুঁথি পাইলে কখন কখন উহা স্বহস্তে লিখিয়াও লইত। গদাধরের স্বহস্তলিখিত রামকৃষ্ণায়ণ পুঁথি, যোগাদ্যার পালা, সুবাহুর পালা প্রভৃতি আমরা কামার-পুকুরের বাটীতে অনুসন্ধানে দেখিতে পাইয়া ঐ বিষয়ে জানিতে পারিয়াছিলাম। ঐসকল উপাখ্যানও যে বালক অনুরুদ্ধ হইয়া গ্রামের সরলচিত্ত নরনারীর নিকটে এইকালে বহুবার অধ্যয়ন ও আবৃত্তি করিত, ইহাতে সন্দেহ নাই।

গণিতশাস্ত্রে বালকের উদাসীনতার কথা আমরা ইতিপূর্বে

উল্লেখ করিয়াছি। কিন্তু পাঠশালায় যাইয়া সে ঐ বিষয়েও উন্নতি সাধন করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ধারাপাতে কাঠাকিয়া পর্যন্ত এবং পাটীগণিতে তেরিজ হইতে আরম্ভ করিয়া সামান্য সামান্য গুণ-ভাগ পর্যন্ত তাহার শিক্ষা অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু দশম বর্ষে উপনীত হইয়া ধ্যানের পরিণতিতে যখন তাহার মধ্যে মধ্যে পূর্বোক্তভাবে সমাধি উপস্থিত হইতে লাগিল, তখন তাহার অগ্রজ রামকুমারপ্রমুখ বাটীর সকলে তাহার বায়ুরোগ হইয়াছে ভাবিয়া তাহাকে যখন ইচ্ছা পাঠশালায় যাইতে এবং যাহা ইচ্ছা শিখিতে স্বাধীনতা প্রদান করিয়াছিলেন এবং ঐজন্য কোন বিষয়ে তাহার শিক্ষা অগ্রসর হইতেছে না দেখিলেও শিক্ষক উহার জন্য তাহাকে কখনও পীড়ন করেন নাই। সুতরাং গদাধরের পাঠশালার শিক্ষা যে এখন হইতে বিশেষ অগ্রসর হইল না, একথা বলিতে হইবে না।

ঐরূপে দুই বৎসরকাল অতীত হইল এবং গদাধর ক্রমে দ্বাদশ বর্ষে উপনীত হইল। তাহার মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এখন দ্বাবিংশতি বর্ষে এবং কনিষ্ঠা ভগিনী সর্বমঙ্গলা নবমে পদার্পণ করিল। শ্রীযুক্ত রামকুমার রামেশ্বরকে বিবাহ-যোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইতে দেখিয়া কামারপুকুরের নিকটবর্তী গৌরহাটি নামক গ্রামের শ্রীযুক্ত রামসদয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগিনীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করিলেন এবং রামসদয়কে নিজ ভগিনী সর্বমঙ্গলার সহিত পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিলেন। ঐরূপে রামেশ্বরের পরিবর্তে বিবাহসম্বন্ধ স্থির হওয়ায় কন্যাপক্ষীয়দিগকে পণ দিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমারকে ব্যস্ত হইতে হইল না।

রামেশ্বরের ও সর্বমঙ্গলার বিবাহ

রামকুমারের পারিবারিক জীবনে এই সময়ে অন্য একটি বিশেষ ঘটনাও উপস্থিত হইয়াছিল। যৌবনের অবসানেও তাঁহার সহধর্মিণী গর্ভধারণ না করায় সকলে তাঁহাকে বন্ধ্যা বলিয়া এতকাল নিরূপণ করিয়াছিল। তাঁহাকে এখন গর্ভবতী হইতে দেখিয়া পরিবারবর্গের মনে আনন্দ ও শঙ্কার যুগপৎ উদয় হইল। কারণ, গর্ভধারণ করিলেই তাঁহার পত্নীর মৃত্যু হইবে, একথা তাঁহাদিগের কেহ কেহ ইতিপূর্বে রামকুমারের নিকটে শ্রবণ করিয়াছিলেন।

গর্ভবতী হইয়া রামকুমার-পত্নীর স্বভাবের পরিবর্তন

সে যাহা হউক, পত্নীর গর্ভধারণের কাল হইতে শ্রীযুক্ত রামকুমারের ভাগ্যচক্রে বিশেষ পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হইল। যে-সকল উপায়ে তিনি এতদিন বেশ দুপয়সা অর্জন করিতেছিলেন, সে-সকলে এখন আর পূর্বের ন্যায় অর্থাগম হইতে লাগিল না এবং তাঁহার শারীরিক স্বাস্থ্যও এখন হইতে ভগ্ন হওয়ায় তিনি আর পূর্বের ন্যায় কর্মঠ রহিলেন না। তাঁহার পত্নীর আচরণসকলও এখন যেন ভিন্নাকার ধারণ করিল। তাঁহার পূজ্যপাদ পিতার সময় হইতে সংসারে নিয়ম প্রবর্তিত ছিল যে, অনুপবীত বালক ও পীড়িত ব্যক্তি ভিন্ন কেহ কখনও ৺রঘুবীরের পূজার পূর্বে জলগ্রহণ করিবে না। তাঁহার পত্নী এখন ঐ নিয়ম ভঙ্গ করিতে লাগিলেন এবং অমঙ্গলাশঙ্কা করিয়া বাটীর অন্য সকলে ঐ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে তিনি তাঁহাদিগের কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সামান্য সামান্য বিষয়সকল অবলম্বন করিয়া তিনি পরিবারস্থ সকলের সহিত বিবাদ ও মনোমালিন্য উপস্থিত করিতে লাগিলেন এবং শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী ও নিজ স্বামী

রামকুমারের কথাতেও ঐরূপ বিপরীতাচরণসকল হইতে নিরস্তা হইলেন না। গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকের স্বভাবের পরিবর্তন হয় ভাবিয়া তাঁহারা ঐসকল আচরণের বিরুদ্ধে আর কিছু না বলিলেও কামারপুকুরের ধর্মের সংসারে এখন ঐরূপে শান্তির পরিবর্তে অনেক সময়ে অশান্তির উদয় হইতে থাকিল।

আবার শ্রীযুক্ত রামকুমারের মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বর এখন কৃতবিদ্য হইলেও বিশেষ উপার্জনক্ষম হইয়া উঠিলেন না। সুতরাং পরিবার-বর্গের সংখ্যাবৃদ্ধির সহিত আয়ের হ্রাস হইয়া সংসারে পূর্বের ন্যায় সচ্ছলতা রহিল না। শ্রীযুক্ত রামকুমার ঐজন্য চিন্তিত হইয়া নানা উপায়-উদ্ভাবনে নিযুক্ত থাকিয়াও ঐ বিষয়ের প্রতিকার করিতে সমর্থ হইলেন না। কে যেন ঐসকল উপায়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া উহাদিগকে ফলবান হইতে দিল না! ঐরূপে চিন্তার উপর চিন্তা আসিয়া রামকুমারের জীবন ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিল এবং দিন, পক্ষ, মাস অতীত হইয়া ক্রমে তাঁহার পত্নীর প্রসবকাল নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া তিনি নিজ পূর্বদর্শন স্মরণপূর্বক অধিকতর বিষণ্ণ হইতে লাগিলেন।

রামকুমারের সাংসারিক অবস্থার পরিবর্তন

ক্রমে ঐ কাল সত্য সত্যই উপস্থিত হইল এবং শ্রীযুক্ত রাম-কুমারের সহধর্মিণী সন ১২৫৫ সালের কোন সময়ে এক পরম রূপবান তনয় প্রসবান্তে তাহার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে সূতিকাগৃহেই স্বর্গারোহণ করিলেন। রামকুমারের দরিদ্র সংসারে ঐ ঘটনায় শোকের নিবিড় যবনিকা পুনরায় নিপতিত হইল।

রামকুমারপত্নীর পুত্রপ্রসবান্তে মৃত্যু

অষ্টম অধ্যায়

যৌবনের প্রারম্ভে

পত্নী পরলোকে গমন করিলেন, কিন্তু রামকুমারের দুঃখ দুর্দিনের অবসান হইল না। বিদায়-আদায় কমিয়া যাওয়ায় অর্থের অভাবে তাঁহার সাংসারিক অবস্থার দিন দিন অবনতি হইতে লাগিল। লক্ষ্মীজলার জমিখণ্ডে পর্যাপ্ত ধান্য এখনও উৎপন্ন হইলেও বস্ত্রাদি অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পদার্থসকলের অভাব সংসারে প্রতিদিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। তদুপরি তাঁহার বৃদ্ধা মাতার ও মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ের জন্য এখন নিত্য দুগ্ধের প্রয়োজন। সুতরাং ঋণ করিয়া ঐসকল প্রয়োজন সাধিত হইতে লাগিল এবং ঋণজালের প্রতিদিন বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হইল না। অশেষ চিন্তা ও নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও রামকুমার উহার প্রতিরোধে অসমর্থ হইলেন। তখন বন্ধুবর্গের পরামর্শে

রামকুমারের কলিকাতায় টোল খোলা

অন্যত্র গমন করিলে আয়বৃদ্ধির সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তাঁহার শোকসন্তপ্ত মনও উহাতে সাহ্লাদে সম্মতিদান করিল। কারণ, প্রায় ত্রিশ বৎসর-কাল যাঁহাকে জীবনসঙ্গিনী করিয়া সংসার পাতিয়াছিলেন, তাঁহার স্মৃতি যে গৃহের সর্বত্র বিজড়িত রহিয়াছে, সেই গৃহ হইতে দূরে থাকিলেই এখন শান্তিলাভের সম্ভাবনা। সুতরাং কলিকাতা

বা বর্ধমান কোথায় যাইলে অধিক অর্থাগমের সম্ভাবনা, এই বিষয়ে পরামর্শ চলিতে লাগিল। পরিশেষে স্থির হইল প্রথমোক্ত স্থানে যাওয়াই কর্তব্য। কারণ, সিহড়গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দেশড়ার রামধন ঘোষ প্রভৃতি তাঁহার পরিচিত অনেক ব্যক্তি কলিকাতায় যাইয়া উপার্জনের স্থবিধালাভ করিয়া নিজ নিজ সংসারের বেশ শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছে—একথা তাঁহার বন্ধুগণ নির্দেশ করিতে লাগিলেন। ঐসকল ব্যক্তি যে তাঁহা অপেক্ষা বিদ্যা, বুদ্ধি ও চরিত্রবলে অনেকাংশে হীন, একথাও তাঁহারা তাঁহাকে বলিতে ভুলিলেন না। স্থতরাং পত্নীবিয়োগের স্বল্পকাল পরেই শ্রীযুক্ত রামকুমার রামেশ্বরের উপর সংসারের ভারার্পণ করিয়া কলিকাতায় আগমন করিলেন এবং ঝামাপুকুর নামক পল্লীর ভিতর টোল খুলিয়া ছাত্রগণকে অধ্যয়ন করাইতে নিযুক্ত হইলেন।

রামকুমার-পত্নীর মৃত্যুতে পারিবারিক পরিবর্তন

রামকুমারের পত্নীর মৃত্যুতে কামারপুকুরের পারিবারিক জীবনে অনেক পরিবর্তন উপস্থিত হইল। শ্রীমতী চন্দ্রা ঐ ঘটনায় গৃহকর্মের সমস্ত ভার পুনরায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের লালনপালনের ভারও ঐদিন হইতে তাঁহার স্কন্ধে নিপতিত হইল। তাঁহার মধ্যম পুত্র রামেশ্বরের পত্নী তাঁহাকে ঐসকল কর্মে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে লাগিল; কিন্তু সে তখনও নিতান্ত বালিকা, তাহার নিকট হইতে বিশেষ সাহায্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল না। স্থতরাং ৺রঘুবীরের সেবা, অক্ষয়ের লালনপালন এবং রন্ধনাদি গৃহকর্ম সকলই তাঁহাকে এখন করিতে হইত। ঐসকল কর্ম সম্পন্ন করিতে তাঁহার সমস্ত দিন

কাটিয়া যাইত, বিশ্রামের জন্য তিলার্ধ অবসর থাকিত না। আটাশ বৎসর বয়ঃক্রমে সংসারের সমস্ত ভার ঐরূপে স্কন্ধে লওয়া সুখসাধ্য না হইলেও শ্রীশ্রীরঘুবীরের ঐরূপ ইচ্ছা বুঝিয়া চন্দ্রাদেবী উহা বিনা অভিযোগে বহন করিতে লাগিলেন।

অন্যদিকে সংসারের আয়ব্যয়ের ভার শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের উপর এখন হইতে নিপতিত হওয়ায় তিনি কিরূপে উপার্জন করিয়া পরিবারবর্গকে সুখী করিতে পারিবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তায় ব্যাপৃত রহিলেন কিন্তু কৃতবিদ্য হইলেও তিনি কোনকালে বিশেষ উপার্জনক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়া আমরা শ্রবণ করি নাই। তদুপরি পরিব্রাজক সাধু ও সাধকগণকে দেখিতে পাইলে তিনি তাঁহাদিগের সঙ্গে অনেককাল অতিবাহিত করিতেন এবং তাঁহাদিগের কোনরূপ অভাব দেখিলে উহা মোচন করিতে অনেক সময়ে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। সুতরাং আয়-বৃদ্ধি হইলেও তাঁহার দ্বারা সংসারের ঋণ-পরিশোধ অথবা বিশেষ সচ্ছলতা সম্পাদিত হইল না। কারণ, সংসারী হইলেও তিনি সঞ্চয়ী হইতে পারিলেন না এবং সময়ে সময়ে আয়ের অধিক ব্যয় করিয়া '৺রঘুবীর কোনরূপে চালাইয়া দিবেন' ভাবিয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।

রামেশ্বরের কথা

কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরকে প্রাণের সহিত ভালবাসিলেও শ্রীযুক্ত রামেশ্বর তাঁহার শিক্ষাদি অগ্রসর হইতেছে কি-না, তদ্বিষয়ে কোন-কালে লক্ষ্য করিতেন না। কারণ, একে ঐরূপ করা তাঁহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ছিল, তদুপরি অর্থচিন্তায় তাঁহাকে নানা স্থানে যাতায়াত করিতে হইত। সুতরাং ঐ বিষয় লক্ষ্য করিতে তাঁহার

ইচ্ছা ও সময় উভয় বস্তুরই এখন অভাব হইয়াছিল। আবার এই অল্প বয়সেই বালকের ধর্মপ্রবৃত্তির অদ্ভুত পরিণতি দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, তাহার প্রকৃতি তাহাকে সুপথে ভিন্ন কখনও কুপথে পরিচালিত করিবে না। পল্লীর নরনারীসকলকে তাহার উপর প্রগাঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিতে এবং তাহাকে পরমাত্মীয়বোধে ভালবাসিতে দেখিয়া তাঁহার ঐ ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। কারণ, তিনি বুঝিতেন বিশেষ সৎ ও উদারচরিত্র না হইলে কেহ কখন সংসারে সকল ব্যক্তির চিত্তাকর্ষণ করিয়া তাহাদিগের প্রশংসাভাজন হইতে পারে না। সেজন্য বালকের সম্বন্ধে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কল্পনাপূর্বক তাঁহার হৃদয় আনন্দিত হইয়া উঠিত এবং তিনি সর্বদা নিশ্চিন্ত থাকিতেন। সুতরাং রামকুমারের কলিকাতায় গমনকালে গদাধর ত্রয়োদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়া একপ্রকার অভিভাবকশূন্য হইয়া পড়িল এবং তাহার উন্নত প্রকৃতি তাহাকে যেদিকে ফিরাইতে লাগিল, সে এখন অবাধে সে-পথেই চলিতে লাগিল।

গদাধরের সম্বন্ধে রামেশ্বরের চিন্তা

আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি গদাধরের সূক্ষ্মদৃষ্টি তাহাকে এই অল্প বয়সেই প্রত্যেক ব্যক্তির ও কার্যের উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিতে শিখাইয়াছিল। সুতরাং অর্থলাভে সহায়তা হইবে বলিয়াই যে পাঠশালায় বিদ্যাভ্যাসে এবং টোলে উপাধি-ভূষিত হইতে লোকে সচেষ্ট হয়, ইহা বুঝিতে তাহার বিলম্ব হয় নাই। আবার, অশেষ আয়াস স্বীকারপূর্বক সেই অর্থ উপার্জন ও উহার দ্বারা সাংসারিক ভোগসুখ লাভ করিয়া লোকে তাহার পিতার ন্যায় সত্যনিষ্ঠা,

চরিত্রবল এবং ধর্মলাভে সক্ষম হয় না, ইহাও সে দিন দিন দেখিতে পাইতেছিল। গ্রামের কোন কোন পরিবারস্থ ব্যক্তিগণ স্বার্থসুখে অন্ধ হইয়া বিষয়সম্পত্তি লইয়া পরস্পর বিবাদ ও মামলা-মকদ্দমা উত্থাপনপূর্বক গৃহ ও ক্ষেত্রাদিতে দড়ি ফেলিয়া 'এই দিকটা আমার, ঐ দিকটা উহার' ইত্যাদি অত্য নিরূপণ করিয়া লইয়া কয়েক দিন ঐ বিষয় ভোগ করিতে না করিতেই শমনসদনে চলিয়া যাইল—ঐরূপ দৃষ্টান্তসকল কখনও কখনও অবলোকন করিয়া বালক বিশেষরূপে বুঝিয়াছিল, অর্থ ও ভোগলালসা মানবজীবনের অনেক অনর্থ উপস্থিত করে। সুতরাং অর্থকরী বিদ্যার্জনে সে যে এখন দিন দিন উদাসীন হইবে এবং পিতার ন্যায় 'মোটা-ভাত-কাপড়ে' সন্তুষ্ট থাকিয়া ঈশ্বরের প্রীতিলাভকে মনুষ্য-জীবনের সারোদ্দেশ্য বলিয়া বুঝিবে, ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্য বয়স্যদিগের প্রতি প্রেমে গদাধর পাঠশালায় প্রায় প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে যাইলেও ৺রঘুবীরের সেবাপূজায় ও গৃহকর্মে সাহায্যদানপূর্বক মাতার পরিশ্রমের লাঘব করিয়া এখন হইতে তাহার অধিককাল অতিবাহিত হইতে লাগিল। ঐসকল বিষয়ে ব্যাপৃত হইয়া বেলা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত তাহাকে এখন প্রায়ই বাটীতে থাকিতে হইত।

গদাধরের মনের বর্তমান অবস্থা ও কার্যকলাপ

গদাধর ঐরূপে বাটীতে অধিককাল অতিবাহিত করায় পল্লী-রমণীগণের তাহার সহিত মিলিত হইবার বিশেষ সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ, গৃহকর্ম সমাপন করিয়া তাঁহাদিগের অনেকে অবসরকালে শ্রীমতী চন্দ্রার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং বালককে তথায় দেখিতে পাইয়া কখনও গান করিতে এবং কখনও

ধর্মোপাখ্যানসকল পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐসকল অনুরোধ যথাসাধ্য পালন করিতে যত্নপর হইত। চন্দ্রাদেবীকে গৃহকর্মে সাহায্য করিবার জন্য তাহার অবসরের অভাব দেখিলে তাঁহারা আবার সকলে মিলিয়া শ্রীমতী চন্দ্রার কর্মসকল করিয়া দিয়া তাহার মুখে পুরাণ-কথা ও সঙ্গীতাদি শুনিবার অবসর করিয়া লইতেন। ঐরূপে তাঁহাদের নিকটে কিছুক্ষণ পাঠ ও সঙ্গীত করা গদাধরের নিত্যকর্মের মধ্যে অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিল। রমণীগণও উহাতে এত আনন্দ অনুভব করিতেন যে, উহা অধিকক্ষণ শুনিবার আশায় তাঁহারা এখন হইতে নিজ নিজ গৃহকর্মসকল শীঘ্র শীঘ্র সমাপ্ত করিয়া চন্দ্রাদেবীর নিকটে উপস্থিত হইতে লাগিলেন।

পল্লীরমণীগণের নিকটে গদাধরের পাঠ ও সঙ্কীর্তনাদি

গদাধর ইঁহাদের নিকটে শুদ্ধ পুরাণপাঠমাত্রই করিত না কিন্তু অন্য নানা উপায়ে ইঁহাদিগের আনন্দ সম্পাদন করিত। গ্রামে ঐ সময়ে তিনদল যাত্রা, একদল বাউল এবং দুই-এক দল কবি ছিল। তদ্ভিন্ন বহু বৈষ্ণব এখানে বসতি করায় অনেক গৃহেই প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভাগবতপাঠ ও সঙ্কীর্তনাদি হইত। বাল্যকাল হইতে শ্রবণ করায় এবং নিজ স্বভাবসিদ্ধ প্রতিভায় ঐসকল দলের পালা, গান ও সঙ্কীর্তনসকল গদাধরের আয়ত্ত ছিল। সেজন্য রমণীগণের আনন্দবর্ধন করিতে সে কোনদিন যাত্রার পালা, কোন দিন বাউলের গীতাবলী, কোনদিন কবি এবং কোনদিন বা সঙ্কীর্তন আরম্ভ করিত। যাত্রার পালা বলিবার কালে সে ভিন্ন ভিন্ন স্বরে বিভিন্ন ভূমিকায় কথাসকল

উচ্চারণপূর্বক একাকীই সকল চরিত্রের অভিনয় করিত। আবার নিজ জননী বা রমণীগণের মধ্যে কাহাকেও কোনদিন বিমর্ষ দেখিলে সে ঐসকল যাত্রার সঙের পালা অথবা সকলের পরিচিত গ্রামের কোন ব্যক্তির বিচিত্র আচরণ ও হাবভাবের এমন স্বাভাবিক অনুকরণ করিত যে, তাঁহাদিগের মধ্যে হাস্য ও কৌতুকের তরঙ্গ ছুটিত।

পল্লীরমণীগণের গদাধরের প্রতি ভক্তি ও বিশ্বাস

সে যাহা হউক, গদাধর ঐরূপে ইঁহাদিগের হৃদয়ে ক্রমে অপূর্ব প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। বালকের জন্মগ্রহণকালে তাহার জনক-জননী যে-সকল অদ্ভুত স্বপ্ন ও দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন, সে সকলের কথা ইঁহারা ইতিপূর্বেই শুনিয়াছিলেন; আবার দেবদেবীর ভাবাবেশে সময়ে সময়ে তাহার যেরূপ অদৃষ্টপূর্ব অবস্থান্তর উপস্থিত হয়, তাহাও তাঁহারা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহার জ্বলন্ত দেবভক্তি, তন্ময় হইয়া পুরাণপাঠ, মধুর কণ্ঠে সঙ্গীত এবং তাঁহাদিগের প্রতি আত্মীয়ের ন্যায় সরল উদার আচরণ যে তাঁহাদিগের কোমল হৃদয়ে এমন অপূর্ব ভক্তি-ভালবাসার উদয় করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। আমরা শুনিয়াছি, ধর্মদাস লাহার কন্যা প্রসন্নময়ীপ্রমুখ বর্ষীয়সী রমণীগণ বালকের ভিতরে বালগোপালের দিব্য প্রকাশ অনুভব করিয়া তাহাকে পুত্রের অধিক স্নেহ করিতেন এবং তদপেক্ষা স্বল্পবয়স্কা রমণীগণ তাহাকে ঐরূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অংশসম্ভূত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া তাহার সহিত সখ্যভাবে সম্বদ্ধা হইয়াছিলেন। রমণীগণের অনেকেই বৈষ্ণববংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সরল

কবিতাময় বিশ্বাসই তাঁহাদিগের ধর্মজীবনের প্রধান অঙ্গ ছিল; সুতরাং অশেষগুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালককে দেবতা বলিয়া বিশ্বাস করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র ছিল না। সে যাহা হউক, ঐরূপ বিশ্বাসে তাঁহারা এখন গদাধরের সহিত মিলিতা হইয়া তাহাকে নিঃসঙ্কোচে আপনাপন মনের কথা খুলিয়া বলিতেন এবং অনেক বিষয়ে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া উহা কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন। গদাধরও তাঁহাদিগের সহিত এমনভাবে মিলিত হইত যে, অনেক সময়ে তাহাকে তাঁহাদিগের রমণী বলিয়া মনে হইত।*

রমণীবেশে গদাধর

গদাধর কখন কখন রমণীর বেশভূষা ধারণ করিয়া তাঁহাদিগের নিকটে বিশেষ বিশেষ নারীচরিত্রের অভিনয় করিত। ঐরূপে শ্রীমতী রাধারানীর অথবা তাঁহার প্রধানা সখী বৃন্দার ভূমিকা গ্রহণ করিবার কালে তাঁহারা তাহাকে অনেক সময় রমণীর বেশভূষায় সজ্জিত হইতে অনুরোধ করিতেন। বালকও তাঁহাদিগের ঐ অনুরোধ রক্ষা করিত। ঐ সময়ে তাহার হাবভাব, কথাবার্তা, চালচলন প্রভৃতি অবিকল নারীর ন্যায় হইত। রমণীগণ উহা দেখিয়া বলিতেন, নারী সাজিলে গদাধরকে পুরুষ বলিয়া কেহই চিনিতে পারে না। উহাতে বুঝিতে পারা যায়, বালক নারীগণের প্রত্যেক কার্য কত তন্ন তন্ন করিয়া ইতিপূর্বে লক্ষ্য করিয়াছিল। রঙ্গপ্রিয় বালক এই সময়ে

* সম্পূর্ণরূপে রমণীগণের ন্যায় হইবার বাসনা শ্রীযুক্ত গদাধরের প্রাণে এই কালে কত প্রবল হইয়াছিল, তাহা 'সাধকভাব'—চতুর্দশ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ কথা হইতে পাঠক সবিশেষ জানিতে পারিবেন।

কোন কোন দিন রমণীর ন্যায় বেশভূষা করিয়া কক্ষে কলসী ধারণপূর্বক পুরুষদিগের সম্মুখ দিয়া হালদারপুকুরে জল আনয়নে গমন করিয়াছিল এবং কেহই তাহাকে ঐ বেশে চিনিতে পারে নাই।

গ্রামের ধনী গৃহস্থ সীতানাথ পাইনদের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। সীতানাথের সাত পুত্র ও আট কন্যা ছিল এবং কন্যাগণ বিবাহের পরেও সীতানাথের ভবনে একান্নে অবস্থান করিতেছিল। শুনা যায়, সীতানাথের বহু গোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন দশখানি শিলে বাটনা বাটা হইত, রন্ধনকার্যে এত মসলার প্রয়োজন হইত! তদ্ভিন্ন সীতানাথের দূরসম্পর্কীয় আত্মীয়বর্গের অনেকে আবার তাঁহার বাটীর পার্শ্বে বাটী করিয়া বাস করিয়াছিল। সেজন্য কামারপুকুরের এই অংশ বণিকপল্লী নামে প্রসিদ্ধ ছিল এবং উহা ক্ষুদিরামের বাটীর সন্নিকটে থাকায় বণিক রমণীগণের অনেকে চন্দ্রাদেবীর নিকটে অবসরকালে উপস্থিত হইতেন; বিশেষতঃ, আবার সীতানাথের স্ত্রী ও কন্যাগণ। সুতরাং গদাধরের সহিত ইঁহাদের এখন বিশেষ সৌহৃদ্য উপস্থিত হইয়াছিল। ইঁহারা বালককে অনেক সময়ে নিজ ভবনে লইয়া যাইতেন এবং রমণী সাজিয়া পূর্বোক্তভাবে অভিনয়াদি করিতে অনুরোধ করিতেন। অভিভাবকগণের নিষেধে তাঁহাদিগের আত্মীয়া রমণীগণের অনেকে তাঁহাদিগের বাটী ভিন্ন অন্যত্র যাইতে পারিতেন না এবং সেজন্য গদাধরের পাঠ ও সঙ্গীতাদি শ্রবণ করা তাঁহাদিগের ভাগ্যে ঘটিত না বলিয়াই বোধ হয় তাঁহারা বালককে

সীতানাথ পাইনের পরিবারবর্গের সহিত গদাধরের সৌহৃদ্য

ঐরূপে নিজ ভবনে যাইতে নিমন্ত্রণ করিতেন। ঐরূপে যাঁহারা চন্দ্রাদেবীর নিকটে যাইতেন না, বণিকপল্লীর ভিতরে এমন অনেক রমণীও গদাধরের ভক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সে সীতানাথের ভবনে উপস্থিত হইলে তাঁহারা লোকমুখে সংবাদ পাইয়া তথায় আগমনপূর্বক তাহার পাঠশ্রবণে ও অভিনয়াদিদর্শনে আনন্দ উপভোগ করিতেন। বাটীর কর্তা সীতানাথ গদাধরকে বিশেষ-রূপে ভালবাসিতেন এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য পুরুষেরাও তাহার সদ্‌গুণসকলের সহিত পরিচিত ছিলেন। সেজন্য তাঁহাদিগের রমণীগণ তাহার নিকটে ঐরূপে সঙ্গীত-সঙ্কীর্তনাদি শ্রবণ করেন জানিয়াও তাঁহারা উহাতে আপত্তি করিতেন না।

বণিকপল্লীর দুর্গাদাস পাইন নামক এক ব্যক্তি কেবল ঐ বিষয়ে আপত্তি করিতেন এবং গদাধরকে স্বয়ং শ্রদ্ধা-ভক্তি করিলেও অন্দরের কঠোর অবরোধপ্রথা কাহারও জন্য কোন কালে শিথিল হইতে দিতেন না। তাঁহার অন্তঃপুরের কথা কেহ জানিতে সক্ষম নহে এবং তাঁহার বাটীর রমণীগণকে কেহ কখনও অবলোকন করে নাই বলিয়া তিনি সীতানাথ-প্রমুখ তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট সময়ে সময়ে অহঙ্কারও করিতেন। ফলতঃ, সীতানাথ-প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহার ন্যায় কঠোর অবরোধপ্রথার পক্ষপাতী ছিলেন না বলিয়া তিনি তাঁহাদিগকে হীন জ্ঞান করিতেন।

দুর্গাদাস একদিন তাঁহার কোন আত্মীয়ের নিকটে ঐরূপে অহঙ্কার করিতেছিলেন, এমন সময়ে গদাধর তথায় উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয় শ্রবণপূর্বক বলিল, "অবরোধ-প্রথার দ্বারা

রমণীগণকে কখন কি রক্ষা করা যায়? সংশিক্ষা ও দেবভক্তি-প্রভাবেই তাঁহারা সুরক্ষিতা হন; ইচ্ছা করিলে আমি তোমার অন্দরের সকলকে দেখিতে ও সমস্ত কথা জানিতে পারি।" দুর্গাদাস তাহাতে অধিকতর অহঙ্কৃত হইয়া বলিলেন, "কেমন জানিতে পার, জান দেখি?" গদাধরও তাহাতে 'আচ্ছা দেখা যাইবে' বলিয়া সেদিন চলিয়া আসিল। পরে একদিন অপরাহ্নে কাহাকেও কিছু না বলিয়া বালক মোটা মলিন একখানি শাড়ি ও রূপার পৈঁছা প্রভৃতি পরিয়া দরিদ্রা তন্তুবায়-রমণীর ন্যায় বেশধারণপূর্বক একটি চুবড়ি কক্ষে লইয়া ও অবগুণ্ঠনে মুখ আবৃত করিয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে হাটের দিক হইতে দুর্গাদাসের ভবন-সম্মুখে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস বন্ধুবর্গের সহিত তখন বহির্বাটীতেই বসিয়াছিলেন। রমণীবেশধারী গদাধর তাহাকে তন্তুবায়-রমণী গ্রামান্তর হইতে হাটে সূতা বেচিতে আসিয়া সঙ্গিনীগণ ফেলিয়া যাওয়ায় বিপন্না বলিয়া নিজ পরিচয় প্রদান করিল এবং রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করিল। দুর্গাদাস তাহাতে তাহার কোন্ গ্রামে বাস ইত্যাদি দুই-একটি প্রশ্ন করিয়া উত্তরশ্রবণানন্তর বলিলেন, "আচ্ছা, অন্দরে স্ত্রীলোকদিগের নিকটে যাইয়া আশ্রয় লও।" গদাধর তাহাতে তাঁহাকে প্রণামপূর্বক কৃতজ্ঞতা জানাইয়া অন্দরে প্রবেশ করিল এবং রমণীগণকে পূর্বের ন্যায় আত্মপরিচয় প্রদানপূর্বক নানাবিধ বাক্যালাপে পরিতুষ্টা করিল। তাহার স্বল্প বয়স দেখিয়া এবং মধুর বাক্যে প্রসন্না হইয়া দুর্গাদাসের অন্তঃপুর-চারিণীরা তাহাকে থাকিতে দিলেন এবং তাহার বিশ্রামের স্থান

দুর্গাদাস পাইনের অহঙ্কার চূর্ণ হওয়া

নিরূপণ করিয়া দিয়া জলযোগ করিবার জন্য মুড়ি-মুড়কি প্রভৃতি প্রদান করিলেন। গদাধর তখন নির্দিষ্ট স্থানে বসিয়া উহা ভক্ষণ করিতে করিতে অন্দরের সকল ঘর ও প্রত্যেক রমণীকে তন্ন তন্ন করিয়া লক্ষ্য করিতে এবং তাঁহাদিগের পরস্পরের বাক্যালাপ শ্রবণ করিতে লাগিল। তাঁহাদিগের বাক্যালাপে মধ্যে মধ্যে যোগদান এবং প্রশ্নাদি করিতেও সে ভুলিল না। ঐরূপে প্রায় এক প্রহর রাত্রি অতীত হইল। এদিকে এত রাত্রি হইলেও সে গৃহে ফিরিল না দেখিয়া চন্দ্রাদেবী রামেশ্বরকে তাহার অনুসন্ধানে প্রেরণ করিলেন এবং বণিকপল্লীতে সে প্রায় যাইয়া থাকে জানিয়া তাহাকে তথায় অন্বেষণ করিতে বলিয়া দিলেন। রামেশ্বর সেজন্য প্রথমে সীতানাথের বাটীতে উপস্থিত হইয়া জানিলেন, বালক তথায় আসে নাই। অনন্তর দুর্গাদাসের ভবনের নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তাঁহার স্বর শুনিতে পাইয়া গদাধর অধিক রাত্রি হইয়াছে বুঝিয়া দুর্গা-দাসের অন্দর হইতে 'দাদা, যাচ্ছি গো' বলিয়া উত্তর দিয়া দ্রুতপদে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। দুর্গাদাস তখন সকল কথা বুঝিলেন এবং বালক তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে প্রতারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে ভাবিয়া প্রথমে অপ্রতিভ ও কিছু রুষ্ট হইলেও পরক্ষণেই তাহার দরিদ্রা তন্তুবায়-রমণীর বেশ ও চাল-চলনের অনুকরণ কতদূর স্বাভাবিক হইয়াছে ভাবিয়া হাসিতে লাগিলেন। সীতানাথ প্রমুখ দুর্গাদাসের আত্মীয়েরা পরদিন ঐ কথা জানিতে পারিয়া গদাধরের নিকটে তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইয়াছে বলিয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। এখন হইতে

সীতানাথের ভবনে বালক উপস্থিত হইলে দুর্গাদাসের অন্তঃপুর-চারিণীরাও তাহার নিকটে আসিতে লাগিলেন।

সীতানাথের পরিবারবর্গ এবং বণিকপল্লীর অন্যান্য রমণীগণ ক্রমে গদাধরের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বালক তাঁহাদিগের নিকটে কিছুদিন না আসিলেই তাঁহারা তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইতেন। সীতানাথের ভবনে পাঠ ও সঙ্গীতাদি করিবার কালে গদাধরের কখন কখন ভাবাবেশ উপস্থিত হইত। তদ্দর্শনে রমণীগণের তাহার প্রতি ভক্তি বিশেষ প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঐরূপ ভাবসমাধিকালে তাঁহাদিগের অনেকে বালককে ভগবান শ্রীগৌরাঙ্গ বা শ্রীকৃষ্ণের জীবন্ত বিগ্রহজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন এবং অভিনয়কালে তাহার সহায়তা হইবে বলিয়া তাঁহারা একটি স্বর্ণনির্মিত মুরলী এবং স্ত্রী ও পুরুষ-চরিত্রের অভিনয়-উপযোগী বিবিধ পরিচ্ছদ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন।

বণিকপল্লীর রমণীগণের গদাধরের প্রতি ভক্তি-বিশ্বাস

ধর্মপ্রবণ, পূতস্বভাব, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতি এবং সপ্রেম, সরল ও অমায়িক ব্যবহারে গদাধর পল্লীরমণীগণের উপরে এইকালে যেরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, তাহার বিবরণ আমরা তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও মুখে সময়ে সময়ে শুনিবার অবসর লাভ করিয়াছিলাম। সন ১২৯৯ সালের বৈশাখের প্রারম্ভে শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রমুখ আমরা কয়েকজন কামারপুকুরদর্শনে গমন করিয়া সীতানাথ পাইনের কন্যা শ্রীমতী রুক্মিণীর সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলাম। তাঁহার

বয়স তখন আন্দাজ ষাট বৎসর হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত গদাধরের পূর্বোক্ত প্রভাব সম্বন্ধে তিনি আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার এখানে উল্লেখ করিলে পাঠকের ঐ বিষয় স্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। শ্রীমতী রুক্মিণী বলিয়াছিলেন—

গদাধরের সম্বন্ধে শ্রীমতী রুক্মিণীর কথা।

"আমাদের বাড়ী এখান হইতে একটু উত্তরে—ঐ দেখা যাইতেছে। আজকাল আমাদের বাড়ীর ভগ্নাবস্থা, পরিবারবর্গ একরূপ নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আমার বয়স যখন সতর-আঠার বৎসর ছিল, তখন বাড়ীটি দেখিলে লক্ষ্মীমন্তের বাড়ী বলিয়া বোধ হইত। আমার পিতার নাম ৺সীতানাথ পাইন। খুড়তুতো জাঠতুতো সকলকে ধরিয়া সর্বসুদ্ধ আমরা সতর-আঠারটি ভগ্নী ছিলাম এবং বয়সে পরস্পরে দুই-পাঁচ বৎসরের ছোট-বড় হইলেও ঐকালে সকলেই যৌবনে পদার্পণ করিয়াছিলাম। গদাধর বাল্যকাল হইতে আমাদিগের সহিত একত্রে খেলা-ধূলা করিতেন। সেজন্য আমাদিগের সহিত তাঁহার খুব ভাব ছিল। আমরা যৌবনে পদার্পণ করিলেও তিনি আমাদের বাড়ীতে যাইতেন এবং ঐরূপে তিনি বড় হইবার পরেও আমাদিগের বাড়ীর অন্দরে যাতায়াত করিতেন। বাবা তাঁহাকে বড় ভালবাসিতেন—আপন ইষ্টের মত দেখিতেন ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতেন। পাড়ায় কেহ কেহ তাঁহাকে বলিত, 'তোমার বাড়ীতে অতগুলি যুবতী কন্যা রহিয়াছে, গদাধরও এখন বড় হইয়াছে, তাহাকে এখনও অত বাড়ীর ভিতরে যাইতে দাও কেন?' বাবা তাহাতে বলিতেন, 'তোমরা নিশ্চিন্ত থাক, আমি গদাধরকে খুব

চিনি।' তাহারা সাহস করিয়া আর কিছু বলিতে পারিত না। গদাধর বাড়ীর অন্দরে আসিয়া আমাদিগকে কত পুরাণকথা বলিতেন, কত রঙ্গ-পরিহাস করিতেন। আমরা প্রায় প্রতিদিন ঐসকল শুনিতে শুনিতে আনন্দে গৃহকর্মসকল করিতাম। তিনি যখন আমাদের নিকটে থাকিতেন, তখন কত আনন্দে যে সময় কাটিয়া যাইত তাহা এক মুখে আর কি বলিব! যেদিন তিনি না আসিতেন, সেদিন তাঁহার অসুখ হইয়াছে ভাবিয়া আমাদিগের মন ছটফট করিত। সেদিন যতক্ষণ না আমাদিগের কেহ জল আনিবার বা অন্য কোন কর্মের দোহাই দিয়া বামুন-মার (চন্দ্রাদেবীর) সহিত দেখা করিয়া তাঁহার সংবাদ লইয়া আসিত, ততক্ষণ আমাদিগের কাহারও প্রাণে শান্তি থাকিত না। তাঁহার প্রত্যেক কথাটি আমাদের অমৃতের ন্যায় বোধ হইত। সেজন্য তিনি যেদিন আমাদিগের বাড়ীতে না আসিতেন, সেদিন তাঁহার কথা লইয়াই আমরা দিন কাটাইতাম।"

কেবলমাত্র রমণীগণের সহিত ঐরূপে মিলিত হইয়াই গদাধর ক্ষান্ত ছিল না। কিন্তু তাহার সর্বতোমুখী উদ্ভাবনী শক্তি এবং সকলের সহিত প্রেমপূর্ণ আচরণ তাহাকে গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেরই সহিত মিলিত করিয়াছিল। প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে গ্রামের বৃদ্ধ ও যুবকবৃন্দ যে-সকল স্থলে মিলিত হইয়া ভাগবতাদি পুরাণ-পাঠ বা সঙ্গীত-সঙ্কীর্তনাদিতে আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাহার সকল স্থলেই তাহার যাতায়াত ছিল। বালক ঐসকল স্থলের যেখানে যেদিন উপস্থিত থাকিত, সেখানে সেদিন

পল্লীর পুরুষসকলের গদাধরের প্রতি অনুরক্তি

আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইত। কারণ, তাহার ন্যায় পাঠ ও ধর্মতত্ত্বসকলের ভক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যা আর কেহই করিতে সক্ষম ছিল না। সঙ্কীর্তনকালে তাহার ন্যায় ভাবোন্মত্ততা, তাহার ন্যায় নূতন নূতন ভাবপূর্ণ আখর দিবার শক্তি এবং তাহার ন্যায় মধুর কণ্ঠ ও রমণীয় নৃত্য আর কাহারও ছিল না। আবার রঙ্গ-পরিহাসস্থলে তাহার ন্যায় সঙ্ দিতে, তাহার ন্যায় নরনারীর সকলপ্রকার আচরণ অনুকরণ করিতে এবং তাহার ন্যায় নূতন, নূতন গল্প ও গান যথাস্থলে অপূর্বভাবে লাগাইয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতে অন্য কেহ সমর্থ হইত না। সুতরাং যুবক ও বৃদ্ধেরা সকলেই তাহার প্রতি বিশেষ অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে তাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেন। বালকও সেইজন্য কোনদিন এক স্থলে, কোনদিন অন্য স্থলে তাহাদিগের সহিত সমভাবে মিলিত হইয়া তাহাদিগের আনন্দবর্ধন করিত।

আবার এই বয়সেই বালক পরিণতবয়স্কের ন্যায় বুদ্ধিধারণ করায় তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকে নিজ নিজ সাংসারিক সমস্যা-সকলের সমাধানের জন্য তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। ধার্মিক ব্যক্তিগণ ঐরূপে তাহার পূতস্বভাবে আকৃষ্ট হইয়া এবং ভগবৎ নাম ও কীর্তনে তাহার ভাবসমাধি হইতে দেখিয়া তাহার পরামর্শ গ্রহণপূর্বক নিজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেন।* কেবল ভণ্ড ও ধূর্তেরা তাহাকে দেখিতে পারিত না। কারণ, গদাধরের

* শুনা যায়, শ্রীনিবাস শাঁখারী প্রমুখ কয়েকজন যুবক শ্রীযুক্ত গদাধরকে এখন হইতে দেবতাজ্ঞানে ভক্তি ও পূজা করিত।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি তাহাদিগের উপরের মোহনীয় আবরণ ভেদ করিয়া গোপনীয় উদ্দেশ্যসকল ধরিয়া ফেলিত এবং সত্যনিষ্ঠ, স্পষ্টবাদী বালক অনেক সময়ে উহা সকলের নিকট কীর্তন করিয়া তাহাদিগকে অপদস্থ করিত। শুদ্ধ তাহাই নহে, রঙ্গপ্রিয় গদাধর অনেক সময়ে অপরের নিকটে তাহাদিগের কপটাচরণের অনুকরণ করিয়াও বেড়াইত। উহার জন্য মনে মনে কুপিত হইলেও সকলের প্রিয়, নির্ভীক বালকের তাহারা কিছুই করিতে পারিত না। সেজন্য অনেক সময়ে শরণাগত হইয়া তাহাদিগকে গদাধরের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে হইত। কারণ শরণাগতের উপর বালকের অশেষ করুণা সর্বদা পরিলক্ষিত হইত।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, গদাধর এখনও প্রতিদিন কোন না কোন সময়ে পাঠশালায় উপস্থিত হইত এবং বয়স্যদিগের প্রতি প্রেমই তাহার ঐরূপ করিবার কারণ ছিল। বাস্তবিক

গদাধরের অর্থকরী বিদ্যার্জনে উদাসীনতার কারণ

চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিবার পর হইতে বালকের ভক্তি ও ভাবুকতা এত অবধি প্রবৃদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল যে, পাঠশালার অর্থকরী শিক্ষা তাহার পক্ষে এককালে নিষ্প্রয়োজন বলিয়া তাহার নিকটে উপলব্ধি হইতেছিল। সে যেন এখন হইতেই অনুভব করিতেছিল, তাহার জীবন অন্য কার্যের নিমিত্ত সৃষ্ট হইয়াছে এবং ধর্মসাক্ষাৎকার করিতে তাহাকে তাহার সর্বশক্তি নিয়োজিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ের অস্পষ্ট ছায়া তাহার মনে অনেক সময়ে উদিত হইত, কিন্তু উহা এখনও পূর্ণাবয়ব না হওয়ায় সে উহাকে সকল সময়ে ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত

না। কিন্তু নিজ জীবন ভবিষ্যতে কিভাবে পরিচালিত করিবে, একথা তাহার মনে যখনই উদিত হইত, তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে তখনই ঈশ্বরের প্রতি একান্ত নির্ভরের দিকে ইঙ্গিত করিয়া তাহার কল্পনাপটে গৈরিক বসন, পবিত্র অগ্নি, ভিক্ষালব্ধ ভোজন এবং নিঃসঙ্গ বিচরণের ছবি উজ্জ্বল বর্ণে অঙ্কিত করিত। তাহার প্রেমপূর্ণ হৃদয় কিন্তু তাহাকে পরক্ষণেই মাতা ও ভ্রাতাদিগের সাংসারিক অবস্থার কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে ঐ পথে গমনের অভিলাষ পরিত্যাগ করিতে এবং নিজ পিতার ন্যায় নির্ভরশীল হইয়া সংসারে থাকিয়া তাঁহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিতে উত্তেজিত করিত। ঐরূপে বুদ্ধি ও হৃদয় তাহাকে ভিন্ন পথ নির্দেশ করায় সে 'যাহা করেন রঘুবীর' ভাবিয়া ঈশ্বরের আদেশলাভের জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকিত। কারণ, বালকের প্রেমপূর্ণ হৃদয় একান্ত আপনার বলিয়া তাঁহাকেই ইতিপূর্বে অবলম্বন করিয়াছিল। সুতরাং যথাকালে তিনিই ঐ প্রশ্ন সমাধান করিয়া দিবেন ভাবিয়া সে এখন অনেক সময়ে আপনাকে শান্ত করিত। ঐরূপে বুদ্ধি ও হৃদয়ের দ্বন্দ্বস্থলে তাহার বিশুদ্ধ হৃদয়ই পরিশেষে জয়লাভ করিত এবং উহার প্রেরণাতেই সে এখন সব কর্ম সম্পাদন করিতেছিল।

অসাধারণসহানুভূতিসম্পন্ন গদাধরের বিশুদ্ধ হৃদয় তাহাকে এখন হইতে অন্য এক বিষয়ও সময়ে সময়ে উপলব্ধি করাইতেছিল। পুরাণপাঠে ও সঙ্কীর্তনাদিসহায়ে উহা তাহাকে গ্রামের নরনারী-সকলের সহিত ইতিপূর্বে ঘনিষ্ঠভাবে সম্বদ্ধ করিয়া তাহাদিগকে

এত আপনার বলিয়া জ্ঞান করিতে শিখাইয়াছিল যে, তাহাদিগের জীবনের সুখ-দুঃখাদি সে এখন হইতে সর্বতোভাবে আপনার বলিয়া অনুভব করিতেছিল। সুতরাং তাহার বিচারশীল বুদ্ধি তাহাকে এইকালে যখনই সংসার-পরিত্যাগে ইঙ্গিত করিত,

গদাধরের হৃদয়ের প্রেরণা

তাহার হৃদয় তাহাকে তখনই ঐসকল নরনারীর সরল প্রেমপূর্ণ আচরণের এবং তাহার প্রতি অসীম বিশ্বাসের কথা স্মরণ করাইয়া তাহাকে এমনভাবে নিজ জীবন নিয়োজিত করিতে বলিত, যদ্দর্শনে তাহারা সকলে নিজ নিজ জীবন পরিচালিত করিবার উচ্চাদর্শ-লাভে কৃতার্থ হইতে পারে এবং তাহার সহিত তাহাদিগের বর্তমান সম্বন্ধ যাহাতে সুগভীর পারমার্থিক সম্বন্ধে পরিণত হইয়া চিরকালের নিমিত্ত অবিনশ্বর হইতে পারে। বালকের স্বার্থগন্ধশূন্য হৃদয় তাহাকে ঐ বিষয়ের স্পষ্ট আভাস প্রদানপূর্বক ঐজন্য বলিতেছিল, 'আপনার জন্য সংসারত্যাগ করা—সে তো স্বার্থপরতা ; যাহাতে ইহারা সকলে উপকৃত হয়, এমন কিছু কর।'

পাঠশালায় এবং পরে টোলে বিদ্যাভ্যাস সম্বন্ধে কিন্তু গদাধরের হৃদয় ও বুদ্ধি এখন মুক্তকণ্ঠে এক কথাই বলিতেছিল, কিন্তু সহসা পাঠশালা পরিত্যাগ করিলে বয়স্যগণ তাহার সঙ্গলাভে অনেকাংশে বঞ্চিত হইবে বলিয়া সে ঐ কার্য এখনও করিতে পারিতেছিল না। কারণ, গয়াবিষ্ণু-প্রমুখ বালকের সমবয়স্ক সকলে তাহাকে প্রাণের সহিত ভালবাসিত এবং তাহার অসাধারণ বুদ্ধি ও অসীম সাহস তাহাকে এখানেও দলপতিপদে প্রতিষ্ঠিত
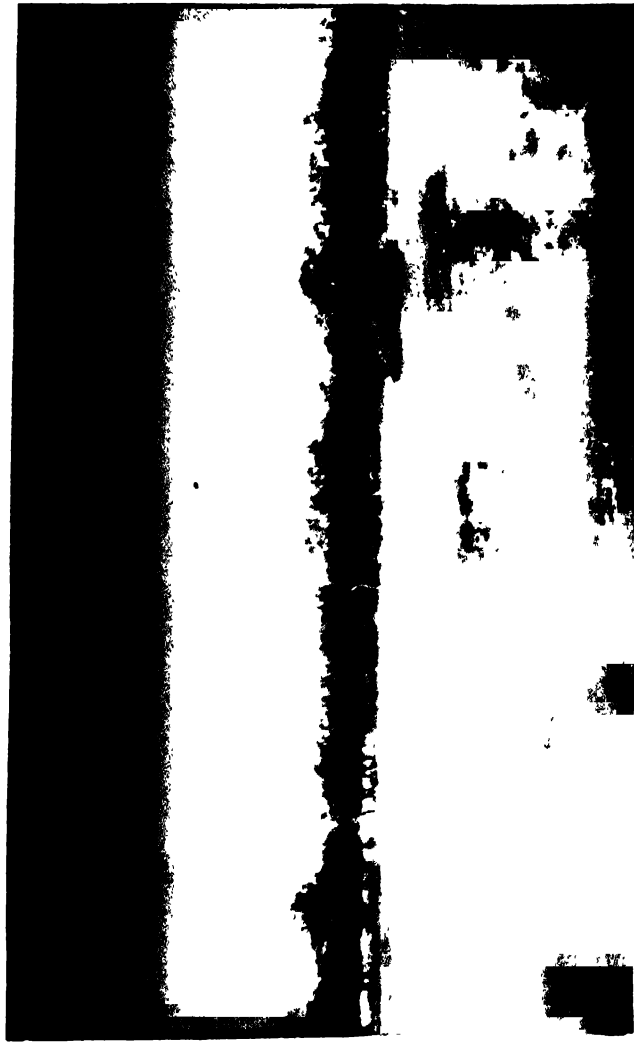
র   রর পশ্চিম প্র   অবস্থিত মানিকরাজার   ম্রকানন   বর্তমানে ইহা নাই

করিয়াছিল। এই সময়ে একটি ঘটনায় বালক অর্থকরী বিদ্যাভ্যাস পরিত্যাগ করিবার সুযোগ লাভ করিয়াছিল। গদাধরের অভিনয় করিবার শক্তি দেখিয়া তাহার কয়েকজন বয়স্য এখন একটি যাত্রার দল খুলিবার প্রস্তাব একদিন উত্থাপন করিল এবং তাহাদিগকে ঐ বিষয়ে শিক্ষাদানের ভার গদাধরকে লইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল। গদাধরও ঐ বিষয়ে সম্মত হইল; কিন্তু অভিভাবকগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা জানিয়া কোন্ স্থানে তাহারা ঐ বিষয়ে শিক্ষালাভ করিবে, তদ্বিষয়ে বালকগণ চিন্তিত হইয়া পড়িল। গদাধরের উদ্ভাবনী শক্তি তখন তাহাদিগকে মানিকরাজার আম্র-কানন দেখাইয়া দিল এবং স্থির হইল, পাঠশালা হইতে পলায়ন করিয়া তাহারা প্রতিদিন সকলে নির্দিষ্ট সময়ে ঐস্থানে উপস্থিত হইবে।

গদাধরের পাঠশালা পরিত্যাগ ও বয়স্যদিগের সহিত অভিনয়

সঙ্কল্প শীঘ্রই কার্যে পরিণত হইল এবং গদাধরের শিক্ষায় বালকগণ স্বল্প সময়ের ভিতরেই আপন আপন ভূমিকা ও গানসকল কণ্ঠস্থ করিয়া লইয়া শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক যাত্রাভিনয়ে আম্রকানন মুখরিত করিয়া তুলিল। অবশ্য ঐসকল যাত্রাভিনয়ের সকল অঙ্গই গদাধরকে নিজ উদ্ভাবনী শক্তিবলে সম্পূর্ণ করিয়া লইতে হইত এবং উহাদিগের প্রধান চরিত্রের ভূমিকাসকল তাহাকেই গ্রহণ করিতে হইত। যাহাই হউক, যাত্রার দল একপ্রকার মন্দ গঠিত হইল না দেখিয়া বালকেরা পরম আনন্দলাভ করিয়াছিল এবং শুনা যায়, আম্রকাননে অভিনয়কালেও গদাধরের সময়ে সময়ে ভাবসমাধি উপস্থিত হইয়াছিল।

সঙ্কীর্তন ও যাত্রাভিনয়ে গদাধরের অনেক কাল অতিবাহিত হওয়ায় তাহার চিত্রবিদ্যা এখন আর অধিক অগ্রসর হইতে পায় নাই। তবে শুনা যায়, গৌরহাটি গ্রামে তাহার কনিষ্ঠা ভগিনী শ্রীমতী সর্বমঙ্গলাকে বালক এই সময়ে একদিন দেখিতে গিয়াছিল এবং বাটীতে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইয়াছিল, তাহার ভগিনী প্রসন্নমুখে তাহার স্বামীর সেবা করিতেছে। উহা দেখিয়া সে অল্পদিন পরে তাহার ভগিনী ও তৎস্বামীর ঐভাবের একখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিল। আমরা শুনিয়াছি, পরিবারস্থ সকলে উহাতে চিত্রগত প্রতিমূর্তিদ্বয়ের সহিত শ্রীমতী সর্বমঙ্গলার ও তৎস্বামীর নিকট-সাদৃশ্য দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল।

গদাধরের চিত্রবিদ্যা ও মূর্তিগঠনে উন্নতি

দেবদেবীর মূর্তিসকল-সংগঠনে কিন্তু গদাধর বিশেষ পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ, তাহার ধর্মপ্রবণ প্রকৃতি তাহাকে ঐসকল মূর্তি গঠনপূর্বক বয়স্যগণ সমভিব্যাহারে যথাবিধি পূজা করিতে অনেক সময়ে প্রযুক্ত করিত।

যে যাহা হউক, পাঠশালা পরিত্যাগ করিয়া গদাধর নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় পূর্বোক্ত কার্যসকলে নিযুক্ত থাকিয়া এবং চন্দ্রাদেবীকে গৃহকর্মে সাহায্য করিয়া কাল কাটাইতে লাগিল। মাতৃহীন শিশু অক্ষয়ও তাহার হৃদয় অধিকার করিয়া তাহাকে অনেক সময় নিযুক্ত রাখিত। কারণ চন্দ্রাদেবীকে গৃহকর্মের অবসর দিবার জন্য ঐ শিশুকে ক্রোড়ে ধারণ করা এবং নানাভাবে খেলা দিয়া তাহাকে ভুলাইয়া রাখা এখন তাহার নিত্যকর্মসকলের অন্যতম হইয়া উঠিয়াছিল। ঐরূপে তিন বৎসরের

অধিককাল অতীত হইয়া গদাধর ক্রমে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছিল। ঐ সময় তিন বৎসরের পরিশ্রমে শ্রীযুক্ত রামকুমারের কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া তাঁহারও উপার্জনের পূর্বাপেক্ষা সুবিধা হইয়াছিল।

গদাধরের সম্বন্ধে রামকুমারের চিন্তা ও তাহাকে কলিকাতায় আনয়ন

কলিকাতায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিলেও শ্রীযুক্ত রামকুমার বৎসরান্তে একবার কয়েক পক্ষের জন্য কামারপুকুরে আগমনপূর্বক জননী ও ভ্রাতৃবৃন্দের তত্ত্বাবধান করিতেন। গদাধরের বিদ্যার্জনে উদাসীনতা ঐ অবসরে লক্ষ্য করিয়া তিনি এখন চিন্তিত হইয়াছিলেন। সে যেভাবে বর্তমানে কাল কাটাইয়া থাকে, তিনি তদ্বিষয়ে সবিশেষ অনুসন্ধান লইলেন এবং মাতা ও মধ্যম ভ্রাতা রামেশ্বরের সহিত পরামর্শ করিয়া তাহাকে কলিকাতায় নিজ সমীপে রাখাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া নিরূপণ করিলেন। ছাত্রসংখ্যার বৃদ্ধির সহিত টোলের গৃহকর্মও অনেক বাড়িয়া গিয়াছিল; সেজন্য ঐসকল বিষয়ে সাহায্য করিতে একজন লোকের অভাবও তিনি ঐসময়ে বোধ করিতেছিলেন। অতএব স্থির হইল যে, গদাধর কলিকাতায় আসিয়া তাঁহাকে ঐসকল বিষয়ে কিছু কিছু সাহায্য দান করিবে এবং অন্যান্য ছাত্রগণের ন্যায় তাঁহারই নিকটে বিদ্যাভ্যাস করিবে। গদাধরের নিকটে ঐ প্রস্তাব উপস্থিত হইলে পিতৃতুল্য অগ্রজকে সাহায্য করিতে হইবে জানিতে পারিয়া সে কলিকাতা-গমনে কিছুমাত্র আপত্তি করিল না। অনন্তর শুভদিনে শুভক্ষণে শ্রীযুক্ত রামকুমার ও গদাধর ৺রঘুবীরকে প্রণামপূর্বক চন্দ্রাদেবীর পদধূলি মস্তকে ধারণ করিয়া কলিকাতায়

যাত্রা করিলেন। কামারপুকুরের আনন্দের হাট কিছুকালের জন্য ভাঙ্গিয়া যাইল এবং শ্রীমতী চন্দ্রা ও গদাধরের প্রতি অনুরক্ত নরনারীসকলে তাহার মধুময় স্মৃতি ও ভাবী উন্নতির চিন্তা করিয়া কোনরূপে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কলিকাতায় আগমন করিবার পরে শ্রীযুক্ত গদাধর যে-সকল অলৌকিক চেষ্টা করিয়াছিলেন, পাঠক সে-সকল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গের 'সাধকভাব' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইবেন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে পূর্বকথা ও বাল্যজীবন পর্ব
সম্পূর্ণ।

পরিশিষ্ট

পুস্তকস্থ ঘটনাবলীর সময়-নিরূপক তালিকা

সাল	খ্রীষ্টাব্দ	ঘটনা
১১৮১	১৭৭৫	—শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের জন্ম।
১১৯৭	১৭৯১	—শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর জন্ম।
১২০৫	১৭৯৯	—শ্রীমতী চন্দ্রাদেবীর সহিত শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের বিবাহ—ক্ষুদিরামের বয়স ২৪ বৎসর ও চন্দ্রাদেবীর বয়স ৮ বৎসর। সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়সে চন্দ্রাদেবীর মৃত্যু।]
১২১১	১৮০৫	—শ্রীযুক্ত রামকুমারের জন্ম। অতএব রামকুমার ঠাকুরের অপেক্ষা ৩১ বৎসরের বড়।
১২১৬	১৮১০	—শ্রীমতী কাত্যায়নীর জন্ম।
১২২০	১৮১৪	—শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের কামারপুকুরে আসিয়া বাস করা। তখন ক্ষুদিরামের বয়স ৩৯ বৎসর।
১২২৬	১৮২০	—রামকুমারের ও কাত্যায়নীর বিবাহ।
১২৩০	১৮২৪	—শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ৺রামেশ্বর-যাত্রা।
১২৩২	১৮২৬	—শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের জন্ম। অতএব তিনি ঠাকুরের অপেক্ষা ১০ বৎসরের বড়।
১২৪০	১৮৩৪	—২৪ বৎসর বয়সে কাত্যায়নীর শরীরে ভূতাবেশ।

পরিশিষ্ট

১২৪১ ১৮৩৫—শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের ৺গয়াদর্শন। তখন তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর।

১২৪২ ১৮৩৬—৬ই ফাল্গুন, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্ম, ব্রাহ্মমুহূর্তে।

১২৪৫ ১৮৩৯—সর্বমঙ্গলার জন্ম।

১২৪৯ ১৮৪২—শ্রীযুক্ত ক্ষুদিরামের দেহত্যাগ, ৬৮ বৎসর বয়সে। তখন ঠাকুরের বয়স ৭ বৎসর।

১২৫৪ ১৮৪৮—রামেশ্বর ও সর্বমঙ্গলার বিবাহ।

১২৫৫ ১৮৪৯—শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের জন্মান্তে ৩৬ বৎসর বয়সে তৎপত্নীর মৃত্যু। তখন রামকুমারের বয়স ৪৪ বৎসর।

১২৫৬ ১৮৫০—শ্রীযুক্ত রামকুমারের কলিকাতায় টোল খোলা।

১২৫৯ ১৮৫৩—ঠাকুরের কলিকাতায় আগমন ও ঝামাপুকুর চতুষ্পাঠীতে বাস।

১২৬২ ১৮৫৫—দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী-প্রতিষ্ঠা।

১২৬৩ ১৮৫৭—শ্রীযুক্ত রামকুমারের মৃত্যু (৫২ বৎসর বয়সে)।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

সাধকভাব

গ্রন্থ-পরিচয়

ঈশ্বরেচ্ছায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক সাধকভাবের আলোচনা সম্পূর্ণ হইল। ইহাতে আমরা তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব সাধনানুরাগ এবং সাধন-তত্ত্বের দার্শনিক আলোচনা করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, কিন্তু সপ্তদশ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে চল্লিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত ঠাকুরের জীবনের সকল প্রধান ঘটনাগুলির সময় নিরূপণপূর্বক ধারাবাহিকভাবে পাঠককে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। অতএব সাধকভাবকে ঠাকুরের সাধক-জীবনের এবং স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ তাঁহার শিষ্যসকল তাঁহার শ্রীপদপ্রান্তে উপস্থিত হইবার পূর্বকাল পর্যন্ত জীবনের ইতিহাস বলা যাইতে পারে।

বর্তমান গ্রন্থ লিখিতে বসিয়া আমরা ঠাকুরের জীবনের সকল ঘটনার সময় নিরূপণ করিতে পারিব কি না তদ্বিষয়ে বিশেষ সন্দিহান ছিলাম। ঠাকুর তাঁহার সাধক-জীবনের কথাসকল আমাদিগের অনেকের নিকটে বলিলেও, উহাদিগের সময় নিরূপণ করিয়া ধারাবাহিকভাবে কাহারও নিকটে বলেন নাই। তজ্জন্য তাঁহার ভক্তসকলের মনে তাঁহার জীবনের ঐ কালের কথাসকল দুর্বোধ্য ও জটিল হইয়া রহিয়াছে; কিন্তু অনুসন্ধানের ফলে আমরা তাঁহার কৃপায় এখন অনেকগুলি ঘটনার যথার্থ সময়নিরূপণে সমর্থ হইয়াছি।

ঠাকুরের জন্ম-সাল লইয়া এতকাল পর্যন্ত গণ্ডগোল চলিয়া আসিতেছিল। কারণ, ঠাকুর আমাদিগকে নিজমুখে বলিয়াছিলেন, তাঁহার যথার্থ জন্মপত্রিকাখানি হারাইয়া গিয়াছিল এবং পরে যেখানি করা হইয়াছিল, সেখানি ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ। একশত বৎসরেরও অধিককালের পঞ্জিকাসকল সন্ধানপূর্বক আমরা এখন ঐ বিরোধ মীমাংসা করিতেও

সক্ষম হইয়াছি এবং ঐজন্য ঠাকুরের জীবনের ঘটনাগুলির সময় নিরূপণ করা আমাদের পক্ষে সুসাধ্য হইয়াছে। ঠাকুরের ৺ষোড়শীপূজা সম্বন্ধে সত্য ঘটনা কাহারও এতদিন জানা ছিল না। বর্তমান গ্রন্থপাঠে পাঠকের ঐ ঘটনা বুঝা সহজ হইবে।

পরিশেষে, শ্রীশ্রীঠাকুরের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইয়া গ্রন্থখানি লোককল্যাণ সাধন করুক, ইহাই কেবল তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা। ইতি—

প্রণত

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

নবম অধ্যায়

দশম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়

ঊনবিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়

পরিশিষ্ট

৺ষোড়শীপূজার পর হইতে পূর্বপরিদৃষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্তসকলের আগমনকালের পূর্ব পর্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

অবতরণিকা

সাধকভাবালোচনার প্রয়োজন

জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, লোকগুরু বুদ্ধ ও শ্রীচৈতন্য ভিন্ন অবতারপুরুষসকলের জীবনে সাধকভাবের কার্যকলাপ বিস্তৃত লিপিবদ্ধ নাই। যে উদ্দাম অনুরাগ ও উৎসাহ হৃদয়ে পোষণ করিয়া তাঁহারা জীবনে সত্যলাভে অগ্রসর হইয়াছিলেন, যে আশা-নিরাশা, ভয়-বিস্ময়, আনন্দ-ব্যাকুলতার তরঙ্গে পড়িয়া তাঁহারা কখনও উল্লসিত এবং কখনও মুহ্যমান হইয়াছিলেন—অথচ নিজ গন্তব্যলক্ষ্যে নিয়ত স্থির দৃষ্টি রাখিতে বিস্মৃত হন নাই, তদ্বিষয়ের বিশদ আলোচনা তাঁহাদিগের জীবনেতিহাসে পাওয়া যায় না। অথবা, জীবনের শেষভাগে অনুষ্ঠিত বিচিত্র কার্যকলাপের সহিত তাঁহাদিগের বাল্যাদি কালের শিক্ষা, উদ্যম ও কার্যকলাপের একটা স্বাভাবিক পূর্বাপর কার্যকারণসম্বন্ধ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে—

আচার্যদিগের সাধকভাব লিপিবদ্ধ পাওয়া যায় না

বৃন্দাবনের গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণ কিরূপে ধর্মপ্রতিষ্ঠাপক দ্বারকানাথ শ্রীকৃষ্ণে পরিণত হইলেন, তাহা পরিষ্কার বুঝা যায় না। ঈশার মহদুদার জীবনে ত্রিশ বৎসর বয়সের পূর্বের কথা দুটি একটা মাত্রই জানিতে পারা

যায়। আচার্য শঙ্করের দিগ্বিজয় কাহিনীমাত্রই সবিস্তার লিপিবদ্ধ। এইরূপ, অন্যত্র সর্বত্র।

ঐরূপ হইবার কারণ খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। ভক্তদিগের ভক্তির আতিশয্যেই বোধ হয় ঐ সকল কথা লিপিবদ্ধ হয় নাই। নরের অসম্পূর্ণতা দেবচরিত্রে আরোপ করিতে সঙ্কুচিত হইয়াই তাঁহারা বোধ হয় ঐ সকল কথা লোক-নয়নের অন্তরালে রাখা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছেন। অথবা হইতে পারে—মহাপুরুষচরিত্রের সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ মহান ভাবসকল সাধারণের সম্মুখে উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া তাহাদিগের যতটা কল্যাণ সাধিত করিবে, ঐ সকল ভাবে উপনীত হইতে তাঁহারা যে অলৌকিক উদ্যম করিয়াছেন, তাহা ততটা করিবে না ভাবিয়া উহাদের বিবরণ লিপিবদ্ধ করা তাঁহারা অনাবশ্যক বোধ করিয়াছেন।

তাঁহারা কোনও কালে অসম্পূর্ণ ছিলেন, এ কথা ভক্ত মানব ভাবিতে চাহে না

ভক্ত আপনার ঠাকুরকে সর্বদা পূর্ণ দেখিতে চাহেন। নরশরীর ধারণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাতে যে নরসুলভ দুর্বলতা, দৃষ্টি ও শক্তি-হীনতা কোন কালে কিছুমাত্র বর্তমান ছিল, তাহা স্বীকার করিতে চাহেন না। বালগোপালের মুখগহ্বরে তাঁহারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রতিষ্ঠিত দেখিতে সর্বদা প্রয়াসী হন এবং বালকের অসম্বদ্ধ চেষ্টাদির ভিতরে পরিণতবয়স্কের বুদ্ধি ও বহুদর্শিতার পরিচয় পাইবার কেবলমাত্র প্রত্যাশা রাখেন না, কিন্তু সর্বজ্ঞতা, সর্বশক্তিমত্তা এবং বিশ্বজনীন উদারতা ও প্রেমের সম্পূর্ণ প্রতিকৃতি দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠেন। অতএব, নিজ ঐশ্বরিক স্বরূপে সর্বসাধারণকে ধরা না দিবার জন্যই অবতারপুরুষেরা সাধনভজনাদি মানসিক চেষ্টা এবং আহার, নিদ্রা, ক্লান্তি, ব্যাধি,

দেহত্যাগ প্রভৃতি শারীরিক অবস্থানিচয়ের মিথ্যা ভান করিয়া থাকেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করা তাঁহাদিগের পক্ষে বিচিত্র নহে। আমাদের কালেই আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, কত বিশিষ্ট ভক্ত ঠাকুরের শারীরিক ব্যাধি সম্বন্ধে ঐরূপে মিথ্যা ভান বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন।

ঐরূপ ভাবিলে ভক্তের ভক্তির হানি হয়, একথা যুক্তিযুক্ত নহে

নিজ দুর্বলতার জন্যই ভক্ত ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। বিপরীত সিদ্ধান্ত করিলে তাঁহার ভক্তির হানি হয় বলিয়াই বোধ হয় তিনি নরসুলভ চেষ্টা ও উদ্দেশ্যাদি অবতারপুরুষে আরোপ করিতে চাহেন না। অতএব, তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে আমাদের বলিবার কিছুই নাই। তবে এ কথা ঠিক যে, ভক্তির অপরিণত অবস্থাতেই ভক্তে ঐরূপ দুর্বলতা পরিলক্ষিত হয়। ভক্তির প্রথমাবস্থাতেই ভক্ত ভগবানকে ঐশ্বর্যবিরহিত করিয়া চিন্তা করিতে পারেন না। ভক্তি পরিপক্ক হইলে, ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগ কালে গভীর ভাব ধারণ করিলে, ঐরূপ ঐশ্বর্য-চিন্তা ভক্তিপথের অন্তরায় বলিয়া বোধ হইতে থাকে, এবং ভক্ত তখন উহা যত্নে দূরে পরিহার করেন। সমগ্র ভক্তিশাস্ত্র ঐ কথা বারংবার বলিয়াছেন। দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণমাতা যশোদা গোপালের দিব্য বিভূতি-নিচয়ের নিত্য পরিচয় পাইয়াও তাঁহাকে নিজ বালকবোধেই লালন-তাড়নাদি করিতেছেন। গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণকে জগৎকারণ ঈশ্বর বলিয়া জানিয়াও তাঁহাতে কান্তভাব ভিন্ন অন্যভাবের আরোপ করিতে পারিতেছেন না। এইরূপ অন্যত্র দ্রষ্টব্য।

ভগবানের শক্তিবিশেষের সাক্ষাৎ পরিচায়ক কোনরূপ দর্শনাদিলাভের জন্য আগ্রহাতিশয় জানাইলে ঠাকুর সেজন্য তাঁহার ভক্তদিগকে অনেক সময় বলিতেন, "ওগো, ঐরূপ দর্শন করতে চাওয়াটা ভাল নয়; ঐশ্বর্য

দেখলে ভয় আসবে; খাওয়ান, পরান, ভালবাসায় (ঈশ্বরের সহিত) 'তুমি আমি'-ভাব, এটা আর থাকবে না।" কত সময়েই না আমরা তখন ক্ষুণ্ণমনে ভাবিয়াছি, ঠাকুর কৃপা করিয়া ঐরূপ দর্শনাদিলাভ করাইয়া দিবেন না বলিয়াই আমাদিগকে ঐরূপ বলিয়া ক্ষান্ত করাইতেছেন। সাহসে নির্ভর করিয়া কোনও ভক্ত যদি সে সময় প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বলিত, "আপনার কৃপাতে অসম্ভব সম্ভব হইতে পারে, কৃপা করিয়া আমাকে ঐরূপ দর্শনাদি করাইয়া দিন", ঠাকুর তাহাতে মধুর নম্রভাবে বলিতেন, "আমি কি কিছু করিয়া দিতে পারি রে—মার যা ইচ্ছা তাই হয়।" ঐরূপ বলিলেও যদি সে ক্ষান্ত না হইয়া বলিত, "আপনার ইচ্ছা হইলেই মা'র ইচ্ছা হইবে", ঠাকুর তাহাতে অনেক সময় তাহাকে বুঝাইয়া বলিতেন, "আমি ত মনে করি রে, তোদের সকলের সব রকম অবস্থা, সব রকম দর্শন হোক, কিন্তু তা হয় কৈ?" উহাতেও ভক্ত যদি ক্ষান্ত না হইয়া বিশ্বাসের জেদ চালাইতে থাকিত, তাহা হইলে ঠাকুর তাহাতে আর কিছু না বলিয়া স্নেহপূর্ণ দর্শন ও মৃদুমন্দ হাস্যের দ্বারা তাহার প্রতি নিজ ভালবাসার পরিচয়মাত্র দিয়া নীরব থাকিতেন; অথবা বলিতেন, "কি বলব বাবু, মা'র যা ইচ্ছা তাই হোক।" ঐরূপ নির্বন্ধাতিশয়ে পড়িয়াও কিন্তু ঠাকুর তাহার ঐরূপ ভ্রমপূর্ণ দৃঢ় বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া তাহার ভাব নষ্ট করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেন না। ঠাকুরের ঐরূপ ব্যবহার আমরা অনেক সময় প্রত্যক্ষ করিয়াছি এবং তাঁহাকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি, "কারও ভাব নষ্ট করতে নেই রে, কারও ভাব নষ্ট করতে নেই।"

ঠাকুরের উপদেশ—ঐশ্বর্য-উপলব্ধিতে 'তুমি-আমি'-ভাবে ভালবাসা থাকে না; কাহারও ভাব নষ্ট করিবে না

প্রবন্ধোক্ত বিষয়ের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ না থাকিলেও কথাটি যখন পাড়া গিয়াছে, তখন একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়া পাঠককে বুঝাইয়া দেওয়া ভাল। ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরের শরীর-মনে ধর্মশক্তি সঞ্চারিত করিবার ক্ষমতা আধ্যাত্মিক জীবনে অতি অল্প সাধকের ভাগ্যে লাভ হইয়া থাকে। স্বামী বিবেকানন্দ কালে ঐ ক্ষমতায় ভূষিত হইয়া প্রভূত লোককল্যাণ সাধন করিবেন—ঠাকুর এ কথা আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উত্তমাধিকারী সংসারে বিরল—প্রথম হইতে ঠাকুর ঐ কথা সম্যক্ বুঝিয়া বেদান্তোক্ত অদ্বৈতজ্ঞানের উপদেশ দিয়া তাঁহাব চরিত্র ও ধর্ম্ম-জীবন একভাবে গঠিত করিতেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের প্রণালীতে দ্বৈতভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অভ্যস্ত স্বামীজীর নিকট বেদান্তের 'সোঽহং' ভাবের উপাসনাটা তখন পাপ বলিয়া পরিগণিত হইলেও ঠাকুর তাঁহাকে তদনুশীলন করাইতে নানাভাবে চেষ্টা করিতেন। স্বামীজী বলিতেন, "দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইবামাত্র ঠাকুর অপর সকলকে যাহা পড়িতে নিষেধ করিতেন, সেই সকল পুস্তক আমায় পড়িতে দিতেন। অন্যান্য পুস্তকের সহিত তাঁহার ঘরে একখানি 'অষ্টাবক্র-সংহিতা' ছিল। কেহ সেখানি বাহির করিয়া পড়িতেছে দেখিতে পাইলে ঠাকুর তাহাকে ঐ পুস্তক পড়িতে নিষেধ করিয়া 'মুক্তি ও তাহার সাধন', 'ভগবদ্গীতা' বা কোন পুরাণগ্রন্থ পড়িবার জন্য দেখাইয়া দিতেন। আমি কিন্তু তাঁহার নিকট যাইলেই ঐ 'অষ্টাবক্র-সংহিতা'খানি বাহির করিয়া পড়িতে বলিতেন। অথবা অদ্বৈতভাবপূর্ণ 'অধ্যাত্মরামায়ণের' কোন অংশ পাঠ করিতে বলিতেন। যদি বলিতাম—ও বই পড়ে কি হবে? আমি

ভাব নষ্ট করা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—কাশীপুরের বাগানে শিবরাত্রির কথা

ভগবান, একথা মনে করাও পাপ। ঐ পাপকথা এই পুস্তকে লেখা আছে। ও বই পুড়িয়ে ফেলা উচিত। ঠাকুর তাহাতে হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'আমি কি তোকে পড়তে বলছি? একটু পড়ে আমাকে শুনাতে বলছি। খানিক পড়ে আমাকে শুনা না। তাতে ত আর তোকে মনে করতে হবে না, তুই ভগবান।' কাজেই অনুরোধে পড়িয়া অল্পবিস্তর পড়িয়া তাঁহাকে শুনাইতে হইত।"

স্বামীজীকে ঐভাবে গঠিত করিতে থাকিলেও ঠাকুর তাঁহার অন্যান্য বালকদিগকে কাহাকেও সাকারোপাসনা, কাহাকেও নিরাকার সগুণ ঈশ্বরোপাসনা, কাহাকেও শুদ্ধা ভক্তির ভিতর দিয়া, আবার কাহাকেও বা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ভিতর দিয়া—অন্য নানাভাবে ধর্মজীবনে অগ্রসর করাইয়া দিতেছিলেন। এইরূপে স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ বালকভক্তগণ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট একত্র শয়ন-উপবেশন, আহার-বিহার, ধর্মচর্চা প্রভৃতি করিলেও ঠাকুর অধিকারিভেদে তাহাদিগকে নানাভাবে গঠিত করিতেছিলেন।

১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাস। কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর গলরোগে দিন দিন ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছেন। কিন্তু যেন পুর্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহে ভক্তদিগের ধর্মজীবন-গঠনে মনোনিবেশ করিয়াছেন—বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের। আবার স্বামীজীকে সাধনমার্গের উপদেশ দিয়া এবং তদনুযায়ী অনুষ্ঠানে সহায়তামাত্র করিয়াই ঠাকুর ক্ষান্ত ছিলেন না। নিত্য সন্ধ্যার পর, অপর সকলকে সরাইয়া দিয়া তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া একাদিক্রমে দুই তিন ঘণ্টাকাল ধরিয়া তাঁহার সহিত অপর বালক ভক্তদিগকে সংসারে পুনরায় ফিরিতে না দিয়া কিভাবে পরিচালিত ও একত্র রাখিতে হইবে, তদ্বিষয়ে আলোচনা ও শিক্ষাপ্রদান করিতেছিলেন।

ভক্তদিগের প্রায় সকলেই তখন ঠাকুরের এইরূপ আচরণে ভাবিতেছিলেন, নিজ সঙ্ঘ সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্যই ঠাকুর গলরোগরূপ একটা মিথ্যা ভান করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন—ঐ কার্য সুসিদ্ধ হইলেই আবার পূর্ববৎ সুস্থ হইবেন। স্বামী বিবেকানন্দ কেবল দিন দিন প্রাণে প্রাণে বুঝিতেছিলেন, ঠাকুর যেন ভক্তদিগের নিকট হইতে বহুকালের জন্য বিদায় গ্রহণ করিবার মত সকল আয়োজন ও বন্দোবস্ত করিতেছেন। তিনিও ঐ ধারণা সকল সময়ে রাখিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ।

সাধনবলে স্বামীজীর ভিতর তখন স্পর্শসহায়ে অপরে ধর্মশক্তিসংক্রমণ করিবার ক্ষমতার ঈষৎ উন্মেষ হইয়াছে। তিনি মধ্যে মধ্যে নিজের ভিতর ঐরূপ শক্তির উদয় স্পষ্ট অনুভব করিলেও, কাহাকেও ঐভাবে স্পর্শ করিয়া ঐ বিষয়ের সত্যাসত্য এপর্যন্ত নির্ধারণ করেন নাই। কিন্তু নানাভাবে প্রমাণ পাইয়া বেদান্তের অদ্বৈতমতে বিশ্বাসী হইয়া, তিনি তর্কযুক্তিসহায়ে ঐ মত বালক ও গৃহস্থ ভক্তদিগের ভিতর প্রবিষ্ট করাইবার চেষ্টা করিতেছিলেন। তুমুল আন্দোলনে ঐ বিষয় লইয়া ভক্তদিগের ভিতর কখন কখন বিষম গণ্ডগোল চলিতেছিল। কারণ স্বামীজীর স্বভাবই ছিল, যখন যাহা সত্য বলিয়া বুঝিতেন, তখনি তাহা হাঁকিয়া ডাকিয়া সকলকে বলিতেন এবং তর্কযুক্তিসহায়ে অপরকে গ্রহণ করাইতে চেষ্টা করিতেন। ব্যবহারিক জগতে সত্য যে, অবস্থা ও অধিকারিভেদে নানা আকার ধারণ করে—বালক স্বামীজী তাহা তখনও বুঝিতে পারেন নাই।

আজ ফাল্গুনী শিবরাত্রি। বালক ভক্তদিগের মধ্যে তিন চারিজন স্বামীজীর সহিত স্বেচ্ছায় ব্রতোপবাস করিয়াছে। পূজা ও জাগরণে

রাত্রি কাটাইবার তাহাদের অভিলাষ। গোলমালে ঠাকুরের পাছে আরামের ব্যাঘাত হয়, এজন্য বসতবাটী হইতে কিঞ্চিদ্দূর পূর্বে অবস্থিত রন্ধনশালার জন্য নির্মিত একটি গৃহে পূজার আয়োজন হইয়াছে। সন্ধ্যার পরে বেশ একপশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে এবং নবীন মেঘে সময়ে সময়ে মহাদেবের জটাপটলের ন্যায় বিদ্যুৎপুঞ্জের আবির্ভাব দেখিয়া ভক্তগণ আনন্দিত হইয়াছেন।

দুশটার পর প্রথম প্রহরের পূজা, জপ ও ধ্যান সাঙ্গ করিয়া স্বামীজী পূজার আসনে বসিয়াই বিশ্রাম ও কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সঙ্গীদিগের মধ্যে একজন তাঁহার নিমিত্ত তামাকু সাজিতে বাহিরে গমন করিল এবং অপর একজন কোন প্রয়োজন সারিয়া আসিতে বসতবাটীর দিকে চলিয়া গেল। এমন সময় স্বামীজীর ভিতর সহসা পূর্বোক্ত দিব্য বিভূতির তীব্র অনুভবের উদয় হইল এবং তিনিও উহা অন্য কার্যে পরিণত করিয়া উহার ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বাসনায় সম্মুখোপবিষ্ট স্বামী অভেদানন্দকে বলিলেন, "আমাকে খানিকক্ষণ ছুঁয়ে থাক্‌ত।" ইতিমধ্যে তামাকু লইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া পূর্বোক্ত বালক দেখিল, স্বামীজী স্থিরভাবে ধ্যানস্থ রহিয়াছেন এবং অভেদানন্দ চক্ষু মুদ্রিত করিয়া নিজ দক্ষিণ হস্ত দ্বারা তাঁহার দক্ষিণ জানু স্পর্শ করিয়া রহিয়াছে ও তাহার ঐ হস্ত ঘন ঘন কম্পিত হইতেছে। দুই এক মিনিটকাল ঐভাবে অতিবাহিত হইবার পর স্বামীজী চক্ষু উন্মীলন করিয়া বলিলেন, "ব্যস্, হয়েছে। কিরূপ অনুভব করলি ?"

অ। ব্যাটারি (electric battery) ধরলে যেমন কি একটা ভিতরে আসছে জানতে পারা যায় ও হাত কাঁপে, ঐ সময়ে তোমাকে ছুঁয়ে সেইরূপ অনুভব হতে লাগল।

অপর ব্যক্তি অভেদানন্দকে জিজ্ঞাসা করিল, "স্বামীজীকে স্পর্শ করে তোমার হাত আপনা আপনি ঐরূপ কাঁপছিল ?"

অ। হাঁ, স্থির করে রাখতে চেষ্টা করেও রাখতে পারছিলুম না।

ঐ সম্বন্ধে অন্য কোন কথাবার্তা তখন আর হইল না, স্বামীজী তামাকু খাইলেন। পরে সকলে দুই-প্রহরের পূজা ও ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। অভেদানন্দ ঐকালে গভীর ধ্যানস্থ হইল। ঐরূপ গভীর ভাবে ধ্যান করিতে আমরা তাহাকে ইতিপূর্বে আর কখনও দেখি নাই। তাহার সর্বশরীর আড়ষ্ট হইয়া গ্রীবা ও মস্তক বাঁকিয়া গেল এবং কিছুক্ষণের জন্য বহির্জগতের সংজ্ঞা এককালে লুপ্ত হইল। উপস্থিত সকলের মনে হইল, স্বামীজীকে ইতিপূর্বে স্পর্শ করার ফলেই তাহার এখন ঐরূপ গভীর ধ্যান উপস্থিত হইয়াছে। স্বামীজীও তাহার ঐরূপ অবস্থা লক্ষ্য করিয়া জনৈক সঙ্গীকে ইঙ্গিত করিয়া উহা দেখাইলেন।

রাত্রি চারিটার সময় চতুর্থ প্রহরেব পূজা শেষ হইবার পরে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ পূজাগৃহে উপস্থিত হইয়া স্বামীজীকে বলিলেন, "ঠাকুর ডাকিতেছেন।" শুনিয়াই স্বামীজী বসতবাটীর দ্বিতলগৃহে ঠাকুরের নিকট চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দও সঙ্গে যাইলেন।

স্বামীজীকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "কি রে ? একটু জমতে না জমতেই খরচ ? আগে নিজের ভিতর ভাল করে জমতে দে, তখন কোথায় কি ভাবে খরচ করতে হবে, তা বুঝতে পারবি—মা-ই বুঝিয়ে দেবেন। ওর ভিতর তোর ভাব ঢুকিয়ে ওর কি অপকারটা করলি বল দেখি ? ও এতদিন এক ভাব দিয়ে যাচ্ছিল, সেটা সব নষ্ট হয়ে গেল !—ছয় মাসের গর্ভ যেন নষ্ট হল! যা হবার হয়েছে, এখন হতে

হঠাৎ অমনটা আর করিস্ নি। যা হোক, ছোঁড়াটার অদেষ্ট ভাল।”

স্বামিজী বলিতেন, “আমি ত একেবারে অবাক্। পূজার সময় নীচে আমরা যা যা করেছি, ঠাকুর সমস্ত জানতে পেরেছেন! কি করি—তাঁর ঐরূপ ভৎ‍র্সনায় চুপ করে রইলুম।”

ফলে দেখা গেল অভেদানন্দ যে ভাবসহায়ে পূর্বে ধর্মজীবনে অগ্রসর হইতেছিল, তাহার ত একেবারে উচ্ছেদ হইয়া যাইলই, আবার অদ্বৈতভাব ঠিক ঠিক ধরা ও বুঝা কালসাপেক্ষ হওয়ায় বেদান্তের দোহাই দিয়া সে কখন কখন সদাচারবিরোধী অনুষ্ঠানসকল করিয়া ফেলিতে লাগিল। ঠাকুর তাহাকে এখন হইতে অদ্বৈতভাবের উপদেশ করিতে ও সস্নেহে তাহার ঐরূপ কার্যকলাপের ভুল দেখাইয়া দিতে থাকিলেও অভেদানন্দের ঐ ভাব-প্রণোদিত হইয়া জীবনের প্রত্যেক কার্যানুষ্ঠানে যথাযথভাবে অগ্রসর হওয়া, ঠাকুরের শরীরত্যাগের বহুকাল পরে সাধিত হইয়াছিল।

সত্যলাভ অথবা জীবনে উহার পূর্ণাভিব্যক্তির জন্য অবতার-পুরুষকৃত চেষ্টাসকলকে মিথ্যা ভান বলিয়া যাঁহারা গ্রহণ করেন, ঐ শ্রেণীর ভক্তদিগকে আমাদিগের বক্তব্য যে, ঠাকুরকে তাঁহাদিগের ন্যায় অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে আমরা কখনও শুনি নাই। বরং অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি, ‘নরলীলায় সমস্ত কার্যই সাধারণ নরের ন্যায় হয়; নরশরীর স্বীকার করিয়া ভগবানকে নরের ন্যায় সুখদুঃখ ভোগ করিতে এবং নরের ন্যায় উদ্যম, চেষ্টা ও তপস্যা দ্বারা সকল বিষয়ে পূর্ণত্বলাভ করিতে হয়।’ জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসও ঐ কথা বলে

নরলীলায় সমস্ত কার্য সাধারণ নরের ন্যায় হয়

এবং যুক্তিসহায়ে একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ঐরূপ না হইলে জীবের প্রতি কৃপায় ঈশ্বরকৃত নরবপু ধারণের কোন সার্থকতা থাকে না।

ভক্তগণকে ঠাকুর যে সকল উপদেশ দিতেন, তাহার ভিতর আমরা দুই ভাবের কথা দেখিতে পাই। তাঁহার কয়েকটি উক্তির উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন। দেখা যায়, একদিকে তিনি তাঁহার ভক্তগণকে বলিতেছেন, "(আমি) ভাত রেঁধেছি, তোরা বাড়া ভাতে বসে যা", "ছাঁচ তৈয়ারী হয়েছে, তোরা সেই ছাঁচে নিজের নিজের মনকে ফ্যাল ও গড়ে তোল", "কিছুই যদি না পারবি ত আমার উপর বকলমা দে" ইত্যাদি। আবার অন্যদিকে বলিতেছেন, "এক এক করে সব বাসনা ত্যাগ কর, তবে ত হবে", "ঝড়ের আগে এঁটো পাতার মত হয়ে থাক্", "কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করে ঈশ্বরকে ডাক্", "আমি ষোল টাং (ভাগ) করেছি, তোরা এক টাং (ভাগ বা অংশ) কর" ইত্যাদি। আমাদের বোধ হয়, ঠাকুরের ঐ দুই ভাবের কথার অর্থ অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়াই আমরা দৈব ও পুরুষকার, নির্ভর ও সাধনের কোন্‌টা ধরিয়া জীবনে অগ্রসর হইব, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারি নাই।

দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঠাকুরের মত

দক্ষিণেশ্বরে একদিন আমরা জনৈক বন্ধুর* সহিত মানবের স্বাধীনেচ্ছা কিছুমাত্র আছে কিনা, এই বিষয় লইয়া অনেকক্ষণ বাদানুবাদের পর উহার যথার্থ মীমাংসা পাইবার নিমিত্ত ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হই। ঠাকুর বালকদিগের বিবাদ কিছুক্ষণ রহস্য করিয়া শুনিতে লাগিলেন, পরে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "স্বাধীন ইচ্ছা ফিচ্ছা কারও কিছু কি আছে রে?

* স্বামী নিরঞ্জনানন্দ। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারে ইঁহার শরীরত্যাগ হয়।

ঈশ্বরেচ্ছাতেই চিরকাল সব হচ্ছে ও হবে। মানুষ ঐ কথা শেষকালে বুঝতে পারে। তবে কি জানিস্, যেমন গরুটাকে লম্বা দড়ি দিয়ে খোঁটায় বেঁধে রেখেছে—গরুটা খোঁটার এক হাত দূরে দাঁড়াতে পারে, আবার দড়িগাছটা যত লম্বা ততদূরে গিয়েও দাঁড়াতে পারে—মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাটাও ঐরূপ জানবি। গরুটা এতটা দূরের ভিতর যেখানে ইচ্ছা বসুক, দাঁড়াক বা ঘুরে বেড়াক—মনে করেই মানুষ তাকে বাঁধে। তেমনি ঈশ্বরও মানুষকে কতকটা শক্তি দিয়ে তার ভিতরে সে যেমন ইচ্ছা, যতটা ইচ্ছা ব্যবহার করুক, বলে ছেড়ে দিয়েছেন। তাই মানুষ মনে করছে সে স্বাধীন। দড়িটা কিন্তু খোঁটায় বাঁধা আছে। তবে কি জানিস্, তাঁর কাছে কাতর হয়ে প্রার্থনা করলে, তিনি নেড়ে বাঁধতে পারেন, দড়িগাছটা আরও লম্বা করে দিতে পারেন, চাই কি গলার বাঁধন একেবারে খুলেও দিতে পারেন।"

কথাগুলি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে মহাশয়, সাধনভজন করাতে ত মানুষের হাত নাই? সকলেই ত বলিতে পারে—আমি যাহা কিছু করিতেছি, সব তাঁহার ইচ্ছাতেই করিতেছি?"

ঠাকুর—মুখে শুধু বললে কি হবে রে? কাঁটা নেই, খোঁচা নেই, মুখে বললে কি হবে। কাঁটায় হাত পড়লেই কাঁটা ফুটে 'উঃ' করে উঠতে হবে। সাধনভজন করাটা যদি মানুষের হাতে থাকত, তবে ত সকলেই তা করতে পারত—তা পারে না কেন? তবে কি জানিস, যতটা শক্তি তিনি তোকে দিয়েছেন ততটা ঠিক ঠিক ব্যবহার না করলে তিনি আর অধিক দেন না। ঐজন্যই পুরুষকার বা উদ্যমের দরকার। দেখ্ না, সকলকেই কিছু না কিছু উদ্যম করে তবে ঈশ্বরকৃপার অধিকারী হতে হয়। ঐরূপ করলে তাঁর কৃপায় দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মেই কেটে যায়।

কিন্তু (তাঁর উপর নির্ভর করে) কিছু না কিছু উদ্যম করতেই হয়। ঐ বিষয়ে একটা গল্প শোন্—

"গোলোক-বিহারী বিষ্ণু একবার নারদকে কোন কারণে অভিশাপ দেন যে, তাকে নরকভোগ করতে হবে। নারদ ভেবে আকুল। নানারূপে স্তবস্তুতি করে তাঁকে প্রসন্ন করে বললে—আচ্ছা ঠাকুর, নরক কোথায়, কিরূপ, কত রকমই বা আছে, আমার জানতে ইচ্ছা হচ্ছে, কৃপা করে আমায় বলুন। বিষ্ণু তখন ভুঁয়ে খড়ি দিয়ে স্বর্গ, নরক, পৃথিবী যেখানে যেরূপ আছে এঁকে দেখিয়ে বললেন, 'এইখানে স্বর্গ, আর এইখানে নরক।' নারদ বললে, 'বটে? তবে আমার এই নরকভোগ হল'—বলেই ঐ আঁকা নরকের উপর গড়াগড়ি দিয়ে উঠে ঠাকুরকে প্রণাম করলে। বিষ্ণু হাসতে হাসতে বললেন, 'সে কি? তোমার নরকভোগ হল কৈ?' নারদ বললে, 'কেন ঠাকুর, তোমারই সৃজন ত স্বর্গ নরক! তুমি এঁকে দেখিয়ে যখন বললে—এই নরক, তখন ঐ স্থানটা সত্যসত্যই নরক হল, আর আমি তাতে গড়াগড়ি দেওয়াতে আমার নরকভোগ হয়ে গেল।' নারদ কথাগুলি প্রাণের বিশ্বাসের সহিত বললে কি না! বিষ্ণুও তাই 'তথাস্তু' বললেন। নারদকে কিন্তু তাঁর উপর ঠিক ঠিক বিশ্বাস করে ঐ আঁকা নরকে গড়াগড়ি দিতে হল, (ঐ উদ্যমটুকু করে) তবে তার ভোগ কাটল।"—এইরূপে কৃপার রাজ্যেও যে উদ্যম ও পুরুষকারের স্থান আছে, তাহা ঠাকুর ঐ গল্পটি সহায়ে কখনও কখনও আমাদিগকে বুঝাইয়া বলিতেন।

ঐ বিষয়ে শ্রীবিষ্ণু ও নারদ-সংবাদ

নরদেহ ধারণ করিয়া নরবৎ লীলায় অবতারপুরুষদিগকে আমাদিগের ন্যায় অনেকাংশে দৃষ্টিহীনতা, অল্পজ্ঞতা প্রভৃতি অনুভব করিতে হয়।

আমাদিগেরই ন্যায় উত্তম করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পথ আবিষ্কার করিতে হয় এবং যতদিন না ঐ পথ আবিষ্কৃত হয়, ততদিন তাঁহাদিগের অন্তরে নিজ দেবস্বরূপের আভাস কখনও কখনও অল্পক্ষণের জন্য উদিত হইলেও উহা আবার প্রচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। এইরূপে 'বহুজনহিতায়' মায়ার আবরণ স্বীকার করিয়া লইয়া তাঁহাদিগকে আমাদিগেরই ন্যায় আলোক-আঁধারের রাজ্যের ভিতর পথ হাতড়াইতে হয়। তবে স্বার্থসুখচেষ্টার লেশমাত্র তাঁহাদের ভিতরে না থাকায় তাঁহারা জীবনপথে আমাদিগের অপেক্ষা অধিক আলোক দেখিতে পান এবং অভ্যন্তরীণ সমগ্র শক্তিপুঞ্জ সহজেই একমুখী করিয়া অচিরেই জীবন-সমস্যার সমাধানকল্পতঃ লোককল্যাণসাধনে নিযুক্ত হয়েন।

মানবের অসম্পূর্ণতা স্বীকার করিয়া অবতারপুরুষের মুক্তির পথ আবিষ্কার করা

নরের অসম্পূর্ণতা যথাযথভাবে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন বলিয়া দেব-মানব ঠাকুরের মানবভাবের আলোচনায় আমাদিগের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হয় এবং ঐজন্যই আমরা তাঁহার মানবভাবসকল সর্বদা পুরোবর্তী রাখিয়া তাঁহার দেবভাবের আলোচনা করিতে পাঠককে অনুরোধ করি। আমাদেরই মত একজন বলিয়া তাঁহাকে না ভাবিলে, তাঁহার সাধনকালের অলৌকিক উত্তম ও চেষ্টাদির কোন অর্থ খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। মনে হইবে, যিনি নিত্য পূর্ণ, তাঁহার আবার সত্যলাভের জন্য চেষ্টা কেন? মনে হইবে, তাঁহার জীবনপাতী চেষ্টাটা একটা 'লোক-দেখানো' ব্যাপার মাত্র। শুধু তাহাই নহে, ঈশ্বরলাভের জন্য উচ্চাদর্শসমূহ নিজ জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার উত্তম, নিষ্ঠা ও ত্যাগ

মানব বলিয়া না ভাবিলে অবতার-পুরুষের জীবন ও চেষ্টার অর্থ পাওয়া যায় না

আমাদিগকে ঐরূপ করিতে উৎসাহিত না করিয়া হৃদয় বিষম উদাসীনতায় পূর্ণ করিবে এবং ইহজীবনে আমাদিগের আর জড়ত্বের অপনোদন হইবে না।

ঠাকুরের কৃপালাভের প্রত্যাশী হইলেও আমাদিগকে তাঁহাকে আমাদিগেরই ন্যায় মানবভাবসম্পন্ন বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, ঠাকুর আমাদিগের দুঃখে সমবেদনাভাগী হইয়াই ত আমাদিগের দুঃখমোচনে অগ্রসর হইবেন। অতএব যে দিক দিয়াই দেখ, তাঁহাকে মানবভাবাপন্ন বলিয়া চিন্তা করা ভিন্ন আমাদিগের গত্যন্তর নাই। বাস্তবিক, যতদিন না আমরা সর্ববিধ বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া নির্গুণ দেব-স্বরূপে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিব, ততদিন পর্যন্ত জগৎকারণ ঈশ্বরকে এবং ঈশ্বরাবতারদিগকে মানবভাবাপন্ন বলিয়াই আমাদিগকে ভাবিতে ও গ্রহণ করিতে হইবে। "দেবো ভূত্বা দেবং যজেৎ" কথাটি ঐরূপ বাস্তবিকই সত্য। তুমি যদি স্বয়ং সমাধিবলে নির্ব্বিকল্প ভূমিতে পৌছাইতে পারিয়া থাক, তবেই তুমি ঈশ্বরের যথার্থ স্বরূপের উপলব্ধি ও ধারণা করিয়া তাঁহার যথার্থ পূজা করিতে পারিবে। আর, যদি তাহা না পারিয়া থাক, তবে তোমার পূজা উক্ত দেবভূমিতে উঠিবার ও যথার্থ পূজাধিকার পাইবার চেষ্টামাত্রেই পর্যবসিত হইবে এবং জগৎকারণ ঈশ্বরকে বিশিষ্ট শক্তিসম্পন্ন মানব বলিয়াই তোমার স্বতঃ ধারণা হইতে থাকিবে।

বদ্ধমানব মানব-ভাবে মাত্রই বুঝিতে পারে

দেবত্বে আরূঢ় হইয়া ঐরূপে ঈশ্বরের মায়াতীত দেবস্বরূপের যথার্থ পূজা করিতে সমর্থ ব্যক্তি বিরল। আমাদিগের মত দুর্বল অধিকারী উহা হইতে এখনও বহুদূরে অবস্থিত। সেইজন্য আমাদিগের ন্যায় সাধারণ ব্যক্তির প্রতি করুণাপরবশ হইয়া আমাদিগের হৃদয়ের পূজাগ্রহণ

করিবার জন্যই ঈশ্বরের মানবভূমিতে অবতরণ—মানবীয় ভাব ও দেহ স্বীকার করিয়া দেবমানব-রূপধারণ। পূর্ব পূর্ব যুগাবির্ভূত দেবমানবদিগের সহিত তুলনায় ঠাকুরের সাধন-কালের ইতিহাস আলোচনা করিবার আমাদের অনেক সুবিধা আছে কারণ, ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার জীবনের ঐ কালের কথা সময়ে সময়ে আমাদিগের নিকট বিস্তৃতভাবে আলোচনা করায় সে সকলের জলন্ত চিত্র আমাদের মনে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। আবার, আমরা তাঁহার নিকট যাইবার স্বল্পকাল পূর্বেই তাঁহার সাধকজীবনের বিচিত্রাভিনয় দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর লোকসকলের চক্ষুসম্মুখে সংঘটিত হইয়াছিল এবং ঐ সকল ব্যক্তিদিগের অনেকে তখনও ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রমুখাৎ ঐ বিষয়ে কিছু কিছু শুনিবারও আমরা অবসর পাইয়াছিলাম। সে যাহা হউক, ঐ বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে সাধনতত্ত্বের মূলসূত্রগুলি একবার সাধারণভাবে আমাদিগের আবৃত্তি করিয়া লওয়া ভাল। অতএব ঐ বিষয়ে আমরা এখন কথঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

ঐজন্য মানবের প্রতি করুণায় ঈশ্বরের মানবদেহধারণ, সুতরাং মানব ভাবিয়া অবতার-পুরুষের জীবনা-লোচনাই কল্যাণকর

প্রথম অধ্যায়

সাধক ও সাধনা

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের পরিচয় যথাযথ পাইতে হইলে আমাদিগকে সাধনা কাহাকে বলে তদ্বিষয় প্রথমে বুঝিতে হইবে। অনেকে হয়ত একথায় বলিবেন, ভারত ত চিরকাল কোনও-না-কোনও ভাবে ধর্মসাধনে লাগিয়া রহিয়াছে, তবে ঐ কথা আবার পাড়িয়া পুঁথি বাড়ান কেন? আবহমানকাল হইতে ভারত আধ্যাত্মিক রাজ্যের সত্যসকল সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে নিজ জাতীয় শক্তি যতদূর ব্যয় করিয়া আসিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, পৃথিবীর অপর কোন্ দেশের কোন্ জাতি এতদূর করিয়াছে? কোন্ দেশে ব্রহ্মজ্ঞ অবতার-পুরুষসকলের আবির্ভাব এত অধিক পরিমাণে হইয়াছে? অতএব সাধনার সহিত চিরপরিচিত আমাদিগকে ঐ বিষয়ের মূলসূত্রগুলি পুনরাবৃত্তি করিয়া বলা নিষ্প্রয়োজন।

কথা সত্য হইলেও ঐরূপ করিবার প্রয়োজন আছে। কারণ, সাধনা সম্বন্ধে অনেকস্থলে জনসাধারণের একটা কিস্তূতকিমাকার ধারণা দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্দেশ্য বা গন্তব্যের প্রতি লক্ষ্য হারাইয়া তাহারা অনেক সময় কেবল-মাত্র শারীরিক কঠোরতায়, দুষ্প্রাপ্য বস্তুসকলের সংযোগে স্থানবিশেষে ক্রিয়াবিশেষের নিরর্থক অনুষ্ঠানে, শ্বাসপ্রশ্বাসরোধে এবং এমন কি, অসম্বন্ধ মনের বিসদৃশ

সাধনা সম্বন্ধে সাধারণ মানবের ভ্রান্ত ধারণা

চেষ্টাদিতেও সাধনার বিশিষ্ট পরিচয় পাইয়া থাকে। আবার এরূপও দেখা যায় যে, কুসংস্কার এবং কু-অভ্যাসে বিকৃত মনকে প্রকৃতিস্থ ও সহজভাবাপন্ন করিয়া আধ্যাত্মিক পথে চালিত করিতে মহাপুরুষগণ কখন কখন যে সকল ক্রিয়া বা উপায়ের উপদেশ করিয়াছেন, সেই সকলকেই সাধনা বলিয়া ধারণাপূর্ব্বক সকলের পক্ষেই ঐ সমূহের অনুষ্ঠান সমভাবে প্রয়োজন বলিয়া অনেকস্থলে প্রচারিত হইতেছে। বৈরাগ্যবান না হইয়া—সংসারের ক্ষণস্থায়ী রূপরসাদিভোগের জন্য সমভাবে লালায়িত থাকিয়া মন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষের সহায়ে জগৎকারণ ঈশ্বরকে মন্ত্রৌষধি-বশীভূত সর্পের ন্যায় নিজ কর্তৃত্বাধীন করিতে পারা যায়, এরূপ ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া অনেককে বৃথা চেষ্টায় কালক্ষেপ করিতে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। অতএব যুগযুগান্তরব্যাপী অধ্যবসায় ও চেষ্টার ফলে ভারতের ঋষিমহাপুরুষগণ সাধনাসম্বন্ধে যে সকল তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন, তাহার সংক্ষেপ আলোচনা এখানে বিষয়বিরুদ্ধ হইবে না।

ঠাকুর বলিতেন, "সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন বা ঈশ্বরদর্শন শেষকালের কথা" —সাধনার চরম উন্নতিতেই উহা মানবের ভাগ্যে উপস্থিত হয়। হিন্দুর সর্বোচ্চ প্রামাণ্য শাস্ত্র বেদোপনিষৎ ঐ কথাই বলিয়া থাকেন। শাস্ত্র বলেন, জগতে স্থূল সূক্ষ্ম, চেতন-অচেতন যাহা কিছু তুমি দেখিতে পাইতেছ—ইট, কাঠ, মাটি, পাথর, মানুষ, পশু, গাছপালা, জীব-জানোয়ার, দেব-উপদেব —সকলই এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তু। ব্রহ্মবস্তুকেই তুমি নানারূপে নানাভাবে দেখিতেছ, শুনিতেছ, স্পর্শ, ঘ্রাণ ও আস্বাদ করিতেছ। তাঁহাকে লইয়া তোমার সকলপ্রকার দৈনন্দিন ব্যবহার আজীবন নিষ্পন্ন হইলেও তুমি তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভাবিতেছ ভিন্ন ভিন্ন বস্তু ও ব্যক্তির সহিত

সাধনার চরম ফল সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন

তুমি ঐরূপ করিতেছ। কথাগুলি শুনিয়া আমাদের মনে যে সন্দেহ-পরম্পরার উদয় হইয়া থাকে এবং ঐসকল নিরসনে শাস্ত্র যাহা বলিয়া থাকেন, প্রশ্নোত্তরচ্ছলে তাহার মোটামুটি ভাবটি পাঠককে এখানে বলিলে উহা সহজে হৃদয়ঙ্গম হইবার সম্ভাবনা।

প্রশ্ন। ঐ কথা আমাদের প্রত্যক্ষ হইতেছে না কেন?

উত্তর। তোমরা ভ্রমে পড়িয়াছ। যতক্ষণ না ঐ ভ্রম দূরীভূত হয়, ততক্ষণ কেমন করিয়া ঐ ভ্রম ধরিতে পারিবে? যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিয়া থাকি। পূর্বোক্ত ভ্রম ধরিতে হইলেও তোমাদের ঐরূপ জ্ঞানের প্রয়োজন।

প্র। আচ্ছা, ঐরূপ ভ্রম হইবার কারণ কি এবং কবে হইতেই বা আমাদের এই ভ্রম আসিয়া উপস্থিত হইল?

উ। ভ্রমের কারণ সর্বত্র যাহা দেখিতে পাওয়া যায়, এখানেও তাহাই—অজ্ঞান। ঐ অজ্ঞান কখন যে উপস্থিত হইল, তাহা কিরূপে জানিবে বল? অজ্ঞানের ভিতর যতক্ষণ পড়িয়া রহিয়াছ, ততক্ষণ উহা জানিবার চেষ্টা বৃথা। স্বপ্ন যতক্ষণ দেখা যায়, ততক্ষণ সত্য বলিয়াই প্রতীতি হয়। নিদ্রাভঙ্গে জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই উহাকে মিথ্যা বলিয়া ধারণা হয়। বলিতে পার—স্বপ্ন দেখিবার কালে কখনও কখনও কোন কোন ব্যক্তির 'আমি স্বপ্ন দেখিতেছি' এরূপ ধারণা থাকিতে দেখা যায়। সেখানেও জাগ্রদবস্থার স্মৃতি হইতেই তাহাদের মনে ঐ ভাবের উদয় হইয়া থাকে। জাগ্রদবস্থায় জগৎ প্রত্যক্ষ করিবার কালে কাহারও কাহারও অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্মৃতি ঐরূপে হইতে দেখা যায়।

ভ্রম বা অজ্ঞানবশতঃ সত্য প্রত্যক্ষ হয় না। অজ্ঞানাবস্থায় থাকিয়া অজ্ঞানের কারণ বুঝা যায় না।

প্র। তবে উপায় ?

উ। উপায়—ঐ অজ্ঞান দূর কর। ঐ ভ্রম বা অজ্ঞান যে দূর করা যায়, তাহা তোমাদের নিশ্চিত বলিতে পারি। পূর্ব পূর্ব ঋষিগণ উহা দূর করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং কেমন করিয়া দূর করিতে হইবে বলিয়া গিয়াছেন।

প্র। আচ্ছা, কিন্তু ঐ উপায় জানিবার পূর্বে আরও দুই-একটি প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমরা এত লোকে যাহা দেখিতেছি, প্রত্যক্ষ করিতেছি, তাহাকে তুমি ভ্রম বলিতেছ, আর অল্পসংখ্যক ঋষিরা যাহা বা যেরূপে জগৎটাকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই সত্য বলিতেছ—এটা কি সম্ভব হইতে পারে না যে, তাঁহারা যাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাই ভুল ?

উ। বহুসংখ্যক ব্যক্তি যাহা বিশ্বাস করিবে, তাহাই যে সর্বদা সত্য হইবে এমন কিছু নিয়ম নাই। ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ সত্য বলিতেছি, কারণ ঐ প্রত্যক্ষসহায়ে তাঁহারা সর্ববিধ দুঃখের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া সর্বপ্রকারে ভয়শূন্য ও চিরশান্তির অধিকারী হইয়াছিলেন এবং নিশ্চিতমৃত্যু মানব-জীবনের সকল প্রকার ব্যবহারচেষ্টাদির একটা উদ্দেশ্যেরও সন্ধান পাইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন যথার্থ জ্ঞান মানবমনে সর্বদা সহিষ্ণুতা, সন্তোষ, করুণা, দীনতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ-রাজির বিকাশ করিয়া উহাকে অদ্ভুত উদারতাসম্পন্ন করিয়া থাকে; ঋষিদিগের জীবনে ঐরূপ অসাধারণ গুণ ও শক্তির পরিচয় আমরা শাস্ত্রে পাইয়া থাকি এবং তাঁহাদিগের পদানুসরণে চলিয়া, যাঁহারা সিদ্ধিলাভ করেন, তাঁহাদিগের ভিতরে ঐ সকলের পরিচয় এখনও দেখিতে পাই।

জগৎকে ঋষিগণ যেরূপ দেখিয়াছেন, তাহাই সত্য। উহার কারণ

প্র। আচ্ছা, কিন্তু আমাদের সকলেরই ভ্রম একপ্রকারের হইল কিরূপে? আমি যেটাকে পশু বলিয়া বুঝি, তুমিও সেটাকে পশু ভিন্ন মানুষ বলিয়া বুঝ না, এইরূপ, সকল বিষয়েই। এত লোকের ঐরূপে সকল বিষয়ে একই কালে একই প্রকার ভুল হওয়া অল্প আশ্চর্যের কথা নহে! পাঁচজনে একটা বিষয়ে ভুল ধারণা করিলেও অপর পাঁচজনের ঐ বিষয়ে সত্যদৃষ্টি থাকে, সর্বত্র এইরূপই ত দেখা যায়। এখানে কিন্তু ঐ নিয়মের একেবারে ব্যতিক্রম হইতেছে। এজন্য তোমার কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না।

অনেকের একরূপ ভ্রম হইলেও ভ্রম কখনও সত্য হয় না

উ। অল্পসংখ্যক ঋষিদিগকে জনসাধারণের মধ্যে গণনা না করাতেই তুমি নিয়মের ব্যতিক্রম এখানে দেখিতে পাইতেছ। নতুবা পূর্ব প্রশ্নেই এ বিষয়ের উত্তর দেওয়া হইয়াছে। তবে যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, সকলের একপ্রকারে ভ্রম হইল কিরূপে? তাহার উত্তরে শাস্ত্র বলেন—এক অসীম অনন্ত সমষ্টি-মনে জগৎরূপ কল্পনার উদয় হইয়াছে। তোমার, আমার এবং জনসাধারণের ব্যষ্টিমন ঐ বিরাট মনের অংশ ও অঙ্গীভূত হওয়ায় আমাদিগকে ঐ একই প্রকার কল্পনা অনুভব করিতে হইতেছে। এজন্যই আমরা প্রত্যেক পশুটাকে পশু ভিন্ন অন্য কিছু বলিয়া ইচ্ছামত দেখিতে বা কল্পনা করিতে পারি না। ঐজন্যই আবার যথার্থ জ্ঞানলাভ করিয়া আমাদের মধ্যে একজন সর্বপ্রকার ভ্রমের হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিলেও অপর সকলে যেমন ভ্রমে পড়িয়া আছে, সেইরূপই থাকে। আর এক কথা, বিরাটমনে জগৎরূপ কল্পনার উদয়

বিরাট মনে জগৎরূপ কল্পনা বিদ্যমান বলিয়াই মানব-সাধারণের একরূপ ভ্রম হইতেছে। বিরাট মন কিন্তু ঐজন্য ভ্রমে আবদ্ধ নহে

হইলেও তিনি আমাদিগের মত অজ্ঞানবন্ধনে জড়ীভূত হইয়া পড়েন না। কারণ, সর্বদর্শী তিনি অজ্ঞানপ্রসূত জগৎকল্পনার ভিতরে ও বাহিরে অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুকে ওতপ্রোতভাবে বিদ্যমান দেখিতে পাইয়া থাকেন। উহা করিতে পারি না বলিয়াই আমাদের কথা স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। ঠাকুর যেমন বলিতেন, "সাপের মুখে বিষ রয়েছে, সাপ ঐ মুখ দিয়ে নিত্য আহারাদি করছে, সাপের তাতে কিছু হচ্ছে না। কিন্তু সাপ যাকে কামড়ায়, ঐ বিষে তার তৎক্ষণাৎ মৃত্যু!"

জগৎরূপ কল্পনা দেশকালের বাহিরে বর্তমান। প্রকৃতি অনাদি

অতএব শাস্ত্রদৃষ্টে দেখা গেল, বিশ্ব-মনের কল্পনাসম্ভূত জগৎটা এক-ভাবে আমাদেরও মনঃকল্পিত। কারণ, আমাদিগের ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন সমষ্টিভূত বিশ্বমনের সহিত শরীর ও অবয়বাদির ন্যায় অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধে নিত্য অবস্থিত। আবার ঐ জগৎরূপ কল্পনা যে এককালে বিশ্ব-মনে ছিল না, পরে আরম্ভ হইল, এ কথা বলিতে পারা যায় না। কারণ নাম ও রূপ বা দেশ ও কালরূপ পদার্থদ্বয়—যাহা না থাকিলে কোনরূপ বিচিত্রতার সৃষ্টি হইতে পারে না—জগৎরূপ কল্পনারই মধ্যগত বস্তু অথবা ঐ কল্পনার সহিত উহারা অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বিদ্যমান। স্থিরভাবে একটু চিন্তা করিয়া দেখিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন এবং বেদাদি শাস্ত্র যে কেন সৃজনীশক্তির মূলীভূত কারণ প্রকৃতি বা মায়াকে অনাদি বা কালাতীত বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন, তাহাও হৃদয়ঙ্গম হইবে। জগৎটা যদি মনঃকল্পিতই হয় এবং ঐ কল্পনার আরম্ভ যদি আমরা 'কাল' বলিতে যাহা বুঝি তাহার ভিতরে না হইয়া থাকে, তবে কথাটা দাঁড়াইল এই যে, কালরূপ কল্পনার সঙ্গে সঙ্গেই জগৎরূপ কল্পনাটা তদাশ্রয় বিশ্ব-মনে বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদিগের

ক্ষুদ্র ব্যষ্টি-মন বহুকাল ধরিয়া ঐ কল্পনা দেখিতে থাকিয়া জগতের অস্তিত্বেই দৃঢ় ধারণা করিয়া রহিয়াছে এবং জগৎরূপ কল্পনার অতীত অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ দর্শনে বহুকাল বঞ্চিত থাকিয়া জগৎটা যে মনঃকল্পিত বস্তুমাত্র, এ কথা এককালে ভুলিয়া গিয়া আপনার ভ্রম এখন ধরিতে পারিতেছে না। কারণ পূর্বেই বলিয়াছি, যথার্থ বস্তু ও অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই আমরা বাহিরের ও ভিতরের ভ্রম ধরিতে সর্বদা সক্ষম হই।

দেশকালাতীত জগৎকারণের সহিত পরিচিত হইবার চেষ্টাই সাধনা

এখন বুঝা যাইতেছে যে, জগৎ সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা ও অনুভবাদি বহুকাল-সঞ্চিত অভ্যাসের ফলে বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে এবং তৎসম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞানে উপনীত হইতে হইলে আমাদিগকে এখন নামরূপ, দেশ-কাল, মন-বুদ্ধি প্রভৃতি জগদন্তর্গত সকল বিষয়ের অতীত পদার্থের সহিত পরিচিত হইতে হইবে। ঐ পরিচয় পাইবার চেষ্টাকেই বেদপ্রমুখ শাস্ত্র 'সাধন' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এবং ঐ চেষ্টা জ্ঞাত বা অজ্ঞাত-সারে যে স্ত্রী বা পুরুষে বিদ্যমান, তাঁহারাই ভারতে সাধক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

'নেতি, নেতি' ও 'ইতি, ইতি' সাধনপথ

সাধারণভাবে বলিতে গেলে, জগদতীত বস্তু অনুসন্ধানের পূর্বোক্ত চেষ্টা দুইটি প্রধান পথে এতকাল পর্যন্ত প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে। প্রথম, শাস্ত্র যাহাকে 'নেতি, নেতি' বা জ্ঞানমার্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন; এবং দ্বিতীয়, যাহা 'ইতি, ইতি' বা ভক্তিমার্গ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। জ্ঞানমার্গের সাধক চরমলক্ষ্যের কথা প্রথম হইতেই হৃদয়ে ধারণা ও সর্বদা স্মরণ রাখিয়া জ্ঞাতসারে তদভিমুখে দিন দিন

অগ্রসর হইতে থাকেন। ভক্তিপথের পথিকেরা চরমে কোথায় উপস্থিত হইবেন, তদ্বিষয়ে অনেক স্থলে অজ্ঞ থাকেন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর লক্ষ্যান্তর পরিগ্রহ করিতে করিতে অগ্রসর হইয়া পরিশেষে জগদতীত অদ্বৈতবস্তুর সাক্ষাৎপরিচয় লাভ করিয়া থাকেন। নতুবা জগৎসম্বন্ধে সাধারণ জনগণের যে ধারণা আছে, তাহা উভয় পথের পথিকগণকেই ত্যাগ করিতে হয়। জ্ঞানী উহা প্রথম হইতেই সর্বতোভাবে পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করেন; এবং ভক্ত উহার কতক ছাড়িয়া কতক রাখিয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেও পরিণামে জ্ঞানীর ন্যায়ই উহার সমস্ত ত্যাগ করিয়া 'একমেবাদ্বিতীয়ং' তত্ত্বে উপস্থিত হন। জগৎসম্বন্ধে উল্লিখিত স্বার্থপর, ভোগসুখৈকলক্ষ্য সাধারণ ধারণার পরিহারকেই শাস্ত্র 'বৈরাগ্য' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

নিত্যপরিবর্তনশীল নিশ্চিত-মৃত্যু মানবজীবনে জগতের অনিত্যতা-জ্ঞান সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়। তজ্জন্য জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা ত্যাগ করিয়া 'নেতি, নেতি' মার্গে জগৎকারণের অনুসন্ধান করা প্রাচীন যুগে মানবের প্রথমেই উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। সেজন্য ভক্তি ও জ্ঞান উভয় মার্গ সমকালে প্রচলিত থাকিলেও ভক্তিপথের সকল বিভাগের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি হইবার পূর্বেই উপনিষদে জ্ঞানমার্গের সম্যক্ পরিপুষ্টি হওয়া দেখিতে পাওয়া যায়।

'নেতি, নেতি'—নিত্যস্বরূপ জগৎকারণ 'ইহা নহে, উহা নহে' করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হইয়া মানব স্বল্পকালেই যে অন্তর্মুখ হইয়া পড়িয়াছিল, উপনিষদ্ এ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করে। মানব বুঝিয়াছিল, বাহিরের অন্য বস্তুসকল অপেক্ষা তাহার নিজ দেহমনই তাহাকে সর্বাগ্রে জগতের সহিত সম্বন্ধযুক্ত করিয়া রাখিয়াছে; অতএব, দেহ-মনাবলম্বনে

জগৎকারণের অন্বেষণে অগ্রসর হইলে উহার সন্ধান শীঘ্র পাইবার সম্ভাবনা। আবার "হাঁড়ির একটা ভাত টিপিয়া যেমন বুঝিতে পারা যায়, ভাত-হাঁড়িটা সুসিদ্ধ হইয়াছে কি না", তদ্রূপ আপনার ভিতরে নিত্য-কারণ-স্বরূপের অনুসন্ধান পাইলেই অপর বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অন্তরে উহার অন্বেষণ পাওয়া যাইবে। এজন্য জ্ঞানপথের পথিকের নিকট 'আমি কোন্ পদার্থ', এ বিষয়ের অনুসন্ধানই একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠে।

'নেতি, নেতি' পথের লক্ষ্য—'আমি কোন্ পদার্থ' তদ্বিষয় সন্ধান করা

পূর্বে বলিয়াছি, জগৎসম্বন্ধীয় সাধারণ ধারণা জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়বিধ সাধককেই ত্যাগ করিতে হয়। ঐ ধারণার একান্ত ত্যাগেই মানবমন সর্ববৃত্তিরহিত হইয়া সমাধির অধিকারী হয়। ঐরূপ সমাধিকেই শাস্ত্র 'নির্বিকল্প' সমাধি আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। জ্ঞানপথের সাধক 'আমি বাস্তবিক কোন্ পদার্থ', এই তত্ত্বের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া কিরূপে নির্বিকল্প সমাধিতে উপস্থিত হন এবং ঐ কালে তাঁহার কীদৃশ অনুভব হইয়া থাকে, তাহা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।* অতএব ভক্তিপথের পথিক ঐ সমাধির অনুভবে কিরূপে উপস্থিত হইয়া থাকেন, পাঠককে এখন তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ বলা কর্তব্য।

নির্বিকল্প সমাধি

ভক্তিমার্গকে 'ইতি, ইতি'-সাধনপথ বলিয়া আমরা নির্দেশ করিয়াছি। কারণ, ঐ পথের পথিক জগতের অনিত্যতা প্রত্যক্ষ করিলেও জগৎকর্তা ঈশ্বরে বিশ্বাসী হইয়া তৎকৃত জগৎরূপ কার্য সত্য ও বর্তমান বলিয়া

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায় দেখ।

বিশ্বাস করিয়া থাকেন। ভক্ত জগৎ ও তন্মধ্যগত সর্ব বস্তু ও ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধযুক্ত দেখিয়া আপনার করিয়া লন। ঐ সম্বন্ধ দর্শন করিবার পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহাকে তিনি দূর-পরিহার করেন। তদ্ভিন্ন, ঈশ্বরের কোন এক রূপের† প্রতি অনুরাগে ও ধ্যানে তন্ময় হওয়া এবং তাঁহারই প্রীতির নিমিত্ত সর্বকার্যানুষ্ঠান করা ভক্তের আশু লক্ষ্য হইয়া থাকে।

রূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া কেমন করিয়া জগতের অস্তিত্ব ভুলিয়া নির্বিকল্প অবস্থায় পৌঁছিতে পারা যায়, এইবার আমরা তাহার অনুশীলন করিব। পূর্বে বলিয়াছি, ভক্ত ঈশ্বরের কোন এক রূপকে নিজ ইষ্ট বলিয়া পরিগ্রহ করিয়া তাহারই চিন্তা ও ধ্যান করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম ধ্যান করিবার কালে, তিনি ঐ ইষ্টমূর্তির সর্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানসনয়নের সম্মুখে আনিতে পারেন না; কখন উহার হস্ত, কখন পদ এবং কখন বা মুখখানিমাত্র তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হয়; উহাও আবার দর্শনমাত্রেই যেন লয় হইয়া যায়, সম্মুখে স্থিরভাবে অবস্থান করে না। অভ্যাসের ফলে ধ্যান গভীর হইলে ঐ মূর্তির সর্বাবয়বসম্পূর্ণ ছবি মানস-চক্ষের সম্মুখে সময়ে সময়ে উপস্থিত হয়। ধ্যান ক্রমে গভীরতর হইলে ঐ ছবি, যতক্ষণ না মন চঞ্চল হয়, ততক্ষণ স্থিরভাবে সম্মুখে অবস্থান করে। পরে ধ্যানের গভীরতার তারতম্যে ঐ মূর্তির চলা-ফেরা, হাসা, কথাকহা এবং চরমে উহার স্পর্শ পর্যন্তও ভক্তের উপলব্ধি

'ইতি, ইতি' পথে নির্বিকল্প সমাধি-লাভের বিবরণ

† ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাকেও আমরা রূপের ধ্যানের মধ্যেই গণনা করিতেছি। কারণ আকাররহিত সর্বগুণান্বিত ব্যক্তিত্বের ধ্যান করিতে যাইলে আকাশ, জল, বায়ু, তেজ প্রভৃতি পদার্থনিচয়ের সদৃশ পদার্থবিশেষই মনোমধ্যে উদিত হইয়া থাকে।

হয়। তখন ঐ মূর্তিকে সর্বপ্রকারে জীবন্ত বলিয়া দেখিতে পাওয়া যায় এবং ভক্ত চক্ষু মুদ্রিত বা উন্মীলিত করিয়া ধ্যান করুন না কেন, ঐ মূর্তির ঐ প্রকার চেষ্টাদি সমভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। পরে, 'আমার ইষ্টই ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণ করিয়াছেন'—এই বিশ্বাসের ফলে ভক্ত-সাধক আপন ইষ্টমূর্তি হইতে নানাবিধ দিব্যরূপসকলের সন্দর্শন লাভ করেন। ঠাকুর বলিতেন—"যে ব্যক্তি একটি রূপ ঐ প্রকার জীবন্তভাবে দর্শন করিয়াছে, তাহার অন্য সব রূপের দর্শন সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়।"

ইতিপূর্বে যে সকল কথা বলা হইল, তাহা হইতে একটি বিষয় আমরা বুঝিতে পারি। ঐরূপ জীবন্ত মূর্তিসকলের দর্শনলাভ যাঁহার ভাগ্যে উপস্থিত হয়, তাঁহার নিকট জাগ্রৎকালে দৃষ্ট পদার্থসকলের ন্যায়, ধ্যান-কালে দৃষ্ট ভাবরাজ্যগত ঐ সকল মূর্তির সমান অস্তিত্ব অনুভব হইতে থাকে। ঐরূপে বাহ্য জগৎ ও ভাবরাজ্যের সমানাস্তিত্ববোধ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাঁহার মনে বাহ্য জগৎটাকে মনঃকল্পিত বলিয়া ধারণা হইতে থাকে। আবার গভীর ধ্যানকালে ভাবরাজ্যের অনুভব ভক্তের মনে এত প্রবল হইয়া উঠে যে, সেই সময়ের জন্য তাঁহার বাহ্য জগতের অনুভব ঈষন্মাত্রও থাকে না। ভক্তের ঐ অবস্থাকেই শাস্ত্র সবিকল্প সমাধি নামে নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ প্রকার সমাধিকালে মানসিক শক্তিপ্রভাবে ভক্তের মনে বাহ্য জগতের বিলয় হইলেও ভাব-রাজ্যের বিলয় হয় না। জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের সহিত ব্যবহার করিয়া আমরা নিত্য যেরূপ সুখদুঃখাদির অনুভব করিয়া থাকি, আপন ইষ্টমূর্তির সহিত ব্যবহারে ভক্ত তখন ঠিক তদ্রূপ অনুভব করিতে থাকেন। কেবলমাত্র ইষ্টমূর্তিকে আশ্রয় করিয়াই তাঁহার মনে তখন যত কিছু

সংকল্প-বিকল্পের উদয় হইতে থাকে। এক বিষয়কে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ভক্তের মনে ঐ সময়ে বৃত্তি-পরম্পরার উদয় হওয়ার জন্য শাস্ত্র তাঁহার ঐ অবস্থাকে সবিকল্পক বা বিকল্পসংযুক্ত সমাধি বলিয়াছেন।

এইরূপে ভাবরাজ্যের অন্তর্গত বিষয়বিশেষের চিন্তায় ভক্তের মনে স্থূল বাহ্য জগতের এবং এক ভাবের প্রাবল্যে অন্য ভাবসকলের বিলয় সাধিত হয়। যে ভক্তসাধক এতদূর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছেন, সমাধির নির্বিকল্পভূমিলাভ তাঁহার নিকট অধিক দূরবর্তী নহে। জগতের বহুকালাভ্যস্ত অস্তিত্বজ্ঞান যিনি এতদূর দূরীকরণে সক্ষম হইয়াছেন, তাঁহার মন যে সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে, একথা বলিতে হইবে না। মনকে এককালে নির্বিকল্প করিতে পারিলে ঈশ্বরসম্ভোগ অধিক ভিন্ন অল্প হয় না, একথা একবার ধারণা হইলেই তাঁহার সমগ্র মন ঐদিকে সোৎসাহে ধাবিত হয় এবং শ্রীগুরু ও ঈশ্বর কৃপায় তিনি অচিরে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে আরোহণ করিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থানপূর্বক চিরশান্তির অধিকারী হন। অথবা বলা যাইতে পারে, প্রগাঢ় ইষ্টপ্রেমই তাঁহাকে ঐ ভূমি দেখাইয়া দেয় এবং ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় উহার প্রেরণায় তিনি আপন ইষ্টের সহিত তখন একত্বানুভব করেন।

জ্ঞানী এবং ভক্ত সাধককুলের চরম লক্ষ্যে উপনীত হইবার ঐরূপ ক্রম শাস্ত্রনির্ধারিত। অবতারপুরুষসকলে কিন্তু দেব এবং মানব, উভয় ভাবের একত্র সম্মিলন আজীবন বিদ্যমান থাকায় সাধনকালেই তাঁহাদিগকে কখন কখন সিদ্ধের ন্যায় প্রকাশ ও শক্তি-সম্পন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। দেব এবং মানব উভয় ভূমিতে তাঁহাদিগের স্বভাবতঃ বিচরণ করিবার শক্তি থাকাতে ঐরূপ হইয়া থাকে ; অথবা ভিতরের দেবভাব তাঁহাদিগের সহজ স্বাভাবিক অবস্থা হওয়ায়, উহা তাঁহাদিগের মানব-

ভাবের বহিরাবরণকে সময়ে সময়ে ভেদ করিয়া ঐরূপে স্বতঃপ্রকাশিত হয়,—মীমাংসা যাহাই হউক না কেন ঐরূপ ঘটনা কিন্তু অবতার-পুরুষসকলের জীবন মানববুদ্ধির নিকটে দুর্ভেদ্য জটিলতাময় করিয়া রাখিয়াছে। ঐ জটিল রহস্যের কখনও যে সম্পূর্ণ ভেদ হইবে, বোধ হয় না। কিন্তু শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উহার অনুশীলনে মানবের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়, একথা ধ্রুব। প্রাচীন পৌরাণিক যুগে অবতারচরিত্রের মানবভাবটি ঢাকিয়া চাপিয়া দেবভাবটির আলোচনাই করা হইয়াছিল—সন্দেহশীল বর্তমান যুগে ঐ চরিত্রের দেবভাবটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হইয়া মানবভাবটির আলোচনাই চলিয়াছে। বর্তমান ক্ষেত্রে আমরা ঐ চরিত্রের আলোচনায় উহাতে উভয় ভাব যে একত্র একই কালে বিদ্যমান থাকে, এই কথাই পাঠককে বুঝাইতে প্রয়াস করিব। বলা বাহুল্য, দেবমানব ঠাকুরের পুণ্যদর্শন জীবনে না ঘটিলে অবতারচরিত্র ঐরূপে দেখিতে আমরা কখনই সমর্থ হইতাম না।

অবতারপুরুষে দেব ও মানব, উভয় ভাব বিদ্যমান থাকায় সাধনকালে তাঁহাদিগকে সিদ্ধের ন্যায় প্রতীত হয়। দেব ও মানব, উভয় ভাবে তাঁহাদিগের জীবনালোচনা আবশ্যক

দ্বিতীয় অধ্যায়

অবতারজীবনে সাধকভাব

পুণ্য-দর্শন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে কৃতার্থ হইয়া আমরা তাঁহার জীবন ও চরিত্রের যতই অনুধ্যান করিয়াছি, ততই তাঁহাতে দেব ও মানব, উভয়বিধ ভাবের বিচিত্র সম্মেলন দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। মধুর সামঞ্জস্যে ঐরূপ বিপরীত ভাবসমষ্টির একত্র একাধারে বর্তমানতা যে সম্ভবপর, একথা তাঁহাকে না দেখিলে আমাদের কখনই ধারণা হইত না। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই আমাদিগের ধারণা তিনি দেবমানব—পূর্ণ দেবত্বের ভাব ও শক্তিসমূহ মানবীয় দেহ ও ভাবাবরণে প্রকাশিত হইলে যাহা হয়, তিনি তাহাই। ঐরূপ দেখিয়াছি বলিয়াই বুঝিয়াছি যে, ঐ উভয় ভাবের কোনটিই তিনি বৃথা ভান করেন নাই এবং মানবভাব তিনি লোকহিতায় যথার্থই স্বীকার করিয়া উহা হইতে দেবত্বে উঠিবার পথ আমাদিগকে দেখাইয়া গিয়াছেন। আবার, দেখিয়াছি বলিয়াই একথা বুঝিতে পারিয়াছি যে, পূর্ব পূর্ব যুগের সকল অবতারপুরুষের জীবনেই ঐ উভয় ভাবের ঐরূপ বিচিত্র প্রকাশ নিশ্চয় উপস্থিত হইয়াছিল।

ঠাকুরে দেব ও মানবভাবের মিলন

শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া অবতারপুরুষসকলের মধ্যে কাহারও জীবনকথা আলোচনা করিতে যাইলেই আমরা ঐরূপ দেখিতে পাইব। দেখিতে পাইব, তাঁহারা কখন আমাদের ভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগতস্থ যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তির সহিত আমাদিগেরই ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন—আবার

কখন বা উচ্চ ভাব-ভূমিতে বিচরণপূর্বক আমাদিগের অজ্ঞাত, অপরিচিত ভাব ও শক্তিসম্পন্ন এক নূতন রাজ্যের সংবাদ আমাদিগকে আনিয়া দিতেছেন!—তাঁহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও কে যেন সকল বিষয়ের যোগাযোগ করিয়া তাঁহাদিগকে ঐরূপ করাইতেছে। আশৈশবই ঐরূপ। তবে, শৈশবে সময়ে সময়ে ঐ শক্তির পরিচয় পাইলেও উহা যে তাঁহাদিগের নিজস্ব এবং অন্তরেই অবস্থিত, একথা তাঁহারা অনেক সময়ে বুঝিতে পারেন না, অথবা ইচ্ছামাত্রেই ঐ শক্তিপ্রয়োগে উচ্চভাব-ভূমিতে আরোহণপূর্বক দিব্যভাবসহায়ে জগদন্তর্গত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতে এবং তাহাদিগের সহিত তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ শক্তির অস্তিত্ব জীবনে বারংবার প্রত্যক্ষ করিতে করিতে উহার সহিত সম্যক্‌রূপে পরিচিত হইবার প্রবল বাসনা তাঁহাদের মনোমধ্যে জাগিয়া উঠে এবং ঐ বাসনাই তাঁহাদিগকে অলৌকিক অনুরাগসম্পন্ন করিয়া সাধনে নিযুক্ত করে।

সকল অবতার-পুরুষেই ঐরূপ

তাঁহাদিগের ঐরূপ বাসনায় স্বার্থপরতার নামগন্ধ থাকে না। ঐহিক বা পারলৌকিক কোনপ্রকার ভোগসুখলাভের প্রেরণা ত দূরের কথা, পৃথিবীস্থ অপর অপর সকল ব্যক্তির যাহা হইবার হউক, আমি মুক্তিলাভ করিয়া ভূমানন্দে থাকি—এইরূপ ভাব পর্যন্ত তাঁহাদিগের ঐ বাসনায় দেখা যায় না। কেবল, যে অজ্ঞাত দিব্যশক্তির নিয়োগে তাঁহারা জন্মাবধি অসাধারণ দিব্যভাবসকল অনুভব করিতেছেন এবং স্থূল জগতে দৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় ভাবরাজ্যগত সকল বিষয়ে সমসমান অস্তিত্ব সময়ে সময়ে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, সেই শক্তি কি বাস্তবিকই

অবতারপুরুষে স্বার্থসুখের বাসনা থাকে না

জগতের অন্তরালে অবস্থিত অথবা স্বকপোলকল্পনা-বিজৃম্ভিত, তদ্বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানই তাঁহাদিগের ঐ বাসনার মূলে পরিলক্ষিত হয়। কারণ, অপর সাধারণের প্রত্যক্ষ ও অনুভবাদির সহিত আপনাদিগের প্রত্যক্ষ-সকলের তুলনা করিয়া একথা তাঁহাদিগের স্বল্পকালেই হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তাঁহারা আজীবন জগতস্থ বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে যেভাবে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, অপরে তদ্রূপ করিতেছে না—ভাবরাজ্যের উচ্চভূমি হইতে জগৎটা দেখিবার সামর্থ্য তাহাদের একপ্রকার নাই বলিলেই হয়।

তাঁহাদিগের করুণা ও পরার্থে সাধনভজন

শুধু তাহাই নহে। পূর্ব্বোক্ত তুলনায় তাঁহাদের আর একটি কথাও সঙ্গে সঙ্গে ধারণা হইয়া পড়ে। তাঁহারা বুঝিতে পারেন যে, সাধারণ ও দিব্য দুই ভূমি হইতে জগৎটাকে দুই ভাবে দেখিতে পান বলিয়াই দুই দিনের নশ্বর জীবনে আপাত-মনোরম রূপরসাদি তাঁহাদিগকে মানবসাধারণের ন্যায় প্রলোভিত করিতে পারে না এবং নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সংসারের নানা অবস্থাবিপর্যয়ে অশান্তি ও নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়া তাঁহাদিগের মনকে আবৃত করিতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত শক্তিকে সম্যক্‌প্রকারে আপনার করিয়া লইয়া কেমন করিয়া ইচ্ছামাত্র উচ্চ ও উচ্চতর ভাব-ভূমি-সকলে স্বয়ং আরোহণ এবং যতকাল ইচ্ছা তথায় অবস্থান করিতে পারিবেন এবং আপামর সাধারণকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া শান্তির অধিকারী করিবেন, এই চিন্তাতেই তাঁহাদের করুণাপূর্ণ মন এককালে নিমগ্ন হইয়া পড়ে। এজন্যই দেখা যায়, সাধনা ও করুণার দুইটি প্রবল প্রবাহ তাঁহাদিগের জীবনে নিরন্তর পাশাপাশি প্রবাহিত হইতেছে। মানবসাধারণের সহিত আপনাদিগের অবস্থার তুলনায় ঐ করুণা তাঁহাদিগের অন্তরে শতধারে বর্দ্ধিত হইতে পারে; কিন্তু ঐরূপেই যে উহার উৎপত্তি হয়, একথা বলা

যায় না। উহা সঙ্গে লইয়া তাঁহারা সংসারে ভ্রমিয়া থাকেন। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক একটি দৃষ্টান্ত স্মরণ কর—

"তিন বন্ধুতে মাঠে বেড়াতে গিয়েছিল। বেড়াতে বেড়াতে মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হয়ে দেখলে উঁচু পাঁচিলে ঘেরা একটা জায়গা—তার ভিতর থেকে গানবাজনার মধুর আওয়াজ আসছে। শুনে ইচ্ছে হোলো, ভিতরে কি হচ্ছে দেখবে। চারিদিকে ঘুরে দেখলে, ভিতরে ঢোকবার একটিও দরজা নেই। কি করে?—একজন কোনরকমে একটা মই যোগাড় করে পাঁচিলের ওপরে উঠতে লাগলো ও অপর দুইজন নীচে দাঁড়িয়ে রইলো। প্রথম লোকটি পাঁচিলের ওপরে উঠে ভিতরের ব্যাপার দেখে আনন্দে অধীর হয়ে হাহা করে হাসতে হাসতে লাফিয়ে পড়লো—কি যে ভিতরে দেখলে তা নীচের দুজনকে বলবার জন্য একটুও অপেক্ষা করতে পারলে না। তারা ভাবলে—বাঃ—বন্ধু ত বেশ, একবার বললেও না কি দেখলে!—যা হোক, দেখতে হোলো। আর একজন ঐ মই বেয়ে উঠতে লাগলো। উপরে উঠে সেও প্রথম লোকটির মত হাহা করে হেসে ভিতরে লাফিয়ে পড়লো। তৃতীয় লোকটি তখন কি করে—ঐ মই বেয়ে উপরে উঠলো ও ভিতরের আনন্দের মেলা দেখতে পেলে। দেখে প্রথমে তার মনে খুব ইচ্ছা হোলো সেও ওতে যোগ দেয়। পরেই ভাবলে—কিন্তু আমি যদি এখনি ওতে যোগদান করি, তাহলে বাইরের অপর দশজনে ত জানতে পারবে না এখানে এমন আনন্দ-উপভোগের জায়গা আছে; একলা এই আনন্দটা ভোগ করবো? ঐ ভেবে সে জোর করে নিজের মনকে ফিরিয়ে নেবে এলো ও দুচোখে যাকেই দেখতে পেলে তাকেই হেঁকে বলতে লাগলো—

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—'তিন বন্ধুর আনন্দ-কাননদর্শন' সম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প

'ওহে, এখানে এমন আনন্দের স্থান রয়েছে, চল চল সকলে মিলে ভোগ করি!' ঐরূপে বহু ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে সেও ওতে যোগ দিলে।" এখন বুঝ, তৃতীয় ব্যক্তির মনে দশজনকে সঙ্গে লইয়া আনন্দোপভোগের ইচ্ছার কারণ যেমন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তদ্রূপ অবতারপুরুষসকলের মনে লোককল্যাণসাধনের ইচ্ছা কেন যে আশৈশব বিদ্যমান থাকে, তাহার কারণ নির্দেশ করা যায় না।

অবতারপুরুষদিগকে সাধারণ মানবের ন্যায় সংযম-অভ্যাস করিতে হয়

পূর্বোক্ত কথায় কেহ কেহ হয়ত স্থির করিবেন, অবতারপুরুষসকলকে আমাদিগের ন্যায় দুর্বার ইন্দ্রিয়সকলের সহিত কখনও সংগ্রাম করিতে হয় না; শিষ্ট শান্ত বালকের ন্যায় উহারা বুঝি আজন্ম তাঁহাদিগের বশে নিরন্তর উঠিতে বসিতে থাকে এবং সেইজন্য সংসারের রূপরসাদি হইতে মনকে ফিরাইয়া তাঁহারা সহজেই উচ্চ লক্ষ্যে চালিত করিতে পারেন। উত্তরে আমরা বলি—তাহা নহে, ঐ বিষয়েও নরবৎ নরলীলা হইয়া থাকে; এখানেও তাঁহাদিগকে সংগ্রামে জয়ী হইয়া গন্তব্য-পথে অগ্রসর হইতে হয়।

মনের অনন্ত বাসনা

মানব-মনের স্বভাব সম্বন্ধে যিনি কিছুমাত্র জানিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি দেখিতে পাইয়াছেন স্থূল হইতে আরম্ভ হইয়া সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম অনন্ত বাসনাস্তরসমূহ উহার ভিতরে বিদ্যমান রহিয়াছে, একটিকে যদি কোনরূপে অতিক্রম করিতে তুমি সমর্থ হইয়াছ, তবে আর একটি আসিয়া তোমার পথরোধ করিল; সেটিকে পরাজিত করিলে ত আর একটি আসিল; স্থূলকে পরাজিত করিলে ত সূক্ষ্ম আসিল; তাহাকে পশ্চাৎপদ করিলে ত সূক্ষ্মতর বাসনা-শ্রেণী তোমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দণ্ডায়মান হইল! কাম যদি ছাড়িলে

ত কাঞ্চন আসিল; স্থূলভাবে কাম-কাঞ্চনগ্রহণে বিরত হইলে ত সৌন্দর্যানুরাগ, লোকৈষণা, মান-যশাদি সম্মুখে উপস্থিত হইল; অথবা মায়িক সম্বন্ধসকল যত্নপূর্বক পরিহার করিলে ত আলস্য বা করুণাকারে মায়ামোহ আসিয়া তোমার হৃদয় অধিকার করিল!

মনের ঐরূপ স্বভাবের উল্লেখ করিয়া বাসনাজাল হইতে দূরে থাকিতে ঠাকুর আমাদিগকে সর্বদা সতর্ক করিতেন। নিজ জীবনের ঘটনাবলী* ও চিন্তা পর্যন্ত সময়ে সময়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে উল্লেখ করিয়া তিনি ঐ বিষয় আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিতেন। পুরুষভক্তদিগের ন্যায় স্ত্রী-ভক্তদিগকেও তিনি ঐ কথা বারংবার বলিয়া তাঁহাদিগের অন্তরে ঈশ্বরানুরাগ উদ্দীপিত করিতেন। তাঁহার এক দিনের ঐরূপ ব্যবহার এখানে বলিলেই পাঠক ঐ কথা বুঝিতে পারিবেন।

বাসনাত্যাগ সম্বন্ধে ঠাকুরের প্রেরণা

স্ত্রী বা পুরুষ ঠাকুরের নিকট যে-কেহই যাইতেন, সকলেই তাঁহার অমায়িকতা, সদ্ব্যবহার ও কামগন্ধরহিত অদ্ভুত ভালবাসার আকর্ষণ প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং সুবিধা পাইলেই পুনরায় তাঁহার পুণ্যদর্শন-লাভের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিতেন। ঐরূপে তাঁহারা যে নিজেই তাঁহার নিকট পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন তাহা নহে, নিজের পরিচিত সকলকে ঠাকুরের নিকট লইয়া যাইয়া তাহারাও যাহাতে তাঁহার দর্শনে বিমলানন্দ উপভোগ করিতে পারে, তজ্জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করিতেন। আমাদিগের পরিচিতা জনৈকা ঐরূপে একদিন তাঁহার বৈমাত্রেয়ী ভগ্নী ও তাঁহার স্বামীর সহোদরাকে সঙ্গে লইয়া অপরাহ্নে

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়, ২৮ পৃষ্ঠা এবং ২য় অধ্যায়, ৬০ ও ৭৩ পৃষ্ঠা দেখ।

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণাম করিয়া উপবেশন করিলে ঠাকুর তাঁহাদের পরিচয় ও কুশল-প্রশ্নাদি করিয়া ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগবান হওয়াই মানবজীবনের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত, এই বিষয়ে কথা পাড়িয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন—

"ভগবানের শরণাপন্ন কি সহজে হওয়া যায় গা? মহামায়ার এমনি কাণ্ড—হতে কি দেয়? যার তিনকুলে কেউ নেই, তাকে দিয়ে একটা বিড়াল পুষিয়ে সংসার করাবে!—সেও বিড়ালের মাছ দুধ ঘুরে ঘুরে যোগাড় করবে, আর বলবে, 'মাছ দুধ না হলে বিড়ালটা খায় না, কি করি?'

ঐবিষয়ে স্ত্রী-ভক্তদিগকে উপদেশ

"হয়ত, বড় বনেদি ঘর। পতি-পুত্তুর সব মরে গেল—কেউ নেই—রইল কেবল গোটাকতক রাঁড়ি!—তাদের মরণ নেই! বাড়ীর এখানটা পড়ে গেছে, ওখানটা ধসে গেছে, ছাদের উপর অশ্বত্থ গাছ জন্মেছে—তার সঙ্গে দু-চারগাছা ডেঙ্গো ডাঁটাও জন্মেছে, রাঁড়িরা তাই তুলে চচ্চড়ি রাঁধচে ও সংসার করচে! কেন? ভগবানকে ডাকুক না কেন? তাঁর শরণাপন্ন হোক না—তার ত সময় হয়েছে। তা হবে না!

"হয়ত বা কারুর বিয়ের পরে স্বামী মরে গেল—কড়ে রাঁড়ি। ভগবানকে ডাকুক না কেন? তা নয়—ভাইয়ের ঘরে গিন্নি হোল! মাথায় কাগা খোঁপা, আঁচলে চাবির থোলো বেঁধে হাত নেড়ে গিন্নিপনা কচ্চেন—সর্বনাশীকে দেখলে পাড়াশুদ্ধ লোক ডরায়! আর বলে বেড়াচ্চেন—'আমি না হলে দাদার খাওয়াই হয় না!'—মর মাগি, তোমার কি হোলো তা খ্যাখ—তা না!"

এক রহস্যের কথা—আমাদের পরিচিতা রমণীর ভগ্নীর ঠাকুরঝি—যিনি অদ্য প্রথমবার ঠাকুরের দর্শনলাভ করলেন, ভ্রাতার ঘরে গৃহিণী-

ভগ্নীদিগের শ্রেণীভুক্তা ছিলেন। ঠাকুরকে কেহই সেকথা ইতিপূর্বে বলে নাই। কিন্তু কথায় কথায় ঠাকুর ঐ দৃষ্টান্ত আনিয়া বাসনার প্রবল প্রতাপ ও মানবমনে অনন্ত বাসনাস্তরের কথা বুঝাইতে লাগিলেন। বলা বাহুল্য, কথাগুলি ঐ স্ত্রীলোকটির অন্তরে অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল। দৃষ্টান্তগুলি শুনিয়া আমাদের পরিচিতা রমণীর ভগ্নী তাঁহার গা ঠেলিয়া চুপি চুপি বলিলেন—"ও ভাই, আজই কি ঠাকুরের মুখ দিয়ে এই কথা বেরুতে হয়!—ঠাকুরঝি কি মনে করবে!" পরিচিতা বলিলেন, "তা কি করবো, ওঁর ইচ্ছা, ওঁকে আর ত কেউ শিখিয়ে দেয় নি?"

মানবপ্রকৃতির আলোচনায় স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যাহার মন যত উচ্চে উঠে, সূক্ষ্ম বাসনারাজি তাহাকে তত তীব্র যাতনা অনুভব করায়।

অবতার-পুরুষদিগের সূক্ষ্ম বাসনার সহিত সংগ্রাম

চুরি, মিথ্যা বা লাম্পট্য যে অসংখ্যবার করিয়াছে, তাহার ঐরূপ কার্যের পুনরনুষ্ঠান তত কষ্টকর হয় না; কিন্তু উদার উচ্চ অন্তঃকরণ ঐ সকলের চিন্তামাত্রেই আপনাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া বিষম যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়। অবতারপুরুষসকলকে আজীবন স্থূলভাবে বিষয়গ্রহণে অনেকস্থলে বিরত থাকিতে দেখা যাইলেও, অন্তরের সূক্ষ্ম বাসনাশ্রেণীর সহিত সংগ্রাম যে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় সমভাবেই করিয়া থাকেন এবং মনের ভিতর উহাদিগের মূর্তি দেখিয়া আমাদিগের অপেক্ষা শত-সহস্রগুণ অধিক যন্ত্রণা অনুভব করেন, একথা তাঁহারা স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অতএব রূপরসাদি বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে ফিরাইতে তাঁহাদিগের সংগ্রামকে ভান কিরূপে বলিব?

শাস্ত্রদর্শী কোন পাঠক হয়ত এখনও বলিবেন—"কিন্তু তোমার কথা মানি কিরূপে? এই দেখ, অদ্বৈতবাদীর শিরোমণি আচার্য শঙ্কর তাঁহার

গীতাভাষ্যের প্রারম্ভে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম ও নরদেহধারণ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন, 'নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাব, সকল জীবের নিয়ামক, জন্মাদিরহিত ঈশ্বরলোকানুগ্রহ করিবেন বলিয়া নিজ মায়াশক্তি দ্বারা যেন দেহবান হইয়াছেন, যেন জন্মিয়াছেন, এইরূপ পরিলক্ষিত হন।'* স্বয়ং আচার্যই যখন ঐকথা বলিতেছেন, তখন তোমাদের পূর্বোক্ত কথা দাঁড়ায় কিরূপে?" আমরা বলি, আচার্য ঐরূপ বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদিগের দাঁড়াইবার স্থল আছে। আচার্যের ঐকথা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তিনি ঈশ্বরের দেহধারণ বা নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে যেমন ভান বলিতেছেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তোমার, আমার এবং জগতের প্রত্যেক বস্তু ও ব্যক্তির নামরূপবিশিষ্ট হওয়াটাকে ভান বলিতেছেন। সমস্ত জগৎটাকেই তিনি ব্রহ্মবস্তুর উপরে মিথ্যা ভান বলিতেছেন বা উহার বাস্তব সত্তা স্বীকার করিতেছেন না।† অতএব তাঁহার ঐ উভয় কথা একত্রে গ্রহণ করিলে তবেই তৎকৃত মীমাংসা বুঝা যাইবে। অবতারের দেহধারণ ও সুখদুঃখাদি অনুভবগুলিকে মিথ্যা ভান বলিয়া ধরিব এবং আমাদিগের ঐ বিষয়গুলিকে সত্য বলিব, এরূপ তাঁহার অভিপ্রায় নহে। আমাদিগের অনুভব ও প্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে অবতার-পুরুষদিগের প্রত্যক্ষাদিকেও সত্য বলিয়া ধরিতে হইবে। সুতরাং পূর্বোক্ত কথায় আমরা অন্যায় কিছু বলি নাই।

অবতারপুরুষের মানবভাবসম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা

* স চ ভগবান্…অজোঽব্যয়ো ভূতানামীশ্বরো নিত্যশুদ্ধমুক্তস্বভাবোঽপি সন্ স্বমায়য়া দেহবানিব জাত ইব লোকানুগ্রহং কুর্বন্ লক্ষ্যতে।

গীতা—শাঙ্করভাষ্যের উপক্রমণিকা

† শারীরকভাষ্যে অধ্যাসনিরূপণ দেখ।

কথাটির আর একভাবে আলোচনা করিলে পরিষ্কার বুঝা যাইবে। অদ্বৈতভাব-ভূমি ও সাধারণ বা দ্বৈতভাব-ভূমি হইতে দৃষ্টি করিয়া জগৎ সম্বন্ধে দুইপ্রকার ধারণা আমাদিগের উপস্থিত হয়—শাস্ত্র এই কথা বলেন। প্রথমটিতে আরোহণ করিয়া জগৎরূপ পদার্থটি কতদূর সত্য বুঝিতে যাইলে প্রত্যক্ষ বোধ হয়, উহা নাই বা কোনও কালে ছিল না—'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নাই; আর দ্বিতীয় বা দ্বৈতভাব-ভূমিতে থাকিয়া জগৎটাকে দেখিলে নানা নামরূপের সমষ্টি উহাকে সত্য ও নিত্য বর্তমান বলিয়া বোধ হয়, যেমন আমাদিগের ন্যায় মানবসাধারণের সর্বক্ষণ হইতেছে। দেহস্থ থাকিয়াও বিদেহভাবসম্পন্ন অবতার ও জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান জীবনে অনেক সময় হওয়ায় নিম্নের দ্বৈতভূমিতে অবস্থানকালে জগৎটাকে স্বপ্নতুল্য মিথ্যা বলিয়া ধারণা হইয়া থাকে। কিন্তু জাগ্রদবস্থার সহিত তুলনায় স্বপ্ন মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হইলেও স্বপ্নসন্দর্শনকালে যেমন উহাকে এককালে মিথ্যা বলা যায় না, জীবন্মুক্ত ও অবতারপুরুষদিগের মনের জগদাভাসকেও সেইরূপ এককালে মিথ্যা বলা চলে না।

ঐ কথার অন্যভাবে আলোচনা

জগৎরূপ পদার্থটাকে পূর্বোক্ত দুই ভূমি হইতে যেমন দুই ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তেমনি আবার উহার অন্তর্গত কোন ব্যক্তি-বিশেষকেও ঐরূপে দুই ভাবভূমি হইতে দুইপ্রকারে দেখা গিয়া থাকে। দ্বৈতভাব-ভূমি হইতে দেখিলে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধ মানব এবং পূর্ণ অদ্বৈত-ভূমি হইতে দেখিলে তাহাকে নিত্য-শুদ্ধ-মুক্তস্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বোধ হয়। পূর্ণ অদ্বৈতভূমি ভাবরাজ্যের সর্বোচ্চ প্রদেশ। উহাতে আরোহণ করিবার পূর্বে মানব-মন উচ্চ উচ্চতর নানা ভাবভূমির ভিতর দিয়া উঠিয়া

পরিশেষে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হয়। ঐ সকল উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে উঠিবার কালে জগৎ ও তদন্তর্গত ব্যক্তিবিশেষ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সাধকের নিকট প্রতীয়মান হইতে থাকিয়া উহাদের সম্বন্ধে তাঁহার পূর্ব ধারণা নানারূপে পরিবর্তিত হইতে থাকে। যথা—জগৎটাকে ভাবময় বলিয়া বোধ হয়; অথবা ব্যক্তিবিশেষকে শরীর হইতে পৃথক, অদৃষ্টপূর্বশক্তিশালী, মনোময় বা দিব্য জ্যোতির্ময় ইত্যাদি বলিয়া বোধ হইতে থাকে।

উচ্চতর ভাবভূমি হইতে জগৎসম্বন্ধে ভিন্ন উপলব্ধি

অবতারপুরুষদিগের নিকট শ্রদ্ধা ও ভক্তিসম্পন্ন হইয়া উপস্থিত হইলে সাধারণ মানব অজ্ঞাতসারে পূর্বোক্ত উচ্চ উচ্চতর ভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া থাকে। অবশ্য তাঁহাদিগের বিচিত্র শক্তি-প্রভাবেই ঐ প্রকার আরোহণসামর্থ্য উপস্থিত হয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঐ সকল উচ্চভূমি হইতে তাঁহাদিগকে ঐরূপ বিচিত্রভাবে দেখিতে পাইয়াই ভক্ত-সাধক তাঁহাদিগের সম্বন্ধে ধারণা করিয়া বসেন যে, বিচিত্রশক্তিসম্পন্ন দিব্যভাবই তাঁহাদিগের যথার্থ স্বরূপ এবং ইতরসাধারণে তাঁহাদিগের ভিতরে যে মানবভাব দেখিতে পায়, তাহা তাঁহারা মিথ্যা ভান করিয়া তাহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন। ভক্তির গভীরতার সঙ্গে ভক্ত-সাধকের প্রথমে ঈশ্বরের ভক্তসকলের সম্বন্ধে এবং পরে ঈশ্বরের জগৎ সম্বন্ধে ঐরূপ ধারণা হইতে দেখা গিয়া থাকে।

অবতারপুরুষদিগের শক্তিতে মানব উচ্চভাবে উঠিয়া তাঁহাদিগকে মানব-ভাবপরিশূন্য দেখে

পূর্বে বলিয়াছি, মনে উচ্চভূমিতে আরোহণ করিয়া ভাবরাজ্যে দৃষ্ট বিষয়সকলে, জগতে প্রতিনিয়ত পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের ন্যায় দৃঢ়

অবতারজীবনে সাধকভাব

অস্তিত্বানুভব, অবতারপুরুষসকলের জীবনে শৈশবকাল হইতে সময়ে সময়ে দেখিতে পাওয়া যায়। পরে, দিনের পর যতই দিন যাইতে থাকে এবং ঐরূপ দর্শন তাঁহাদিগের জীবনে বারংবার যত উপস্থিত হইতে থাকে, তত তাঁহারা স্থূল, বাহ্য জগতের অপেক্ষা ভাবরাজ্যের অস্তিত্বেই সমধিক বিশ্বাসবান হইয়া পড়েন। পরিশেষে, সর্বোচ্চ অদ্বৈতভাবভূমিতে উঠিয়া যে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' বস্তু হইতে নানা নামরূপময় জগতের বিকাশ হইয়াছে, তাহার সন্ধান পাইয়া তাঁহারা সিদ্ধকাম হন। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেও ঐরূপ হইয়া থাকে। তবে অবতারপুরুষেরা অতি স্বল্পকালে যে সত্যে উপনীত হন, তাহা উপলব্ধি করিতে তাঁহাদিগের আজীবন চেষ্টার আবশ্যক হয়। অথবা, স্বয়ং স্বল্পকালে অদ্বৈতভূমিতে আরোহণ করিতে পারিলেও অপরকে ঐ ভূমিতে আরোহণ করাইয়া দিবার শক্তি তাঁহাদিগের ভিতর অবতারপুরুষদিগের সহিত তুলনায় অতি অল্পমাত্রই প্রকাশিত হয়। ঠাকুরের ঐ বিষয়ক শিক্ষা স্মরণ কর—"জীব ও অবতারে শক্তির প্রকাশ লইয়াই প্রভেদ।"

অবতারপুরুষদিগের মনের ক্রমোন্নতি। জীব ও অবতারের শক্তির প্রভেদ

অদ্বৈতভূমিতে কিছুকাল অবস্থান করিয়া জগৎকারণের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষে পরিতৃপ্ত হইয়া অবতারপুরুষেরা যখন পুনরায় মনের নিম্নভূমিতে অবরোহণ করেন, তখন সাধারণ দৃষ্টিতে মানবমাত্র থাকিলেও তাঁহারা যথার্থই অমানব বা দেবমানব পদবী প্রাপ্ত হন। তখন তাঁহারা জগৎ ও তৎকারণ, উভয় পদার্থকে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তুলনায় বাহ্যান্তর জগৎটার ছায়ার ন্যায় অস্তিত্ব সর্বদা সর্বত্র অনুভব করিতে থাকেন। তখন তাঁহাদিগের

অবতার—দেবমানব সর্বজ্ঞ

ভিতর দিয়া মনে অসাধারণ উচ্চশক্তিসমূহ স্বতঃ লোকহিতায় নিত্য প্রকাশিত হইতে থাকে এবং জগতে পরিদৃষ্ট সকল পদার্থের আদি, মধ্য ও অন্ত সম্যক্ অবগত হইয়া তাঁহারা সর্বজ্ঞত্ব লাভ করেন। স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন মানব আমরা তখনই তাঁহাদিগের অলৌকিক চরিত্র ও চেষ্টাদি প্রত্যক্ষ-পূর্বক তাঁহাদিগের অভয় শরণ গ্রহণ করিয়া থাকি এবং তাঁহাদিগের অপার করুণায় পুনরায় একথা হৃদয়ঙ্গম করি যে—বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া বাহ্যজগতে পরিদৃষ্ট বস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে যথার্থ সত্যলাভ, বা জগৎকারণের অনুসন্ধান ও শান্তি লাভ কখনই সফল হইবার নহে।

পাশ্চাত্যবিদ্যা-পারদর্শী পাঠক আমাদিগের পূর্বোক্ত কথা শ্রবণ করিয়া নিশ্চয় বলিবেন—বাহ্যজগতের বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে অবলম্বন করিয়া অনুসন্ধানে মানবের জ্ঞান আজকাল কতদূর উন্নত হইয়াছে ও নিত্য হইতেছে, তাহা যে দেখিয়াছে সে ঐরূপ কথা কখনই বলিতে পারে না। উত্তরে আমরা বলি—জড়বিজ্ঞানের উন্নতি দ্বারা মানবের জ্ঞানবৃদ্ধির কথা সত্য হইলেও উহার সহায়ে পূর্ণসত্য-লাভ আমাদিগের কখনই সাধিত হইবে না। কারণ, যে বিজ্ঞান জগৎকারণকে জড় অথবা আমাদিগের অপেক্ষাও অধম, নিকৃষ্ট দরের বস্তু বলিয়া ধারণা করিতে শিক্ষা দিতেছে, তাহার উন্নতি দ্বারা আমরা ক্রমশঃ বহির্মুখ হইয়া অধিক পরিমাণে রূপরসাদি-ভোগলাভকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বলিয়া স্থির করিয়া বসিতেছি। অতএব, একমাত্র জড়বস্তু হইতে জগতের সকল বস্তু উৎপন্ন হইয়াছে—একথা যন্ত্রসহায়ে কোনকালে প্রমাণ করিতে পারিলেও অন্তর-রাজ্যের বিষয়সকল আমাদিগের নিকট চিরকালই অন্ধকারাবৃত ও অপ্রমাণিত থাকিবে।

বহির্মুখী বৃত্তি লইয়া জড়বিজ্ঞানের আলোচনায় জগৎ কারণের জ্ঞানলাভ অসম্ভব

ভোগবাসনাত্যাগ ও অন্তর্মুখীবৃত্তিসম্পন্ন হওয়ার ভিতর দিয়াই মানবের মুক্তিলাভের পথ, একথা যতদিন না হৃদয়ঙ্গম হইবে, ততদিন আমাদিগের দেশকালাতীত অখণ্ড সত্যলাভপূর্বক শান্তিলাভ সুদূরপরাহতই থাকিবে।

ভাবরাজ্যের বিষয় লইয়া বাল্যকালে সময়ে সময়ে তন্ময় হইয়া যাইবার কথা সকল অবতারপুরুষের জীবনেই শুনিতে পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ বাল্যকালে স্বীয় দেবত্বের পরিচয় নানা সময় নিজ পিতামাতা ও বন্ধুবান্ধবদিগের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দিয়াছিলেন; বুদ্ধ বাল্যে উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া জম্বুবৃক্ষতলে সমাধিস্থ হইয়া দেবতা ও মানবের নয়নাকর্ষণ করিয়াছিলেন;

অবতারপুরুষদিগের আশৈশব ভাবতন্ময়ত্ব

ঈশা বন্য পক্ষীদিগকে প্রেমে আকর্ষণপূর্বক বাল্যে নিজহস্তে খাওয়াইয়াছিলেন; শঙ্কর স্বীয় মাতাকে দিব্যশক্তিপ্রভাবে মুগ্ধ ও আশ্বস্ত করিয়া বাল্যেই সংসারত্যাগ করিয়াছিলেন; এবং চৈতন্য বাল্যেই দিব্যভাবে আবিষ্ট হইয়া ঈশ্বরপ্রেমিক হেয়-উপাদেয় সকল বস্তুর ভিতরেই ঈশ্বর-প্রকাশ দেখিতে পান, একথার আভাস দিয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও ঐরূপ ঘটনার অভাব নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপে কয়েকটি এখানে উল্লেখ করিতেছি। ঘটনাগুলি ঠাকুরের নিজমুখে শুনিয়া আমরা বুঝিয়াছি, ভাবরাজ্যে প্রথম তন্ময় হওয়া তাঁহার অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন—"ওদেশে (কামারপুকুরে) ছেলেদের ছোট ছোট টেকোয়* করে মুড়ি খেতে দেয়। যাদের ঘরে টেকো নেই, তারা কাপড়েই মুড়ি খায়। ছেলেরা কেউ টেকোয়, কেউ কাপড়ে মুড়ি নিয়ে খেতে খেতে মাঠে-ঘাটে বেড়িয়ে বেড়ায়। সেটা জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাস হবে, আমার তখন ছয় কি সাত বছর বয়স। একদিন সকালবেলা টেকোয় মুড়ি নিয়ে মাঠের

* চুবড়ি।

আল্‌পথ দিয়ে খেতে খেতে যাচ্ছি। আকাশে একখানা সুন্দর জলভরা মেঘ উঠেছে—তাই দেখছি ও খাচ্ছি। দেখতে দেখতে মেঘখানা আকাশ প্রায় ছেয়ে ফেলেছে, এমন সময় একঝাঁক সাদা দুধের মত বক ঐ কাল মেঘের কোল দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো। সে এমন এক বাহার হলো!—দেখতে দেখতে অপূর্ব ভাবে তন্ময় হয়ে এমন একটা অবস্থা হলো যে, আর হুঁশ রইলো না! পড়ে গেলুম—মুড়িগুলো আলের ধারে ছড়িয়ে গেল। কতক্ষণ ঐভাবে পড়েছিলাম বলতে পারি না, লোকে দেখতে পেয়ে ধরাধরি করে বাড়ী নিয়ে এসেছিল। সেই প্রথম ভাবে বেহুঁশ হয়ে যাই।"

ঠাকুরের ছয় বৎসর বয়সে প্রথম ভাবাবেশের কথা

ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরের এক ক্রোশ আন্দাজ উত্তরে আনুড় নামে গ্রাম। আনুড়ের বিষলক্ষ্মী * জাগ্রতা দেবী। চতুষ্পার্শ্বস্থ দূর-দূরান্তরের গ্রাম হইতে গ্রামবাসিগণ নানাপ্রকার কামনা পূরণের জন্য দেবীর উদ্দেশে পূজা মানত করে এবং অভীষ্টসিদ্ধি হইলে যথাকালে আসিয়া পূজা বলি প্রভৃতি দিয়া যায়। অবশ্য, আগন্তুক যাত্রীদিগের ভিতর স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক হয় এবং রোগশান্তির কামনাই অন্যান্য কামনা অপেক্ষা অধিকসংখ্যক লোককে এখানে আকৃষ্ট করে। দেবীর প্রথমাবির্ভাব ও আত্মপ্রকাশ-সম্বন্ধীয় গল্প ও গান করিতে করিতে সদ্বংশজাতা গ্রাম্য স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ হইয়া

৺বিশালাক্ষী দর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুরের দ্বিতীয় ভাবাবেশের কথা

* উক্ত দেবীর নাম্ বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী, তাহা স্থির করা কঠিন। প্রাচীন বাঙ্গলা গ্রন্থে মনসাদেবীর অন্য নাম বিষহরি দেখিতে পাওয়া যায়। বিষহরি শব্দটি বিষলক্ষ্মীতে পরিণত সহজেই হইতে পারে। আবার মনসামঙ্গলাদি গ্রন্থে মনসাদেবীর রূপবর্ণনায়

নিঃশঙ্কচিত্তে প্রান্তর পার হইয়া দেবীদর্শনে আগমন করিতেছেন—এ দৃশ্য এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। ঠাকুরের বাল্যকালে কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রাম যে বহুলোকপূর্ণ এবং এখন অপেক্ষা অনেক অধিক সমৃদ্ধিশালী ছিল, তাহার নিদর্শন, জনশূন্য জঙ্গলপূর্ণ ভগ্ন ইষ্টকালয়, জীর্ণ পতিত দেবমন্দির, রাসমঞ্চ প্রভৃতি দেখিয়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। সেজন্য আমাদের অনুমান, আনুড়ের দেবীর নিকট তখন যাত্রিসংখ্যাও অনেক অধিক ছিল।

প্রান্তরমধ্যে শূন্য অম্বরতলেই দেবীর অবস্থান, বর্ষাতপাদি হইতে রক্ষার জন্য কৃষকেরা সামান্য পর্ণাচ্ছাদনমাত্র বৎসর বৎসর করিয়া দেয়। ইষ্টকনির্মিত মন্দির যে এককালে বর্তমান ছিল, তাহার পরিচয় পার্শ্বের ভগ্নস্তূপে পাওয়া যায়। গ্রামবাসীদিগকে উক্ত মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলে, দেবী স্বেচ্ছায় উহা ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। বলে—

গ্রামের রাখালবালকগণ দেবীর প্রিয় সঙ্গী; প্রাতঃকাল হইতে তাহারা এখানে আসিয়া গরু ছাড়িয়া দিয়া বসিবে, গল্প-গান করিবে, খেলা করিবে বনফুল তুলিয়া তাহাকে সাজাইবে এবং দেবীর উদ্দেশ্যে যাত্রী বা পথিক-প্রদত্ত মিষ্টান্ন ও পয়সা নিজেরা গ্রহণ করিয়া আনন্দ করিবে—এ সকল মিষ্ট উপদ্রব না হইলে তিনি থাকিতে পারেন না। এক সময়ে কোন

বিশালাক্ষী শব্দেরও প্রয়োগ আছে। অতএব মনসাদেবীই সম্ভবতঃ বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী নামে অভিহিতা হইয়া এখানে লোকের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। বিষলক্ষ্মী বা বিশালাক্ষী দেবীর পূজা রাঢ়ের অন্যত্র অনেক স্থলেও দেখিতে পাওয়া যায়। কামারপুকুর হইতে ঘাটাল আসিবার পথে একস্থলে আমরা উক্ত দেবীর একটি সুন্দর মন্দির দেখিয়াছিলাম। মন্দির-সংলগ্ন নাটমন্দির, পুষ্করিণী, বাগিচা প্রভৃতি দেখিয়া ধারণা হইয়াছিল, এখানে পূজার বিশেষ বন্দোবস্ত আছে।

গ্রামের এক ধনী ব্যক্তির অভীষ্টপূরণ হওয়ায় সে ঐ মন্দির নির্মাণ করিয়া দেয় এবং দেবীকে উহার মধ্যে প্রতিষ্ঠিতা করে। পুরোহিত সকাল সন্ধ্যা নিত্য যেমন আসে, আসিয়া পূজা করিয়া মন্দিরদ্বার রুদ্ধ করিয়া যাইতে লাগিল এবং পূজার সময় ভিন্ন অন্য সময়ে যে-সকল দর্শনাভিলাষী আসিতে লাগিল, তাহারা দ্বারের জাফরির রন্ধ্রমধ্য দিয়া দর্শনী-প্রণামী মন্দিরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া যাইতে থাকিল। কাজেই কৃষাণবালকদিগের আর পূর্বের ন্যায় ঐ সকল পয়সা আত্মসাৎ করা ও মিষ্টান্নাদি ক্রয় করিয়া দেবীকে একবার দেখাইয়া ভোজন ও আনন্দ করার সুবিধা রহিল না। তাহারা ক্ষুণ্ণমনে মাকে জানাইল—মা, মন্দিরে ঢুকিয়া আমাদের খাওয়া বন্ধ করিলি? তোর দৌলতে নিত্য লাড্ডু মোয়া খাইতাম, এখন আমাদের আর ঐ সকল কে খাইতে দিবে? সরল কৃষাণবালকদিগের ঐ অভিযোগ দেবী শুনিলেন এবং সেই রাত্রে মন্দির এমন ফাটিয়া গেল যে, পরদিন ঠাকুর চাপা পড়িবার ভয়ে পুরোহিত শশব্যস্তে দেবীকে পুনরায় বাহিরে অম্বরতলে আনিয়া রাখিল! তদবধি যে-কেহ পুনরায় মন্দিরনির্মাণের জন্য চেষ্টা করিয়াছে তাহাকেই দেবী স্বপ্নে বা অন্য নানা উপায়ে জানাইয়াছেন, ঐ কর্ম তাঁহার অভিপ্রেত নয়। গ্রামবাসীরা বলে—তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও মা ভয় দেখাইয়াও নিরস্ত করিয়াছেন!—স্বপ্নে বলিয়াছেন, "আমি রাখালবালকদের সঙ্গে মাঠের মাঝে বেশ আছি; মন্দিরমধ্যে আমায় আবদ্ধ করলে তোর সর্বনাশ করবো—বংশে কাকেও জীবিত রাখবো না!"

ঠাকুরের আট বৎসর বয়স—এখনও উপনয়ন হয় নাই। গ্রামের ভদ্রঘরের অনেকগুলি স্ত্রীলোক একদিন দলবদ্ধ হইয়া পূর্বোক্তরূপে ৺বিশালাক্ষী দেবীর মানত শোধ করিতে মাঠ ভাঙ্গিয়া যাইতে লাগিলেন।

ঠাকুরের নিজ পরিবারের দুই এক জন স্ত্রীলোক এবং গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার বিধবা কন্যা প্রসন্ন ইঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। প্রসন্নের সরলতা, ধর্মপ্রাণতা, পবিত্রতা ও অমায়িকতা সম্বন্ধে ঠাকুরের উচ্চ ধারণা ছিল। সকল বিষয় প্রসন্নকে জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার পরামর্শমত চলিতে ঠাকুর মাতাঠাকুরানীকে অনেকবার বলিয়াছিলেন এবং প্রসন্নের কথা সময়ে সময়ে নিজ স্ত্রীভক্তদিগকেও বলিতেন। প্রসন্নও ঠাকুরকে বালক-কাল হইতে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন এবং অনেক সময় তাঁহাকে যথার্থ গদাধর বলিয়াই জ্ঞান করিতেন। সরলা স্ত্রীলোক গদাধরের মুখে ঠাকুর-দেবতার পুণ্যকথা এবং ভক্তিপূর্ণ সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইয়া অনেকবার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতেন—"হ্যাঁ গদাই, তোকে সময়ে সময়ে ঠাকুর বলে মনে হয় কেন বল্ দেখি? হ্যাঁ রে, সত্যিসত্যিই ঠাকুর মনে হয়!" গদাই শুনিয়া মধুর হাসি হাসিতেন, কিন্তু কিছুই বলিতেন না; অথবা অন্য পাঁচ কথা পাড়িয়া তাঁহাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিতেন। প্রসন্ন সে-সকল কথায় না ভুলিয়া গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া বলিতেন—"তুই যা-ই বলিস্, তুই কিন্তু মানুষ নোস্।" প্রসন্ন ৺রাধাকৃষ্ণবিগ্রহ স্থাপন করিয়া নিজহস্তে নিত্য সেবার আয়োজন করিয়া দিতেন। পালপার্বনে ঐ মন্দিরে যাত্রাগান হইত। প্রসন্ন কিন্তু উহার অল্পই শুনিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "গদাইয়ের গান শুনে আর কোন গান মিঠে লাগে নি—গদাই কান খারাপ করে দিয়ে গিয়েছে।"—অবশ্য এ সকল অনেক পরের কথা।

স্ত্রীলোকেরা যাইতেছেন দেখিয়া বালক গদাই বলিয়া বসিলেন, "আমিও যাব!" বালকের কষ্ট হইবে ভাবিয়া স্ত্রীলোকেরা নানারূপে নিষেধ করিলেও কোন কথা না শুনিয়া গদাধর সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। স্ত্রীলোকদিগের তাহাতে আনন্দ ভিন্ন বিরক্তি হইল না। কারণ সর্বদা

প্রফুল্লচিত্ত রঙ্গরসপ্রিয় বালক কাহার না মন হরণ করে? তাহার উপর এই অল্প বয়সে গদাইয়ের ঠাকুরদেবতার গান ছড়া সব কণ্ঠস্থ। পথে চলিতে চলিতে তাঁহাদিগের অনুরোধে তাহার দুই-চারিটা সে বলিবেই বলিবে। আর ফিরিবার সময় তাহার ক্ষুধা পাইলেও ক্ষতি নাই, দেবীর প্রসাদী নৈবেদ্য দুগ্ধাদি ত তাঁহাদিগের সঙ্গেই থাকিবে; তবে আর কি? গদাইয়ের সঙ্গে যাওয়ায় বিরক্ত হইবার কি আছে বল। রমণীগণ ঐ প্রকার নানা কথা ভাবিয়া গদাইকে সঙ্গে লইয়া নিঃশঙ্কচিত্তে পথ বাহিয়া চলিলেন এবং গদাইও তাঁহারা যেরূপ ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুরদেবতার গল্প গান করিতে করিতে হৃষ্টচিত্তে চলিতে লাগিলেন।

কিন্তু বিশালাক্ষী দেবীর মহিমা কীর্তন করিতে করিতে প্রান্তর পার হইবার পুর্বেই এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল। বালক গান করিতে করিতে সহসা থামিয়া গেল, তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবশ আড়ষ্ট হইয়া গেল, চক্ষে অবিরল জলধারা বহিতে লাগিল এবং কি অসুখ করিতেছে বলিয়া তাঁহাদিগের বারংবার সস্নেহ আহ্বানে সাড়া পর্যন্ত দিল না। পথ চলিতে অনভ্যস্ত, কোমল বালকের রৌদ্র লাগিয়া সর্দিগরমি হইয়াছে ভাবিয়া রমণীগণ বিশেষ শঙ্কিতা হইলেন এবং সন্নিহিত পুষ্করিণী হইতে জল আনিয়া বালকের মস্তকে ও চক্ষে প্রদান করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও বালকের কোনরূপ সংজ্ঞার উদয় না হওয়ায় তাঁহারা নিতান্ত নিরুপায় হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—এখন উপায়? দেবীর মানত পূজাই বা কেমন করিয়া দেওয়া হয় এবং পরের বাছা গদাইকে বা ভালয় ভালয় কিরূপে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হয়! প্রান্তরে জনমানব নাই যে সাহায্য করে। এখন উপায়? স্ত্রীলোকেরা বিশেষ বিপন্না হইলেন এবং ঠাকুরদেবতার কথা ভুলিয়া বালককে ঘিরিয়া বসিয়া

কখন ব্যজন, কখন জলসেক এবং কখন বা তাহার নাম ধরিয়া ডাকাডাকি করিতে লাগিলেন।

কিছুকাল এইরূপে গত হইলে প্রসন্নের প্রাণে সহসা উদয় হইল—বিশ্বাসী সরল বালকের উপর দেবীর ভর হয় নাই ত? সরলপ্রাণ পবিত্র বালক ও স্ত্রীপুরুষের উপরেই ত দেবদেবীর ভর হয়, শুনিয়াছি। প্রসন্ন সঙ্গী রমণীগণকে ঐ কথা বলিলেন এবং এখন হইতে গদাইকে না ডাকিয়া একমনে ৺বিশালাক্ষীর নাম করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রসন্নের পুণ্যচারিত্র্যে তাঁহার উপর শ্রদ্ধা রমণীগণের পূর্ব হইতেই ছিল, সুতরাং সহজেই ঐ কথায় বিশ্বাসিনী হইয়া এখন দেবীজ্ঞানে বালককেই সম্বোধন করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন—'মা বিশালাক্ষি, প্রসন্না হও, মা, রক্ষা কর; মা বিশালাক্ষি, মুখ তুলে চাও; মা, অকূলে কূল দাও!'

আশ্চর্য! রমণীগণ কয়েকবার ঐরূপে দেবীর নাম গ্রহণ করিতে না করিতেই গদাইয়ের মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল এবং বালকের অল্প অল্প সংজ্ঞার লক্ষণ দেখা গেল। তখন আশ্বাসিতা হইয়া তাঁহারা বালকশরীরে বাস্তবিকই দেবীর ভর হইয়াছে নিশ্চয় করিয়া তাঁহাকে পুনঃপুনঃ প্রণাম ও মাতৃসম্বোধনে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।*

ক্রমে সংজ্ঞালাভ করিয়া বালক প্রকৃতিস্থ হইল এবং আশ্চর্যের বিষয়, ইতিপূর্বের ঐরূপ অবস্থার জন্য তাহার শরীরে কোনরূপ অবসাদ বা দুর্বলতা লক্ষিত হইল না। রমণীগণ তখন তাঁহাকে লইয়া ভক্তিগদ্‌গদ্‌-চিত্তে ৺দেবীস্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যথাবিধি পূজা দিয়া গৃহে ফিরিয়া

* কেহ কেহ বলেন, এই সময়ে ভক্তির আতিশয্যে স্ত্রীলোকেরা বিশালাক্ষীর নিমিত্ত আনীত নৈবেদ্যাদি বালককে ভোজন করিতে দিয়াছিলেন।

ঠাকুরের মাতার নিকট সকল কথা আদ্যোপান্ত নিবেদন করিলেন।' তিনি তাহাতে ভীতা হইয়া গদাইয়ের কল্যাণে সেদিন কুলদেবতা ৺রঘুবীরের বিশেষ পূজা দিলেন এবং বিশালাক্ষীর উদ্দেশ্যে পুনঃপুনঃ প্রণাম করিয়া তাঁহারও বিশেষ পূজা অঙ্গীকার করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের আর একটি ঘটনা বাল্যকাল হইতে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে মধ্যে মধ্যে আরূঢ় হওয়ার বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। ঘটনাটি এইরূপ হইয়াছিল—

কামারপুকুরে ঠাকুরের পিত্রালয়ের দক্ষিণ-পশ্চিমে কিয়দ্দূরে একঘর সুবর্ণবণিক বাস করিত। পাইনরা যে তখন বিশেষ শ্রীমান ছিল, তৎপরিচয় তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বিচিত্র কারুকার্যখচিত ইষ্টকনির্মিত শিব-মন্দিরে এখনও পাওয়া যায়। এ পরিবারের দুই-একজন মাত্র এখনও বাঁচিয়া আছে এবং ঘরদ্বার ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়াছে। গ্রামের লোকের নিকট শুনিতে পাওয়া যায়, পাইনদের তখন বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি ছিল, বাটীতে লোক ধরিত না এবং জমিজেরাত, চাষবাস, গরুলাঙ্গলও যেমন ছিল, নিজেদের ব্যবসায়েও তেমনি বেশ দুপয়সা আয় ছিল। তবে পাইনরা গ্রামের জমিদারদের মত ধনাঢ্য ছিল না, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-শ্রেণীভুক্ত ছিল।

পাইনদের কর্তা বিশেষ ধর্মনিষ্ঠ ছিলেন। সমর্থ হইলেও নিজের বসতবাটীটি ইষ্টকনির্মিত করিতে প্রয়াস পান নাই, বরাবর মাটকোঠাতেই* বাস করিতেন; দেবালয়টি কিন্তু ইষ্টক পোড়াইয়া বিশিষ্ট শিল্পী নিযুক্ত করিয়া সুন্দরভাবে নির্মাণ করিয়াছিলেন। কর্তার নাম সীতানাথ ছিল। তাঁহার সাত পুত্র ও আট কন্যা ছিল; এবং বিবাহিতা হইলেও

* বাঁশ, কাঠ, খড় ও মৃত্তিকাসহায়ে নির্মিত দ্বিতল বাটীকে পল্লীগ্রামে 'মাটকোঠা' বলে। ইহাতে ইষ্টকের সম্পর্ক থাকে না।

কন্যাগুলি, কি কারণে বলিতে পারি না, সর্বদা পিত্রালয়েই বাস করিত। শুনিয়াছি, ঠাকুরের যখন দশ-বার বৎসর বয়স, তখন উহাদের সর্বকনিষ্ঠা যৌবনে পদার্পণ করিয়াছে। কন্যাগুলি সকলেই রূপবতী ও দেবদ্বিজভক্তিপরায়ণা ছিল এবং প্রতিবেশী বালক গদাইকে বিশেষ স্নেহ করিত। ঠাকুর বাল্যকালে অনেক সময় এই ধর্মনিষ্ঠ পরিবারের ভিতর কাটাইতেন এবং পাইনদের বাটীতে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে উঠিয়া অনেক লীলার কথা এখনও গ্রামে শুনিতে পাওয়া যায়। বর্তমান ঘটনাটি কিন্তু আমরা ঠাকুরের নিকটেই শুনিয়াছিলাম।

কামারপুকুরে বিষ্ণুভক্তি ও শিবভক্তি পরস্পর দ্বেষাদ্বেষি না করিয়া বেশ পাশাপাশি চলিত বলিয়া বোধ হয়। এখনও শিবের গাজনের ন্যায় বৎসর বৎসর বিষ্ণুর চব্বিশপ্রহরী নামসংকীর্তন সমারোহে সম্পন্ন হইয়া থাকে; তবে শিবমন্দির ও শিবস্থানের সংখ্যা বিষ্ণুমন্দিরাপেক্ষা অধিক। সুবর্ণবণিকদিগের ভিতর অনেকেই গোঁড়া বৈষ্ণব হইয়া থাকে, নিত্যানন্দ প্রভুর উদ্ধারণ দত্তকে দীক্ষা দিয়া উদ্ধার করিবার পর হইতে ঐ জাতির ভিতর বৈষ্ণব মত বিশেষ প্রচলিত। কামারপুকুরের পাইনরা কিন্তু শিব ও বিষ্ণু উভয়েরই ভক্ত ছিল। বৃদ্ধ কর্তা পাইন একদিকে যেমন ত্রিসন্ধ্যা হরিনাম করিতেন, অন্যদিকে তেমনি শিবপ্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং প্রতি বৎসর শিবরাত্রিব্রত পালন করিতেন। রাত্রিজাগরণে সহায়ক হইবে বলিয়া ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রাগানের বন্দোবস্ত হইত।

একবার ঐরূপে শিবরাত্রি-ব্রতকালে পাইনদের বাটীতে যাত্রার বন্দোবস্ত হইয়াছে। নিকটবর্তী গ্রামেরই দল শিবমহিমাসূচক পালা গাহিবে, রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিবে। সন্ধ্যার সময় সংবাদ পাওয়া

গেল, যাত্রার দলে যে বালক শিব সাজিয়া থাকে, তাহার সহসা কঠিন পীড়া হইয়াছে, শিব সাজিবার লোক বহু সন্ধানেও পাওয়া যাইতেছে না। অধিকারী হতাশ হইয়া অদ্যকার নিমিত্ত যাত্রা বন্ধ রাখিতে মিনতি করিয়া পাঠাইয়াছেন। এখন উপায়? শিবরাত্রিতে রাত্রিজাগরণ কেমন করিয়া হয়? বৃদ্ধেরা পরামর্শ করিতে বসিলেন এবং অধিকারীকে জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, শিব সাজিবার লোক দিলে তিনি অদ্য রাত্রে যাত্রা করিতে পারিবেন কি-না। উত্তর আসিল, শিব সাজিবার লোক পাইলে পারিব। গ্রাম্য পঞ্চায়েৎ আবার পরামর্শ জুড়িল, শিব সাজিতে কাহাকে অনুরোধ করা যায়। স্থির হইল, গদাইয়ের বয়স অল্প হইলেও সে অনেক শিবের গান জানে এবং শিব সাজিলে তাহাকে দেখাইবেও ভাল, তাহাকেই বলা যাক্। তবে শিব সাজিয়া একটু আধটু কথাবার্তা কহা, তাহা অধিকারী স্বয়ং কৌশলে চালাইয়া লইবে। গদাধরকে বলা হইল, সকলের আগ্রহ দেখিয়া তিনি ঐ কার্যে সম্মত হইলেন। পূর্বনির্ধারিত কথামত রাত্রি একদণ্ড পরে যাত্রা বসিল।

শিবরাত্রিকালে শিব সাজিয়া ঠাকুরের তৃতীয় ভাবাবেশ

গ্রামের জমিদার ধর্মদাস লাহার ঠাকুরের পিতার সহিত বিশেষ সৌহার্দ্য থাকায়, তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা ও ঠাকুর উভয়ে 'সেঙাত' পাতাইয়াছিলেন। 'সেঙাত' শিব সাজিবেন জানিয়া গয়াবিষ্ণু ও তাঁহার দলবল মিলিয়া ঠাকুরের অনুরূপ বেশভূষা করিয়া দিতে লাগিলেন। ঠাকুর শিব সাজিয়া সাজঘরে বসিয়া শিবের কথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার আসরে ডাক পড়িল এবং তাঁহার বন্ধুগণের মধ্যে জনৈক পথপ্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে আসরের দিকে লইয়া যাইতে উপস্থিত হইল। বন্ধুর আহ্বানে ঠাকুর উঠিলেন এবং কেমন

উন্মনাভাবে কোনদিকে লক্ষ্য না করিয়া ধীরমন্থর গতিতে সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া স্থিরভাবে দণ্ডায়মান হইলেন। তখন ঠাকুরের সেই জটাজটিল বিভূতিমণ্ডিত বেশ, সেই ধীরস্থির পাদক্ষেপ ও পরে অচল অটল অবস্থিতি, বিশেষতঃ সেই অপার্থিব অন্তর্মুখী নির্নিমেষ দৃষ্টি ও অধরকোণে ঈষৎ হাস্যরেখা দেখিয়া লোকে আনন্দে ও বিস্ময়ে মোহিত হইয়া পল্লীগ্রামের প্রথামত সহসা উচ্চরবে হরিধ্বনি করিয়া উঠিল এবং রমণীগণের কেহ কেহ উলুধ্বনি এবং শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল। অনন্তর সকলকে স্থির করিবার জন্য অধিকারী ঐ গোলযোগের ভিতরেই শিবস্তুতি আরম্ভ করিলেন। তাহাতে শ্রোতারা কথঞ্চিৎ স্থির হইল বটে, কিন্তু পরস্পরে ইশারা ও গা ঠেলিয়া 'বাহবা, বাহবা', 'গদাইকে কি সুন্দর দেখাইতেছে', 'ছোঁড়া শিবের পালাটা এত সুন্দর করতে পারবে তা কিন্তু ভাবি নি', 'ছোঁড়াকে বাগিয়ে নিয়ে আমাদের একটা যাত্রার দল করলে হয়' ইত্যাদি নানা কথা অনুচ্চস্বরে চলিতে লাগিল। গদাধর কিন্তু তখনও সেই একইভাবে দণ্ডায়মান, অধিকন্তু তাহার বক্ষ বহিয়া অবিরত নয়নাশ্রু পতিত হইতেছে। এইরূপ কিছুক্ষণ অতীত হইলে গদাধর তখনও স্থানপরিবর্তন বা বলাকহা কিছুই করিতেছেন না দেখিয়া অধিকারী ও পল্লীর বৃদ্ধ দুই এক জন বালকের নিকটে গিয়া দেখেন, তাহার হস্ত-পদ অসাড়—বালক সম্পূর্ণ সংজ্ঞাশূন্য। তখন গোলমাল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। কেহ বলিল—জল, চোখে মুখে জল দাও; কেহ বলিল—বাতাস কর; কেহ বলিল—শিবের ভর হয়েছে, নাম কর, আবার কেহ বলিল—ছোঁড়াটা রসভঙ্গ করলে, যাত্রাটা আর শোনা হল না দেখচি! যাহা হউক, বালকের কিছুতেই সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া যাত্রা ভাঙ্গিয়া গেল এবং গদাধরকে কাঁধে লইয়া কয়েকজন কোনরূপে বাড়ী পৌছাইয়া

দিল। শুনিয়াছি সে রাত্রে গদাধরের সে ভাব বহু প্রযত্নেও ভঙ্গ হয় নাই এবং বাড়ীতে কান্নাকাটি উঠিয়াছিল। পরে সূর্যোদয় হইলে তিনি আবার প্রকৃতিস্থ হইয়াছিলেন।*

* কেহ কেহ বলেন, তিনি তিনদিন সমভাবে ঐ অবস্থায় ছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

সাধকভাবের প্রথম বিকাশ

ভাবতন্ময়তা সম্বন্ধে পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি ভিন্ন আরও অনেক কথা ঠাকুরের বাল্যজীবনে শুনিতে পাওয়া যায়। ছোটি-খাট অনেক বিষয়ে তাঁহার মনের ঐরূপ স্বভাবের পরিচয় আমরা সময়ে সময়ে পাইয়া থাকি।

ঠাকুরের বাল্যজীবনে ভাবতন্ময়তার পরিচায়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত

যেমন—গ্রামের কুম্ভকার শিবদুর্গাদি দেবদেবীর প্রতিমা গড়িতেছে, বয়স্যবর্গের সহিত যথা ইচ্ছা বেড়াইতে বেড়াইতে ঠাকুর তথায় আগমন করিয়া মূর্তিগুলি দেখিতে দেখিতে সহসা বলিলেন, "এ কি হইয়াছে? দেব-চক্ষু কি এইরূপ হয়? এইভাবে আঁকিতে হয়"—বলিয়া যেভাবে টান দিয়া অঙ্কিত করিলে চক্ষে অমানব শক্তি, করুণা, অন্তর্মুখীনতা ও আনন্দের একত্র সমাবেশ হইয়া মূর্তিগুলিকে জীবন্ত দেবভাবসম্পন্ন করিয়া তুলিবে, তাহাকে তদ্বিষয় বুঝাইয়া দিলেন। বালক গদাধর কখনও শিক্ষালাভ না করিয়া কেমন করিয়া ঐ কথা বুঝিতে ও বুঝাইতে সক্ষম হইল, সকলে অবাক হইয়া তাহা ভাবিতে থাকিল এবং ঐ বিষয়ের কারণ খুঁজিয়া পাইল না।

যেমন—ক্রীড়াচ্ছলে বয়স্যদিগের সহিত কোন দেববিশেষের পূজা করিবার সঙ্কল্প করিয়া ঠাকুর স্বহস্তে ঐ মূর্তি এমন সুন্দরভাবে গড়িলেন ও আঁকিলেন যে, লোকে দেখিয়া উহা দক্ষ কুম্ভকার বা পটুয়ার কার্য বলিয়া স্থির করিল।

যেমন—অযাচিত অতর্কিতভাবে কোন ব্যক্তিকে এমন কোন কথা বলিলেন, যাহাতে তাহার মনোগত বহুকালের সন্দেহজাল মিটিয়া যাইয়া সে তাহার ভাবী জীবন নিয়মিত করিবার বিশেষ সন্ধান ও শক্তি লাভ-পূর্বক স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিল, বালক গদাইকে আশ্রয় করিয়া তাহার আরাধ্য দেবতা কি করুণায় তাহাকে ঐরূপে পথ দেখাইলেন !

যেমন—শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা যে প্রশ্নের মীমাংসা করিতে পারিতেছেন না, বালক গদাই তাহা এক কথায় মিটাইয়া দিয়া সকলকে চমৎকৃত করিলেন।*

ঠাকুরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে ঐরূপ যে-সকল অদ্ভুত ঘটনা আমরা শুনিয়াছি, তাহার সকলগুলিই যে তাঁহার উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিয়া দিব্যশক্তিপ্রকাশের পরিচায়ক, তাহা নহে। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি ঐরূপ হইলেও অপর সকলগুলিকে আমরা সাধারণতঃ ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারি। উহাদিগের কতকগুলি তাঁহার অদ্ভুত স্মৃতির, কতকগুলি প্রবল বিচারবুদ্ধির, কতকগুলি বিশেষ নিষ্ঠা ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞার, কতকগুলি অসীম সাহসের, কতকগুলি রঙ্গরসপ্রিয়তার এবং কতকগুলি অপার প্রেম বা করুণার পরিচায়ক। পূর্বোক্ত সকল শ্রেণীর সকল ঘটনার ভিতরেই কিন্তু তাঁহার মনের অসাধারণ বিশ্বাস, পবিত্রতা ও নিঃস্বার্থতা ওতপ্রোতভাবে জড়িত রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, বিশ্বাস, পবিত্রতা ও স্বার্থ-হীনতারূপ উপাদানে তাঁহার মন যেন স্বভাবতঃ নির্মিত হইয়াছে, এবং সংসারের নানা ঘাতপ্রতিঘাত উহাতে স্মৃতি, বুদ্ধি, প্রতিজ্ঞা, সাহস,

ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল ঘটনার ছয় প্রকার শ্রেণীনির্দেশ

* 'গুরুভাব'—পূর্বার্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১০৭ পৃষ্ঠা।

রঙ্গরস, প্রেম বা করুণারূপ আকারে তরঙ্গসমূহের উদয় করিতেছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা সম্যক্‌রূপে ধারণা করিতে পারিবেন।

অদ্ভুত স্মৃতিশক্তির দৃষ্টান্ত

পল্লীতে রাম বা কৃষ্ণযাত্রা হইয়াছে, অন্যান্য লোকের সহিত বালক গদাধরও তাহা শুনিয়াছে; ঐসকল পবিত্র পুরাণকথা ও গানের বিষয় ভুলিয়া পরদিন যে যাহার স্বার্থচেষ্টায় লাগিয়াছে, কিন্তু বালক গদাইয়ের মনে উহা যে ভাবতরঙ্গ তুলিয়াছে, তাহার বিরাম নাই; বালক ঐ সকলের পুনরাবৃত্তি করিয়া আনন্দোপভোগের জন্য বয়স্যবর্গকে সমীপস্থ আম্র-কাননে একত্র করিয়াছে এবং উহাদিগের প্রত্যেককে পালার ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের ভূমিকা যথাসম্ভব আয়ত্ত করাইয়া এবং আপনি প্রধান চরিত্রের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া উহার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সরল কৃষাণ পার্শ্বের ভূমিতে চাষ দিতে দিতে বালকদিগের ঐরূপ ক্রীড়াদর্শনে মুগ্ধহৃদয়ে ভাবিতেছে—একবারমাত্র শুনিয়া পালাটির প্রায় সমগ্র কথা ও গানগুলি উহারা এরূপে আয়ত্ত করিল কিরূপে?

দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দৃষ্টান্ত

উপনয়নকালে বালক আত্মীয়স্বজন ও সমাজপ্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে ধরিয়া বসিল—কর্মকারজাতীয়া ধনী নাম্নী কামিনীকে ভিক্ষামাতাস্বরূপে বরণ করিবে![১] অথবা ধনীর স্নেহ-ভালবাসায় মুগ্ধ হইয়া এবং তাহার হৃদয়ের অভিলাষ জানিতে পারিয়া বালক সামাজিক শাসনের কথা ভুলিয়া ঐ নীচজাতীয়া রমণীর স্বহস্ত-পক্ক ব্যঞ্জনাদি কাড়িয়া খাইল! ধনীর ভীতিপ্রসূত সাগ্রহ নিষেধ বালককে ঐ কার্য হইতে বিরত করিতে পারিল না।

১ 'গুরুভাব'-পূর্বার্ধ—৪র্থ অধ্যায়, ১৪০ পৃষ্ঠা।

বিভূতিমণ্ডিত জটাধারী নাগা-ফকির দেখিলে শহর বা পল্লীগ্রামের বালকদিগের হৃদয়ে সর্বদা ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐরূপ ফকিরেরা অল্পবয়স্ক বালকদিগকে নানারূপে ভুলাইয়া অথবা সুযোগ পাইলে বল-প্রয়োগে দূরদেশে লইয়া যাইয়া দলপুষ্টি করে, এরূপ কিংবদন্তী বঙ্গের সর্বত্র প্রচলিত। কামারপুকুরের দক্ষিণপ্রান্তে ৺পুরীধামে যাইবার যে পথ আছে, সেই পথ দিয়া তখন নিত্য ঐরূপ সাধু-ফকির, বৈরাগী-বাবাজীর দল যাওয়া-আসা করিত এবং গ্রামমধ্যে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা আহার্য সংগ্রহপূর্বক দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া গন্তব্য পথে অগ্রসর হইত। কিংবদন্তীতে ভীত হইয়া বয়স্তগণ দূরে পলাইলেও বালক গদাই ভীত হইবার পাত্র ছিল না। ফকিরের দল দেখিলেই সে তাহাদিগের সহিত মিশিয়া মধুরালাপ ও সেবায় তাহাদিগকে প্রসন্ন করিয়া তাহাদের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করিবার জন্য অনেক কাল তাহাদের সঙ্গে কাটাইত। কোন কোন দিন দেবোদ্দেশে নিবেদিত তাহাদিগের অন্ন খাইয়াও বালক বাটীতে ফিরিত এবং মাতার নিকট ঐ বিষয়ে গল্প করিত। তাহাদিগের ন্যায় বেশ-ধারণের জন্য বালক একদিন সর্বাঙ্গে তিলকচিহ্ন এবং পিতামাতা-প্রদত্ত নূতন বসনখানি ছিঁড়িয়া কৌপীন ও বহির্বাসরূপে ধারণপূর্বক জননীর নিকট আগমন করিয়াছিল।

অসীম সাহসের দৃষ্টান্ত

গ্রামের নীচ জাতিদের ভিতর অনেকে রামায়ণ মহাভারত পাঠ করিতে জানিত না। ঐ সকল গ্রন্থ শুনিবার ইচ্ছা হইলে তাহারা পড়িয়া বুঝাইয়া দিতে পারে এমন কোন ব্রাহ্মণ বা স্বশ্রেণীর লোককে আহ্বান করিত এবং ঐ ব্যক্তি আগমন করিলে ভক্তিপূর্বক পদ ধৌত করিবার জল, নূতন হুঁকায় তামাকু

রঙ্গরসপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত

এবং উপবেশন করিয়া পাঠ করিবার জন্য উত্তম আসন বা তদভাবে নূতন একখানি মাদুর প্রদান করিত। ঐরূপে সম্মানিত হইয়া সে ব্যক্তি ঐকালে অহঙ্কার অভিমানে স্ফীত হইয়া শ্রোতাদের নিকটে কিরূপে উচ্চাসন গ্রহণ করিত এবং কতপ্রকার বিসদৃশ অঙ্গভঙ্গী ও স্বরে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে তাহাদিগকে আপন প্রাধান্য জ্ঞাপন করিত, তীক্ষ্ণ-বিচারসম্পন্ন রঙ্গরসপ্রিয় বালক তাহা লক্ষ্য করিত এবং সময়ে সময়ে অপরের নিকট গম্ভীরভাবে উহার অভিনয় করিয়া হাস্যকৌতুকের রোল ছুটাইয়া দিত।

ঠাকুরের বাল্যজীবনের ঐ সকল কথার আলোচনায় আমরা বুঝিতে পারি, তিনি কিরূপ মন লইয়া সাধনায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ মন যাহা ধরিবে তাহা করিবেই করিবে, যাহা শুনিবে তাহা কখনও ভুলিবে না এবং অভীষ্টলাভের পথে যাহা অন্তরায় বলিয়া বুঝিবে, সবলহস্তে তাহা তৎক্ষণাৎ দূরে নিক্ষেপ করিবে। বুঝিতে পারি যে, ঐরূপ হৃদয় ঈশ্বরের উপর, আপনার উপর এবং মানবসাধারণের অন্তর্নিহিত দেবপ্রকৃতির উপর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া সংসারের সকল কার্যে অগ্রসর হইবে, নীচ অপবিত্র ভাবসমূহ ত দূরের কথা—সঙ্কীর্ণতার স্বল্পমাত্র গন্ধও যে-সকল ভাবে অনুভূত হইবে, কখনই তাহাকে উপাদেয় বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে না, এবং পবিত্রতা, প্রেম ও করুণাই কেবল উহাকে সর্বকাল সর্ববিষয়ে নিয়মিত করিবে। ঐ সঙ্গে একথাও হৃদয়ঙ্গম হয় যে, আপনার বা অন্যের অন্তরের কোন ভাবই আপন আকার লুক্কায়িত রাখিয়া ছদ্মবেশে ঐরূপ হৃদয়-মনকে কখনও প্রতারিত করিতে পারিবে না। ঠাকুরের অন্তর সম্বন্ধে পূর্বোক্ত কথা বিশেষভাবে স্মরণ রাখিয়া

ঠাকুরের মনের স্বাভাবিক গঠন

অগ্রসর হইলে তবেই আমরা তাঁহার সাধকজীবনের অলৌকিকত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইব।

সাধকভাবের প্রথম প্রকাশ—চালকলা-বাঁধা বিদ্যা শিখিব না; যাহাতে যথার্থ জ্ঞান হয় সেই বিদ্যা শিখিব

ঠাকুরের জীবনে সাধকভাবের প্রথম বিশেষ বিকাশ আমরা দেখিতে পাই, তিনি যখন কলিকাতায় তাঁহার ভ্রাতার চতুষ্পাঠীতে—যেদিন বিদ্যাশিক্ষায় মনোযোগী হইবার জন্য অগ্রজ রামকুমারের তিরস্কার ও অনুযোগের উত্তরে তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছিলেন, "চালকলা-বাঁধা বিদ্যা আমি শিখিতে চাহি না; আমি এমন বিদ্যা শিখিতে চাহি যাহাতে জ্ঞানের উদয় হইয়া মানুষ বাস্তবিক কৃতার্থ হয়!" তাঁহার বয়স তখন সতের বৎসর হইবে এবং গ্রাম্য পাঠশালায় তাঁহার শিক্ষা অগ্রসর হইবার বিশেষ সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া অভিভাবকেরা তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া রাখিয়াছেন।

কলিকাতায় ঝামাপুকুরে রামকুমারের টোলে বাস কালে ঠাকুরের আচরণ

ঝামাপুকুরে ৺দিগম্বর মিত্রের বাটীর সমীপে জ্যোতিষ এবং স্মৃতি-শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন তাঁহার স্বধর্মনিষ্ঠ অগ্রজ টোল খুলিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেছিলেন এবং পূর্বোক্ত মিত্র পরিবার ভিন্ন পল্লীর অপর কয়েকটি বর্দ্ধিষ্ণু ঘরে নিত্য দেবসেবার ভারও গ্রহণ করিয়াছিলেন। নিত্যক্রিয়া সমাপন-পূর্বক ছাত্রগণকে পাঠদান করিতেই তাঁহার প্রায় সমস্ত সময় অতিবাহিত হইত, সুতরাং অপরের গৃহে প্রত্যহ দুই সন্ধ্যা গমনপূর্বক দেবসেবা যথারীতি সম্পন্ন করা স্বল্পকালেই তাঁহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া উঠিয়াছিল। অথচ সহসা তিনি উহা ত্যাগ করিতে পারিতেছিলেন না। কারণ, বিদায় আদায়ে টোলের যাহা উপস্বত্ব হইত, তাহা অল্প এবং দিন দিন হ্রাস

ভিন্ন উহার বৃদ্ধি হইতেছিল না ; এরূপ অবস্থায় দেবসেবার পারিশ্রমিক-স্বরূপে যাহা পাইতেছিলেন, তাহা ত্যাগ করিলে সংসার চলিবে কিরূপে ? পরিশেষে নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে আনাইয়া তাহার উপর উক্ত দেবসেবার ভার অর্পণপূর্বক তিনি অধ্যাপনাতে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

গদাধর এখানে আসিয়া অবধি নিজ মনোমত কর্ম পাইয়া উহা সানন্দে সমাপনপূর্বক অগ্রজের সেবা ও তাঁহার নিকটে কিছু কিছু পাঠাভ্যাস করিতেন। গুণসম্পন্ন প্রিয়দর্শন বালক অল্পকালেই যজমান-পরিবারবর্গের সকলের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও ঐ সকল সম্ভ্রান্ত পরিবারের রমণীগণ তাঁহার কর্মদক্ষতা, সরল ব্যবহার, মিষ্টালাপ ও দেবভক্তিদর্শনে তাঁহার নিকট নিঃসঙ্কোচে আগমন করিতেন এবং তাঁহার দ্বারা ছোট খাট 'ফাইফরমাশ' করাইয়া লইতে এবং তাঁহার মধুর কণ্ঠে ভজন শুনিতে আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। এইরূপে কামারপুকুরের ন্যায় এখানেও বালকের একটি আপনার দল বিনা চেষ্টায় গঠিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং বালকও অবসর পাইলেই ঐ সকল স্ত্রীপুরুষ-দিগের সহিত মিলিত হইয়া আনন্দে দিন কাটাইতেছিলেন। সুতরাং, এখানে আসিয়াও বালকের বিদ্যাশিক্ষার যে বড় একটা সুবিধা হইতেছিল না, একথা বুঝিতে পারা যায়।

পূর্বোক্ত বিষয় লক্ষ্য করিয়াও রামকুমার ভ্রাতাকে সহসা কিছু বলিতে পারেন নাই। কারণ, একে ত মাতার প্রিয় কনিষ্ঠকে তাঁহার স্নেহসুখে বঞ্চিত করিয়া একপ্রকার নিজের সুবিধার জন্যই দূরে আনিয়াছেন, তাহার উপর ভ্রাতার গুণে আকৃষ্ট হইয়া লোকে তাহাকে আগ্রহপূর্বক বাটীতে আহ্বান ও নিমন্ত্রণাদি করিতেছে, এই অবস্থায় যাইতে নিষেধ করিয়া বালকের আনন্দে বিঘ্নোৎপাদন করা কি যুক্তিযুক্ত ?

ঐরূপ করিলে বালকের কলিকাতাবাস কি বনবাসতুল্য অসহ্য হইয়া উঠিবে না? সংসারে অভাব না থাকিলে বালককে মাতার নিকট হইতে দূরে আনিবার কোনই প্রয়োজন ছিল না; কামারপুকুরের নিকটবর্ত্তী গ্রামান্তরে কোন মহোপাধ্যায়ের নিকটে পড়িতে পাঠাইলেই ত চলিত। বালক তাহাতে মাতার নিকটে থাকিয়াই বিদ্যাভ্যাস করিতে পারিত। ঐরূপ চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া রামকুমার কয়েক মাস কোন কথা না বলিলেও পরিশেষে কর্ত্তব্যজ্ঞানের প্রেরণায় একদিন বালককে পাঠে মনোযোগী হইবার জন্য মৃদু তিরস্কার করিলেন। কারণ সরল, সর্বদা আত্মহারা বালককে পরে ত সংসারে প্রবিষ্ট হইতে হইবে? এখন হইতে যদি সে আপনার সাংসারিক অবস্থার যাহাতে উন্নতি হয়, এমন পথে আপনাকে নিয়মিত করিয়া চলিতে না শিখে, তবে ভবিষ্যতে কি আর ঐরূপ করিতে পারিবে? অতএব ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং সংসারের অভিজ্ঞতা, উভয়ই রামকুমারকে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল।

নিজ ভ্রাতার মানসিক প্রকৃতি সম্বন্ধে রামকুমারের অনভিজ্ঞতা

কিন্তু স্নেহপরবশ রামকুমার সংসারের স্বার্থপর কঠোর প্রথায় ঠেকিয়া শিখিয়া কতকটা অভিজ্ঞতা লাভ করিলেও নিজ কনিষ্ঠের অদ্ভুত মানসিক গঠন সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন না। বালক যে এই অল্প বয়সেই সংসারী মানবের সর্ববিধ চেষ্টার এবং আজীবন পরিশ্রমের কারণ ধরিতে পারিয়াছে এবং দুই দিনের প্রতিষ্ঠা ও ভোগসুখলাভকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া মানবজীবনের অন্য উদ্দেশ্য নির্দ্ধারিত করিয়াছে, একথা তিনি স্বপ্নেও হৃদয়ে আনয়ন করিতে পারেন নাই। সুতরাং, তিরস্কারে বিচলিত না হইয়া সরল বালক যখন তাঁহাকে প্রাণের কথা পূর্বোক্তরূপে খুলিয়া বলিল, তখন তিনি বালকের কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে

পারিলেন না। ভাবিলেন, মাতাপিতার বহু আদরের বালক জীবনে এই প্রথম তিরস্কৃত হইয়া অভিমান বা বিরক্তিতে এরূপ উত্তর প্রদান করিতেছে। সত্যনিষ্ঠ বালক তাঁহাকে আপন অন্তরের কথা বুঝাইতে সেদিন অনেক চেষ্টা পাইল, অর্থকরী বিদ্যা শিখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইতেছে না, একথা নানাভাবে প্রকাশ করিল, কিন্তু বালকের সে কথা শুনে কে? বালক ত বালক, বয়োবৃদ্ধ কাহাকেও যদি কোন দিন আমরা স্বার্থচেষ্টায় পরাঙ্মুখ দেখি, তবে সিদ্ধান্ত করিয়া বসি—তাহার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে।

বালকের ঐ সকল কথা রামকুমার সেদিন বুঝিলেন না। অধিকন্তু ভালবাসার পাত্রকে তিরস্কার করিয়া পরক্ষণে আমরা যেমন অনুতপ্ত হই এবং তাহাকে পূর্বাপেক্ষা শতগুণে আদরযত্ন করিয়া স্বয়ং শান্তিলাভ করিতে চেষ্টা করি, কনিষ্ঠের প্রতি তাঁহার প্রতিকার্যে ব্যবহার এখন কিছুকাল ঐরূপ হইয়া উঠিল। বালক গদাধর কিন্তু নিজ মনোগত অভিপ্রায় সফল করিবার জন্য এখন হইতে যে অবসর অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, এ বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার পর পর কায দেখিয়া বিশেষরূপে পাইয়া থাকি।

পূর্বোক্ত ঘটনার পরের দুই বৎসরে ঠাকুর এবং তাঁহার অগ্রজের জীবনে পরিবর্তনের প্রবাহ কিছু প্রবলভাবে চলিয়াছিল। অগ্রজের আর্থিক অবস্থা দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল এবং নানাভাবে চেষ্টা করিলেও তিনি কিছুতেই ঐ বিষয়ের উন্নতিসাধন করিতে পারিতেছিলেন না।

রামকুমারের সাংসারিক অবস্থা

টোল বন্ধ করিয়া অপর কোন কায স্বীকার করিবেন কি না, তদ্বিষয়ে নানা তোলাপাড়াও তাঁহার মনোমধ্যে চলিতেছিল। কিন্তু কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না। তবে একথা মনে মনে বেশ বুঝিতেছিলেন যে,

সাংসারযাত্রানির্বাহের অন্য উপায় শীঘ্র গ্রহণ না করিয়া এরূপে দিন কাটাইলে পরিশেষে ঋণগ্রস্ত হইয়া নানা অনর্থ উপস্থিত হইবে। কিন্তু কি উপায় অবলম্বন করিবেন? যজন, যাজন ও অধ্যাপন ভিন্ন অন্য কোন কার্যই ত শিখেন নাই, এবং চেষ্টা করিয়া এখন যে সময়োপযোগী কোন অর্থকরী বিদ্যা শিখিবেন, সে উদ্যম উৎসাহই বা প্রাণে কোথায়? আবার, ঐরূপ শিক্ষালাভ করিয়া অর্থোপার্জনের পথে অগ্রসর হইলে নিজ নিত্যক্রিয়া ও পূজাদি সম্পন্ন করিবার অবসরলাভ যে কঠিন হইবে, ইহাও নিশ্চয়। সামান্যে সন্তুষ্ট সাধুপ্রকৃতি রামকুমার বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষ উদ্যমী পুরুষ ছিলেন না। সুতরাং 'যাহা করেন ৺রঘুবীর' ভাবিয়া পূর্বোক্ত চিন্তা হইতে মনকে ফিরাইয়া যাহা এতকাল করিয়া আসিয়াছেন, তাহাই ভগ্নহৃদয়ে করিয়া যাইতেছিলেন। সে যাহা হউক, ঐরূপ অনিশ্চয়তার মধ্যে একটি ঘটনা ঈশ্বরেচ্ছায় রামকুমারকে পথ দেখাইয়া শীঘ্রই নিশ্চিন্ত করিয়াছিল।

চতুর্থ অধ্যায়

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী

সন ১২৫৬ সালে রামকুমার যখন কলিকাতায় চতুষ্পাঠী খুলিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম সম্ভবতঃ ৪৫ বৎসর ছিল। সংসারের অভাব অনটন ঐ কালের কিছু পূর্ব হইতে তাঁহাকে চিন্তিত করিয়াছিল এবং তাঁহার পত্নী একমাত্র পুত্র অক্ষয়কে প্রসবান্তে তখন মৃত্যুমুখে পতিতা হইয়াছিলেন। কথিত আছে, সাধক রামকুমার তাঁহার পত্নীর মৃত্যুর কথা পূর্ব হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন এবং পরিবারস্থ কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন, "ও (তাঁহার পত্নী) এবার আর বাঁচিবে না।" ঠাকুর তখন চতুর্দশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। সমৃদ্ধিশালী কলিকাতায় নানা ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের বাস; শান্তিস্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়া-কলাপে, বিবিধ ব্যবস্থাপত্রদানে এবং টোলের ছাত্রদিগকে বিদ্যালাভে পারদর্শী করিয়া সেখানে সুপণ্ডিত বলিয়া একবার খ্যাতিলাভ করিতে পারিলে সংসারের আয়ব্যয়ের জন্য তাঁহাকে আর চিন্তান্বিত হইতে হইবে না—বোধ হয় এইরূপ একটা কিছু ভাবিয়া রামকুমার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। পত্নী-বিয়োগে তিনি জীবনে যে বিশেষ পরিবর্তন ও অভাব অনুভব করিতেছিলেন, বিদেশে নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিলে তাহার হস্ত হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তিলাভ করিবেন, এই ধারণাও তাঁহাকে ঐ কার্যে প্রবৃত্ত করাইয়াছিল।

রামকুমারের কলিকাতায় টোল খুলিবার কারণ ও সময়নিরূপণ

যাহা হউক, ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী প্রতিষ্ঠিত হইবার আন্দাজ তিন-চারি বৎসর পরে তিনি ঠাকুরকে যেজন্য কলিকাতায় আনয়ন করিয়াছিলেন এবং ১২৫৯ সালে কলিকাতায় আসিয়া ঠাকুর যেভাবে তিন বৎসরকাল অতিবাহিত করেন, তাহা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী জানিতে হইলে অতঃপর আমাদিগকে অন্যত্র দৃষ্টি করিতে হইবে। বিদায় আদায়ের সুবিধার জন্য ছাতুবাবুর দলভুক্ত হইয়া তাঁহার অগ্রজ যখন নিজ চতুষ্পাঠীর শ্রীবৃদ্ধি-সাধনে যত্নপর ছিলেন, তখন কলিকাতার অন্যত্র একস্থলে এক সুবিখ্যাত পরিবারমধ্যে ঈশ্বরেচ্ছায় যে ঘটনাপরম্পরার উদয় হইতেছিল, তাহাতেই এখন পাঠককে মনোনিবেশ করিতে হইবে।

রাণী রাসমণি

কলিকাতার দক্ষিণাংশে জানবাজার নামক পল্লীতে প্রথিতকীর্তি রাণী রাসমণির বাস ছিল। ক্রমশঃ চারিটি কন্যার মাতা হইয়া রাণী চুয়াল্লিশ বৎসর বয়সে বিধবা হইয়াছিলেন; এবং তদবধি স্বামী ৺রাজচন্দ্র দাসের প্রভূত সম্পত্তির তত্ত্বাবধানে স্বয়ং নিযুক্তা থাকিয়া উহার সমধিক শ্রীবৃদ্ধিসাধনপূর্বক তিনি স্বল্পকাল মধ্যেই কলিকাতাবাসিগণের নিকটে সুপরিচিতা হইয়া উঠিয়াছিলেন। কেবলমাত্র বিষয়কর্মের পরিচালনায় দক্ষতা দেখাইয়া তিনি যশস্বিনী হয়েন নাই, কিন্তু তাঁহার ঈশ্বরবিশ্বাস, ওজস্বিতা* এবং

* শুনা যায়, রাণী রাসমণির জানবাজারের বাটীর নিকট পূর্বে ইংরাজ সৈনিকদিগের একটি ব্যারাক বা আড্ডা তখন প্রতিষ্ঠিত ছিল। মদ্যপানে উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকেরা একদিন রাণীর দ্বাররক্ষকদিগকে বলপ্রয়োগে বশীভূত করিয়া বাটীমধ্যে প্রবেশ ও লুটপাট করিতে আরম্ভ করে। রাণীর জামাতা মথুরবাবুপ্রমুখ পুরুষেরা তখন কার্যান্তরে বাহিরে গিয়াছিলেন। সৈনিকেরা বাধা না পাইয়া ক্রমে অন্দরে প্রবেশ করিতে উদ্যত দেখিয়া রাণী স্বয়ং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিতা হইয়া তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

দরিদ্রদিগের প্রতি নিরন্তর সহানুভূতি*, তাঁহার অজস্র দান, অকাতর অন্নব্যয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানসমূহ তাঁহাকে সকলের বিশেষ প্রিয় করিয়া

* কথিত আছে, গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার জন্য ধীবরদিগের উপর ইংরাজ রাজসরকার একবার কর বসাইয়াছিলেন। ঐ ধীবরদিগের অনেকে রাণীর জমিদারিতে বাস করিত। করের দায়ে উৎপীড়িত হইয়া তাহারা রাণীর নিকট আপনাদের দুঃখ-কষ্টের কথা নিবেদন করে। রাণী শুনিয়া তাহাদিগকে অভয় দিলেন এবং বহু অর্থ দিয়া সরকার বাহাদুরের নিকট হইতে গঙ্গায় মৎস্য ধরিবার ইজারা লইলেন। সরকার বাহাদুর রাণী মৎস্য ব্যবসায় করিবেন ভাবিয়া উক্ত অধিকার প্রদান করিবামাত্র গঙ্গার কয়েক স্থল এক কূল হইতে অন্য কূল পর্যন্ত রাণী এমন শৃঙ্খলিত করিলেন যে, ইংরাজদের জলযানসমূহের নদীমধ্যে প্রবেশপথ প্রায় রুদ্ধ হইয়া যাইল। তাঁহারা তখন রাণীর ঐ কার্যের প্রতিবাদ করিলে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি অনেক অর্থব্যয়ে নদীতে মৎস্য ধরিবার অধিকার আপনাদের নিকট হইতে ক্রয় করিয়াছি, সেই অধিকার-বলেই ঐরূপ করিয়াছি। ঐরূপ করিবার কারণ, নদীমধ্য দিয়া জলযানাদি নিরন্তর গমনাগমন করিলে মৎস্যসকল অন্যত্র পলায়ন করিবে এবং আমার সমূহ ক্ষতি হইবে; অতএব নদীগর্ভ শৃঙ্খলমুক্ত কেমন করিয়া করিব? তবে যদি আপনারা নদীতে মৎস্য ধরিবার নূতন কর উঠাইয়া দিতে রাজী হন, তবে আমিও আমার অধিকারস্বত্ব স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিতে স্বীকৃতা আছি। নতুবা ঐ বিষয় লইয়া মকদ্দমা উপস্থিত হইবে এবং সরকার বাহাদুরকে আমার ক্ষতিপূরণে বাধ্য হইতে হইবে।" শুনা যায়, রাণীর ঐরূপ যুক্তিযুক্ত কথায় এবং গরীব ধীবরদিগকে রক্ষা করিবার জন্যই রাণী ঐরূপ করিতেছেন, একথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া সরকার বাহাদুর ঐ কর অল্প দিন বাদেই উঠাইয়া দেন এবং ধীবরেরা পূর্বের ন্যায় বিনা করে যথা ইচ্ছা মৎস্য ধরিয়া রাণীকে আশীর্বাদ করিতে থাকে।

লোকহিতকর কার্যে রাণী রাসমণির উৎসাহ সর্বদা পরিলক্ষিত হইত। "সোনাই, বেলেঘাটা ও ভবানীপুরে বাজার; কালীঘাটে ঘাট ও মুমূর্ষু-নিবাস; হালিসহরে জাহ্নবীতীরে ঘাট ও সুবর্ণরেখার অপর তীর হইতে কিছুদূর পর্যন্ত শ্রীক্ষেত্রের রাস্তা প্রভৃতিতে তাহার

তুলিয়াছিল। বাস্তবিক নিজ গুণ ও কর্মে এই রমণী তখন আপন 'রাণী' নাম সার্থক করিতে এবং ব্রাহ্মণেতরনির্বিশেষে সকল জাতির হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভক্তি সর্বপ্রকারে আকর্ষণে সক্ষম হইয়াছিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখন রাণীর কন্যাগণের বিবাহ ও সন্তানসন্ততি হইয়াছে; এবং একটিমাত্র পুত্র রাখিয়া রাণীর তৃতীয়া কন্যার মৃত্যু হওয়ায় প্রিয়দর্শন তৃতীয় জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বা মথুরানাথ বিশ্বাস ঐ ঘটনায় পর হইয়া যাইবেন ভাবিয়া, রাণী তাঁহার চতুর্থ কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর বিবাহ উক্ত জামাতারই সহিত সম্পন্ন করিয়া তাঁহার ছিন্নহৃদয় পুনরায় স্নেহপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। রাণীর ঐ চারি কন্যার সন্তানসন্ততিগণ এখনও বর্তমান।*

রাণীর দেবীভক্তি

অশেষগুণশালিনী রাণী রাসমণির শ্রীশ্রীকালিকার শ্রীপাদপদ্মে চিরকাল বিশেষ ভক্তি ছিল। জমিদারী সেরেস্তার কাগজপত্রে নামাঙ্কিত করিবার জন্য তিনি যে শীলমোহর নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহাতে ক্ষোদিত ছিল—'কালীপদ অভিলাষী শ্রীমতী রাসমণি দাসী'। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, তেজস্বিনী রাণীর দেবীভক্তি ঐরূপে সকল বিষয়ে প্রকাশ পাইত।

পরিচয় পাওয়া যায়। গঙ্গাসাগর, ত্রিবেণী, নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ ও পুরীতে তীর্থযাত্রা করিয়া রাসমণি দেবোদ্দেশে প্রচুর অর্থব্যয় করেন।" তদ্ভিন্ন মকিমপুর জমিদারির প্রজাগণকে নীলকরের অত্যাচার হইতে রক্ষা করা এবং দশসহস্র মুদ্রা ব্যয়ে টোনায় খাল খনন করাইয়া মধুমতীর সহিত নবগঙ্গার সংযোগবিধান করা প্রভৃতি নানা সৎকার্য রাণী রাসমণির দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

* পাঠকের অবগতির জন্য রাণী রাসমণির বংশতালিকা 'শ্রীদক্ষিণেশ্বর' নামক পুস্তিকা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি—

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী

রাণী রাসমণির ৺কাশী যাইবার উদ্যোগকালে প্রত্যাদেশলাভ

৺কাশীধামে গমনপূর্বক শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণামাতাকে দর্শন ও বিশেষভাবে পূজা করিবার বাসনা রাণীর হৃদয়ে বহুকাল হইতে বলবতী ছিল। শুনা যায়, প্রভূত অর্থ তিনি ঐজন্য সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছিলেন; কিন্তু স্বামীর সহসা মৃত্যু হইয়া সমগ্র বিষয়ের তত্ত্বাবধান নিজ স্কন্ধে পতিত হওয়ায় এতদিন ঐ বাসনা ফলবতী করিতে পারেন নাই। এখন জামাতৃগণ, বিশেষতঃ তাঁহার কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে শিক্ষালাভ করিয়া তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠায় রাণী ১২৫৫ সালে কাশী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সকল বিষয় স্থির হইলে যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্ব রাত্রে তিনি স্বপ্নে ৺দেবীর দর্শনলাভ এবং প্রত্যাদেশ পাইলেন—কাশী যাইবার আবশ্যক নাই, ভাগীরথীতীরে মনোরম প্রদেশে আমার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা
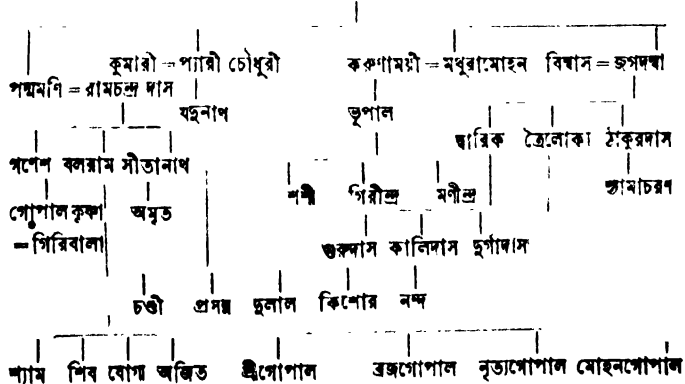
কর, আমি ঐ মূর্ত্যাশ্রয়ে আবির্ভূতা হইয়া তোমার নিকট হইতে নিত্য পূজা গ্রহণ করিব।* ভক্তিপরায়ণা রাণী ঐরূপ আদেশলাভে বিশেষ পরিতৃপ্তা হইলেন এবং কাশীযাত্রা স্থগিত রাখিয়া সঞ্চিত ধনরাশি ঐ কার্যে নিয়োজিত করিতে সংকল্প করিলেন।

রাণীর দেবীমন্দির-নির্মাণ

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি রাণীর বহুকালসঞ্চিত ভক্তি এই সময়ে সাকার মূর্তিপরিগ্রহে উন্মুখ হইয়া উঠিয়াছিল এবং ভাগীরথীতীরে বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড † ক্রয় করিয়া তিনি বহু অর্থব্যয়ে তদুপরি নবরত্ন-পরিশোভিত সুবৃহৎ মন্দির, দেবারাম ও তৎসংলগ্ন উদ্যান নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এখন হইতে আরব্ধ হইয়া ১২৬২ সালেও উক্ত দেবালয় সম্যক্ নির্মিত হইয়া উঠে নাই দেখিয়া রাণী ভাবিয়াছিলেন, জীবন অনিশ্চিত, মন্দির-নির্মাণে বহুকাল ব্যয় করিলে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রতিষ্ঠা করিবার সংকল্প হয়ত নিজ জীবনকালে কার্যে পরিণত হইয়া উঠিবে না। ঐরূপ আলোচনা করিয়া সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ তারিখে স্নানযাত্রার দিনে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠাকার্য সম্পন্ন করিয়াছিলেন। উহার পূর্বের কয়েকটি কথা পাঠকের জানা আবশ্যক।

* কেহ কেহ বলেন, যাত্রা করিয়া রাণী কলিকাতার উত্তরে দক্ষিণেশ্বর গ্রাম পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নৌকার উপর রাত্রিবাস করিবার কালে ঐ প্রকার প্রত্যাদেশ লাভ করেন।

† কালীবাটীর জমির পরিমাণ ৬০ বিঘা, দেবোত্তর-দানপত্রে লেখা আছে। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসের ৬ই তারিখে উক্ত জমি কলিকাতার সুপ্রিম কোর্টের এটর্নী হেষ্টি নামক জনৈক ইংরেজের নিকট হইতে ক্রয় করা হয়। অতএব মন্দিরাদি নির্মাণ করিতে প্রায় দশ বৎসর লাগিয়াছিল।

প্রত্যাদেশ পাইয়াই হউক বা হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাসেই হউক—কারণ, ভক্তেরা নিজ ইষ্টদেবতাকে সর্বদা আত্মবৎ সেবা করিতে ভালবাসেন—শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নভোগ দিবার জন্য রাণীর প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। রাণী ভাবিয়াছিলেন—মন্দিরাদি মনের মত নির্মিত হইয়াছে, সেবা চলিবার জন্য সম্পত্তিও যথেষ্ট দিতেছি, কিন্তু এতটা করিয়াও যদি শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রাণ যেমন চাহে, নিত্য অন্নভোগ না দিতে পারি, তবে সকলই বৃথা। লোকে বলিবে, রাণী রাসমণি এত বড় কীর্তি রাখিয়া গিয়াছে, কিন্তু লোকের ঐরূপ কথায় কি আসে যায়? হে জগদম্বে, অন্তঃসারহীন নামযশমাত্র দিয়া আমাকে এ বিষয়ে ফিরাইও না। তুমি এখানে নিত্য প্রকাশিতা থাক এবং কৃপা করিয়া দাসীর প্রাণের কামনা পূর্ণ কর।

রাণীর ৺দেবীর অন্নভোগ দিবার বাসনা

রাণী দেখিলেন, দেবীকে অন্নভোগ প্রদান করিবার পথে প্রধান অন্তরায় তাঁহার জাতি ও সামাজিক প্রথা। নতুবা তাঁহার প্রাণ ত একবারও বলে না যে, অন্নভোগ দিলে জগন্মাতা উহা গ্রহণ করিবেন না—হৃদয় ত ঐ চিন্তায় উৎফুল্ল ভিন্ন কখন সঙ্কুচিত হয় না! তবে এই বিপরীত প্রথার প্রচলন হইয়াছে কেন? শাস্ত্রকার কি প্রাণহীন ব্যক্তি ছিলেন? অথবা, স্বার্থপ্রেরিত হইয়া ঈশ্বরীর নিকটেও উচ্চবর্ণের উচ্চাধিকার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন? প্রাণের পবিত্রাকাঙ্ক্ষার অনুসরণপূর্বক প্রচলিত প্রথার বিরুদ্ধে কার্য করিলেও ভক্ত ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা দেবালয়ে উপস্থিত হইয়া প্রসাদ গ্রহণ করিবেন না—তবে উপায়? তিনি অন্নভোগপ্রদানের নিমিত্ত নানাস্থান হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতদিগের

পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থা-গ্রহণে ঐ বাসনা-পূরণের অন্তরায়

ব্যবস্থাসকল আনাইতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই তাঁহাকে ঐ বিষয়ে উৎসাহিত করিলেন না।

ঐরূপে মন্দিরনির্মাণ ও মূর্তিগঠন সম্পূর্ণ হইলেও রাণীর পূর্বোক্ত সঙ্কল্প পূর্ণ হইবার কোন উপায় দেখা যাইল না। পণ্ডিতগণের নিকট বারংবার প্রত্যাখ্যাতা হইয়া তাঁহার আশা যখন ঐ বিষয়ে প্রায় নির্মূলিতা হইয়াছিল, তখন ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠী হইতে এক দিবস ব্যবস্থা আসিল—প্রতিষ্ঠার পূর্বে রাণী যদি উক্ত সম্পত্তি কোন ব্রাহ্মণকে দান করেন এবং সেই ব্রাহ্মণ ঐ মন্দিরে দেবীপ্রতিষ্ঠা করিয়া অন্নভোগের ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে শাস্ত্রনিয়ম যথাযথ রক্ষিত হইবে এবং ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ উক্ত দেবালয়ে প্রসাদগ্রহণ করিলেও দোষভাগী হইবেন না।

রামকুমারের ব্যবস্থাদান

ঐরূপ ব্যবস্থা পাইয়া রাণীর হৃদয়ে আশা আবার মুকুলিতা হইয়া উঠিল। তিনি নিজ গুরুর নামে দেবালয় প্রতিষ্ঠাপূর্বক তাঁহার অনুমতি-ক্রমে ঐ দেবসেবার তত্ত্বাবধায়ক কর্মচারীর পদবী গ্রহণ করিয়া থাকিতে সঙ্কল্প করিলেন। রামকুমার ভট্টাচার্যের ব্যবস্থানুযায়ী কার্য করিতে তাঁহাকে দৃঢ়সঙ্কল্প জানিতে পারিয়া অপরাপর পণ্ডিতগণ 'কার্যটি সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধ', 'ঐরূপ করিলেও ব্রাহ্মণ সজ্জনেরা ঐস্থানে প্রসাদাদি গ্রহণ করিবেন না' ইত্যাদি নানা কথা পরোক্ষে বলিলেও উহা যে শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরণ হইবে, একথা বলিতে সাহসী হইলেন না।

মন্দিরোৎসর্গ সম্বন্ধে রাণীর সঙ্কল্প

ভট্টাচার্য রামকুমারের প্রতি রাণীর দৃষ্টি যে উক্ত ঘটনায় বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। ভাবিয়া দেখিলে তখনকার কালে রামকুমারের ঐরূপ ব্যবস্থাদান সামান্য

উদারতার পরিচায়ক বলিয়া বোধ হয় না। সমাজের নেতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণের মন তখন সঙ্কীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল, উহার বাহিরে যাইয়া শাস্ত্রশাসনের ভিতর একটা উদার ভাব দেখিতে এবং অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা-প্রদান করিতে তাঁহাদের ভিতর বিরল ব্যক্তিই সক্ষম হইতেন ; ফলে অনেকস্থলে তাঁহাদিগের ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিতে লোকের মনে প্রবৃত্তির উদয় হইত।

রামকুমারের উদারতা

সে যাহা হউক, রামকুমারের সহিত রাণীর সম্বন্ধ ঐখানেই সমাপ্ত হইল না। বুদ্ধিমতী রাণী নিজ গুরুবংশীয়গণকে যথাযথ সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহাদিগের শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্য এবং শাস্ত্রমত দেবসেবা সম্পন্ন করিবার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। সেজন্য তাঁহাদের ন্যায্য বিদায় আদায় অক্ষুণ্ণ রাখিয়া নূতন দেবালয়ের কার্যভার যাহাতে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী ব্রাহ্মণগণের হস্তে অর্পিত হয়, তদ্বিষয়ের বন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন। এখানেও আবার প্রচলিত সামাজিক প্রথা তাঁহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইল। শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত দেবদেবীর পূজা করা দূরে যাউক, সদ্বংশজাত ব্রাহ্মণগণ ঐকালে প্রণাম পর্যন্ত করিয়া ঐসকল মূর্তির মর্যাদা রক্ষা করিতেন না এবং রাণীর গুরুবংশীয়গণের ন্যায় ব্রহ্মবন্ধুদিগকে তাঁহারা শূদ্রমধ্যেই পরিগণিত করিতেন। সুতরাং যজনযাজনক্ষম সদাচারী কোন ব্রাহ্মণই রাণীর দেবালয়ে পূজকপদে ব্রতী হইতে সহসা স্বীকৃত হইলেন না। উহাতেও কিন্তু হতাশ না হইয়া রাণী বেতন ও পারিতোষিকের হার বৃদ্ধিপূর্বক পূজকের জন্য নানাস্থানে সন্ধান করিতে লাগিলেন।

রাণী রাসমণির উপযুক্ত পূজকের অন্বেষণ

ঠাকুরের ভগিনী শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর বাটী কামারপুকুরের অনতিদূরে সিহড় নামক গ্রামে ছিল। তথায় অনেক ব্রাহ্মণের বসতি। মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়* নামক গ্রামের এক ব্যক্তি তখন রাণীর সরকারে কর্ম করিতেন। দুপয়সা লাভ হইতে পারে ভাবিয়া ইনিই এখন রাণীর দেবালয়ের জন্য পূজক, পাচক প্রভৃতি সকলপ্রকার ব্রাহ্মণ কর্মচারী যোগাড় করিয়া দিবার ভার লইতে অগ্রসর হইলেন। রাণীর দেবালয়ে চাকরি স্বীকার করাটা দূষণীয় নহে, ইহা গ্রামস্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণগণকে বুঝাইবার জন্য মহেশ উক্ত বন্দোবস্তের ভার গ্রহণপূর্বক সর্বাগ্রে নিজ অগ্রজ ক্ষেত্রনাথকে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজকপদে মনোনীত করিলেন। ঐরূপে নিজ পরিবারস্থ এক ব্যক্তিকে রাণীর কার্যে নিযুক্ত করায় অন্যান্য ব্রাহ্মণ কর্মচারিসকলের যোগাড় করা তাঁহার পক্ষে অনেকটা সহজ হইয়াছিল। কিন্তু নানা প্রযত্নেও তিনি শ্রীশ্রীকালিকাদেবীর মন্দিরের জন্য সুযোগ্য পূজক যোগাড় করিতে না পারিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলেন।

রাণীর কর্মচারী সিহড় গ্রামের মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পূজক দিবার ভারগ্রহণ

রামকুমার ভট্টাচার্যের সহিত মহেশ পূর্ব হইতেই পরিচিত ছিলেন। গ্রামসম্পর্কে তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে একটা সুবাদও পাতান ছিল বলিয়া বোধ হয়। রামকুমার যে একজন ভক্তিমান সাধক এবং স্বেচ্ছায় শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াছেন, একথা মহেশের অবিদিত ছিল না। তাঁহার সাংসারিক অভাব অনটনের কথাও

রাণীর রামকুমারকে পূজকের পদগ্রহণে অনুরোধ

* কেহ কেহ বলেন, এই বংশীয়েরা কোন সময়ে 'মজুমদার' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

মহেশ কিছু কিছু জানিতেন। সেজন্ত শ্রীশ্রীকালিকামাতার পূজক নির্বাচন করিতে যাইয়া তাঁহার দৃষ্টি এখন রামকুমারের প্রতি আকৃষ্ট হইল। কিন্তু পরক্ষণেই তাঁহার মনে হইল—অশূদ্রযাজী রামকুমার কলিকাতায় আসিয়া ৺দিগম্বর মিত্র প্রভৃতি দুই একজনের বাটীতে পূজক পদ কখন কখন গ্রহণ করিলেও কৈবর্তজাতীয়া রাণীর দেবালয়ে কি ঐরূপ করিতে স্বীকৃত হইবেন ?—বিশেষ সন্দেহ! যাহা হউক, ৺দেবীপ্রতিষ্ঠার দিন সন্নিকট, সুযোগ্য লোকও পাওয়া যাইতেছে না, অতএব সকল দিক ভাবিয়া মহেশ একবার ঐ বিষয়ে চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিলেন। কিন্তু স্বয়ং ঐ বিষয়ে সহসা অগ্রসর না হইয়া রাণীর নিকট সকল কথা বলিয়া প্রতিষ্ঠার দিনে অন্ততঃ রামকুমার যাহাতে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া সকল কার্য সুসম্পন্ন করেন, তজ্জন্য অনুরোধ ও নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইতে বলিলেন। রামকুমারের নিকট হইতে পূর্বোক্ত ব্যবস্থাপত্র পাইয়া রাণী তাঁহার যোগ্যতার বিষয়ে পূর্বেই উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার পূজকপদে ব্রতী হইবার সম্ভাবনা দেখিয়া তিনি এখন বিশেষ আনন্দিতা হইলেন এবং অতি দীনভাবে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন, "শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রতিষ্ঠা করিতে আপনার ব্যবস্থাবলেই আমি অগ্রসর হইয়াছি এবং আগামী স্নানযাত্রার দিনে শুভমুহূর্তে ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার জন্য সমুদয় আয়োজনও করিয়াছি। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর জন্য পূজক পাওয়া গিয়াছে কিন্তু কোন সুযোগ্য ব্রাহ্মণই শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজকপদগ্রহণে সম্মত হইয়া আমাকে প্রতিষ্ঠাকার্যে সহায়তা করিতে অগ্রসর হইতেছেন না। অতএব আপনিই এ বিষয়ে যাহা হয় একটা শীঘ্র ব্যবস্থা করিয়া আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন। আপনি সুপণ্ডিত এবং শাস্ত্রজ্ঞ, অতএব ঐ পূজকের পদে যাহাকে তাহাকে নিযুক্ত করা চলে না, একথা বলা বাহুল্য।"

রাণীর ঐ প্রকার অনুরোধপত্র লইয়া মহেশ রামকুমারের নিকট স্বয়ং উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে নানারূপে বুঝাইয়া সুযোগ্য পূজক না পাওয়া পর্যন্ত পূজকের আসনগ্রহণে স্বীকৃত করাইলেন। ঐরূপে লোভ-পরিশূন্য ভক্তিমান রামকুমার নির্দিষ্ট দিনে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা বন্ধ হইবার আশঙ্কাতেই প্রথম দক্ষিণেশ্বরে* আগমন করেন এবং পরে রাণী ও মথুরবাবুর অনুনয় বিনয়ে সুযোগ্য পূজকের অভাব দেখিয়া ঐ স্থানে যাবজ্জীবন থাকিয়া যান। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছাতেই সংসারে ছোট বড় সকল কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে; দেবীভক্ত রামকুমার ঐ বিষয়ে ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা জানিতে পারিয়া ঐ কার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন কি-না কে বলিতে পারে।

* দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে শ্রীযুক্ত রামকুমারের প্রথমাগমন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা ঠাকুরের অনুগত ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রামের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছি। ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল ভট্টাচার্য কিন্তু ঐ সম্বন্ধে অন্য কথা বলেন। তিনি বলেন—কামারপুকুরের নিকটবর্তী দেশড়া নামক গ্রামের রামধন ঘোষ রাণী রাসমণির কর্মচারী ছিলেন। কার্যদক্ষতায় ইনি রাণীর সুনয়নে পড়িয়া ক্রমে তাঁহার দেওয়ান পর্যন্ত হইয়াছিলেন। কালীবাটী প্রতিষ্ঠার সময় ইনি শ্রীযুক্ত রামকুমারের সহিত পরিচয় থাকায় বিদায় লইতে আসিবার জন্য তাঁহাকে নিমন্ত্রণ-পত্র দেন। রামকুমার তাহাতে রাণীর জানবাজারস্থ ভবনে উপস্থিত হইয়া রামধনকে বলেন, "রাণী কৈবর্তজাতীয়া, আমরা তাঁহার নিমন্ত্রণ ও দান গ্রহণ করিলে 'একঘরে' হইতে হইবে।" রামধন তাহাতে তাঁহাকে খাতা দেখাইয়া বলেন, "কেন? এই দেখ, কত ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে, তাহারা সকলে যাইবে ও রাণীর বিদায় গ্রহণ করিবে।" রামকুমার তাহাতে বিদায়গ্রহণে স্বীকৃত হইয়া কালীবাটী প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে ঠাকুরের সহিত দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হন। প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে যাত্রা, কালীকীর্তন, ভাগবতপাঠ, রামায়ণকথা ইত্যাদি নানা বিষয়ে কালীবাটীতে আনন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল।

সে যাহা হউক, ঐরূপ অসম্ভাবিত উপায়ে রামকুমারকে পূজকরূপে পাইয়া রাণী রাসমণি সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, বৃহস্পতিবার, স্নানযাত্রার দিবসে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নবমন্দিরে প্রতিষ্ঠিতা করিলেন! শুনা যায়, 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' শব্দে সেদিন ঐ স্থান দিবারাত্র সমভাবে কোলাহলপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল এবং রাণী অকাতরে অজস্র অর্থব্যয় করিয়া অতিথি অভ্যাগত সকলকে আপনার ন্যায় আনন্দিত করিয়া তুলিতে চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই। সুদূর কান্যকুব্জ, বারাণসী, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম, উড়িষ্যা এবং নবদ্বীপ প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রধান স্থানসমূহ হইতে বহু অধ্যাপক ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঐ উপলক্ষে সমাগত হইয়া ঐদিনে প্রত্যেকে রেশমী বস্ত্র, উত্তরীয় এবং বিদায়স্বরূপে এক একটি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুনা যায়, দেবালয়নির্মাণ ও প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে রাণী নয় লক্ষ মুদ্রা ব্যয় করিয়াছিলেন এবং ২,২৬,০০০ মুদ্রার বিনিময়ে ত্রৈলোক্যনাথ ঠাকুরের নিকট হইতে দিনাজপুর জেলার ঠাকুরগাঁ মহকুমার অন্তর্গত শালবাড়ী পরগণা ক্রয় করিয়া দেবসেবার জন্য দানপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন।

রাণীর ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা

কেহ কেহ বলেন, ভট্টাচার্য রামকুমার ঐদিন সিধা লইয়া গঙ্গাতীরে

রাত্রিকালেও ঐরূপ আনন্দের বিরাম হয় নাই এবং অসংখ্য আলোকমালায় দেবালয়ের সর্বত্র দিবসের ন্যায় উজ্জ্বল ভাব ধারণ করিয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন—"ঐ সময় দেবালয় দেখিয়া মনে হইয়াছিল, রাণী যেন রজতগিরি তুলিয়া আনাইয়া এখানে বসাইয়া দিয়াছেন।" পূর্বোক্ত আনন্দোৎসব দেখিবার জন্য শ্রীযুক্ত রামকুমার প্রতিষ্ঠার পূর্বদিনে কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

রামলাল ভট্টাচার্যের পূর্বোক্ত কথায় অনুমিত হয়, রামধন ও মহেশ উভয়ের অনুরোধে শ্রীযুক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক পূজকের পদ অঙ্গীকার করিয়াছিলেন।

রন্ধনকরতঃ আপন অভীষ্টদেবীকে নিবেদন করিয়া প্রসাদ ভোজন করিয়াছিলেন। কিন্তু আমাদের ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। কারণ, দেবীভক্ত রামকুমার স্বয়ং ব্যবস্থা দিয়া দেবীর অন্নভোগের বন্দোবস্ত করাইয়াছিলেন। তিনিই এখন ঐ নিবেদিত অন্ন গ্রহণ না করিয়া আপন বিধানের এবং ভক্তিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ কার্য করিবেন, একথা নিতান্তই অযুক্তিকর। ঠাকুরের মুখেও আমরা ঐরূপ কথা শুনি নাই। অতএব

প্রতিষ্ঠার দিনে ঠাকুরের আচরণ

আমাদিগের ধারণা, তিনি পূজান্তে হৃষ্টচিত্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদী নৈবেদ্যান্নই গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর কিন্তু ঐ আনন্দোৎসবে সম্পূর্ণহৃদয়ে যোগদান করিলেও আহারের বিষয়ে নিজ নিষ্ঠা রক্ষাপূর্বক সন্ধ্যাগমে নিকটবর্তী বাজার হইতে এক পয়সার মুড়ি-মুড়কি কিনিয়া খাইয়া পদব্রজে ঝামাপুকুরের চতুষ্পাঠীতে আসিয়া সে রাত্রি বিশ্রাম করিয়াছিলেন।

রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটী প্রতিষ্ঠা করা সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং আমাদিগকে অনেক সময়ে অনেক কথা বলিতেন। বলিতেন—

কালীবাটী প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

রাণী কাশীধামে যাইবার জন্য সমস্ত আয়োজন করিয়াছিলেন; যাত্রার দিন স্থির করিয়া প্রায় একশতখানা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নৌকা বিবিধ দ্রব্যসম্ভারে পূর্ণ করিয়া ঘাটে বাঁধাইয়া রাখিয়াছিলেন, যাত্রা করিবার অব্যবহিত পূর্বরাত্রে স্বপ্নে ৺দেবীর নিকট হইতে প্রত্যাদেশলাভ করিয়াই ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করেন এবং ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য যথাযোগ্য স্থানের অনুসন্ধানে নিযুক্তা হন।

বলিতেন—রাণী প্রথমে 'গঙ্গার পশ্চিমকূল, বারাণসী সমতুল'—এই ধারণার বশবর্তিনী হইয়া ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি

গ্রামে স্থানান্বেষণ করিয়া বিফলমনোরথ হয়েন।* কারণ, 'দশ আনি' 'ছয় আনি' খ্যাত ঐ স্থানের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারিগণ, রাণী প্রভূত অর্থদানে স্বীকৃত হইলেও, বলিয়াছিলেন, তাঁহাদের অধিকৃত স্থানের কোথাও অপরের ব্যয়ে নির্মিত ঘাট দিয়া গঙ্গায় অবতরণ করিবেন না। রাণী বাধ্য হইয়া পরিশেষে ভাগীরথীর পূর্বকূলে এই স্থানটি ক্রয় করেন।

বলিতেন—রাণী দক্ষিণেশ্বরে যে স্থানটি মনোনীত করিলেন, উহার কিয়দংশ এক সাহেবের ছিল এবং অপরাংশে মুসলমানদিগের কবরডাঙ্গী ও গাজিসাহেবের পীরের স্থান ছিল; স্থানটির কূর্মপৃষ্ঠের মত আকার ছিল; ঐরূপ কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি শ্মশানই শক্তিপ্রতিষ্ঠা ও সাধনার জন্য বিশেষ প্রশস্ত বলিয়া তন্ত্রনির্দিষ্ট; অতএব দৈবাধীন হইয়াই রাণী যেন ঐ স্থানটি মনোনীত করেন।

আবার শক্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রনির্দিষ্ট অন্যান্য প্রশস্ত দিবসে মন্দির-প্রতিষ্ঠা না করিয়া স্নানযাত্রার দিনে বিষ্ণু-পর্বাহে রাণী শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতিষ্ঠা কেন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে কথা উত্থাপন করিয়া ঠাকুর কখন কখন আমাদিগকে বলিতেন—দেবীমূর্তি নির্মাণারম্ভের দিবস হইতে রাণী যথাশাস্ত্র কঠোর তপস্যার অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন; ত্রিসন্ধ্যা স্নান, হবিষ্যান্ন-ভোজন, মাটিতে শয়ন ও যথাশক্তি জপ পূজাদি করিতেছিলেন; মন্দির ও দেবীমূর্তি নির্মিত হইলে প্রতিষ্ঠার জন্য ধীরে সুস্থে শুভদিবসের নির্ধারণ হইতেছিল এবং মূর্তিটি ভগ্ন হইবার আশঙ্কায় বাক্সবন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল; এমন সময়ে যে-কোন কারণেই হউক, ঐ মূর্তি ঘামিয়া উঠে

* বালী, উত্তরপাড়া প্রভৃতি গ্রামের প্রাচীন লোকেরা এখনও একথা সত্য বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করেন।

এবং রাণীকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ হয়—'আমাকে আর কতদিন এইভাবে আবদ্ধ করিয়া রাখিবি ? আমার যে বড় কষ্ট হইতেছে ; যত শীঘ্র পারিস আমাকে প্রতিষ্ঠিতা কর।' ঐরূপ প্রত্যাদেশলাভ করিয়াই রাণী দেবী-প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যস্ত হইয়া দিন দেখাইতে থাকেন এবং স্নানযাত্রার পূর্ণিমার অগ্রে অন্য কোন প্রশস্ত দিন না পাইয়া ঐ দিবসে ঐ কার্য সম্পন্ন করিতে সঙ্কল্প করেন।

তদ্ভিন্ন দেবীকে অন্নভোগ দিতে পারিবেন বলিয়া নিজ গুরুর নামে রাণীর উক্ত ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠা করা প্রভৃতি পূর্বোল্লিখিত সকল কথাই আমরা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলাম। কেবল ঠাকুরবাটী প্রতিষ্ঠার জন্য রাণীকে রামকুমারের ব্যবস্থাদানের ও ঠাকুরকে বুঝাইবার জন্য রাম-কুমারের ধর্মপত্রানুষ্ঠানের কথা দুইটি আমরা ঠাকুরের ভাগিনেয় শ্রীযুক্ত হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি।

দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে চিরকালের জন্য পূজকপদ গ্রহণ করা যে ভট্টাচার্য রামকুমারের প্রথম অভীপ্সিত ছিল না, তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারি। ঐ কথার অনুধাবনে মনে হয় সরল রামকুমার তখনও ঐ বিষয় বুঝিতে পারেন নাই। তিনি ভাবিয়া-ছিলেন, দেবীকে অন্নভোগপ্রদানের বিধান দিয়া এবং প্রতিষ্ঠার দিনে স্বয়ং ঐ কার্য সম্পন্ন করিবার পর তিনি পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিবেন। ঐদিন দেবীকে অন্নভোগ নিবেদন করিতে বসিয়া তিনি যে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই বা কোনরূপ অন্যায়, অশাস্ত্রীয় কার্য করিতেছেন এরূপ মনে করেন নাই, তাহা কনিষ্ঠের সহিত তাঁহার এই সময়ের ব্যবহারে বুঝিতে পারা যায়।

প্রতিষ্ঠার পরদিন প্রত্যূষে ঠাকুর অগ্রজের সংবাদ লইবার জন্য এবং

প্রতিষ্ঠাসংক্রান্ত যে-সকল কার্য বাকি ছিল, তাহা দেখিতে কৌতূহলপরবশ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন এবং কিছুকাল তথায় থাকিয়া বুঝেন, অগ্রজের সেদিন ঝামাপুকুরে ফিরিবার কোন সম্ভাবনা নাই। সুতরাং সেদিন তথায় অবস্থান করিতে অনুরোধ করিলেও অগ্রজের কথা না শুনিয়া তিনি ভোজনকালে পুনরায় ঝামাপুকুরে ফিরিয়া আসেন। ইহার পর ঠাকুর পাঁচ-সাত দিন আর দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন নাই। দক্ষিণেশ্বরের কার্যসমাপনান্তে অগ্রজ যথাসময়ে ঝামাপুকুরে ফিরিবেন ভাবিয়া ঐ স্থানেই অবস্থান করিয়াছিলেন। কিন্তু সপ্তাহ অতীত হইলেও যখন রামকুমার ফিরিলেন না, তখন মনে নানাপ্রকার তোলাপাড়া করিয়া ঠাকুর পুনরায় সংবাদ লইতে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন এবং শুনিলেন, রাণীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তিনি চিরকালের জন্য তথায় শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজকের পদে ব্রতী হইতে সম্মত হইয়াছেন। শুনিয়াই ঠাকুরের মনে নানা কথার উদয় হইল এবং তিনি পিতার অশূদ্রযাজিত্বের এবং অপ্রতি-গ্রাহিত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া তাঁহাকে ঐরূপ কার্য হইতে ফিরাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, রামকুমার তাহাতে ঠাকুরকে শাস্ত্র ও যুক্তিসহকারে নানাপ্রকারে বুঝাইয়াছিলেন এবং কোন কথাই তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতেছে না দেখিয়া পরিশেষে ধর্মপত্রানুষ্ঠানরূপ* সরল

* পল্লীগ্রামে রীতি আছে, কোন বিষয় যুক্তিসহকারে মীমাংসিত হইবার সম্ভাবনা না দেখিলে লোকে দৈবের উপর নির্ভর করিয়া কেন ঐ বিষয়ে কি অভীপ্সিত, জানিবার জন্য ধর্মপত্রের অনুষ্ঠান করে এবং উহার সহায়ে দেবতার ইচ্ছা জানিয়া ঐ বিষয়ে আর যুক্তিতর্ক না করিয়া তদনুরূপ কার্য করিয়া থাকে। ধর্মপত্র নিম্নলিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়—

উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। শুনা যায়, ধর্মপত্রে উঠিয়াছিল—"রামকুমার পূজকের পদগ্রহণে স্বীকৃত হইয়া নিন্দিত কর্ম করেন নাই। উহাতে সকলেরই মঙ্গল হইবে।"

ধর্মপত্রের মীমাংসা দেখিয়া ঠাকুরের মন ঐ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইলেও এখন অন্য এক চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি ভাবিতে লাগিলেন, চতুষ্পাঠী ত এইবার উঠিয়া যাইল, তিনি এখন কি করিবেন! ঝামাপুকুরে ঐদিন আর না ফিরিয়া ঠাকুর ঐ বিষয়ক চিন্তাতেই

ঠাকুরের আহারসম্বন্ধে নিষ্ঠা

কতকগুলি টুকরা কাগজে বা বিল্বপত্রে 'হাঁ' 'না' লিখিয়া একটি ঘটিতে রাখিয়া কোন শিশুকে একখণ্ড তুলিতে বলা হয়। শিশু 'হাঁ' লিখিত কাগজ তুলিলে অনুষ্ঠাতা বুঝে, দেবতা তাহাকে ঐ কার্য করিতে বলিতেছেন। বলা বাহুল্য, বিপরীত উঠিলে অনুষ্ঠাতা দেবতার অভিপ্রায় অন্যরূপ বুঝে। ধর্মপত্রের অনুষ্ঠানে কখন কখন বিষয়বিভাগাদিও হইয়া থাকে। যেমন, পিতার চারি সন্তান পূর্বে একত্রে ছিল, এখন হইতে পৃথক হইবার সঙ্কল্প করিয়া বিষয়বিভাগ করিতে যাইয়া উহার কোন্ অংশ কে লইবে ভাবিয়া স্থির করিতে পারিল না, গ্রামের কয়েকজন নিঃস্বার্থ ধার্মিক লোককে মীমাংসা করিয়া দিতে বলিল। তাঁহারা তখন স্থাবর অস্থাবর সমুদয় সম্পত্তি যতদূর সম্ভব সমান চারিভাগে বিভাগ করত কোন্ ভ্রাতার ভাগ্যে কোন্ ভাগটি পড়িবে, তাহা ধর্মপত্রের দ্বারা মীমাংসা করিয়া থাকেন। ঐ সময়েও প্রায় পূর্বের ন্যায় অনুষ্ঠান হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে বিষয়াধিকারীদিগের নাম লিখিয়া কেহ না দেখিতে পায় এরূপভাবে মুড়িয়া একটি ঘটির ভিতর রক্ষিত হয় এবং উক্ত চারিভাগে বিভক্ত সম্পত্তির প্রত্যেক ভাগ 'ক' 'খ' ইত্যাদি চিহ্নে নির্দিষ্ট ও ঐরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজখণ্ডে লিপিবদ্ধ হইয়া অন্য একটি পাত্রে পূর্ববৎ রক্ষিত হইয়া থাকে। অনন্তর দুইজন শিশুকে ডাকিয়া একজনকে একটি পাত্র হইতে এবং অপরকে অপর পাত্র হইতে ঐ কাগজখণ্ডগুলি তুলিতে বলা হয়। অনন্তর কাগজগুলি খুলিয়া দেখিয়া যে নামে সম্পত্তির যে ভাগটি উঠিয়াছে, তাহাই তাহাকে লইতে বাধ্য করা হয়।

মগ্ন রহিলেন এবং রামকুমার তাঁহাকে ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে বলিলেও তাহাতে সম্মত হইলেন না। রামকুমার নানাপ্রকারে বুঝাইলেন; বলিলেন—"দেবালয়, গঙ্গাজলে রান্না, তাহার উপর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত হইয়াছে, ইহা ভোজনে কোন দোষ হইবে না।" ঠাকুরের কিন্তু ঐ সকল কথা মনে লাগিল না। তখন রামকুমার বলিলেন, "তবে সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে গঙ্গাগর্ভে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন কর; গঙ্গাগর্ভে অবস্থিত সকল বস্তুই পবিত্র, একথা ত মান?" আহার-সম্বন্ধীয় ঠাকুরের মনের ঐকান্তিক নিষ্ঠা এইবার তাঁহার অন্তর্নিহিত গঙ্গাভক্তির নিকট পরাজিত হইল। শাস্ত্রজ্ঞ রামকুমার তাঁহাকে যুক্তিসহায়ে এত করিয়া বুঝাইয়া ইতিপূর্বে যাহা করাইতে পারেন নাই, বিশ্বাস ও ভক্তি তাহা সংসাধিত করিল। ঠাকুর ঐ কথায় সম্মত হইলেন এবং ঐপ্রকারে ভোজন করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

বাস্তবিক, আমরা আজীবন ঠাকুরকে গঙ্গার প্রতি গভীর ভক্তি করিতে দেখিয়াছি। বলিতেন—নিত্য-শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবকে পবিত্র করিবার জন্য বারিরূপে গঙ্গার আকারে পরিণত হইয়া রহিয়াছেন। সুতরাং গঙ্গা সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি।

ঠাকুরের গঙ্গাভক্তি

গঙ্গাতীরে বাস করিলে দেবতুল্য অন্তঃকরণ হইয়া ধর্মবুদ্ধি স্বতঃ স্ফুরিত হয়। গঙ্গার পূতবাষ্পকণাপূর্ণ পবন উভয় কূলে যতদূর সঞ্চরণ করে, ততদূর পর্যন্ত পবিত্র ভূমি—ঐ ভূমিবাসীদিগের জীবনে সদাচার, ঈশ্বর-ভক্তি, নিষ্ঠা, দান এবং তপস্যার ভাব শৈলসুতা ভাগীরথীর কৃপায় সদাই বিরাজিত। অনেকক্ষণ যদি কেহ বিষয়কথা কহিয়াছে বা বিষয়ী লোকের সঙ্গ করিয়া আসিয়াছে ত ঠাকুর তাহাকে বলিতেন, 'একটু গঙ্গাজল খাইয়া আয়।' ঈশ্বরবিমুখ, বিষয়াসক্ত মানব পুণ্যাশ্রমের কোন স্থানে

বসিয়া বিষয়চিন্তা করিয়া কলুষিত করিলে তথায় গঙ্গাবারি ছিটাইয়া দিতেন এবং গঙ্গাবারিতে কেহ শৌচাদি করিতেছে দেখিলে মনে বিশেষ ব্যথা পাইতেন।

সে যাহা হউক, মনোরম ভাগীরথীতীরে বিহগকূজিত পঞ্চবটীশোভিত উদ্যান, সুবিশাল দেবালয়ে ভক্তিমান সাধকানুষ্ঠিত সুসম্পন্ন দেবসেবা, ধার্মিক সদাচারী পিতৃতুল্য অগ্রজের অকৃত্রিম স্নেহ এবং দেবদ্বিজপরায়ণা পুণ্যবতী রাণী রাসমণি ও তজ্জামাতা মথুরবাবুর শ্রদ্ধা ও ভক্তি শীঘ্রই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীকে ঠাকুরের নিকট কামারপুকুরের গৃহের ন্যায় আপনার করিয়া তুলিল এবং কিছুকাল স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন করিলেও তিনি তথায় সানন্দচিত্তে বাস করিয়া মনের পূর্বোক্ত কিংকর্তব্য-ভাব দূরপরিহার করিতে সমর্থ হইলেন।

ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বরে বাস ও স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন

ঠাকুরের আহারসম্বন্ধীয় পূর্বোক্ত নিষ্ঠার কথা শুনিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিবেন, ঐরূপ অনুদারতা আমাদের ন্যায় মানবের অন্তরেই সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে—ঠাকুরের জীবনে উহার উল্লেখ করিয়া ইহাই কি বলিতে চাও যে ঐরূপ অনুদার না হইলে আধ্যাত্মিক জীবনের চরমোন্নতি সম্ভবপর নহে? উত্তরে বলিতে হয়, অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠা, দুইটি এক বস্তু নহে। অহঙ্কারেই প্রথমটির জন্ম এবং উহার প্রাদুর্ভাবে মানব স্বয়ং যাহা বুঝিতেছে, করিতেছে, তাহাকেই সর্বোচ্চ জ্ঞানে আপনার চারিদিকে গণ্ডি টানিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া বসে; এবং শাস্ত্র ও মহাপুরুষগণের অনু-শাসনে বিশ্বাস হইতেই দ্বিতীয়ের উৎপত্তি—উহার উদয়ে মানব নিজ অহঙ্কারকে খর্ব করিয়া আধ্যাত্মিক জীবনে উন্নত এবং ক্রমে পরম সত্যের

অনুদারতা ও ঐকান্তিক নিষ্ঠার প্রভেদ

অধিকারী হইয়া থাকে। নিষ্ঠার প্রাদুর্ভাবে মানব প্রথম প্রথম কিছুকাল অনুদাররূপে প্রতীয়মান হইতে পারে ; কিন্তু উহার সহায়ে সে জীবনপথে উচ্চ উচ্চতর আলোক ক্রমশঃ দেখিতে পায় এবং তাহার সঙ্কীর্ণতার গণ্ডি স্বভাবতঃ খসিয়া পড়ে। অতএব আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে নিষ্ঠার একান্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। ঠাকুরের জীবনে উহার পূর্বোক্তরূপ পরিচয় পাইয়া ইহাই বুঝিতে পারা যায় যে, শাস্ত্রশাসনের প্রতি দৃঢ় নিষ্ঠা রাখিয়া যদি আমরা আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হই, তবেই কালে যথার্থ উদারতার অধিকারী হইয়া পরম শান্তিলাভে সক্ষম হইব, নতুবা নহে। ঠাকুর যেমন বলিতেন—কাঁটা দিয়াই আমাদিগকে কাঁটা তুলিতে হইবে—নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়াই সত্যের উদারতায় পৌঁছিতে হইবে—শাসন, নিয়ম অনুসরণ করিয়াই শাসনাতীত, নিয়মাতীত অবস্থা লাভ করিতে হইবে।

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের জীবনে ঐরূপ অসম্পূর্ণতা বিদ্যমান দেখিয়া কেহ কেহ হয়ত বলিয়া বসিবেন, তবে আর তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলা কেন, মানুষ বলিলেই ত হয়? আর যদি তাঁহাকে ঠাকুর বানাইতেই চাও, তবে তাঁহার ঐরূপ অসম্পূর্ণতাগুলি ছাপিয়া ঢাকিয়া বলাই ভাল, নতুবা তোমাদিগের অভীষ্ট সহজে সংসিদ্ধ হইবে না। আমরা বলি—ভ্রাতঃ, আমাদেরও এককাল গিয়াছে যখন ঈশ্বরের মানববিগ্রহধারণপূর্বক অবতীর্ণ হইবার কথা স্বপ্নেও সম্ভবপর বলিয়া বিশ্বাস করি নাই ; আবার যখন তাঁহার অহেতুক কৃপায় ঐ কথা সম্ভবপর বলিয়া তিনি আমাদিগকে বুঝাইলেন তখন দেখিলাম, মানবদেহধারণ করিতে গেলে ঐ দেহের অসম্পূর্ণতাগুলির ন্যায় মানবমনের ত্রুটিগুলিও তাঁহাকে যথাযথভাবে স্বীকার করিতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, "স্বর্ণাদি ধাতুতে খাদ না মিলাইলে

যেমন গড়ন হয় না, সেইরূপ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের সহিত রজঃ এবং তমোগুণের মলিনতা কিছুমাত্র মিলিত না হইলে কোন প্রকার দেহ-মন গঠিত হওয়া অসম্ভব।” নিজ জীবনের ঐসকল অসম্পূর্ণতার কথা আমাদের নিকট প্রকাশ করিতে তিনি কখন কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই, অথচ স্পষ্টাক্ষরে আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছেন—“পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি রাম ও কৃষ্ণাদিরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তিনিই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছেন ; তবে [illegible] গুপ্তভাবে আসা—রাজা যেমন ছদ্মবেশে শহর দেখিতে বাহির হন [illegible]ই প্রকার।” অতএব ঠাকুরের সম্বন্ধে আমাদের যাহা কিছু জানা আছে, সকল কথাই আমরা বলিয়া যাইব। হে পাঠক, তুমি উহার যতদূর বিশ্বাস ও গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বুঝিবে, ততটা মাত্র লইয়া অবশিষ্টের জন্য আমাদিগকে যথা ইচ্ছা নিন্দা তিরস্কার করিলেও আমরা দুঃখিত হইব না।

পঞ্চম অধ্যায়

পূজকের পদগ্রহণ

মন্দিরপ্রতিষ্ঠার কয়েক সপ্তাহ পরে ঠাকুরের সৌম্য দর্শন, কোমল প্রকৃতি, ধর্মনিষ্ঠা ও অল্প বয়স রাণী রাসমণির জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরবাবুর নয়নাকর্ষণ করিয়াছিল। দেখিতে পাওয়া যায়, জীবনে যাহাদিগের সহিত দীর্ঘকালব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়, তাহাদিগকে প্রথম দর্শনকালে মানবহৃদয়ে একটা প্রীতির আকর্ষণ সহসা আসিয়া উপস্থিত হয়। শাস্ত্র বলেন, উহা আমাদিগের পূর্বজন্মকৃত সম্বন্ধের সংস্কার হইতে উদিত হইয়া থাকে। ঠাকুরকে দেখিয়া মথুরবাবুর মনে এখন যে ঐরূপ একটা অনির্দিষ্ট আকর্ষণ উপস্থিত হইয়াছিল, একথা পরবর্তীকালে তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যে সুদৃঢ় প্রেমসম্বন্ধ দেখিয়া আমরা নিশ্চয়রূপে বুঝিতে পারি।

প্রথম দর্শন হইতে মথুরবাবুর ঠাকুরের প্রতি আচরণ ও সংকল্প

দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে একমাস কাল পর্যন্ত ঠাকুর কি করা কর্তব্য, নিশ্চয় করিতে না পারিয়া অগ্রজের অনুরোধে দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন। মথুরবাবু ইতিমধ্যে তাঁহাকে দেবীর বেশকারীর কার্যে নিযুক্ত করিবার সংকল্প মনে মনে স্থির করিয়া রামকুমার ভট্টাচার্যের নিকট ঐ বিষয়ক প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন। রামকুমার তাহাতে ভ্রাতার মানসিক অবস্থার কথা তাঁহাকে আনুপূর্বিক নিবেদন করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিরুৎসাহিত করেন। কিন্তু মথুর সহজে

নিরস্ত হইবার পাত্র ছিলেন না। ঐরূপে প্রত্যাখ্যাত হইয়াও তিনি ঐ সংকল্প কার্যে পরিণত করিতে অবসরানুসন্ধান করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংযুক্ত আর এক ব্যক্তি এখন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ঠাকুরের পিতৃস্বস্ত্রীয়া ভগিনী* শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী দেবীর পুত্র শ্রীহৃদয়রাম মুখোপাধ্যায় পূর্বোক্ত ঘটনার কয়েক মাস পূর্বে কর্মের অনুসন্ধানে বর্ধমান শহরে আসিয়া উপস্থিত হয়। হৃদয়ের বয়স তখন ষোল বৎসর। যুবক ঐ স্থানে নিজ গ্রামস্থ পরিচিত ব্যক্তিদের নিকটে থাকিয়া নিজ সংকল্পসিদ্ধির কোনরূপ সুবিধা করিতে পারিতেছিল না। সে এখন লোকমুখে সংবাদ পাইল তাহার মাতুলেরা রাণী রাসমণির নব দেবালয়ে সসম্মানে অবস্থান করিতেছেন, সেখানে

ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়রাম

* পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা ঠাকুরের বংশতালিকা এখানে প্রদান করিতেছি—
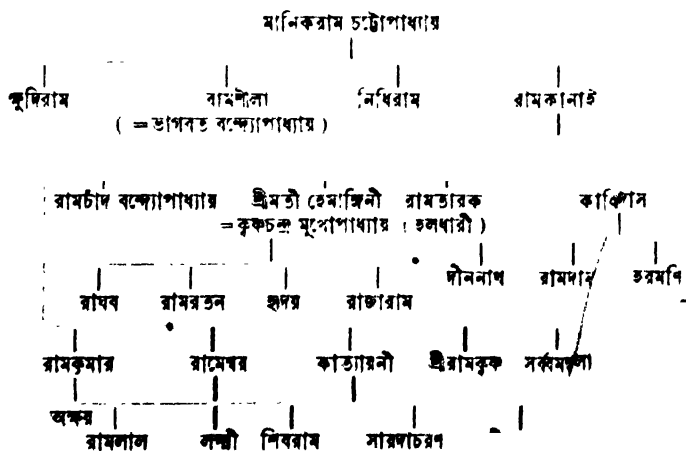
উপস্থিত হইতে পারিলে অভিপ্রায়সিদ্ধির সুযোগ হইতে পারে। কাল-বিলম্ব না করিয়া হৃদয় দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে উপস্থিত হইল এবং বাল্যকাল হইতে সুপরিচিত, প্রায় সমবয়স্ক মাতুল শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত মিলিত হইয়া তথায় আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল।

হৃদয় দীর্ঘাকৃতি এবং দেখিতে সুশ্রী সুপুরুষ ছিল। তাহার শরীর যেমন সুদৃঢ় ও বলিষ্ঠ ছিল, মনও তদ্রূপ উদ্যমশীল ও ভয়শূন্য ছিল। কঠোর পরিশ্রম ও অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা করিতে এবং প্রতিকূলাবস্থায় পড়িয়া স্থির থাকিয়া অদ্ভুত উপায়সকলের উদ্ভাবনপূর্বক উহা অতিক্রম করিতে হৃদয় পারদর্শী ছিল। নিজ কনিষ্ঠ মাতুলকে সে সত্যসত্যই ভালবাসিত এবং তাঁহাকে সুখী করিতে অশেষ শারীরিক কষ্টস্বীকারে কুণ্ঠিত হইত না।

সর্বদা অনলস হৃদয়ের অন্তরে ভাবুকতার বিন্দুবিসর্গ ছিল না। ঐজন্য সংসারী মানবের যেমন হইয়া থাকে, হৃদয়ের চিত্ত নিজ স্বার্থচেষ্টা হইতে কখনও সম্পূর্ণ বিযুক্ত হইতে পারিত না। ঠাকুরের সহিত হৃদয়ের এখন হইতে সম্বন্ধের কথার আমরা যতই আলোচনা করিব ততই দেখিতে পাইব, তাহার জীবনে ভবিষ্যতে যতটুকু ভাবুকতা ও নিঃস্বার্থ চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা ভাবময় ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে এবং কখন কখন তাঁহার চেষ্টার অনুকরণে আসিয়া উপস্থিত হইত। ঠাকুরের ন্যায় আহার, বিহার প্রভৃতি সর্ববিধ শারীরচেষ্টায় উদাসীন, সর্বদা চিন্তাশীল, স্বার্থগন্ধশূন্য ভাবুকজীবনের গঠনকালে হৃদয়ের ন্যায় একজন শ্রদ্ধাসম্পন্ন সাহসী উদ্যমশীল কর্মীর সহায়তা নিতান্ত প্রয়োজন। শ্রীশ্রীজগদম্বা কি সেইজন্য ঠাকুরের সাধনকালে হৃদয়ের ন্যায় পুরুষকে তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ করিয়াছিলেন? ঠাকুর একথা আমাদিগকে বারংবার

বলিয়াছেন, হৃদয় না থাকিলে সাধনকালে তাঁহার শরীররক্ষা অসম্ভব হইত! শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সহিত হৃদয়ের নাম তজ্জন্য নিত্যসংযুক্ত—এবং তজ্জন্যই সে আন্তরিক ভক্তিশ্রদ্ধার অধিকারী হইয়া চিরকালের নিমিত্ত আমাদিগের প্রণম্য হইয়া রহিয়াছে।

হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার কালে ঠাকুর বিংশতি বর্ষে কয়েক মাস মাত্র পদার্পণ করিয়াছেন। সহচররূপে তাঁহাকে পাইয়া তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে বাস যে এখন হইতে অনেকটা সহজ হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ অনুমান করিতে পারি। তিনি এখন হইতে ভ্রমণ, শয়ন, উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্যই তাঁহার সহিত একত্রে অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। চিরকাল বালক-ভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণদেবের, সাধারণ নয়নে নিষ্কারণ চেষ্টাসকলের প্রতিবাদ না করিয়া সর্বদা সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন ও সহানুভূতি করায়, হৃদয় এখন হইতে তাঁহার বিশেষ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

হৃদয়ের আগমনে ঠাকুর

হৃদয় আমাদিগকে নিজমুখে বলিয়াছে—"এই সময় হইতে আমি ঠাকুরের প্রতি একটা অনির্বচনীয় আকর্ষণ অনুভব করিতাম ও ছায়ার ন্যায় সর্বদা তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। তাঁহাকে ছাড়িয়া একদণ্ড কোথাও থাকিতে হইলে কষ্ট বোধ হইত। শয়ন, ভ্রমণ, উপবেশনাদি সকল কাজ একত্রে করিতাম। কেবল মধ্যাহ্নে ভোজনকালে কিছুক্ষণের জন্য আমাদিগকে পৃথক হইতে হইত। কারণ, ঠাকুর সিধা লইয়া পঞ্চবটীতে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইতেন এবং আমি ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতাম। তাঁহার রন্ধনাদির সমস্ত যোগাড় আমি করিয়া দিয়া যাইতাম এবং অনেক সময়ে প্রসাদও পাইতাম। ঐরূপে রন্ধন করিয়া খাইয়াও কিন্তু তিনি মনে

ঠাকুরের প্রতি হৃদয়ের ভালবাসা

শান্তি পাইতেন না—আহার সম্বন্ধে তাঁহার নিষ্ঠা তখন এত প্রবল ছিল! মধ্যাহ্নে ঐরূপ রন্ধন করিলেও রাত্রে কিন্তু তিনি আমাদিগের ন্যায় শ্রীশ্রীজগদম্বাকে নিবেদিত প্রসাদী লুচি খাইতেন। কতদিন দেখিয়াছি, ঐরূপে লুচি খাইতে খাইতে তাঁহার চক্ষে জল আসিয়াছে এবং আক্ষেপ করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বলিয়াছেন, 'মা, আমাকে কৈবর্তের অন্ন খাওয়ালি'!"

ঠাকুর কখন কখন নিজমুখে আমাদিগকে এই সময়ের কথা এইরূপে বলিয়াছেন, "কৈবর্তের অন্ন খাইতে হইবে ভাবিয়া মনে তখন দারুণ কষ্ট উপস্থিত হইত। গরীব কাঙ্গালেরাও অনেকে তখন রাসমণির ঠাকুর-বাড়ীতে ঐজন্য খাইতে আসিত না। খাইবার লোক জুটিত না বলিয়া কতদিন প্রসাদী অন্ন গরুকে খাওয়াইতে এবং অবশিষ্ট গঙ্গায় ফেলিয়া দিতে হইয়াছে।" তবে ঐরূপে রন্ধন করিয়া তাঁহাকে বহুদিন যে খাইতে হয় নাই, একথাও আমরা হৃদয় ও ঠাকুর উভয়ের মুখেই শুনিয়াছি। আমাদের ধারণা, কালীবাটীতে পূজকের পদে ঠাকুর যতদিন না ব্রতী হইয়াছিলেন, ততদিনই ঐরূপ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার ঐ পদে ব্রতী হওয়া দেবালয়প্রতিষ্ঠার দুই তিন মাস পরেই হইয়াছিল।

ঠাকুর যে তাহাকে বিশেষ ভালবাসেন, একথা হৃদয় বুঝিত। তাঁহার সম্বন্ধে একটি কথা কেবল সে কিছুতেই বুঝিতে পারিত না। উহা ইহাই,—জ্যেষ্ঠ মাতুল রামকুমারকে যখন সে কোন বিষয়ে সহায়তা করিতে যাইত, মধ্যাহ্নে আহারাদির পর যখন একটু শয়ন করিত, অথবা সায়াহ্নে যখন সে মন্দিরে আরাত্রিক দর্শন করিত, তখন ঠাকুর কিছুক্ষণের জন্য কোথায় অন্তর্হিত হইতেন! অনেক খুঁজিয়াও সে তখন

ঠাকুরের আচরণ সম্বন্ধে যাহা হৃদয় বুঝিতে পারিত না

তাঁহার সন্ধান পাইত না। পরে দুই এক ঘণ্টা গত হইলে তিনি যখন ফিরিতেন, তখন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, 'এইখানেই ছিলাম।' কোন কোন দিন সন্ধান করিতে যাইয়া সে তাঁহাকে পঞ্চবটীর দিক হইতে ফিরিতে দেখিয়া ভাবিত, তিনি শৌচাদির জন্য ঐদিকে গিয়াছিলেন এবং আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিত না।

হৃদয় বলিত, এই সময়ে একদিন মূর্তিগঠন করিয়া ঠাকুরের শিবপূজা 'করিতে ইচ্ছা হয়।' আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, বাল্যকালে কামার-পুকুরে তিনি কখন কখন ঐরূপ করিতেন। ইচ্ছা হইবামাত্র তিনি গঙ্গাগর্ভ হইতে মৃত্তিকা আহরণ করিয়া বৃষ, ডমরু ও ত্রিশূল সহিত একটি শিবমূর্তি স্বহস্তে গঠন করিয়া উহার পূজা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুরের গঠিত শিবমূর্তিদর্শনে মথুরের প্রশংসা

মথুরবাবু ঐ সময়ে ইতস্ততঃ বেড়াইতে বেড়াইতে ঐ স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং তিনি তন্ময় হইয়া কি পূজা করিতেছেন জানিতে উৎসুক হইয়া নিকটে আসিয়া ঐ মূর্তিটি দেখিতে পাইলেন। বৃহৎ না হইলেও মূর্তিটি সুন্দর হইয়াছিল। মথুর উহা দেখিয়া বিস্মিত হইলেন, বাজারে ঐরূপ দেবভাবাঙ্কিত মূর্তি যে পাওয়া যায় না, ইহা তিনি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন। কৌতূহলপরবশ হইয়া তিনি হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মূর্তি কোথায় পাইলে, কে গড়িয়াছে?" হৃদয়ের উত্তরে ঠাকুর দেবদেবীর মূর্তি গড়িতে এবং ভগ্ন মূর্তি সুন্দরভাবে জুড়িতে জানেন—একথা জানিতে পারিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন এবং পূজান্তে মূর্তিটি তাঁহাকে দিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। হৃদয়ও ঐ কথায় স্বীকৃত হইয়া পূজাশেষে ঠাকুরকে বলিয়া মূর্তিটি লইয়া তাঁহাকে দিয়া আসিলেন। মূর্তিটি হস্তে পাইয়া মথুর এখন উহা তন্ন তন্ন করিয়া নিরীক্ষণ করিতে

লাগিলেন এবং স্বয়ং মুগ্ধ হইয়া রাণীকে উহা দেখাইতে পাঠাইলেন। রাণীও উহা দেখিয়া নির্মাতার বিশেষ প্রশংসা করিলেন এবং ঠাকুর উহা গড়িয়াছেন জানিয়া মথুরের ন্যায় বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। * ঠাকুরকে দেবালয়ের কার্যে নিযুক্ত করিতে মথুরের ইতিপূর্বেই ইচ্ছা হইয়াছিল, এখন তাঁহার এই নূতন গুণপনার পরিচয় পাইয়া ঐ ইচ্ছা অধিকতর বলবতী হইল। তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায়ের কথা ঠাকুর ইতিপূর্বে অগ্রজের নিকট শুনিয়াছিলেন ; কিন্তু ভগবান্ ভিন্ন অপর কাহারও চাকরি করিব না—এইরূপ একটা ভাব বাল্যকাল হইতে তাঁহার মনে দৃঢ়নিবদ্ধ থাকায় তিনি ঐ কথায় কর্ণপাত করেন নাই।

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুরকে ঐরূপ ভাব প্রকাশ করিতে আমরা অনেক সময় শুনিয়াছি। বিশেষ অভাবে না পড়িয়া কেহ স্বেচ্ছায় চাকরি স্বীকার করিলে ঠাকুর ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা করিতেন না। তাঁহার বালক ভক্তদিগের মধ্যে একজন † একসময়ে চাকরি স্বীকার করিয়াছে জানিয়া আমরা তাঁহাকে বিশেষ ব্যথিত হইয়া বলিতে শুনিয়াছি, "সে মরিয়াছে শুনিলে আমার যত না কষ্ট হইত, সে চাকরি করিতেছে শুনিয়া ততোধিক কষ্ট হইয়াছে!" পরে কিছুকাল অতীত হইলে ঐ ব্যক্তির সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইয়া যখন জানিলেন, সে তাহার অসহায়া বৃদ্ধা মাতার ভরণপোষণ-নির্বাহের জন্য চাকরি স্বীকার করিয়াছে, তখন

চাকরি করা সম্বন্ধে ঠাকুর

* কেহ কেহ বলেন, এই ঘটনা ঠাকুরের পূজাকালে হইয়াছিল এবং মথুর উহা রাণী রাসমণিকে দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—"যেরূপ উপযুক্ত পূজক পাইয়াছি, তাহাতে দেবী শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন।"

† স্বামী নিরঞ্জনানন্দ।

তিনি সস্নেহে তাহার গাত্রে ও মস্তকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিয়াছিলেন, "তাতে দোষ নেই, ঐ জন্য চাকরি করায় তোকে দোষ স্পর্শ করবে না; কিন্তু মার জন্য না হয়ে যদি তুই স্বেচ্ছায় চাকরি করতে যেতিস, তাহলে তোকে আর স্পর্শ করতে পারতুম না। তাই ত বলি, আমার নিরঞ্জনে এতটুকু অঞ্জন (কাল দাগ) নেই, তার ঐরূপ হীনবুদ্ধি কেন হবে?"

নিত্যনিরঞ্জনকে লক্ষ্য করিয়া ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথা শুনিয়া অন্যান্য আগন্তুক ব্যক্তিরা সকলেই বিস্মিত হইল। একজন বলিয়াও বসিল, "মহাশয়, আপনি চাকরির নিন্দা করিতেছেন, কিন্তু চাকরি না করিলে সংসারপোষণ করিব কিরূপে?" তদুত্তরে ঠাকুর বলিলেন, "যে করবে, করুক না; আমি ত সকলকে চাকরি করতে নিষেধ করছি না, (নিরঞ্জনকে ও তাঁহার অন্যান্য বালক ভক্তদিগকে দেখাইয়া) এদের ঐ কথা বলছি; এদের কথা আলাদা।" ঠাকুর তাঁহার বালক ভক্তদিগের জীবন অন্যভাবে গড়িতেছিলেন এবং পূর্ণ আধ্যাত্মিক ভাবের সহিত চাকরি করাটার কখন সামঞ্জস্য হয় না, এইরূপ ধারণা ছিল বলিয়াই যে তিনি ঐ কথা বলিয়াছিলেন, ইহা বলা বাহুল্য।

অগ্রজের নিকট হইতে মথুরবাবুর ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া ঠাকুর তখন হইতে তাঁহার সম্মুখে অগ্রসর না হইয়া যতটা পারেন তাঁহার চক্ষুর অন্তরালে থাকিবার চেষ্টা করিতেন। কারণ, কায়মনোবাক্যে সত্য ও ধর্ম পালন করিতে তিনি যেমন কখন কাহারও অপেক্ষা রাখিতেন না, তেমনি আবার বিশেষ কারণ না থাকিলে কাহাকেও উপেক্ষা করিয়া বৃথা কষ্ট দিতে চিরকাল কুণ্ঠিত হইতেন। আবার, কোনরূপ প্রত্যাশা মনের ভিতর না রাখিয়া গুণী ব্যক্তির গুণের

চাকুরি করিতে বলিবে বলিয়া ঠাকুরের মথুরের নিকট যাইতে সঙ্কোচ

আদর করা এবং মানী ব্যক্তিকে সরল স্বাভাবিকভাবে সম্মান দেওয়াটা ঠাকুরের প্রকৃতিগত ছিল। অতএব দেবালয়ে পূজকপদ গ্রহণ করিবেন কি-না, এই প্রশ্নের যাহা হয় একটা মীমাংসায় স্বয়ং উপনীত হইবার পূর্বে মথুরবাবু তাঁহাকে উহা স্বীকার করিতে অনুরোধ করিয়া ধরিয়া বসিলে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া প্রত্যাখ্যানপূর্বক তাঁহার মনে কষ্ট দিতে হইবে—এই আশঙ্কাই যে ঠাকুরের ঐরূপ চেষ্টার মূলে ছিল, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বিশেষতঃ, তিনি তখন একজন নগণ্য যুবকমাত্র এবং রাণী রাসমণির দক্ষিণহস্তস্বরূপ মথুর মহামাননীয় ব্যক্তি ; এ অবস্থায় মথুরের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করাটা তাঁহার পক্ষে বালসুলভ চপলতা বলিয়া পরিগণিত হইবে। কিন্তু যত দিন যাইতেছে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাটীতে অবস্থান করাটা তাঁহার নিকট তত প্রীতিকর বলিয়া বোধ হইতেছে, অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুরের নিকট নিজ মনোগত এই ভাবটিও লুক্কায়িত ছিল না। কোনরূপ গুরুতর কার্যের দায়িত্ব গ্রহণ না করিয়া দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিতে পাইলে তাঁহার যে এখন আর পূর্বের ন্যায় আপত্তি ছিল না এবং জন্মভূমি কামারপুকুরে ফিরিবার জন্য তাঁহার মন যে এখন আর পূর্বের ন্যায় চঞ্চল ছিল না, একথা আমরা অতঃপর ঘটনাবলী হইতে বেশ বুঝিতে পারি।

ঠাকুর যাহা আশঙ্কা করিতেছিলেন, তাহাই একদিন হইয়া বসিল। মথুরবাবু কালীমন্দিরে দর্শনাদি করিতে আসিয়া কিছু দূরে ঠাকুরকে দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়ের সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে মথুরবাবুকে দূরে দেখিতে পাইয়া সেখান হইতে সরিয়া অন্যত্র যাইতেছিলেন, এমন সময়ে মথুরের ভৃত্য আসিয়া সংবাদ

ঠাকুরের পূজকের পদগ্রহণ

দিল, "বাবু আপনাকে ডাকিতেছেন।" ঠাকুর মথুরের নিকট যাইতে ইতস্ততঃ করিতেছেন দেখিয়া হৃদয় কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিলেন—"যাইলেই আমাকে এখানে থাকিতে বলিবে, চাকরি স্বীকার করিতে বলিবে।" হৃদয় বলিল, "তাহাতে দোষ কি? এমন স্থানে, মহতের আশ্রয়ে কার্যে নিযুক্ত হওয়া ত ভাল বই মন্দ নয়, তবে কেন ইতস্ততঃ করিতেছ?"

ঠাকুর—"আমার চাকরিতে চিরকাল আবদ্ধ হইয়া থাকিতে ইচ্ছা নাই। বিশেষতঃ, এখানে পূজা করিতে স্বীকার করিলে দেবীর অঙ্গে যে সমস্ত অলঙ্কারাদি আছে তাহার জন্য দায়ী থাকিতে হইবে, সে বড় হাঙ্গামার কথা; আমার দ্বারা উহা সম্ভব হইবে না। তবে যদি তুমি ঐ কার্যের ভার লইয়া এখানে থাক, তাহা হইলে আমার পূজা করিতে আপত্তি নাই।"

হৃদয় এখানে চাকরির অন্বেষণেই আসিয়াছিল। সুতরাং ঠাকুরের ঐকথায় আনন্দে স্বীকৃত হইল। ঠাকুর তখন মথুরবাবুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহার দ্বারা দেবালয়ে কর্ম স্বীকার করিতে অনুরুদ্ধ হইয়া পূর্বোক্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর তাঁহার কথায় স্বীকৃত হইয়া ঐ দিন হইতে তাঁহাকে কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে এবং হৃদয়কে রামকুমার ও তাঁহাকে সাহায্য করিতে নিযুক্ত করিলেন। মথুরবাবুর অনুরোধে ভ্রাতাকে ঐরূপে কার্যে নিযুক্ত হইতে দেখিয়া রামকুমার নিশ্চিন্ত হইলেন।

দেবালয়প্রতিষ্ঠার তিন মাসের মধ্যেই পূর্বোক্ত ঘটনাগুলি হইয়া গেল। ১২৬২ সালের ভাদ্র মাস উপস্থিত। পূর্বদিনে মন্দিরে জন্মাষ্টমী-কৃত্য যথাযথ সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। আজ নন্দোৎসব। মধ্যাহ্নে

৺রাধাগোবিন্দজীর বিশেষ পূজা ও ভোগরাগাদি হইয়া গেলে পূজক ক্ষেত্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ৺রাধারাণীকে কক্ষান্তরে শয়ন করাইয়া আসিয়া ৺গোবিন্দজীকে শয়ন করাইতে লইয়া যাইবার সময় সহসা পড়িয়াগেলেন; বিগ্রহের একটি পদ ভাঙ্গিয়া যাইল। নানা পণ্ডিতের মতামত লইবার পরে ঠাকুরের পরামর্শে বিগ্রহের ভগ্নাংশ জুড়িয়া পূজা চলিতে লাগিল।* ভগবৎপ্রেমে ঠাকুরকে ইতিপূর্বে মধ্যে মধ্যে ভাবাবিষ্ট হইতে দর্শন এবং কোন কোন বিষয়ে আদেশপ্রাপ্ত হইতে শ্রবণ করিয়াই মথুরবাবু ভগ্নবিগ্রহপরিবর্তন সম্বন্ধে তাঁহার পরামর্শগ্রহণে সমুৎসুক হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ভগ্নবিগ্রহসম্বন্ধে মথুরবাবুর প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্বে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং ভাব ভঙ্গ হইলে বলিয়াছিলেন, বিগ্রহমূর্তি-পরিবর্তনের প্রয়োজন নাই। ঠাকুর যে ভগ্নবিগ্রহ সুন্দরভাবে জুড়িতে পারেন, একথা মথুরবাবুর অবিদিত ছিল না। সুতরাং তাঁহার অনুরোধে তাঁহাকেই এখন ঐ বিগ্রহ জুড়িয়া দিতে হইয়াছিল। তিনি উহা এমন সুন্দররূপে জুড়িয়াছিলেন যে, বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেও ঐ মূর্তি যে কোনকালে ভগ্ন হইয়াছিল, একথা এখনও বুঝিতে পারা যায় না।

৺গোবিন্দজীর বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া

৺রাধাগোবিন্দজীর বিগ্রহ ঐরূপে ভগ্ন হইলে অঙ্গহীন বিগ্রহে পূজা সিদ্ধ হয় না বলিয়া অনেকে অনেক কথা তখন বলাবলি করিত। রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু কিন্তু ঠাকুরের যুক্তিযুক্ত পরামর্শে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক ঐ সকল কথায় কর্ণপাত করিতেন না। সে যাহা হউক, পূজক ক্ষেত্রনাথ অনবধানতার অপরাধে কর্মচ্যুত হইলেন এবং ৺রাধাগোবিন্দজীর

* এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণের জন্য 'গুরুভাব, পূর্বার্ধ—ষষ্ঠ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

পূজার ভার তদবধি ঠাকুরের উপরে ন্যস্ত হইল। হৃদয়ও এখন হইতে পূজাকালে শ্রীশ্রীকালীমাতার বেশ করিয়া রামকুমারকে সাহায্য করিতে লাগিল।

বিগ্রহভঙ্গপ্রসঙ্গে হৃদয় এক সময়ে আমাদিগের নিকট আর একটি কথার উল্লেখ করিয়াছিল। কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে, বরাহনগরে কুটিঘাটার নিকটে নড়ালের প্রসিদ্ধ জমিদার ৺রতন রায়ের ঘাট বিদ্যমান। ঐ ঘাটের নিকটে একটি ঠাকুর-বাটী আছে। উহাতে ৺দশমহাবিদ্যামূর্তি প্রতিষ্ঠিতা। পূর্বে উক্ত ঠাকুরবাটীতে পূজাদির বেশ বন্দোবস্ত থাকিলেও ঠাকুরের সাধনকালে উহা হীনদশাপন্ন হইয়াছিল। মথুরবাবু যখন ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করিতেছেন, তখন তিনি এক সময়ে তাঁহার সহিত উক্ত দেবালয় দর্শন করিতে আসেন এবং অভাব দেখিয়া তাঁহাকে বলিয়া ভোগের জন্য দুই মণ চাউল ও দুইটি করিয়া টাকার মাসিক বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। তদবধি এখানে তিনি মধ্যে মধ্যে ৺দশমহাবিদ্যা দর্শন করিতে আসিতেন। একদিন ঐরূপে দর্শন করিয়া ফিরিবার কালে ঠাকুর এখানকার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার জয়নারায়ণ বন্দ্যো-পাধ্যায়কে অনেকগুলি লোকের সহিত স্বপ্রতিষ্ঠিত ঘাটে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়াছিলেন। পূর্বপরিচয় থাকায় ঠাকুর তাঁহার সহিত দেখা করিতে যাইলেন। জয়নারায়ণবাবু তাঁহাকে নমস্কার ও সাদরাহ্বানপূর্বক সঙ্গীসকলকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। পরে কথাপ্রসঙ্গে রাণী রাসমণির কালীবাটীর কথা তুলিয়া ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, ওখানকার ৺গোবিন্দজী কি ভাঙ্গা?" ঠাকুর তাহাতে বলিয়া-ছিলেন, "তোমার কি বুদ্ধি গো? অখণ্ডমণ্ডলাকার যিনি, তিনি কি

ভগ্নবিগ্রহের পূজাসম্বন্ধে ঠাকুর জয়নারায়ণবাবুকে যাহা বলেন

কখনও তাজা হন? জয়নারায়ণবাবুর প্রশ্নে নিরর্থক নানা কথা উঠিবার সম্ভাবনা দেখিয়া ঠাকুর ঐরূপে ঐ প্রসঙ্গ পালটাইয়া দেন এবং প্রসঙ্গান্তরের উত্থাপন করিয়া সকল বস্তুর অসার ভাগ ছাড়িয়া সার ভাগ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে বলিলেন। সুবুদ্ধিসম্পন্ন জয়নারায়ণবাবুও ঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া তদবধি ঐরূপ প্রশ্নসকল করিতে নিরস্ত হইয়াছিলেন।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, ঠাকুরের পূজা একটা দেখিবার বিষয় ছিল; যে দেখিত সে মুগ্ধ হইত। আর ঠাকুরের সেই প্রাণের উচ্ছ্বাসে মধুর কণ্ঠে গান!—সে গান যে একবার শুনিত, সে কখন ভুলিতে পারিত না। তাহাতে ওস্তাদী কালোয়াতী ঢং-ঢাং কিছুই ছিল না; ছিল কেবল গীতোক্ত বিষয়ের ভাবটি আপনাতে সম্পূর্ণ আরোপ করিয়া মর্মস্পর্শী মধুর স্বরে যথাযথ প্রকাশ এবং তাল লয়ের বিশুদ্ধতা। ভাবই যে সঙ্গীতের প্রাণ, একথা যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই বুঝিয়াছে। আবার তাল লয় বিশুদ্ধ না হইলে ঐ ভাব যে আত্ম-প্রকাশে বাধা পাইয়া থাকে—একথা ঠাকুরের মুখনিঃসৃত সঙ্গীত শুনিয়া এবং অপরের সঙ্গীতের সহিত উহার তুলনা করিয়া বেশ বুঝা যাইত। রাণী রাসমণি যখন দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন, তখন ঠাকুরকে ডাকাইয়া তাঁহার গান শুনিতেন। নিম্নলিখিত গীতটি তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল—

ঠাকুরের সঙ্গীতশক্তি

কোন্ হিসাবে হরহৃদে দাঁড়িয়েছ মা পদ দিয়ে।
সাধ করে জিব্ বাড়ায়েছ, যেন কত ন্যাকা মেয়ে॥
জেনেছি জেনেছি তারা,
তারা কি তোর এমনি ধারা।
তোর মা কি তোর বাপের বুকে দাঁড়িয়েছিল অমনি করে॥

ঠাকুরের গীত অত মধুর লাগিবার আর একটি কারণ ছিল। গান

গাহিবার সময় তিনি গীতোক্ত ভাবে নিজে এত মুগ্ধ হইতেন যে, অপর কাহারও প্রীতির জন্য গান গাহিতেছেন, একথা একেবারে ভুলিয়া যাইতেন। গীতোক্ত ভাবে মুগ্ধ হইয়া ঐরূপে সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হইতে আমরা জীবনে অপর কাহাকেও দেখি নাই। ভাবুক গায়কেরাও শ্রোতার নিকট হইতে প্রশংসার প্রত্যাশা কিছু না কিছু রাখিয়া থাকেন। ঠাকুরকে কেবল দেখিয়াছি, তাঁহার গীত শুনিয়া কেহ প্রশংসা করিলে তিনি যথার্থই ভাবিতেন, এই ব্যক্তি গীতোক্ত ভাবের প্রশংসা করিতেছে এবং উহার বিন্দুমাত্র তাঁহার প্রাপ্য নহে।

হৃদয় বলিত, এই কালে গীত গাহিতে গাহিতে দুই চক্ষের জলে তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত; এবং যখন পূজা করিতেন, তখন এমন তন্ময়ভাবে উহা করিতেন যে, পূজাস্থানে কেহ আসিলে বা নিকটে দাঁড়াইয়া কথা কহিলেও তিনি উহা আদৌ শুনিতে পাইতেন না। ঠাকুর বলিতেন, অঙ্গন্যাস, করন্যাস প্রভৃতি পূজাঙ্গসকল সম্পন্ন করিবার কালে ঐ সকল মন্ত্রবর্ণ নিজদেহে উজ্জ্বলবর্ণে সন্নিবেশিত রহিয়াছে বলিয়া তিনি বাস্তবিক দেখিতে পাইতেন। বাস্তবিকই দেখিতেন—সর্পাকৃতি কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নামার্গ দিয়া সহস্রারে উঠিতেছেন এবং শরীরের যে যে অংশকে ঐ শক্তি ত্যাগ করিতেছেন, সেই সেই অংশগুলি এককালে নিস্পন্দ, অসাড় ও মৃতবৎ হইয়া যাইতেছে! আবার পূজা-পদ্ধতির বিধানানুসারে যখন "রং ইতি জলধারয়া বহ্নিপ্রাকারং বিচিন্ত্য"—অর্থাৎ, রং এই মন্ত্রবর্ণ উচ্চারণপূর্বক পূজক আপনার চতুর্দিকে জল ছড়াইয়া ভাবিবে যেন অগ্নির প্রাচীর দ্বারা পূজাস্থান বেষ্টিত রহিয়াছে এবং তজ্জন্য কোন প্রকার বিঘ্নবাধা তথায় প্রবেশ করিতে পারিতেছে না—প্রভৃতি

প্রথম পূজাকালে ঠাকুরের দর্শন

কথার উচ্চারণ করিতেন, তখন দেখিতে পাইতেন তাঁহার চতুর্দিকে শত জিহ্বা বিস্তার করিয়া অনুল্লঙ্ঘনীয় অগ্নির প্রাচীর সত্য সত্যই বিদ্যমান থাকিয়া পূজাস্থানকে সর্ববিধ বিঘ্নের হস্ত হইতে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছে! হৃদয় বলিত, পূজার সময় ঠাকুরের তেজপুঞ্জিত শরীর ও তন্মনস্ক ভাব দেখিয়া অপর ব্রাহ্মণগণ বলাবলি করিতেন—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব যেন নরশরীর পরিগ্রহ করিয়া পূজা করিতে বসিয়াছেন!

দেবীভক্ত রামকুমার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অবধি আত্মীয়গণের ভরণ-পোষণ সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেও অন্য এক বিষয়ের জন্য মধ্যে মধ্যে বড় চিন্তিত হইতেন। কারণ, দেখিতেন, এখানে আসিয়া অবধি কনিষ্ঠের নির্জনপ্রিয়তা ও সংসার সম্বন্ধে কেমন একটা উদাসীন উদাসীন ভাব! সংসারে যাহাতে উন্নতি হইবে এরূপ কোন কাজেই যেন তাঁহার আঁট দেখিতে পাইতেন না। দেখিতেন, বালক সকাল সন্ধ্যা যখন তখন একাকী মন্দির হইতে দূরে গঙ্গাতীরে পদচারণ করিতেছে, পঞ্চবটী-মূলে স্থির হইয়া বসিয়া আছে, অথবা পঞ্চবটীর চতুর্দিকে তখন যে জঙ্গলপূর্ণ স্থান ছিল তন্মধ্যে প্রবেশপূর্বক বহুক্ষণ পরে তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইতেছে। রামকুমার প্রথম প্রথম ভাবিতেন, বালক বোধ হয় কামারপুকুরে মাতার নিকট ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছে এবং ঐ বিষয় সদা সর্বদা চিন্তা করিতেছে। কিন্তু দিনের পর দিন যাইলেও সে যখন গৃহে ফিরিবার কথা তাঁহাকে মুখ ফুটিয়া বলিল না এবং কখন কখন তাহাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াও তিনি যখন উক্ত সত্য বলিয়া বুঝিতে পারিলেন না, তখন তাহাকে বাড়ীতে ফিরিয়া পাঠাইবার কথা ছাড়িয়া দিলেন। ভাবিলেন, তাঁহার বয়স হইয়াছে, শরীরও দিন দিন অপটু হইয়া পড়িতেছে,

ঠাকুরকে কার্যদক্ষ করিবার জন্য রামকুমারের শিক্ষাদান

কবে পরমায়ু ফুরাইবে কে বলিতে পারে ?—এ অবস্থায় আর সময় নষ্ট না করিয়া, তাঁহার অবর্তমানে বালক যাহাতে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইয়া দু'পয়সা উপার্জন করিয়া সংসারনির্বাহ করিতে পারে এমন ভাবে তাহাকে মানুষ করিয়া দিয়া যাওয়া একান্ত কর্তব্য। সুতরাং মথুরবাবু যখন বালককে দেবালয়ে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায়ে রামকুমারকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তিনি বিশেষ আনন্দিত হয়েন এবং উহার কিছুকাল পরে যখন বালক মথুরবাবুর অনুরোধে প্রথমে বেশকারী ও পরে পূজকের পদে ব্রতী হইল এবং দক্ষতার সহিত ঐ কার্যসকল সম্পন্ন করিতে লাগিল, তখন তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়া এখন হইতে তাহাকে চণ্ডীপাঠ, শ্রীশ্রীকালিকামাতা এবং অন্যান্য দেবদেবীর পূজা প্রভৃতি শিখাইতে লাগিলেন। ঠাকুর ঐরূপে দশকর্মান্বিত ব্রাহ্মণগণের যাহা শিক্ষা করা কর্তব্য, তাহা অচিরে শিখিয়া লইলেন ; এবং শাক্তী দীক্ষা না লইয়া দেবীপূজা প্রশস্ত নহে শুনিয়া শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হইবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন।

কেনারাম ভট্টাচার্যের নিকট ঠাকুরের শাক্তীদীক্ষাগ্রহণ

শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টাচার্য নামক জনৈক প্রবীণ শক্তিসাধক তখন কলিকাতার বৈঠকখানা বাজারে বাস করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে রাণী রাসমণির দেবালয়ে তাঁহার গতায়াত ছিল এবং মথুরবাবু-প্রমুখ সকলের সহিত তাঁহার পরিচয়ও ছিল বলিয়া বোধ হয়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, যাঁহারা তাঁহাকে চিনিতেন, অনুরাগী সাধক বলিয়া তাঁহাকে তাঁহারা বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিতেন। ঠাকুরের অগ্রজ রামকুমার ভট্টাচার্যের সহিত ইনি পূর্ব হইতে পরিচিত ছিলেন। ঠাকুর ইঁহার নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিতে মনস্থ করিলেন। শুনিয়াছি, দীক্ষাগ্রহণ করিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবেশে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত কেনারাম

তাঁহার অসাধারণ ভক্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ইষ্টলাভবিষয়ে প্রাণ খুলিয়া আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।

রামকুমারের শরীর এখন হইতে অপটু হওয়াতেই হউক, অথবা ঠাকুরকে ঐ কার্যে অভ্যস্ত করাইবার জন্যই হউক, তিনি এই সময়ে

রামকুমারের মৃত্যু

স্বল্পায়াসসাধ্য ৺রাধাগোবিন্দজীর সেবা স্বয়ং সম্পন্ন করিতে এবং শ্রীশ্রীকালীমাতার পূজাকার্যে ঠাকুরকে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন। মথুরবাবু ঐ কথা শ্রবণ করিয়া এবং ঠাকুর এখন ৺দেবীপূজায় পারদর্শী হইয়াছেন জানিয়া রামকুমারকে এখন হইতে বরাবর বিষ্ণুঘরে পূজা করিতে অনুরোধ করিলেন। অতএব এখন হইতে কালীঘরে ঠাকুর পূজকরূপে নিযুক্ত থাকিলেন। বৃদ্ধ রামকুমারের শরীর অপটু হওয়ায় কালীঘরের গুরুতর কার্যভার বহন করা তাঁহার শক্তিতে কুলাইতেছে না—একথা বুঝিয়াই মথুরবাবু ঐরূপে পূজকের পরিবর্তন করিয়াছিলেন। রামকুমারও ঐরূপ বন্দোবস্তে বিশেষ আনন্দিত হইয়া কনিষ্ঠকে ৺দেবীর পূজা ও সেবাকার্য যথাযথ ভাবে সম্পন্ন করিতে শিক্ষাদান-পূর্বক নিশ্চিন্ত হইয়াছিলেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি মথুরবাবুকে বলিয়া হৃদয়কে ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত করিলেন এবং অবসর লইয়া কিছুদিনের জন্য গৃহে ফিরিবার যোগাড় করিতে লাগিলেন। কিন্তু রামকুমারকে আর গৃহে ফিরিতে হয় নাই। গৃহে ফিরিবার বন্দোবস্ত করিতে করিতে কলিকাতার উত্তরে অবস্থিত শ্যামনগর-মূলাজোড় নামক স্থানে তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য কার্যোপলক্ষে গমন করিতে হয় এবং তথায় সহসা মৃত্যুমুখে পতিত হন। রামকুমার ভট্টাচার্য রাণী রাসমণির দেবালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে এক বৎসরকাল মাত্র জীবিত থাকিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৬৩ সালের প্রারম্ভে তাঁহার শরীরত্যাগ হইয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ব্যাকুলতা ও প্রথম দর্শন

অতি অল্প বয়সেই ঠাকুরের পিতার মৃত্যু হয়। সুতরাং বাল্যকাল হইতে তিনি জননী চন্দ্রমণি ও অগ্রজ রামকুমারের স্নেহেই পালিত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অপেক্ষা রামকুমার একত্রিশ বৎসর বড় ছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের পিতৃভক্তির কিয়দংশ তিনি পাইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পিতৃতুল্য অগ্রজের সহসা মৃত্যু হওয়ায় ঠাকুর নিতান্ত ব্যথিত হইয়াছিলেন। কে বলিবে, ঐ ঘটনা তাঁহার শুদ্ধ মনে সংসারের অনিত্যতা-সম্বন্ধীয় ধারণা দৃঢ় করিয়া উহাতে বৈরাগ্যানল কতদূর প্রবৃদ্ধ করিয়াছিল? দেখা যায়, এই সময় হইতে তিনি শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজায় সমধিক মনোনিবেশপূর্বক মানব তাঁহার দর্শনলাভে বাস্তবিক কৃতার্থ হয় কি না, তদ্বিষয় জানিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। পূজান্তে মন্দিরমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে বসিয়া এই সময়ে তিনি তন্ময়চিত্তভাবে দিন যাপন করিতেন এবং রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত-প্রমুখ ভক্তগণরচিত সঙ্গীতসকল ৺দেবীকে শুনাইতে শুনাইতে প্রেমে বিহ্বল ও আত্মহারা হইয়া পড়িতেন। বৃথা বাক্যালাপ করিয়া তিনি এখন তিলমাত্র সময় অপব্যয় করিতেন না এবং রাত্রে মন্দিরদ্বার রুদ্ধ হইলে লোকসঙ্গ পরিহার-পূর্বক পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া জগন্মাতার ধ্যানে কাল-যাপন করিতেন।

ঠাকুরের এই কালের আচরণ

পঞ্চবটি

ঠাকুরের ঐ প্রকার চেষ্টাসমূহ হৃদয়ের প্রীতিকর হইত না। কিন্তু সে কি করিবে? বাল্যকাল হইতে তিনি যখন যাহা ধরিয়াছেন, তখনি তাহা সম্পাদন করিয়াছেন, কেহই তাঁহাকে বাধা দিতে পারে নাই—একথা তাহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং প্রতিবাদ বা বাধা দেওয়া বৃথা। কিন্তু দিন দিন ঠাকুরের ঐ ভাব প্রবল হইতেছে দেখিয়া হৃদয় কখন কখন একটু আধটু না বলিয়াও থাকিতে পারিত না। রাত্রে নিদ্রা না যাইয়া শয্যাত্যাগপূর্বক তিনি পঞ্চবটীতে চলিয়া যান, একথা জানিতে পারিয়া হৃদয় এই সময়ে বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিল। কারণ, মন্দিরে ঠাকুরসেবার পরিশ্রম, তাহার উপর তাঁহার পূর্ববৎ আহার ছিল না, এ অবস্থায় রাত্রে নিদ্রা না যাইলে শরীর ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। হৃদয় স্থির করিল, ঐ বিষয়ের সন্ধান এবং যথাসাধ্য প্রতিবিধান করিতে হইবে।

হৃদয়ের তদ্দর্শনে চিন্তা ও সঙ্কল্প

পঞ্চবটীর পার্শ্বস্থ স্থান তখন এখনকার মত সমতল ছিল না; নীচু জমি, খানাখন্দ ও জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। বুনো গাছগাছড়ার মধ্যে একটি ধাত্রী বা আমলকী বৃক্ষ তথায় জন্মিয়াছিল। একে কবরডাঙ্গা, তাহার উপর জঙ্গল, সেজন্য দিবাভাগেও কেহ ঐ স্থানে বড় একটা যাইত না। যাইলেও জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইত না। আর রাত্রে? ভূতের ভয়ে কেহ ঐ দিক মাড়াইত না। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, পূর্বোক্ত আমলকী বৃক্ষটি নীচু জমিতে থাকায় তাহার তলে কেহ বসিয়া থাকিলে জঙ্গলের বাহিরের উচ্চ জমি হইতে কাহারও নয়নগোচর হইত না। ঠাকুর এই সময়ে উহারই তলে বসিয়া রাত্রে ধ্যানধারণা করিতেন।

ঐ সময়ে পঞ্চবটী-প্রদেশের অবস্থা

রাত্রে ঠাকুর ঐ স্থানে গমন করিতে আরম্ভ করিলে হৃদয় একদিন

অলক্ষ্যে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল এবং তাঁহাকে জঙ্গলমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিতে পাইল। তিনি বিরক্ত হইবেন ভাবিয়া সে আর অগ্রসর হইল না। কিন্তু তাঁহাকে ভয় দেখাইবার নিমিত্ত কিছুক্ষণ পর্যন্ত আশেপাশে ঢিল ছুঁড়িতে থাকিল। তিনি তাহাতেও ফিরিলেন না দেখিয়া অগত্যা সে স্বয়ং গৃহে ফিরিল। পরদিন অবসরকালে সে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "জঙ্গলের ভিতর রাত্রে যাইয়া কি কর বল দেখি?" ঠাকুর বলিলেন, "ঐ স্থানে একটা আমলকী গাছ আছে, তাহার তলায় বসিয়া ধ্যান করি; শাস্ত্রে বলে, আমলকী গাছের তলায় যে যাহা কামনা করিয়া ধ্যান করে, তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়।"

হৃদয়ের প্রশ্ন—রাত্রে জঙ্গলে যাইয়া কি কর?

ঐ ঘটনার পরে কয়েক দিন ঠাকুর পূর্বোক্ত আমলকী বৃক্ষের তলায় ধ্যানধারণা করিতে বসিলেই মধ্যে মধ্যে লোষ্ট্রাদি নিক্ষিপ্ত হওয়া প্রভৃতি নানাবিধ উৎপাত হইতে লাগিল। উহা হৃদয়ের কর্ম বুঝিয়াও তিনি তাহাকে কিছুই বলিলেন না। হৃদয় কিন্তু ভয় দেখাইয়া তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া আর স্থির থাকিতে পারিল না। একদিন ঠাকুর বৃক্ষতলে যাইবার কিছুক্ষণ পরে নিঃশব্দে জঙ্গল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দূর হইতে দেখিল, তিনি পরিধেয় বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্র ত্যাগ করিয়া সুখাসীন হইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন। দেখিয়া ভাবিল, 'মামা কি পাগল হইল নাকি? এরূপ ত পাগলেই করে; ধ্যান করিবে, কর; কিন্তু এরূপ উলঙ্গ হইয়া কেন?' ঐরূপ ভাবিয়া সে সহসা তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "এ কি হচ্ছে? পৈতে কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে বসেছ যে?" কয়েকবার ডাকাডাকির পরে ঠাকুরের

ঠাকুরকে হৃদয়ের ভয় দেখাইবার চেষ্টা

চৈতন্য হইল এবং হৃদয়কে নিকটে দাঁড়াইয়া ঐরূপ প্রশ্ন করিতে শুনিয়া বলিলেন, "তুই কি জানিস? এইরূপে পাশমুক্ত হয়ে ধ্যান করতে হয়; জন্মাবধি মানুষ ঘৃণা, লজ্জা, কুল, শীল, ভয়, মান, জাতি ও অভিমান—এই অষ্ট পাশে বদ্ধ হয়ে রয়েছে, পৈতেগাছটাও 'আমি ব্রাহ্মণ, সকলের চেয়ে বড়'—এই অভিমানের চিহ্ন এবং একটা পাশ; মাকে ডাকতে হলে ঐসব পাশ ফেলে দিয়ে এক মনে ডাকতে হয়, তাই ঐসব খুলে রেখেছি, ধ্যান করা শেষ হলে ফিরিবার সময় আবার পরব।"

হৃদয়কে ঠাকুরের বলা—'পাশমুক্ত' হইয়া ধ্যান করিতে হয়

হৃদয় ঐরূপ কথা পূর্বে আর কখন শুনে নাই, সুতরাং অবাক্ হইয়া রহিল এবং উত্তরে কিছুই বলিতে না পারিয়া সেস্থান হইতে প্রস্থান করিল। ইতিপূর্বে সে ভাবিয়াছিল মাতুলকে অনেক কথা অদ্য বুঝাইয়া বলিবে ও তিরস্কার করিবে—তাহার কিছুই করা হইল না।

পূর্বোক্ত ঘটনাপ্রসঙ্গে একটি কথা এখানে বলিয়া রাখা ভাল। কারণ, উহা জানা থাকিলে ঠাকুরের জীবনের পরবর্তী অনেকগুলি ঘটনা আমরা সহজে বুঝিতে পারিব। আমরা দেখিলাম, অষ্টপাশের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য কেবলমাত্র মনে মনে ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়াই ঠাকুর নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই; কিন্তু স্থূলভাবেও ঐ সকলকে যতদূর ত্যাগ করা যাইতে পারে, তাহা করিয়াছিলেন। পরজীবনে অন্য সকল বিষয়েও তাঁহাকে ঐরূপ করিতে আমরা দেখিতে পাই। যথা—

শরীর এবং মন উভয়ের দ্বারা ঠাকুরের অষ্টাভিমাননাশের, 'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' হইবার ও সর্বজীবে শিবজ্ঞানলাভের জন্য অনুষ্ঠান

অভিমান নাশ করিয়া মনে যথার্থ দীনতা আনয়নের জন্য তিনি,

অপরে যে স্থানকে অশুদ্ধ ভাবিয়া সর্বথা পরিহার করে, সে স্থান বহু প্রযত্নে স্বহস্তে পরিষ্কৃত করিয়াছিলেন।

'সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চন' না হইলে অর্থাৎ ইতরসাধারণের নিকট বহুমূল্য বলিয়া পরিগণিত স্বর্ণাদি ধাতু ও প্রস্তরসকলকে উপলখণ্ডের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিতে না পারিলে, মানব-মন শারীরিক ভোগসুখেচ্ছা হইতে আপনাকে বিযুক্ত করিয়া ঈশ্বরাভিমুখে সম্পূর্ণ ধাবিত হয় না এবং যোগারূঢ় হইতে পারে না—একথা শুনিয়াই ঠাকুর কয়েক খণ্ড মুদ্রা ও লোষ্ট্র হস্তে গ্রহণ করিয়া বারংবার 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' বলিতে বলিতে উহা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

সর্বজীবে শিবজ্ঞান দৃঢ় করিবার জন্য কালীবাটীতে কাঙ্গালীদের ভোজন সাঙ্গ হইলে তাহাদের উচ্ছিষ্টান্ন তিনি দেবতার প্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ (ভক্ষণ) ও মস্তকে ধারণ করিয়াছিলেন। পরে, উচ্ছিষ্ট পত্রাদি মস্তকে বহন করিয়া গঙ্গাতীরে নিক্ষেপপূর্বক স্বহস্তে মার্জনী ধরিয়া ঐ স্থান ধৌত করিয়াছিলেন এবং নিজ নশ্বর শরীরের দ্বারা ঐরূপে দেবসেবা যৎকিঞ্চিৎ সাধিত হইল ভাবিয়া আপনাকে কৃতার্থম্মন্য জ্ঞান করিয়াছিলেন।

ঐরূপ নানা ঘটনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। সকল স্থলেই দেখা যায়, ঈশ্বরলাভের পথে প্রতিকূল বিষয়সকলকে কেবলমাত্র মনে মনে ত্যাগ করিয়া তিনি নিশ্চিন্ত থাকিতেন না। কিন্তু স্থূলভাবে ঐ সকলকে প্রথমে ত্যাগ করিয়া অথবা নিজ শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গকে ঐ সকল বিষয় হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিয়া তদ্বিপরীত অনুষ্ঠানসকল করিতে তিনি উহাদিগকে বলপূর্বক নিয়োজিত করিতেন। দেখা যায়, ঐরূপ অনুষ্ঠানে তাঁহার মনের পূর্ব সংস্কারসকল এককালে উৎসন্ন হইয়া যাইত এবং

তদ্বিপরীত নবীন সংস্কার সকলকে উহা এমন দৃঢ়ভাবে ধারণ করিত যে, কখনই সে আর অন্য ভাব আশ্রয় করিয়া কার্য করিতে পারিত না। ঐরূপে কোন নবীন ভাব মনের দ্বারা প্রথম গৃহীত হইয়া শরীরেন্দ্রিয়াদিসহায়ে কার্যে কিঞ্চিন্মাত্রও যতক্ষণ না অনুষ্ঠিত হইত, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐ বিষয়ের যথাযথ ধারণা হইয়া উহার বিপরীত ভাবের ত্যাগ হইয়াছে, একথা তিনি স্বীকার করিতেন না।

ঠাকুরের ত্যাগের ক্রম

পূর্ব সংস্কারসমূহ ত্যাগ করিতে নিতান্ত পরাঙ্মুখ আমরা ভাবি, ঠাকুরের ঐরূপ আচরণের কিছুমাত্র আবশ্যকতা ছিল না। তাঁহার ঐরূপ আচরণসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া কেহ কেহ বলিয়া বসিয়াছেন—"অপবিত্র কদর্য স্থান পরিষ্কৃত করা, 'টাকা মাটি মাটি টাকা' বলিয়া মৃত্তিকাসহ মুদ্রাখণ্ডসকল গঙ্গায় ফেলিয়া দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী তাঁহার নিজ মনঃকল্পিত সাধনপথ বলিয়া বোধ হইয়া থাকে; কিন্তু ঐরূপ অদৃষ্টপূর্ব উপায়সকল অবলম্বনে তিনি মনের উপর যে কর্তৃত্বলাভ করিয়াছিলেন তাহা অতি শীঘ্রই তদপেক্ষা সহজ উপায়ে পাওয়া যাইতে পারে।"* উত্তরে বলিতে হয়—উত্তম কথা, কিন্তু ঐরূপ বাহ্য অনুষ্ঠানসকল না করিয়া কেবলমাত্র মনে মনে বিষয়-ত্যাগকরারূপ তোমাদের তথাকথিত সহজ উপায়ের অবলম্বনে কয়জন লোক এ পর্যন্ত পূর্ণভাবে রূপরসাদি বিষয়সমূহ হইতে বিমুখ হইয়া যোল-

ঐ ক্রম সম্বন্ধে 'মনঃকল্পিত সাধন-পথ' বলিয়া আপত্তি ও তাহার মীমাংসা

* ৺শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের লিখিত—'Personal Reminiscences of Ramakrishna Paramahamsa.' Vide 'Modern Review' for November, 1910.

আনা মন ঈশ্বরে অর্পণ করিতে সক্ষম হইয়াছে? উহা কখনই হইবার নহে। মন একরূপ চিন্তা করিয়া একদিকে চলিবে, এবং শরীর ঐ চিন্তা বা ভাবের বিপরীত কার্যানুষ্ঠান করিয়া অন্য পথে চলিবে—এই প্রকারে কোন মহৎ কার্যেই সিদ্ধিলাভ করা যায় না, ঈশ্বরলাভ তো দূরের কথা! কিন্তু রূপরসাদিভোগলোলুপ মানব ঐ কথা বোঝে না। কোন বিষয় ত্যাগ করা ভাল বলিয়া বুঝিয়াও সে পূর্বসংস্কারবশে নিজ শরীরেন্দ্রিয়াদির দ্বারা উহা ত্যাগ করিতে অগ্রসর হয় না এবং ভাবিতে থাকে, 'শরীর যেরূপ কার্য করুক না কেন, মনে তো আমি অন্যরূপ ভাবিতেছি!' যোগ ও ভোগ একত্রে গ্রহণ করিবে ভাবিয়া সে আপনাকে আপনি ঐরূপে প্রতারিত করিয়া থাকে। কিন্তু আলোকান্ধকারের ন্যায় যোগ ও ভোগরূপ দুই পদার্থ কখনও একত্রে থাকিতে পারে না। কাম-কাঞ্চনময় সংসার ও ঈশ্বরের সেবা যাহাতে একত্রে একই কালে সম্পন্ন করিতে পারা যায়, এরূপ সহজ পথের আবিষ্কার আধ্যাত্মিক জগতে এ পর্যন্ত কেহই করিতে পারেন নাই।* শাস্ত্র সেজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেছেন, 'যাহা ত্যাগ করিতে হইবে, তাহা কায়মনোবাক্যে ত্যাগ করিতে হইবে এবং যাহা গ্রহণ করিতে হইবে তাহাও ঐরূপ কায়মনোবাক্যে গ্রহণ করিতে হইবে, তবেই সাধক ঈশ্বরলাভের অধিকারী হইবেন।' ঋষিগণ সেজন্যই বলিয়াছেন, মানসিক ভাবোদ্দীপক শারীরিক চিহ্ন ও অনুষ্ঠানরহিত তপস্যাসহায়ে—'তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ'—মানব কখন আত্মসাক্ষাৎকারলাভে সমর্থ হয় না। যুক্তিও বলে, স্থূল হইতে সূক্ষ্ম এবং সূক্ষ্ম হইতে কারণে মানবমন ক্রমশঃ অগ্রসর হয়—'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।'

আমরা বলিয়াছি, অগ্রজের মৃত্যুর পর ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায়

* Ye cannot serve God and Mammon together.—Holy Bible.

অধিকতর মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য যাহাই অনুকূল বলিয়া বুঝিতেছিলেন, তাহাই বিশ্বস্তচিত্তে ব্যগ্র হইয়া সম্পন্ন করিতেছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে যথারীতি পূজাসমাপনান্তে ৺দেবীকে নিত্য রামপ্রসাদ-প্রমুখ সিদ্ধ ভক্তদিগের রচিত সঙ্গীতসমূহ শ্রবণ করান তিনি পূজার অঙ্গবিশেষ বলিয়া গণ্য করিতেন। হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাসপূর্ণ ঐ সকল গীত গাহিতে গাহিতে তাঁহার চিত্ত উৎসাহপূর্ণ হইয়া উঠিত। ভাবিতেন—রামপ্রসাদ-প্রমুখ ভক্তেরা মার দর্শন পাইয়াছিলেন; জগজ্জননীর দর্শন তবে নিশ্চয়ই পাওয়া যায়; আমি কেন তবে তাঁহার দর্শন পাইব না? ব্যাকুলহৃদয়ে বলিতেন—"মা, তুই রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস্, আমায় কেন তবে দেখা দিবি না? আমি ধন, জন ভোগসুখ কিছুই চাহি না, আমায় দেখা দে।" ঐরূপ প্রার্থনা করিতে করিতে নয়নধারায় তাঁহার বক্ষ ভাসিয়া যাইত এবং উহাতে হৃদয়ের ভার কিঞ্চিৎ লঘু হইলে বিশ্বাসের মুগ্ধ প্রেরণায় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া পুনরায় গীত গাহিয়া তিনি ৺দেবীকে প্রসন্না করিতে উদ্যত হইতেন। এইরূপে পূজা, ধ্যান ও ভজনে দিন যাইতে লাগিল এবং ঠাকুরের মনের অনুরাগ ও ব্যাকুলতা দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল।

ঠাকুর এই সময়ে যে ভাবে পূজাদি করিতেন

দেবীর পূজা ও সেবা সম্পন্ন করিবার নির্দিষ্ট কালও এই সময় হইতে তাঁহার দিন দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। পূজা করিতে বসিয়া তিনি যথাবিধি নিজ মস্তকে একটি পুষ্প দিয়াই হয়ত দুই ঘণ্টা কাল স্থাণুর ন্যায় স্পন্দহীনভাবে ধ্যানস্থ রহিলেন; অন্নাদি নিবেদন করিয়া, মা খাইতেছেন ভাবিতে ভাবিতেই হয়ত বহুক্ষণ কাটাইলেন, প্রত্যূষে স্বহস্তে পুষ্পচয়ন

করিয়া মালা গাঁথিয়া ৺দেবীকে সাজাইতে কত সময় ব্যয় করিলেন, অথবা অনুরাগপূর্ণ হৃদয়ে সন্ধ্যারতিতেই বহুক্ষণ ব্যাপৃত রহিলেন! আবার অপরাহ্ণে জগন্মাতাকে যদি গান শুনাইতে আরম্ভ করিলেন, তবে এমন তন্ময় ও ভাববিহ্বল হইয়া পড়িলেন যে, সময় অতীত হইতেছে একথা বারংবার স্মরণ করাইয়া দিয়াও তাঁহাকে আরাত্রিকাদি কর্মসম্পাদনের সময়ে নিযুক্ত করিতে পারা গেল না! —এইরূপে কিছুকাল পূজা চলিতে লাগিল।

ঐরূপ নিষ্ঠা, ভক্তি ও ব্যাকুলতা দেখিয়া ঠাকুরবাটীর জনসাধারণের দৃষ্টি যে এখন ঠাকুরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা বেশ বুঝা যায়।

ঠাকুরের এইকালে পূজাদি কার্য সম্বন্ধে মথুর-প্রমুখ সকলে যাহা ভাবিত

সাধারণে সচরাচর যে পথে চলিয়া থাকে, তাহা ছাড়িয়া নূতনভাবে কাহাকেও চলিতে বা কিছু করিতে দেখিলে লোকে প্রথম বিদ্রূপ পরিহাসাদি করিয়া থাকে। কিন্তু দিনের পর যত দিন যাইতে থাকে এবং ঐ ব্যক্তি দৃঢ়তাসহকারে নিজ গন্তব্য পথে যত অগ্রসর হয়, ততই সাধারণের মনে পূর্বোক্ত ভাব পরিবর্তিত হইয়া উহার স্থল শ্রদ্ধা আসিয়া অধিকার করে। ঠাকুরের এই সময়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে ঐরূপ হইয়াছিল। কিছুদিন ঐরূপে পূজা করিতে না করিতে তিনি প্রথমে অনেকের বিদ্রূপভাজন হইলেন। কিছুকাল পরে কেহ কেহ আবার তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিল। শুনা যায়, মথুরবাবু এই সময়ে ঠাকুরের পূজাদি দেখিয়া হৃষ্টচিত্তে রাণী রাসমণিকে বলিয়াছিলেন, "অদ্ভুত পূজক পাওয়া গিয়াছে, ৺দেবী বোধ হয় শীঘ্রই জাগ্রতা হইয়া উঠিবেন!" লোকের ঐরূপ মতামতে ঠাকুর কিন্তু কোনদিন নিজ গন্তব্য পথ হইতে বিচলিত হন নাই। সাগরগামিনী নদীর ন্যায় তাঁহার মন এখন হইতে অবিরাম একভাবেই শ্রীশ্রীজগন্মাতার শ্রীপাদোদ্দেশে ধাবিত হইয়াছিল।

দিনের পর যত দিন যাইতে লাগিল, ঠাকুরের মনে অনুরাগ, ব্যাকুলতাও তত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল এবং মনের ঐপ্রকার অবিরাম একদিকে গতি তাঁহার শরীরে নানাপ্রকার বাহ্য লক্ষণে প্রকাশ পাইতে লাগিল। ঠাকুরের আহার এবং নিদ্রা কমিয়া গেল। শরীরের রক্ত-প্রবাহ বক্ষে ও মস্তিষ্কে নিরন্তর দ্রুত প্রধাবিত হওয়ায়, বক্ষঃস্থল সর্বদা আরক্তিম হইয়া রহিল, চক্ষু মধ্যে মধ্যে সহসা জলভারাক্রান্ত হইতে লাগিল, এবং ভগবদ্দর্শনের জন্য একান্ত ব্যাকুলতা-বশতঃ 'কি করিব, কেমনে পাইব' এইরূপ একটা চিন্তা নিরন্তর পোষণ করায় ধ্যানপূজাদির কাল ভিন্ন অন্য সময়ে তাঁহার শরীরে একটা অশান্তি ও চাঞ্চল্যের ভাব লক্ষিত হইতে লাগিল।

ঈশ্বরানুরাগের বৃদ্ধিতে ঠাকুরের শরীরে যে-সকল বিকার উপস্থিত হয়

তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন তিনি জগদম্বাকে গান শুনাইতেছিলেন এবং তাঁহার দর্শনলাভের জন্য নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া প্রার্থনা ও ক্রন্দন করিতেছিলেন। বলিতেছিলেন, "মা, এত যে ডাকছি, তার কিছুই তুই কি শুনছিস না? রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিস, আমাকে কি দেখা দিবি না?" তিনি বলিতেন—

"মার দেখা পাইলাম না বলিয়া তখন হৃদয়ে অসহ্য যন্ত্রণা; জলশূন্য করিবার জন্য লোক যেমন সজোরে গামছা নিঙড়াইয়া থাকে, মনে হইল হৃদয়টাকে ধরিয়া কে যেন তদ্রূপ করিতেছে! মার দেখা বোধ হয় কোনকালেই পাইব না ভাবিয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে লাগিলাম। অস্থির হইয়া ভাবিলাম, তবে আর এ জীবনে আবশ্যক নাই। মার ঘরে যে অসি ছিল, দৃষ্টি সহসা তাহার উপর পড়িল। এই দণ্ডেই

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথম দর্শনলাভের বিবরণ: ঠাকুরের ঐ সময়ের ব্যাকুলতা

জীবনের অবসান করিব ভাবিয়া উন্মত্তপ্রায় ছুটিয়া উহা ধরিতেছি, এমন সময়ে সহসা মার অদ্ভুত দর্শন পাইলাম ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম! তাহার পর বাহিরে কি যে হইয়াছে, কোন্ দিক দিয়া সেদিন ও তৎপরদিন যে গিয়াছে, তাহার কিছুই জানিতে পারি নাই! অন্তরে কিন্তু একটা অননুভূতপূর্ব জমাট-বাঁধা আনন্দের স্রোত প্রবাহিত ছিল এবং মার সাক্ষাৎ প্রকাশ উপলব্ধি করিয়াছিলাম!"

পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের কথা ঠাকুর অন্য একদিন আমাদিগকে এইরূপে বিবৃত করিয়া বলেন, "ঘর, দ্বার, মন্দির সব যেন কোথায় লুপ্ত হইল—কোথাও যেন আর কিছুই নাই! আর দেখিতেছি কি, এক অসীম অনন্ত চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্র!—যেদিকে যতদূর দেখি, চারিদিক হইতে তার উজ্জ্বল উর্মিমালা তর্জন গর্জন করিয়া গ্রাস করিবার জন্য মহাবেগে অগ্রসর হইতেছে! দেখিতে দেখিতে উহারা আমার উপর নিপতিত হইল এবং আমাকে এককালে কোথায় তলাইয়া দিল! হাঁপাইয়া হাবুডুবু খাইয়া সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া গেলাম!" ঐরূপে প্রথম দর্শনকালে তিনি চেতন জ্যোতিঃ-সমুদ্রের দর্শনলাভের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। কিন্তু চৈতন্য-ঘন জগদম্বার বরাভয়করা মূর্তি ?—ঠাকুর কি এখন তাঁহারও দর্শন এই জ্যোতিঃ-সমুদ্রের মধ্যে পাইয়াছিলেন? পাইয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয়, কারণ শুনিয়াছি; প্রথম দর্শনের সময়ে তাঁহার কিছুমাত্র সংজ্ঞা যখন হইয়াছিল, তখন তিনি কাতরকণ্ঠে 'মা', 'মা' শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত দর্শনের বিরাম হইলে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী মূর্তির অবাধ অবিরাম দর্শনলাভের জন্য ঠাকুরের প্রাণে একটা অবিশ্রান্ত আকুল ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছিল। ক্রন্দনাদি বাহ্যলক্ষণে সকল সময়ে প্রকাশিত

না হইলেও উহা অন্তরে সর্বদা বিদ্যমান থাকিত এবং কখন কখন এত বৃদ্ধি পাইত যে, আর চাপিতে না পারিয়া ভূমিতে লুটাইয়া যন্ত্রণায় ছটফট করিতে করিতে 'মা, আমায় কৃপা কর, দেখা দে' বলিয়া এমন ক্রন্দন করিতেন যে, চারিপার্শ্বে লোক দাঁড়াইয়া যাইত! ঐরূপ অস্থির চেষ্টায় লোকে কি বলিবে, এ কথার বিন্দুমাত্রও তখন তাঁহার মনে আসিত না। বলিতেন, "চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া থাকিলেও তাহাদিগকে ছায়া বা ছবিতে আঁকা মূর্তির ন্যায় অবাস্তব মনে হইত এবং তজ্জন্য মনে কিছুমাত্র লজ্জা বা সঙ্কোচের উদয় হইত না! ঐরূপ অসহ্য যন্ত্রণায় সময়ে সময়ে বাহ্যসংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িতাম এবং ঐরূপ হইবার পরেই দেখিতাম, মার বরাভয়করা চিন্ময়ী মূর্তি!—দেখিতাম ঐ মূর্তি হাসিতেছে, কথা কহিতেছে, অশেষ প্রকারে সান্ত্বনা ও শিক্ষা দিতেছে!"

সপ্তম অধ্যায়

সাধনা ও দিব্যোন্মত্ততা

শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রথমদর্শন লাভের আনন্দে ঠাকুর কয়েক দিনের জন্য একেবারে কাজের বাহির হইয়া পড়িলেন। পূজাদি মন্দিরের কার্যসকল নিয়মিতভাবে সম্পন্ন করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইয়া উঠিল। হৃদয় উহা অন্য এক ব্রাহ্মণের সহায়ে কোনরূপে সম্পাদন করিতে লাগিল এবং মাতুল বায়ুরোগগ্রস্ত হইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার চিকিৎসায় মনোনিবেশ করিল। ভূকৈলাসের রাজবাটীতে নিযুক্ত এক সুযোগ্য বৈদ্যের সহিত ইতিপূর্বে কোনও সূত্রে তাহার পরিচয় হইয়াছিল; হৃদয় এখন তাঁহারই দ্বারা ঠাকুরের চিকিৎসা করাইতে লাগিল এবং রোগের শীঘ্র উপশমের সম্ভাবনা না দেখিয়া কামারপুকুরে সংবাদ পাঠাইল।

প্রথম দর্শনের পরের অবস্থা

ভগবদ্দর্শনের জন্য উদ্দাম ব্যাকুলতায় ঠাকুর যেদিন একেবারে অস্থির বা বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া না পড়িতেন, সেদিন পূর্বের ন্যায় পূজা করিতে অগ্রসর হইতেন। পূজা ও ধ্যানাদি করিবার কালে ঐ সময়ে তাঁহার যেরূপ চিন্তা ও অনুভব উপস্থিত হইত, তদ্বিষয়ে তিনি আমাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে কখন কখন কিছু কিছু বলিয়াছিলেন। "মার নাট-মন্দিরের ছাদের আলিসায় যে ধ্যানস্থ ভৈরবমূর্তি আছে, ধ্যান করিতে যাইবার সময় তাঁহাকে দেখাইয়া মনকে বলিতাম, 'ঐরূপ স্থির নিস্পন্দভাবে

ঠাকুরের ঐ সময়ের শারীরিক ও মানসিক প্রত্যক্ষ এবং দর্শনাদি

বসিয়া মার পাদপদ্ম চিন্তা করিতে হইবে।' ধ্যান করিতে বসিবামাত্র শুনিতে পাইতাম, শরীর ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গ্রন্থিসকলে, পায়ের দিক হইতে উর্দ্ধে খটখট করিয়া শব্দ হইতেছে এবং একটার পর একটা করিয়া গ্রন্থিগুলি আবদ্ধ হইয়া যাইতেছে—কে যেন ভিতরে ঐ সকল স্থান তালাবদ্ধ করিয়া দিতেছে! যতক্ষণ ধ্যান করিতাম ততক্ষণ শরীর যে একটুও নাড়িয়া চাড়িয়া আসন পরিবর্তন করিয়া লইব অথবা ইচ্ছামাত্রেই ধ্যান ছাড়িয়া অন্যত্র গমন করিব বা অন্য কর্মে নিযুক্ত হইব, তাহার সামর্থ্য থাকিত না! পূর্ববৎ খটখট শব্দ করিয়া—এবার উপরের দিক হইতে পা পর্যন্ত—ঐ সকল গ্রন্থি পুনরায় যতক্ষণ না খুলিয়া যাইত, ততক্ষণ কে যেন একভাবে জোর করিয়া বসাইয়া রাখিত! ধ্যান করিতে বসিয়া প্রথম প্রথম খদ্যোৎপুঞ্জের ন্যায় জ্যোতির্বিন্দুসমূহ দেখিতে পাইতাম; কখনও বা কুয়াসার ন্যায় পুঞ্জ পুঞ্জ জ্যোতিঃতে চতুর্দিক ব্যাপ্ত দেখিতাম; আবার কখনও বা গলিত রূপার ন্যায় উজ্জ্বল জ্যোতিঃ-তরঙ্গে সমুদয় পদার্থ পরিব্যাপ্ত দেখিতাম। চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ঐরূপ দেখিতাম; আবার অনেক সময় চক্ষু চাহিয়াও ঐরূপ দেখিতে পাইতাম। কি দেখিতেছি তাহা বুঝিতাম না, ঐরূপ দর্শন হওয়া ভাল কি মন্দ তাহাও জানিতাম না; সুতরাং মার (৺জগন্মাতার) নিকট ব্যাকুলহৃদয়ে প্রার্থনা করিতাম —'মা, আমার কি হচ্চে, কিছুই বুঝি না; তোকে ডাকবার মন্ত্র তন্ত্র কিছুই জানি না; যাহা করলে তোকে পাওয়া যায়, তুই-ই তাহা আমাকে শিখিয়ে দে। তুই না শিখালে কে আর আমাকে শিখাবে, মা; তুই ছাড়া আমার গতি বা সহায় আর কেহই যে নাই!' একমনে ঐরূপে প্রার্থনা করিতাম এবং প্রাণের ব্যাকুলতায় ক্রন্দন করিতাম!"

ঠাকুরের পূজাধ্যানাদি এই সময়ে এক অভিনব আকার ধারণ করিয়াছিল। সেই অদ্ভুত তন্ময়ভাব, শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে আশ্রয় করিয়া সেই বালকের ন্যায় সরল বিশ্বাস ও নির্ভরের মাধুর্য অপরকে বুঝান কঠিন। প্রবীণের গাম্ভীর্য, পুরুষকার-অবলম্বনে দেশকালপাত্রভেদে বিধিনিষেধ মানিয়া চলা অথবা ভবিষ্যৎ ভাবিয়া সকল দিক বজায় রাখিয়া ব্যবহার করা ইত্যাদির কিছুই উহাতে লক্ষিত হইত না। দেখিলে মনে হইত, 'মা, তোর শরণাগত বালককে যাহা বলিতে ও করিতে হইবে, তাহা তুই-ই বলা ও করা'—সর্বান্তঃকরণে ঐরূপ ভাব আশ্রয়পূর্বক ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছার ভিতর আপনার ক্ষুদ্র ইচ্ছা ও অভিমানকে ডুবাইয়া দিয়া এককালে যন্ত্রস্বরূপ হইয়াই যেন তিনি যতকিছু কার্য এখন করিতেছেন। উহাতে মানবসাধারণের বিশ্বাস ও কার্যকলাপের সহিত তাঁহার ব্যবহার-চেষ্টাদির বিশেষ বিরোধ উপস্থিত হইয়া, নানা লোকে নানা কথা প্রথম অস্ফুট জল্পনায়, পরে উচ্চস্বরে বলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ হইলে কি হইবে? জগদম্বার বালক এখন তাঁহারই অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে যাহা করিবার করিতেছিল, ক্ষুব্ধ সংসারের বৃথা কোলাহল তাঁহার কর্ণে এখন কিছুমাত্র প্রবিষ্ট হইতেছিল না! সে এখন সংসারে থাকিয়াও সংসারে ছিল না। বহির্জগৎ এখন তাহার নিকট স্বপ্নরাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; চেষ্টা করিয়াও উহাতে সে আর পূর্বের ন্যায় বাস্তবতা আনিতে পারিতেছিল না এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার চিন্ময়ী আনন্দঘনমূর্তিই এখন তাহার নিকটে একমাত্র সার পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছিল।

প্রথম দর্শনলাভে ঠাকুরের প্রত্যেক চেষ্টায় ও ভাবে কিরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হয়

পূজা ধ্যানাদি করিতে বসিয়া ঠাকুর ইতিপূর্বে কোনদিন দেখিতেন

মার হাতখানি, বা কমলোজ্জ্বল পাখানি, বা 'সৌম্যাৎসৌম্য' হাস্যদীপ্ত স্নিগ্ধ চন্দ্রমুখখানি—এখন পূজাধ্যানকাল ভিন্ন অন্য সময়েও দেখিতে পাইতেন সর্বাবয়বসম্পন্না জ্যোতির্ময়ী মা হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন, 'এটা কর্, ওটা করিস্ না' বলিয়া তাঁহার সঙ্গে ফিরিতেছেন।

ঠাকুরের ইতিপূর্বের পূজা ও দর্শনাদির সহিত এই সময়ের ঐ সকলের প্রভেদ

পূর্বে মাকে অন্নাদি নিবেদন করিয়া দেখিতেন, মার নয়ন হইতে অপূর্ব জ্যোতিঃরশ্মি লকলক করিয়া নির্গত হইয়া নিবেদিত আহার্যসমুদয় স্পর্শ ও তাহার সারভাগ সংগ্রহ করিয়া পুনরায় নয়নে সংহৃত হইতেছে!" এখন দেখিতে পাইতেন, ভোগ নিবেদন করিয়া দিবা মাত্র এবং কখন কখন দিবার পূর্বেই মা শ্রীঅঙ্গের প্রভায় মন্দির আলো করিয়া সাক্ষাৎ খাইতে বসিয়াছেন! হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, পূজাকালে একদিন সে সহসা উপস্থিত হইয়া দেখে ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে জবাবিল্বার্ঘ্য দিবেন বলিয়া উহা হস্তে লইয়া তন্ময় হইয়া চিন্তা করিতে করিতে সহসা 'রোস্, রোস্, আগে মন্ত্রটা বলি, তার পর খাস্' বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন এবং পূজা সম্পূর্ণ না করিয়া অগ্রেই নৈবেদ্য নিবেদন করিয়া দিলেন।

পূর্বে ধ্যানপূজাদিকালে দেখিতেন, সম্মুখস্থ পাষাণময়ী মূর্তিতে এক জীবন্ত জাগ্রত অধিষ্ঠান আবির্ভূত হইয়াছে—এখন মন্দিরে প্রবিষ্ট হইয়া পাষাণময়ীকে আর দেখিতেই পাইতেন না। দেখিতেন, যাঁহার চৈতন্যে সমগ্র জগৎ সচেতন হইয়া রহিয়াছে, তিনিই চিদ্‌ঘন মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক বরাভয়কর-সুশোভিতা হইয়া তথায় সর্বদা বিরাজিতা! ঠাকুর বলিতেন, "নাসিকায় হাত দিয়া দেখিয়াছি, মা সত্যসত্যই নিঃশ্বাস ফেলিতেছেন। তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াও রাত্রিকালে দীপালোকে মন্দিরদেউলে মার দিব্যাঙ্গের ছায়া কখন পতিত হইতে দেখি নাই। আপন কক্ষে বসিয়া

শুনিয়াছি, মা পাইজর পরিয়া বালিকার মত আনন্দিতা হইয়া ঝমঝম শব্দ করিতে করিতে মন্দিরের উপর তলায় উঠিতেছেন। দ্রুতপদে কক্ষের বাহিরে আসিয়া দেখিয়াছি, সত্যসত্যই মা মন্দিরে দ্বিতলের বারান্দায় আলুলায়িতকেশে দাঁড়াইয়া কখন কলিকাতা এবং কখন গঙ্গা দর্শন করিতেছেন।

ঠাকুরের এই সময়ের পূজাদি সম্বন্ধে হৃদয়ের কথা

হৃদয় বলিত, "ঠাকুর যখন শ্রীমন্দিরে থাকিতেন তখন তো কথাই নাই, অন্য সময়েও এখন কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলে এক অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ অনুভূত হইয়া গা 'ছমছম' করিত। পূজাকালে ঠাকুর কিরূপ ব্যবহার করেন, তাহা দেখিবার প্রলোভন ছাড়িতে পারিতাম না। অনেক সময়ে সহসা তথায় উপস্থিত হইয়া যাহা দেখিতাম, তাহাতে বিস্ময়ভক্তিতে অন্তর পূর্ণ হইত। বাহিরে আসিয়া কিন্তু মনে সন্দেহ হইত। ভাবিতাম, মামা কি সত্যসত্যই পাগল হইলেন? নতুবা পূজাকালে এরূপ ব্যবহার করেন কেন? রাণীমাতা ও মথুরবাবু এইরূপ পূজার কথা জানিতে পারিলে কি মনে করিবেন, ভাবিয়া বিষম ভয়ও হইত। মামার কিন্তু ঐরূপ কথা একবারও মনে আসিত না এবং বলিলেও তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। অধিক কথাও তাঁহাকে এখন বলিতে পারিতাম না; একটা অব্যক্ত ভয় ও সঙ্কোচ আসিয়া মুখ চাপিয়া ধরিত এবং তাঁহার ও আমার মধ্যে একটা অনির্বচনীয় দূরত্বের ব্যবধান অনুভব করিতাম। অগত্যা নীরবে তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতাম। মনে কিন্তু হইত, মামা ঐরূপে কোনদিন একটা কাণ্ড না বাধাইয়া বসেন!"

পূজাকালে মন্দির-মধ্যে সহসা উপস্থিত হইয়া ঠাকুরের যেসকল চেষ্টা

দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়, ভয় ও ভক্তি যুগপৎ উপস্থিত হইত, তৎসম্বন্ধে সে আমাদিগকে এইরূপে বলিয়াছিল—

"দেখিতাম, অর্ঘ্যাবিধার্ঘ্য সাজাইয়া মামা প্রথমতঃ উহা দ্বারা নিজ মস্তক, বক্ষ, সর্বাঙ্গ, এমন কি নিজ পদ পর্যন্ত স্পর্শ করিয়া পরে উহা জগদম্বার পাদপদ্মে অর্পণ করিলেন।

"দেখিতাম, মাতালের ন্যায় তাঁহার বক্ষ ও চক্ষু আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে এবং তদবস্থায় টলিতে টলিতে পূজাসন ত্যাগ করিয়া সিংহাসনের উপর উঠিয়া সস্নেহে জগদম্বার চিবুক ধরিয়া আদর, গান পরিহাস বা কথোপকথন করিতে লাগিলেন, অথবা শ্রীমূর্তির হাত ধরিয়া নৃত্য করিতেই আরম্ভ করিলেন!

"দেখিতাম, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে অন্নাদি ভোগনিবেদন করিতে করিতে তিনি সহসা উঠিয়া পড়িলেন এবং থালা হইতে এক গ্রাস অন্নব্যঞ্জন লইয়া দ্রুতপদে সিংহাসনে উঠিয়া মার মুখে স্পর্শ করাইয়া বলিতে লাগিলেন—'খা, মা খা! বেশ করে খা!' পরে হয়ত বলিলেন, "আমি খাব? আচ্ছা, খাচ্ছি!'—এই বলিয়া উহার কিয়দংশ নিজে গ্রহণ করিয়া অবশিষ্টাংশ পুনরায় মার মুখে দিয়া বলিতে লাগিলেন, 'আমি ত খেয়েছি, এইবার তুই খা!'

"একদিন দেখি, ভোগনিবেদন করিবার সময় একটা বিড়ালকে কালীঘরে ঢুকিয়া ম্যাও ম্যাও করিয়া ডাকিতে দেখিয়া মা মা 'খাবি মা, খাবি মা' বলিয়া ভোগের অন্ন তাহাকেই খাওয়াইতে লাগিলেন!

"দেখিতাম, রাত্রে এক একদিন জগন্মাতাকে শয়ন দিয়া—'মা মা আমাকে কাছে শুতে বল্‌চিস্—আচ্ছা, শুচ্ছি' বলিয়া জগন্মাতার রৌপ্যনির্মিত খট্টায় কিছুক্ষণ শুইয়া রহিলেন।

"আবার দেখিতাম, পূজা করিতে বসিয়া তিনি এমন তন্ময়ভাবে ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন যে, বহুক্ষণ তাঁহার বাহ্যজ্ঞানের লেশমাত্র রহিল না।

"প্রত্যূষে উঠিয়া মা-কালীর মালা গাঁথিবার নিমিত্ত মামা নিত্য পুষ্পচয়ন করিতেন। দেখিতাম, তখনও তিনি যেন কাহার সহিত কথা কহিতেছেন, হাসিতেছেন, আদর আবদার, রঙ্গ পরিহাসাদি করিতেছেন।

"আর দেখিতাম, রাত্রিকালে মামার আদৌ নিদ্রা নাই! যখনি জাগিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি তিনি ঐরূপে ভাবের ঘোরে কথা কহিতেছেন, গান করিতেছেন বা পঞ্চবটীতে যাইয়া ধ্যানে নিমগ্ন রহিয়াছেন।"

হৃদয় বলিত, ঠাকুরকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া মনে আশঙ্কা হইলেও উহা অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া কি করা কর্তব্য, তদবিষয়ে পরামর্শ লইবার তাহার উপায় ছিল না। কারণ, পাছে সে উহা ঠাকুরবাটীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদিগের নিকট প্রকাশ করে এবং তাহারা শুনিয়া ঐকথা বাবুদের কানে তুলিয়া তাহার মাতুলের অনিষ্ট সাধন করে। কিন্তু প্রতিদিন যখন ঐরূপ হইতে লাগিল, তখন ঐকথা আর কেমনে চাপা যাইবে? অন্য কেহ কেহ তাহার ন্যায় পূজাকালে কালীঘরে আসিয়া ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ স্বচক্ষে দেখিয়া যাইয়া খাজাঞ্চীপ্রমুখ কর্মচারীদিগের নিকট অভিযোগ উপস্থিত করিল। তাহারা ঐকথা শুনিয়া কালীঘরে আসিয়া স্বচক্ষে উহা প্রত্যক্ষ করিল; কিন্তু ঠাকুরের দেবতাবিষ্টের ন্যায় আকার, অসঙ্কোচ ব্যবহার ও নির্ভীক উন্মনাভাব দেখিয়া একটা অনির্দিষ্ট ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া সহসা

ঠাকুরের রাগাত্মিকা পূজা দেখিয়া কালীবাটীর খাজাঞ্চীপ্রমুখ কর্মচারীদিগের জল্পনা ও মথুরবাবুর নিকট সংবাদপ্রেরণ

তাঁহাকে কিছু বলিতে বা নিষেধ করিতে পারিল না। দপ্তরখানায় ফিরিয়া আসিয়া সকলে পরামর্শ করিয়া স্থির করিল—হয় ভট্টাচার্য পাগল হইয়াছেন, না হয়ত তাঁহাতে উপদেবতার আবেশ হইয়াছে! নতুবা পূজাকালে কেহ কখন ঐরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ স্বেচ্ছাচার করিতে পারে না; যাহাই হউক, ৺দেবীর পূজা, ভোগরাগাদি কিছুই হইতেছে না; তিনি সকল নষ্ট করিয়াছেন; বাবুদের এ বিষয়ে সংবাদপ্রেরণ কর্তব্য।

মথুরবাবুর নিকট সংবাদ প্রেরিত হইল। উত্তরে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি শীঘ্রই স্বয়ং উপস্থিত হইয়া ঐ বিষয়ে যথাবিধান করিবেন। যদবধি তাহা না করিতেছেন, তদবধি ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবে পূজাদি করিতেছেন, সেই ভাবেই করুন; তদ্বিষয়ে কেহ বাধা দিবে না। মথুরবাবুর ঐরূপ পত্র পাইয়া সকলে তাঁহার আগমনের অপেক্ষায় উদ্‌গ্রীব হইয়া রহিল এবং 'এইবারেই ভট্টাচার্য পদচ্যুত হইল, বাবু আসিয়াই তাঁহাকে দূর করিবেন—দেবতার নিকট অপরাধ, দেবতা কতদিন সহিবে বল,' ইত্যাদি নানা জল্পনা তাহাদের মধ্যে চলিতে লাগিল।

মথুরবাবু কাহাকেও কিছু না জানাইয়া একদিন পূজাকালে সহসা আসিয়া কালীঘরে প্রবিষ্ট হইলেন এবং অনেকক্ষণ ধরিয়া ঠাকুরের কার্যকলাপ দেখিতে লাগিলেন। ভাববিভোর ঠাকুর কিন্তু তৎপ্রতি আদৌ লক্ষ্য করিলেন না। পূজাকালে মাকে লইয়াই তিনি নিত্য তন্ময় হইয়া থাকিতেন, মন্দিরে কে আসিতেছে, যাইতেছে, সে বিষয়ে তাঁহার আদৌ জ্ঞান থাকিত না। শ্রীযুত মথুরামোহন ঐ বিষয়টি আসিয়াই বুঝিতে পারিলেন। পরে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকট তাঁহার বালকের ন্যায় আবদার, অনুরোধ প্রভৃতি দেখিয়া উহা যে ঐকান্তিক

ঠাকুরের পূজা দেখিতে মথুরবাবুর আগমন ও তদ্বিষয়ে ধারণা

প্রেমভক্তিপ্রসূত, তাহাও বুঝিলেন। তাঁহার মনে হইল, ঐরূপ অকপট ভক্তিবিশ্বাসে যদি মাকে না পাওয়া যায় ত কিসে তাঁহার দর্শনলাভ হইবে? পূজা করিতে করিতে ভট্টাচার্যের কখন গলদশ্রুধারা, কখন অকপট উদ্দাম উল্লাস এবং কখন বা জড়ের ন্যায় সংজ্ঞাশূন্যতা, অবিচলতা ও বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ লক্ষ্যরাহিত্য দেখিয়া তাঁহার চিত্ত একটা অপূর্ব আনন্দে পূর্ণ হইল। তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন, শ্রীমন্দির দেবপ্রকাশে যথার্থই জমজম করিতেছে! তাঁহার স্থির বিশ্বাস হইল, ভট্টাচার্য জগন্মাতার কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন। অনন্তর ভক্তিপূতচিত্তে সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতা ও তাঁহার অপূর্ব পূজককে দূর হইতে বারংবার প্রণাম করিতে করিতে বলিতে লাগিলেন, "এতদিনের পর ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা সার্থক হইল, এতদিনের পর শ্রীশ্রীজগন্মাতা সত্যসত্যই এখানে আবির্ভূতা হইলেন, এতদিনে মার পূজা ঠিক ঠিক সম্পন্ন হইল।" কর্মচারীদিগের কাহাকেও কিছু না বলিয়া তিনি সেদিন বাটীতে ফিরিলেন। পরদিন মন্দিরের প্রধান কর্মচারীর উপর তাঁহার নিয়োগ আসিল, 'ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবেই পূজা করুন না কেন, তাঁহাকে বাধা দিবে না।'

পূর্বোক্ত ঘটনাবলী শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পাঠক একথা সহজেই বুঝিতে পারিবেন যে, বৈধী ভক্তির বিধিবদ্ধ সীমা অতিক্রম করিয়া ঠাকুরের মন এখন অহেতুক প্রেমভক্তির উচ্চমার্গে প্রবলবেগে ধাবিত হইয়াছিল। এমন সরল স্বাভাবিকভাবে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল যে, অপরের কথা দূরে থাকুক, তিনি নিজেও ঐ কথা তখন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই। কেবল বুঝিয়াছিলেন যে, জগন্মাতার প্রতি ভালবাসার

প্রবল ঈশ্বরপ্রেমে ঠাকুরের রাগাত্মিকা ভক্তিলাভ—ঐ ভক্তির ফল

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

প্রবল প্রেরণায় তিনি ঐরূপ চেষ্টাদি না করিয়া থাকিতে পারিতেছেন না—কে যেন তাঁহাকে জোর করিয়া ঐরূপ করাইতেছে! ঐজন্য দেখিতে পাওয়া যায়, মধ্যে মধ্যে তাঁহার মনে হইতেছে, 'আমার এ কিপ্রকার অবস্থা হইতেছে? আমি ঠিক পথে চলিতেছি ত?' ঐজন্য দেখা যায়, তিনি ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে জানাইতেছেন—'মা, আমার এইরূপ অবস্থা কেন হইতেছে কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, তুই আমাকে যাহা করিবার করাইয়া ও যাহা শিখাইবার শিখাইয়া দেখা দে! সর্বদা আমার হাত ধরিয়া থাক!' কাম, কাঞ্চন, মান, যশ, পৃথিবীর সমস্ত ভোগৈশ্বর্য হইতে মন ফিরাইয়া অন্তরের অন্তর হইতে তিনি জগন্মাতাকে ঐকথা নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও তাহাতে তাঁহার হস্ত ধরিয়া সর্ব বিষয়ে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সাধকজীবনের পরিপুষ্টি ও পূর্ণতার জন্য যখনি যাহা কিছু ও যেরূপ লোকের প্রয়োজন উপস্থিত হইয়াছিল, তখনি ঐসকল বস্তু ও ব্যক্তিকে অযাচিতভাবে তাঁহার নিকটে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে শুদ্ধ জ্ঞান ও শ্রদ্ধা ভক্তির চরম সীমায় স্বাভাবিক সহজভাবে আরূঢ় করাইয়াছিলেন। গীতামুখে শ্রীভগবান ভক্তের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥—গীতা, ৯।২২

—যে-সকল ব্যক্তি অনন্যচিত্তে উপাসনা করিয়া আমার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া থাকে—শরীরধারণোপযোগী আহার-বিহারাদি বিষয়ের জন্যও চিন্তা না করিয়া সম্পূর্ণ মন আমাতে অর্পণ করে—প্রয়োজনীয় সকল বিষয়ই আমি (অযাচিত হইয়াও) তাহাদিগের নিকট আনয়ন করিয়া থাকি। গীতার ঐ প্রতিজ্ঞা ঠাকুরের জীবনে কিরূপ বর্ণে বর্ণে সাফল্যলাভ

করিয়াছিল, তাহা আমরা ঠাকুরের এই সময়ের জীবন যত আলোচনা করিব তত সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইব। কামকাঞ্চনৈ-কলক্ষ্য স্বার্থপর বর্তমান যুগে শ্রীভগবানের ঐ প্রতিজ্ঞার সত্যতা সুস্পষ্টরূপে পুনঃপ্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। যুগে যুগে সাধকেরা 'সব্ ছোড়ে সব পাওয়ে'—শ্রীভগবানের নিমিত্ত সর্বস্ব ত্যাগ করিলে প্রয়োজনীয় কোন বিষয়ের জন্য সাধককে অভাবগ্রস্ত হইয়া কষ্ট পাইতে হয় না——একথা মানবকে উপদেশ দিয়া আসিলেও দুর্বলহৃদয় বিষয়াবদ্ধ মানব তাহা বর্তমান যুগে আবার পূর্ণভাবে না দেখিয়া বিশ্বাসী হইতে পারিতেছিল না। সেজন্য সম্পূর্ণরূপে অনন্যচিত্ত ঠাকুরকে লইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার শাস্ত্রীয় ঐ বাক্যের সফলতা মানবকে দেখাইবার এই অদ্ভুত লীলাভিনয়! হে মানব, পূতচিত্তে একথা শ্রবণ করিয়া ত্যাগের পথে যথাসাধ্য অগ্রসর হও।

ঠাকুরের কথা—রাগাত্মিকা বা রাগানুগা ভক্তির পূর্ণ প্রভাব কেবল অবতারপুরুষদিগের শরীর-মন ধারণ করিতে সমর্থ

ঠাকুর বলিতেন, ঈশ্বরীয় ভাবের প্রবল বন্যা যখন অতর্কিতভাবে মানবজীবনে আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন তাহাকে চাপিবার সহস্র চেষ্টা করিলেও সফল হওয়া যায় না। মানব সাধারণের জড় দেহ উহার প্রবল বেগ ধারণ করিতে সক্ষম না হইয়া এককালে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যায়। ঐরূপে অনেক সাধক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। পূর্ণ জ্ঞান বা পূর্ণা ভক্তির উদ্দাম বেগ ধারণ করিবার উপযোগী শরীরের প্রয়োজন। অবতারপ্রথিত মহাপুরুষ-দিগের শরীরসকলকেই কেবলমাত্র উহার পূর্ণ বেগ সর্বক্ষণ ধারণ করিয়া সংসারে জীবিত থাকিতে এপর্যন্ত দেখা গিয়াছে। ভক্তিশাস্ত্র সেজন্য তাঁহাদিগকে শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহবান বলিয়া বারংবার নির্দেশ করিয়াছে। শুদ্ধসত্ত্বগুণরূপ উপাদানে গঠিত শরীর ধারণ করিয়া সংসারে আগমন

করেন বলিয়াই তাঁহারা আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের পূর্ণবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হয়েন। ঐরূপ শরীরধারণ করিয়াও তাঁহাদিগের উহাদিগের প্রবল বেগে অনেক সময় মুহ্যমান হইতে দেখা গিয়া থাকে, বিশেষতঃ ভক্তি-মার্গ-সঞ্চরণশীল অবতারপুরুষদিগকে। ভাব-ভক্তির প্রাবল্যে ঈশা ও শ্রীচৈতন্যের শরীরের অঙ্গগ্রন্থিসকল শিথিল হওয়া, ঘর্মের ন্যায় শরীরের প্রতি রোমকূপ দিয়া বিন্দু বিন্দু করিয়া শোণিত নির্গত হওয়া প্রভৃতি শাস্ত্রনিবদ্ধ কথাতেই উহা বুঝিতে পারা যায়। ঐসকল শারীরিক বিকার ক্লেশকর বলিয়া উপলব্ধ হইলেও উহাদের সহায়েই তাঁহাদিগের শরীর ভক্তিপ্রসূত অসাধারণ মানসিক বেগ ধারণ করিতে অভ্যস্ত হইয়া আসে। পরে, ঐ বেগধারণে উহা ক্রমে যত অভ্যস্ত হয়, ঐ বিকৃতিসকলও তখন আর উহাতে পূর্বের ন্যায় পরিলক্ষিত হয় না।

ঐ ভক্তিপ্রভাবে ঠাকুরের শারীরিক বিকার ও তজ্জনিত কষ্ট—যথা, গাত্রদাহ। প্রথম গাত্রদাহ পাপপুরুষ দগ্ধ হইবার কালে. দ্বিতীয়, প্রথম দর্শনলাভের পর ঈশ্বরবিরহে; তৃতীয়, মধুরভাব-সাধনকালে

ভাব-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় ঠাকুরের শরীরে এখন হইতে নানা-প্রকার অদ্ভুত বিকারপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল। সাধনার প্রারম্ভ হইতে তাঁহার গাত্রদাহের কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। উহার বৃদ্ধিতে তাঁহাকে অনেক সময় বিশেষ কষ্ট পাইতে হইয়াছিল। ঠাকুর স্বয়ং আমাদের নিকট অনেক সময় উহার কারণ এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন—"সন্ধ্যা-পূজাদি করিবার সময় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যখন ভিতরের পাপপুরুষ দগ্ধ হইয়া গেল এইরূপ চিন্তা করিতাম, তখন কে জানিত, শরীরে সত্যসত্যই পাপপুরুষ আছে এবং উহাকে বাস্তবিক দগ্ধ ও বিনষ্ট করা যায়! সাধনার প্রারম্ভ হইতে গাত্রদাহ উপস্থিত হইল; ভাবিলাম, এ আবার কি রোগ

হইল! ক্রমে উহা খুব বাড়িয়া অসহ্য হইয়া উঠিল। নানা কবিরাজী তেল মাখা গেল; কিন্তু কিছুতেই উহা কমিল না। পরে একদিন পঞ্চবটীতে বসিয়া আছি, সহসা দেখ্‌ছি কি মিস্‌কালো রঙ, আরক্তলোচন, ভীষণাকার একটা পুরুষ যেন মদ খাইয়া টলিতে টলিতে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া সম্মুখে বেড়াইতে লাগিল। পরক্ষণে দেখি কি—আর একজন সৌম্যমূর্তি পুরুষ গৈরিক ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া ঐরূপে (শরীরের) ভিতর হইতে বাহির হইয়া পূর্বোক্ত ভীষণাকার পুরুষকে সবলে আক্রমণপূর্বক নিহত করিল এবং ঐদিন হইতে গাত্রদাহ কমিয়া গেল! ঐ ঘটনার পূর্বে ছয় মাস কাল গাত্রদাহে বিষম কষ্ট পাইয়াছিলাম।”

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, পাপপুরুষ বিনষ্ট হইবার পরে গাত্রদাহ নিবারিত হইলেও অল্পকাল পরেই উহা আবার আরম্ভ হইয়াছিল। তখন বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া তিনি রাগমার্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাদিতে নিযুক্ত। ক্রমে উহা এত বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, ভিজা গামছা মাথায় দিয়া তিন-চারি ঘণ্টাকাল গঙ্গাগর্ভে শরীর ডুবাইয়া বসিয়া থাকিয়াও তিনি শান্তিলাভ করিতে পারিতেন না। পরে ব্রাহ্মণী আসিয়া ঐ গাত্রদাহ, শ্রীভগবানের পূর্ণদর্শনলাভের জন্য উৎকণ্ঠা ও বিরহবেদনা-প্রসূত বলিয়া নির্দেশ করিয়া যেরূপ সহজ উপায়ে উহা নিবারণ করেন, সে-সকল কথা আমরা অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি।* উহার পরে ঠাকুর মধুরভাব সাধন করিবার কাল হইতে আবার গাত্রদাহে পীড়িত হইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, “বুকের ভিতর এক মালসা আগুন রাখিলে যেরূপ উত্তাপ ও যন্ত্রণা হয়, ঠাকুর ঐকালে সেইরূপ অনুভব করিয়া অস্থির হইয়া পড়িতেন।

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

মধ্যে মধ্যে উপস্থিত হইয়া উহা তাঁহাকে বহুকাল পর্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। অনন্তর সাধনকালের কয়েক বৎসর পরে তিনি বারাসতনিবাসী মোক্তার শ্রীযুক্ত রামকানাই ঘোষালের সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উন্নত শক্তিসাধক ছিলেন এবং তাঁহার ঐরূপ দাহের কথা শুনিয়া তাঁহাকে ইষ্টকবচ অঙ্গে ধারণ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। কবচধারণের পরে তিনি ঐরূপ দাহে আর কখনও কষ্ট পান নাই।"

ঠাকুরের ঐরূপ অদ্ভুত পূজা দেখিয়া জানবাজারে ফিরিয়া মথুরামোহন রাণীমাতাকে শুনাইলেন। ভক্তিমতী রাণী উহা শুনিয়া বিশেষ পুলকিতা হইলেন। ভট্টাচার্যের মুখনিঃসৃত ভক্তিমাখা সঙ্গীত-শ্রবণে তিনি তাঁহার প্রতি ইতিপূর্বেই স্নেহপরায়ণা ছিলেন এবং শ্রীগোবিন্দ-বিগ্রহ-ভগ্নকালে তাঁহার ভাবাবেশ ও ভক্তিপূত বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপালাভ যে ঠাকুরের ন্যায় পবিত্রহৃদয়ের পক্ষে সম্ভবপর, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। ইহার অল্পকাল পরে কিন্তু এমন একটি ঘটনা উপস্থিত হইল, যাহাতে রাণী ও মথুরবাবুর ঐ বিশ্বাস বিচলিত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা হইয়াছিল। রাণী একদিন মন্দিরে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন ও পূজাদি করিবার কালে তদ্বিষয়ে তন্ময় না হইয়া বিষয়কর্মসম্পর্কীয় একটি মামলার ফলাফল সাগ্রহে চিন্তা করিতেছিলেন। ঠাকুর তখন ঐস্থানে বসিয়া তাঁহাকে সঙ্গীত শুনাইতেছিলেন। ভাবাবিষ্ট ঠাকুর তাঁহার মনের কথা জানিতে পারিয়া 'এখানেও ঐ চিন্তা!' বলিয়া তাঁহার কোমলাঙ্গে আঘাতপূর্বক ঐ চিন্তা হইতে নিরস্তা হইতে শিক্ষাপ্রদান করেন।

পূজা করিতে করিতে বিষয়-কর্মের চিন্তার জন্য রাণী রাসমণিকে ঠাকুরের দণ্ডপ্রদান

গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৫ম অধ্যায়

শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপাপাত্রী সাধিকা রাণী উহাতে নিজ মনের দুর্বলতা ধরিতে পারিয়া অনুতপ্তা হইয়াছিলেন এবং ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভক্তি ঐ ঘটনায় বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঐ সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তারে উল্লেখ করিয়াছি।

শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে লইয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ ও আনন্দোল্লাস উহার অল্পদিন পরে এত বর্ধিত হইয়া উঠিল যে, দেবীসেবার নিত্য-নৈমিত্তিক কার্যকলাপ কোনরূপে নির্বাহ করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব হইল। আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতিতে বৈধী কর্মের ত্যাগ কিরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে ঠাকুর বলিতেন, "যেমন গৃহস্থের বধূর যে পর্যন্ত গর্ভ না হয়, ততদিন তাহার শ্বশ্রূ তাহাকে সকল জিনিস খাইতে ও সকল কাজ করিতে দেয়, গর্ভ হইলেই ঐ সকল বিষয়ে একটু আধটু বাচবিচার আরম্ভ হয়; পরে গর্ভ যত বৃদ্ধি পাইতে থাকে, ততই তাহার কাজ কমাইয়া দেওয়া হয়; ক্রমে যখন সে আসন্ন-প্রসবা হয়, গর্ভস্থ শিশুর অনিষ্টাশঙ্কায় তখন তাহাকে আর কোন কার্যই করিতে দেওয়া হয় না; পরে যখন তাহার সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, তখন ঐ সন্তানকে নাড়াচাড়া করিয়াই তাহার দিন কাটিতে থাকে।" শ্রীশ্রীজগদম্বার বাহ্যপূজা ও সেবাদি-ত্যাগও ঠাকুরের ঠিক ঐরূপ স্বাভাবিকভাবে হইয়া আসিয়াছিল। পূজা ও সেবার কালাকালবিচার তাঁহার এখন লোপ হইয়াছিল। ভাবাবেশে সর্বদা বিভোর থাকিয়া তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার যখন যেরূপে সেবা করিবার ইচ্ছা হইত, তখন সেইরূপই করিতেন। যথা—পূজা না করিয়াই হয়ত ভোগ নিবেদন করিয়া

ভক্তির পরিণতিতে ঠাকুরের বাহ্যপূজা-ত্যাগ। এইকালে তাঁহার অবস্থা

গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৫ম অধ্যায়

দিলেন! অথবা ধ্যানে তন্ময় হইয়া আপনার পৃথক অস্তিত্ব এককালে ভুলিয়া গিয়া দেবীপূজার নিমিত্ত আনীত পুষ্প-চন্দনাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়া বসিলেন! ভিতরে বাহিরে নিরন্তর জগদম্বার দর্শনেই যে ঠাকুরের এই কালের কার্যকলাপ ঐরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা তাঁহার নিকটে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। আর শুনিয়াছি যে, ঐ তন্ময়তার অল্পমাত্র হ্রাস হইয়া যদি এই সময়ে কয়েক দণ্ডের নিমিত্তও তিনি মাতৃদর্শনে বাধা প্রাপ্ত হইতেন ত এমন ব্যাকুলতা আসিয়া তাঁহাকে অধিকার করিয়া বসিত যে, আছাড় খাইয়া ভূমিতে পড়িয়া মুখ ঘর্ষণ করিতে করিতে ব্যাকুল ক্রন্দনে দিক্ পূর্ণ করিতেন! শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ হইয়া প্রাণ ছটফট করিত। আছাড় খাইয়া পড়িয়া সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও রুধিরলিপ্ত হইয়া যাইতেছে, সে বিষয় লক্ষ্য হইত না। জলে পড়িলেন বা অগ্নিতে পড়িলেন, কখন কখন তাহারও জ্ঞান থাকিত না। পরক্ষণেই আবার শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন পাইয়া ঐ ভাব কাটিয়া যাইত এবং তাঁহার মুখমণ্ডল অদ্ভুত জ্যোতিঃ ও উল্লাসে পূর্ণ হইত—তিনি যেন সম্পূর্ণ আর এক ব্যক্তি হইয়া যাইতেন!

পূজাত্যাগ সম্বন্ধে হৃদয়ের কথা এবং ঠাকুরের বর্তমান অবস্থা সম্বন্ধে মথুরের সন্দেহ

ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থালাভের পূর্ব পর্যন্ত মথুরবাবু তাঁহার দ্বারা পূজাকার্য কোনরূপে চালাইয়া লইতেছিলেন; এখন আর তদ্রূপ করা অসম্ভব বুঝিয়া পূজাকার্যের অন্যরূপ বন্দোবস্ত করিতে সঙ্কল্প করিলেন। হৃদয় বলিত, "মথুরবাবুর ঐরূপ সঙ্কল্পের একটি কারণও উপস্থিত হইয়াছিল। পূজাসন হইতে সহসা উত্থিত হইয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুর একদিন মথুরবাবু ও আমাকে মন্দিরমধ্যে দেখিলেন এবং আমার হাত ধরিয়া পূজাসনে বসাইয়া মথুরবাবুকে লক্ষ্য করিয়া

বলিলেন, 'আজ হইতে হৃদয় পূজা করিবে; মা বলিতেছেন, আমার পূজার ন্যায় হৃদয়ের পূজা তিনি সমভাবে গ্রহণ করিবেন।' বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরের ঐ কথা দেবাদেশ বলিয়া গ্রহণ করিয়া লইয়াছিলেন।" হৃদয়ের ঐ কথা কতদূর সত্য তাহা বলিতে পারি না, তবে বর্তমান অবস্থায় ঠাকুরের নিত্য পূজাদি করা যে অসম্ভব, একথা মথুরের বুঝিতে বাকি ছিল না।

গঙ্গাপ্রসাদ সেন কবিরাজের চিকিৎসা

প্রথমদর্শনকাল হইতে মথুরবাবুর মন ঠাকুরের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল, একথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি। ঐদিন হইতে তিনি সকল প্রকার অসুবিধা দূর করিয়া তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাড়ীতে রাখিতে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। পরে ক্রমশঃ তাঁহাতে অদ্ভুত গুণরাশির যত পরিচয় পাইতেছিলেন, ততই মুগ্ধ হইয়া তিনি আবশ্যকমত তাঁহার সেবা এবং অপরের অযথা অত্যাচার হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিয়া আসিতেছিলেন। 'যেমন,—ঠাকুরের বায়ুপ্রবণ ধাত জানিয়া মথুর নিত্য মিছরির সরবৎ-পানের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন; রাগানুগাভক্তি-প্রভাবে ঠাকুর অদৃষ্টপূর্ব প্রণালীতে পূজায় প্রবৃত্ত হইলে বাধা পাইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া তিনি তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন; ঐরূপ আরও কয়েকটি কথার আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।* কিন্তু রাণী রাসমণির অঙ্গে আঘাত করিয়া ঠাকুর যেদিন তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছিলেন, সেই-দিন হইতে মথুর সন্দিগ্ধ হইয়া তাঁহার বায়ুরোগ হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, একথা আমাদিগের সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়। বোধ হয়, ঐ ঘটনায় তিনি তাঁহাতে আধ্যাত্মিকতার সহিত উন্মত্ততার সংযোগ

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

অনুমান করিয়াছিলেন। কারণ, এই সময়ে তিনি কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গঙ্গাপ্রসাদ সেনের দ্বারা তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

ঐরূপে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই মথুর ক্ষান্ত হন নাই। কিন্তু নিজ মনকে সুসংযত রাখিয়া যাহাতে ঠাকুর সাধনায় অগ্রসর হন, তর্কযুক্তিসহায়ে তাঁহাকে তদ্বিষয় বুঝাইতে তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। লাল জবাফুলের গাছে শ্বেত জবা প্রস্ফুটিত হইতে দেখিয়া কিরূপে তিনি এখন পরাজয় স্বীকারপূর্বক সম্পূর্ণরূপে ঠাকুরের বশীভূত হইয়াছিলেন, সে-সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।*

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, মন্দিরের নিত্য নিয়মিত ৺দেবীসেবা ঠাকুরের দ্বারা নিষ্পন্ন হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া মথুরবাবু এখন অন্য বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের খুল্লতাতপুত্র শ্রীযুক্ত রামতারক চট্টোপাধ্যায় এই সময়ে কর্মান্বেষণে ঠাকুরবাড়িতে উপস্থিত হওয়ায় তাঁহাকেই তিনি ঠাকুরের আরোগ্য না হওয়া পর্যন্ত ৺দেবীপূজায় নিযুক্ত করিলেন। সন ১২৬৫ সালে, ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

রামতারককে ঠাকুর হলধারী বলিয়া নির্দেশ করিতেন। ইঁহার সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি। হলধারী সুপণ্ডিত ও নিষ্ঠাচারী সাধক ছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত, অধ্যাত্ম-রামায়ণাদি গ্রন্থসকল তিনি নিত্য পাঠ করিতেন।

হলধারীর আগমন

৺বিষ্ণুপূজায় তাঁহার অধিক প্রীতি থাকিলেও ৺শক্তির উপর তাঁহার দ্বেষ ছিল না। সেজন্য বিষ্ণুভক্ত হইয়াও তিনি মথুরবাবুর অনুরোধে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজাকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। মথুরবাবুকে বলিয়া তিনি

---

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

সিধা লইয়া নিত্য স্বহস্তে রন্ধন করিয়া খাইবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিলেন। মথুরবাবু তাহাতে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "কেন, তোমার ভ্রাতা শ্রীরামকৃষ্ণ ও ভাগিনেয় হৃদয় ত ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতেছে?" বুদ্ধিমান হলধারী তাহাতে বলেন, "আমার ভ্রাতার আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা; তাহার কিছুতেই দোষ নাই; আমার ঐরূপ অবস্থা হয় নাই, সুতরাং নিষ্ঠাভঙ্গে দোষ হইবে।" মথুরবাবু তাঁহার ঐরূপ বাক্যে সন্তুষ্ট হন এবং তদবধি হলধারী সিধা লইয়া পঞ্চবটীতলে নিত্য স্বপাকে ভোজন করিতেন।

শাক্তদ্বেষী না হইলেও হলধারী ৺দেবীকে পশুবলিপ্রদানে প্রবৃত্তি হইত না। পূর্বকালে ৺জগদম্বাকে পশুবলিপ্রদান করার বিধি ঠাকুর-বাটীতে প্রচলিত থাকায় ঐসকল দিবসে তিনি আনন্দে পূজা করিতে পারিতেন না। কথিত আছে, প্রায় একমাস ঐরূপে ক্ষুণ্ণমনে পূজা করিবার পরে হলধারী এক দিবস সন্ধ্যা করিতে বসিয়াছেন, এমন সময় দেখিলেন ৺দেবী ভয়ঙ্করী মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "আমার পূজা তোকে করিতে হইবে না; করিলে সেবাপরাধে তোর সন্তানের মৃত্যু হইবে!" শুনা যায়, মাথার খেয়াল মনে করিয়া তিনি ঐ আদেশ প্রথমে গ্রাহ্য করেন নাই। কিন্তু কিছুকাল পরে তাঁহার পুত্রের মৃত্যুসংবাদ যখন সত্য সত্যই উপস্থিত হইল, তখন ঠাকুরের নিকট ঐ বিষয় আদ্যোপান্ত বলিয়া তিনি ৺দেবীপূজায় বিরত হইয়াছিলেন। সেজন্য এখন হইতে তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের পূজা এবং হৃদয় ৺দেবী-পূজা করিতে থাকেন। ঘটনাটি আমরা হৃদয়ের ভ্রাতা শ্রীযুত রাজারামের নিকট শ্রবণ করিয়াছিলাম।

অষ্টম অধ্যায়

প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা

ঠাকুরের সাধনকালের আলোচনা করিতে হইলে তিনি আমাদিগকে ঐ কালসম্বন্ধে নিজমুখে যাহা বলিয়াছেন, তাহা সর্বাগ্রে স্মরণ করিতে হইবে। তাহা হইলেই ঐ কালের ঘটনাবলীর যথাযথ সময় নির্দেশ করা অসম্ভব হইবে না। পাঠককে আমরা বলিয়াছি, আমরা তাঁহার নিকট শুনিয়াছি, দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল নিরন্তর নানামতের সাধনায় তিনি নিমগ্ন ছিলেন। রাণী রাসমণির মন্দিরসংক্রান্ত দেবোত্তর-দানপত্র-দর্শনে সাব্যস্ত হয়, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে তারিখে বৃহস্পতিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঐ ঘটনার কয়েক মাস পরে সন ১২৬২ সালেই ঠাকুর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সন ১২৬২ হইতে সন ১২৭৩ সাল পর্যন্তই যে তাঁহার সাধনকাল, একথা সুনিশ্চিত। উক্ত দ্বাদশ বৎসর ঠাকুরের সাধনকাল বলিয়া বিশেষভাবে নির্দিষ্ট হইলেও উহার পরে তীর্থ-দর্শনে গমন করিয়া ঐসকল স্থলে এবং তথা হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া তিনি কখন কখন কিছুকালের জন্য সাধনায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, আমরা দেখিতে পাইব।

সাধনকালের সময়নিরূপণ

পূর্বোক্ত দ্বাদশ বৎসরকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া প্রত্যেক অংশের আলোচনা করিতে আমরা অগ্রসর হইয়াছি। প্রথম, ১২৬২ হইতে

১২৬৫, চারি বৎসর—যে কালের প্রধান প্রধান কথার ইতিপূর্বে আলোচনা করিয়াছি। দ্বিতীয়, ১২৬৬ হইতে ১২৬৯ পর্যন্ত, চারি বৎসর—যে সময়ের শেষ দুই বৎসরাধিক কাল ঠাকুর ব্রাহ্মণীর নির্দেশে গোকুলব্রত হইতে আরম্ভ করিয়া বঙ্গদেশে প্রচলিত চৌষট্টিখানা প্রধানতন্ত্র-নির্দিষ্ট সাধনসকল যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। তৃতীয়, ১২৭০ হইতে ১২৭৩ পর্যন্ত, চারি বৎসর—যে কালে তিনি 'জটাধারী' নামক রামাইত সাধুর নিকট হইতে রাম-মন্ত্রে উপদিষ্ট হন ও শ্রীশ্রীরামলালাবিগ্রহ লাভ করেন, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য ছয়মাস কাল স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকেন, আচার্য শ্রীতোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক সমাধির নির্বিকল্প ভূমিতে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে শ্রীযুক্ত গোবিন্দের নিকট হইতে ইসলামী ধর্মে উপদেশ গ্রহণ করিয়াছিলেন; উক্ত দ্বাদশ বৎসরের ভিতরেই তিনি বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখ্যভাবের এবং কর্তাভজা, নবরসিক প্রভৃতি বৈষ্ণব মতের অবান্তর সম্প্রদায়সকলের সাধনমার্গের সহিতও পরিচিত হইয়াছিলেন। বৈষ্ণবধর্মের সকল সম্প্রদায়ের মতের সহিতই তিনি যে বিশেষভাবে পরিচিত ছিলেন, একথা বৈষ্ণবচরণ গোস্বামী প্রমুখ ঐসকল পথের সাধকবর্গের তাঁহার নিকট আধ্যাত্মিক সহায়তালাভের জন্য আগমনে স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরের সাধনকালকে পূর্বোক্তরূপে তিন ভাগে ভাগ করিয়া অনুধাবন করিয়া দেখিলে ঐ তিন ভাগের প্রত্যেকটিতে অনুষ্ঠিত তাঁহার সাধনসকলের মধ্যে একটা শ্রেণীগত বিভিন্নতা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যাইবে।

ঐ কালের তিনটি প্রধান বিভাগ

আমরা দেখিয়াছি—সাধনকালের প্রথমভাগে ঠাকুর বাহিরের সহায়ের মধ্যে কেবল শ্রীযুক্ত কেনারাম ভট্টের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিয়া-

ছিলেন। ঈশ্বরলাভের জন্য অন্তরের ব্যাকুলতাই ঐ কালে তাঁহার একমাত্র সহায় হইয়াছিল। উহাই প্রবল হইয়া অচিরকাল মধ্যে তাঁহার শরীর-মনে অশেষ পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। উপাস্যের প্রতি অসীম ভালবাসা আনয়নপূর্বক উহাই তাঁহাকে বৈধী ভক্তির নিয়মাবলী উল্লঙ্ঘন করাইয়া ক্রমে রাগানুগা ভক্তিপথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রত্যক্ষ দর্শনে ধনী করিয়া যোগবিভূতিসম্পন্নও করিয়া তুলিয়াছিল।

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুরের অবস্থা ও দর্শনাদির পুনরাবৃত্তি

পাঠক হয়ত বলিবেন—'তবে আর বাকি রহিল কি? ঐ কালেই ত ঠাকুর যোগসিদ্ধি ও ঈশ্বরলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; তবে পরে আবার সাধন কেন?' উত্তরে বলিতে হয়-একভাবে ঐ কথা যথার্থ হইলেও পরবর্তীকালে সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার তাঁহার অন্য প্রয়োজন ছিল। ঠাকুর বলিতেন—"বৃক্ষ ও লতাসকলের সাধারণ নিয়মে আগে ফুল, পরে ফল হইয়া থাকে; উহাদের কোন কোনটি কিন্তু এমন আছে, যাহাদিগের আগেই ফল দেখা দিয়া পরে ফুল দেখা দেয়।" সাধনক্ষেত্রে ঠাকুরের মনের বিকাশও ঠিক ঐরূপভাবে হইয়াছিল। এজন্য পাঠকের পূর্বোক্ত কথাটা আমরা একভাবে সত্য বলিতেছি। কিন্তু সাধনকালের প্রথম ভাগে তাঁহার অদ্ভুত প্রত্যক্ষ ও জগদম্বার দর্শনাদি উপস্থিত হইলেও ঐসকলকে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ সাধককুলের উপলব্ধির সহিত যতক্ষণ না মিলাইতে পারিতেছিলেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ঐসকলের সত্যতা এবং উহাদিগের চরম সীমা সম্বন্ধে তিনি

ঐ কালে শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শন-লাভ হইবার পরে ঠাকুরকে আবার সাধন কেন করিতে হইয়াছিল। গুরূপদেশ শাস্ত্রবাক্য ও নিজকৃত প্রত্যক্ষের একত্বদর্শনে শান্তিলাভ

দৃঢ়নিশ্চয় হইতে পারিতেছিলেন না। কেবলমাত্র অন্তরের ব্যাকুলতা-সহায়ে যাহা তিনি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহাই আবার পূর্বোক্ত কারণে শাস্ত্রনির্দিষ্ট পথ ও প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যক্ষ করিবার তাঁহার প্রয়োজন হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন—গুরুমুখে শ্রুত অনুভব ও শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ পূর্ব পূর্ব যুগের সাধককুলের অনুভবের সহিত সাধক আপন ধর্মজীবনের দিব্যদর্শন ও অলৌকিক অনুভবসকল যতক্ষণ না মিলাইয়া সমসমান বলিয়া দেখিতে পায়, ততক্ষণ সে এককালে নিশ্চিন্ত হইতে পারে না। ঐ তিনটি বিষয়কে মিলাইয়া এক বলিয়া দেখিতে পাইবামাত্র সে সর্বতোভাবে ছিন্নসংশয় হইয়া পূর্ণ শান্তির অধিকারী হয়।

পূর্বোক্ত কথার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা পাঠককে ব্যাসপুত্র পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত শুকদেব গোস্বামীর জীবন-ঘটনা নির্দেশ করিতে পারি। মায়া-রহিত শুকের জীবনে জন্মাবধি নানাপ্রকার দিব্য দর্শন ও অনুভব উপস্থিত হইত। কিন্তু পূর্ণজ্ঞান-লাভে কৃতার্থ হইয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহার ঐরূপ হয়, তাহা তিনি ধারণা করিতে পারিতেন না।

ব্যাসপুত্র শুকদেব গোস্বামীর ঐরূপ হইবার কথা

মহামতি ব্যাসের নিকট বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া শুক একদিন পিতাকে বলিলেন, "শাস্ত্রে যে-সকল অবস্থার কথা লিপিবদ্ধ আছে, তাহা আমি আজন্ম অনুভব করিতেছি; তথাপি আধ্যাত্মিক রাজ্যের চরম সত্য উপলব্ধি করিয়াছি কি-না, তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইতে পারিতেছি না। অতএব ঐ বিষয়ে আপনি যাহা জ্ঞাত আছেন, তাহা আমাকে বলুন।" ব্যাস ভাবিলেন শুককে আমি আধ্যাত্মিক লক্ষ্য ও চরম সত্য সম্বন্ধে সতত উপদেশ দিয়াছি, তথাপি তাহার মন হইতে সন্দেহ দূর হয় নাই; সে মনে করিতেছে পূর্ণজ্ঞান লাভ করিলে সে

সংসারত্যাগ করিবে ভাবিয়া স্নেহের বশবর্তী হইয়া অথবা অন্য কোন কারণে আমি তাহাকে সকল কথা বলি নাই। সুতরাং অন্য কোন মনীষী ব্যক্তির নিকটে তাহার ঐ বিষয় শ্রবণ করা কর্তব্য। ঐরূপ চিন্তাপূর্বক ব্যাস বলিলেন, "আমি তোমার ঐ সন্দেহ নিরসনে অসমর্থ; মিথিলার বিদেহরাজ জনকের যথার্থ জ্ঞানী বলিয়া প্রতিপত্তির কথা তোমার অবিদিত নাই। তাঁহার নিকটে গমন করিয়া তুমি সকল প্রশ্নের মীমাংসা করিয়া লও।" শুক পিতার ঐ কথা শুনিয়া অবিলম্বে মিথিলা গমন করিয়াছিলেন এবং রাজর্ষি জনকের নিকট ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের যেরূপ অনুভূতি উপস্থিত হয় শুনিয়া, গুরূপদেশ, শাস্ত্রবাক্য ও নিজ জীবনানুভবের ঐক্য দেখিয়া শান্তিলাভ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের সাধনার অন্য কারণ স্বার্থে নহে—পরার্থে

পূর্বোক্ত কারণ ভিন্ন ঠাকুরের পরবর্তীকালে সাধনার অন্য গভীর কারণসমূহও ছিল। ঐসকলের উল্লেখমাত্রই আমরা এখানে করিতে পারিব। শান্তিলাভ করিয়া স্বয়ং কৃতার্থ হইবেন, কেবলমাত্র ইহাই ঠাকুরের সাধনার উদ্দেশ্য ছিল না। শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহাকে জগতের কল্যাণের জন্য শরীরপরিগ্রহ করাইয়াছিলেন। সেইজন্যই পরস্পরবিবদমান ধর্মমতসকলের অনুষ্ঠান করিয়া সত্যাসত্য-নির্ধারণের অদ্ভুত প্রয়াস তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং সমগ্র আধ্যাত্মিক জগতের আচার্যপদবী গ্রহণের জন্য তাঁহাকে সকলপ্রকার ধর্মমতের সাধনায় ও তাঁহাদিগের চরমোদ্দেশ্যের সহিত পরিচিত হইতে হইয়াছিল, একথা বলা যাইতে পারে। শুদ্ধ তাহাই নহে, কেবলমাত্র অনুষ্ঠান-সহায়ে তাঁহার ন্যায় নিরক্ষর পুরুষের জীবনে শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ অবস্থাসকলের উদয় করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরের দ্বারা বর্তমান যুগে বেদ, বাইবেল,

পুরাণ, কোরানাদি সকল ধর্মশাস্ত্রের সত্যতা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সেইজন্যও স্বয়ং শান্তিলাভ করিবার পরে তাঁহার সাধনার বিরাম হয় নাই। প্রত্যেক ধর্মমতের সিদ্ধপুরুষ ও পণ্ডিতসকলকে যথাকালে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নপূর্বক যাবতীয় ধর্মমতের সাধনানুষ্ঠানের শাস্ত্রসকল শ্রবণ করিবার অধিকার যে জগন্মাতা ঠাকুরকে পূর্বোক্ত প্রয়োজনবিশেষ সাধনের জন্য প্রদান করিয়াছিলেন, একথা আমরা তাঁহার অদ্ভুত জীবনালোচনায় যত অগ্রসর হইব ততই স্পষ্ট বুঝিতে পারিব।

যথার্থ ব্যাকুলতার উদয়ে সাধকের ঈশ্বরলাভ। ঠাকুরের জীবনে উক্ত ব্যাকুলতা কতদূর উপস্থিত হইয়াছিল

পূর্বে বলিয়াছি, সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঈশ্বরদর্শনের জন্য অন্তরের ব্যাকুল আগ্রহই ঠাকুরের প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল। এমন কোন লোক ঐ সময়ে তাঁহার নিকট উপস্থিত হন নাই, যিনি তাঁহাকে সকল বিষয়ে শাস্ত্রনির্দিষ্ট বিধিবদ্ধ পথে সুচালিত করিয়া আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অগ্রসর করাইবেন। সুতরাং সকল সাধনপ্রণালার অন্তর্গত তীব্র আগ্রহ-রূপ সাধারণ বিধিই তখন তাঁহার একমাত্র অবলম্বনীয় হইয়াছিল। কেবলমাত্র উহার সহায়ে ঠাকুরের ৺জগদম্বার দর্শনলাভ হওয়ায় ইহাও প্রমাণিত হয় যে, বাহ্য কোন বিষয়ের সহায়তা না পাইলেও একমাত্র ব্যাকুলতা থাকিলেই সাধকের ঈশ্বরলাভ হইতে পারে। কিন্তু কেবলমাত্র উহার সহায়ে সিদ্ধকাম হইতে হইলে ঐ ব্যাকুলাগ্রহের পরিমাণ যে কত অধিক হওয়া আবশ্যক, তাহা আমরা অনেক সময় অনুধাবন করিতে ভুলিয়া যাই। ঠাকুরের এই সময়ের জীবনালোচনা করিলে ঐ কথা আমাদিগের স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। আমরা দেখিয়াছি, তীব্র ব্যাকুলতার প্রেরণায় তাঁহার আহার, নিদ্রা, লজ্জা ভয় প্রভৃতি

শারীরিক ও মানসিক দৃঢ়বদ্ধ সংস্কার ও অভ্যাসসকল যেন কোথায় লুপ্ত হইয়াছিল ; এবং শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষা দূরে থাকুক, জীবনরক্ষার দিকেও কিছুমাত্র লক্ষ্য ছিল না! ঠাকুর বলিতেন, "শরীরসংস্কারের দিকে মন আদৌ না থাকায় ঐ কালে মস্তকের কেশ বড় হইয়া ধূলামাটি লাগিয়া আপনা আপনি জটা পাকাইয়া গিয়াছিল! ধ্যান করিতে বসিলে মনের একাগ্রতায় শরীরটা এমন স্থাণুবৎ স্থির হইয়া থাকিত যে, পক্ষিসকল জড়পদার্থজ্ঞানে নিঃসঙ্কোচে মাথার উপর আসিয়া বসিয়া থাকিত এবং কেশমধ্যগত ধূলিরাশি চঞ্চুদ্বারা নাড়িয়া চাড়িয়া তন্মধ্যে তণ্ডুলকণার অন্বেষণ কবিত! আবার সময়ে সময়ে ভগবদ্বিরহে অধীর হইয়া ভূমিতে এমন মুখঘর্ষণ করিতাম যে, কাটিয়া যাইয়া স্থানে স্থানে রক্ত বাহির হইত! ঐরূপে ধ্যান, ভজন, প্রার্থনা, আত্মনিবেদনাদিতে সমস্ত দিন যে কোথা দিয়া এসময় চলিয়া যাইত, তাহার হুঁশই থাকিত না! পরে সন্ধ্যাসমাগমে যখন চারিদিকে শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি হইতে থাকিত, তখন মনে পড়িত—দিবা অবসান হইল, আর একটা দিন বৃথা চলিয়া গেল, মার দেখা পাইলাম না। তখন তীব্র আক্ষেপ আসিয়া প্রাণ এমন ব্যাকুল করিয়া তুলিত যে, আর স্থির থাকিতে পারিতাম না ; আছাড় খাইয়া মাটিতে পড়িয়া 'মা, এখনও দেখা দিলি না' বলিয়া চীৎকার ও ক্রন্দনে দিক পূর্ণ করিতাম ও যন্ত্রণায় ছটফট করিতাম। লোকে বলিত, 'পেটে শূলব্যথা ধরিয়াছে, তাই অত কাঁদিতেছে।'" আমরা যখন ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছি, তখন সময়ে সময়ে তিনি আমাদিগকে ঈশ্বরের জন্য প্রাণে তীব্র ব্যাকুলতার প্রয়োজন বুঝাইতে সাধনকালের পূর্বোক্ত কথাসকল শুনাইয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "লোকে স্ত্রীপুত্রাদির মৃত্যুতে বা বিষয়সম্পত্তি হারাইয়া ঘটি ঘটি চোখের জল ফেলে, কিন্তু

ঈশ্বরলাভ হইল না বলিয়া কে আর ঐরূপ করে বল? অথচ বলে, ‘তাঁহাকে এত ডাকিলাম, তত্রাচ তিনি দর্শন দিলেন না!’ ঈশ্বরের জন্য ঐরূপ ব্যাকুলভাবে একবার ক্রন্দন করুন দেখি, কেমন না তিনি দর্শন দেন!” কথাগুলি আমাদের মর্মে মর্মে আঘাত করিত; শুনিলেই বুঝা যাইত, তিনি নিজ জীবনে ঐ কথা সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছেন বলিয়াই অত নিঃসংশয়ে উহা বলিতে পারিতেছেন।

মহাবীরের পদানুগ হইয়া ঠাকুরের দাস্যভক্তি সাধনা

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর ৺জগদম্বার দর্শনমাত্র করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। ভাবমুখে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনলাভের পর নিজ কুলদেবতা ৺রঘুবীরের দিকে তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। হনুমানের ন্যায় অনন্যভক্তিতেই শ্রীরামচন্দ্রের দর্শনলাভ সম্ভবপর বুঝিয়া দাস্যভক্তিতে সিদ্ধ হইবার জন্য তিনি এখন আপনাতে মহাবীরের ভাবারোপ করিয়া কিছুদিনের জন্য সাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নিরন্তর মহাবীরের চিন্তা করিতে করিতে এই সময়ে তিনি ঐ আদর্শে এতদূর তন্ময় হইয়াছিলেন যে, আপনার পৃথক্ অস্তিত্ব ও ব্যক্তিত্বের কথা কিছু-কালের জন্য একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, “ঐ সময়ে আহারবিহারাদি সকল কার্য হনুমানের ন্যায় করিতে হইত—ইচ্ছা করিয়া যে করিতাম তাহা নহে, আপনা আপনি হইয়া পড়িত! পরিবার কাপড়খানাকে লেজের মত করিয়া কোমরে জড়াইয়া বাঁধিতাম, উল্লম্ফনে চলিতাম, ফলমূলাদি ভিন্ন অপর কিছুই খাইতাম না—তাহাও আবার খোসা ফেলিয়া খাইতে প্রবৃত্তি হইত না, বৃক্ষের উপরই অনেক সময় অতিবাহিত করিতাম এবং নিরন্তর ‘রঘুবীর, রঘুবীর’ বলিয়া গম্ভীর স্বরে চীৎকার করিতাম। চক্ষুদ্বয় তখন সর্বদা চঞ্চল ভাব ধারণ করিয়াছিল

এবং আশ্চর্যের বিষয়, মেরুদণ্ডের শেষ ভাগটা ঐ সময়ে প্রায় এক ইঞ্চি বাড়িয়া গিয়াছিল।"* শেষোক্ত কথাটি শুনিয়া আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "মহাশয়, আপনার শরীরের ঐ অংশ কি এখনও ঐরূপ আছে?" উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন, "না, মনের উপর হইতে ঐ ভাবের প্রভুত্ব চলিয়া যাইবার কালে উহা ধীরে ধীরে পূর্বের ন্যায় স্বাভাবিক আকার ধারণ করিয়াছে।"

দাস্যভক্তি সাধনকালে ঠাকুরের জীবনে এক অভূতপূর্ব দর্শন ও অনুভব আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ দর্শন ও অনুভব তাঁহার ইতিপূর্বের দর্শনপ্রত্যক্ষাদি হইতে এক নূতন ধরনের ছিল যে, উহা তাঁহার মনে গভীরভাবে অঙ্কিত হইয়া স্মৃতিতে সর্বক্ষণ জাগরূক ছিল। তিনি

দাস্যভক্তি-সাধনকালে শ্রীশ্রীসীতাদেবীর দর্শনলাভ বিবরণ

বলিতেন, "এইকালে পঞ্চবটীতলে একদিন বসে আছি—ধ্যানচিন্তা কিছু যে করিতেছিলাম তাহা নহে, অমনি বসিয়াছিলাম—এমন সময়ে নিরুপমা জ্যোতির্ময়ী স্ত্রীমূর্তি অদূরে আবির্ভূতা হইয়া স্থান-টিকে আলোকিত করিয়া তুলিল। ঐ মূর্তিটিকেই তখন যে কেবল দেখিতে পাইতেছিলাম তাহা নহে, পঞ্চবটীর গাছপালা, গঙ্গা ইত্যাদি সকল পদার্থই দেখিতে পাইতেছিলাম। দেখিলাম, মূর্তিটি মানবীর, কারণ উহা দেবীদিগের ন্যায় ত্রিনয়নসম্পন্না নহে। কিন্তু প্রেম-দুঃখ-করুণা-সহিষ্ণুতাপূর্ণ সেই মুখের ন্যায় অপূর্ব ওজস্বী গম্ভীরভাব দেবীমূর্তি-সকলেও সচরাচর দেখা যায় না! প্রসন্ন-দৃষ্টিপাতে মোহিত করিয়া ঐ দেবী-মানবী ধীর মন্থর পদে উত্তর দিক হইতে দক্ষিণে আমার দিকে অগ্রসর হইতেছেন! স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, 'কে ইনি?'—এমন

* Enlargement of the Coccyx.

সময়ে একটি হনুমান কোথা হইতে সহসা উ-উপ্ শব্দ করিয়া আসিয়া তাঁহার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল এবং ভিতর হইতে মন বলিয়া উঠিল, 'সীতা, জনম-দুঃখিনী সীতা, জনকরাজনন্দিনী সীতা, রামময়জীবিতা সীতা!' তখন 'মা' 'মা' বলিয়া অধীর হইয়া পদে নিপতিত হইতে যাইতেছি, এমন সময় তিনি চকিতের ন্যায় আসিয়া (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর প্রবিষ্ট হইলেন!—আনন্দে বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া পড়িয়া গেলাম। ধ্যান-চিন্তাদি কিছু না করিয়া এমনভাবে কোন দর্শন ইতিপূর্বে আর হয় নাই। জনম-দুঃখিনী সীতাকে সর্বাগ্রে দেখিয়াছিলাম বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার ন্যায় আজন্ম দুঃখভোগ করিতেছি!"

ঠাকুরের স্বহস্তে পঞ্চবটীরোপণ

তপস্যার উপযুক্ত পবিত্র ভূমির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া ঠাকুর এই সময়ে হৃদয়ের নিকট নূতন একটি পঞ্চবটী* স্থাপনের বাসনা প্রকাশ করেন। হৃদয় বলিত, "পঞ্চবটীর নিকটবর্তী হাঁসপুকুর নামক ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটি তখন ঝালান হইয়াছে এবং পুরাতন পঞ্চবটীর নিকটস্থ নিম্ন জমিখণ্ড ঐ মাটিতে ভরাট করিয়া সমতল করান হওয়ায় ঠাকুর ইতিপূর্বে যে আমলকী

* অশ্বত্থবিল্ববৃক্ষঞ্চ বটধাত্রী-অশোককম্।
বটীপঞ্চকমিত্যুক্তং স্থাপয়েৎ পঞ্চদিক্ষু চ॥
অশ্বত্থং স্থাপয়েৎ প্রাচি বিল্বমুত্তরভাগতঃ।
বটং পশ্চিমভাগে তু ধাত্রীং দক্ষিণতস্তথা॥
অশোকং বহ্নিদিক্‌স্থাপ্যং তপস্যার্থং সুরেশ্বরী।
মধ্যে বেদীং চতুর্হস্তাং সুন্দরীং সুমনোহরাম্॥

ইতি—স্কন্দপুরাণ

বৃক্ষের নিম্নে ধ্যান করিতেন, তাহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" অনন্তর এখন যেখানে সাধনকুটির আছে, তাহারই পশ্চিমে ঠাকুর স্বহস্তে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষ রোপণ করিয়া হৃদয়কে দিয়া বট, অশোক, বেল ও আমলকী বৃক্ষের চারা রোপণ করাইলেন এবং তুলসী ও অপরাজিতার অনেকগুলি চারা পুঁতিয়া সমগ্র স্থানটিকে বেষ্টন করাইয়া লইলেন। গরু-ছাগলের হস্ত হইতে ঐসকল চারাগাছগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য যে অদ্ভুত উপায়ে তিনি 'ভর্তাভারী' নামক ঠাকুরবাটীর উদ্যানের জনৈক মালীর সাহায্যে ঐ স্থানে বেড়া লাগাইয়া লইয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি।* ঠাকুরের যত্নে এবং নিয়মিত জলসিঞ্চনে তুলসী ও অপরাজিতা গাছগুলি অতি শীঘ্রই এত বড ও নিবিড় হইয়া উঠে যে, উহার ভিতরে বসিয়া যখন তিনি ধ্যান করিতেন, তখন ঐ স্থানের বাহিরের ব্যক্তিরা তাঁহাকে কিছুমাত্র দেখিতে পাইত না।

কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার কথা জানাজানি হইবার পরে গঙ্গাসাগর ও ৺জগন্নাথ-দর্শনপ্রয়াসী পথিক-সাধুকুল ঐ তীর্থদ্বয়ে যাইবার কালে কয়েক দিনের জন্য শ্রদ্ধাসম্পন্না রাণীর আতিথ্যগ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর ঠাকুর-বাটীতে বিশ্রাম করিয়া যাইতে আরম্ভ করেন।† ঠাকুর বলিতেন,

ঠাকুরের হঠযোগ-অভ্যাস

ঐরূপে অনেক সাধক ও সিদ্ধপুরুষেরা এখানে পদার্পণ করিয়াছেন। ইঁহাদিগের কাহারও নিকট হইতে উপদিষ্ট হইয়া ঠাকুর এইকালে প্রাণায়ামাদি হঠযোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতেন বলিয়া বোধ হয়। হলধারী-সম্পর্কীয় নিম্নলিখিত ঘটনাটি বলিতে বলিতে একদিন তিনি আমাদিগকে

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়

† গুরুভাব—উত্তরার্ধ, দ্বিতীয় অধ্যায়

ঐ বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন। হঠযোগোক্ত ক্রিয়াসকল স্বয়ং অভ্যাস-পূর্বক উহাদিগের ফলাফল প্রত্যক্ষ করিয়াই তিনি পরজীবনে আমাদিগকে ঐসকল অভ্যাস করিতে নিষেধ করিতেন। আমাদিগের জানা আছে, ঐ বিষয়ে উপদেশলাভের জন্য কেহ কেহ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া উত্তর পাইয়াছেন—"ও-সকল সাধন একালের পক্ষে নয়। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অন্নগতপ্রাণ ; এখন হঠযোগ অভ্যাসপূর্বক শরীর দৃঢ় করিয়া লইয়া রাজযোগসহায়ে ঈশ্বরকে ডাকিবে, তাহার সময় কোথায়? হঠযোগের ক্রিয়াসকল অভ্যাস করিতে হইলে সিদ্ধ গুরুর সঙ্গে নিরন্তর থাকিতে হয় এবং আহার-বিহারাদি সকল বিষয়ে তাঁহার উপদেশ লইয়া কঠোর নিয়মসকল রক্ষা করিতে হয়। নিয়মের এতটুকু ব্যতিক্রমে শরীরে ব্যাধি উপস্থিত এবং অনেক সময় সাধকের মৃত্যুও হইয়া থাকে। সেজন্য ঐসকল করিবার আবশ্যকতা নাই। মননিরোধের জন্যই ত প্রাণায়াম ও কুম্ভকাদি করিয়া বায়ুনিরোধ করা। ঈশ্বরের ভক্তিসংযুক্ত ধ্যানে মন ও বায়ু উভয়ই স্বতোনিরুদ্ধ হইয়া আসিবে। কলিতে জীব অল্পায়ু ও অল্পশক্তি বলিয়া ভগবান কৃপা করিয়া তাহার জন্য ঈশ্বরলাভের পথ সুগম করিয়া দিয়াছেন। স্ত্রী-পুত্রের বিয়োগে প্রাণে যেরূপ ব্যাকুলতা ও অভাববোধ আসে, ঈশ্বরের জন্য সেইরূপ ব্যাকুলতা চব্বিশ ঘণ্টামাত্র কাহারও প্রাণে স্থায়ী হইলে তিনি তাহাকে এককালে দেখা দিবেনই দিবেন।"

হলধারীর অভিশাপ

লীলাপ্রসঙ্গের অন্যত্র একস্থলে আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ভারতের বর্তমানকালে স্মৃত্যনুসারী সাধক-ভক্তেরা প্রায়ই অনুষ্ঠানে তন্ত্রের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত ঐরূপ ব্যক্তিরা প্রায়ই পরকীয়া-প্রেমসাধনরূপ পথে

ধাবিত হন।* বৈষ্ণবমতে প্রীতিসম্পন্ন হলধারীও ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজায় নিযুক্ত হইবার কিছুকাল পরে গোপনে পূর্বোক্ত সাধনপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন। লোকে ঐ কথা জানিতে পারিয়া কানাকানি করিতে থাকে; কিন্তু হলধারী বাক্‌সিদ্ধ, অর্থাৎ যাহাকে যাহা বলিবে তাহাই হইবে, এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি থাকায় কোপে পড়িবার আশঙ্কায় তাহার সম্মুখে ঐ কথা আলোচনা বা হাস্য-পরিহাসাদি করিতে সহসা কেহ সাহসী হইত না। অগ্রজের সম্বন্ধে ঐ কথা ক্রমে ঠাকুর জানিতে পারিলেন এবং ভিতরে ভিতরে জল্পনা করিয়া লোকে তাঁহার নিন্দাবাদ করিতেছে দেখিয়া তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। হলধারী তাহাতে তাঁহার ঐরূপ ব্যবহারের বিপরীত অর্থ গ্রহণপূর্বক সাতিশয় রুষ্ট হইয়া বলিলেন, "কনিষ্ঠ হইয়া তুই আমাকে অবজ্ঞা করিলি? তোর মুখ দিয়া রক্ত উঠিবে!" ঠাকুর তাঁহাকে নানারূপে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিলেও তিনি সে সময়ে কোন কথা শ্রবণ করিলেন না।

উক্ত অভিশাপ কিরূপে সফল হইয়াছিল

ঐ ঘটনার কিছুকাল পরে একদিন রাত্রি আটটা আন্দাজ সময়ে ঠাকুরের তালুদেশ সহসা সাতিশয় সড়সড় করিয়া মুখ দিয়া সত্য সত্যই রক্ত বাহির হইতে লাগিল। ঠাকুর বলিতেন, "সিমপাতার রসের মত তার মিস্‌কাল রং—এত গাঢ় যে, কতক বাহিরে পড়িতে লাগিল এবং কতক মুখের ভিতরে জমিয়া গিয়া সম্মুখের দাঁতের অগ্রভাগ হইতে বটের জটের মত ঝুলিতে লাগিল! মুখের ভিতর কাপড় দিয়া চাপিয়া ধরিয়া রক্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম, তথাপি থামিল না দেখিয়া বড় ভয় হইল। সংবাদ পাইয়া সকলে ছুটিয়া আসিল। হলধারী তখন

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, প্রথম অধ্যায়

মন্দিরে সেবার কাজ সারিতেছিল ; ঐ সংবাদে সেও শশব্যস্তে আসিয়া পড়িল। তাকে বলিলাম, 'দাদা, শাপ দিয়া তুমি আমার এ কি অবস্থা করলে, দেখ দেখি!' আমার কাতরতা দেখিয়া সে কাঁদিতে লাগিল।

"ঠাকুরবাড়ীতে সেদিন একজন প্রাচীন বিজ্ঞ সাধু আসিয়াছিলেন। গোলমাল শুনিয়া তিনিও আমাকে দেখিতে আসিলেন এবং রক্তের রং ও মুখের ভিতরে যে স্থানটা হইতে উহা নির্গত হইতেছে তাহা পরীক্ষা করিয়া বলিলেন—'ভয় নাই, রক্ত বাহির হইয়া বড় ভালই হইয়াছে। দেখিতেছি, তুমি যোগসাধনা করিতে। হঠযোগের চরমে জড়সমাধি হয়, তোমারও ঐরূপ হইতেছিল। সুষুম্নাদ্বার খুলিয়া যাইয়া শরীরের রক্ত মাথায় উঠিতেছিল। মাথায় না উঠিয়া উহা যে এইরূপে মুখের ভিতরে একটা নির্গত হইবার পথ আপনা আপনি করিয়া লইয়া বাহির হইয়া গেল, ইহাতে বড়ই ভাল হইল ; কারণ, জড়সমাধি হইলে উহা কিছুতেই ভাঙ্গিত না। তোমার শরীরটার দ্বারা ৺জগন্মাতার বিশেষ কোন কার্য আছে ; তাই তিনি তোমাকে এইরূপে রক্ষা করিলেন!' সাধুর ঐ কথা শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম।" ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর শাপ ঐরূপে কাকতালীয়ের ন্যায় সফলতা দেখাইয়া বরে পরিণত হইয়াছিল।

হলধারীর সহিত ঠাকুরের আচরণে বেশ একটা মধুর রহস্যের ভাব ছিল। পূর্বে বলিয়াছি হলধারী ঠাকুরের খুল্লতাত-পুত্র ও বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন। আন্দাজ ১২৬৫ সালে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়া তিনি ৺রাধাগোবিন্দজীর পূজাকার্যে ব্রতী হন এবং ১২৭২ সালের কিছুকাল পর্যন্ত ঐ কার্য সম্পন্ন করেন। অতএব ঠাকুরের সাধনকালের দ্বিতীয় চারি বৎসর এবং তাহার পরেও দুই বৎসরের অধিক-

ঠাকুরের সম্বন্ধে হলধারীর ধারণার পুনঃ পুনঃ পরিবর্তনের কথা

কাল দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া তিনি ঠাকুরকে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন। তত্রাচ তিনি ঠাকুরের সম্বন্ধে একটা স্থির ধারণা করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তিনি স্বয়ং বিশেষ নিষ্ঠাচারসম্পন্ন ছিলেন; সুতরাং ভাবাবেশে ঠাকুরের পরিধানে কাপড়, পৈতা, প্রভৃতি ফেলিয়া দেওয়াটা তাঁহার ভাল লাগিত না। ভাবিতেন কনিষ্ঠ যথেচ্ছাচারী অথবা পাগল হইয়াছেন। হৃদয় বলিত—"তিনি কখন কখন আমাকে বলিতেন, 'হৃদু, উনি কাপড় ফেলিয়া দেন, পৈতা ফেলিয়া দেন, এটা বড় দোষের কথা; কত জন্মের পুণ্যে ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম হয়, উনি কিনা সেই ব্রাহ্মণত্বকে সামান্য জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মণাভিমান ত্যাগ করিতে চান! এমন কি উচ্চাবস্থা হইয়াছে, যাহাতে উনি ঐরূপ করিতে পারেন? হৃদু, উনি তোমারই কথা একটু শুনেন, তোমার উচিত যাহাতে উনি ঐরূপ না করিতে পারেন তদ্বিষয়ে লক্ষ্য রাখা; এমন কি বাঁধিয়া রাখিয়াও উঁহাকে যদি তুমি ঐরূপ কার্য হইতে নিরস্ত করিতে পার, তাহাও করা উচিত।'"

আবার পূজা করিতে করিতে ঠাকুরের নয়নে প্রেমধারা ভগবৎ-নামগুণশ্রবণে অদ্ভুত উল্লাস ও ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব ব্যাকুলতা প্রভৃতি দেখিয়া তিনি মোহিত হইয়া ভাবিতেন, নিশ্চয়ই কনিষ্ঠের ঐ সকল অবস্থা ঐশ্বরিক আবেশে হইয়া থাকে, নতুবা সাধারণ মানুষের কখন ত ঐরূপ হইতে দেখা যায় না। ভাবিয়া হলধারী আবার কখন কখন হৃদয়কে বলিতেন, "হৃদয়, তুমি নিশ্চয় উঁহার ভিতরে কোনরূপ আশ্চর্য দর্শন পাইয়াছ, নতুবা এত করিয়া উঁহার এত সেবা করিতে না।"

ঐরূপে হলধারীর মন সর্বদা সন্দেহে দোলায়মান থাকিয়া ঠাকুরের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে একটা স্থির মীমাংসায় কিছুতেই উপনীত হইতে

পারিত না। ঠাকুর বলিতেন, "আমার পূজা দেখিয়া মোহিত হইয়া হলধারী কতদিন বলিয়াছে, 'রামকৃষ্ণ, এইবার আমি তোকে চিনিয়াছি।' তাতে কখন কখন আমি রহস্য করিয়া বলিতাম, 'দেখো, আবার যেন গোলমাল হয়ে না যায়!' সে বলিত, 'এবার আর তোর ফাঁকি দিবার জো নেই; তোতে নিশ্চয়ই ঈশ্বরীয় আবেশ আছে; এবার একেবারে ঠিক ঠাক বুঝিয়াছি।' শুনিয়া বলিতাম, 'আচ্ছা, দেখা যাবে।' অনন্তর মন্দিরের দেবসেবা সম্পূর্ণ করিয়া এক টিপ নস্য লইয়া হলধারী যখন শ্রীমদ্ভাগবত গীতা বা অধ্যাত্মরামায়ণাদি শাস্ত্র বিচার করিতে বসিত, তখন অভিমানে ফুলিয়া উঠিয়া একেবারে অন্য লোক হইয়া যাইত। আমি তখন সেখানে উপস্থিত হইয়া বলিতাম, 'তুমি শাস্ত্রে যা যা পড়ছ, সে-সব অবস্থা আমার উপলব্ধি হয়েছে, আমি ওসব কথা বুঝতে পারি।' শুনিয়াই সে বলিয়া উঠিত, 'হাঁ, তুই গণ্ডমূর্খ, তুই আবার এসব কথা বুঝবি!' আমি বলিতাম (নিজের শরীর দেখাইয়া), 'সত্য বলছি, এর ভিতরে যে আছে, সে সকল কথা বুঝিয়ে দেয়। এই যে তুমি কিছুক্ষণ পূর্বে বললে ইহার ভিতর ঈশ্বরীয় আবেশ আছে—সেই-ই সকল কথা বুঝিয়ে দেয়।' হলধারী ঐ কথা শুনিয়া গরম হইয়া বলিত, 'যাঃ যাঃ মূর্খ কোথাকার, কলিতে কল্কি ছাড়া আর ঈশ্বরের অবতার হবার কথা কোন্ শাস্ত্রে আছে? তুই উন্মাদ হইয়াছিস্, তাই ঐরূপ ভাবিস্।' হাসিয়া বলিতাম, 'এই যে বলেছিলে আর গোল হবে না';—কিন্তু সে কথা তখন শোনে কে? এইরূপ এক আধ দিন নয়; অনেক দিন হইয়াছিল। পরে একদিন সে দেখিতে পাইল, ভাবাবিষ্ট হইয়া বস্ত্র ত্যাগপূর্বক বৃক্ষের উপরে বসিয়া আছি এবং বালকের ন্যায় তদবস্থায়

নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিয়াই হলধারীর উচ্চ ধারণার লোপ

মন্ত্রত্যাগ করিতেছি—সেইদিন হইতে সে একেবারে পাকা করিল (স্থিরনিশ্চয় করিল) আমাকে ব্রহ্মদৈত্যে পাইয়াছে !”

হলধারীর শিশুপুত্রের মৃত্যুর কথা আমরা ইতিপূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐদিন হইতে তিনি ৺কালীমূর্তিকে তমোগুণময়ী বা তামসী বলিয়া ধারণা করিয়াছিলেন। একদিন ঠাকুরকে ঐ কথা বলিয়াও ফেলেন, “তামসী মূর্তির উপাসনায় কখন আধ্যাত্মিক উন্নতি হইতে পারে কি ? তুমি ঐ দেবীর আরাধনা কর কেন ?” ঠাকুর ঐকথা শুনিয়া তখন তাহাকে কিছু বলিলেন না, কিন্তু ইষ্টনিন্দাশ্রবণে তাঁহার অন্তর ব্যথিত হইল। অনন্তর কালীমন্দিরে যাইয়া সজলনয়নে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মা, হলধারী শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত—সে তোকে তমোগুণময়ী বলে ; তুই কি সত্যই ঐরূপ ?” অনন্তর ৺জগদম্বার মুখে ঐ বিষয়ে যথার্থ তত্ত্ব জানিতে পারিয়া ঠাকুর উল্লাসে উৎসাহিত হইয়া হলধারীর নিকট ছুটিয়া যাইলেন এবং একেবারে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া বসিয়া উত্তেজিত স্বরে বারংবার বলিতে লাগিলেন, “তুই মাকে তামসী বলিস্ ? মা কি তামসী ? মা যে সব—ত্রিগুণময়ী, আবার শুদ্ধসত্ত্বগুণময়ী !” ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐরূপ কথায় ও স্পর্শে হলধারীর তখন যেন অন্তরের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইল ! তিনি তখন পূজার আসনে বসিয়াছিলেন—ঠাকুরের ঐ কথা অন্তরের সহিত স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার ভিতর সাক্ষাৎ জগদম্বার আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া সম্মুখস্থ ফুলচন্দনাদি লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে ভক্তিভরে অঞ্জলি প্রদান করিলেন ! উহার কিছুক্ষণ পরে হৃদয় আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মামা, এই তুমি বল রামকৃষ্ণকে ভূতে পাইয়াছে, তবে আবার তাঁহাকে ঐরূপে

৺কালীকে তমোগুণময়ী বলায় ঠাকুরের হলধারীকে শিক্ষাদান

পূজা কারলে যে ?" হলধারী বলিলেন, "কি জানি, হৃদু, কালীঘর হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে আমাকে কি যে একরকম করিয়া দিল, আমি সব ভুলিয়া তার ভিতর সাক্ষাৎ ঈশ্বরপ্রকাশ দেখিতে পাইলাম! কালী-মন্দিরে যখনই আমি রামকৃষ্ণের কাছে যাই, তখনই আমাকে ঐরূপ করিয়া দেয়! এ এক চমৎকার ব্যাপার—কিছু বুঝিতে পারি না!"

ঐরূপে হলধারী ঠাকুরের ভিতর বারংবার দৈব প্রকাশ দেখিতে পাইলেও নস্য লইয়া শাস্ত্রবিচার করিতে বসিলেই পাণ্ডিত্যাভিমানে মত্ত হইয়া 'পুনর্মূষিকত্ব' প্রাপ্ত হইতেন। কামকাঞ্চনে আসক্তি দূর না হইলে বাহ্যশৌচ, সদাচার ও শাস্ত্রজ্ঞান যে বিশেষ কাজে লাগে না এবং মানবকে সত্য তত্ত্বের ধারণা করাইতে পারে না, হলধারীর পূর্বোক্ত ব্যাপার হইতে একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। ঠাকুরবাড়ীতে প্রসাদ পাইতে সমাগত কাঙ্গালীদিগকে নারায়ণজ্ঞান করিয়া ঠাকুর এক সময়ে তাহাদের ভোজনাবশেষ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন—একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। হলধারী উহা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোর ছেলেমেয়ের কেমন করিয়া বিবাহ হয়, তাহা দেখিব!" জ্ঞানাভিমানী হলধারীর মুখে ঐরূপ কথা শুনিয়া ঠাকুর উত্তেজিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তবে রে শালা, শাস্ত্রব্যাখ্যা করবার সময় তুই না বলিস্, জগৎ মিথ্যা ও সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টি করতে হয়? তুই বুঝি ভাবিস, আমি তোর মত জগৎ মিথ্যা বল্‌বো, অথচ ছেলে-মেয়ের বাপ হব! ধিক্ তোর শাস্ত্রজ্ঞানে!"

কাঙ্গালীদিগের পাত্রাবশেষ ভোজন করিতে দেখিয়া হলধারীর ঠাকুরকে ভর্ৎসনা ও ঠাকুরের উত্তর

বালকস্বভাব ঠাকুর আবার কখন কখন হলধারীর পাণ্ডিত্যে ভুলিয়া ইতিকর্তব্যতা বিষয়ে শ্রীশ্রীজগন্মাতার মতামতগ্রহণ করিতে ছুটিতেন।

আমরা শুনিয়াছি, ভাবসহায়ে ঐশ্বরিক স্বরূপ সম্বন্ধে যে-সকল অনুভূতি হয়, সে-সকলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিয়া এবং ঈশ্বরকে ভাবাভাবের অতীত বলিয়া শাস্ত্রসহায়ে নির্দেশ করিয়া হলধারী ঠাকুরের মনে একদিন বিষম সন্দেহের উদয় করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিলাম, তবে তো ভাবাবেশে যত কিছু ঈশ্বরীয় রূপ দেখিয়াছি, আদেশ পাইয়াছি, সে সমস্ত ভুল; মা তো তবে আমায় ফাঁকি দিয়াছে! মন বড়ই ব্যাকুল হইল এবং অভিমানে কাঁদিতে কাঁদিতে মাকে বলিতে লাগিলাম—'মা, নিরক্ষর মুখ্‌খু বলে আমাকে কি এমনি করে ফাঁকি দিতে হয়?'—সে কান্নার তোড় (বেগ) আর থামে না! কুঠির ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কি, সহসা মেঝে হইতে কুয়াসার মত ধোঁয়া উঠিয়া সামনের কতকটা স্থান পূর্ণ হইয়া গেল! তারপর দেখি, তাহার ভিতরে আবক্ষলম্বিতশ্মশ্রু একখানি গৌরবর্ণ জীবন্ত সৌম্য মুখ! ঐ মূর্তি আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে গম্ভীরস্বরে বলিলেন—'ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্, ভাবমুখে থাক্!'—তিনবার মাত্র ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঐ মূর্তি ধীরে ধীরে আবার ঐ কুয়াসায় গলিয়া গেল এবং ঐ কুয়াসার মত ধূমও কোথায় অন্তর্হিত হইল! ঐরূপ দেখিয়া সেবার শান্ত হইলাম।" ঘটনাটি ঠাকুর একদিন স্বামী প্রেমানন্দকে স্বমুখে বলিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "হলধারীর কথায় ঐরূপ সন্দেহ আর একবার মনে উঠিয়াছিল; সেবার পূজা করিতে করিতে মাকে ঐ বিষয়ের মীমাংসার জন্য কাঁদিয়া ধরিয়াছিলাম; মা ঐ সময়ে 'রতির মা' নাম্নী একটি স্ত্রীলোকের বেশে ঘটের পার্শ্বে আবির্ভূতা হইয়া বলিয়াছিলেন, 'তুই ভাবমুখে থাক্!"

হলধারীর পাণ্ডিত্যে ঠাকুরের মনে সন্দেহের উদয় ও শ্রীশ্রীজগদম্বার পুনর্দর্শন ও প্রত্যাদেশলাভ—'ভাবমুখে থাক্'

আবার পরিব্রাজকাচার্য তোতাপুরী গোস্বামী বেদান্তজ্ঞান উপদেশ করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাইবার পর ঠাকুর যখন ছয়মাস কাল ধরিয়া নিরন্তর নির্বিকল্প ভূমিতে বাস করিয়াছিলেন, তখনও ঐ কালের অন্তে শ্রীশ্রীজগদম্বার অশরীরী বাণী প্রাণে প্রাণে শুনিতে পাইয়াছিলেন—'তুই ভাবমুখে থাক্ !'

হলধারী কালীবাটীতে কতকাল ছিলেন

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে হলধারী প্রায় সাত বৎসর বাস করিয়াছিলেন। সুতরাং পিশাচবৎ আচারবান পূর্ণজ্ঞানী সাধুর, ব্রাহ্মণীর, জটাধারী নামক রামায়েৎ সাধুর, ও শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে পর পর আগমন তিনি স্বচক্ষে দেখিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনা গিয়াছে, হলধারী শ্রীমৎ তোতাপুরীর সহিত একত্রে কখন কখন অধ্যাত্ম-রামায়ণাদি শাস্ত্র পাঠ করিতেন। অতএব হলধারী-সংক্রান্ত ঘটনাগুলি পূর্বোক্ত সাত বৎসরের ভিতর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে উপস্থিত হইয়াছিল। বলিবার সুবিধার জন্য আমরা ঐকল পাঠককে একত্রে বলিয়া লইলাম।

ঠাকুরের দিব্যোন্মাদাবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা

ঠাকুরের সাধক-জীবনের কথা আমরা যতদূর আলোচনা করিলাম, তাহাতে একথা নিঃসংশয়ে বুঝা যায়, কালীবাটীর জনসাধারণের নয়নে তিনি এখন উন্মত্ত বলিয়া পরিগণিত হইলেও মস্তিষ্কের বিকার বা ব্যাধিপ্রসূত সাধারণ উন্মাদাবস্থা তাঁহার উপস্থিত হয় নাই। ঈশ্বরদর্শনের জন্য তাঁহার অন্তরে তীব্র ব্যাকুলতার উদয় হইয়াছিল এবং উহার প্রভাবে তিনি ঐকালে আত্মসংবরণ করিতে পারিতেছিলেন না! অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বালাময়ী ঐরূপ ব্যাকুলতা হৃদয়ে নিরন্তর ধারণপূর্বক সাধারণ বিষয়সকলে সাধারণের ন্যায় যোগদানে সক্ষম হইতেছিলেন না।

বলিয়াই লোকে বলিতেছিল, তিনি উন্মাদ হইয়াছেন। কেই বা ঐরূপ করিতে পারে? হৃদয়ের তীব্র বেদনা মানবের স্বাভাবিক সহ্যগুণকে যখন অতিক্রম করে, কেহই তখন মুখে একপ্রকার এবং ভিতরে অন্য-প্রকার ভাব রাখিয়া সংসারে সকলের সহিত একযোগে চলিতে পারে না। বলিতে পার, সহ্যগুণের সীমা কিন্তু সকলের পক্ষে এক নহে, কেহ অল্প সুখদুঃখেই বিচলিত হইয়া পড়ে, আবার কেহ বা তদুভয়ের গভীর বেগ হৃদয়ে ধরিয়াও সমুদ্রবৎ অচল অটল থাকে; অতএব ঠাকুরের সহ্যগুণের সীমার পরিমাণটা বুঝিব কিরূপে? উত্তরে বলিতে পারা যায়, তাঁহার জীবনের অন্যান্য ঘটনাবলীর অনুধাবন করিলেই উহা যে অসাধারণ ছিল, একথা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে; দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর কাল অর্ধাশন, অনশন ও অনিদ্রায় থাকিয়া যিনি স্থির থাকিতে পারেন, অতুল সম্পত্তি বারংবার পদে আসিয়া পড়িলে ঈশ্বরলাভের পথে অন্তরায় বলিয়া যিনি উহা ততোধিকবার প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন—ঐরূপ কত কথাই না বলিতে পারা যায়—তাঁহার শরীর ও মনের অসাধারণ ধৈর্যের কথা কি আবার বলিতে হইবে?

অজ্ঞ ব্যক্তিরাই ঐ অবস্থাকে ব্যাধি-জনিত ভাবিয়াছিল, সাধকেরা নহে

এই কালের ঘটনাবলীর অনুধাবনে দেখিতে পাওয়া যায়, কাম-কাঞ্চনোন্মত্ত বদ্ধ জীবের চক্ষেই তাঁহার পূর্বোক্ত অবস্থা ব্যাধিজনিত বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। দেখা যায়, মথুরানাথকে ছাড়িয়া দিলে কল্পনাযুক্তিসহায়ে তাঁহার মানসিক অবস্থার বিষয় আংশিকভাবেও, নির্ধারণ করিতে পারে, এমন কোন লোক ঐ কালে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত ছিল না। শ্রীযুত কেনারাম ভট্ট ঠাকুরকে দীক্ষা দিয়াই কোথায় যে অন্তর্হিত হইয়াছিলেন, বলিতে পারি না; কারণ

ঐ ঘটনার পরে তাঁহার কথা হৃদয় বা অন্য কাহারও মুখে শুনিতে পাওয়া যায় নাই। ঠাকুরবাটীর মূর্খ লুব্ধ কর্মচারিগণ ঠাকুরের এইকালের ক্রিয়াকলাপ ও মানসিক অবস্থার বিষয়ে যে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, তাহা প্রমাণের মধ্যে গণ্য হইতে পারে না। অতএব কালীবাটীতে সমাগত সিদ্ধ ও সাধকগণ তাঁহার অবস্থা সম্বন্ধে এই কালে যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই ঐ বিষয়ে একমাত্র বিশ্বস্ত প্রমাণ। ঠাকুরের নিজের ও অন্যান্য ব্যক্তিদিগের নিকটে ঐ বিষয়ে যাহা শুনা গিয়াছে তাহাতে জানা যায়, তাঁহারা তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত স্থির করা দূরে থাকুক, তাঁহার সম্বন্ধে সর্বদা অতি উচ্চ ধারণা করিয়াছিলেন।

পরবর্তী কালের কথাসকলের আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাইব, ঈশ্বরলাভের প্রবল ব্যাকুলতায় ঠাকুর যতক্ষণ না এককালে দেহবোধরহিত হইয়া পড়িতেন, ততক্ষণ শারীরিক কল্যাণের জন্য তাঁহাকে যে যাহা করিতে বলিত, তাহা তৎক্ষণাৎ অনুষ্ঠান করিতেন। পাঁচজনে বলিল, তাঁহার চিকিৎসা করান হউক, তাহাতে তিনি সম্মত হইলেন; কামারপুকুরে তাঁহার মাতার নিকট লইয়া যাওয়া হউক, তাহাতে সম্মত হইলেন; বিবাহ দেওয়া হউক, তাহাতেও অমত করিলেন না!—এরূপাবস্থায় উন্মত্তের কার্যকলাপের সহিত তাঁহার আচরণাদির কেমন করিয়া তুলনা করা যাইতে পারে?

এই কালের কার্যকলাপ দেখিয়া ঠাকুরকে ব্যাধিগ্রস্ত বলা চলে না

আবার দেখিতে পাওয়া যায়, দিব্যোন্মাদ-অবস্থালাভের কাল হইতে ঠাকুর বিষয়ী লোক ও বিষয়সংক্রান্ত ব্যাপারসকল হইতে সর্বদা দূরে থাকিতে যত্নবান হইলেও বহু লোক একত্র হইয়া যেখানে কোনভাবে ঈশ্বরের পূজাকীর্তনাদি করিতেছে, সেখানে যাইতে এবং তাহাদিগের

সহিত যোগদান করিতে কোনরূপ আপত্তি করা দূরে থাকুক, বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বরাহনগরে ৺দশমহাবিদ্যাদর্শন, কালীঘাটে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দেখিতে গমন এবং এখন হইতে প্রায় প্রতি বৎসর পানিহাটির মহোৎসবে যোগদান হইতে তাঁহার সম্বন্ধে ঐ কথা বেশ বুঝা যায়। ঐসকল স্থানেও শাস্ত্রজ্ঞ সাধকদিগের সহিত তাঁহার কখন কখন দর্শন-সম্ভাষণাদি হইয়াছিল। তদ্বিষয়ে আমরা অল্প অল্প যাহা জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি, ঐসকল সাধকও তাঁহাকে উচ্চাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা ঠাকুরের সন ১২৬৫ সালে (ইংরাজী ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে) পানিহাটি মহোৎসবদর্শনে গমন করিবার কথা উল্লেখ করিতে পারি। উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র বৈষ্ণবচরণকে তিনি ঐদিন প্রথম দেখিয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকটে এবং ঠাকুরের নিজমুখেও আমাদের কেহ কেহ শুনিয়াছেন, ঐ দিবস পানিহাটিতে গমন করিয়া তিনি শ্রীযুক্ত মনিমোহন সেনের ঠাকুরবাটীতে বসিয়াছিলেন, এমন সময়ে বৈষ্ণবচরণ তথায় উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে দেখিয়াই আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থাসম্পন্ন অদ্বিতীয় মহাপুরুষ বলিয়া স্থির-নিশ্চয় করেন। বৈষ্ণবচরণ সেদিন অধিকাংশ কাল উৎসবক্ষেত্রে তাঁহার সঙ্গে অতিবাহিত করেন এবং নিজ ব্যয়ে চিড়া, মুড়কি, আম ইত্যাদি ক্রয় করিয়া 'মালসা ভোগের' বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে লইয়া আনন্দ করিয়াছিলেন। আবার, উৎসবান্তে কলিকাতা ফিরিবার কালে তিনি পুনরায় দর্শনলাভের জন্য রাণী রাসমণির কালীবাটীতে নামিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধান করিয়াছিলেন; এবং তিনি তখনও উৎসবক্ষেত্র হইতে

১২৬৫ সালে পানিহাটি মহোৎসবে বৈষ্ণব-চরণের ঠাকুরকে প্রথম দর্শন ও ধারণা

প্রত্যাগমন করেন নাই জানিতে পারিয়া ক্ষুন্নমনে চলিয়া আসিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার তিন চারি বৎসর পরে বৈষ্ণবচরণ কিরূপে পুনরায় ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন এবং তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন, সে-সকল কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি।

এই চারি বৎসরের ভিতরেই আবার ঠাকুর মন হইতে কাঞ্চনাসক্তি এককালে দূর করিবার জন্য কয়েক খণ্ড মুদ্রা মৃত্তিকার সহিত একত্রে হস্তে গ্রহণ করিয়া সদসদ্বিচারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সচ্চিদানন্দস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করা যে ব্যক্তি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছে, সে মৃত্তিকার ন্যায় কাঞ্চন হইতেও ঐ বিষয়ে কোন সহায়তা লাভ করে না। সুতরাং তাঁহার নিকটে মৃত্তিকা ও কাঞ্চন উভয়ের সমান মূল্য। ঐ কথা দৃঢ় ধারণার জন্য তিনি বারংবার 'টাকা মাটি', 'মাটি টাকা' বলিতে বলিতে কাঞ্চন লাভ করিবার বাসনার সহিত হস্তস্থিত মৃত্তিকা ও মুদ্রাসকল গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করিয়াছিলেন। ঐরূপে আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত বস্তু ও ব্যক্তিসকলকে শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ ও অংশ-রূপে ধারণার জন্য কাঙ্গালাদের ভোজনাবশিষ্ট গ্রহণপূর্বক ভোজনস্থান পরিষ্কার করা—সকলের ঘৃণার পাত্র মেথর অপেক্ষাও তিনি কোন অংশে বড় নহেন, একথা ধারণাপূর্বক মন হইতে অভিমান অহঙ্কার পরিহারের জন্য অশুচি স্থান ধৌত করা—চন্দন হইতে বিষ্ঠা পর্যন্ত সকল পদার্থ পঞ্চভূতের বিকারপ্রসূত জানিয়া হেয়োপাদেয় জ্ঞান দূর করিবার জন্য জিহ্বার দ্বারা অপরের বিষ্ঠা নির্বিকারচিত্তে স্পর্শ করা প্রভৃতি যে-সকল অশ্রুতপূর্ব সাধনকথা ঠাকুরের সম্বন্ধে শুনিতে

ঠাকুরের এই কালের অন্যান্য সাধন—'টাকা মাটি, মাটি টাকা'; অশুচি স্থান পরিষ্কার; চন্দন-বিষ্ঠায় সমজ্ঞান

গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

পাওয়া যায়, তাহাও এই কালে সাধিত হইয়াছিল। প্রথম চারি বৎসরের ঐসকল সাধন ও দর্শনের কথা অনুধাবন করিলে ঈশ্বরলাভের জন্য তাঁহার মনে কি অসাধারণ আগ্রহ ঐকালে আধিপত্য করিয়াছিল এবং কি অলৌকিক বিশ্বাসের সহিত তিনি সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐ সঙ্গে একথাও নিশ্চয় ধারণা হয় যে, অপর কোন ব্যক্তির নিকট হইতে সাহায্য না পাইয়া একমাত্র ব্যাকুলতা-সহায়ে তিনি ঐকালের ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণদর্শন লাভপূর্বক সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন এবং সাধনার চরম ফল করগত করিয়া গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ অপূর্ব প্রত্যক্ষসকল মিলাইতেই পরবর্তী কালে অগ্রসর হইয়াছিলেন!

পরিশেষে নিজ মনই সাধকের গুরু হইয়া দাঁড়ায়। ঠাকুরের মনের এইকালে গুরুবৎ আচরণের দৃষ্টান্ত, (১) সূক্ষ্মদেহে কীর্তনানন্দ

নিরন্তর ত্যাগ ও সংযম অভ্যাসপূর্বক সাধক যখন নিজ মনকে সম্পূর্ণরূপে বশীভূত করিয়া পবিত্র হয়, ঠাকুর বলিতেন, ঐ মনই তখন তাহার গুরু হইয়া থাকে। ঐরূপ শুদ্ধ মনে যে সকল ভাবতরঙ্গ উঠিতে থাকে, সে-সকল বিপথগামী করা দূরে থাকুক, তাহাকে গন্তব্য লক্ষ্যে আশু পৌঁছাইয়া দেয়। অতএব বুঝা যাইতেছে, ঠাকুরের আজন্ম পরিশুদ্ধ মন গুরুর ন্যায় পথ প্রদর্শন করিয়া সাধনার প্রথম চারি বৎসরেই তাঁহাকে ঈশ্বরলাভবিষয়ে সিদ্ধকাম করিয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, উহা তাঁহাকে ঐকালে কোন্ কার্য করিতে হইবে এবং কোন্টি হইতে বিরত থাকিতে হইবে, তাহা শিক্ষা দিয়াই নিশ্চিন্ত ছিল না, কিন্তু সময়ে সময়ে মূর্তি পরিগ্রহপূর্বক পৃথক্ এক ব্যক্তির ন্যায় দেহমধ্য হইতে তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সাধনপথে উৎসাহিত করিত, ভয়

প্রদর্শনপূর্বক ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিত, অনুষ্ঠানবিশেষ কেন করিতে হইবে তাহা বুঝাইয়া দিত এবং কৃত কার্যের ফলাফল জানাইয়া দিত! ঐ কালে ধ্যান করিতে বসিয়া তিনি দেখিতেন, শাণতত্রিশূল-ধারী জনৈক সন্ন্যাসী দেহমধ্য হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাকে বলিতেছেন, "অন্য চিন্তাসকল পরিত্যাগপূর্বক ইষ্টচিন্তা যদি না করিবি ত এই ত্রিশূল তোর বুকে বসাইয়া দিব!" অন্য এক সময়ে দেখিয়াছিলেন—ভোগ-বাসনাময় পাপপুরুষ শরীরমধ্য হইতে বিনিষ্ক্রান্ত হইলে, ঐ সন্ন্যাসী যুবকও সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে আসিয়া ঐ পুরুষকে নিহত করিলেন! দূরস্থ দেব-দেবীর মূর্তিদর্শনে অথবা কীর্তনাদিশ্রবণে অভিলাষী হইয়া ঐ সন্ন্যাসী যুবক কখন কখন ঐরূপে দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া জ্যোতির্ময় পথে ঐসকল স্থানে গমন করিতেন এবং কিয়ৎকাল আনন্দ উপভোগপূর্বক পুনরায় পূর্বোক্ত জ্যোতির্ময় বর্ত্ম-অবলম্বনে আসিয়া তাঁহার শরীরমধ্যে প্রবিষ্ট হইতেন!—ঐরূপ নানা দর্শনের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি।

(২) নিজ শরীরের ভিতরে যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন ও উপদেশলাভ

সাধনকালের প্রায় প্রারম্ভ হইতে ঠাকুর দর্পণে দৃষ্ট প্রতিবিম্বের ন্যায় তাঁহারই অনুরূপ আকারবিশিষ্ট শরীরমধ্যগত ঐ যুবক সন্ন্যাসীর দর্শন পাইয়াছিলেন এবং ক্রমে সকল কার্যের মীমাংসাস্থলে তাঁহার পরামর্শ মত চলিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলেন। সাধকজীবনের অপূর্ব অনুভব-প্রত্যক্ষাদির প্রসঙ্গ করিতে করিতে তিনি একদিন ঐ বিষয় আমাদিগকে নিম্নলিখিতভাবে বলিয়াছিলেন: "আমারই ন্যায় দেখিতে এক যুবক সন্ন্যাসীমূর্তি ভিতর হইতে যখন তখন বাহির হইয়া আমাকে সকল বিষয়ে উপদেশ দিত। সে ঐরূপে বাহিরে আসিলে

কখন সামান্য বাহ্যজ্ঞান থাকিত এবং কখন বা উহা এককালে হারাইয়া জড়বৎ পড়িয়া থাকিয়া কেবল তাহারই চেষ্টা ও কথা দেখিতে এবং শুনিতে পাইতাম! তাহার মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলাম, সেইসকল তত্ত্বকথাই ব্রাহ্মণী, ন্যাঙ্গটা (শ্রীমৎ তোতাপুরী) প্রভৃতি আসিয়া পুনরায় উপদেশ দিয়াছিলেন। যাহা জানিতাম, তাহাই তাঁহারা জানাইয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে বোধ হয়, শাস্ত্রবিধির মান্য রক্ষা করাইবার জন্যই তাঁহারা গুরুরূপে জীবনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নতুবা ন্যাঙ্গটা প্রভৃতিকে গুরুরূপে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।"

সাধনার প্রথম চারি বৎসরের শেষভাগে ঠাকুর যখন কামারপুকুরে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ঐ বিষয়ক আর একটি অপূর্ব দর্শন তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইয়াছিল। শিবিকারোহণে কামারপুকুর হইতে সিহড় গ্রামে হৃদয়ের বাটীতে যাইবার কালে তাঁহার ঐ দর্শন উপস্থিত হয়। উহারই কথা এখন পাঠককে বলিব—সুনীল অম্বরতলে বিস্তীর্ণ প্রান্তর, শ্যামল ধান্যক্ষেত্র, বিহগকূজিত শীতলছায়াময় অশ্বত্থবট-বৃক্ষরাজি এবং মধুগন্ধ-কুসুম-ভূষিত তরুলতা প্রভৃতি অবলোকনপূর্বক প্রফুল্লমনে যাইতে যাইতে ঠাকুর দেখিলেন, তাঁহার দেহমধ্য হইতে দুইটি কিশোরবয়স্ক সুন্দর বালক সহসা বহির্গত হইয়া বন্যপুষ্পাদির অন্বেষণে কখন প্রান্তরমধ্যে বহুদূরে গমন, আবার কখন বা শিবিকার সন্নিকটে আগমনপূর্বক হাস্য, পরিহাস, কথোপকথনাদি নানা চেষ্টা করিতে করিতে অগ্রসর হইতে লাগিল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত ঐরূপে আনন্দে বিহার করিয়া তাহারা পুনরায় তাঁহার দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইল

(৩) সিহড় যাইবার পথে ঠাকুরের দর্শন। উক্ত দর্শন সম্বন্ধে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর মীমাংসা

ঐ দর্শনের প্রায় দেড় বৎসর পরে ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। কথাপ্রসঙ্গে এক দিবস ঠাকুরের নিকটে ঐ দর্শনের বিবরণ শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "বাবা, তুমি ঠিক দেখিয়াছ; এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব—শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্য এবার একসঙ্গে একাধারে আসিয়া তোমার ভিতরে রহিয়াছেন! সেইজন্যই তোমার ঐরূপ দর্শন হইয়াছিল।" হৃদয় বলিত, ঐকথা বলিয়া ব্রাহ্মণী চৈতন্য-ভাগবত হইতে নিম্নের শ্লোক দুইটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন—

অদ্বৈতের গলা ধরি কহেন বার বার
পুনঃ যে করিব লীলা মোর চমৎকার।
কীর্তনে আনন্দরূপ হইবে আমার॥
অদ্যাবধি গৌরলীলা করেন গৌররায়।
কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়॥

আমরা এক দিবস তাঁহাকে ঐ দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করায় ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ঐরূপ দেখিয়াছিলাম সত্য। ব্রাহ্মণী তাহা শুনিয়া ঐরূপ বলিয়াছিল, একথাও সত্য। কিন্তু উহার যথার্থ অর্থ যে কি, তাহা কেমন করিয়া বলি, বল?" যাহা হউক, ঐসকল দর্শনের কথা শুনিয়া মনে হয়,

উক্ত দর্শন হইতে যাহা বুঝিতে পারা যায়

তিনি এই সময় হইতে জানিতে পারিয়াছিলেন, বহু প্রাচীনকাল হইতে পৃথিবীতে সুপরিচিত কোন আত্মা তাঁহার শরীরমনে আমিত্বাভিমান লইয়া প্রয়োজনবিশেষ সিদ্ধির জন্য অবস্থান করিতেছে! ঐরূপে নিজ ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে যে অলৌকিক আভাস তিনি এখন পাইতেছিলেন,

তাহাই কালে সুস্পষ্ট হইয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিয়াছিল—যিনি পূর্ব পূর্ব যুগে ধর্মসংস্থাপনের জন্য অযোধ্যা ও শ্রীবৃন্দাবনে জানকীবল্লভ শ্রীরামচন্দ্র ও রাধাবল্লভ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনিই এখন পুনরায় ভারত ও জগৎকে নবীন ধর্মাদর্শদানের জন্য নূতন শরীর পরিগ্রহপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে বারংবার বলিতে শুনিয়াছি, "যে রাম, যে কৃষ্ণ হইয়াছিল, সেই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতরে আসিয়াছে—রাজা যেমন কখন কখন ছদ্মবেশে নগরভ্রমণে বহির্গত হয়, সেইরূপ গুপ্তভাবে সে এইবার পৃথিবীতে আগমন করিয়াছে!"

পূর্বোক্ত দর্শনটির সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে হইলে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটে ঠাকুর ঐরূপে নিজ ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে বিশ্বাস ভিন্ন অপর কোন উপায় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কিন্তু ঐ দর্শনটির কথা ছাড়িয়া দিলে তাঁহার এই কালের অপর দর্শনসমূহের সত্যতাসম্বন্ধে আমরা নিশ্চিত ধারণা করিতে পারি। কারণ, ঐরূপ দর্শনাদি আমাদের সময়ে ঠাকুরের জীবনে নিত্য উপস্থিত হইত এবং তাঁহার ইংরেজী-শিক্ষিত সন্দেহশীল শিষ্যবর্গ ঐসকল পরীক্ষা করিতে যাইয়া প্রতিদিন পরাজিত ও স্তম্ভিত হইত। ঐ বিষয়ক কয়েকটি উদাহরণ* 'লীলাপ্রসঙ্গে'র অন্যত্র থাকিলেও পাঠকের তৃপ্তির জন্য আর একটি দৃষ্টান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ঠাকুরের দর্শনসমূহ কখনও মিথ্যা হয় নাই

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ, আশ্বিন মাস, ৺শারদীয় পূজা-মহোৎসবে

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়

কলিকাতা নগরীর আবালবৃদ্ধবনিতা প্রতি বৎসর যেমন মাতিয়া থাকে, সেইরূপ মাতিয়াছে। সে আনন্দের প্রবাহ ঠাকুরের ভক্তদিগের প্রাণে বিশেষরূপে অনুভূত হইলেও উহার বাহ্যপ্রকাশের পথে বিশেষ বাধা উপস্থিত হইয়াছে। কারণ, যাঁহাকে লইয়া তাহাদের আনন্দোল্লাস, তাঁহার শরীরই এখন অসুস্থ—ঠাকুর গলরোগে আক্রান্ত। কলিকাতার শ্যামপুকুর পল্লীস্থ একটি দ্বিতল বাটী ভাড়া* করিয়া প্রায় মাসাবধি

উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত—১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শ্রীসুরেশচন্দ্র মিত্রের বাটীতে ৺দুর্গাপূজা-কালে ঠাকুরের দর্শন-বিবরণ

হইল ভক্তেরা তাঁহাকে আনিয়া রাখিয়াছে এবং সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল সরকার ঔষধপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহাকে রোগমুক্ত করিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু ব্যাধির উপশম এ পর্যন্ত কিছুমাত্র হয় নাই, উত্তরোত্তর উহা বৃদ্ধিই হইতেছে। গৃহস্থ ভক্তেরা সকাল সন্ধ্যা ঐ বাটীতে আগমনপূর্বক সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান ও বন্দোবস্ত করিতেছে এবং যুবক-ছাত্র ভক্তদলের ভিতর অনেকে নিজ নিজ বাটীতে আহারাদি করিতে যাওয়া ভিন্ন অন্য সময়ে ঠাকুরের সেবায় লাগিয়া রহিয়াছে; আবশ্যক বুঝিয়া কেহ কেহ তাহাও করিতে না যাইয়া চব্বিশ ঘণ্টা এখানেই কাটাইতেছে।

অধিক কথা কহিলে এবং বারংবার সমাধিস্থ হইলে শরীরের রক্ত-প্রবাহ উর্ধ্বে প্রবাহিত হইয়া ক্ষতস্থানটিকে নিরন্তর আঘাত-পূর্বক রোগের উপশম হইতে দিবে না, চিকিৎসক ঐজন্য ঠাকুরকে ঐ উভয় বিষয় হইতে সংযত থাকিতে বলিয়া গিয়াছেন। ঐ ব্যবস্থামত চলিবার চেষ্টা করিলেও ভ্রমক্রমে তিনি বারংবার উহার বিপরীত কার্য করিয়া বসিতেছেন।

* গোকুলচন্দ্র ভট্টাচার্যের বাটী

কারণ 'হাড়মাসের খাঁচা' বলিয়া চিরকাল অবজ্ঞা করিয়া যে শরীর হইতে মন উঠাইয়া লইয়াছেন, সাধারণ মানবের ন্যায় তাহাকে পুনরায় বহুমূল্য জ্ঞান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইতেছেন না। ভগবৎপ্রসঙ্গ উঠিলেই শরীর ও শরীররক্ষার কথা ভুলিয়া পূর্বের ন্যায় উহাতে যোগদান-পূর্বক বারংবার সমাধিস্থ হইয়া পড়িতেছেন! ইতিপূর্বে তাঁহার দর্শন পায় নাই এইরূপ অনেক ব্যক্তিও উপস্থিত হইতেছে; তাহাদিগের হৃদয়ের ব্যাকুলতা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেছেন না, মৃদুস্বরে তাহাদিগকে সাধনপথসকল নির্দেশ করিয়া দিতেছেন। ঐ কার্যে তাঁহার নিরন্তর উৎসাহ-আনন্দ দেখিয়া ভক্তদিগের অনেকে ঠাকুরের ব্যাধিটাকে সামান্য ও সহজসাধ্য জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত হইতেছেন; কেহ কেহ আবার নবাগত ব্যক্তিসকলকে কৃপা করিবার এবং বহুজনমধ্যে ধর্মভাবপ্রচারের নিমিত্ত ঠাকুর স্বেচ্ছায় শারীরিক ব্যাধিরূপ উপায় কিছুকালের জন্য অবলম্বন করিয়াছেন—এইরূপ মত প্রকাশপূর্বক সকলকে নিঃশঙ্ক করিতে চেষ্টা পাইতেছেন।

ডাক্তার মহেন্দ্রলাল কোন দিন সকালে এবং কোন দিন অপরাহ্ণে প্রায় নিত্য আসিতেছেন এবং রোগের হ্রাসবৃদ্ধি পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থাদি করিবার পর ঠাকুরের মুখ হইতে ভগবদালাপ শুনিতে শুনিতে এতই মুগ্ধ হইয়া যাইতেছেন যে, তন্ময় হইয়া দুই তিন ঘণ্টাকাল অতীত হইলেও বিদায়গ্রহণ করিতে পারিতেছেন না! আবার, প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া ঐসকলের অদ্ভুত সমাধান শ্রবণ করিতে করিতে বহুক্ষণ অতীত হইলে কখন কখন তিনি অনুতপ্ত হইয়া বলিতেছেন, "আজ তোমাকে বহুক্ষণ বকাইয়াছি, অন্যায় হইয়াছে; তা হউক, সমস্ত দিন আর কাহারও সহিত কোনও কথা কহিও না, তাহা হইলেই আর কোন অপকার হইবে না;

তোমার কথায় এরূপ আকর্ষণ যে এই দেখ না, তোমার কাছে আসিলেই সমস্ত কাজকর্ম ফেলিয়া দুই তিন ঘণ্টা না বসিয়া আর উঠিতে পারি না; জানিতেই পারি না কোন্ দিক দিয়া সময় চলিয়া গেল! সে যাহা হউক, আর কাহারও সহিত এরূপে এতক্ষণ ধরিয়া কথা কহিও না; কেবল আমি আসিলে এইরূপে কথা কহিবে, তাহাতে দোষ হইবে না।" (ডাক্তারের ও সকল ভক্তদিগের হাস্য)

ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র—যাঁহাকে তিনি কখন কখন 'সুরেশ মিত্র' বলিতেন—তাঁহার সিমলার ভবনে এ বৎসর পূজা আনিয়াছেন। পূর্বে তাঁহাদিগের বাটীতে প্রতি বৎসর পূজা হইত, কিন্তু একবার বিশেষ বিঘ্ন হওয়ায় অনেক দিন বন্ধ ছিল। বাটীর কেহই আর এপর্যন্ত পূজা আনিতে সাহসী হয়েন নাই; আবার কেহ ঐ বিষয়ে উদ্যোগী হইলে অপর সকলে তাঁহাকে ঐ সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিয়াছিলেন। ঠাকুরের বলে বলীয়ান সুরেন্দ্রনাথ দৈববিঘ্নের ভয় রাখিতেন না এবং একবার কোন বিষয় করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিলে কাহারও কোন ওজর আপত্তি গ্রাহ্য করিতেন না। বাটীর সকলে নানা চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে এবৎসর পূজার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারেন নাই। তিনি ঠাকুরকে জানাইয়া সমস্ত ব্যয়ভার নিজেই বহন করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে বাটীতে আনয়ন করিয়াছেন। শরীরের অসুস্থতাবশতঃ ঠাকুর আসিতে পারিবেন না বলিয়াই কেবল সুরেন্দ্রের আনন্দে নিরানন্দ। আবার পূজার অল্পদিন পূর্বে দুই একজন পীড়িত হইয়া পড়ায় তিনিই ঐজন্য দোষী সাব্যস্ত হইয়া বাটীর সকলের বিরক্তিভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাহাতেও বিচলিত না হইয়া সুরেন্দ্রনাথ ভক্তির সহিত শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূজা আরম্ভ করিয়া দিলেন এবং সকল গুরুভ্রাতাকে নিমন্ত্রণ করিলেন।

প্রথম চারি বৎসরের শেষ কথা

সপ্তমীপূজা হইয়া গিয়াছে, আজ মহাষ্টমী। শ্যামপুকুরের বাসায় ঠাকুরের নিকট অনেকগুলি ভক্ত একত্রিত হইয়া ভগবদালাপ ও ভজনাদি করিয়া আনন্দ করিতেছেন। ডাক্তারবাবুর অপরাহ্ণ চার ঘটিকার সময়ে উপস্থিত হইবার কিছুক্ষণ পরেই নরেন্দ্রনাথ (স্বামী বিবেকানন্দ) ভজন আরম্ভ করিলেন। সেই দিব্য স্বরলহরী শুনিতে শুনিতে সকলে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। ঠাকুর সমীপে উপবিষ্ট ডাক্তারকে সঙ্গীতের ভাবার্থ মৃদুস্বরে বুঝাইয়া দিতে এবং কখন বা অল্পক্ষণের জন্য সমাধিস্থ হইতে লাগিলেন। ভক্তগণের মধ্যেও কেহ কেহ ভাবাবেশে বাহ্যচৈতন্য হারাইলেন।

ঐরূপে প্রবল আনন্দপ্রবাহে ঘর জমজম করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে রাত্রি সাড়ে-সাতটা বাজিয়া গেল। ডাক্তারের এতক্ষণে চৈতন্য হইল। তিনি স্বামীজীকে পুত্রের ন্যায় স্নেহে আলিঙ্গন করিলেন এবং ঠাকুরের নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়া দাঁড়াইবামাত্র ঠাকুরও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া সহসা গভীরসমাধিমগ্ন হইলেন। ভক্তেরা কানাকানি করিতে লাগিলেন, 'এই সময় সন্ধিপূজা কিনা, সেইজন্য ঠাকুর সমাধিস্থ হইয়াছেন! সন্ধিক্ষণের কথা না জানিয়া সহসা এই সময়ে দিব্যাবেশে সমাধিমগ্ন হওয়া অল্প বিচিত্র নহে!' প্রায় অর্ধ ঘণ্টা পরে তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল এবং ডাক্তারও বিদায়গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন।

ঠাকুর এইবার ভক্তগণকে সমাধিকালে যাহা দেখিয়াছিলেন, তাহা এইরূপে বলিতে লাগিলেন –"এখান হইতে সুরেন্দ্রের বাড়ী পর্যন্ত একটা জ্যোতির রাস্তা খুলিয়া গেল। দেখিলাম, তাহার ভক্তিতে প্রতিমায় মার আবেশ হইয়াছে! তৃতীয় নয়ন দিয়া জ্যোতিরশ্মি নির্গত হইতেছে! দালানের ভিতরে দেবীর সম্মুখে দীপমালা জ্বালিয়া দেওয়া হইয়াছে, আর

উঠানে বসিয়া সুরেন্দ্র ব্যাকুল হৃদয়ে 'মা', 'মা' বলিয়া রোদন করিতেছে। তোমরা সকলে তাহার বাটীতে এখনই যাও। তোমাদের দেখিলে তাহার প্রাণ শীতল হইবে।"

অনন্তর ঠাকুরকে প্রণাম করিয়া স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ সকলে সুরেন্দ্রনাথের বাটীতে গমন করিলেন এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হইলেন, বাস্তবিকই দালানে ঠাকুর যে স্থানে বলিয়াছিলেন, সে স্থানে দীপমালা জ্বালা হইয়াছিল এবং তাঁহার যখন সমাধি হয়, তখন সুরেন্দ্রনাথ প্রতিমার সম্মুখে উঠানে বসিয়া প্রাণের আবেগে 'মা', 'মা' বলিয়া প্রায় একঘণ্টা কাল বালকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের সমাধিকালের দর্শন ঐরূপে বাহ্যঘটনার সহিত মিলাইয়া পাইয়া ভক্তগণ বিস্ময়ে আনন্দে হতবুদ্ধি হইয়া রহিলেন!

রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু ভ্রমধারণাবশতঃ ঠাকুরকে যে ভাবে পরীক্ষা করেন

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরের কোন সময়ে রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরামোহন ভাবিয়াছিলেন, অখণ্ড ব্রহ্মচর্যপালনের জন্য ঠাকুরের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতারূপে প্রকাশিত হইতেছে। ব্রহ্মচর্যভঙ্গ হইলে পুনরায় শারীরিক স্বাস্থ্যলাভের সম্ভাবনা আছে ভাবিয়া তাঁহারা লছমীবাই প্রমুখ হাবভাবসম্পন্না সুন্দরী বারনারীকুলের সহায়ে তাঁহাকে প্রথমে দক্ষিণেশ্বরে এবং পরে কলিকাতার মেছুয়াবাজার পল্লীস্থ এক ভবনে প্রলোভিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, ঐ সকল নারীর মধ্যে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিতে পাইয়া তিনি ঐকালে 'মা', 'মা' বলিতে বলিতে বাহ্যচৈতন্য হারাইয়াছিলেন এবং তাঁহার ইন্দ্রিয় সঙ্কুচিত হইয়া কূর্মাঙ্গের ন্যায় শরীরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়াছিল! ঐ ঘটনা প্রত্যক্ষ

করিয়া এবং তাঁহার বালকের ন্যায় ব্যবহারে মুগ্ধা হইয়া ঐসকল নারীর হৃদয়ে বাৎসল্যের সঞ্চার হইয়াছিল। অনন্তর তাঁহাকে ব্রহ্মচর্যভঙ্গে প্রলোভিত করিতে যাইয়া অপরাধিনী হইয়াছে ভাবিয়া সজলনয়নে তাঁহার নিকটে ক্ষমাপ্রার্থনা ও তাঁহাকে বারংবার প্রণামপূর্বক তাহারা সশঙ্কচিত্তে বিদায়গ্রহণ করিয়াছিল।

নবম অধ্যায়

বিবাহ ও পুনরাগমন

এদিকে ঠাকুর পূজাকার্য ছাড়িয়া দিয়াছেন, এই সংবাদ কামারপুকুরে তাঁহার মাতা ও ভ্রাতার কর্ণে পৌঁছিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিয়া তুলিল। রামকুমারের মৃত্যুর পর দুই বৎসর কাল যাইতে না যাইতে ঠাকুরকে বায়ুরোগাক্রান্ত হইতে শুনিয়া জননী চন্দ্রমণি দেবী এবং শ্রীযুত রামেশ্বর বিশেষ চিন্তিত হইলেন। লোকে বলে, মানবের অদৃষ্টে যখন দুঃখ আসে তখন একটিমাত্র দুর্ঘটনায় উহার পরিসমাপ্তি হয় না, কিন্তু নানাপ্রকারের দুঃখ চারিদিক হইতে উপর্যুপরি আসিয়া তাহার জীবনাকাশ এককালে আচ্ছন্ন করে—ইঁহাদিগের জীবনে এখন ঐরূপ হইল। গদাধর চন্দ্রাদেবীর পরিণত বয়সে প্রাপ্ত আদরের কনিষ্ঠ সন্তান ছিলেন। সুতরাং শোকে দুঃখে অধীরা হইয়া তিনি পুত্রকে বাটীতে ফিরাইয়া আনিলেন এবং তাঁহার উদাসীন, চঞ্চল ভাব ও 'মা', 'মা' রবে কাতর ক্রন্দনে নিতান্ত ব্যাকুলা হইয়া প্রতিকারের নানারূপ চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ঔষধাদি ব্যবহারের সহিত শান্তি, স্বস্ত্যয়ন, ঝাড়ফুঁক প্রভৃতি নানা দৈব প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইতে লাগিল। তখন সন ১২৬৫ সালের আশ্বিন বা কার্তিক মাস হইবে।

ঠাকুরের কামারপুকুরে আগমন

বাটীতে ফিরিয়া ঠাকুর সময়ে সময়ে পূর্বের ন্যায় প্রকৃতিস্থ থাকিলেও মধ্যে মধ্যে 'মা', 'মা' রবে ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করিতেন এবং কখন কখন

ভাবাবেশে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। তাঁহার চালচলন ব্যবহারাদি কখন সাধারণ মানবের ন্যায় এবং কখনও উহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইত।

ঠাকুর উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া আত্মীয়দিগের ধারণা

ঐ কারণে এখন তাঁহাতে সত্য, সরলতা, দেব ও মাতৃভক্তি এবং বয়স্য-প্রেমের একদিকে যেমন প্রকাশ দেখা যাইত, অপর দিকে তেমনি সাংসারিক সকল বিষয়ে উদাসীনতা, সাধারণের অপরিচিত বিষয়-বিশেষ লাভের জন্য ব্যাকুলতা এবং লজ্জা, ঘৃণা ও ভয়শূন্য হৃদয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছিবার উদ্দাম চেষ্টা সতত লক্ষিত হইত। লোকের মনে উহাতে তাঁহার সম্বন্ধে এক অদ্ভুত বিশ্বাসের উদয় হইয়াছিল। তাহারা ভাবিয়াছিল, তিনি উপদেবতাবিষ্ট হইয়াছেন!

ঠাকুরের মাতা সরলহৃদয়া চন্দ্রাদেবীর প্রাণে পূর্বোক্ত কথা ইতিপূর্বে কখন কখন উদিত হইয়াছিল। এখন অপরেও ঐরূপ আলোচনা করিতেছে শুনিয়া তিনি পুত্রের কল্যাণের জন্য ওঝা আনাইতে মনোনীত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন

ওঝা আনাইয়া চণ্ড নামান

—"একদিন একজন ওঝা আসিয়া একটা মন্ত্রপূত পলতে পুড়াইয়া শুঁকিতে দিল; বলিল, যদি ভূত হয় ত পলাইয়া যাইবে। কিন্তু কিছুই হইল না! পরে কয়েকজন প্রধান ওঝা পূজাদি করিয়া একদিন রাত্রিকালে চণ্ড নামাইল। চণ্ড পূজা ও বলি গ্রহণপূর্বক প্রসন্ন হইয়া তাহাদিগকে বলিল, 'উহাকে ভূতে পায় নাই বা উহার কোন ব্যাধি হয় নাই!'—পরে সকলের সমক্ষে আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'গদাই, তুমি সাধু হইতে চাও, তবে অত সুপারি খাও কেন? অধিক সুপারি খাইলে কামবৃদ্ধি হয়!' ইতিপূর্বে সত্যই আমি সুপারি খাইতে বড় ভালবাসিতাম এবং যখন তখন খাইতাম; চণ্ডের কথাতে উহা

তদবধি ত্যাগ করিলাম!" ঠাকুরের বয়স তখন ত্রয়োবিংশতি বর্ষ পূর্ণ হইতে চলিয়াছে। কামারপুকুরে কয়েক মাস থাকিবার পরে তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার অদ্ভুত দর্শনাদি বারংবার লাভ করিয়াই তিনি এখন শান্ত হইতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ের অনেক কথা আমরা তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকট শুনিয়াছি। তাহাতেই আমাদিগের মনে ঐরূপ ধারণা হইয়াছে। অতঃপর ঐসকল কথা আমরা পাঠককে বলিব।

ঠাকুরের প্রকৃতিস্থ হইবার কারণসম্বন্ধে তাঁহার আত্মীয়বর্গের কথা

কামারপুকুরের পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব প্রান্তদ্বয়ে অবস্থিত 'ভূতির খাল' এবং 'বুধুই মোড়ল' নামক শ্মশানদ্বয়ে দিবা ও রাত্রির অনেক ভাগ তিনি একাকী অতিবাহিত করিতেন। তাঁহাতে অদৃষ্টপূর্ব শক্তিপ্রকাশের কথাও তাঁহার আত্মীয়েরা এইকালে জানিতে পারিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের নিকটে শুনিয়াছি, পূর্বোক্ত শ্মশানদ্বয়ে অবস্থিত শিবা এবং উপদেবতা-দিগকে তিনি এই সময়ে মধ্যে মধ্যে বলি প্রদান করিতেন। নূতন হাঁড়িতে মিষ্টান্নাদি খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহপূর্বক ঐ স্থানদ্বয়ে গমন করিয়া বলি নিবেদন করিবামাত্র শিবাসমূহ দলে দলে চারিদিক হইতে আসিয়া উহা খাইয়া ফেলিত এবং উপদেবতাদিগকে নিবেদিত আহার্যপূর্ণ হাঁড়িসকল বায়ুভরে উর্ধ্বে উঠিয়া শূন্যে লীন হইয়া যাইত! ঐসকল উপদেবতাকে তিনি অনেক সময় দেখিতে পাইতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহর অতীত হইলেও কনিষ্ঠকে কোন কোন দিন গৃহে ফিরিতে না দেখিয়া ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুত রামেশ্বর শ্মশানের নিকটে যাইয়া ভ্রাতার নাম ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকিতেন। ঠাকুর উহাতে তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে বলিতেন, "যাচ্চি গো, দাদা; তুমি এদিকে আর অগ্রসর

হইও না, তাহা হইলে ইহারা (উপদেবতারা) তোমার অপকার করিবে।" ভূতির খালের পার্শ্বস্থ শ্মশানে তিনি এই সময়ে একটি বিল্ববৃক্ষ স্বহস্তে রোপণ করিয়াছিলেন এবং শ্মশানমধ্যে যে প্রাচীন অশ্বত্থবৃক্ষ ছিল, তাহার তলে বসিয়া অনেক সময় জপ-ধ্যানে অতিবাহিত করিতেন। ঠাকুরের আত্মীয়বর্গের ঐসকল কথায় বুঝিতে পারা যায়, জগদম্বার দর্শনলালসায় তিনি ইতিপূর্বে যে বিষম অভাব প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা কতকগুলি অপূর্ব দর্শন ও উপলব্ধি দ্বারা এই সময়ে প্রশমিত হইয়াছিল। তাঁহার এই কালের জীবনালোচনা করিয়া মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার অসি-মুণ্ডধরা বরাভয়করা সাধকানুগ্রহকারিণী চিন্ময়ী মূর্তির দর্শন তিনি এখন প্রায় সর্বদা লাভ করিতেছিলেন এবং তাঁহাকে যখন যাহা প্রশ্ন করিতে-ছিলেন, তাহার উত্তর পাইয়া তদনুযায়ী নিজ জীবন চালিত করিতেছিলেন। মনে হয়, এখন হইতেই তাঁহার প্রাণে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাধামাত্রশূন্য নিরন্তর দর্শন তাঁহার ভাগ্যে অচিরে উপস্থিত হইবে।

ঐকালে ঠাকুরের যোগবিভূতির কথা

ভবিষ্যৎ দর্শনরূপ বিভূতির প্রকাশও এইকালে ঠাকুরের জীবনে দেখিতে পাওয়া যায়। হৃদয়রাম এবং কামারপুকুর ও জয়রামবাটীর অনেকে ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে আমরা ঐ কথার ইঙ্গিত কখন কখন পাইয়াছি। নিম্নলিখিত ঘটনাবলী হইতে পাঠক উহা বুঝিতে পারিবেন।

• ঠাকুরের ব্যবহার ও কার্যকলাপ দেখিয়া তাঁহার মাতৃ প্রভৃতির ধারণা হইয়াছিল, দৈবকৃপায় তাঁহার বায়ুরোগের এখন অনেকটা শান্তি হইয়াছে। কারণ, তাঁহারা দেখিতেছিলেন, তিনি এখন পূর্বের ন্যায় ব্যাকুলভাবে ক্রন্দন করেন না, আহারাদি যথাসময়ে করেন এবং প্রায় সকল বিষয়ে

জনসাধারণের ন্যায় আচরণ করিয়া থাকেন। সর্বদা ঠাকুর-দেবতা লইয়া থাকা, শ্মশানে বিচরণ করা, পরিধেয় বসন ত্যাগপূর্বক কখন কখন ধ্যান পূজাদির অনুষ্ঠান এবং ঐ বিষয়ে কাহারও নিষেধ না মানা প্রভৃতি কয়েকটি ব্যবহার অনন্যসাধারণ হইলেও, তিনি চিরকাল করিতেন বলিয়া ঐসকলে তাঁহারা বায়ুরোগের পরিচয় পাইবার কারণ দেখেন নাই।

ঠাকুরকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া আত্মীয়বর্গের বিবাহদানের সঙ্কল্প

কিন্তু সাংসারিক সকল বিষয়ে তাঁহার পূর্ণমাত্রায় উদাসীনতা এবং নিরন্তর উন্মনাভাব দূর করিবার জন্য তাঁহারা এখনও বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। সাংসারিক বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া পূর্বোক্ত ভাবটা যতদিন না প্রশমিত হইতেছে, ততদিন বায়ুরোগে পুনরাক্রান্ত হইবার তাঁহার বিশেষ সম্ভাবনা রহিয়াছে—একথা তাঁহাদের মনে পুনঃপুনঃ উদিত হইত। উহার হস্ত হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিবার জন্য ঠাকুরের স্নেহময়ী মাতা ও অগ্রজ এখন উপযুক্ত পাত্রী দেখিয়া তাঁহার বিবাহ দিবার পরামর্শ স্থির করিলেন। কারণ, সদ্বংশীয়া সুশীলা স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা পড়িলে তাঁহার মন নানা বিষয়ে সঞ্চরণ না করিয়া নিজ সাংসারিক অবস্থার উন্নতিসাধনেই রত থাকিবে।

গদাধরের বিবাহে সম্মতিদানের কথা

গদাধর জানিতে পারিলে পাছে ওজর আপত্তি করে, এজন্য মাতা ও পুত্রে পূর্বোক্ত পরামর্শ অন্তরালে হইয়াছিল। চতুর গদাধরের কিন্তু ঐ বিষয় জানিতে অধিক বিলম্ব হয় নাই। জানিতে পারিয়াও তিনি উহাতে কোনরূপ আপত্তি করেন নাই। বাটীতে কোন একটা অভিনব ব্যাপার উপস্থিত হইলে বালকবালিকারা যেরূপ আনন্দ করিয়া থাকে, তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে নিবেদন করিয়া ঐ বিষয়ে

কিংকর্তব্য জানিয়াই কি তিনি আনন্দপ্রকাশ করিয়াছিলেন, অথবা বালকের ন্যায় ভবিষ্যদ্দৃষ্টি ও চিন্তারাহিত্যই তাঁহার ঐরূপ করিবার কারণ? পাঠক দেখিতে পাইবেন, আমরা ঐ সম্বন্ধে অন্যত্র যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি।

যাহা হউক, চারিদিকের গ্রামসকলে লোক প্রেরিত হইল, কিন্তু মনোমত পাত্রীর সন্ধান পাওয়া গেল না। যে কয়েকটি পাওয়া গেল, তাহাদের পিতামাতা অত্যধিক পণ যাচ্ঞা করায় রামেশ্বর ঐসকল স্থানে ভ্রাতার বিবাহ দিতে সাহস করিলেন না। ঐরূপে বহু অনুসন্ধানেও পাত্রী মিলিতেছে না দেখিয়া চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর যখন নিতান্ত বিরস ও চিন্তামগ্ন হইয়াছেন, তখন ভাবাবিষ্ট হইয়া গদাধর এক দিবস তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন—"অন্যত্র অনুসন্ধান বৃথা, জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীরামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বাটীতে বিবাহের পাত্রী কুটাবাঁধা হইয়া রক্ষিতা আছে!"

বিবাহের জন্য ঠাকুরের পাত্রী-নির্বাচন

ঐ কথায় বিশ্বাস না করিলেও ঠাকুরের মাতা ও ভ্রাতা ঐস্থানে অনুসন্ধান করিতে লোক প্রেরণ করিলেন। লোক যাইয়া সংবাদ আনিল, অন্য সকল বিষয়ে যাহাই হউক পাত্রী কিন্তু নিতান্ত বালিকা, বয়স পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ঐরূপ অপ্রত্যাশিতভাবে সন্ধানলাভে চন্দ্রাদেবী ঐস্থানেই পুত্রের বিবাহ দিতে স্বীকৃতা হইলেন এবং অল্পদিনেই সকল বিষয়ের কথাবার্তা স্থির হইয়া গেল। অনন্তর শুভদিনে শুভমুহূর্তে শ্রীযুত রামেশ্বর কামারপুকুরের দুই

বিবাহ

- গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়

গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়

ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামে ভ্রাতাকে লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চমবর্ষীয়া একমাত্র কন্যার সহিত শুভ-পরিণয়-ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়া আসিলেন। বিবাহে তিন শত টাকা পণ লাগিল। তখন সন ১২৬৬ সালের বৈশাখ মাসের শেষভাগ এবং ঠাকুর চতুর্বিংশতি বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন।

বিবাহের পরে শ্রীমতী চন্দ্রমণি এবং ঠাকুরের আচরণ

গদাধরের বিবাহ দিয়া শ্রীমতী চন্দ্রমণি অনেকটা নিশ্চিন্তা হইয়াছিলেন। বিবাহ বিষয়ে তাঁহার নিয়োগ পুত্রকে সম্পন্ন করিতে দেখিয়া তিনি ভাবিয়াছিলেন, দেবতা এতদিনে মুখ তুলিয়া চাহিয়াছেন। উন্মনা পুত্র গৃহে ফিরিল, সদ্বংশীয়া পাত্রী জুটিল, অর্থের অনটনও অচিন্তনীয়ভাবে পূর্ণ হইল; অতএব দৈব অনুকূল নহেন, একথা আর কেমন করিয়া বলা যাইতে পারে? সুতরাং সরলহৃদয়া ধর্মপরায়ণা চন্দ্রাদেবী যে এখন কথঞ্চিৎ সুখী হইয়াছিলেন, একথা আমরা বলিতে পারি। কিন্তু বৈবাহিকের মনস্তুষ্টি ও বাহিরের সম্ভ্রমরক্ষা করিবার জন্য জমিদার বন্ধু লাহাবাবুদের বাটী হইতে যে গহনাগুলি চাহিয়া বধূকে বিবাহের দিনে সাজাইয়া আনিয়াছিলেন, কয়েক দিন পরে ঐগুলি ফিরাইয়া দিবার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন তিনি যে আবার নিজ সংসারের দারিদ্র্যচিন্তায় অভিভূতা হইয়াছিলেন, ইহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। নব বধূকে তিনি বিবাহের দিন হইতে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বালিকার অঙ্গ হইতে অলঙ্কারগুলি তিনি কোন্ প্রাণে খুলিয়া লইবেন, এই চিন্তায় বৃদ্ধার চক্ষু এখন জলপূর্ণ হইয়াছিল। অন্তরের কথা তিনি কাহাকেও না বলিলেও গদাধরের উহা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। তিনি মাতাকে শান্ত করিয়া নিদ্রিতা বধূর অঙ্গ হইতে গহনাগুলি

এমন কৌশলে খুলিয়া লইয়াছিলেন যে, বালিকা উহা কিছুই জানিতে পারে নাই। বুদ্ধিমতী বালিকা কিন্তু নিদ্রাভঙ্গে বলিয়াছিল, "আমার গায়ে যে এইরূপ সব গহনা ছিল, তাহা কোথায় গেল?" চন্দ্রাদেবী তাহাতে সজলনয়নে তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া সান্ত্বনাপ্রদানের জন্য বলিয়াছিলেন, "মা! গদাধর তোমাকে ঐ সকলের অপেক্ষাও উত্তম অলঙ্কারসকল ইহার পর কত দিবে!" এইখানেই কিন্তু ঐ বিষয়ের পরিসমাপ্তি হইল না। কন্যার খুল্লতাত তাহাকে ঐদিন দেখিতে আসিয়া ঐকথা জানিয়াছিলেন এবং অসন্তোষ প্রকাশপূর্বক ঐদিনেই তাহাকে পিত্রালয়ে লইয়া গিয়াছিলেন। মাতার মনে ঐ ঘটনায় বিশেষ বেদনা উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া গদাধর তাঁহার ঐ দুঃখ দূর করিবার জন্য পরিহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন, "উহারা এখন যাহাই বলুক ও করুক না, বিবাহ ত আর ফিরিবে না!"

ঠাকুরের কলিকাতায় পুনরাগমন

বিবাহের পর ঠাকুর প্রায় এক বৎসর সাত মাস কাল কামারপুকুরেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন। বোধ হয়, শরীর সম্পূর্ণ সুস্থ না হইয়া কলিকাতায় ফিরিলে পুনরায় তাঁহার বায়ুরোগ হইতে পারে, এই আশঙ্কা করিয়া শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী তাঁহাকে সহসা যাইতে দেন নাই। যাহা হউক, সন ১২৬৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসে বধূ সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করিলে কুল-প্রথানুসারে তাঁহাকে কয়েক দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে গমনপূর্বক শুভদিন দেখিয়া পত্নীর সহিত একত্রে কামারপুকুরে আগমন করিতে হইয়াছিল। ঐরূপে 'যোড়ে' আসিবার অনতিকাল পরে তিনি কলিকাতায় ফিরিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। মাতা ও ভ্রাতা তাঁহাকে কামারপুকুরে আরও কিছুকাল অবস্থান করিতে বলিলেও সংসারের অভাব-অনটনের কথা

তাঁহার অবিদিত ছিল না। ঐ কারণে তাঁহাদিগের কথা না শুনিয়া তিনি কালীবাটীতে ফিরিয়া পূর্ববৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবাকার্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

কলিকাতায় ফিরিয়া কয়েক দিন পূজা করিতে না করিতেই তাঁহার মন ঐ কার্যে এত তন্ময় হইয়া যাইল যে, মাতা, ভ্রাতা, স্ত্রী, সংসার, অনটন প্রভৃতি কামারপুকুরের সকল কথা তাঁহার মনের এক নিভৃত কোণে চাপা পড়িয়া গেল এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সকল সময়ে সকলের মধ্যে কিরূপে দেখিতে পাইবেন—এই বিষয়ই উহার সকল স্থল অধিকার করিয়া বসিল। দিবারাত্র স্মরণ, মনন, জপ, ধ্যানে তাঁহার বক্ষ পুনরায় সর্বক্ষণ আরক্তিম ভাব ধারণ করিল, সংসার ও সাংসারিক বিষয়ের প্রসঙ্গ বিষবৎ বোধ হইতে লাগিল, বিষম গাত্রদাহ পুনরায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং নয়নকোণ হইতে নিদ্রা যেন দূরে কোথায় অপসৃত হইল! তবে, শারীরিক ও মানসিক ঐপ্রকার অবস্থা ইতিপূর্বে একবার অনুভব করায় তিনি উহাতে পূর্বের ন্যায় এককালে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন না।

ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দিব্যোন্মাদ অবস্থা

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, মথুরবাবুর নির্দেশে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ, ঠাকুরের বায়ুপ্রকোপ, অনিদ্রা ও গাত্রদাহাদি রোগের উপশমের জন্য এইকালে নানাপ্রকার ঔষধ ও তৈল ব্যবহারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। চিকিৎসায় আশু ফল না পাইলেও, হৃদয় নিরাশ না হইয়া মধ্যে মধ্যে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া কবিরাজের কলিকাতাস্থ ভবনে উপস্থিত হইত। ঠাকুর বলিতেন, "একদিন ঐরূপে গঙ্গাপ্রসাদের ভবনে উপস্থিত হইলে তিনি চিকিৎসায় আশানুরূপ ফল হইতেছে না দেখিয়া চিন্তিত হইলেন এবং বিশেষরূপে পরীক্ষাপূর্বক নূতন ব্যবস্থা করিতে

লাগিলেন। পূর্ববঙ্গীয় অন্য একজন বৈদ্যও তখন তথায় উপস্থিত ছিলেন। রোগের লক্ষণসকল শ্রবণ করিতে করিতে তিনি বলিয়াছিলেন, 'ইঁহার দিব্যোন্মাদ অবস্থা বলিয়া বোধ হইতেছে ; উহা যোগজ ব্যাধি ; ঔষধে সারিবার নহে।'* ঐ বৈদ্যই ব্যাধির ন্যায় প্রতীয়মান আমার শারীরিক বিকারসমূহের যথার্থ কারণ প্রথম নির্দেশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু কেহই তখন তাঁহার কথায় আস্থা প্রদান করে নাই।" ঐরূপে মথুরবাবু প্রমুখ ঠাকুরের হিতৈষী বন্ধুবর্গ তাঁহার অসাধারণ ব্যাধির জন্য চিন্তান্বিত হইয়া নানারূপে চিকিৎসা করাইয়াছিলেন। রোগের কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধি ভিন্ন উপশম হয় নাই।

চন্দ্রাদেবীর হত্যাদান

সংবাদ ক্রমে কামারপুকুরে পৌঁছিল। শ্রীমতী চন্দ্রাদেবী উপায়ান্তর না দেখিয়া পুত্রের কল্যাণকামনায় ৺মহাদেবের নিকট হত্যা দিবার সঙ্কল্প স্থির করিলেন, এবং কামারপুকুরের 'বুড়ো শিব'কে জাগ্রত দেবতা জানিয়া তাঁহারই মন্দির-প্রান্তে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। 'মুকুন্দপুরের শিবের নিকট হত্যা দিলে তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ হইবে'—তিনি এখানে এইরূপ প্রত্যাদেশ লাভ করিলেন এবং ঐ স্থানে গমনপূর্বক পুনরায় প্রায়োপবেশনের অনুষ্ঠান করিলেন। মুকুন্দপুরের শিবের নিকট ইতিপূর্বে কামনাপূরণের জন্য কেহ হত্যা দিত না। প্রত্যাদৃষ্টা বৃদ্ধা উহা জানিয়াও মনে কিছুমাত্র দ্বিধা করিলেন না। দুই তিন দিন পরেই তিনি স্বপ্নে দেখিলেন, জলজ্জটাসুশোভিত বাঘাম্বরপরিহিত রজতগিরিনিভকান্তি মহাদেব সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদানপূর্বক বলিতেছেন—'ভয়

* কেহ কেহ বলেন, ৺গঙ্গাপ্রসাদের ভ্রাতা শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদই ঠাকুরকে ঐ কথা বলিয়াছিলেন।

নাই, তোমার পুত্র পাগল হয় নাই, ঐশ্বরিক আবেশে তাহার ঐরূপ অবস্থা হইয়াছে!' ধর্মপরায়ণা বৃদ্ধা ঐরূপ দেবাদেশলাভে আশ্বস্তা হইয়া ভক্তিপূতচিত্তে শ্রীশ্রীমহাদেবের পূজা দিয়া গৃহে ফিরিলেন এবং পুত্রের মানসিক বিকার শান্তির জন্য কুলদেবতা ৺রঘুবীর ও ৺শীতলামাতার একমনে সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, মুকুন্দপুরের শিবের নিকট তদবধি অনেক নরনারী প্রতিবৎসর হত্যা দিয়া সফলকাম হইতেছে।

ঠাকুর তাঁহার এই কালের দিব্যোন্মাদ অবস্থার কথা স্মরণ করিয়া আমাদিগকে কত সময় বলিয়াছেন—"আধ্যাত্মিক ভাবের প্রাবল্যে সাধারণ জীবের শরীর-মনে ঐরূপ হওয়া দূরে থাকুক উহার একচতুর্থাংশ বিকার উপস্থিত হইলে শরীর-ত্যাগ হয়। দিবা-রাত্রির অধিকাংশ ভাগ মার কোন না কোনরূপ দর্শনাদি পাইয়া ভুলিয়া থাকিতাম তাই রক্ষা, নতুবা (নিজ শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা থাকা অসম্ভব হইত। এখন হইতে আরম্ভ হইয়া দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল তিলমাত্র নিদ্রা হয় নাই। চক্ষু পলকশূন্য হইয়া গিয়াছিল, সময়ে সময়ে চেষ্টা করিয়াও পলক ফেলিতে পারিতাম না! কত কাল গত হইল, তাহার জ্ঞান থাকিত না এবং শরীর বাঁচাইয়া চলিতে হইবে, একথা প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিলাম। শরীরের দিকে যখন একটু আধটু দৃষ্টি পড়িত, তখন উহার অবস্থা দেখিয়া বিষম ভয় হইত; ভাবিতাম, পাগল হইতে বসিয়াছি নাকি? দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া চক্ষে অঙ্গুলি প্রদানপূর্বক দেখিতাম, চক্ষুর পলক উহাতেও পড়ে কি না। তাহাতেও চক্ষু সমভাবে পলকশূন্য হইয়া থাকিত। ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিতাম এবং মাকে বলিতাম—'মা, তোকে ডাকার ও তোর উপর একান্ত বিশ্বাসে নির্ভর করার কি এই ফল হ'ল? শরীরে বিষম

ঠাকুরের এইকালের অবস্থা

ব্যাধি দিলি ?' আবার পরক্ষণেই বলিতাম, 'তা যা হবার হক্‌গে, শরীর যায় যাক্, তুই কিন্তু আমায় ছাড়িস্ নি, আমায় দেখা দে, কৃপা কর্, আমি যে মা তোর পাদপদ্মে একান্ত শরণ নিয়েছি, তুই ভিন্ন আমার যে আর অন্য গতি একেবারেই নাই!' ঐরূপে কাঁদিতে কাঁদিতে মন আবার অদ্ভুত উৎসাহে উত্তেজিত হইয়া উঠিত, শরীরটাকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া মনে হইত এবং মার দর্শন ও অভয়বাণী শুনিয়া আশ্বস্ত হইতাম!"

মথুরবাবুর ঠাকুরকে শিবকালীরূপে দর্শন

শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্য নিয়োগে মথুরবাবু এই সময়ে একদিন ঠাকুরের মধ্যে অদ্ভুত দেবপ্রকাশ অযাচিতভাবে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছিলেন। কিরূপে তিনি সেদিন ঠাকুরের ভিতর শিব ও কালীমূর্তি সন্দর্শনপূর্বক তাঁহাকে জীবন্ত দেবতাজ্ঞানে পূজা করিয়াছিলেন, তাহা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* ঐদিন হইতে তিনি যেন দৈবশক্তি-প্রভাবে ঠাকুরকে ভিন্ন নয়নে দেখিতে এবং সর্বদা ভক্তি বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঐরূপ অঘটন ঘটনা দেখিয়া স্পষ্ট মনে হয়, ঠাকুরের সাধকজীবনে এখন হইতে মথুরের সহায়তা ও আনুকূল্যের বিশেষ প্রয়োজন হইবে বলিয়াই ইচ্ছাময়ী জগন্মাতা তাঁহাদিগের উভয়কে অবিচ্ছেদ্য প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সন্দেহবাদ, জড়বাদ ও নাস্তিক্যপ্রবণ বর্তমান যুগে ধর্মগ্লানি দূর করিয়া জীবন্ত অধ্যাত্মশক্তি-সংক্রমণের জন্য ঠাকুরের শরীরমনরূপ যন্ত্রটিকে শ্রীশ্রীজগদম্বা কত যত্নে ও কি অদ্ভুত উপায় অবলম্বনে নির্মাণ করিয়াছিলেন. ঐরূপ ঘটনাসকলে তাহার প্রমাণ পাইয়া স্তম্ভিত হইতে হয়।

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৬ষ্ঠ অধ্যায়

দশম অধ্যায়

ভৈরবী-ব্রাহ্মণী-সমাগম

সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে, ইংরাজী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কামারপুকুর হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবার পরে ঠাকুরের জীবনে দুইটি ঘটনা সমুপস্থিত হয়। ঘটনা দুইটি তাঁহার জীবনে বিশেষ পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল; সেজন্য উহাদের কথা আমাদিগের আলোচনা করা আবশ্যক। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে রাণী রাসমণি গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, রাণী ঐ সময়ে একদিন সহসা পড়িয়া যান। উহাতেই জ্বর, গাত্রবেদনা ও অজীর্ণাদি ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া উক্ত রোগের সঞ্চার করে। ব্যাধি স্বল্পকাল মধ্যে সাংঘাতিকভাব ধারণ করিয়াছিল।

রাণী রাসমণির সাংঘাতিক পীড়া

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের মে মাসের ৩১শে তারিখ বৃহস্পতিবার রাণী দক্ষিণেশ্বরে দেবী-প্রতিষ্ঠা করেন। ঠাকুরবাটীর ব্যয়নির্বাহের জন্য তিনি ঐ বৎসর ১৪ই ভাদ্র, ইংরাজী ২৯শে আগষ্ট তারিখে দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত তিন লাট জমিদারি দুই লক্ষ ছাব্বিশ সহস্র মুদ্রায় ক্রয় করিয়াছিলেন কিন্তু মনে মনে সঙ্কল্প থাকিলেও এতদিন তিনি ঐ সম্পত্তি

রাণীর দিনাজপুরের সম্পত্তি দেবোত্তর করা ও মৃত্যু

Plaint in High Court Suit No 308 of 1872 Puddomoni Dasee vs. Jagadamba Dasee, recites the following from the Deed of Endowment

দানপত্র করিয়া দেবোত্তরে পরিণত করেন নাই। আসন্নকাল উপস্থিত দেখিয়া উহা করিবার জন্য তিনি এখন ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। রাণীর চারি কন্যার মধ্যে মধ্যমা ও তৃতীয়া শ্রীমতী কুমারী ও শ্রীমতী করুণাময়ী দাসীর কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার পূর্বেই মৃত্যু হইয়াছিল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুশয্যার পার্শ্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠা ও কনিষ্ঠা কন্যাদ্বয় শ্রীমতী পদ্মমণি ও শ্রীমতী জগদম্বা দাসীই উপস্থিত ছিলেন। দানপত্র সম্পন্ন করিবার কালে তিনি ভবিষ্যৎ ভাবিয়া উক্ত সম্পত্তির অযথা নিয়োগের পথ এককালে রুদ্ধ করিবার মানসে নিজ কন্যাদ্বয়কে দেবোত্তর করিবার সম্মতি প্রদানপূর্বক ভিন্ন এক অঙ্গীকারপত্র সহি করিতে বলিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদম্বা উক্ত পত্রে সহি প্রদান করিলেন, কিন্তু জ্যেষ্ঠা কন্যা পদ্মমণি বহু অনুরোধেও উহাতে সহি দিলেন না। সেজন্য মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও রাণী শান্তিলাভ করিতে পারেন নাই। অগত্যা, ৺জগদম্বার ইচ্ছায় যাহা হইবার হইবে ভাবিয়া রাণী ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি তারিখে দেবোত্তর-দানপত্রে সহি করিলেন* এবং ঐ কার্য সমাধা করিবার পরদিন ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে রাত্রিকালে শরীরত্যাগ করিয়া ৺দেবীলোকে গমন করিলেন।

executed by Rani Rasmani :—According to my late husband's desire *** I on 18th Jaistha, 1262 B. S. (31st May, 1855) established and consecrated the *Thakurs* *** and for purpose of carrying on the *Sheba* purchased three lots of Zemindaris in District Dinajpur on 14th Bhadra, 1262 B. S. (29th August, 1855) for Rs. 2,26,000."

* The Deed of Endowment, dated 18th February, 1861 was executed by Rani Rasmoni ; she acknowledged her execution of the same before J. F. Watkins, Solicitor, Calcutta. This dedication was accepted as valid by all parties in Alipore Suit No. 47 of 1867, Jadu Nath

ঠাকুর বলিতেন, শরীরত্যাগের কিছুদিন পূর্বে রাণী রাসমণি ৺কালীঘাটে আদিগঙ্গাতীরস্থ বাটীতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্বে তাঁহাকে গঙ্গাগর্ভে আনয়ন করা হইলে সম্মুখে অনেকগুলি আলোক জ্বালা রহিয়াছে দেখিয়া তিনি সহসা বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "সরিয়ে দে, সরিয়ে দে, ও সব রোশনাই আর ভাল লাগছে না, এখন আমার মা (শ্রীশ্রীজগন্মাতা) আসছেন, তাঁর শ্রীঅঙ্গের প্রভায় চারিদিক আলোকময় হয়ে উঠেছে!" (কিছুক্ষণ পরে) "মা, এলে! পদ্ম যে সহি দিলে না—কি হবে, মা?" ঐ কথার উত্তরপ্রদান করিয়াই যেন শিবাকুল ঐ সময়ে চারিদিক হইতে উচ্চৈস্বরে ডাকিয়া উঠিল। কথাগুলি বলিয়াই পুণ্যবতী রাণী শান্তভাবে মাতৃক্রোড়ে মহাসমাধিতে শয়ন করিলেন। রাত্রি তখন দ্বিতীয় প্রহর উত্তীর্ণ হইয়াছে।

শরীররক্ষা করিবার কালে রাণীর দর্শন

কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তি লইয়া রাণী রাসমণির দৌহিত্রগণের মধ্যে উত্তরকালে যে বহুল বিবাদবিসংবাদ ও মকদ্দমা চলিতেছে, তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায়—তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্না রাণী তাঁহার প্রাণস্বরূপ দেবীসেবার বন্দোবস্ত যথাযথ থাকিবে না বলিয়া কেন এত আশঙ্কা করিয়াছিলেন এবং কেনই বা ব্যাধির যন্ত্রণাপেক্ষা ঐ চিন্তার যন্ত্রণা মৃত্যুকালে তাঁহার নিকট তীব্রতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আদালতের কাগজপত্রে দেখা যায়, ঐসকল মকদ্দমার বহুল ব্যয়ের জন্য ঐ দেবোত্তর

রাণী মৃত্যুকালে যাহা আশঙ্কা করেন, তাহাই হইতে বসিয়াছে

Chowdhury vs. Puddomoni and in the High Court Suit No. 308 of 1872, Puddomoni vs. Jagadamba and also when that Suit (No. 308) was revived after contest on 19th July, 1888.

সম্পত্তি ঋণগ্রস্ত হইয়া ক্রমশঃ কিঞ্চিন্ন্যূন লক্ষ মুদ্রায় বাঁধা পড়িয়াছে। কে বলিবে, রাণী রাসমণির অদ্বিতীয় দেবকীর্তি ঐ বিবাদের ফলে নামমাত্রে পর্যবসিত এবং ক্রমে লুপ্ত হইবে কি না!

রাণীর কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত মথুরামোহন বিশ্বাস বিষয়সংক্রান্ত সকল কার্যপরিচালনায় তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠার কাল হইতে তিনি কালীবাটীর দেবোত্তর সম্পত্তির আয়ব্যয় বুঝিয়া লইয়া রাণীর ইচ্ছামত সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতেছিলেন। সুতরাং রাণীর মৃত্যুর পরে তিনিই দেবসেবা-সংক্রান্ত সকল কার্য পূর্বের ন্যায় পরিচালনা করিতে থাকিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পবিত্র প্রভাবে দেবতাভক্তি মথুরামোহনের অন্তরে বিশেষ অধিকার বিস্তার করায় দক্ষিণেশ্বরের মাতৃসেবা রাণীর মৃত্যুতে কোন প্রকারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই।

মথুরবাবুর সাংসারিক উন্নতি ও দেবসেবার বন্দোবস্ত

ঠাকুরের সহিত মথুরবাবুর বিচিত্র সম্বন্ধের কথা আমরা ইতিপূর্বে অনেকস্থলে বলিয়াছি; অতএব এখানে উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। এখানে কেবলমাত্র এই কথা বলিলেই চলিবে যে, দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ ঠাকুরের জীবনে অনুষ্ঠিত হইবার পূর্বে রাণী রাসমণির স্বর্গারোহণ ও কালীবাটীসংক্রান্ত সকল বিষয়ে মথুরামোহনের একাধিপত্যলাভরূপ ঘটনা উপস্থিত হওয়ায়, ভক্তিমান মথুর তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিবার বিশেষ অবসরপ্রাপ্ত হইয়া-

মথুরবাবুর উন্নতি ও আধিপত্য ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্য

Debt due on mortgage by the Estate is Rs. 50,000 ; interest payable quarterly is Rs. 876-0-0 ; Costs of the Referee already stated amount to Rs. 20,000. as yet untaxed,

ছিলেন। মনে হয়, মথুরের উক্ত আধিপত্যলাভ যেন ঠাকুরকে সহায়তা করিবার জন্যই উপস্থিত হইয়াছিল। কারণ দেখা যায়, দেবতাজ্ঞানে ঠাকুরের সেবা করাই এখন হইতে তাঁহার নিকটে সর্বপ্রধান কার্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। দীর্ঘকাল সমভাবে এক বিষয়ে বিশ্বাসী থাকিয়া উচ্চভাবাশ্রয়ে জীবন অতিবাহিত করা একমাত্র ঈশ্বরকৃপাতেই সম্ভবপর হয়। অতএব রাণীর বিপুল বিষয়ে একাধিপত্য লাভপূর্বক বিপথগামী না হইয়া মথুরামোহন যে ঠাকুরের প্রতি দিন দিন অধিকতর বিশ্বাসসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এখন হইতে দীর্ঘ একাদশ বৎসরকাল তাঁহার সেবায় আপনাকে সমভাবে নিযুক্ত রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পরম ভাগ্যের কথা বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের সম্বন্ধে ইতরসাধারণের ও মথুরের ধারণা

ঈশ্বরসাধক ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তি ঠাকুরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার অসাধারণ উচ্চতা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা করিতে পারে নাই। মানব-সাধারণ তাঁহাকে বিকৃতমস্তিষ্ক বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কারণ, তাহারা দেখিয়াছিল, তিনি সর্বপ্রকার পার্থিব ভোগসুখলাভে পরাঙ্মুখ হইয়া তাহাদিগের বুদ্ধির অগোচর একটা অনির্দিষ্ট ভাবে বিভোর থাকিয়া কখন 'হরি', কখন 'রাম', এবং কখন বা 'কালী' 'কালী' বলিয়া দিন কাটাইয়া দেন! আবার রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া কত লোক ধনী হইয়া যাইল, তিনি কিন্তু ভাগ্যক্রমে তাঁহাদের সুনয়নে পড়িয়াও আপনার সাংসারিক উন্নতির কিছুই করিয়া লইতে পারিলেন না। সুতরাং তিনি হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য উন্মাদ ভিন্ন অপর কি হইবেন? একথা কিন্তু সকলে বুঝিয়াছিল যে, সাংসারিক সকল বিষয়ে অকর্মণ্য হইলেও এই উন্মাদের উজ্জ্বল নয়নে, অদৃষ্টপূর্ব চালচলনে, মধুর কণ্ঠস্বরে,

সুললিত বাক্যবিন্যাসে এবং অদ্ভুত প্রত্যুৎপন্নমতিত্বে এমন একটা কি আকর্ষণ আছে, যাহাতে তাহারা যে-সকল ধনী মানী পণ্ডিত ব্যক্তির সম্মুখে অগ্রসর হইতেও সঙ্কোচ বোধ করে, সেইসকল লোকের সম্মুখে ইনি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত না হইয়া উপস্থিত হন এবং অচিরে তাঁহাদিগের প্রিয় হইয়া উঠেন! ইতরসাধারণ মানব এবং কালীবাটীর কর্মচারীরা ঐরূপ ভাবিলেও, মথুরবাবু কিন্তু এখন অন্যরূপ ভাবিতেন। মথুরামোহন বলিতেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপা হইয়াছে বলিয়াই উঁহার ঐ প্রকার উন্মত্তবৎ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।"

রাণী রাসমণির মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে ঠাকুরের জীবনে ঐ বৎসর আর একটি বিশেষ ঘটনা সমুপস্থিত হয়। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর পশ্চিমভাগে গঙ্গাতীরে সুবৃহৎ পোস্তার উপর এইকালে বিচিত্র পুষ্পকানন ছিল। সযত্ন-রক্ষিত ঐ উদ্যানে নানাজাতীয় পুষ্পসম্ভারে ভূষিত হইয়া বৃক্ষলতাদি তখন বিচিত্র শোভা বিস্তার করিত এবং মধুগন্ধে দিক আমোদিত হইত। শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা না করিলেও ঠাকুর এই সময়ে নিত্য ঐ কাননে পুষ্পচয়ন করিতেন এবং মাল্যরচনা করিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে স্বহস্তে সাজাইতেন। ঐ কাননের মধ্যভাগে গঙ্গাগর্ভ হইতে মন্দিরে যাইবার চাঁদনি-শোভিত বিস্তৃত সোপানাবলী এবং উত্তরে পোস্তার শেষে স্ত্রীলোকদিগের ব্যবহারের জন্য একটি বাঁধাঘাট ও নহবৎখানা অদ্যাপি বর্তমান। বাঁধাঘাটটির উপরে একটি বৃহৎ বকুল বৃক্ষ বিদ্যমান থাকায় লোকে উহাকে বকুলতলার ঘাট বলিয়া নির্দেশ করিত।

ভৈরবী ব্রাহ্মণীর আগমন

ঠাকুর একদিন প্রাতে পুষ্পচয়ন করিতেছেন, এমন সময়ে একখানি নৌকা বকুলতলার ঘাটে আসিয়া লাগিল এবং গৈরিকবস্ত্রপরিহিতা

আলুলায়িত-দীর্ঘকেশা ভৈরবীবেশধারিণী এক সুন্দরী রমণী উহা হইতে অবতরণপূর্বক দক্ষিণেশ্বর ঘাটের চাঁদনির দিকে অগ্রসর হইলেন। প্রৌঢ়া হইলেও যৌবনের সৌন্দর্যাভাস তাঁহার শরীরকে তখনও ত্যাগ করে নাই। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, ভৈরবীর বয়স তখন চল্লিশের কাছাকাছি ছিল। নিকট আত্মীয়কে দেখিলে লোকে যেরূপ বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকে, ভৈরবীকে দেখিয়া তিনি ঐরূপ অনুভব করিয়াছিলেন এবং গৃহে ফিরিয়া ভাগিনেয় হৃদয়কে চাঁদনি হইতে তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় তাঁহার ঐরূপ আদেশে ইতস্তত: করিয়া বলিয়াছিল, "রমণী অপরিচিতা, ডাকিলেই আসিবে কেন?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "আমার নাম করিয়া বলিলেই আসিবে।" হৃদয় বলিত, অপরিচিতা সন্ন্যাসিনীর সহিত আলাপ করিবার জন্য মাতুলের ঐরূপ আগ্রহাতিশয় দেখিয়া সে অবাক হইয়াছিল। কারণ, তাঁহাকে ঐরূপ আচরণ করিতে সে ইতিপূর্বে কখনও দেখে নাই।

উন্মাদ মাতুলের বাক্য অন্যথা করিবার উপায় নাই বুঝিয়া হৃদয় চাঁদনিতে যাইয়া দেখিল ভৈরবী ঐস্থানেই উপবিষ্টা রহিয়াছেন। সে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, তাহার ঈশ্বরভক্ত মাতুল তাঁহার দর্শনলাভের জন্য প্রার্থনা করিতেছেন। ঐ কথা শুনিয়া ভৈরবী কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া তাহার সহিত আগমনের জন্য উঠিলেন দেখিয়া সে অধিকতর বিস্মিত হইল।

ঠাকুরের ঘরে প্রবেশপূর্বক তাঁহাকে দেখিয়াই ভৈরবী আনন্দে ও বিস্ময়ে অভিভূতা হইলেন এবং সজলনয়নে সহসা বলিয়া উঠিলেন, "বাবা, তুমি এখানে রহিয়াছ! তুমি গঙ্গাতীরে আছ জানিয়া তোমায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছিলাম, এতদিনে দেখা পাইলাম!" ঠাকুর জিজ্ঞাসা

করিলেন, "আমার কথা কেমন করিয়া জানিতে পারিলে, মা?" ভৈরবী বলিলেন, "তোমাদের তিনজনের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে, একথা ৺জগদম্বার কৃপায় পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলাম। দুইজনের দেখা পূর্ব (বঙ্গ) দেশে পাইয়াছি, আজ এখানে তোমার দেখা পাইলাম।"

প্রথম দর্শনে ভৈরবী ঠাকুরকে যাহা বলেন

ঠাকুর তখন ভৈরবীর নিকটে উপবিষ্ট হইয়া বালক যেমন অন্তরের কথা জননীর নিকটে সানন্দে প্রকাশ করে, সেইরূপ নিজ অলৌকিক দর্শন, ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গে বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হওয়া, গাত্রদাহ, নিদ্রাশূন্যতা, শারীরিক বিকার প্রভৃতি জীবনে নিত্য অনুভূত বিষয়সকল তাঁহাকে বলিতে বলিতে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "হ্যাঁগা, আমার এসকল কি হয়? আমি কি সত্যই পাগল হইলাম? জগদম্বাকে মনে প্রাণে ডাকিয়া সত্যই কি আমার কঠিন ব্যাধি হইল?" ভৈরবী তাঁহার ঐসকল কথা শুনিতে শুনিতে জননীর ন্যায় কখন উত্তেজিতা, কখন উল্লসিতা এবং কখন করুণার্দ্রহৃদয়া হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনাদানের জন্য বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তোমায় কে পাগল বলে, বাবা? তোমার ইহা পাগলামি নয়, তোমার মহাভাব হইয়াছে, সেইজন্যই ঐরূপ অবস্থাসকল হইয়াছে ও হইতেছে। তোমার যে অবস্থা হইয়াছে, তাহা কি কাহারও চিনিবার সাধ্য আছে? সেইজন্য ঐ প্রকার বলে। ঐ প্রকার অবস্থা হইয়াছিল শ্রীমতী রাধারাণীর; ঐ প্রকার হইয়াছিল শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর! এই কথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। আমার নিকটে যে-সকল পুঁথি আছে, তাহা হইতে আমি পড়িয়া দেখাইব, ঈশ্বরকে যাঁহারা একমনে ডাকিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই ঐরূপ

ঠাকুর ও ভৈরবীর প্রথমালাপ

অবস্থাসকল হইয়াছে ও হয়।” ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও নিজ মাতুলকে ঐরূপে পরামাত্মীয়ের ন্যায় বাক্যালাপ করিতে দেখিয়া হৃদয়ের বিস্ময়ের অবধি ছিল না।

অনন্তর কথায় কথায় বেলা অধিক হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর দেবীর প্রসাদী ফলমূল, মাখন, মিছরি প্রভৃতি ভৈরবী ব্রাহ্মণীকে জলযোগ করিতে দিলেন এবং মাতৃভাবে ভাবিতা ব্রাহ্মণী পুত্রস্বরূপ তাঁহাকে পূর্বে না খাওয়াইয়া জলগ্রহণ করিবেন না বুঝিয়া স্বয়ং ঐসকল খাদ্যের কিয়দংশ গ্রহণ করিলেন। দেবদর্শন ও জলযোগ শেষ হইলে ব্রাহ্মণী নিজ কণ্ঠগত রঘুবীরশিলার ভোগের জন্য ঠাকুরবাটীর ভাণ্ডার হইতে আটা, চাল প্রভৃতি ভিক্ষাস্বরূপে গ্রহণ করিয়া পঞ্চবটীতলে রন্ধনাদিতে ব্যাপৃতা হইলেন।

পঞ্চবটীতে ভৈরবীর অপূর্ব দর্শন

রন্ধন শেষ শেষ হইলে ৺রঘুবীরের সম্মুখে খাদ্যাদি রাখিয়া ব্রাহ্মণী নিবেদন করিয়া দিলেন এবং ইষ্টদেবকে চিন্তা করিতে করিতে গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া অভূতপূর্ব দর্শনলাভে সমাধিস্থা হইলেন। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হইয়া তাঁহার দুনয়নে প্রেমাশ্রুধারা প্রবাহিত হইতে লাগিল। ঠাকুর ঐ সময়ে প্রাণে প্রাণে আকৃষ্ট হইয়া অর্দ্ধবাহ্য অবস্থায় সহসা তথায় উপস্থিত হইলেন এবং দৈবশক্তিবলে পূর্ণাবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণী-নিবেদিত খাদ্যসকল ভোজন করিতে লাগিলেন। কতক্ষণ পরে ব্রাহ্মণী সংজ্ঞালাভ করিয়া চক্ষু উন্মীলন করিলেন এবং বাহ্যজ্ঞানবিরহিত ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের ঐপ্রকার কার্যকলাপ নিজ দর্শনের সহিত মিলাইয়া পাইয়া আনন্দে কণ্টকিত-কলেবরা হইলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুর সাধারণ জ্ঞানভূমিতে অবরোহণ করিলেন এবং নিজকৃত কার্যের জন্য ক্ষুব্ধ হইয়া ব্রাহ্মণীকে বলিতে লাগিলেন, “কে জানে বাপু, আত্মহারা হইয়া কেন এইরূপ

কার্যসকল করিয়া বসি!" ব্রাহ্মণী তখন জননীর ন্যায় তাঁহাকে আশ্বাস প্রদানপূর্বক বলিলেন, "বেশ করিয়াছ, বাবা; ঐরূপ কার্য তুমি কর নাই, তোমার ভিতরে যিনি আছেন তিনি করিয়াছেন; ধ্যান করিতে করিতে আমি যাহা দেখিয়াছি, তাহাতে নিশ্চয়ই বুঝিয়াছি, কে ঐরূপ করিয়াছে এবং কেনই বা করিয়াছে; বুঝিয়াছি, আর আমার পূর্বের বাহ্যপূজার আবশ্যকতা নাই, আমার পূজা এতদিনে সার্থক হইয়াছে!" এই বলিয়া ব্রাহ্মণী কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া দেবপ্রসাদস্বরূপে উক্ত ভোজনাবিশিষ্ট গ্রহণ করিলেন এবং ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে ৺রঘুবীরের জীবন্ত দর্শনলাভপূর্বক প্রেমগদ্‌গদচিত্তে বাষ্পবারি মোচন করিতে করিতে বহুকালপূজিত নিজ রঘুবীরশিলাটিকে গঙ্গাগর্ভে বিসর্জন করিলেন!

প্রথম দর্শনের প্রীতি ও আকর্ষণ ঠাকুর এবং ব্রাহ্মণীর মধ্যে দিন দিন বর্ধিত হইতে লাগিল। ঠাকুরের প্রতি অপত্যপ্রেমে মুগ্ধহৃদয়া সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরেই রহিয়া গেলেন। আধ্যাত্মিক বাক্যালাপে দিনের পর দিন কোথা দিয়া যাইতে লাগিল, উভয়ের মধ্যে কাহারও তাহা অনুভবে আসিল না! নিজ আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসম্বন্ধীয় রহস্যকথাসকল অকপটে বলিয়া ঠাকুর নিত্য নানাবিধ প্রশ্ন করিতে লাগিলেন এবং ভৈরবী তন্ত্রশাস্ত্র হইতে ঐসকলের সমাধান করিয়া অথবা ঈশ্বরপ্রেমের প্রবল বেগে অবতার-পুরুষদিগের দেহমনে কিরূপ লক্ষণসকল প্রকাশিত হয়, ভক্তিগ্রন্থসমূহ হইতে তদ্বিষয় পাঠ করিয়া ঠাকুরের সংশয়সকল ছিন্ন করিতে লাগিলেন। পঞ্চবটিতে ঐরূপে কয়েক দিবস দিব্যানন্দের প্রবাহ ছুটিয়াছিল।

পঞ্চবটীতে শাস্ত্রপ্রসঙ্গ

ছয় সাত দিন ঐরূপে কাটিবার পরে, ঠাকুরের মনে হইল ব্রাহ্মণীকে এখানে রাখা ভাল হইতেছে না। কামকাঞ্চনাসক্ত সংসারী মানব বুঝিতে না পারিয়া পবিত্রা রমণীর চরিত্র সম্বন্ধে নানা কথা রটনার অবসর পাইবে। ব্রাহ্মণীকে উহা বলিবামাত্র তিনি ঐ বিষয়ের যাথার্থ্য অনুধাবন করিলেন এবং গ্রামমধ্যে নিকটে কোন স্থানে থাকিয়া, প্রতিদিন দিবসে কিছুকালের জন্য আসিয়া ঠাকুরের সহিত দেখা করিয়া যাইবার সঙ্কল্প স্থিরপূর্বক কালীবাটী পরিত্যাগ করিলেন।

ভৈরবীর দেবমণ্ডলের ঘাটে অবস্থানের কারণ

কালীবাটীর উত্তরে ভাগীরথীতীরে দক্ষিণেশ্বর গ্রামস্থ দেবমণ্ডলের ঘাটে আসিয়া ব্রাহ্মণী বাস করিতে লাগিলেন* এবং গ্রামমধ্যে পরিভ্রমণ-পূর্বক রমণীগণের সহিত আলাপ করিয়া স্বল্পদিনেই তাহাদিগের শ্রদ্ধার পাত্রী হইয়া উঠিলেন। সুতরাং এখানে তাঁহার বাস ও ভিক্ষা সম্বন্ধে কোনরূপ অসুবিধা রহিল না এবং লোকনিন্দার ভয়ে ঠাকুরের পবিত্র দর্শনলাভে তাঁহাকে একদিনের জন্যও বঞ্চিত হইতে হইল না। তিনি প্রতিদিন কিয়ৎকালের জন্য কালীবাটীতে আসিয়া ঠাকুরের সহিত কথাবার্তায় কাল কাটাইতে লাগিলেন এবং গ্রামস্থ রমণীগণের নিকট হইতে নানাপ্রকার খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহপূর্বক মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে ভোজন করাইতে লাগিলেন।†

* হৃদয় বলিত, দেবমণ্ডলের ঘাটে থাকিবার পরামর্শ ঠাকুরই ব্রাহ্মণীকে প্রদানপূর্বক মণ্ডলদের বাটীতে পাঠাইয়া দেন। তথায় যাইবামাত্র ৺নবীনচন্দ্র নিয়োগীর ধর্মপরায়ণা পত্নী তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং ঘাটের চাঁদনীতে যতকাল ইচ্ছা থাকিবার অনুমতিসহ একখানি তক্তাপোশ, চাল, ডাল, ঘি ও অন্যান্য ভোজনসামগ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।

† গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৮ম অধ্যায়

ঠাকুরের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণীর ইতিপূর্বে মনে হইয়াছিল, অসাধারণ ঈশ্বরপ্রেমেই তাঁহার অলৌকিক দর্শন ও অবস্থাসকল উপস্থিত হইয়াছে। এখন ভগবদালাপে, তাঁহার ভাবসমাধিতে মুহুর্মুহুঃ বাহ্যচৈতন্যলোপ, ও কীর্তনে পরমানন্দ দেখিয়া তাঁহার দৃঢ় ধারণা হইল—ইনি কখনই সামান্য সাধক নহেন। চৈতন্যচরিতামৃত ও ভাগবতাদি গ্রন্থের স্থলে স্থলে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবোদ্ধারের নিমিত্ত পুনরায় শরীর ধারণপূর্বক আগমনের যে-সকল ইঙ্গিত দেখিতে পাওয়া যায়, ঠাকুরকে দেখিয়া ব্রাহ্মণীর স্মৃতিপথে সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। বিদুষী ব্রাহ্মণী ঐ সকল গ্রন্থে শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ সম্বন্ধে যে-সকল কথা লিপিবদ্ধ দেখিয়াছিলেন, সেই সকলের সহিত ঠাকুরের আচারব্যবহার ও অলৌকিক প্রত্যক্ষাদি মিলাইয়া সৌসাদৃশ্য দেখিতে পাইলেন। শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় ভাবাবেশে স্পর্শ করিয়া অপরের মনে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিবার শক্তি ঠাকুরে প্রকাশিত দেখিলেন। আবার ঈশ্বরবিরহ-বিধুর শ্রীচৈতন্যদেবের গাত্রদাহ উপস্থিত হইলে স্রক্চন্দনাদি যে-সকল পদার্থের ব্যবহারে উহা প্রশমিত হইত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, ঠাকুরের গাত্রদাহপ্রশমনের জন্য ঐ সকলের প্রয়োগ করিয়া তিনি তদ্রূপ ফল পাইলেন। সুতরাং তাঁহার মনে এখন হইতে দৃঢ় ধারণা হইল, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়ে জীবোদ্ধারের নিমিত্ত ঠাকুরের শরীরমনাশ্রয়ে পুনরায় পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। সিহড় গ্রামে যাইবার কালে ঠাকুর নিজ দেহাভ্যন্তর হইতে কিশোরবয়স্ক দুই জনকে যেরূপ

ঠাকুরকে ভৈরবীর অবতার বলিয়া ধারণা কিরূপে হয়

গুরুভাব, উত্তরার্ধ—১ম অধ্যায়

বাহিরে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াছিলেন, তাহা আমরা পাঠককে ইতিপূর্বে বলিয়াছি।* ব্রাহ্মণী এখন ঐ দর্শনের কথা ঠাকুরের মুখে শ্রবণপূর্বক শ্রীরামকৃষ্ণদেবসম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসায় দৃঢ়তর বিশ্বাসবতী হইয়া বলিলেন, "এবার নিত্যানন্দের খোলে চৈতন্যের আবির্ভাব!"

উদাসিনী ব্রাহ্মণী সংসারে কাহারও নিকট কিছু প্রত্যাশা করিতেন না, প্রাণ যাহা সত্য বলিয়া বুঝিয়াছে তাহা প্রকাশে লোকের নিন্দা বা উপহাসভাগিনী হইতে হইবে, এ আশঙ্কা রাখিতেন না। সুতরাং শ্রীরামকৃষ্ণদেবসম্বন্ধীয় নিজ মীমাংসা তিনি সকলের সম্মুখে বলিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিতা হয়েন নাই। শুনিয়াছি, এই সময়ে একদিন ঠাকুর পঞ্চবটীতলে মথুরবাবুর সহিত বসিয়াছিলেন। হৃদয়ও তাঁহাদের নিকটে ছিল। কথাপ্রসঙ্গে ঠাকুর, ব্রাহ্মণী তাঁহার সম্বন্ধে যে মীমাংসায় উপনীতা হইয়াছেন, তাহা মথুরমোহনকে বলিতে লাগিলেন। বলিলেন, "সে বলে যে, অবতারদিগের যে-সকল লক্ষণ থাকে, তাহা এই শরীর-মনে আছে। তার অনেক শাস্ত্র দেখা আছে, কাছে অনেক পুঁথিও আছে।" মথুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তিনি যাহাই বলুন না, বাবা, অবতার ত আর দশটির অধিক নাই? সুতরাং তাঁহার কথা সত্য হইবে কেমন করিয়া? তবে আপনার উপর মা কালীর কৃপা হইয়াছে, এ কথা সত্য।"

তাঁহারা ঐরূপে কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে এক সন্ন্যাসিনী তাঁহাদের অভিমুখে আগমন করিতেছেন দেখিতে পাইলেন এবং মথুর ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "উনিই কি তিনি?" ঠাকুর স্বীকার

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

করিলেন। তাঁহারা দেখিলেন—ব্রাহ্মণী কোথা হইতে একথালা মিষ্টান্ন সংগ্রহ করিয়া শ্রীবৃন্দাবনে নন্দরাণী যশোদা যেভাবে গোপালকে খাওয়াইতে সপ্রেমে অগ্রসর হইতেন, সেইভাবে তন্ময় হইয়া অন্যমনে তাঁহাদিগের দিকে চলিয়া আসিতেছেন। নিকটে আসিয়া মথুরবাবুকে দেখিতে পাইয়া তিনি যত্নপূর্বক আপনাকে সংযতা করিলেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইবার নিমিত্ত হৃদয়ের হস্তে মিষ্টান্নথালাটি প্রদান করিলেন। তখন মথুরবাবুকে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ওগো! তুমি আমাকে যাহা বল সেই সব কথা আজ ইঁহাকে বলিতেছিলাম, ইনি বলিলেন, 'অবতার ত দশটি ছাড়া আর নাই'।" মথুরানাথও ইত্যবসরে সন্ন্যাসিনীকে অভিবাদন করিলেন এবং তিনি সত্যই যে ঐরূপ আপত্তি করিতেছিলেন, তদ্বিষয় অঙ্গীকার করিলেন। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে আশীর্বাদ করিয়া উত্তর করিলেন, "কেন? শ্রীমদ্ভাগবতে চব্বিশটি অবতারের কথা বলিবার পরে ভগবান ব্যাস শ্রীহরির অসংখ্য বার অবতীর্ণ হইবার কথা বলিয়াছেন ত? বৈষ্ণবদিগের গ্রন্থেও মহাপ্রভুর পুনরাগমনের কথা স্পষ্ট উল্লিখিত আছে। তদ্ভিন্ন শ্রীচৈতন্যের সহিত (শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে দেখাইয়া) ইঁহার শরীর-মনে প্রকাশিত লক্ষণসকলের বিশেষ সৌসাদৃশ্য মিলাইয়া পাওয়া যায়।" ব্রাহ্মণী ঐরূপে নিজপক্ষ সমর্থন করিয়া বলিলেন, শ্রীমদ্ভাগবত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যদিগের গ্রন্থে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদিগকে তাঁহার কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতেই হইবে। ঐরূপ ব্যক্তির নিকটে তিনি নিজ পক্ষ সমর্থন করিতে সম্মতা আছেন। ব্রাহ্মণীর ঐ কথার কোন উত্তর দিতে না পারিয়া মথুরামোহন নীরব রহিলেন।

মথুরের সম্মুখে ভৈরবীর ঠাকুরকে অবতার বলা

ঠাকুরের সম্বন্ধে ব্রাহ্মণীর অপূর্ব ধারণা ক্রমে কালীবাটীর সকলেই

জানিতে পারিল এবং উহা লইয়া একটা বিষম আন্দোলন উপস্থিত হইল। উহার ফলাফল আমরা অন্যত্র বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছি।* ভৈরবী ব্রাহ্মণী ঐরূপে ঠাকুরকে সকলের সমক্ষে সহসা দেবতার সম্মান প্রদান করিলেও তাঁহার মনে কিছুমাত্র বিকার উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু উক্ত সিদ্ধান্ত শ্রবণ করিয়া শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষসকলে কিরূপ মতামত প্রদান করেন, তাহা জানিতে উৎসুক হইয়া তিনি বালকের ন্যায় মথুরামোহনকে ঐ বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ঐ অনুরোধের ফলেই বৈষ্ণবচরণপ্রমুখ পণ্ডিতসকলের দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন হইয়াছিল। তাঁহাদিগের নিকটে ব্রাহ্মণী কিরূপে নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন, তাহা অন্যত্র বলিয়াছি।†

পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমণের কারণ

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৫ম ও ষষ্ঠ অধ্যায় এবং উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

† গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়

ঠাকুরের তন্ত্রসাধন

কেবলমাত্র তর্কযুক্তিসহায়ে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সম্বন্ধে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত স্থির করেন নাই। পাঠকের স্মরণ থাকিবে, ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকালে তিনি বলিয়াছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব-প্রমুখ তিন ব্যক্তির সহিত দেখা করিয়া তাঁহাদিগের আধ্যাত্মিক-জীবন-বিকাশে তাঁহাকে সহায়তা করিতে হইবে। ঠাকুরকে দর্শন করিবার বহু পূর্বে তিনি ঐরূপ প্রত্যাদেশলাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বুঝিতে পারা যায়, সাধনপ্রসূত দিব্যদৃষ্টিই তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন-পূর্বক স্বল্প পরিচয়েই ঠাকুরকে ঐরূপে বুঝিতে সহায়তা করিয়াছিল। আবার দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার সহিত তিনি যত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিতা হইতে লাগিলেন, ততই তাঁহার মনে ঠাকুরকে কিভাবে কতদূর সহায়তা করিতে হইবে, তদ্বিষয় পূর্ণ প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। অতএব ঠাকুরের সম্বন্ধে সাধারণের ভ্রান্ত ধারণা দূর করিবার চেষ্টাতেই তিনি এখন কালক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু শাস্ত্রপথাবলম্বনে সাধনসকলের অনুষ্ঠানপূর্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ প্রসন্নতার অধিকারী হইয়া ঠাকুর যাহাতে দিব্যভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েন, তদ্বিষয়ে যত্নবতী হইয়াছিলেন।

সাধনপ্রসূত দিব্য-দৃষ্টি ব্রাহ্মণীকে ঠাকুরের অবস্থা যথাযথরূপে বুঝাইয়াছিল

গুরু-পরম্পরাগত শাস্ত্রনির্দিষ্ট সাধনপথ অবলম্বন না করিয়া কেবলমাত্র অনুরাগ-সহায়ে ঈশ্বরদর্শনে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়াই ঠাকুর নিজ উচ্চ

অবস্থা সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিতেছেন না, প্রবীণা সাধিকা ব্রাহ্মণীর একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় নাই। নিজ অপূর্ব প্রত্যক্ষসকলকে মস্তিষ্ক-বিকৃতির ফল বলিয়া এবং শারীরিক বিকারসমূহ ব্যাধির জন্য উপস্থিত হইতেছে বলিয়া যে সন্দেহ ঠাকুরকে মধ্যে মধ্যে মুহ্যমান করিতেছিল, তাহার হস্ত হইতে নির্মুক্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মণী এখন তাঁহাকে তন্ত্রোক্ত সাধনমার্গ অবলম্বনে উৎসাহিত করিয়াছিলেন। কারণ সাধক যেরূপ ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে যেরূপ ফল প্রাপ্ত হইবেন, তন্ত্রে তদ্বিষয় লিপিবদ্ধ দেখিতে পাইয়া এবং অনুষ্ঠানসহায়ে স্বয়ং ঐরূপ ফলসমূহ লাভ করিয়া তাঁহার মনে এ কথার দৃঢ় প্রতীতি হইবে যে, সাধনাসহায়ে মানব অন্তঃরাজ্যের উচ্চ উচ্চতর ভূমিসমূহে যত আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহার অনন্যসাধারণ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাসমূহের উপলব্ধি হয়। ফলে ইহা দাঁড়াইবে যে, ঠাকুরের জীবনে ভবিষ্যতে যেরূপ অসাধারণ প্রত্যক্ষসকল উপস্থিত হউক না কেন, কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তিনি ঐ সকলকে সত্য ও অবশ্যম্ভাবী জানিয়া নিশ্চিন্তমনে গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন। ব্রাহ্মণী জানিতেন, শাস্ত্র ঐজন্য সাধককে গুরুবাক্য ও শাস্ত্রবাক্যের সহিত নিজ জীবনের অনুভবসকলকে মিলাইয়া অনুরূপ হইল কি না, দেখিতে বলিয়াছেন।

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর তন্ত্রসাধন করিতে বলিবার কারণ

প্রশ্ন উঠিতে পারে, ঠাকুরকে অবতারপুরুষ বলিয়া বুঝিয়া ব্রাহ্মণী কোন্ যুক্তিবলে আবার তাঁহাকে সাধন করাইতে উদ্যত হইলেন? ঐশমহিমাসম্পন্ন অবতারপুরুষকে সর্বতোভাবে পূর্ণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, সুতরাং তাঁহার সম্বন্ধে সাধনাদি চেষ্টার অনাবশ্যকতা সর্বদা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। উত্তরে বলা যাইতে পারে, ঠাকুরের সম্বন্ধে

ঐ প্রকার মহিমা বা ঐশ্বর্যজ্ঞান ব্রাহ্মণীর মনে সর্বদা সমুদিত থাকিলে তাঁহার মানসিক ভাব বোধ হয় ঐরূপ হইত, কিন্তু তাহা হয় নাই। আমরা বলিয়াছি, প্রথম দর্শন হইতে ব্রাহ্মণী অপত্যনির্বিশেষে ঠাকুরকে ভালবাসিয়াছিলেন এবং ঐশ্বর্যজ্ঞান ভুলাইয়া প্রিয়তমের কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত করাইতে ভালবাসার ন্যায় দ্বিতীয় পদার্থ সংসারে নাই। অতএব বুঝা যায়, অকৃত্রিম ভালবাসার প্রেরণাতেই তিনি ঠাকুরকে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। দেব-মানব, অবতার পুরুষসকলের জীবনালোচনায় আমরা সর্বত্র ঐরূপ দেখিতে পাই। দেখিতে পাই, তাঁহাদিগের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ ব্যক্তিসকল তাঁহাদিগের অলৌকিক ঐশ্বর্যজ্ঞানে সময়ে সময়ে স্তম্ভিত হইলেও, পরক্ষণে উহা ভুলিয়া যাইতেছেন এবং প্রেমে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদিগকে অন্য সাধারণের ন্যায় অপূর্ণ জ্ঞানে তাঁহাদিগের কল্যাণচেষ্টায় নিযুক্ত হইতেছেন। অতএব অলৌকিক ভাবাবেশ ও শক্তিপ্রকাশ-দর্শনে সময়ে সময়ে স্তম্ভিতা হইলেও, তাঁহার প্রতি ঠাকুরের অকৃত্রিম ভক্তি, বিশ্বাস ও নির্ভরতা ব্রাহ্মণীর হৃদয়নিহিত কোমলকঠোর মাতৃস্নেহকে উদ্বেলিত করিয়া তাঁহাকে ভুলাইয়া রাখিতে এবং ঠাকুরকে সুখী করিবার জন্য সকল বিষয়ে সহায়তা করিতে সতত অগ্রসর করিত।

অবতার বলিয়া বুঝিয়াও ব্রাহ্মণী কিরূপে ঠাকুরকে সাধনায় সহায়তা করিয়াছিলেন

যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষাদানের সুযোগ উপস্থিত হইলে, গুরুর হৃদয়ে পরম পরিতৃপ্তি ও আত্মপ্রসাদ স্বতঃ উদিত হয়। সুতরাং ঠাকুরের ন্যায় উত্তমাধিকারীকে শিক্ষাদানের অবসর পাইয়া ব্রাহ্মণীর হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়াছিল। তাহার উপর ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অকৃত্রিম

ঠাকুরকে ব্রাহ্মণীর সর্ব তপস্যার ফলপ্রদানের জন্য ব্যস্ততা

বাৎসল্যভাব—অতএব এক্ষেত্রে ব্রাহ্মণী তাঁহার আজীবন স্বাধ্যায় ও তপস্যার ফল স্বল্পকালের মধ্যে তাঁহাকে অনুভব করাইবার জন্য সচেষ্ট হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

তন্ত্রোক্ত সাধনসকল-অনুষ্ঠানের পূর্বে ঠাকুর ঐ বিষয়ের ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে জিজ্ঞাসাপূর্বক তাঁহার অনুমতি লাভ করিয়া উহাতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে কখন কখন শ্রবণ করিয়াছি। অতএব কেবলমাত্র ব্রাহ্মণীর আগ্রহ ও উত্তেজনা তাঁহাকে ঐ বিষয়ে নিযুক্ত করে নাই; সাধনপ্রসূত যোগদৃষ্টিপ্রভাবেও তিনি এখন প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন—শাস্ত্রীয় প্রণালী-অবলম্বনে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রত্যক্ষ করিবার অবসর উপস্থিত হইয়াছে। ঠাকুরের একনিষ্ঠ মন ঐরূপে ব্রাহ্মণীনির্দিষ্ট সাধনপথে এখন পূর্ণাগ্রহে ধাবিত হইয়াছিল। সে আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতা অনুভব করা আমাদিগের ন্যায় ব্যক্তির সম্ভবপর নহে। কারণ পার্থিব নানা বিষয়ে প্রসারিত আমাদিগের মনের সে উপরতি ও একলক্ষতা কোথায়? অন্তঃসমুদ্রের উর্মিমালার বিচিত্র রঙ্গভঙ্গে ভাসমান না থাকিয়া উহার তলস্পর্শ করিবার জন্য সর্বস্ব ছাড়িয়া নিমগ্ন হইবার অসীম সাহস আমাদিগের কোথায়? 'একেবারে ডুবিয়া যা', 'আপনাতে আপনি ডুবিয়া যা' বলিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার যেভাবে উত্তেজিত করিতেন, সেইভাবে জগতের সকল পদার্থের এবং নিজ শরীরের প্রতি মায়ামমতা উচ্ছিন্ন করিয়া আধ্যাত্মিকতার গভীর গর্ভে ডুবিয়া যাইবার আমাদিগের সামর্থ্য কোথায়? আমরা যখন শুনি, ঠাকুর অসহ্য যন্ত্রণায় ব্যাকুল হইয়া 'মা, দেখা দে' বলিয়া পঞ্চবটীমূলে গঙ্গাসৈকতে মুখঘর্ষণ

জগদম্বার অনুজ্ঞা-লাভে ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অনুষ্ঠান—তাঁহার সাধনাগ্রহের পরিমাণ

করিতেন এবং দিনের পর দিন চলিয়া যাইলেও তাঁহার ঐ ভাবের বিরাম হইত না, তখন কথাগুলি কর্ণে প্রবিষ্ট হয় মাত্র, হৃদয়ে অনুরূপ ঝঙ্কারের কিছুমাত্র উপলব্ধি হয় না! হইবেই বা কেন? শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে যথার্থই আছেন এবং সর্বস্ব ছাড়িয়া ব্যাকুলহৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিলে তাঁহার দর্শনলাভ যে যথার্থই সম্ভবপর—এ কথায় কি আমরা ঠাকুরের ন্যায় সরলভাবে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছি?

সাধনকালে নিজ মানসিক আগ্রহের পরিমাণ ও তীব্রতার কিঞ্চিৎ আভাস ঠাকুর আমাদিগকে একদিন কাশীপুরে অবস্থানকালে প্রদান করিয়া স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। তৎকালে আমরা যাহা অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা পাঠককে কতদূর বুঝাইতে সমর্থ হইব বলিতে পারি না; কিন্তু কথাটির এখানে উল্লেখ করিব—

ঈশ্বরলাভের জন্য স্বামী বিবেকানন্দের আকুল আগ্রহ তখন আমরা কাশীপুরে স্বচক্ষে দর্শন করিতেছিলাম। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য নির্ধারিত টাকা (ফি) জমা দিতে যাইয়া কেমন করিয়া তাঁহার চৈতন্যোদয় হইল, উহার প্রেরণায় অস্থির হইয়া কেমন করিয়া তিনি একবস্ত্রে, নগ্নপদে জ্ঞানশূন্যের ন্যায় শহরের রাস্তা দিয়া ছুটিয়া কাশীপুরে শ্রীগুরুর পদপ্রান্তে উপস্থিত হইলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় নিজ মনোবেদনা নিবেদনপূর্বক তাঁহার কৃপালাভ করিলেন, আহার-নিদ্রা ত্যাগপূর্বক কেমন করিয়া তিনি ঐ সময় হইতে দিবারাত্র ধ্যান, জপ, ভজন ও ঈশ্বরচর্চায় কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন, অসীম সাধনোৎসাহে কেমন করিয়া তাঁহার কোমল হৃদয় তখন বজ্রকঠোর-ভাবাপন্ন হইয়া নিজ মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের অশেষ কষ্টে এককালে উদাসীন

কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর নিজ সাধন-কালের আগ্রহ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন

হইয়া রহিল এবং কেমন করিয়া শ্রীগুরুপ্রদর্শিত সাধনপথে দৃঢ়নিষ্ঠার সহিত অগ্রসর হইয়া তিনি দর্শনের পর দর্শন লাভ করিতে করিতে তিন চারি মাসের অন্তেই নির্বিকল্প-সমাধিসুখ প্রথম অনুভব করিলেন—ঐ সকল বিষয় তখন আমাদের চক্ষের সমক্ষে অভিনীত হইয়া আমাদিগকে স্তম্ভিত করিতেছিল। ঠাকুর তখন পরমানন্দে স্বামীজীর ঐরূপ অপূর্ব অনুরাগ, ব্যাকুলতা ও সাধনোৎসাহের ভূয়সী প্রশংসা নিত্য করিতেছিলেন। ঐ সময়ে একদিন ঠাকুর নিজ অনুরাগ ও সাধনোৎসাহের সহিত স্বামীজীর ঐ বিষয়ের তুলনা করিয়া ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "নরেন্দ্রের অনুরাগ উৎসাহ অতি অদ্ভুত, কিন্তু (আপনাকে দেখাইয়া) এখানে তখন (সাধনকালে) উহাদের যে তোড় (বেগ) আসিয়াছিল, তাহার তুলনায় ইহা যৎসামান্য —ইহা তাহার সিকিও হইবে না!" ঠাকুরের ঐ কথায় আমাদিগের মনে কীদৃশ ভাবের উদয় হইয়াছিল, হে পাঠক, পার ত কল্পনাসহায়ে তাহা অনুভব কর।

সে যাহা হউক, শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঠাকুর এখন সর্বস্ব ভুলিয়া সাধনায় মগ্ন হইলেন এবং প্রজ্ঞাসম্পন্না কর্মকুশলা ব্রাহ্মণী তান্ত্রিকক্রিয়োপযোগী পদার্থসকলের সংগ্রহপূর্বক উহাদিগের প্রয়োগ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়া তাঁহাকে সহায়তা করিতে অশেষ আয়াস করিতে লাগিলেন। মনুষ্য প্রভৃতি পঞ্চপ্রাণীর মস্তক-কঙ্কাল* গঙ্গাহীন প্রদেশ হইতে সযত্নে

* ইদানীং শৃণু দেবেশি মুণ্ডসাধনমুত্তমম্।
যৎ কৃত্বা সাধকো যাতি মহাদেব্যাঃ পরং পদম্॥ ৫১

নর-মহিষ-মার্জার-মুণ্ডত্রয়ং বরাননে।
অথবা পরমেশানি নৃমুণ্ডত্রয়মাদরাৎ॥ ৫২

সমাহৃত হইয়া ঠাকুরবাটীর উদ্যানে উত্তরসীমান্তে অবস্থিত বিল্বতরুমূলে এবং ঠাকুরের স্বহস্ত-প্রোথিত পঞ্চবটীতলে সাধনানুকূল দুইটি বেদিকা† নির্মিত হইল এবং প্রয়োজন মত ঐ মুণ্ডাসনদ্বয়ের অন্যতমের উপরে উপবিষ্ট হইয়া জপ, পুরশ্চরণ ও ধ্যানাদিতে ঠাকুরের কাল কাটিতে লাগিল।

শিবাসর্পসারমেয়বৃষভাণাং মহেশ্বরী।
নরমুণ্ডং তথা মধ্যে পঞ্চমুণ্ডানি হীরিতম্॥ ৫৩

অথবা পরমেশানি নরাণাং পঞ্চমুণ্ডকান্।
তথা শতং সহস্রং বাযুতং লক্ষং তথৈব চ॥ ৫৪

নিযুতঞ্চাথবা কোটিং নৃমুণ্ডান্ পরমেশ্বরি।
নরমুণ্ডং স্থাপয়িত্বা প্রোথয়িত্বা ধরাতলে॥ ৫৫

বিতস্তিপ্রমিতাং বেদীং তস্যোপরি প্রকল্পয়েৎ।
আয়ামপ্রস্থতো দেবি চতুর্হস্তৌ সমাচরেৎ॥ ৫৬

যোগিনীতন্ত্রম্—পঞ্চমপটলঃ

† সচরাচর পঞ্চমুণ্ডসংযুক্ত একটি বেদিকা নির্মাণ করিয়া সাধকেরা জপধ্যানাদি অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন; ঠাকুর কিন্তু দুইটি মুণ্ডাসনের কথা আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বিল্বমূলের বেদিকার নিম্নে তিনটি নরমুণ্ড প্রোথিত ছিল এবং পঞ্চবটীতলস্থ বেদিকায় পঞ্চপ্রকার জীবের পাঁচটি মুণ্ড প্রোথিত ছিল। সাধনায় সিদ্ধ হইবার কিছুকাল পরে, তিনি মুণ্ডকঙ্কালসকল গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপপূর্বক আসনদ্বয় ভঙ্গ করিয়া দিয়াছিলেন। সাধনায় ত্রিমুণ্ডাসন প্রশস্ততর বলিয়া হউক অথবা বিল্বমূল তৎকালে অধিকতর নির্জন থাকায় বিশেষ ক্রিয়াসকল অনুষ্ঠানের সুবিধা হইবে বলিয়াই হউক, দুইটি আসন নির্মিত হইয়াছিল। বিল্বমূলের সন্নিকটে কোম্পানীর বারুদখানা বিদ্যমান থাকায়, হোমাদির জন্য তথায় অগ্নি প্রজ্বলিত করিবার অসুবিধা হওয়ায় দুইটি মুণ্ডাসন নির্মিত হইয়াছিল, এরূপও হইতে পারে।

কয়েক মাস দিবারাত্র কোথা দিয়া আসিতে ও যাইতে লাগিল, তাহা এই অদ্ভুত সাধক ও উত্তরসাধিকার জ্ঞান রহিল না। ঠাকুর বলিতেন,* "ব্রাহ্মণী দিবাভাগে দূরে নানাস্থানে পরিভ্রমণপূর্বক তন্ত্রনির্দিষ্ট দুষ্প্রাপ্য পদার্থসকল সংগ্রহ করিত। রাত্রিকালে বিল্বমূলে বা পঞ্চবটীতলে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া আমাকে আহ্বান করিত এবং ঐ সকল পদার্থের সহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা যথাবিধি সম্পন্ন করাইয়া জপধ্যানে নিমগ্ন হইতে বলিত। কিন্তু পূজান্তে জপ প্রায়ই করিতে পারিতাম না, মন এতদূর তন্ময় হইয়া পড়িত যে, মালা ফিরাইতে যাইয়া সমাধিস্থ হইতাম এবং ঐ ক্রিয়ার শাস্ত্রনির্দিষ্ট ফল যথাযথ প্রত্যক্ষ করিতাম। ঐরূপে এই কালে দর্শনের পর দর্শন, অনুভবের পর অনুভব, অদ্ভুত অদ্ভুত সব কতই যে প্রত্যক্ষ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই! বিষ্ণুক্রান্তায় প্রচলিত চৌষট্টিখানা তন্ত্রে যত কিছু সাধনের কথা আছে, সকলগুলিই ব্রাহ্মণী একে একে অনুষ্ঠান করাইয়াছিল। কঠিন কঠিন সাধন—যাহা করিতে যাইয়া অধিকাংশ সাধক পথভ্রষ্ট হয়—মার (শ্রীশ্রীজগদম্বার) কৃপায় সে সকলে উত্তীর্ণ হইয়াছি।

পঞ্চমুণ্ডাসন-নির্মাণ ও চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধনের অনুষ্ঠান

একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী নিশাভাগে কোথা হইতে এক পূর্ণযৌবনা সুন্দরী রমণীকে ডাকিয়া আনিয়াছে এবং পূজার আয়োজন করিয়া ৺দেবীর আসনে তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিয়া উপবেশন করাইয়া আমাকে বলিতেছে, 'বাবা, ইঁহাকে দেবীবুদ্ধিতে পূজা কর'! পূজা সাঙ্গ হইলে বলিল, 'বাবা, সাক্ষাৎ জগজ্জননী

স্ত্রী-মূর্তিতে দেবীজ্ঞানসিদ্ধি

---

* ঠাকুরের শ্রীমুখে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে যাহা শুনা গিয়াছে, তাহাই এখানে সম্বদ্ধভাবে দেওয়া গেল।

জ্ঞানে ইহার ক্রোড়ে বসিয়া তন্ময়চিত্তে জপ কর!' তখন আতঙ্কে ক্রন্দন করিয়া মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) বলিলাম, 'মা, তোর শরণাগতকে এ কি আদেশ করিতেছিস? দুর্বল সন্তানের ঐরূপ দুঃসাহসের সামর্থ্য কোথায়?' ঐরূপ বলিবামাত্র দিব্যবলে হৃদয় পূর্ণ হইল এবং দেবতাবিষ্টের ন্যায় কি করিতেছি সম্যক্ না জানিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে রমণীর ক্রোড়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র সমাধিস্থ হইয়া পড়িলাম! অনন্তর যখন জ্ঞান হইল তখন ব্রাহ্মণী বলিল, 'ক্রিয়া পূর্ণ হইয়াছে, বাবা; অপরে কষ্টে ধৈর্যধারণ করিয়া ঐ অবস্থায় কিছুকাল জপমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তুমি এককালে শরীরবোধশূন্য হইয়া সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছ!' শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করার জন্য মাকে (শ্রীশ্রীজগদম্বাকে) কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বারংবার প্রণাম করিতে লাগিলাম।

"আর একদিন দেখি, ব্রাহ্মণী শবের খর্পরে মৎস্য রাঁধিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার তর্পণ করিল এবং আমাকেও ঐরূপ করাইয়া উহা গ্রহণ করিতে বলিল। তাহার আদেশে তাহাই করিলাম, মনে কোনরূপ ঘৃণার উদয় হইল না।

"কিন্তু যেদিন সে (ব্রাহ্মণী) গলিত আম-মহামাংস-খণ্ড আনিয়া তর্পণান্তে উহা জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিতে বলিল, সে দিন ঘৃণায় বিচলিত হইয়া বলিয়া উঠিলাম, 'তা কি কখন করা যায়?' শুনিয়া সে বলিল, 'সে কি বাবা, এই দেখ আমি করিতেছি!'—বলিয়াই সে উহা নিজ মুখে গ্রহণ করিয়া 'ঘৃণা করিতে নাই' বলিয়া পুনরায় উহার কিয়দংশ আমার সম্মুখে ধারণ করিল। তাহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রচণ্ড চণ্ডিকা-মূর্তির উদ্দীপনা হইয়া গেল এবং 'মা' 'মা' বলিতে বলিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলাম! তখন ব্রাহ্মণী উহা মুখে প্রদান করিলেও ঘৃণার উদয় হইল না।

ঘৃণাত্যাগ

"ঐরূপে পূর্ণাভিষেক গ্রহণ করাইয়া অবধি ব্রাহ্মণী কত প্রকারের অনুষ্ঠান করাইয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা হয় না। সকল কথা সকল সময়ে এখন স্মরণে আসে না। তবে মনে আছে, যে দিন সুরতক্রিয়াসক্ত নরনারীর সম্ভোগানন্দ দর্শনপূর্বক শিবশক্তির লীলাবিলাসজ্ঞানে মুগ্ধ ও সমাধিস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, সেই দিন বাহ্যচৈতন্য-লাভের পর ব্রাহ্মণী বলিয়াছিল, 'বাবা, তুমি আনন্দাসনে সিদ্ধ হইয়া দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে, উহাই এই মতের (বীরভাবের) শেষ সাধন!' উহার কিছুকাল পরে একজন ভৈরবীকে পাঁচসিকা দক্ষিণাদানে প্রসন্না করিয়া তাঁহার সহায়ে কালীঘরের নাটমন্দিরে দিবাভাগে সর্বজনসমক্ষে কুলাগার-পূজার যথাবিধি অনুষ্ঠান করিয়া বীরভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিয়াছিলাম। দীর্ঘকালব্যাপী তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় আমার রমণীমাত্রে মাতৃভাব যেমন অক্ষুণ্ণ ছিল, তদ্রূপ বিন্দুমাত্র 'কারণ' গ্রহণ করিতে পারি নাই। কারণের নাম বা গন্ধমাত্রেই জগৎকারণের উপলব্ধিতে আত্মহারা হইতাম এবং 'যোনি'-শব্দ শ্রবণমাত্রেই জগদ্‌যোনির উদ্দীপনায় সমাধিস্থ হইয়া পড়িতাম!"

আনন্দাসনে সিদ্ধিলাভ, কুলাগার পূজা এবং তন্ত্রোক্ত-সাধনকালে ঠাকুরের আচরণ

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে ঠাকুর একদিন তাঁহার রমণীমাত্রে মাতৃ-ভাবের উল্লেখ করিয়া একটি পৌরাণিক কাহিনী বলিয়াছিলেন। সিদ্ধ-জ্ঞানিগণের অধিনায়ক শ্রীশ্রীগণপতিদেবের হৃদয়ে ঐরূপ মাতৃজ্ঞান কিরূপে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, গল্পটি তাহারই বিবরণ। মদস্রাবিগজতুণ্ডাস্ফালিত-বদন লম্বোদর দেবতাটির উপর ইতিপূর্বে আমাদের ভক্তি-শ্রদ্ধার বড় একটা আতিশয্য ছিল না। কিন্তু ঠাকুরের শ্রীমুখ

শ্রীশ্রীগণপতির রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানসম্বন্ধে ঠাকুরের গল্প

হইতে উহা শুনিয়া পর্যন্ত ধারণা হইয়াছে, শ্রীশ্রীগণপতি বাস্তবিকই সকল দেবতার অগ্রে পূজা পাইবার যোগ্য।

কিশোরবয়সে গণেশ একদিন ক্রীড়া করিতে করিতে একটি বিড়াল দেখিতে পান এবং বালসুলভ চপলতায় উহাকে নানাভাবে পীড়াদান ও প্রহার করিয়া ক্ষতবিক্ষত করেন। বিড়াল কোনরূপে প্রাণ বাঁচাইয়া পলায়ন করিলে গণেশ শান্ত হইয়া নিজ জননী শ্রীশ্রীপার্বতীদেবীর নিকট আগমন করিয়া দেখিলেন, দেবীর শ্রীঅঙ্গের নানাস্থানে প্রহারচিহ্ন দেখা যাইতেছে। বালক মাতার ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ব্যথিত হইয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দেবী বিমর্ষভাবে উত্তর করিলেন, "তুমিই আমার ঐরূপ দুরবস্থার কারণ।" মাতৃভক্ত গণেশ ঐ কথায় বিস্মিত ও অধিকতর দুঃখিত হইয়া সজলনয়নে বলিলেন, "সে কি কথা, মা! আমি তোমাকে কখন প্রহার করিলাম? অথবা এমন কোন দুষ্কর্ম করিয়াছি বলিয়াও ত স্মরণ হইতেছে না, যাহাতে তোমার অবোধ বালকের জন্য অপরের হস্তে তোমাকে ঐরূপ অপমান সহ্য করিতে হইবে?" জগন্ময়ী শ্রীশ্রীদেবী তখন বালককে বলিলেন, "ভাবিয়া দেখ দেখি, কোন জীবকে আজ তুমি প্রহার করিয়াছ কিনা?" গণেশ বলিলেন, "তাহা করিয়াছি; অল্পক্ষণ হইল একটা বিড়ালকে মারিয়াছি।" যাহার বিড়াল সে-ই মাতাকে ঐরূপে প্রহার করিয়াছে ভাবিয়া গণেশ তখন রোদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর শ্রীশ্রীগণেশজননী অনুতপ্ত বালককে সাদরে হৃদয়ে ধারণপূর্বক বলিলেন, "তাহা নহে, বাবা, তোমার সম্মুখে বিদ্যমান আমার এই শরীরকে কেহ প্রহার করে নাই, কিন্তু আমিই মার্জারাদি যাবতীয় প্রাণিরূপে সংসারে বিচরণ করিতেছি, এজন্য তোমার প্রহারের চিহ্ন আমার অঙ্গে দেখিতে পাইতেছ। তুমি না জানিয়া ঐরূপ করিয়াছ,

সেজন্য দুঃখ করিও না ; কিন্তু অদ্যাবধি একথা স্মরণ রাখিও, স্ত্রীমূর্তিবিশিষ্ট জীবসকল আমার অংশে উদ্ভূত হইয়াছে এবং পুংমূর্তিধারী জীবসমূহ তোমার পিতার অংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছে—শিব ও শক্তি ভিন্ন জগতে কেহ বা কিছুই নাই !" গণেশ মাতার ঐ কথা শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া রহিলেন এবং বিবাহযোগ্য বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে মাতাকে বিবাহ করিতে হইবে ভাবিয়া উদ্বাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলেন। ঐরূপে শ্রীশ্রীগণেশ চিরকাল ব্রহ্মচারী হইয়া রহিলেন এবং শিবশক্ত্যাত্মক জগৎ — এই কথা হৃদয়ে সর্বদা ধারণা করিয়া থাকায় জ্ঞানিগণের অগ্রগণ্য হইলেন।

গণেশ ও কার্তিকের জগৎপরিভ্রমণ-বিষয়ক গল্প

পূর্বোক্ত গল্পটি বলিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীগণপতির জ্ঞানগরিমাসূচক নিম্নলিখিত কাহিনীটিও বলিয়াছিলেন : কোন সময় শ্রীশ্রীপার্বতী দেবী নিজ বহুমূল্য রত্নমালা দেখাইয়া গণেশ ও কার্তিককে বলেন যে, চতুর্দশভুবনান্বিত জগৎ পরিভ্রমণ করিয়া তোমাদের মধ্যে যে অগ্রে আমার নিকট উপস্থিত হইবে, তাহাকে আমি এই রত্নমালা প্রদান করিব। শিখিবাহন কার্তিকেয় অগ্রজের লম্বোদর স্থূল তনুর গুরুত্ব এবং তদীয় বাহন মূষিকের মন্দগতি স্মরণ করিয়া বিদ্রূপহাস্য হাসিলেন এবং 'রত্নমালা আমারই হইয়াছে' স্থির করিয়া ময়ূরারোহণে জগৎ-পরিভ্রমণে বহির্গত হইলেন। কার্তিক চলিয়া যাইবার বহুক্ষণ পরে গণেশ আসন পরিত্যাগ করিলেন এবং প্রজ্ঞাচক্ষুসহায়ে শিবশক্ত্যাত্মক জগৎকে শ্রীশ্রীহরপার্বতীর শরীরে অবস্থিত দেখিয়া ধীরপদে তাঁহাদিগকে পরিক্রমণ ও বন্দনা করতঃ নিশ্চিন্ত মনে উপবিষ্ট রহিলেন। অনন্তর কার্তিক ফিরিয়া আসিলে শ্রীশ্রীপার্বতীদেবী প্রসাদী রত্নমালা গণপতির প্রাপ্য বলিয়া নির্দেশপূর্বক তাঁহার গলদেশে উহা সস্নেহে লম্বিতা করিলেন।

ঐরূপে শ্রীশ্রীগণপতির রমণীমাত্রে মাতৃভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিলেন, "আমারও রমণীমাত্রে ঐরূপ ভাব; সেইজন্য বিবাহিতা স্ত্রীর ভিতরে শ্রীশ্রীজগদম্বার মাতৃমূর্তির সাক্ষাৎ দর্শন পাইয়া পূজা ও পাদবন্দনা করিয়াছিলাম।"

রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তন্ত্রোক্ত বীরভাবে সাধনসকল অনুষ্ঠান করিবার কথা আমরা কোনও যুগে কোনও সাধকের সম্বন্ধে শ্রবণ করি নাই। বীরমতাশ্রয়ী হইয়া সাধক-মাত্রেই একাল পর্যন্ত শক্তিগ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। বীরাচারী সাধকবর্গের মনে ঐ কারণে একটা দৃঢ়বদ্ধ ধারণা হইয়াছে, শক্তিগ্রহণ না করিলে সাধনায় সিদ্ধি বা শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসন্নতালাভ একান্ত অসম্ভব। নিজ পাশব প্রবৃত্তির এবং ঐ ধারণার বশবর্তী হইয়া সাধকেরা কখন কখন পরকীয়াশক্তি-গ্রহণেও বিরত থাকেন না। লোকে ঐজন্য তন্ত্রশাস্ত্র-নির্দিষ্ট বীরাচার-মতের নিন্দা করিয়া থাকে।

তন্ত্রসাধনে ঠাকুরের বিশেষত্ব

যুগাবতার অলৌকিক ঠাকুরই কেবল নিজসম্বন্ধে একথা আমাদিগকে বারংবার বলিয়াছেন, আজীবন তিনি কখন স্বপ্নেও স্ত্রীগ্রহণ করেন নাই। অতএব আজন্ম মাতৃভাবাবলম্বী ঠাকুরকে বীরমতের সাধনসমূহ অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইতে শ্রীশ্রীজগদম্বার গূঢ় অভিপ্রায় সুস্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

ঐ বিশেষত্ব ৺জগদম্বার অভিপ্রেত

ঠাকুর বলিতেন, সাধনসকলের কোনটিতে সাফল্যলাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময় লাগে নাই। 'সাধনবিশেষ গ্রহণ করিয়া ফল প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যাকুলহৃদয়ে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ধরিয়া বসিলে তিন দিবসেই উহাতে সিদ্ধকাম হইতাম।' শক্তি-গ্রহণ না করিয়া

বীরাচারের সাধনকালে তাঁহার ঐরূপে স্বল্পকালে সাফল্যলাভ করাতে একথা স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয় যে, পঞ্চ'ম'কার বা স্ত্রীগ্রহণ ঐসকল অনুষ্ঠানের অবশ্যকর্তব্য অঙ্গ নহে। সংযমরহিত সাধক আপন দুর্বল প্রকৃতির বশবর্তী হইয়া ঐরূপ করিয়া থাকে। সাধক ঐরূপ করিয়া বসিলেও যে, তন্ত্র তাহাকে অভয় দান করিয়াছেন এবং পুনঃপুনঃ অভ্যাসের ফলে কালে সে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে, একথার উপদেশ করিয়াছেন ইহাতে ঐ শাস্ত্রের পরমকারুণিকত্বই উপলব্ধ হয়।

শক্তিগ্রহণ না করিয়া ঠাকুরের সিদ্ধিলাভে যাহা প্রমাণিত হয়

অতএব রূপরসাদি যে-সকল পদার্থ মানবসাধারণকে প্রলোভিত করিয়া পুনঃপুনঃ জন্মমরণাদি অনুভব করাইতেছে এবং ঈশ্বরলাভ ও আত্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে দিতেছে না, সংযম-সহায়ে বারংবার উদ্যম ও চেষ্টার দ্বারা সেই সকলকে ঈশ্বরের মূর্তি বলিয়া অবধারণ করিতে সাধককে অভ্যস্ত করানই তান্ত্রিক ক্রিয়াসকলের উদ্দেশ্য বলিয়া অনুমিত হয়। সাধকের সংযম ও সর্বভূতে ঈশ্বরধারণার তারতম্য বিচার করিয়াই তন্ত্র পশু, বীর ও দিব্যভাবের অবতারণা করিয়াছেন এবং তাহাকে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় ভাবে ঈশ্বরোপাসনায় অগ্রসর হইতে উপদেশ করিয়াছেন। কিন্তু কঠোর সংযমকে ভিত্তিস্বরূপে অবলম্বনপূর্বক তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইলে ফল প্রত্যক্ষ হইবে, নতুবা নহে, একথা লোকে কালধর্মে প্রায় বিস্মৃত হইয়াছিল এবং তাহাদিগের অনুষ্ঠিত কুক্রিয়াসকলের জন্য তন্ত্রশাস্ত্রই দায়ী স্থির করিয়া সাধারণে তাহার নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। অতএব রমণীমাত্রে মাতৃভাবে পূর্ণহৃদয় ঠাকুরের এইসকল অনুষ্ঠানের সাফল্য দেখিয়া যথার্থ সাধককুল কোন্ লক্ষ্যে চলিতে হইবে,

তন্ত্রোক্ত অনুষ্ঠান-সকলের উদ্দেশ্য

তাহার নির্দেশ লাভপূর্বক যেমন উপকৃত হইয়াছে, তন্ত্রশাস্ত্রের প্রামাণ্যও তেমনি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া ঐ শাস্ত্র মহিমান্বিত হইয়াছে।

ঠাকুরের তন্ত্রসাধনের অন্য কারণ

ঠাকুর এই সময়ে তন্ত্রোক্ত রহস্যসাধনসমূহের অনুষ্ঠান কিঞ্চিদধিক দুই বৎসরকাল একাদিক্রমে করিলেও, উহাদিগের আদ্যোপান্ত বিবরণ আমাদিগের কাহাকেও কখন বলিয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না। তবে সাধনপথে উৎসাহিত করিবার জন্য ঐসকল কথার অল্পবিস্তর আমাদিগের অনেককে সময়ে সময়ে বলিয়াছেন, অথবা ব্যক্তিগত প্রয়োজন বুঝিয়া বিরল কাহাকেও কোন কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করাইয়াছেন। তন্ত্রোক্ত ক্রিয়াসকলের অনুষ্ঠানপূর্বক অসাধারণ অনুভবসমূহ স্বয়ং প্রত্যক্ষ না করিলে উত্তরকালে সমীপাগত নানা বিভিন্নপ্রকৃতিবিশিষ্ট ভক্তগণের মানসিক অবস্থা ধরিয়া সাধনপথে সহজে অগ্রসর করাইয়া দিতে পারিবেন না বলিয়াই যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঠাকুরকে এসময় এই পথের সহিত সম্যক্ পরিচিত করাইয়াছিলেন—একথা বুঝিতে পারা যায়। শরণাগত ভক্তদিগকে কিভাবে কতরূপে তিনি সাধনপথে অগ্রসর করাইয়া দিতেন, তদ্বিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস আমরা অন্যত্র* প্রদান করিয়াছি; তৎপাঠে আমাদের পূর্বোক্ত বাক্যের যুক্তিযুক্ততা বুঝিতে পাঠকের বিলম্ব হইবে না। অতএব এখানে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের দর্শন ও অনুভবসমূহ

সাধনক্রিয়াসকল পূর্বোক্তভাবে বলা ভিন্ন ঠাকুর তাঁহার তন্ত্রোক্ত সাধনকালের অনেকগুলি দর্শন ও অনুভবের কথা আমাদিগের নিকট মধ্যে মধ্যে উল্লেখ করিতেন। আমরা এখন উহাদিগের কয়েকটি পাঠককে বলিব।

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ১ম ও ২য় অধ্যায়

তিনি বলিতেন, তন্ত্রোক্ত সাধনের সময় তাঁহার পূর্ব স্বভাবের আমূল পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা সময়ে সময়ে শিবারূপ পরিগ্রহ করিয়া থাকেন শুনিয়া এবং কুক্কুরকে ভৈরবের বাহন জানিয়া তিনি ঐকালে তাহাদের উচ্ছিষ্ট খাদ্যকে পবিত্রবোধে গ্রহণ করিতেন। মনে কোনরূপ দ্বিধা হইত না।

শিবানীর উচ্ছিষ্ট গ্রহণ

শ্রীশ্রীজগদম্বার পাদপদ্মে দেহ, মন, প্রাণ আহুতি প্রদান করিয়া তিনি ঐকালে আপনাকে অন্তরে বাহিরে জ্ঞানাগ্নি-পরিব্যাপ্ত দেখিয়াছিলেন।

আপনাকে জ্ঞানাগ্নিব্যাপ্ত দর্শন

কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া মস্তকে উঠিবার কালে মূলাধারাদি সহস্রার পর্যন্ত পদ্মসকল উর্ধ্বমুখ ও পূর্ণপ্রস্ফুটিত হইতেছে এবং উহাদিগের একের পর অন্য যেমনি প্রস্ফুটিত হইতেছে, অমনি অপূর্ব অনুভবসমূহ অন্তরে উদিত হইতেছে*—এবিষয় ঠাকুর এই সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন—এক জ্যোতির্ময় দিব্য পুরুষমূর্তি সুষুম্নার মধ্য দিয়া ঐসকল পদ্মের নিকট উপস্থিত হইয়া জিহ্বাদ্বারা স্পর্শ করিয়া উহাদিগকে প্রস্ফুটিত করাইয়া দিতেছেন।

কুণ্ডলিনী-জাগরণ দর্শন

স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের এককালে ধ্যান করিতে বসিলেই সম্মুখে সুবৃহৎ বিচিত্র জ্যোতির্ময় একটি ত্রিকোণ স্বতঃ সমুদিত হইত এবং ঐ ত্রিকোণকে জীবন্ত বলিয়া তাঁহার বোধ হইত। একদিন দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া ঠাকুরকে এ বিষয় বলায়, তিনি বলিয়াছিলেন, "বেশ, বেশ, তোর ব্রহ্মযোনিদর্শন হইয়াছে ;

ব্রহ্মযোনি দর্শন

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়

বিল্বমূলে সাধনকালে আমিও ঐরূপ দেখিতাম এবং উহা প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিতেছে, দেখিতে পাইতাম।"

ব্রহ্মাণ্ডান্তর্গত পৃথক্ পৃথক্ যাবতীয় ধ্বনি একত্রীভূত হইয়া এক বিরাট প্রণবধ্বনি প্রতি মুহূর্তে জগতের সর্বত্র স্বতঃ উদিত হইতেছে—এ বিষয় ঠাকুর এইকালে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আমাদিগের কেহ কেহ বলেন, এইকালে তিনি পশু, পক্ষী প্রভৃতি মনুষ্যেতর জন্তুদিগের ধ্বনিসকলের যথাযথ অর্থবোধ করিতে পারিতেন—একথা তাঁহারা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছেন। স্ত্রীযোনির মধ্যে তিনি এইকালে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে সাক্ষাৎ অধিষ্ঠিতা দেখিয়াছিলেন।

অনাহতধ্বনি শ্রবণ

কুলাগারে ৺দেবীদর্শন

এইকালের শেষে ঠাকুর আপনাতে অণিমাদি সিদ্ধি বা বিভূতির আবির্ভাব অনুভব করিয়াছিলেন এবং নিজ ভাগিনেয় হৃদয়ের পরামর্শে ঐসকল প্রয়োগ করিবার ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট একদিন জানিতে যাইয়া দেখিয়াছিলেন, উহারা বেশ্যা-বিষ্ঠার তুল্য হেয় ও সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। তিনি বলিতেন, ঐরূপ দর্শন করা পর্যন্ত সিদ্ধাইয়ের নামে তাঁহার ঘৃণার উদয় হয়।

ঠাকুরের অণিমাদি সিদ্ধিকালের অনুভবপ্রসঙ্গে একটি কথা আমাদের মনে উদিত হইতেছে। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি পঞ্চবটীতলে নির্জনে একদিন আহ্বান করিয়া বলিয়াছিলেন, "ছাখ, আমাতে প্রসিদ্ধ অষ্টসিদ্ধি উপস্থিত রহিয়াছে; কিন্তু আমি ঐসকলের কখনও প্রয়োগ করিব না, একথা বহু পূর্ব হইতে নিশ্চয় করিয়াছি—উহাদিগের প্রয়োগ করিবার আমার কোনরূপ আবশ্যকতাও দেখি না; তোকে ধর্মপ্রচারাদি

অষ্টসিদ্ধি সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দের সহিত ঠাকুরের কথা

অনেক কার্য করিতে হইবে, তোকেই ঐসকল দান করিব স্থির করিয়াছি —গ্রহণ কর।" স্বামীজী তদুত্তরে জিজ্ঞাসা করেন, "মহাশয়, ঐসকল আমাকে ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে কি?" পরে ঠাকুরের উত্তরে যখন বুঝিলেন, উহারা ধর্মপ্রচারাদি কার্যে কিছুদূর পর্যন্ত সহায়তা করিতে পারিলেও ঈশ্বরলাভে কোনরূপ সহায়তা করিবে না, তখন তিনি ঐসকল গ্রহণে অসম্মত হইলেন। স্বামীজী বলিতেন, তাঁহার ঐ আচরণে ঠাকুর তাঁহার উপর অধিকতর প্রসন্ন হইয়াছিলেন।

মোহিনীমায়া দর্শন

শ্রীশ্রীজগন্মাতার মোহিনীমায়ার দর্শন করিবার ইচ্ছা মনে সমুদিত হওয়ায় ঠাকুর এইকালে দর্শন করিয়াছিলেন—এক অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রীমূর্তি গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্থিতা হইয়া ধীর-পদবিক্ষেপে পঞ্চবটীতে আগমন করিলেন; ক্রমে দেখিলেন, ঐ রমণী পূর্ণগর্ভা; পরে দেখিলেন, ঐ রমণী তাঁহার সম্মুখেই সুন্দর কুমার প্রসব করিয়া তাহাকে কত স্নেহে স্তন্যদান করিতেছেন; পরক্ষণে দেখিলেন, রমণী কঠোর করালবদনা হইয়া ঐ শিশুকে গ্রাস করিয়া পুনরায় গঙ্গাগর্ভে প্রবিষ্টা হইলেন।

ষোড়শীমূর্তির সৌন্দর্য

পূর্বোক্ত দর্শনসকল ভিন্ন ঠাকুর এইকালে দশভুজা হইতে দ্বিভুজা পর্যন্ত কত যে দেবীমূর্তি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা হয় না। উহাদিগের মধ্যে কোন কোনটি তাঁহাকে নানাভাবে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ঐ মূর্তিসমূহের সকলগুলিই অপূর্বস্বরূপা হইলেও শ্রীশ্রীরাজরাজেশ্বরী বা ষোড়শীমূর্তির সৌন্দর্যের সহিত তাঁহাদিগের রূপের তুলনা হয় না—একথা আমরা তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। তিনি বলিতেন—"ষোড়শী বা ত্রিপুরামূর্তির অঙ্গ হইতে রূপ-সৌন্দর্য গলিত হইয়া চতুর্দিকে পতিত

ও বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছিলাম।” এতদ্ভিন্ন ভৈরবাদি নানা দেবমূর্তি-সকলের দর্শনও ঠাকুর এই সময়ে পাইয়াছিলেন।

অলৌকিক দর্শন ও অনুভবসকল ঠাকুরের জীবনে তন্ত্রসাধনকাল হইতে নিত্য এতই উপস্থিত হইয়াছিল যে, তাহাদের সম্যক্ উল্লেখ করা মনুষ্যশক্তির সাধ্যাতীত বলিয়া আমাদের প্রতীতি হইয়াছে।

তন্ত্রোক্ত-সাধনকাল হইতে ঠাকুরের সুষুম্নাদ্বার পূর্ণভাবে উন্মোচিত হইয়া তাঁহার বালকবৎ অবস্থায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার কথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। এইকালের শেষভাগ হইতে তিনি পরিহিত বস্ত্র ও যজ্ঞসূত্রাদি চেষ্টা করিলেও অঙ্গে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিতেন না। ঐসকল কখন কোথায় যে পড়িয়া যাইত, তাহা জানিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্মে মন সতত নিবিষ্ট থাকা বশতঃ তাঁহার শরীরবোধ না থাকাই যে উহার হেতু, তাহা আর বলিতে হইবে না। নতুবা স্বেচ্ছাপূর্বক তিনি যে কখন ঐরূপ করেন নাই বা অন্যত্র দৃষ্ট পরমহংসদিগের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতে অভ্যাস করেন নাই—একথা আমরা তাঁহার শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, ঐসকল সাধনশেষে তাঁহার সকল পদার্থে অদ্বৈতবুদ্ধি এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল যে, বাল্যাবধি তিনি যাহাকে হেয় নগণ্য বস্তু বলিয়া পরিগণনা করিতেন, তাহাকেও মহাপবিত্র বস্তুসকলের সহিত তুল্য দেখিতেন। বলিতেন—“তুলসী ও সজিনাগাছের পত্র সমভাবে পবিত্র বোধ হইত।”

তন্ত্রসাধনে সিদ্ধিলাভে ঠাকুরের দেহবোধরাহিত্য ও বালকভাব-প্রাপ্তি

এইকাল হইতে আরম্ভ হইয়া কয়েক বৎসর পর্যন্ত ঠাকুরের অঙ্গকান্তি এত অধিক হইয়াছিল যে, তিনি সর্বদা সর্বত্র লোক-নয়নের আকর্ষণের

বিষয় হইয়াছিলেন। তাঁহার নিরভিমান চিত্তে উহাতে এত বিরক্তির উদয় হইত যে, তিনি উক্ত দিব্যকান্তি পরিহারের জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট অনেক সময় প্রার্থনা করিয়া বলিতেন—"মা, আমার এ বাহ্য রূপে কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই। উহা লইয়া তুই আমাকে আন্তরিক আধ্যাত্মিক রূপ প্রদান কর!" তাঁহার ঐরূপ প্রার্থনা কালে পূর্ণ হইয়াছিল, একথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।

তন্ত্রসাধনকালে ঠাকুরের অঙ্গকান্তি

তন্ত্রোক্ত সাধনে ব্রাহ্মণী যেমন ঠাকুরকে সহায়তা করিয়াছিলেন, ঠাকুরও তদ্রূপ ব্রাহ্মণীর আধ্যাত্মিক জীবন পূর্ণ করিতে উত্তরকালে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। তিনি ঐরূপ না করিলে ব্রাহ্মণী যে দিব্যভাবে প্রতিষ্ঠিতা হইতে পারিতেন না, একথার আভাস আমরা পাঠককে অন্যত্র দিয়াছি।† ব্রাহ্মণীর নাম যোগেশ্বরী ছিল এবং ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশসম্ভূতা বলিয়া নির্দেশ করিতেন।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীশ্রীযোগমায়ার অংশ ছিলেন

তন্ত্রসাধনপ্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করিয়া ঠাকুরের অন্য এক বিষয়ের উপলব্ধি হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদে তিনি জানিতে পারিয়াছিলেন, উত্তরকালে বহু ব্যক্তি তাঁহার নিকটে ধর্মলাভের জন্য উপস্থিত হইয়া কৃতার্থ হইবে। পরম অনুগত শ্রীযুত মথুর ও হৃদয় প্রভৃতিকে তিনি ঐ উপলব্ধির কথা বলিয়াছিলেন। মথুর তাহাতে বলিয়াছিলেন, "বেশ ত বাবা, সকলে মিলিয়া তোমাকে লইয়া আনন্দ করিব!"

গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়

গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৮ম অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়

জটাধারী ও বাৎসল্যভাব-সাধন

সন ১২৬৭ সালের শেষভাগে পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেহত্যাগের পর ভৈরবী শ্রীমতী যোগেশ্বরী দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমন করিয়াছিলেন। ঐকাল হইতে আরম্ভ করিয়া সন ১২৬৯ সালের শেষভাগ পর্যন্ত ঠাকুর তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহ অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ঐকালের প্রারম্ভ হইতে মথুরবাবু ঠাকুরের সেবাধিকার পূর্ণভাবে লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঐকালের পূর্বে মথুর বারংবার পরীক্ষা করিয়া ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব ঈশ্বরানুরাগ, সংযম ও ত্যাগবৈরাগ্য সম্বন্ধে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার সহিত তাঁহাতে মধ্যে মধ্যে উন্মত্ততারূপ ব্যাধির সংযোগ হয় কি-না, তদ্বিষয়ে তিনি তখনও একটা স্থির সিদ্ধান্ত করিতে পারেন নাই। তন্ত্রসাধনকালে তাঁহার মন হইতে ঐ সংশয় সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, অলৌকিক বিভূতিসকলের বারংবার প্রকাশ দেখিতে পাইয়া এইকালে তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, তাঁহার ইষ্টদেবী তাঁহার প্রতি প্রসন্না হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণবিগ্রহাবলম্বনে তাঁহার সেবা লইতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়া তাঁহাকে সর্ববিষয়ে রক্ষা করিতেছেন এবং তাঁহার প্রভুত্ব ও বিষয়াধিকার সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাঁহাকে দিন দিন অশেষ মর্যাদা

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুরের অনুভব ও আচরণ

ও গৌরব-সম্পন্ন করিয়া তুলিতেছেন। মথুরামোহন তখন যে কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছিলেন, তাহাতেই সিদ্ধকাম হইতেছিলেন এবং ঠাকুরের কৃপালাভে আপনাকে বিশেষভাবে দৈবসহায়বান বলিয়া অনুভব করিতে-ছিলেন। সুতরাং ঠাকুরের সাধনানুকূল দ্রব্যসমূহের সংগ্রহে এবং তাঁহার অভিপ্রায়মত দেবসেবা ও অন্যান্য সংকর্মে মথুরের এইকালে বহুল অর্থব্যয় করা বিচিত্র নহে।

সাধনসহায়ে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রকাশ দিন দিন যত বর্ধিত হইয়াছিল, তাঁহার শ্রীপদাশ্রয়ী মথুরের সর্ববিষয়ে উৎসাহ, সাহস ও বল ততই বৃদ্ধি পাইয়াছিল। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপনপূর্বক তাঁহার আশ্রয় ও কৃপালাভে ভক্ত নিজ হৃদয়ে যে অপূর্ব উৎসাহ ও বলসঞ্চার অনুভব করেন, মথুরের অনুভূতি এখন তাদৃশী হইয়াছিল। তবে রজোগুণী সংসারী মথুরের ভক্তি ঠাকুরের সেবা ও পুণ্যকার্যসকলের অনুষ্ঠানমাত্র করিয়াই পরিতুষ্ট থাকিত, আধ্যাত্মিক রাজ্যের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া গূঢ় রহস্যসকল প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হইত না। ঐরূপ না হইলেও কিন্তু মথুরের মন তাঁহাকে একথা স্থির বুঝাইয়াছিল যে, ঠাকুরই তাঁহার বল, বুদ্ধি, ভরসা, তাঁহার ইহকাল-পরকালের সম্বল এবং তাঁহার বৈষয়িক উন্নতি ও পদমর্যাদালাভের মূলীভূত কারণ।

ঠাকুরের কৃপালাভে মথুর যে এখন আপনাকে বিশেষ মহিমান্বিত জ্ঞান করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ের পরিচয় আমরা তাঁহার এই কালানুষ্ঠিত কার্যে পাইয়া থাকি। 'রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত'-শীর্ষক গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি এইকালে (সন ১২৭০ সালে) বহুব্যয়সাধ্য অন্নমেরু-ব্রতানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, এই ব্রতকালে প্রভূত স্বর্ণরৌপ্যাদি ব্যতীত সহস্র মণ চাউল ও সহস্র মণ তিল ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে

দান করা হইয়াছিল এবং সহচরী নাম্নী প্রসিদ্ধ গায়িকার কীর্তন, রাজনারায়ণের চণ্ডীর গান ও যাত্রা প্রভৃতিতে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী কিছুকালের জন্য উৎসবক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছিল। ঐসকল গায়ক-গায়িকার ভক্তিবসাশ্রিত সঙ্গীত-শ্রবণে তাঁহাকে মুহুর্মুহুঃ ভাবসমাধিতে মগ্ন হইতে দেখিয়া শ্রীযুত মথুর ঠাকুরের পরিতৃপ্তির তারতম্যকেই তাহাদিগের গুণপনার পরিমাপক-স্বরূপে নির্ধারিত করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে বহুমূল্য শাল, রেশমী বস্ত্র ও প্রচুর মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করিয়াছিলেন।

মথুরের অন্নমেরু-ব্রতানুষ্ঠান

পূর্বোক্ত ব্রতানুষ্ঠানের স্বল্পকাল পূর্বে ঠাকুর বর্ধমানরাজের প্রধান সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত পদ্মলোচনের গভীর পাণ্ডিত্য ও নিরভিমানিতার কথা শুনিয়া তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, অন্নমেরুব্রত-কালে আহূত পণ্ডিতসভাতে পদ্মলোচনকে আনয়ন ও দানগ্রহণ করাইবার নিমিত্ত শ্রীযুত মথুরের বিশেষ আগ্রহ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তির কথা জানিতে পারিয়া মথুর উক্ত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিতে হৃদয়রামকে পাঠাইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন নানা-কারণে মথুরের ঐ নিমন্ত্রণগ্রহণে অসমর্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন পণ্ডিতের কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র সবিস্তার বলিয়াছি*

বৈদান্তিক পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত ঠাকুরের সাক্ষাৎ

তান্ত্রিকসাধনসমূহ অনুষ্ঠানের পর ঠাকুর বৈষ্ণবমতের সাধনসকলে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।† ঐরূপ হইবার কতকগুলি স্বাভাবিক কারণ

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

† ইহা তাঁহার দ্বিতীয়বার এবং গুরূপদিষ্ট প্রণালী-অবলম্বনে বৈষ্ণবমত-সাধনা ইহার পূর্বে তিনি হৃদয়ের ঐকান্তিক প্রেরণায় দাস্যভক্তির সাধন করিয়া সিদ্ধকাম হইয়াছিলেন। (১৫৪-৫৬ পৃষ্ঠা)—প্রঃ

আমরা অনুসন্ধানে পাইয়া থাকি। প্রথম—ভক্তিমতী ব্রাহ্মণী বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনসমূহে স্বয়ং পারদর্শিনী ছিলেন এবং ঐ ভাবসকলের অন্যতমকে আশ্রয়পূর্বক তন্ময়চিত্তে অনেককাল অবস্থান করিতেন। নন্দরাণী যশোদার ভাবে তন্ময় হইয়া ঠাকুরকে বালগোপাল-জ্ঞানে ভোজন করাইবার কথা আমরা তাঁহার সম্বন্ধে ইতিপূর্বে বলিয়াছি। অতএব বৈষ্ণবমত-সাধনবিষয়ে ঠাকুরকে তাঁহার উৎসাহপ্রদান করা বিচিত্র নহে। দ্বিতীয়—বৈষ্ণবকুলসম্ভূত ঠাকুরের বৈষ্ণবভাবসাধনে অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক। কামারপুকুর-অঞ্চলে ঐসকল সাধন বিশেষভাবে প্রচলিত থাকায় উহাদিগের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা-সম্পন্ন হইবার বাল্যকাল হইতে বিশেষ সুযোগ ছিল। তৃতীয় ও সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট কারণ—ঠাকুরের ভিতর আজীবন পুরুষ ও স্ত্রী, উভয়বিধ প্রকৃতির অদৃষ্টপূর্ব সম্মিলন দেখা যাইত। উহাদিগের একের প্রভাবে তিনি সিংহপ্রতিম নির্ভীক, বিক্রমশালী, সর্ববিষয়ের কারণান্বেষী, কঠোর পুরুষ-প্রবররূপে প্রতিভাত হইতেন এবং অন্যের প্রকাশে ললনাজনসুলভ কোমল-কঠোর-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া হৃদয় দিয়া জগতের যাবতীয় বস্তু ও ব্যক্তিকে দেখিতেছেন এবং পরিমাণ করিতেছেন, এইরূপ দেখা যাইত। শেষোক্ত প্রকৃতির বশে তাঁহাতে কতকগুলি বিষয়ে তীব্র অনুরাগ ও অন্য কতকগুলিতে ঐরূপ বিরাগ স্বভাবতঃ উপস্থিত হইত এবং ভাবাবেশে অশেষ ক্লেশ হাস্যমুখে বহন করিতে পারিলেও ভাববিহীন হইয়া ইতর-সাধারণের ন্যায় কোন কার্য করিতে সমর্থ হইতেন না।

ঠাকুরের বৈষ্ণবমতের সাধনসমূহে প্রবৃত্ত হইবার কারণ

সাধনকালের প্রথম চারি বৎসরে ঠাকুর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত শান্ত, দাস্য এবং কখন কখন শ্রীকৃষ্ণসখা সুদামাদি ব্রজবালকগণের ন্যায় সখ্যভাবা-

বলম্বনে সাধনে স্বয়ং প্রবর্তিত হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। শ্রীরাম-চন্দ্রগতপ্রাণ মহাবীরকে আদর্শরূপে গ্রহণপূর্বক দাস্যভক্তি অবলম্বনে তাঁহার কিছুকাল অবস্থিতি এবং জনকনন্দিনী, জনমদুঃখিনী সীতার দর্শনলাভ প্রভৃতি কথা ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। অতএব বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত বাৎসল্য ও মধুর-রসাশ্রিত মুখ্য ভাবদ্বয়সাধনেই তিনি এখন মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। দেখিতে পাওয়া যায় এইকালে তিনি আপনাকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার সখারূপে ভাবনা করিয়া চামরহস্তে তাঁহাকে বীজনে নিযুক্ত আছেন, শরৎকালীন দেবীপূজাকালে মথুরের কলিকাতাস্থ বাটীতে উপস্থিত হইয়া রমণীজনোচিত সাজে সজ্জিত ও কুলস্ত্রীগণ-পরিবৃত হইয়া ৺দেবীর দর্শনাদি করিতেছেন এবং স্ত্রীভাবের প্রাবল্যে অনেক সময়ে স্বয়ং যে পুংদেহবিশিষ্ট, একথা বিস্মৃত হইতেছেন।* আমরা যখন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট যাইতে আরম্ভ করিয়াছি, তখনও তাহাতে সময়ে সময়ে প্রকৃতিভাবের উদয় হইতে দেখিয়াছি, কিন্তু তখন উহার এইকালের মত দীর্ঘকালব্যাপী আবেশ উপস্থিত হইত না। ঐরূপ হইবার আবশ্যকতাও ছিল না। কারণ, স্ত্রী-পুংপ্রকৃতিগত যাবতীয় ভাব এবং তদতীত অদ্বৈতভাব-মুখে ইচ্ছামত অবস্থান করা শ্রীশ্রীজগদম্বার কৃপায় তাঁহার তখন সহজ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং সমীপাগত প্রত্যেক ব্যক্তির কল্যাণ-সাধনের জন্য ঐসকল ভাবের যেটিতে যতক্ষণ ইচ্ছা তিনি অবস্থান করিতেছিলেন।

বাৎসল্য ও মধুর-ভাবসাধনের পূর্বে ঠাকুরের ভিতর স্ত্রীভাবের উদয়

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়

ঠাকুরের সাধনকালের মহিমা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে পাঠককে কল্পনাসহায়ে সর্বাগ্রে অনুধ্যান করিয়া দেখিতে হইবে, তাঁহার মন জন্মাবধি কীদৃশ অসাধারণ ধাতুতে গঠিত থাকিয়া কিভাবে সংসারে নিত্য বিচরণ করিত এবং আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবল বাত্যাভিমুখে পতিত হইয়া বিগত আট বৎসরে উহাতে কিরূপ পরিবর্তনসকল উপস্থিত হইয়াছিল। আমরা তাঁহার নিজমুখে শুনিয়াছি, ১২৬২ সালে দক্ষিণেশ্বর কালী-বাটীতে যখন তিনি প্রথম পদার্পণ করেন এবং উহার পরেও কিছুকাল পর্যন্ত তিনি সরলভাবে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতৃ-পিতামহগণ যেরূপে সৎপথে থাকিয়া সংসারধর্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনিও ঐরূপ করিবেন। আজন্ম অভিমানরহিত তাঁহার মনে একথা একবারও উদিত হয় নাই যে, তিনি সংসারের অন্য কাহারও অপেক্ষা কোন অংশে বড় বা বিশেষগুণসম্পন্ন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অসাধারণ বিশেষত্ব প্রতি পদে প্রকাশিত হইয়া পড়িতে লাগিল। এক অপূর্ব দৈবশক্তি যেন প্রতিক্ষণ তাঁহার সঙ্গে থাকিয়া সংসারের রূপরসাদি প্রত্যেক বিষয়ের অনিত্যত্ব ও অকিঞ্চিৎকরত্ব উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া তাঁহার নয়নসম্মুখে ধারণপূর্বক তাঁহাকে সর্বদা বিপরীত পথে চালিত করিতে লাগিল। স্বার্থশূন্য সত্যমাত্রানুসন্ধিৎসু ঠাকুর উহার ইঙ্গিতে চলিতে ফিরিতে শীঘ্রই আপনাকে অভ্যস্ত করিয়া ফেলিলেন। পার্থিব ভোগ্যবস্তুসকলের কোনটি লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহার মনে প্রবল থাকিলে ঐরূপ করা তাঁহার যে সুকঠিন হইত, একথা বুঝিতে পারা যায়।

ঠাকুরের মনের গঠন কিরূপ ছিল, তদ্বিষয়ের আলোচনা

সর্ববিষয়ে ঠাকুরের আজীবন আচরণ স্মরণ করিলেই পূর্বোক্ত কথা

পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। সংসারে প্রচলিত বিদ্যাভ্যাসের উদ্দেশ্য 'চালকলাবাঁধা' বা অর্থোপার্জন বুঝিয়া তিনি লেখপড়া শিখিলেন না—সংসারযাত্রানির্বাহে সাহায্য হইবে বলিয়া পূজকের পদ গ্রহণ করিয়া দেবোপাসনার অন্যোদ্দেশ্য বুঝিলেন এবং ঈশ্বরলাভের জন্য উন্মত্ত হইয়া উঠিলেন—সম্পূর্ণ সংযমেই ঈশ্বরলাভ হয়, একথা বুঝিয়া বিবাহিত হইলেও কখন স্ত্রীগ্রহণ করিলেন না—সঞ্চয়শীল ব্যক্তি ঈশ্বরে পূর্ণনির্ভরবান হয় না বুঝিয়া কাঞ্চনাদি দূরের কথা, সামান্য পদার্থসকল-সঞ্চয়ের ভাবও মন হইতে এককালে উৎপাটিত করিয়া ফেলিলেন—ঐরূপ অনেক কথা ঠাকুরের সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়। ঐসকল কথার অনুধাবনে বুঝিতে পারা যায়, ইতরসাধারণ জীবের মোহকর সংস্কারবন্ধনসকল তাঁহার মনে বাল্যাবধি কতদূর অল্প প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। উহাতে এই কথারও স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তাঁহার ধারণাশক্তি এত প্রবল ছিল যে, মনের পূর্ব-সংস্কারসকল তাঁহার সম্মুখে মস্তকোত্তোলন করিয়া তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট করাইতে কখনও সমর্থ হইত না।

ঠাকুরের মনে সংস্কারবন্ধন কত অল্প ছিল

তদ্ভিন্ন আমরা দেখিয়াছি, বাল্যকাল হইতে ঠাকুর শ্রুতিধর ছিলেন। যাহা একবার শুনিতেন, তাহা আনুপূর্বিক আবৃত্তি করিতে পারিতেন এবং তাঁহার স্মৃতি উহা চিরকালের জন্য ধারণ করিয়া থাকিত। বাল্যকালে রামায়ণাদি কথা, গান ও যাত্রা প্রভৃতি একবার শ্রবণ করিবার পরে বয়স্যগণকে লইয়া কামারপুকুরে গোঠে ব্রজে তিনি ঐসকলের কিরূপে পুনরাবৃত্তি করিতেন, তদ্বিষয় পাঠকের জানা আছে। অতএব দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টপূর্ব সত্যানুরাগ, শ্রুতিধরত্ব ও সম্পূর্ণ

সাধনায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ঠাকুরের মন কিরূপ গুণসম্পন্ন ছিল

ধারণারূপ দৈবী সম্পত্তিনিচয় নিজস্ব করিয়া ঠাকুর সাধকজীবনে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। যে অনুরাগ, ধারণা প্রভৃতি গুণসমূহ আয়ত্ত করা সাধারণ সাধকের জীবনপাতী চেষ্টাতেও সুসাধ্য হয় না, তিনি সেই গুণসকলকে ভিত্তিরূপে অবলম্বন করিয়া সাধনরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। সুতরাং সাধনরাজ্যে স্বল্পকালমধ্যে তাঁহার সমধিক ফললাভ করা বিচিত্র নহে। সাধনকালে কঠিন সাধনসমূহে তিনি তিন দিনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, একথা তাঁহার নিকটে শ্রবণ করিয়া অনেক সময়ে আমরা যে বিস্ময়ে হতবুদ্ধি হইয়াছি, তাহার কারণ তাঁহার অসামান্য মানসিক গঠনের কথা আমরা তখন বিন্দুমাত্র হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি নাই।

ঠাকুরের জীবনের কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করিলে পাঠক আমাদিগের পূর্বোক্ত কথা বুঝিতে পারিবেন। সাধনকালের প্রথমে ঠাকুর নিত্যানিত্য-বস্তু বিচারপূর্বক 'টাকা মাটি—মাটি টাকা' বলিতে বলিতে মৃত্তিকাসহ কয়েকখণ্ড মুদ্রা গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন—অমনি তৎসহ যে কাঞ্চনা-শক্তি মানবমনের অন্তস্তল পর্যন্ত আপন অধিকার বিস্তৃত করিয়া রহিয়াছে, তাহা চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার মন হইতে সমূলে উৎপাটিত হইয়া গঙ্গাগর্ভে বিসর্জিত হইল। সাধারণে যে স্থানে গমনপূর্বক স্নানাদি না করিলে আপনাদিগকে শুচি জ্ঞান করে না, সেই স্থান তিনি স্বহস্তে মার্জনা করিলেন—অমনি তাঁহার মন জন্মগত জাত্যভিমান পরিত্যাগপূর্বক চিরকালের নিমিত্ত ধারণা করিয়া রাখিল, সমাজে অস্পৃশ্য জাতি বলিয়া পরিগণিত ব্যক্তিসমূহ অপেক্ষা তিনি কোন অংশে বড় নহেন! জগদম্বার সন্তান বলিয়া আপনাকে ধারণাপূর্বক ঠাকুর যেমন শুনিলেন, তিনিই 'স্ত্রিয়ঃ সমস্তাঃ সকলা জগৎসু'—অমনি আর কখন স্ত্রীজাতির কাহাকেও ভোগ-

ঠাকুরের অসাধারণ মানসিক গঠনের দৃষ্টান্ত ও আলোচনা

লালসার চক্ষে দেখিয়া দাম্পত্য সুখলাভে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। ঐসকল বিষয়ের অনুধাবনে স্পষ্ট বুঝা যায়, অসামান্য ধারণাশক্তি না থাকিলে তিনি ঐরূপ ফলসকল কখন লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার জীবনের ঐসকল কথা শুনিয়া আমরা যে বিস্মিত হই অথবা সহসা বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহার কারণ—আমরা ঐসময়ে আমাদিগের অন্তরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিতে পাই যে, ঐরূপে মৃত্তিকাসহ মুদ্রাখণ্ড সহস্রবার জলে বিসর্জন করিলেও আমাদিগের কাঞ্চনাসক্তি যাইবে না—সহস্রবার কদর্য স্থান ধৌত করিলেও আমাদের মনের অভিমান ধৌত হইবে না এবং জগজ্জননীর রমণীরূপে প্রকাশ হইয়া থাকিবার কথা আজীবন শুনিলেও কার্যকালে আমাদিগের রমণীমাত্রে মাতৃজ্ঞানের উদয় হইবে না! আমাদিগের ধারণাশক্তি পূর্বকৃত কর্মসংস্কারের নিতান্ত নিগড়বদ্ধ রহিয়াছে বলিয়া, চেষ্টা করিয়াও আমরা এসকল বিষয়ে ঠাকুরের ন্যায় ফললাভ করিতে পারি না। সংযমরহিত, ধারণাশূন্য, পূর্বসংস্কারপ্রবল মন লইয়া আমরা ঈশ্বরলাভ করিতে সাধনরাজ্যে অগ্রসর হই—ফলও সুতরাং তাঁহার ন্যায় লাভ করিতে পারি না।

ঠাকুরের ন্যায় অপূর্বশক্তিবিশিষ্ট মন সংসারে চারি-পাঁচ শত বৎসরেও এক আধটা আসে কিনা সন্দেহ। সংযমপ্রবীণ, ধারণাকুশল, পূর্বসংস্কার-নির্জীব সেই মন ঈশ্বরলাভের জন্য অদৃষ্টপূর্ব অনুরাগব্যাকুলতা-তাড়িত হইয়া আট বৎসর কাল আহারনিদ্রাত্যাগপূর্বক শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শন-লাভের জন্য সচেষ্ট থাকিয়া কতদূর শক্তিসম্পন্ন হইয়াছিল এবং সূক্ষ্মদৃষ্টি-সহায়ে কিরূপ প্রত্যক্ষসকল লাভ করিয়াছিল, তাহা আমাদের মত মনের কল্পনায় আনয়ন করাও অসম্ভব।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, রাণী রাসমণির মৃত্যুর পর দক্ষিণেশ্বর

কালীবাটীতে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবার কিছুমাত্র ত্রুটি পরিলক্ষিত হইত না।

ঠাকুরের অনুজ্ঞায় মথুরের সাধুসেবা

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ মথুরামোহন ঐ সেবার জন্য নিয়মিত ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, অনেক সময় ঠাকুরের নির্দেশে ঐ বিষয়ে তদপেক্ষা অধিক ব্যয় করিতেন। দেবদেবীসেবা ভিন্ন সাধুভক্তের সেবাতে তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। কারণ ঠাকুরের শ্রীপদাশ্রয়ী মথুর তাঁহার শিক্ষায় সাধুভক্তগণকে ঈশ্বরের প্রতিরূপ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। সেজন্য দেখা যায়, ঠাকুর যখন এইকালে তাঁহাকে সাধুভক্তদিগকে অন্নদান ভিন্ন দেহ-রক্ষার উপযোগী বস্ত্র কম্বলাদি ও নিত্যব্যবহার্য কমণ্ডলু প্রভৃতি জলপাত্র-দানের ব্যবস্থা করিতে বলেন, তখন ঐ বিষয় সুচারুরূপে সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি ঐসকল পদার্থ ক্রয় করিয়া কালীবাটীর একটি গৃহ পূর্ণ করিয়া রাখেন এবং ঐ নূতন ভাণ্ডারের দ্রব্যসকল ঠাকুরের আদেশানুসারে বিতরিত হইবে, কর্মচারীদিগকে এইরূপ বলিয়া দেন। আবার উহার কিছুকাল পরে সকল সম্প্রদায়ের সাধুভক্তদিগকে সাধনার অনুকূল পদার্থসকল দান করিয়া তাহাদিগের সেবা করিবার অভিপ্রায় ঠাকুরের মনে উদিত হইলে, মথুর তদ্বিষয় জানিতে পারিয়া উহারও বন্দোবস্ত করিয়া দেন।* সম্ভবতঃ সন ১২৬৯-৭০ সালেই মথুরামোহন ঠাকুরের অভিপ্রায়ানুসারে ঐরূপে সাধুসেবার বহুল অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন এবং ঐজন্য রাণী রাসমণির কালীবাটীর অদ্ভুত আতিথেয়তার কথা সাধুভক্তগণের মধ্যে সর্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল। রাণী রাসমণির জীবৎকাল হইতেই কালীবাটী তীর্থপর্যটনশীল সাধু-পরিব্রাজকগণের নিকটে পথিমধ্যে কয়েক দিন বিশ্রামলাভের স্থানবিশেষ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকিলেও, এখন উহার

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

সুনাম চারিদিকে সমধিক প্রসারিত হইয়া পড়ে এবং সর্বসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকাগ্রণী সকলে ঐ স্থানে উপস্থিত ও আতিথ্যগ্রহণে পরিতৃপ্ত হইয়া উহার সেবাপরিচালককে আশীর্বাদপূর্বক গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতে থাকেন। ঐরূপে সমাগত বিশিষ্ট সাধুদিগের কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহা অন্যত্র লিপিবদ্ধ করিয়াছি।[1] এখানে তাহার পুনরুল্লেখ—'জটাধারী' নামক যে রামাইত সাধুর নিকট ঠাকুর রামমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ করেন ও 'শ্রীশ্রীরামলালা' নামক শ্রীরামচন্দ্রের বালবিগ্রহ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারই দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আগমনকাল পাঠককে জানাইবার জন্য। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে তিনি ঠাকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জটাধারীর আগমন

শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি জটাধারীর অদ্ভুত অনুরাগ ও ভালবাসার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে অনেকবার শ্রবণ করিয়াছি। বালক রামচন্দ্রের মূর্তিই তাঁহার সমধিক প্রিয় ছিল। ঐ মূর্তির বহুকাল সেবায় তাঁহার মন ভাবরাজ্যে আরূঢ় হইয়া এতদূর অন্তর্মুখী ও তন্ময়াবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার পূর্বেই তিনি দেখিতে পাইতেন, শ্রীরামচন্দ্রের জ্যোতির্ঘন বালবিগ্রহ সত্যসত্যই তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার ভক্তিপূত সেবা গ্রহণ করিতেছেন। প্রথমে এরূপ দর্শন মধ্যে মধ্যে ক্ষণকালের জন্য উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আনন্দে বিহ্বল করিত। কালে সাধনায় তিনি যত অগ্রসর হইয়াছিলেন, ঐ দর্শনও তত ঘনীভূত হইয়া বহুকালব্যাপী এবং ক্রমে নিত্য-পরিদৃষ্ট বিষয়সকলের ন্যায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ঐরূপে বাল-শ্রীরামচন্দ্রকে তিনি একপ্রকার নিত্য সহচররূপে লাভ করিয়াছিলেন। অনন্তর যদবলম্বনে ঐরূপ পরম সৌভাগ্য তাঁহার জীবনে উপস্থিত

[1] গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

হইয়াছিল, সেই রামলালাবিগ্রহের সেবাতে আপনাকে নিত্য নিযুক্ত রাখিয়া জটাধারী ভারতের নানা তীর্থ যদৃচ্ছাক্রমে পর্যটনপূর্বক দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এই সময়ে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন।

জটাধারীর সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

রামলালা-সেবায় নিযুক্ত জটাধারী যে বাল-রামচন্দ্রের ভাবঘন মূর্তির সদাসর্বদা দর্শনলাভ করেন, একথা তিনি কাহারও নিকট প্রকাশ করেন নাই। লোকে দেখিত, তিনি একটি ধাতুময় বাল-বিগ্রহের সেবা অপূর্ব নিষ্ঠার সহিত সর্বক্ষণ সম্পাদন করিয়া থাকেন, এই পর্যন্ত। ভাবরাজ্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর ঠাকুরের দৃষ্টি কিন্তু তাঁহার সহিত প্রথম সাক্ষাতের স্থূল যবনিকার অন্তরাল ভেদ করিয়া অন্তরের গূঢ় রহস্য অবধারণ করিয়াছিল। ঐজন্য প্রথম দর্শনেই তিনি জটাধারীর প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসকল সাহ্লাদে প্রদানপূর্বক তাঁহার নিকটে প্রতিদিন বহুক্ষণ অবস্থান করিয়া তাঁহার সেবা ভক্তিভরে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের যে ভাবঘন দিব্যমূর্তির দর্শন সর্বক্ষণ পাইতেন, সেই মূর্তির দর্শন পাইয়াছিলেন বলিয়াই যে ঠাকুর এখন ঐরূপ করিয়াছিলেন, একথা আমরা অন্যত্র বলিয়াছি।* ঐরূপে জটাধারীর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ ক্রমে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ ঘনিষ্ঠ ভাব ধারণ করিয়াছিল।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুর এই সময়ে আপনাকে রমণীজ্ঞানে তন্ময় হইয়া অনেক কাল অবস্থান করিতেছিলেন। হৃদয়ের প্রবল

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

প্রেরণায় শ্রীশ্রীজগদম্বার নিত্যসঙ্গিনী-জ্ঞানে অনেক সময় স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকা, পুষ্পহারাদি রচনা করিয়া তাঁহার বেশভূষা করিয়া দেওয়া, গ্রীষ্মাপনোদনের জন্য বহুক্ষণ ধরিয়া তাঁহাকে চামরব্যজন করা, মথুরকে বলিয়া নূতন নূতন অলঙ্কার নির্মাণ করাইয়া তাঁহাকে পরাইয়া দেওয়া এবং তাঁহার পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে নৃত্যগীতাদি শ্রবণ করান প্রভৃতি কার্যে তিনি এই সময়ে অনেক কাল অতিবাহিত করিতেছিলেন। জটাধারীর সহিত আলাপে শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি ভক্তিপ্রীতি পুনরুদ্দীপিত হইয়া তিনি এখন তাঁহার ভাবঘন শৈশবাবস্থার মূর্তির দর্শনলাভ করিলেন এবং প্রকৃতিভাবের প্রাবল্যে তাঁহার হৃদয় বাৎসল্যরসে পূর্ণ হইল। মাতা শিশুপুত্রকে দেখিয়া যে অপূর্ব প্রীতি ও প্রেমাকর্ষণ অনুভব করিয়া থাকেন, তিনি এখন ঐ শিশুমূর্তির প্রতি সেইরূপ আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। ঐ প্রেমাকর্ষণই তাঁহাকে এখন জটাধারীর বালবিগ্রহের পার্শ্বে বসাইয়া কিরূপে কোথা দিয়া সময় অতীত হইতেছে, তাহা জানিতে দিত না। তাঁহার নিজ মুখে শ্রবণ করিয়াছি, ঐ উজ্জ্বল দেবশিশু মধুময় বালচেষ্টায় ভুলাইয়া তাঁহাকে সর্বক্ষণ নিজ সকাশে ধরিয়া রাখিতে নিত্য প্রয়াস পাইত, তাঁহার অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া পথ নিরীক্ষণ করিত এবং নিষেধ না শুনিয়া তাঁহার সহিত যথাতথা গমনে উদ্যত হইত!

স্ত্রীভাবের উদয়ে ঠাকুরের বাৎসল্যভাব-সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া

ঠাকুরের উদ্যমশীল মন কখন কোন কার্যের অর্ধেক নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিত না। স্থূল কর্মক্ষেত্রে প্রকাশিত তাঁহার ঐরূপ স্বভাব সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যের বিষয়সকলের অধিকারেও পরিদৃষ্ট হইত। দেখা যাইত, স্বাভাবিক প্রেরণায় ভাববিশেষ তাঁহার হৃদয় পূর্ণ করিলে তিনি

উহার চরম সীমা পর্যন্ত উপলব্ধি না করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন না।

কোন ভাবের উদয় হইলে উহার চরম উপলব্ধি করিবার জন্ত তাঁহার চেষ্টা—ঐরূপ করা কর্তব্য কি-না

তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের অনুশীলন করিয়া কোন কোন পাঠক হয়ত ভাবিয়া বসিবেন—'কিন্তু উহা কি ভাল? যখন যে ভাব অন্তরে উদয় হইবে, তখনই তাহার হস্তে ক্রীড়াপুত্তলিস্বরূপ হইয়া তাহার পশ্চাৎ ধাবিত হইলে মানবের কখন কি কল্যাণ হইতে পারে? দুর্বল মানবের অন্তরে সু ও কু সকল প্রকার ভাবই যখন অনুক্ষণ উদয় হইতেছে, তখন ঠাকুরের ঐ প্রকার স্বভাব তাঁহাকে কখন বিপথগামী না করিলেও, সাধারণের অনুকরণীয় হইতে পারে না। কেবলমাত্র সুভাবসকলই অন্তরে উদিত হইবে, আপনার প্রতি এতদূর বিশ্বাসস্থাপন করা মানবের কখনই কর্তব্য নহে। অতএব সংযমরূপ রশ্মি দ্বারা ভাবরূপ অশ্বসকলকে সর্বদা নিয়ত রাখাই মানবের লক্ষ্য হওয়া কর্তব্য।'

পূর্বোক্ত কথা যুক্তিযুক্ত বলিয়া স্বীকার করিলেও, উত্তরে আমাদিগের কিছু বক্তব্য আছে। কামকাঞ্চন-নিবদ্ধ-দৃষ্টি ভোগ-লোলুপ মানব-মনের আপনার প্রতি অতদূর বিশ্বাস স্থাপন করা কখনও কর্তব্য নহে—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। অতএব ইতর-সাধারণ মানবের পক্ষে ভাবসংযমের আবশ্যকতাবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের উত্থাপন করা নিতান্ত অদূরদৃষ্টি ব্যক্তিরই সম্ভবপর। কিন্তু বেদাদি শাস্ত্রে আছে, ঈশ্বর-কৃপায় বিরল কোন কোন সাধকের নিকট সংযম নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ ও স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। তাঁহাদিগের মন তখন কাম-কাঞ্চনের আকর্ষণ হইতে এককালে মুক্তিলাভ করিয়া

ঠাকুরের ন্যায় নির্ভরশীল সাধকের ভাবসংযমের আবশ্যকতা নাই—উহার কারণ

কেবলমাত্র সুভাবসমূহের নিবাসভূমিতে পরিণত হয়। ঠাকুর বলিতেন —শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ঐরূপ মানবের মনে তখন তাঁহার কৃপায় কোন কুভাব মস্তকোত্তোলনপূর্বক প্রভুত্ব স্থাপন করিতে সক্ষম হয় না ; 'মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) তাহার পা কখনও বেতালে পড়িতে দেন না।' ঐরূপ অবস্থাপন্ন মানব তৎকালে অন্তরের প্রত্যেক মনোভাবকে বিশ্বাস করিলে তাহা দ্বারা কিছুমাত্র অনিষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, অপরের বিশেষ কল্যাণই সংসাধিত হয়। কারণ দেহাভিমানবিশিষ্ট যে ক্ষুদ্র আমিত্বের প্রেরণায় আমরা স্বার্থপর হইয়া জগতের সমগ্র ভোগসুখাধিকারলাভকেও পর্যাপ্ত বলিয়া বিবেচনা করি না, অন্তরের সেই ক্ষুদ্র আমিত্ব ঈশ্বরের বিরাট আমিত্বে চিরকালের মত বিসর্জিত হওয়ায়, ঐরূপ মানবের পক্ষে স্বার্থসুখান্বেষণ তখন এককালে অসম্ভব হইয়া উঠে। সুতরাং বিরাট ঈশ্বরের সর্বকল্যাণকরী ইচ্ছাই ঐ মানবের অন্তরে তখন অপরের কল্যাণ-সাধনের জন্য বিবিধ মনোভাবরূপে সমুদিত হইয়া থাকে। অথবা ঐরূপ অবস্থাপন্ন সাধক তখন 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' একথা প্রাণে প্রাণে অনুক্ষণ প্রত্যক্ষ করিয়া নিজ মনোগত ভাবসকলকে বিরাট পুরুষ ঈশ্বরেরই অভিপ্রায় বলিয়া স্থিরনিশ্চয় করিয়া উহাদিগের প্রেরণায় কার্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। ফলেও দেখা যায়, তাঁহাদিগের ঐরূপ অনুষ্ঠানে অপরের মহৎ কল্যাণ সাধিত হইয়া থাকে। ঠাকুরের ন্যায় অলোকসামান্য মহাপুরুষদিগের উক্তবিধ অবস্থা জীবনের অতি প্রত্যূষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্য ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনেতিহাসে আমরা তাঁহাদিগকে কিছুমাত্র যুক্তিতর্ক না করিয়া নিজ নিজ মনোগত ভাবসকলকে পূর্ণভাবে বিশ্বাসপূর্বক অনেক সময় কার্যে

ঐরূপ সাধক নিজ শরীরত্যাগের কথা জানিতে পারিয়াও উদ্বিগ্ন হন না—ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

অগ্রসর হইতে দেখিতে পাইয়া থাকি। বিরাট ইচ্ছাশক্তির সহিত নিজ ক্ষুদ্র ইচ্ছাকে সর্বদা অভিন্ন রাখিয়া তাঁহারা মানবসাধারণের মনবুদ্ধির বিষয়ীভূত বিষয়সকল তখন সর্বদা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হয়েন। কারণ, বিরাট মনে সূক্ষ্ম ভাবাকারে ঐসকল বিষয় পুর্ব হইতেই প্রকাশিত থাকে। আবার বিরাটেচ্ছার সর্বদা সম্পূর্ণ অনুগত থাকায় তাঁহারা এতদূর স্বার্থ ও ভয়শূন্য হয়েন যে, কিভাবে কাহার দ্বারা তাঁহাদিগের ক্ষুদ্র শরীর মন ধ্বংস হইবে, তদ্বিষয় পর্যন্ত পুর্ব হইতে জানিতে পারিয়া ঐ বস্তু, ব্যক্তি ও বিষয়সকলের প্রতি কিছুমাত্র বিরাগসম্পন্ন না হইয়া পরম প্রীতির সহিত ঐ কার্যসম্পাদনে তাহাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়া থাকেন। কয়েকটি দৃষ্টান্তের এখানে উল্লেখ করিলেই আমাদের কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম হইবে। দেখ—শ্রীরামচন্দ্র জনক-তনয়া সীতাকে নিষ্পাপা জানিয়াও ভবিতব্য বুঝিয়া তাঁহাকে বনে বিসর্জন করিলেন। আবার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়ানুজ লক্ষ্মণকে বর্জন করিলে নিজ লীলাসংবরণ অবশ্যম্ভাবী বুঝিয়াও ঐ কার্যের অনুষ্ঠান করিলেন। শ্রীকৃষ্ণ 'যদুবংশ ধ্বংস হইবে' পুর্ব হইতে জানিতে পারিয়াও তৎপ্রতিরোধে বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করিয়া যাহাতে ঐ ঘটনা যথাকালে উপস্থিত হয়, তাহারই অনুষ্ঠান করিলেন। অথবা ব্যাধহস্তে আপনার নিধন জানিয়াও ঐ কাল উপস্থিত হইলে বৃক্ষ-পত্রান্তরালে সর্বশরীর লুক্কায়িত রাখিয়া নিজ আরক্তিম চরণ-যুগল এমন-ভাবে ধারণ করিয়া রহিলেন, যাহাতে ব্যাধ উহা দেখিবামাত্র পক্ষিভ্রমে শাণিত শর নিক্ষেপ করিল। তখন নিজ ভ্রমের জন্য অনুতপ্ত ব্যাধকে আশীর্বাদ ও সান্ত্বনা প্রদানপুর্বক তিনি যোগাবলম্বনে শরীররক্ষা করিলেন।

মহামহিম বুদ্ধ চণ্ডালের আতিথ্যগ্রহণে পরিনির্বাণপ্রাপ্তির কথা পুর্ব হইতে জানিতে পারিয়াও উহা স্বীকারপুর্বক আশীর্বাদ ও সান্ত্বনার দ্বারা

তাহাকে অপরের ঘৃণা ও নিন্দাবাদের হস্ত হইতে রক্ষা করিয়া উক্ত পদবীতে আরূঢ় হইলেন। আবার স্ত্রীজাতিকে সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি প্রদান করিলে তৎপ্রচারিত ধর্ম শীঘ্র কলুষিত হইবে জানিতে পারিয়াও মাতৃষ্বসা আর্যা গৌতমীকে প্রব্রজ্যাগ্রহণে আদেশ করিলেন।

ঈশ্বরাবতার ঈশা 'তাঁহার শিষ্য যুদা তাঁহাকে অর্থলোভে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিবে এবং তাহাতেই তাহার শরীরধ্বংস হইবে' একথা জানিতে পারিয়াও তাহার প্রতি সমভাবে স্নেহপ্রদর্শন করিয়া আজীবন তাহার কল্যাণ-চেষ্টায় আপনাকে নিযুক্ত রাখিলেন।

অবতারপুরুষদিগের ত কথাই নাই, সিদ্ধ জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিয়াও আমরা ঐরূপ অনেক ঘটনা অনুসন্ধানে প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অবতারপুরুষসকলের জীবনে একপক্ষে অসাধারণ উদ্যমশীলতার ও অন্যপক্ষে বিরাটেচ্ছায় সম্পূর্ণ নির্ভরতার সামঞ্জস্য করিতে হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, বিরাটেচ্ছার অনুমোদনেই তাঁহাদিগের মধ্য দিয়া উদ্যমের প্রকাশ হইয়া থাকে, নতুবা নহে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঈশ্বরেচ্ছার সম্পূর্ণ অনুগামী পুরুষসকলের অন্তর্গত স্বার্থ-সংস্কারসমূহ এককালে বিনষ্ট হইয়া মন এমন এক পবিত্র ভূমিতে উপনীত হয়, যেখানে উহাতে শুদ্ধ ভিন্ন স্বার্থদুষ্ট ভাবসমূহের কখনও উদয় হয় না এবং ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা নিশ্চিন্তমনে আপন মনোভাবসমূহে বিশ্বাস-স্থাপনপূর্বক উহাদিগের প্রেরণায় কর্মানুষ্ঠান করিয়া দোষভাগী হয়েন না। ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠানসমূহ ইতরসাধারণ মানবের পক্ষে অনুকরণীয় না হইলেও, পূর্বোক্ত প্রকার অসাধারণ অবস্থাসম্পন্ন সাধককে নিজ জীবনপরিচালনে বিশেষালোক প্রদান করিবে, সন্দেহ

ঐরূপ সাধকের মনে স্বার্থদুষ্ট বাসনার উদয় হয় না

নাই। ঐরূপ অবস্থাসম্পন্ন পুরুষদিগের আহারবিহারাদি সামান্য স্বার্থ-বাসনাকে শাস্ত্র ভৃষ্টবীজের সহিত তুলনা করিয়াছেন। অর্থাৎ বৃক্ষলতাদির বীজসমূহ উত্তাপদগ্ধ হইলে তাহাদের জীবনীশক্তি অন্তর্হিত হইয়া সমজাতীয় বৃক্ষলতাদি যেমন উৎপন্ন হইতে পারে না, পুরুষদিগের সংসার-বাসনা তদ্রূপ সংযম ও জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধীভূত হওয়ায়, উহারা তাঁহাদিগকে আর কখন ভোগতৃষ্ণায় আকৃষ্ট করিয়া বিপথগামী করিতে পারে না। ঠাকুর ঐ বিষয় আমাদিগকে বুঝাইবার নিমিত্ত বলিতেন, স্পর্শমণির সহিত সঙ্গত হইয়া লোহের তরবারি স্বর্ণময় হইয়া যাইলে উহার হিংসাত্মক আকারমাত্রই বর্তমান থাকে, উহার দ্বারা হিংসাকার্য আর করা চলে না।

উপনিষদ্‌কার ঋষিগণ বলিয়াছেন, ঐ প্রকার অবস্থাসম্পন্ন সাধকেরা সত্যসঙ্কল্প হয়েন। অর্থাৎ তাঁহাদিগের অন্তরে উদিত সঙ্কল্পসকল সত্য ভিন্ন মিথ্যা কখনও হয় না। ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের মনে উদিত ভাবসকলকে বারংবার পরীক্ষার দ্বারা সত্য বলিয়া না দেখিতে পাইলে, আমরা ঋষিদিগের পূর্বোক্ত কথায় কখনও বিশ্বাসবান হইতে পারিতাম না। আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ আহার্য গ্রহণ করিতে যাইয়া ঠাকুরের মন সঙ্কুচিত হইলে অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে, তাহা ইতিপূর্বে বাস্তবিকই দোষদুষ্ট হইয়াছে—কোন ব্যক্তিকে ঈশ্বরীয় কথা বলিতে যাইয়া তাঁহার মুখ বন্ধ হইয়া যাইলে প্রমাণিত হইয়াছে, বাস্তবিকই ঐ ব্যক্তি ঐ বিষয়ের সম্পূর্ণ অনধিকারী—কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে ইহজীবনে ধর্মলাভ হইবে বলিয়া অথবা অত্যল্পমাত্র ধর্মলাভ হইবে বলিয়া তাঁহার উপলব্ধি হইলে, বাস্তবিকই তাহা সিদ্ধ হইয়াছে—কাহাকেও দেখিয়া

ঐরূপ সাধক সত্যসঙ্কল্প হন, ঠাকুরের জীবনে ঐ বিষয়ের দৃষ্টান্তসকল

তাঁহার মনে বিশেষ কোন ভাব বা দেবদেবীর কথা উদিত হইলে, উক্ত ব্যক্তি ঐ ভাবের বা ঐ দেবীর অনুগত সাধক বলিয়া জানা গিয়াছে—অন্তরের ভাব-প্রেরণায় সহসা কাহাকেও কোন কথা তিনি বলিলে ঐ কথার বিশেষালোক প্রাপ্ত হইয়া তাহার জীবন এককালে পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ কত কথাই না তাঁহার সম্বন্ধে বলিতে পারা যায়।

জটাধারীর নিকটে ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণপূর্বক বাৎসল্যভাব সাধন ও সিদ্ধি

আমরা বলিয়াছি, জটাধারীর আগমনকালে ঠাকুর অন্তরের ভাব-প্রেরণায় অনেক সময় আপনাকে ললনাজনোচিত দেহ-মন-সম্পন্ন বলিয়া ধারণাপূর্বক তদনুরূপ কার্য-সকলের অনুষ্ঠান করিতেন এবং শ্রীরামচন্দ্রের মধুময় বাল্যরূপের দর্শনলাভে তৎপ্রতি বাৎসল্য-ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের পূজা ও সেবাদি যথারীতি সম্পন্ন করিবার জন্য তিনি বহুপূর্বে রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেও তাঁহার প্রতি প্রভু ভিন্ন অন্য কোনভাবে তিনি আকৃষ্ট হয়েন নাই। বর্তমানে ঐ দেবতার প্রতি পূর্বোক্ত নবীন ভাব উপলব্ধি করায় তিনি এখন গুরুমুখে যথাশাস্ত্র ঐ ভাবসাধনোচিত মন্ত্র গ্রহণপূর্বক উহার চরমোপলব্ধি প্রত্যক্ষ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। গোপালমন্ত্রে সিদ্ধকাম জটাধারী তাঁহার ঐরূপ আগ্রহ জানিতে পারিয়া তাঁহাকে সাহ্লাদে নিজ ইষ্টমন্ত্রে দীক্ষিত করিলেন এবং ঠাকুর ঐ মন্ত্রসহায়ে তৎপ্রদর্শিত পথে সাধনায় নিমগ্ন হইয়া কয়েক দিনের মধ্যেই শ্রীরামচন্দ্রের বালগোপালমূর্তির অনুক্ষণ দিব্যদর্শনলাভে সমর্থ হইলেন। বাৎসল্যভাবসহায়ে ঐ দিব্যমূর্তির অনুধ্যানে তন্ময় হইয়া তিনি অচিরে প্রত্যক্ষ করিলেন—

'যো রাম দশরথকা বেটা,
ওহি রাম ঘট-ঘটমে লেটা!

ওহি রাম জগৎ পসেরা,

ওহি রাম সব্‌সে নেয়ারা।'

অর্থাৎ শ্রীরামচন্দ্র কেবলমাত্র দশরথের পুত্র নহেন, কিন্তু প্রতি শরীর আশ্রয় করিয়া জীবভাবে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন। আবার ঐরূপে অন্তরে প্রবেশপূর্বক জগদ্রূপে নিত্য-প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও তিনি জগতের যাবতীয় পদার্থ হইতে পৃথক, মায়ারহিত, নির্গুণ স্বরূপে নিত্য বিদ্যমান রহিয়াছেন। পূর্বোদ্ধৃত হিন্দী দোঁহাটি আমরা ঠাকুরকে অনেক সময়ে আবৃত্তি করিতে শুনিয়াছি।

শ্রীগোপালমন্ত্রে দীক্ষাপ্রদান ভিন্ন জটাধারী 'রামলালা' নামক যে বালগোপালবিগ্রহের এতকাল পর্যন্ত নিষ্ঠার সহিত সেবা করিতেছিলেন, তাহা ঠাকুরকে দিয়া গিয়াছিলেন। কারণ, ঐ জীবন্ত বিগ্রহ এখন হইতে ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিবেন বলিয়া স্বীয় অভিপ্রায় তাঁহার নিকট প্রকাশ করিয়াছিলেন। জটাধারী ও ঠাকুরকে লইয়া ঐ বিগ্রহের অপূর্ব লীলাবিলাসের কথা আমরা অন্যত্র সবিস্তার উল্লেখ করিয়াছি,* এজন্য তৎপ্রসঙ্গের এখানে পুনরায় উত্থাপন নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুরকে জটাধারীর 'রামলালা' বিগ্রহ দান

বাৎসল্যভাবের পরিপুষ্টি ও চরমোৎকর্ষলাভের জন্য ঠাকুর যখন পূর্বোক্তরূপে সাধনায় মনোনিবেশ করেন, তখন যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণী দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে অবস্থান করিতেছিলেন, একথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চভাবাশ্রিত সাধনে তিনিও

বৈষ্ণবমত-সাধন-কালে ঠাকুর ভৈরবী ব্রাহ্মণীর কতদূর সহায়তা লাভ করিয়াছিলেন

---

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়

বিশেষ অভিজ্ঞা ছিলেন। বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে বিশেষ কোন সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন কি-না, ঐ বিষয়ে কোন কথা আমরা তাঁহার নিকটে স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই। তবে বাৎসল্য-ভাবে আরূঢ়া হইয়া ব্রাহ্মণী অনেক সময় ঠাকুরকে গোপালরূপে দর্শনপূর্বক সেবা করিতেন, একথা ঠাকুরের শ্রীমুখে ও হৃদয়ের নিকটে শুনিয়া অনুমিত হয়, শ্রীকৃষ্ণের বালগোপালমূর্তিতে বাৎসল্যভাব আরোপিত করিয়া উহার চরমোপলব্ধি করিবার কালে ও মধুরভাব-সাধনকালে ঠাকুর তাঁহার নিকট হইতে কিছু না কিছু সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিশেষ কোনপ্রকার সাহায্য না পাইলেও, ব্রাহ্মণীকে ঐরূপ সাধনসমূহে নিরতা দেখিয়া এবং তাঁহার মুখে ঐসকলের প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ঠাকুরের মনে ঐসকল ভাবসাধনের ইচ্ছা যে বলবতী হইয়া উঠে, একথা অন্ততঃ স্বীকার করিতে পারা যায়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

মধুরভাবের সারতত্ত্ব

সাধক না হইলে সাধকজীবনের ইতিহাস বুঝা সুকঠিন। কারণ সাধনা সূক্ষ্মভাবরাজ্যের কথা। সেখানে রূপরসাদি বিষয়সমূহের মোহনীয় স্থূল মূর্তিসকল নয়নগোচর হয় না, বাহ্যবস্তু ও ব্যক্তিসকলের অবলম্বনে ঘটনাবলীর বিচিত্র সমাবেশপারম্পর্য দেখা যায় না, অথবা রাগদ্বেষাদি দ্বন্দ্বসমাকুল মানবমন প্রবৃত্তির প্রেরণায় অস্থির হইয়া ভোগসুখ করায়ত্ত করিবার নিমিত্ত অপরকে পশ্চাৎপদ করিতে যেরূপ উদ্যম প্রয়োগ করে এবং বিষয়বিমুগ্ধ সংসার যাহাকে বীরত্ব ও মহত্ত্ব বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে—সেরূপ উন্মাদ উদ্যমাদির কিছুমাত্র প্রকাশ নাই। সেখানে আছে কেবল সাধকের নিজ অন্তর ও তন্মধ্যস্থ জন্মজন্মান্তরাগত অনন্ত সংস্কার-প্রবাহ। আছে কেবল বাহ্যবস্তু বা শক্তিবিশেষের সংঘর্ষে আসিয়া সাধকের উচ্চভাব ও লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া এবং তদ্ভাবে মনের একতানতা আনয়ন করিবার ও তল্লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য নিজ প্রতিকূল সংস্কারসমূহের সহিত সংকল্পপূর্বক অনন্ত সংগ্রাম। আছে কেবল বাহ্য-বিষয়সমূহ হইতে সাধকমনের ক্রমে এককালে বিমুখ হইয়া নিজাভ্যন্তরে প্রবেশপূর্বক আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাওয়া, অন্তররাজ্যের গভীর গভীরতর প্রদেশসমূহে অবতীর্ণ হইয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্মতর ভাবস্তরসমূহের উপলব্ধি করা এবং পরিশেষে নিজ অস্তিত্বের গভীরতম প্রদেশে উপস্থিত হইয়া

সাধকের কঠোর অন্তঃসংগ্রাম এবং লক্ষ্য

যদবলম্বনে সর্বভাবের ও অহংজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে এবং যদাশ্রয়ে উহারা নিত্য অবস্থান করিতেছে, সেই 'অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়মেকমেবা-দ্বিতীয়ম্' বস্তুর উপলব্ধি ও তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া অবস্থিতি। পরে সংস্কারসমূহ এককালে পরিক্ষীণ হইয়া মনের সংকল্পবিকল্পাত্মক ধর্ম চিরকালের মত যতদিন নাশ না হয় ততদিন পর্যন্ত, যে পথাবলম্বনে সাধক-মন পূর্বোক্ত অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধিতে উপস্থিত হইয়াছিল, বিলোম-ভাবে সেই পথ দিয়া সমাধি-অবস্থা হইতে পুনরায় বহির্জগতের উপলব্ধিতে উহার উপস্থিত হওয়া। ঐরূপে সমাধি হইতে বাহ্য জগতের উপলব্ধিতে এবং উহা হইতে সমাধি-অবস্থায় সাধক-মনের গতাগতি পুনঃ পুনঃ হইতে থাকে। জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাস আবার সৃষ্টির প্রাচীনতম যুগ হইতে অদ্যাবধি এমন কয়েকটি সাধক-মনের কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছে, যাঁহাদের পূর্বোক্ত সমাধি-অবস্থাই যেন স্বাভাবিক অবস্থানভূমি —ইতরসাধারণ মানবের কল্যাণের জন্য কোনরূপে জোর করিয়া তাঁহারা কিছুকালের জন্য আপনাদিগকে সংসারে, বাহ্যজগৎ উপলব্ধি করিবার ভূমিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন।

অসাধারণ সাধকদিগের নির্বিকল্প সমাধিতে অবস্থানের স্বতঃপ্রবৃত্তি—শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীভুক্ত সাধক

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনেতিহাস আমরা যত অবগত হইব, ততই বুঝিব তাঁহার মন পূর্বোক্তশ্রেণীভুক্ত ছিল। তাঁহার লীলাপ্রসঙ্গ-আলোচনায় যদি আমাদের ঐরূপ ধারণা উপস্থিত না হয়, তবে বুঝিতে হইবে উহার জন্য লেখকের ত্রুটিই দায়ী। কারণ তিনি আমাদিগকে বারংবার বলিয়া গিয়াছেন, "ছোট ছোট এক-আধটা বাসনা জোর করিয়া রাখিয়া তদবলম্বনে মনটাকে তোদের জন্য নীচে নামাইয়া রাখি! নতুবা উহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি অখণ্ডে মিলিত ও একীভূত হইয়া অবস্থানের দিকে।"

সমাধিকালে উপলব্ধ অখণ্ড অদ্বয় বস্তুকে প্রাচীন ঋষিগণের কেহ কেহ সর্বভাবের অভাব বা 'শূন্য' বলিয়া, আবার কেহ কেহ সর্বভাবের সম্মিলনভূমি 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। ফলে কিন্তু সকলে এক কথাই বলিয়াছেন। কারণ সকলেই উহাকে সর্বভাবের উৎপত্তি এবং লয়ভূমি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভগবান বুদ্ধ যাহাকে সর্বভাবের নির্বাণভূমি শূন্যবস্তু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন, ভগবান শঙ্কর তাহাকেই সর্বভাবের মিলনভূমি পূর্ণবস্তু বলিয়া শিক্ষা দিয়াছেন। পরবর্তী বৌদ্ধাচার্যগণের মতামত ছাড়িয়া দিয়া উভয়ের কথা আলোচনা করিলে ঐরূপ প্রতিপন্ন হয়।

'শূন্য' এবং 'পূর্ণ' বলিয়া নির্দিষ্ট বস্তু এক পদার্থ

শূন্য বা পূর্ণ বলিয়া উপলক্ষিত অদ্বৈতভাবভূমিই উপনিষৎ ও বেদান্তে ভাবাতীত অবস্থা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ উহাতে সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত হইলে সাধকের মন সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরের সৃজন, পালন ও নিধনাদি লীলাপ্রসূত সমগ্র ভাবভূমির সীমা অতিক্রমপূর্বক সমরস-মগ্ন হইয়া যায়। অতএব দেখা যাইতেছে, সসীম মানবমন আধ্যাত্মিকরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া শান্তদাস্যাদি যে পঞ্চভাবাবলম্বনে ঈশ্বরের সহিত নিত্য সম্বন্ধ হয়, সে-সকল হইতে অদ্বৈতভাব একটি পৃথক অপার্থিব বস্তু। পৃথিবীর মানুষ ইহপরকালে প্রাপ্ত সকল প্রকার ভোগসুখে এককালে উদাসীন হইয়া পবিত্রতাবলে দেবতাগণ অপেক্ষা উচ্চ পদবীলাভ করিলে তবেই ঐভাব উপলব্ধি করে এবং সমগ্র সংসার ও উহার সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্তা ঈশ্বর যাঁহাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত, উক্ত ভাবসহায়ে সেই নির্গুণ ব্রহ্মবস্তুর সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষলাভে কৃতকৃতার্থ হয়।

অদ্বৈতভাবের স্বরূপ

অদ্বৈতভাব ও উহা দ্বারা উপলব্ধ নির্গুণব্রহ্মের কথা ছাড়িয়া দিলে আধ্যাত্মিকরাজ্যে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রূপ পঞ্চভাব-প্রকাশ

দেখিতে পাওয়া যায়। উহাদিগের প্রত্যেকটিরই সাধ্যবস্তু ঈশ্বর বা সগুণ-ব্রহ্ম। অর্থাৎ সাধক মানব নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান, সর্বশক্তিমান, সর্বনিয়ন্তা ঈশ্বরের প্রতি ঐসকল ভাবের অন্যতমের আরোপ করিয়া তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হয় এবং সর্বান্তর্যামী, সর্বভাবাধার ঈশ্বরও তাহার মনের ঐকান্তিকতা ও একনিষ্ঠা দেখিয়া তাহার ভাব-পরিপুষ্টির জন্য ঐ ভাবানুরূপ তনু ধারণপূর্বক তাহাকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়া থাকেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন যুগে ঈশ্বরের নানা ভাবময় চিদ্‌ঘন মূর্তিধারণ এবং এমন কি, স্থূল মনুষ্যবিগ্রহে পর্যন্ত অবতীর্ণ হইয়া সাধকের অভীষ্ট-পূর্ণকরণের কথা শাস্ত্রপাঠে অবগত হওয়া যায়।

শান্তাদি ভাবপঞ্চক এবং উহাদিগের সাধ্যবস্তু ঈশ্বর

সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব অন্য সকল মানবের সহিত যে-সকল ভাব লইয়া নিত্য সম্বন্ধ থাকে, শান্তদাস্যাদি পঞ্চভাব সেই পার্থিব ভাব-সমূহেরই সূক্ষ্ম ও শুদ্ধ প্রতিকৃতিস্বরূপ। দেখা যায়, সংসারে আমরা পিতা, মাতা, স্বামী, স্ত্রী, সখা, সখী, প্রভু, ভৃত্য, পুত্র, কন্যা, রাজা, প্রজা, গুরু, শিষ্য প্রভৃতির সহিত এক একটা বিশেষ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিয়া থাকি এবং শত্রু না হইলে ইতরসকলের সহিত শ্রদ্ধাসংযুক্ত শান্ত ব্যবহার করা কর্তব্য বলিয়া জ্ঞান করি। ভক্ত্যাচার্যগণ ঐ সম্বন্ধসকলকেই শান্তাদি পঞ্চ শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন এবং অধিকারিভেদে উহাদিগের অন্যতমকে মুখ্যরূপে অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরে আরোপ করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কারণ শান্তাদি পঞ্চভাবের সহিত জীব নিত্য পরিচিত থাকায় তদবলম্বনে ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিতে অগ্রসর হওয়া তাহার পক্ষে সুগম হইবে। শুধু তাহাই নহে, প্রবৃত্তিমূলক

শান্তাদি ভাব-পঞ্চকের স্বরূপ—উহারা জীবকে কিরূপে উন্নত করে

ঐসকল সম্বন্ধাশ্রিত ভাবের প্রেরণায় রাগদ্বেষাদি যে-সকল বৃত্তি তাহার মনে উদিত হইয়া থাকে, তাহাকে সংসারে ইতিপূর্বে নানা কুকর্মে রত করাইতেছিল, ঈশ্বরার্পিত সম্বন্ধাশ্রয়ে সেইসকল বৃত্তি তাহার মনে উত্থিত হইলেও উহাদিগের প্রবল বেগ তাহাকে ঈশ্বরদর্শনরূপ লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর করাইয়া দিবে। যথা—সকল দুঃখের কারণস্বরূপ হৃদ্‌রোগ কাম তাহাকে ঈশ্বরদর্শনকামনায় নিযুক্ত রাখিবে, ঐ দর্শনপথের প্রতিকূল বস্তু ও ব্যক্তিসকলের উপরেই তাহার ক্রোধ প্রযুক্ত হইবে, সাধ্যবস্তু ঈশ্বরের অপূর্ব প্রেম-সৌন্দর্যের সম্ভোগলোভেই সে উন্মত্ত ও মোহিত হইবে এবং ঈশ্বরের পুণ্যদর্শনলাভে কৃতকৃতার্থ ব্যক্তিসকলের অপূর্ব ধর্মশ্রী দেখিয়া তল্লাভের জন্য সে ব্যাকুল হইয়া উঠিবে।

শান্তদাস্যাদি ভাবপঞ্চক ঐরূপে ঈশ্বরে প্রয়োগ করিতে জীব এক সময়ে বা একজনের নিকটে শিক্ষা করে নাই। যুগে যুগে নানা মহাপুরুষ সংসারে জন্মগ্রহণপূর্বক ঐসকল ভাবের এক দুই বা ততোধিক অবলম্বনে ঈশ্বরলাভের জন্য নিযুক্ত হইয়া তাঁহাকে প্রেমে আপনার করিয়া লইয়া তাহাকে ঐরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। ঐসকল আচার্যের

প্রেমই ভাবসাধনার উপায় এবং ঈশ্বরের সাকার ব্যক্তিত্বই উহার অবলম্বন

অলৌকিক জীবনালোচনায় একথার স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, একমাত্র প্রেমই ভাবসাধনার মূলে অবস্থিত এবং ঈশ্বরের উচ্চাবচ কোনপ্রকার সাকার ব্যক্তিত্বের উপরেই ঐ প্রেম সর্বদা প্রযুক্ত হইয়াছে ; কারণ দেখা যায়, অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি মানব যতদিন না করিতে পারে, ততদিন পর্যন্ত সে ঈশ্বরের কোন না কোনপ্রকার সসীম সাকার ব্যক্তিত্বেরই কল্পনা ও উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়।

প্রেমের স্বভাব পর্যালোচনা করিয়া একথা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, উহা

প্রেমিকদ্বয়ের ভিতরে ঐশ্বর্যজ্ঞানমূলক ভেদোপলব্ধি ক্রমশঃ তিরোহিত করিয়া দেয়। ভাব-সাধনায় নিযুক্ত সাধকের মন হইতেও উহা ক্রমে ঈশ্বরের অসীম ঐশ্বর্যজ্ঞান তিরোহিত করিয়া তাঁহাকে তাঁহার ভাবানুরূপ প্রেমাস্পদমাত্র বলিয়া গণনা করিতে সর্বথা নিযুক্ত করে। দেখা যায়, ঐজন্য এই পথের সাধক প্রেমে ঈশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে আপনার জ্ঞান করিয়া তাঁহার প্রতি নানা আবদার, অনুরোধ, অভিমান, তিরস্কারাদি করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না। সাধককে ঈশ্বরের ঐশ্বর্য-জ্ঞান ভুলাইয়া কেবলমাত্র তাঁহার প্রেম ও মাধুর্যের উপলব্ধি করাইতে পূর্বোক্ত ভাবপঞ্চকের মধ্যে যেটি যতদূর সক্ষম, সেটি ততদূর উচ্চভাব বলিয়া ঐপথে পরিগণিত হয়। শান্তাদি ভাবপঞ্চকের উচ্চাবচ তারতম্য নির্ণয় করিয়া মধুরভাবকে সর্বোচ্চ পদবী-প্রদান ভক্ত্যাচার্যগণ ঐরূপেই করিয়াছেন। নতুবা উহাদিগের প্রত্যেকটিই যে সাধককে ঈশ্বরলাভ করাইতে সক্ষম, একথা তাঁহারা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন।

প্রেমে ঐশ্বর্যজ্ঞানের লোপসিদ্ধি—উহাই ভাবসকলের পরিমাপক

ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে সাধক যে আপনাকে বিস্মৃত হইয়া কেবলমাত্র তাহার প্রেমাস্পদের সুখে সুখী হইয়া থাকে এবং বিরহকালে তাঁহার চিন্তায় তন্ময় হইয়া সময়ে সময়ে আপনার অস্তিত্বজ্ঞান পর্যন্ত হারাইয়া বসে, একথা আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে অবগত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবতাদি ভক্তিগ্রন্থপাঠে দেখিতে পাওয়া যায়, ব্রজ-গোপিকাগণ ঐরূপে আপনাদিগের অস্তিত্বজ্ঞান কেবলমাত্র বিস্মৃত হইতেন না, পরন্তু সময়ে সময়ে আপনাদিগকে নিজ প্রেমাস্পদ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও উপলব্ধি করিয়া বসিতেন। জীবের কল্যাণার্থ শরীরত্যাগকালে ঈশাকে যে উৎকট দুঃখভোগ করিতে হইয়াছিল, তাহার কথা চিন্তা করিতে

করিতে তন্ময় হইয়া কোন কোন সাধক-সাধিকার অনুরূপ অঙ্গসংস্থান হইতে রক্তনির্গমের কথা খৃষ্টান সম্প্রদায়ের ভক্তি-গ্রন্থে প্রসিদ্ধ আছে।* অতএব বুঝা যাইতেছে, শান্তাদি ভাবপঞ্চকের প্রত্যেকটির চরম পরিপুষ্টিতে সাধক প্রেমাস্পদের চিন্তায় সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়া যায় এবং প্রেমের প্রাবল্যে তাঁহার সহিত মিলিত ও একীভূত হইয়া অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য সাধকজীবন ঐ বিষয়ে আমাদিগকে অদ্ভুত আলোক প্রদান করিয়াছে। ভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রত্যেক ভাবের চরম পরিপুষ্টিতেই প্রেমাস্পদের সহিত প্রেমে তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন এবং নিজ অস্তিত্ব এককালে বিস্মৃত হইয়া অদ্বৈতভাবের উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

শান্তাদি ভাবের প্রত্যেকের সহায়ে চরমে অদ্বৈতভাব-উপলব্ধি-বিষয়ে ভক্তিশাস্ত্র ও শ্রীরামকৃষ্ণজীবনের শিক্ষা

প্রশ্ন হইতে পারে, শান্তদাস্যাদি ভাবাবলম্বনে মানবমন কেমন করিয়া সর্বভাবাতীত অদ্বয়বস্তুর উপলব্ধি করিবে। কারণ অন্ততঃ দুই ব্যক্তির উপলব্ধি ব্যতীত উহাতে কোনপ্রকার ভাবের উদয়, স্থিতি ও পরিপুষ্টি কুত্রাপি দেখা যায় না।

সত্য। কিন্তু কোনও ভাব যত পরিপুষ্ট হয়, ততই উহা আপন প্রভাব বিস্তার করিয়া সাধকমন হইতে অপর সকল বিরোধী ভাবকে ক্রমে তিরোহিত করে। আবার যখন উহার চরম পরিপুষ্টি হয়, তখন সাধকের সমাহিত অন্তঃকরণ, ধ্যানকালে পূর্বপরিদৃষ্ট 'তুমি' (সেব্য), 'আমি' (সেবক) এবং তদুভয়ের মধ্যগত দাস্যাদি সম্বন্ধ সময়ে সময়ে বিস্মৃত

* *Vide* Life of St. Francis of Assisi and St. Catherine of Sienna.

হইয়া কেবলমাত্র 'তুমি' শব্দ-নির্দিষ্ট সেব্য বস্তুতে প্রেমে এক হইয়া অচল-ভাবে অবস্থিতি করিতে থাকে। ভারতের বিশিষ্ট আচার্যগণ বলিয়াছেন যে, মানবমন কখনই যুগপৎ 'তুমি', 'আমি' ও তদুভয়ের মধ্যগত ভাবসম্বন্ধ উপলব্ধি করে না। উহা একক্ষণে 'তুমি'-শব্দনির্দিষ্ট বস্তুর এবং পরক্ষণে 'আমি'-শব্দাভিধেয় পদার্থের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকে এবং ঐ উভয় পদার্থের মধ্যে সর্বদা দ্রুত পরিভ্রমণ করিবার জন্য উহাদিগের মধ্যে একটা ভাবসম্বন্ধ তাহার বুদ্ধিতে পরিস্ফুট হইয়া উঠে। তখন মনে হয় যেন উহা উহাদিগকে এবং উহাদিগের মধ্যগত ঐ সম্বন্ধকে যুগপৎ প্রত্যক্ষ করিতেছে। পরিপুষ্ট ভাবের প্রভাবে মনের চঞ্চলতা নষ্ট হইয়া যায় এবং উহা ক্রমে পূর্বোক্ত কথা ধরিতে সক্ষম হয়। ধ্যানকালে মন ঐরূপে যত বৃত্তিহীন হয়, ততই সে ক্রমে বুঝিতে পারে যে, এক অদ্বয় পদার্থকে দুই দিক হইতে দুই ভাবে দেখিয়া, 'তুমি' ও 'আমি'-রূপ দুই পদার্থের কল্পনা করিয়া আসিয়াছে।

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের দ্বারা অদ্বৈতভাব-লাভবিষয়ে আপত্তি ও মীমাংসা

শান্তদাস্যাদি ভাবের প্রত্যেকটি পূর্ণ-পরিপুষ্ট হইয়া মানবমনকে পূর্বোক্তরূপে অদ্বয় বস্তুর উপলব্ধি করাইতে কত সাধকের কতকালব্যাপী চেষ্টার যে প্রয়োজন হইয়াছে, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। শাস্ত্ররূপ আধ্যাত্মিক ইতিহাসপাঠে বুঝা যায়, এক এক যুগে ঐসকল ভাবের এক একটি মানবমনের উপাসনার প্রধান অবলম্বনীয় হইয়াছিল এবং উহা দ্বারাই ঐ যুগের বিশিষ্ট সাধককুল ঈশ্বরের ও তাঁহাদিগের মধ্যে বিরল কেহ কেহ অখণ্ড অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। দেখা যায়, বৈদিক ও বৌদ্ধ যুগে প্রধানতঃ শান্তভাবের, ঔপনিষদিক যুগে

ভিন্ন ভিন্ন যুগে ভিন্ন ভিন্ন ভাবসাধনার প্রাবল্য-নির্দেশ

শান্তভাবের চরম পরিপুষ্টিতে অদ্বৈতভাবের এবং দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাবের, রামায়ণ ও মহাভারতের যুগে শান্ত ও নিষ্কামকর্মসংযুক্ত দাস্যভাবের, তান্ত্রিকযুগে ঈশ্বরের মাতৃভাব ও মধুরভাবসম্বন্ধের কিয়দংশের এবং বৈষ্ণবযুগে সখ্য, বাৎসল্য ও মধুরভাবের চরম প্রকাশ উপস্থিত হইয়াছিল।

শান্তাদি ভাবপঞ্চকের পূর্ণ পরিপুষ্টিবিষয়ে ভারত এবং ভারতেতর দেশে যেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়

ভারতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ঐরূপে অদ্বৈতভাবের সহিত শান্তাদি পঞ্চভাবের পূর্ণ প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যাইলেও, ভারতেতরদেশীয় ধর্মসম্প্রদায়সকলে কেবলমাত্র শান্ত, দাস্য ও ঈশ্বরের পিতৃভাবসম্বন্ধেরই প্রকাশ দেখা যায়। য়াহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্মসম্প্রদায়সকলে রাজর্ষি সোলেমানের সখ্য ও মধুর-ভাবাত্মক গীতাবলী প্রচলিত থাকিলেও, উহারা ঐসকলের ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়া ভিন্নার্থ-কল্পনা করিয়া থাকে। মুসলমানধর্মের স্থফী-সম্প্রদায়ের ভিতর সখ্য ও মধুর-ভাবের অনেকটা প্রচলন থাকিলেও মুসলমান জনসাধারণ ঐরূপে ঈশ্বরোপাসনা কোরানবিরোধী বলিয়া বিবেচনা করে। আবার ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঈশামাতা মেরীর প্রতিমাবলম্বনে জগন্মাতৃত্বের পূজা প্রকারান্তরে প্রচলিত থাকিলেও, উহা ঈশ্বরের মাতৃভাবের সহিত প্রকাশ্যরূপে সংযুক্ত না থাকায়, ভারতে প্রচলিত জগজ্জননীর পূজার ন্যায় ফলপ্রদ হইয়া সাধককে অখণ্ড সচ্চিদানন্দের উপলব্ধি করাইতে ও রমণীমাত্রে ঈশ্বরীয় বিকাশ প্রত্যক্ষ করাইতে সক্ষম হয় নাই। ক্যাথলিক সম্প্রদায়গত মাতৃভাবের ঐ প্রবাহ ফল্গুনদীর ন্যায় অর্ধপথে অন্তর্হিত হইয়াছে।

পূর্বে বলা হইয়াছে, কোনপ্রকার ভাবসম্বন্ধাবলম্বনে সাধকমন ঈশ্বরের

প্রতি আকৃষ্ট হইলে উহা ক্রমে ঐ ভাবে তন্ময় হইয়া বাহ্য জগৎ হইতে বিমুখ হয় এবং আপনাতে আপনি ডুবিয়া যায়; ঐরূপে মগ্ন হইবার কালে মনের পূর্বসংস্কারসমূহ ঐ পথে বাধাপ্রদান করিয়া তাহাকে ভাসাইয়া পুনরায় বহির্মুখ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করে। ঐজন্য প্রবলপূর্বসংস্কারবিশিষ্ট সাধারণ মানবমনের একটিমাত্র ভাবে তন্ময় হওয়াও অনেক সময় এক জীবনের চেষ্টাতে হইয়া উঠে না। ঐরূপ স্থলে সে প্রথমে নিরুৎসাহ, পরে হতোদ্যম এবং তৎপরে সাধ্যবস্তুতে বিশ্বাস হারাইয়া বাহ্যজগতের রূপরসাদিভোগকেই সার ভাবিয়া বসে ও তল্লাভে পুনরায় ধাবিত হয়। অতএব বাহ্যবিষয়বিমুখতা, প্রেমাস্পদের ধ্যানে তন্ময়ত্ব এবং ভাবপ্রসূত উল্লাসই সাধকের লক্ষ্যাভিমুখে অগ্রসর হইবার একমাত্র পরিমাপক বলিয়া ভাবাধিকারে পরিগণিত হইয়াছে।

সাধকের ভাবের গভীরত্ব যাহা দেখিয়া বুঝা যায়

কোন এক ভাবে তন্ময়ত্বলাভে অগ্রসর হইয়া যিনি কখন অন্তর্নিহিত পূর্বসংস্কারসমূহের প্রবল বাধা উপলব্ধি করেন নাই, সাধকমনের অন্তঃ-সংগ্রামের কথা তিনি কিছুমাত্র বুঝিতে পারিবেন না। যিনি উহা করিয়াছেন, তিনিই বুঝিবেন—কত দুঃখে মানব-জীবনে ভাবতন্ময়ত্ব আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে স্বল্পকালে একের পর এক করিয়া সকলপ্রকার ভাবে অদৃষ্টপূর্ব তন্ময়ত্বলাভ করিতে দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ভাবিবেন, ঐরূপ হওয়া মনুষ্যশক্তির সাধ্যায়ত্ত নহে।

ঠাকুরকে সর্বভাবে সিদ্ধিলাভ করিতে দেখিয়া যাহা মনে হয়

ভাবরাজ্যের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল সাধারণ মানবমন বুঝিতে সক্ষম হয় নাই

বলিয়াই কি অবতারপ্রথিত ধর্মবীরদিগের সাধনেতিহাস সম্যক্ লিপিবদ্ধ হয় নাই? কারণ তৎপাঠে দেখা যায়, তাঁহাদিগের সাধনপথে প্রবেশকালে বিষয়বৈরাগ্য ও তত্ত্যাগের কথা এবং সাধনায় সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহাদিগের ভিতর দিয়া বিষয়বিমুগ্ধ মানবমনের কল্যাণের জন্য যে অদ্ভুত শক্তি প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই কথারই সবিস্তার আলোচনা বিদ্যমান। দেখা যায়, অন্তরের পূর্বসংস্কারসমূহকে বিধ্বস্ত ও সমূলে উৎপাটিত করিয়া আপনার উপর সম্যক্ প্রভুত্বস্থাপনের জন্য তাঁহারা সাধনকালে যে অপূর্ব অন্তঃসংগ্রামে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাহার আভাসমাত্রই কেবল উহাতে আলোচিত হইয়াছে। অথবা রূপক এবং অতিরঞ্জিত বাক্যসহায়ে ঐ সংগ্রামের কথা এমনভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, তদ্বিবরণের মধ্য হইতে সত্য বাহির করিয়া লওয়া আমাদিগের পক্ষে এখন সুকঠিন হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিলেই পাঠক আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিবেন।

ধর্মবীরগণের সাধনেতিহাস লিপিবদ্ধ না থাকা সম্বন্ধে আলোচনা

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ লোককল্যাণ-সাধনোদ্দেশ্যে বিশেষ বিশেষ শক্তিলাভের জন্য অনেক সময় তপস্যায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন, একথা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ঐ বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে তিনি কিছুকাল জল বা পবনাহারপূর্বক একপদে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন ইত্যাদি কথা ভিন্ন বিরোধী ভাব-সকলের হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার অন্তঃসংগ্রামের কোন বিবরণ পাওয়া যায় না।

শ্রীকৃষ্ণের সম্বন্ধে ঐ কথা

ভগবান বুদ্ধের সংসারবৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া অভিনিষ্ক্রমণ ও পরে ধর্মচক্রপ্রবর্তনের যতদূর বিশদেতিহাস পাওয়া যায়, তাঁহার সাধনেতিহাস

ততদূর পাওয়া যায় না। তবে অন্যান্য ধর্মবীরগণের ভাবেতিহাসের যেমন কিছুই পাওয়া যায় না, তাঁহার সম্বন্ধে তদ্রূপ না হইয়া ঐ বিষয়ের অল্প স্বল্প কিছু পাওয়া গিয়া থাকে। দেখা যায়—সিদ্ধিলাভে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়া আহার সংযমপূর্বক তিনি দীর্ঘ ছয় বৎসর কাল একাসনে ধ্যান-তপস্যায় নিযুক্ত ছিলেন এবং অন্তঃপবন নিরোধপূর্বক 'আস্ফানক' নামক ধ্যানাভ্যাসে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু চিত্তের পূর্বসংস্কারসমূহ বিনষ্ট করিতে তাঁহার মানসিক সংগ্রামের কথা লিপিবদ্ধ করিবার কালে গ্রন্থকার স্থূল বাহ্য ঘটনার ন্যায় 'মারের' সহিত তাঁহার সংগ্রামকাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের সম্বন্ধে ঐ কথা

ভগবান ঈশার সাধনেতিহাসের কোন কথাই একপ্রকার লিপিবদ্ধ নাই। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ পর্যন্ত বয়সের কয়েকটি ঘটনামাত্র লিপিবদ্ধ করিয়াই গ্রন্থকার ত্রিংশ বৎসরে জন নামক সিদ্ধ সাধুর নিকট হইতে তাঁহার অভিষেক গ্রহণপূর্বক বিজন মরুপ্রদেশে চল্লিশদিনব্যাপী ধ্যানতপস্যার কথার এবং ঐ মরুপ্রদেশে 'শয়তান' কর্তৃক প্রলোভিত হইয়া জয়লাভপূর্বক তথা হইতে প্রত্যাগমন ও লোককল্যাণ-সাধনে নিযুক্ত হইবার কথার অবতারণা করিয়াছিলেন। উহার পরে তিনি তিন বৎসর মাত্র স্থূলশরীরে অবস্থান করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার দ্বাদশ বর্ষ হইতে ত্রিংশ বৎসর পর্যন্ত তিনি যে কিভাবে কালযাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোন সংবাদই নাই।

ঈশার সম্বন্ধে ঐ কথা

ভগবান শঙ্করের জীবনে ঘটনাবলীর পারম্পর্য অনেকটা পাওয়া যাইলেও, তাঁহার অন্তরের ভাবেতিহাস অনেক স্থলে অনুমান করিয়া লইতে হয়।

ভগবান শ্রীচৈতন্যের সাধনেতিহাসের অনেক কথা লিপিবদ্ধ পাওয়া যাইলেও, তাঁহার কামগন্ধহীন উচ্চ ঈশ্বরপ্রেমের কথা শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রণয়বিহারাদি-অবলম্বনে রূপকচ্ছলে বর্ণিত হওয়ায় মানবসাধারণে উহা অনেক সময় যথাযথভাবে বুঝিতে পারে না। একথা কিন্তু অবশ্য স্বীকার্য যে, ধর্মবীর শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রধান প্রধান সাঙ্গোপাঙ্গেরা সখ্য, বাৎসল্য এবং বিশেষতঃ মধুরভাবের আরম্ভ হইতে প্রায় চরম পরিস্ফূর্তি পর্যন্ত সাধকমনে যে যে অবস্থা ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়া থাকে, সে-সকল রূপকের ভাষায় যতদূর বলিতে পারা যায় ততদূর অতি বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। কেবল ঐ ভাবত্রয়ের প্রত্যেকটির সর্বোচ্চ পরিণতিতে সাধকমন প্রেমাস্পদের সহিত একত্ব অনুভবপূর্বক অদ্বয় বস্তুতে লীন হইয়া থাকে—এই চরম তত্ত্বটি তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই, অথবা উহার সামান্য ইঙ্গিত প্রদান করিলেও উহাকে হীনাবস্থা বলিয়া সাধককে উহা হইতে সতর্ক থাকিতে উপদেশ করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলোকসামান্য জীবন ও অদৃষ্টপূর্ব সাধনেতিহাস বর্তমান যুগে আমাদিগকে ঐ চরম তত্ত্ব বিশদভাবে শিক্ষা দিয়া জগতের যাবতীয় ধর্মসম্প্রদায়ের যাবতীয় ধর্মভাব যে সাধকমনকে একই লক্ষ্যে আনয়ন করিয়া থাকে, এ বিষয় সম্যক্ বুঝিতে সক্ষম করিয়াছে। তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষিতব্য অন্য সকল কথা গণনায় না আনিলেও তাঁহার কৃপায় কেবলমাত্র পূর্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত হইয়া আমাদিগের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি যে প্রসারতা ও সমন্বয়াভাস প্রাপ্ত হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকটে চিরকালের জন্য নিঃসংশয়ে ঋণী হইয়াছি।

শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধে ঐ কথা এবং মধুরভাবের চরম তত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণদেব

পূর্বে বলা হইয়াছে, মধুরভাবই শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণের

আধ্যাত্মিক জগতে প্রধান দান। তাঁহারা পথপ্রদর্শন না করিলে কখনই উহা ঈশ্বরলাভের জন্য এত লোকের অবলম্বনীয় হইয়া তাহাদিগকে শান্তি ও বিমলানন্দের অধিকারী করিত না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনে বৃন্দাবনলীলা যে নিরর্থক অনুষ্ঠিত হয় নাই, একথা তাঁহারাই প্রথমে বুঝিয়া অপরকে বুঝাইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অভ্যুদয় না হইলে শ্রীবৃন্দাবন সামান্য বনমাত্র বলিয়া পরিগণিত হইত।

মধুরভাব ও বৈষ্ণবাচার্যগণ

পাশ্চাত্যের অনুকরণে বাহ্য ঘটনাবলীমাত্র লিপিবদ্ধ করিতে যত্নশীল বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণ বলিবেন, বৃন্দাবনলীলা তোমরা যেরূপ বলিতেছ সেরূপ বাস্তবিক যে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; অতএব তোমাদের এতটা হাসি-কান্না, ভাব-মহাভাব সব যে শূন্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে! বৈষ্ণবাচার্যগণ তদুত্তরে বলিতে পারেন, পুরাণদৃষ্টে আমরা যেরূপ বলিতেছি উহা যে তদ্রূপ হয় নাই, তদ্বিষয়ে তুমিই বা এমন কি নিঃসংশয় প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার? তোমার ইতিহাস সেই বহু প্রাচীন যুগের দ্বার নিঃসংশয়ে উদ্ঘাটিত করিয়াছে, এ বিষয়ে যতদিন না প্রমাণ পাইব, ততদিন আমরা বলিব তোমার সন্দেহই শূন্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। আর এক কথা, যদিই কখন তুমি ঐরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পার, তাহা হইলেও আমাদের বিশ্বাসের এমন কি হানি হইবে? নিত্যবৃন্দাবনে শ্রীভগবানের নিত্যলীলাকে উহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিবে না। ভাবরাজ্যে ঐ রহস্যলীলা চিরকাল সমান সত্য থাকিবে। চিন্ময় ধামে চিন্ময় রাধাশ্যামের ঐরূপ অপূর্ব প্রেমলীলা যদি দেখিতে চাও, তবে প্রথমে কায়মনোবাক্যে কামগন্ধহীন হও এবং

বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে আপত্তি ও মীমাংসা

শ্রীমতীর সখীদিগের অন্যতমের পদানুগ হইয়া নিঃস্বার্থ সেবা করিতে শিক্ষা কর। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তোমার হৃদয়ে শ্রীহরির লীলাভূমি শ্রীবৃন্দাবন চির-প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে এবং তোমাকে লইয়া ঐরূপ লীলার নিত্য অভিনয় হইতেছে।

ভাবরাজ্যকে সত্য বলিয়া উপলব্ধি করিয়া যিনি বাহ্যঘটনারূপ অবলম্বন ভুলিতে এবং শুদ্ধ ভাবেতিহাসের আলোচনা করিতে শিখেন নাই, তিনি শ্রীবৃন্দাবনলীলার সত্যতা ও মাধুর্যের উপভোগে কখন সক্ষম হইবেন না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ লীলার কথা সোৎসাহে বলিতে বলিতে যখন দেখিতেন, উহা তাঁহার সমীপাগত ইংরাজীশিক্ষিত নব্যযুবকদলের রুচিকর হইতেছে না, তখন বলিতেন, "তোরা ঐ লীলার ভিতর শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর মনের টানটাই শুধু দেখ্ না, ধর্ না—ঈশ্বরে মনের ঐরূপ টান হইলে তবে তাঁহাকে পাওয়া যায়। দেখ্ দেখি, গোপীরা স্বামী, পুত্র, কুল-শীল, মান-অপমান, লজ্জা-ঘৃণা, লোকভয়, সমাজ-ভয়—সব ছাড়িয়া শ্রীগোবিন্দের জন্য কতদূর উন্মত্তা হইয়া উঠিয়াছিল!—ঐরূপ করিতে পারিলে তবে ভগবান লাভ হয়।" আবার বলিতেন, "কামগন্ধহীন না হইলে মহাভাবময়ী শ্রীরাধার ভাব বুঝা যায় না, সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে দেখিলেই গোপীদের মনে কোটি কোটি রমণসুখের অধিক আনন্দ উপস্থিত হইয়া দেহবুদ্ধির লোপ হইত—তুচ্ছ দেহের রমণ কি আর তখন তাহাদের মনে উদয় হইতে পারে রে! শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গের দিব্য জ্যোতি তাহাদের শরীরকে স্পর্শ করিয়া প্রতি রোমকূপে যে তাহাদের রমণসুখের অধিক আনন্দ অনুভব করাইত!"

বৃন্দাবনলীলা বুঝিতে হইলে ভাবেতিহাস বুঝিতে হইবে—এ বিষয়ে ঠাকুর যাহা বলিতেন

মধুরভাবের সারতত্ত্ব

স্বামী বিবেকানন্দ এক সময়ে ঠাকুরের নিকট শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলার ঐতিহাসিকত্বসম্বন্ধে আপত্তি উত্থাপন করিয়া উহার মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বলেন, "আচ্ছা, ধরিলাম যেন শ্রীমতী রাধিকা বলিয়া কেহ কখন ছিলেন না—কোন প্রেমিক সাধক রাধাচরিত্র কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু উক্ত চরিত্র কল্পনাকালে ঐ সাধককে শ্রীরাধার ভাবে এককালে তন্ময় হইতে হইয়াছিল, একথা ত মানিস্? তাহা হইলে উক্ত সাধকই যে, ঐকালে আপনাকে ভুলিয়া রাধা হইয়াছিল এবং বৃন্দাবন লীলার অভিনয় যে ঐরূপে স্থূলভাবেও হইয়াছিল, একথা প্রমাণিত হয়।"

বাস্তবিক, শ্রীবৃন্দাবনে ভগবানের প্রেমলীলাসম্বন্ধে শত-সহস্র আপত্তি উত্থাপিত হইলেও শ্রীচৈতন্যপ্রমুখ বৈষ্ণবাচার্যগণের দ্বারা প্রথমাবিষ্কৃত এবং তাঁহাদিগের শুদ্ধ পবিত্র জীবনাবলম্বনে প্রকাশিত মধুরভাবসম্বন্ধ চিরকালই সত্য থাকিবে, চিরকালই ঐ বিষয়ের অধিকারী সাধক আপনাকে স্ত্রী ভাবিয়া এবং শ্রীভগবানকে নিজ পতিস্বরূপে দেখিয়া তাঁহার পুণ্যদর্শনলাভে ধন্য হইবে এবং ঐ ভাবের চরম পরিপুষ্টিতে শুদ্ধাদ্বয় ব্রহ্মরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া সাধনপথে অগ্রসর হওয়া স্ত্রীজাতির পক্ষে স্বাভাবিক ও সহজসাধ্য হইলেও, পুংশরীরধারীদিগের নিকট উহা অস্বাভাবিক বলিয়া প্রতীয়মান হয়। অতএব একথা সহজে মনে উদিত হয় যে, ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব এরূপ বিসদৃশ সাধনপথ কেন লোকে প্রবর্তিত করিলেন। তদুত্তরে বলিতে হয়, যুগাবতারগণের সকল কার্য লোক-কল্যাণের জন্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের দ্বারা

পূর্বোক্ত সাধনপথের প্রবর্তন ঐজন্যই হইয়াছিল। সাধকগণ তৎকালে আধ্যাত্মিক রাজ্যে যেরূপ আদর্শ উপলব্ধি করিবার জন্য বহুকাল হইতে ব্যগ্র হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করিয়া তিনি তাহাদিগকে মধুরভাবরূপ পথে অগ্রসর করাইতেছিলেন। নতুবা ঈশ্বরাবতার নিত্যমুক্ত শ্রীগৌরাঙ্গদেব নিজ কল্যাণের নিমিত্ত যে ঐ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়া উহার পূর্ণাদর্শ জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা নহে। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, হাতীর বাহিরের দাঁত যেমন শত্রুকে আক্রমণের জন্য এবং ভিতরের দাঁত খাদ্য চর্বণ করিয়া নিজ শরীরপোষণের জন্য থাকে, তদ্রূপ শ্রীগৌরাঙ্গের অন্তরে ও বাহিরে দুই প্রকার ভাবের প্রকাশ ছিল। বাহিরের মধুরভাবসহায়ে তিনি লোককল্যাণসাধন করিতেন এবং অন্তরের অদ্বৈতভাবে প্রেমের চরম পরিপুষ্টিতে ব্রহ্মভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়া স্বয়ং ভূমানন্দ অনুভব করিতেন।"

শ্রীচৈতন্যের পুরুষ-জাতিকে মধুর-ভাবসাধনে প্রবৃত্ত করিবার কারণ

পুরাতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন, বৌদ্ধযুগের অবসানকালে দেশে বজ্রযানরূপ মার্গ এবং ঐ মতের আচার্যগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল। তাঁহারা প্রচার করিয়াছিলেন—নির্বাণপ্রয়াসী মানবমন বাসনাসমূহের হস্ত হইতে মুক্তপ্রায় হইয়া ধ্যানসহায়ে যখন মহাশূন্যে লীন হইতে অগ্রসর হয়, তখন 'নিরাত্মা' নামক দেবী তাহার সম্মুখীন হইয়া তাহাকে ঐরূপ হইতে না দিয়া নিজাঙ্গে সংযুক্ত করিয়া রাখেন, এবং সাধকের স্থূল শরীররূপ ভোগায়তনের উপলব্ধি তখন না থাকিলেও সূক্ষ্মশরীরবিশিষ্ট তাহাকে ইন্দ্রিয়জ সর্ব ভোগসুখের সারসমষ্টি নিত্য উপভোগ করাইয়া থাকেন। স্থূলবিষয়ভোগ-ত্যাগে ভাবরাজ্যে সূক্ষ্ম নিরবচ্ছিন্ন ভোগসুখপ্রাপ্তিরূপ তাঁহাদিগের প্রচারিত মত কালে বিকৃত হইয়া নিরবচ্ছিন্ন স্থূলভোগসুখপ্রাপ্তিকে

ধর্মানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য করিয়া তুলিবে এবং দেশে ব্যভিচারের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে, ইহা বিচিত্র নহে। ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবকালে দেশের অশিক্ষিত জনসাধারণ ঐসকল বিকৃত বৌদ্ধধর্মমত অবলম্বন করিয়া নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল। উচ্চবর্ণদিগের অধিকাংশের মধ্যে তন্ত্রোক্ত বামাচার বিকৃত হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার সকাম পূজা ও উপাসনা দ্বারা অসাধারণ বিভূতি ও ভোগসুখলাভরূপ মতের প্রচলন হইয়াছিল। আবার এইকালের যথার্থ সাধককুল আধ্যাত্মিক রাজ্যে ভাবসহায়ে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দলাভের প্রয়াসী হইয়া পথের সন্ধান পাইতেছিলেন না। ভগবান শ্রীচৈতন্য নিজ জীবনে অনুষ্ঠান করিয়া অদ্ভুত ত্যাগ-বৈরাগ্যের আদর্শ ঐসকল সাধকের সম্মুখে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। পরে শুদ্ধ পবিত্র হইয়া আপনাকে প্রকৃতি ভাবিয়া ঈশ্বরকে পতিরূপে ভজনা করিলে জীব যে সূক্ষ্ম ভাবরাজ্যে নিরবচ্ছিন্ন দিব্যানন্দ-লাভে সত্য সত্য সমর্থ হয়, তাহা তাহাদিগকে দেখাইয়া গেলেন এবং স্থূলদৃষ্টিসম্পন্ন সাধারণ জনগণের নিকট ঈশ্বরের নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া তাহাদিগকে নাম জপ ও উচ্চসঙ্কীর্তনে নিযুক্ত করিলেন। ঐরূপে পথভ্রষ্ট লক্ষ্যবিচ্যুত বহুলবিকৃত বৌদ্ধসম্প্রদায়সকল তাঁহার কৃপায় পুনরায় আধ্যাত্মিক পথে উন্নীত হইয়াছিল। বিকৃতবামাচার-অনুষ্ঠানকারীর দলসকল প্রথম প্রথম প্রকাশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিলেও পরে তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব জীবনাদর্শের অদ্ভুত আকর্ষণে ত্যাগশীল হইয়া নিষ্কামভাবে পূজা করিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার দর্শনলাভ করিতে অগ্রসর হইয়াছিল। ভগবান শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন-কথা লিপিবদ্ধ করিতে যাইয়া সেইজন্য কোন কোন গ্রন্থকার স্পষ্ট লিখিয়াছেন, তিনি

তৎকালে দেশের আধ্যাত্মিক অবস্থা ও শ্রীচৈতন্য কিরূপে উহাকে উন্নীত করেন

অবতীর্ণ হইবার কালে শূন্যবাদী বৌদ্ধসম্প্রদায়সকলও আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিল।*

মধুরভাবের স্থূলকথা

সচ্চিদানন্দ-ঘন পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র পুরুষ—এবং জগতের স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় পদার্থ ও জীবগণের প্রত্যেকেই তাঁহার মহাভাবময়ী প্রকৃতির অংশসম্ভূত—অতএব, তাঁহার স্ত্রী। সেজন্য শুদ্ধ পবিত্র হইয়া জীব তাঁহাকে পতিরূপে সর্বান্তঃকরণে ভজনা করিলে তাঁহার কৃপায় তাহার গতিমুক্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দপ্রাপ্তি হয়—ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু কর্তৃক প্রচারিত মধুরভাবের স্থূল কথা। মহাভাবে সর্বভাবের একত্র সমাবেশ। প্রধানা গোপী শ্রীরাধা সেই মহাভাবস্বরূপিণী এবং অন্য গোপিকাগণের প্রত্যেকে মহাভাবান্তর্গত অন্তর্ভাবসকলের এক, দুই বা ততোধিক ভাবস্বরূপিণী। সুতরাং ব্রজগোপিকাগণের ভাবানুকরণে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া সাধক ঐসকল অন্তর্ভাব নিজায়ত্ত করিতে সমর্থ হয় এবং পরিশেষে মহাভাবোত্থ মহানন্দের আভাস প্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়া থাকে। ঐরূপে মহাভাবস্বরূপিণী† শ্রীরাধিকার ভাবানুধ্যানে নিজ সুখবাঞ্ছা এককালে পরিত্যাগ করিয়া কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের সুখে সুখী হওয়াই এই পথে সাধকের চরম লক্ষ্য।

* 'চৈতন্যমঙ্গল' গ্রন্থ দেখ।

† কৃষ্ণস্য সুখে পীড়াশঙ্কয়া নিমিষস্যাপি অসহিষ্ণুতাদিকং যত্র স রূঢ়ো মহাভাবঃ। কোটিব্রহ্মাণ্ডগতং সমস্তসুখং যস্য সুখস্য লেশোঽপি ন ভবতি, সমস্তবৃশ্চিকসর্পাদিদংশকৃতদুঃখমপি যস্য দুঃখস্য লেশো ন ভবতি, এবম্ভূতে কৃষ্ণসংযোগবিয়োগয়োঃ সুখদুঃখে যতো ভবতঃ সঃ অধিরূঢ়ঃ মহাভাবঃ। অধিরূঢ়স্যৈব মোদন মাদন ইতি দ্বৌ রূপৌ ভবতঃ। ইত্যাদি—শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ভক্তিগ্রন্থাবলী

মধুরভাবের সারতত্ত্ব

সামাজিক বিধানে বিবাহিত নায়ক নায়িকারা পরস্পরের প্রতি প্রেম, জাতি, কুল, শীল, লোকভয়, সমাজভয় প্রভৃতি নানা বিষয়ের দ্বারা নিয়মিত হইয়া থাকে। ঐরূপ নায়ক নায়িকা ঐসকলের সীমার ভিতরে অবস্থানপূর্বক নানা কর্তব্যাকর্তব্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া পরস্পরের সুখসম্পাদনে যথাসম্ভব ত্যাগস্বীকার করিয়া থাকে। বিবাহিতা নায়িকা সামাজিক কঠোর নিয়মবন্ধনসকল যথাযথ পালন করিতে যাইয়া অনেক সময় নায়কের প্রতি নিজ প্রেমসম্বন্ধ ভুলিতে বা হ্রাস করিতে সঙ্কুচিত হয় না; স্বাধীনা নায়িকার প্রেমের আচরণ কিন্তু অন্যরূপ। প্রেমের প্রাবল্যে ঐরূপ নায়িকা অনেক সময় ঐসকল নিয়মবন্ধনকে পদদলিত করিতে এবং সমাজপ্রদত্ত নিজ সামাজিক অধিকারের সর্বস্ব ত্যাগপূর্বক নায়কের সহিত সংযুক্তা হইতে কুণ্ঠিত হয় না। বৈষ্ণবাচার্যগণ ঐরূপ সর্বগ্রাসী প্রেমসম্বন্ধ ঈশ্বরে আরোপ করিতে সাধককে উপদেশ করিয়াছেন এবং বৃন্দাবনাধিশ্বরী শ্রীরাধা সেই-জন্যই আয়ান ঘোষের বিবাহিতা পত্নী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বত্যাগিনী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

স্বাধীনা নায়িকার সর্বগ্রাসী প্রেম ঈশ্বরে আরোপ করিতে হইবে

বৈষ্ণবাচার্যগণ মধুরভাবকে শান্তাদি অন্য চারিপ্রকার ভাবের সারসমষ্টি এবং ততোধিক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কারণ প্রেমিকা নায়িকা ক্রীতদাসীর ন্যায় প্রিয়ের সেবা করেন, সখীর ন্যায় সর্বাবস্থায় তাঁহাকে সুপরামর্শ দানপূর্বক তাঁহার আনন্দে উল্লসিতা ও দুঃখে সমবেদনাযুক্ত হয়েন, মাতার ন্যায় সতত তাঁহার শরীরমনের পোষণে এবং কল্যাণকামনায় নিযুক্তা থাকেন এবং ঐরূপে সর্বপ্রকারে আপনাকে ভুলিয়া প্রিয়তমের কল্যাণসাধন ও চিত্তবিনোদনপূর্বক তাঁহার মন অপূর্ব

মধুরভাব অন্য সকল ভাবের সমষ্টি ও অধিক

শান্তিতে আপ্লুত করিয়া থাকেন! যে নায়িকা ঐরূপে প্রেমভাবে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া প্রিয়ের কল্যাণ ও সুখের দিকে সর্বতোভাবে নিবদ্ধদৃষ্টি হইয়া থাকেন, তাঁহার প্রেমই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং তিনিই সমর্থা প্রেমিকা বলিয়া ভক্তিগ্রন্থে নির্দিষ্ট হইয়াছেন। স্বার্থগন্ধদুষ্ট অন্য সকল প্রকার প্রেম সমঞ্জসা ও সাধারণী শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। সমঞ্জসাশ্রেণীভুক্তা নায়িকা প্রিয়ের সুখের ন্যায় আত্মসুখের দিকেও সমভাবে লক্ষ্য রাখে এবং সাধারণীশ্রেণী-ভুক্তা নায়িকা কেবলমাত্র আত্মসুখের জন্য নায়ককে প্রিয় জ্ঞান করে।

বিষয়সুখ বিষবৎ পরিত্যাগপূর্বক জীবন নিয়মিত করিতে এবং প্রেমে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ার স্থলে দণ্ডায়মান হইতে সাধকগণকে শিক্ষা প্রদান করিয়া ও নামমাহাত্ম্য প্রচার করিয়া ভগবান শ্রীচৈতন্যদেব তৎকালে দেশের ব্যভিচারনিবারণে ও কল্যাণসাধনে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ফলে তৎকালে তদীয় ভাব ও উপদেশ পথভ্রষ্টকে পথ দেখাইয়া, সমাজচ্যুতদিগকে নবীন সমাজবন্ধনে আনিয়া জাতিবহির্ভূতদিগকে ভগবদ্ভক্তরূপ জাতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া এবং সর্বসম্প্রদায়ের গোচরে ত্যাগবৈরাগ্যের পবিত্র উচ্চাদর্শ ধারণ করিয়া অশেষ লোককল্যাণ সাধিত করিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে— সাধারণ নায়ক নায়িকার প্রণয় ও মিলনসম্ভূত "অষ্ট সাত্ত্বিকবিকার* নামক মানসিক ও শারীরিক বিকারসমূহ শ্রীশ্রীজগৎস্বামীর তীব্র ধ্যানানুচিন্তনে পবিত্রচেতা সাধকের সত্য সত্যই উপস্থিত হইয়া থাকে, শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক জীবন-সহায়ে একথা নিঃসংশয়ে প্রমাণিত করিয়া বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে প্রচারিত মধুরভাব তৎকালে অলঙ্কার-শাস্ত্রকে আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকলের অঙ্গীভূত করিয়াছিল, কুবাক্যসকলকে

শ্রীচৈতন্য মধুর-ভাবসহায়ে কিরূপে লোককল্যাণ করিয়াছিলেন

* যে চিত্তং তনুং ক্ষোভয়ন্তি তে সাত্ত্বিকাঃ। তে অষ্টৌ স্তম্ভ স্বেদঃ রোমাঞ্চস্বরভেদ

উচ্চ আধ্যাত্মিকভাবে রঞ্জিত করিয়া সাধকমনের উপভোগ্য ও উন্নতি-বিধায়ক করিয়াছিল এবং শান্তভাবানুষ্ঠানে অবশ্য-পরিহর্তব্য কামক্রোধাদি ইতর ভাবসমূহ শ্রীভগবানকে আপনার করিয়া লইয়া তন্নিমিত্ত এবং তাঁহারই উপর সাধককে প্রয়োগ করিতে শিখাইয়া তাঁহার সাধনপথ সুগম করিয়া দিয়াছিল।

পাশ্চাত্ত্যশিক্ষাপ্রাপ্ত বর্তমান যুগের নব্য সম্প্রদায়ের চক্ষে মধুরভাব পুংশরীরধারীদিগের পক্ষে অস্বাভাবিক ও বিসদৃশ বলিয়া প্রতীত হইলেও বেদান্তবাদীর নিকটে উহার সমুচিত মূল্য নির্ধারিত হইতে বিলম্ব হয় না। তিনি দেখেন, ভাবসমূহই বহুকালাভ্যাসে মানব-মনে দৃঢ় সংস্কাররূপে পরিণত হয় এবং জন্মজন্মাগত ঐরূপ সংস্কারসকলের জন্যই মানব এক অদ্বয় ব্রহ্মবস্তুর স্থলে এই বিচিত্র জগৎ দেখিতে পাইয়া থাকে। ঈশ্বরানুগ্রহে এই মুহূর্তে যদি সে জগৎ নাই বলিয়া ঠিক ঠিক ভাবনা করিতে পারে, তবে তদ্দণ্ডেই উহা তাহার চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের সম্মুখ হইতে কোথায় অন্তর্হিত হইবে। জগৎ আছে ভাবে বলিয়াই মানবের নিকট জগৎ বর্তমান। আমি পুরুষ বলিয়া আপনাকে ভাবি বলিয়াই পুরুষভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছি এবং অন্যে স্ত্রী বলিয়া ভাবে বলিয়াই স্ত্রীভাবাপন্ন হইয়া রহিয়াছে। আবার, মানবহৃদয়ে এক ভাব প্রবল হইয়া অপর সকল বিপরীত ভাবকে যে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে বিনষ্ট করে, ইহাও নিত্যপরিদৃষ্ট। অতএব ঈশ্বরের প্রতি মধুর-ভাবসম্বন্ধের আরোপ করিয়া উহার প্রাবল্যে সাধকের নিজ মনের অন্য

বেদান্তবিৎ মধুর-ভাবসাধনাকে যে ভাবে সাধকের কল্যাণকর বলিয়া গ্রহণ করেন

বেপথু-বৈবর্ণ্যাশ্রুপ্রলয়াঃ ইতি। তে ধূমায়িতা জ্বলিতা দীপ্তা উদ্দীপ্তা সুদীপ্তা ইতি পঞ্চবিধা যথোত্তরসুখদা স্যুঃ।—আকরগ্রন্থ

সকল ভাবকে সমাচ্ছন্ন এবং ক্রমে উৎসাদিত করিবার চেষ্টাকে বেদান্তবিৎ অন্ত কণ্টকের সাহায্যে পদবিদ্ধ কণ্টকের অপনয়নের চেষ্টার ন্যায় বিবেচনা করিয়া থাকেন। মানবমনের অন্য সকল সংস্কারের অবলম্বনস্বরূপ 'আমি দেহী' বলিয়া বোধ এবং তদ্দেহসংযোগে 'আমি পুরুষ বা স্ত্রী' বলিয়া সংস্কারই সর্বাপেক্ষা প্রবল। শ্রীভগবানে পতিভাবারোপ করিয়া 'আমি স্ত্রী' বলিয়া ভাবিতে ভাবিতে সাধক-পুরুষ আপনার পুংস্ত্ব ভুলিতে সক্ষম হইবার পরে, 'আমি স্ত্রী' এ ভাবকেও অতি সহজে নিক্ষেপ করিয়া ভাবাতীত অবস্থায় উপনীত হইতে পারিবেন, ইহা বলা বাহুল্য। অতএব মধুরভাবে সিদ্ধ হইলে সাধক যে ভাবাতীত ভূমির অতি নিকটেই উপস্থিত হইবেন, বেদান্তবাদী দার্শনিকের চক্ষে ইহাই সর্বথা প্রতীয়মান হয়।

শ্রীমতীর ভাব প্রাপ্ত হওয়াই মধুরভাব-সাধনের চরম লক্ষ্য

প্রশ্ন হইতে পারে, তবে কি রাধাভাব প্রাপ্ত হওয়াই সাধকের চরম লক্ষ্য? উত্তরে বলিতে হয়, বৈষ্ণব গোস্বামিগণ বর্তমানে উহা অস্বীকারপূর্বক সখীভাবপ্রাপ্তিই সাধ্য এবং মহাভাবময়ী শ্রীরাধিকার ভাবলাভ সাধকের পক্ষে অসাধ্য বলিয়া প্রচার করিলেও উহাই সাধকের চরম লক্ষ্য বলিয়া অনুমতি হয়। কারণ, দেখা যায়, সখীদিগের ও শ্রীমতীর ভাবের মধ্যে একটা গুণগত পার্থক্য বিদ্যমান নাই, কেবলমাত্র পরিমাণগত পার্থক্যই বর্তমান। দেখা যায়, শ্রীমতীর ন্যায় সখীগণও সচ্চিদানন্দঘন শ্রীকৃষ্ণকে পতিভাবে ভজনা করিতেন এবং শ্রীরাধার সহিত সম্মিলনে শ্রীকৃষ্ণের সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ দেখিয়া, তাঁহাকে সুখী করিবার জন্যই শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলনসম্পাদনে সর্বদা যত্নবতী। আবার দেখা যায় শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন, শ্রীজীব প্রভৃতি প্রাচীন গোস্বামিপাদগণের

মধুরভাবের সারতত্ত্ব

প্রত্যেকে মধুরভাব-পরিতুষ্টির জন্য পৃথক পৃথক শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের সেবায় শ্রীবৃন্দাবনে জীবন অতিবাহিত করিলেও, তৎসঙ্গে শ্রীরাধিকার মূর্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেবা করিবার প্রয়াস পান নাই—আপনাদিগকে রাধাস্থানীয় ভাবিতেন বলিয়াই যে তাঁহারা ঐরূপ করেন নাই, একথাই উহাতে অনুমিত হয়।

বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত মধুরভাবের যাঁহারা বিস্তারিত আলোচনা করিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ও শ্রীজীবাদি প্রাচীন গোস্বামিপাদ-গণের গ্রন্থসমূহে এবং শ্রীবিদ্যাপতি-চণ্ডীদাস প্রমুখ বৈষ্ণবকবিকুলের পূর্বরাগ, দান, মান ও মাথুর-সম্বন্ধীয় পদাবলীসকলের আলোচনা করিবেন। মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর উহাতে কি অপূর্ব চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে সুগম হইবে বলিয়াই আমরা উহার সারাংশের এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করিলাম।

চতুর্দশ অধ্যায়

ঠাকুরের মধুরভাব-সাধন

ঠাকুরের একাগ্রমনে যখন যে ভাবের উদয় হইত, তাহাতে তিনি কিছুকালের জন্য তন্ময় হইয়া যাইতেন। ঐ ভাব তখন তাঁহার মনে পূর্ণাধিকার স্থাপনপূর্বক অন্য সকল ভাবের লোপ করিয়া দিত এবং তাঁহার শরীরকে পরিবর্তিত করিয়া উহার প্রকাশানুরূপ যন্ত্র করিয়া তুলিত। বাল্যকাল হইতে তাঁহার ঐরূপ স্বভাবের কথা শুনিতে পাওয়া যায় এবং দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন করিবার কালে আমরা ঐ বিষয়ের নিত্য পরিচয় পাইতাম। দেখিতাম, সঙ্গীতাদি শ্রবণে বা অন্য কোন উপায়ে তাঁহার মন ভাববিশেষে মগ্ন হইলে যদি কেহ সহসা অন্য ভাবের সঙ্গীত বা কথা আরম্ভ করিত, তাহা হইলে তিনি বিষম যন্ত্রণা অনুভব করিতেন। এক লক্ষ্যে প্রবাহিত চিত্তবৃত্তিসকলের সহসা গতিরোধ হওয়াতেই যে তাঁহার ঐরূপ কষ্ট উপস্থিত হইত, একথা বলা বাহুল্য। মহামুনি পতঞ্জলি এক ভাবে তরঙ্গিত চিত্তবৃত্তিযুক্ত মনকে সবিকল্প সমাধিস্থ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন এবং ভক্তিগ্রন্থসকলে ঐ সমাধি ভাবসমাধি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, ঠাকুরের মন ঐরূপ সমাধিতে অবস্থান করিতে আজীবন সমর্থ ছিল।

বাল্যকাল হইতে ঠাকুরের মনের ভাব-তন্ময়তার আচরণ

সাধনায় প্রবর্তিত হইবার কাল হইতে তাঁহার মনের পূর্বোক্ত স্বভাব এক অপূর্ব বিভিন্ন পথ অবলম্বন করিয়াছিল। কারণ দেখা যায়, ঐকালে

তাঁহার মন পূর্বের ন্যায় কোন ভাবে কিছুক্ষণ মাত্র অবস্থান করিয়াই অন্য ভাববিশেষ অবলম্বন করিতেছে না; কিন্তু কোন এক ভাবে আবিষ্ট হইলে, যতক্ষণ না ঐ ভাবের চরম সীমায় উপনীত হইয়া অদ্বৈতভাবের আভাস পর্যন্ত উপলব্ধি করিতেছে, ততক্ষণ উহাকে অবলম্বন করিয়াই সর্বক্ষণ অবস্থান করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে যে, দাস্যভাবের চরম সীমায় উপস্থিত না হওয়া পর্যন্ত তিনি মাতৃ-ভাবোপলব্ধি করিতে অগ্রসর হন নাই; আবার মাতৃভাবসাধনায় চরমোপলব্ধি না করিয়া বাৎসল্যাদি ভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন নাই। তাঁহার সাধনকালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে ঐরূপ সর্বত্র দৃষ্ট হয়।

সাধনকালে তাঁহার মনের উক্ত স্বভাবের কিরূপ পরিবর্তন হয়

ব্রাহ্মণীর আগমনকালে ঠাকুরের মন ঈশ্বরের মাতৃভাবের অনুধ্যানে পূর্ণ ছিল। জগতের যাবতীয় প্রাণী ও পদার্থে, বিশেষতঃ স্ত্রীমূর্তিসকলে তখন তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রকাশ সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছিলেন। অতএব ব্রাহ্মণীকে দর্শনমাত্র তিনি কেন মাতৃসম্বোধন করিয়াছিলেন এবং সময় সময় বালকের ন্যায় ক্রোড়ে উপবেশনপূর্বক তাঁহার হস্তে আহার্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার কারণ স্পষ্ট বুঝা যায়। হৃদয়ের মুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী এইকালে কখন কখন ব্রজগোপিকাগণের ভাবে আবিষ্টা হইয়া মধুররসাত্মক সঙ্গীতসকল আরম্ভ করিলে ঠাকুর বলিতেন, ঐ ভাব তাঁহার ভাল লাগে না এবং ঐ ভাব সংবরণপূর্বক মাতৃভাবের ভজনসকল গাহিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিতেন। ব্রাহ্মণীও উহাতে ঠাকুরের মানসিক অবস্থা যথাযথ বুঝিয়া তাঁহার প্রীতির জন্য তৎক্ষণাৎ শ্রীশ্রীজগদম্বার

সাধনকালের পূর্বে ঠাকুরের মধুরভাব ভাল লাগিত না

দাসীভাবে সঙ্গীত আরম্ভ করিতেন, অথবা ব্রজগোপালের প্রতি নন্দরাণী শ্রীমতী যশোদার হৃদয়ের গভীরোচ্ছ্বাসপূর্ণ সঙ্গীতের অবতারণা করিতেন। ঘটনা অবশ্য ঠাকুরের মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইবার বহু পূর্বের কথা। 'ভাবের ঘরে চুরি' যে তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র কোনকালে ছিল না, একথা উহাতে বুঝিতে পারা যায়।

উহার কয়েক বৎসর পরে ঠাকুরের মন কিরূপে পরিবর্তিত হইয়া বাৎসল্যভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিল, সেকথা আমরা পাঠককে ইতিপূর্বে বলিয়াছি। অতএব মধুরভাবসাধনে অগ্রসর হইয়া তিনি যেসকল অনুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সেইসকল কথা আমরা এখন বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

ঠাকুরের সাধনসকল কখন শাস্ত্রবিরোধী হয় নাই। উহাতে যাহা প্রমাণিত হয়

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আমরা যাহাকে 'নিরক্ষর' বলি, তিনি প্রায় পূর্ণমাত্রায় তদ্রূপ অবস্থাপন্ন হইলেও কেমন করিয়া আজীবন শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা করিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। গুরুগ্রহণ করিবার পূর্বে কেবলমাত্র নিজ হৃদয়ের প্রেরণায় তিনি যেসকল সাধনানুষ্ঠানে রত হইয়াছিলেন, সেসকলও কখনও শাস্ত্রবিরোধী না হইয়া উহার অনুগামী হইয়াছিল। 'ভাবের ঘরে চুরি' না রাখিয়া শুদ্ধ পবিত্র হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে ঐরূপ হইয়া থাকে, একথার পরিচয় উহাতে স্পষ্ট পাওয়া যায়। ঘটনা ঐরূপ হওয়া বিচিত্র নহে; কারণ শাস্ত্রসমূহ ঐভাবেই যে প্রণীত হইয়াছে, একথা স্বল্প চিন্তার ফলে বুঝিতে পারা যায়। কারণ, মহাপুরুষদিগের সত্যলাভের চেষ্টা ও উপলব্ধিসকল লিপিবদ্ধ হইয়া পরে 'শাস্ত্র' আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যাহা হউক, নিরক্ষর ঠাকুরের শাস্ত্রনির্দিষ্ট উপলব্ধিসকলের যথাযথ অনুভূতি

হওয়ায় শাস্ত্রসমূহের সত্যতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ ঐকথা নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন—ঠাকুরের এবার নিরক্ষর হইয়া আগমনের কারণ শাস্ত্রসকলকে সত্য বলিয়া প্রমাণিত করিবার জন্য।

তাঁহার স্বভাবতঃ শাস্ত্রমর্যাদা রাখার দৃষ্টান্ত—সাধনকালে নামভেদ ও বেশগ্রহণ

শাস্ত্রমর্যাদা স্বভাবতঃ রক্ষা করিবার দৃষ্টান্তস্বরূপে আমরা এখানে বিশেষ বিশেষ ভাবের প্রেরণায় ঠাকুরের নানা বেশগ্রহণের কথার উল্লেখ করিতে পারি। উপনিষদ্‌মুখে ঋষিগণ বলিয়াছেন—'তপসো ব্যাপ্যলিঙ্গাৎ'* সিদ্ধ হওয়া যায় না। ঠাকুরের জীবনেও দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তখন হৃদয়ের প্রেরণায় প্রথমেই সেই ভাবানুকূল বেশভূষা বা বাহ্য চিহ্নসকল ধারণ করিয়াছিলেন। যথা, তন্ত্রোক্ত মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভের জন্য তিনি রক্তবস্ত্র, বিভূতি, সিন্দূর ও রুদ্রাক্ষাদি ধারণ করিয়াছিলেন; বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত ভাবসমূহের সাধনকালে গুরু-পরম্পরাপ্রসিদ্ধ ভেক বা তদনুকূল বেশ গ্রহণ করিয়া শ্বেতবস্ত্র, শ্বেতচন্দন, তুলসী-মাল্যাদিতে নিজাঙ্গ ভূষিত করিয়াছিলেন। বেদান্তোক্ত অদ্বৈতভাবে সিদ্ধ হইবেন বলিয়া শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্বক কাষায় ধারণ করিয়াছিলেন, ইত্যাদি। আবার পুংভাব-সমূহের সাধনকালে তিনি যেমন বিবিধ পুরুষবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ স্ত্রীজনোচিত ভাবসমূহের সাধনকালে রমণীর বেশভূষায় আপনাকে সজ্জিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই। ঠাকুর আমাদিগকে বারংবার শিক্ষা দিয়াছেন—লজ্জা, ঘৃণা, ভয় ও জন্মজন্মাগত জাতি-কুল-শীলাদি অষ্টপাশ

* মুণ্ডকোপনিষৎ, ৩।২।৪—সন্ন্যাসের লিঙ্গ বা চিহ্ন (যথা, গৈরিকাদি) ধারণ না করিয়া কেবলমাত্র তপস্যা দ্বারা আত্মদর্শন হয় না।

ত্যাগ না করিলে কেহ কখন ঈশ্বরলাভ করিতে পারে না। ঐ শিক্ষা তিনি স্বয়ং আজীবন কায়মনোবাক্যে কতদূর পালন করিয়াছিলেন, তাহা সাধনকালে তাঁহার বিবিধ বেশধারণাদি হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতি কার্যকলাপের অনুশীলনে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত ঠাকুরের স্ত্রীবেশগ্রহণ

মধুরভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষাধারণের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং পরমভক্ত মথুরামোহন তাঁহার ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া কখন বহুমূল্য বারাণসী শাড়ি এবং কখন ঘাগরা, ওড়না, কাঁচুলি প্রভৃতির দ্বারা তাঁহাকে সজ্জিত করিয়া সুখী হইয়াছিলেন। আবার 'বাবা'র রমণীবেশ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুর চাঁচর কেশপাশ (পরচুলা) এবং এক সুট্ স্বর্ণালঙ্কারেও তাঁহাকে ভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে শ্রবণ করিয়াছি, ভক্তিমান মথুরের ঐরূপ দান ঠাকুরের কঠোর ত্যাগে কলঙ্কার্পণ করিতে দুষ্টচিত্তদিগকে অবসর দিয়াছিল; কিন্তু ঠাকুর ও মথুরামোহন সেসকল কথায় কিছুমাত্র মনোযোগী না হইয়া আপন আপন লক্ষ্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন। মথুরামোহন 'বাবা'র পরিতৃপ্তিতে এবং তিনি যে উহা নিরর্থক করিতেছেন না—এই বিশ্বাসে পরম সুখী হইয়াছিলেন; এবং ঠাকুর ঐরূপ বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া শ্রীহরির প্রেমৈকলোলুপা ব্রজরমণীর ভাবে ক্রমে এতদূর মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহার আপনাতে পুরুষবোধ এককালে অন্তর্হিত হইয়া প্রতি চিন্তা ও বাক্য রমণীর ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি, মধুরভাবসাধনকালে তিনি ছয় মাসকাল রমণীর বেশ ধারণপূর্বক অবস্থান করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভিতর স্ত্রী ও পুরুষ—উভয় ভাবের বিচিত্র সমাবেশের কথা

আমরা অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। অতএব স্ত্রীবেশের উদ্দীপনায় তাঁহার মনে যে এখন রমণীভাবের উদয় হইবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু ঐ ভাবের প্রেরণায় তাঁহার চলন, বলন, হাস্য, কটাক্ষ, অঙ্গভঙ্গী এবং শরীর ও মনের প্রত্যেক চেষ্টা যে, এককালে ললনা-সুলভ হইয়া উঠিবে, একথা কেহ কখন কল্পনা করিতে পারে নাই। কিন্তু ঐরূপ অসম্ভব ঘটনা যে এখন বাস্তবিক হইয়াছিল, একথা আমরা ঠাকুর ও হৃদয় উভয়ের নিকটে বহুবার শ্রবণ করিয়াছি। দক্ষিণেশ্বরে গমনাগমন-কালে আমরা অনেকবার তাঁহাকে রঙ্গচ্ছলে স্ত্রীচরিত্রের অভিনয় করিতে দেখিয়াছি। তখন উহা এতদূর সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ হইত যে, রমণীগণও উহা দেখিয়া আশ্চর্যবোধ করিতেন।

স্ত্রীবেশগ্রহণে ঠাকুরের প্রত্যেক আচরণ স্ত্রীজাতির ন্যায় হওয়া

ঠাকুর এই সময়ে কখন কখন রাণী রাসমণির জানবাজারস্থ বাটীতে যাইয়া শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের পুরাঙ্গনাদিগের সহিত বাস করিয়াছিলেন। অন্তঃপুরবাসিনীরা তাঁহার কামগন্ধহীন চরিত্রের সহিত পরিচিত থাকিয়া তাঁহাকে ইতিপূর্বেই দেবতা-সদৃশ জ্ঞান করিতেন। এখন তাঁহার স্ত্রীসুলভ আচার-ব্যবহারে এবং অকৃত্রিম স্নেহ ও পরিচর্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে তাঁহারা আপনাদিগের অন্যতম বলিয়া এতদূর নিশ্চয় করিয়াছিলেন যে, তাঁহার সম্মুখে লজ্জাসঙ্কোচাদি ভাব রক্ষা করিতে সমর্থা হয়েন নাই।* ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, শ্রীযুক্ত মথুরের কন্যাগণের মধ্যে কাহারও স্বামী ঐকালে জানবাজার ভবনে উপস্থিত হইলে, তিনি ঐ কন্যার কেশবিন্যাস ও বেশভূষাদি

মথুরের বাটীতে রমণীগণের সহিত ঠাকুরের সখীভাবে আচরণ

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়

নিজহস্তে সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং স্বামীর চিত্তরঞ্জনের নানা উপায় তাহাকে শিক্ষাপ্রদানপূর্বক সখীর ন্যায় তাহার হস্তধারণ করিয়া লইয়া যাইয়া স্বামীর পার্শ্বে দিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "তাহারা তখন আমাকে তাহাদিগের সখী বলিয়া বোধ করিয়া কিছুমাত্র সঙ্কুচিতা হইত না!"

হৃদয় বলিত—"ঐরূপে রমণীগণপরিবৃত হইয়া থাকিবার কালে ঠাকুরকে সহসা চিনিয়া লওয়া তাঁহার নিত্যপরিচিত আত্মীয়দিগের পক্ষেও দুরূহ হইত। মথুরবাবু ঐকালে একসময়ে আমাকে অন্তঃপুরমধ্যে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'বল দেখি, উহাদিগের মধ্যে তোমার মামা কোন্‌টি?' এতকাল একসঙ্গে বাস ও নিত্য সেবাদি করিয়াও তখন আমি তাঁহাকে সহসা চিনিতে পারি নাই! দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে মামা তখন প্রতিদিন প্রত্যূষে সাজি হস্তে লইয়া বাগানে পুষ্পচয়ন করিতেন—আমরা ঐ সময়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াছি, চলিবার সময় রমণীর ন্যায় তাঁহার বামপদ প্রতিবার স্বতঃ অগ্রসর হইতেছে। ব্রাহ্মণী বলিতেন—'তাঁহারা ঐরূপে পুষ্পচয়ন করিবার কালে তাঁহাকে (ঠাকুরকে) দেখিয়া আমার সময়ে সময়ে সাক্ষাৎ শ্রীমতী রাধারাণী বলিয়া ভ্রম হইয়াছে।'" পুষ্পচয়নপূর্বক বিচিত্র মালা গাঁথিয়া তিনি এইকালে প্রতিদিন শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউকে সজ্জিত করিতেন এবং কখন কখন শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐরূপে সাজাইয়া ৺কাত্যায়নীর নিকটে ব্রজগোপিকাগণের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে স্বামিরূপে পাইবার নিমিত্ত সকরুণ প্রার্থনা করিতেন।"

রমণীবেশগ্রহণে ঠাকুরকে পুরুষ বলিয়া চেনা দুঃসাধ্য হইত

ঐরূপে শ্রীশ্রীজগদম্বার সেবা-পূজাদি সম্পাদনপূর্বক শ্রীকৃষ্ণদর্শন ও

তাঁহাকে স্বীয় বল্লভরূপে প্রাপ্ত হইবার মানসে ঠাকুর এখন অনন্যচিত্তে শ্রীশ্রীযুগলপাদপদ্মসেবায় রত হইয়াছিলেন এবং সাগ্রহ প্রার্থনা ও প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিবা কিংবা রাত্রি, কোনকালেই তাঁহার হৃদয়ে সে আকুল প্রার্থনার বিরাম হইত না এবং দিন, পক্ষ, মাসান্তেও অবিশ্বাসপ্রসূত নৈরাশ্য আসিয়া তাঁহার হৃদয়কে সে প্রতীক্ষা হইতে বিন্দুমাত্র বিচলিত করিত না। ক্রমে ঐ প্রার্থনা আকুল ক্রন্দনে এবং ঐ প্রতীক্ষা উন্মত্তের ন্যায় উৎকণ্ঠা ও চঞ্চলতায় পরিণত হইয়া তাঁহার আহারনিদ্রাদির লোপসাধন করিয়াছিল। আর বিরহ?—নিতান্ত প্রিয়জনের সহিত সর্বদা সর্বতোভাবে সম্মিলিত হইবার অসীম লালসা নানা বিঘ্নবাধায় প্রতিরুদ্ধ হইলে মানবের হৃদয়-মন-মথনকরী শরীরেন্দ্রিয়বিকলকরী যে অবস্থা আনয়ন করে, সেই বিরহ? উহা তাঁহাতে অশেষ যন্ত্রণার নিদান মানসিক বিকাররূপে কেবলমাত্র প্রকাশিত হইয়াই উপশান্ত হয় নাই, কিন্তু সাধনকালের পূর্বাবস্থায় অনুভূত নিদারুণ শারীরিক উত্তাপ ও জ্বালারূপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়াছিল। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি—শ্রীকৃষ্ণবিরহের প্রবল প্রভাবে এইকালে তাঁহার শরীরের লোমকূপ দিয়া সময়ে সময়ে বিন্দু বিন্দু রক্তনির্গমন হইত, দেহের গ্রন্থিসকল ভগ্নপ্রায় শিথিল লক্ষিত হইত এবং হৃদয়ের অসীম যন্ত্রণায় ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব কার্য হইতে এককালে বিরত হওয়ায় দেহ কখন কখন মৃতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ও সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িয়া থাকিত।

মধুরভাবসাধনে নিযুক্ত ঠাকুরের আচরণ ও শারীরিক বিকারসমূহ

দেহের সহিত নিত্যসম্বদ্ধ মানব আমরা প্রেম বলিতে এক দেহের প্রতি অন্য দেহের আকর্ষণই বুঝিয়া থাকি! অথবা বহু চেষ্টার ফলে স্থূল দেহবুদ্ধি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র উর্ধ্বে উঠিয়া যদি উহাকে দেহবিশেষাশ্রয়ে

প্রকাশিত গুণসমষ্টির প্রতি আকর্ষণ বলিয়া অনুভব করি, তবে 'অতীন্দ্রিয় প্রেম' বলিয়া উহার আখ্যা প্রদানপূর্বক উহার সহিত কত যশোগান করি। কিন্তু কবিকুলবন্দিত আমাদিগের ঐ অতীন্দ্রিয় প্রেম যে স্থূল দেহবুদ্ধি ও সূক্ষ্ম ভোগলালসাপরিশূন্য নহে, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ঠাকুরের জীবনে প্রকাশিত যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের তুলনায় উহা কি তুচ্ছ, হেয় ও অন্তঃসারশূন্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়!

ঠাকুরের অতীন্দ্রিয় প্রেমের সহিত আমাদের ঐ বিষয়ক ধারণার তুলনা

ভক্তিগ্রন্থসকলে লিখিত আছে, ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীই কেবলমাত্র যথার্থ অতীন্দ্রিয় প্রেমের পরাকাষ্ঠা জীবনে প্রত্যক্ষপূর্বক উহার পূর্ণাদর্শ জগতে রাখিয়া গিয়াছেন। লজ্জা ঘৃণা ভয় ছাড়িয়া, লোকভয় সমাজভয় পরিত্যাগ করিয়া, জাতি কুল শীল পদমর্যাদা ও নিজ দেহ-মনের ভোগসুখের কথা সম্পূর্ণভাবে বিস্মৃত হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সুখেই কেবলমাত্র আপনাকে সুখী অনুভব করিতে তাঁহার ন্যায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল ভক্তিশাস্ত্রে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র সেজন্য বলেন, শ্রীমতী রাধা-রাণীর কৃপাকটাক্ষ ভিন্ন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ জগতে কখন সম্ভবপর নহে, কারণ সচ্চিদানন্দঘনবিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতীর প্রেমে চিরকাল সর্বতোভাবে আবদ্ধ থাকিয়া তাঁহারই ইঙ্গিতে ভক্তসকলের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেছেন। শ্রীমতীর কামগন্ধহীন প্রেমের অনুরূপ বা তজ্জাতীয় প্রেমলাভ না হইলে কেহ কখন ঈশ্বরকে পতিভাবে লাভ করিতে এবং মধুরভাবের পূর্ণ মাধুর্য উপলব্ধি করিতে পারিবে না, ভক্তিশাস্ত্রের পূর্বোক্ত কথার ইহাই অভিপ্রায়, একথা বুঝিতে পারা যায়।

শ্রীমতীর প্রেম সম্বন্ধে ভক্তিশাস্ত্রের কথা

ঠাকুরের মধুরভাব-সাধন

ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমের দিব্য মহিমা, মায়ারহিতবিগ্রহ পরমহংসাগ্রণী শ্রীশুকদেবপ্রমুখ আত্মারাম মুনিসকলের দ্বারা বহুশঃ গীত হইলেও, ভারতের জনসাধারণ উহা কিরূপে জীবনে উপলব্ধি করিতে হইবে, তাহা বহুকাল পর্যন্ত বুঝিতে পারে নাই। গৌড়ীয় গোস্বামিপাদগণ বলেন, উহা বুঝাইবার জন্য শ্রীভগবানকে শ্রীমতীর সহিত মিলিত হইয়া একাধারে বা একশরীরাবলম্বনে পুনরায় অবতীর্ণ হইতে হইয়াছিল। অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌররূপে প্রকাশিত শ্রীগৌরাঙ্গদেবই মধুরভাবের প্রেমাদর্শ প্রতিষ্ঠা করিতে আবির্ভূত শ্রীভগবানের ঐ অপূর্ব বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে রাধারাণীর শরীরমনে যেসকল লক্ষণ প্রকাশিত হইত, পুংশরীরধারী হইলেও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সেই সমস্ত লক্ষণ ঈশ্বরপ্রেমের প্রাবল্যে আবির্ভূত হইতে দেখিয়াই গোস্বামিগণ তাঁহাকে শ্রীমতী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছিলেন। অতএব শ্রীগৌরাঙ্গদেব যে অতীন্দ্রিয় প্রেমাদর্শের দ্বিতীয় দৃষ্টান্তস্থল, একথা বুঝা যায়।

শ্রীমতীর অতীন্দ্রিয় প্রেমের কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেবের আগমন

শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণদর্শন অসম্ভব জানিয়া ঠাকুর এখন তদ্গতচিত্তে তাঁহার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমঘনমূর্তির স্মরণ, মনন ও ধ্যানে নিরন্তর মগ্ন হইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে হৃদয়ের আকুল আবেগ অবিরাম নিবেদন করিয়াছিলেন। ফলে, অচিরেই তিনি শ্রীমতী রাধারাণীর দর্শনলাভে কৃতার্থ হইয়াছিলেন। অন্যান্য দেব-দেবীসকলের দর্শনকালে ঠাকুর ইতিপূর্বে যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এই দর্শনকালেও সেইরূপে ঐ মূর্তি নিজাঙ্গে

ঠাকুরের শ্রীমতী রাধিকার উপাসনা ও দর্শনলাভ

সম্মিলিত হইয়া গেল, এইরূপ অনুভব করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে সর্বস্বহারা সেই নিরুপম পবিত্রোজ্জ্বল মূর্তির মহিমা ও মাধুর্য বর্ণনা করা অসম্ভব। শ্রীমতীর অঙ্গকান্তি নাগকেশরপুষ্পের কেশরসকলের ন্যায় গৌরবর্ণ দেখিয়াছিলাম।"

ঠাকুরের আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া অনুভব ও তাহার কারণ

উক্ত দর্শনের পর হইতে ঠাকুর কিছুকালের জন্য আপনাকে শ্রীমতী বলিয়া নিরন্তর উপলব্ধি করিয়াছিলেন। শ্রীমতী রাধারাণীর শ্রীমূর্তি ও চরিত্রের গভীর অনুধ্যানে আপন পৃথগস্তিত্ববোধ এককালে হারাইয়াই তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। সুতরাং একথা নিশ্চয় বলিতে পারা যায় যে, তাঁহার মধুরভাবোত্থ ঈশ্বর এখন পরিবর্ধিত হইয়া শ্রীমতী রাধারাণীর প্রেমানুরূপ সুগভীর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফলেও ঐরূপ দেখা গিয়াছিল। কারণ পূর্বোক্ত দর্শনের পর হইতে শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীগৌরাঙ্গদেবের ন্যায় তাঁহাতেও মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাপ্রসূত মহাভাবের সর্বপ্রকার লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছিল। গোস্বামিপাদগণের গ্রন্থে মহাভাবে প্রকাশিত শারীরিক লক্ষণ-সকলের কথা লিপিবদ্ধ আছে। বৈষ্ণবতন্ত্রনিপুণা ভৈরবী ব্রাহ্মণী এবং পরে বৈষ্ণবচরণাদি শাস্ত্রজ্ঞ সাধকেরা ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে মহাভাবের প্রেরণায় ঐসকল লক্ষণের আবির্ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া তাঁহাকে হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও পূজা অর্পণ করিয়াছিলেন। মহাভাবের উল্লেখ করিয়া ঠাকুর আমাদিগকে বহুবার বলিয়াছিলেন—"উনিশ প্রকারের ভাব একাধারে প্রকাশিত হইলে তাহাকে মহাভাব বলে, একথা ভক্তিশাস্ত্রে আছে। সাধন করিয়া এক একটা ভাবে সিদ্ধ হইতেই লোকের জীবন কাটিয়া যায়! (নিজ শরীর

দেখাইয়া) এখানে একাধারে একত্র ঐপ্রকার উনিশটি ভাবের পূর্ণ প্রকাশ।"*

প্রকৃতিভাবে ঠাকুরের শরীরের অদ্ভুত পরিবর্তন

শ্রীকৃষ্ণবিরহের দারুণ যন্ত্রণায় ঠাকুরের শরীরের প্রতি লোমকূপ হইতে রক্তনির্গমনের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি—উহা মহাভাবের পরাকাষ্ঠায় এইকালেই সজ্ঘটিত হইয়াছিল। প্রকৃতি ভাবিতে ভাবিতে তিনি এইকালে এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, স্বপ্নে বা ভ্রমেও কখন আপনাকে পুরুষ বলিয়া ভাবিতে পারিতেন না এবং স্ত্রীশরীরের ন্যায় কার্যকলাপে তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় স্বতঃই প্রবৃত্ত

* শ্রীজীব গোস্বামী প্রভৃতি বৈষ্ণবাচার্যগণ রাগাত্মিকা ভক্তির নিম্নলিখিত বিভাগ নির্দেশ করিয়াছেন—
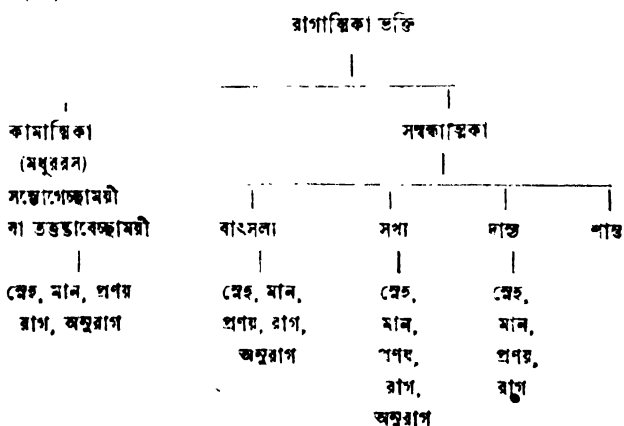
মহাভাবে কামাত্মিকা এবং সম্বন্ধাত্মিকা, উভয় প্রকার ভক্তির পূর্বোল্লিখিত ঊনবিংশ প্রকার অন্তর্ভাবের একত্র সমাবেশ হয়। ঠাকুর এখানে উহাই নির্দেশ করিয়াছেন।

হইত! আমরা তাঁহার নিজমুখে শ্রবণ করিয়াছি—স্বাধিষ্ঠানচক্রের অবস্থান-প্রদেশের রোমকূপসকল হইতে তাঁহার এইকালে প্রতিমাসে নিয়মিত সময়ে বিন্দু বিন্দু শোণিত-নির্গমন হইত এবং স্ত্রী শরীরের ন্যায় প্রতিবারই উপর্যুপরি দিবসত্রয় ঐরূপ হইত! তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়নাথ আমাদিগকে বলিয়াছেন—তিনি উহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন এবং পরিহিত বস্ত্র দুষ্ট হইবার আশঙ্কায় ঠাকুরকে উহার জন্য এইকালে কৌপীন ব্যবহার করিতেও দেখিয়াছেন!

মানসিক ভাবের প্রাবল্যে তাঁহার শারীরিক ঐরূপ পরিবর্তন দেখিয়া বুঝা যায়, 'মন সৃষ্টি করে এ শরীর'

বেদান্তশাস্ত্রের শিক্ষা—মানবের মন তাহার শরীরকে বর্তমান আকারে পরিণত করিয়াছে—'মন সৃষ্টি করে এ শরীর' এবং তীব্র ইচ্ছা বা বাসনা-সহায়ে তাহার জীবনের প্রতি মুহূর্তে উহাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতনভাবে গঠিত করিতেছে। শরীরের উপর মনের ঐরূপ প্রভুত্বের কথা শুনিলে আমরা বুঝিতে ও ধারণা করিতে সমর্থ হই না। কারণ যেরূপ তীব্র বাসনা উপস্থিত হইলে মন অন্য সকল বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বিষয়-বিশেষে কেন্দ্রীভূত হয় এবং অপূর্ব শক্তি প্রকাশ করে, সেইরূপ তীব্র বাসনা আমরা কোন বিষয় লাভ করিবার জন্যই অনুভব করি না। বিষয়বিশেষ উপলব্ধি করিবার তীব্র বাসনায় ঠাকুরের শরীর স্বল্পকালে ঐরূপে পরিবর্তিত হওয়ায় বেদান্তের পূর্বোক্ত কথা সবিশেষ প্রমাণিত হইতেছে, একথা বলা বাহুল্য। পদ্মলোচনাদি প্রসিদ্ধ পণ্ডিতেরা ঠাকুরের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল শ্রবণপূর্বক বেদপুরাণাদিতে লিপিবদ্ধ পূর্বপূর্ব যুগের সিদ্ধ ঋষিকুলের উপলব্ধিসকলের সহিত মিলাইতে যাইয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার উপলব্ধিসকল বেদপুরাণকে অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর

হইয়াছে!" মানসিক ভাবের প্রাবল্যে ঠাকুরের শারীরিক পরিবর্তন-সকলের অনুশীলনে তদ্রূপ স্তম্ভিত হইয়া বলিতে হয়,—তাঁহার শারীরিক বিকারসমূহ শারীরিক জ্ঞানরাজ্যের সীমা অতিক্রমপূর্বক উহাতে অপূর্ব যুগান্তর উপস্থিত করিবার সূচনা করিয়াছে।

সে যাহা হউক, ঠাকুরের পতিভাবে ঈশ্বরপ্রেম এখন পরিশুদ্ধ ও ঘনীভূত হওয়াতেই তিনি পূর্বোক্ত প্রকারে ব্রজেশ্বরী শ্রীমতী রাধারাণীর কৃপা অনুভব করিয়াছিলেন এবং ঐ প্রেমের প্রভাবে স্বল্পকাল পরেই সচ্চিদানন্দ-ঘন-বিগ্রহ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুণ্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। দৃষ্ট মূর্তি অন্য সকলের ন্যায় তাঁহার শ্রীঅঙ্গে মিলিত হইয়াছিল। ঐ দর্শনলাভের দুই তিন মাস পরে পরমহংস শ্রীমৎ তোতাপুরী আসিয়া তাঁহাকে বেদান্তপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অতএব বুঝা যাইতেছে, মধুরভাব-সাধনায় সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর কিছুকাল ঐ ভাবসহায়ে ঈশ্বরসম্ভোগে কালযাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি—ঐকালে শ্রীকৃষ্ণচিন্তায় এককালে তন্ময় হইয়া তিনি নিজ পৃথক অস্তিত্ববোধ হারাইয়া কখন আপনাকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন, আবার কখন আব্রহ্মস্তম্ব পর্যন্ত সকলকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ বলিয়া দর্শন করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার নিকটে যখন আমরা গমনাগমন করিতেছি, তখন তিনি একদিন বাগান হইতে একটি ঘাসফুল সংগ্রহ করিয়া হর্ষোৎফুল্লবদনে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "তখন তখন (মধুরভাব-সাধনকালে) যে কৃষ্ণমূর্তি দেখিতাম, তাঁহার অঙ্গের এইরকম রং ছিল।"

ঠাকুরের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ

অন্তরস্থ প্রকৃতিভাবের প্রেরণায় যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে

একপ্রকার বাসনার উদয় হইত। ব্রজগোপীগণ স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া প্রেমে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে লাভ করিয়াছিলেন জানিয়া ঠাকুরের মনে হইত, তিনি যদি স্ত্রীশরীর লইয়া জন্মগ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে গোপিকাদিগের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণকে ভজনা ও লাভ করিয়া ধন্য হইতেন। ঐরূপে নিজ পুরুষশরীরকে শ্রীকৃষ্ণলাভের পথের অন্তরায় বলিয়া বিবেচনা করিয়া তিনি তখন কল্পনা করিতেন যে, যদি আবার ভবিষ্যতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তবে ব্রাহ্মণের ঘরের পরমাসুন্দরী দীর্ঘকেশী বালবিধবা হইবেন এবং শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও পতি বলিয়া জানিবেন না। মোটা ভাত কাপড়ের মত কিছু সংস্থান থাকিবে, কুঁড়েঘরের পার্শ্বে দুই এক কাঠা জমি থাকিবে—যাহাতে নিজ হস্তে দুই পাঁচ প্রকার শাকশবজি উৎপন্ন করিতে পারিবেন, এবং তৎসঙ্গে একজন বৃদ্ধা অভিভাবিকা, একটি গাভী—যাহাকে তিনি স্বহস্তে দোহন করিতে পারিবেন, এবং একখানি সূতা কাটিবার চরকা থাকিবে। বালকের কল্পনা আরও অধিক অগ্রসর হইয়া ভাবিত, দিনের বেলা গৃহকর্ম সমাপন করিয়া ঐ চরকায় সূতা কাটিতে কাটিতে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক সঙ্গীত করিবে এবং সন্ধ্যার পর ঐ গাভীর দুগ্ধে প্রস্তুত মোদকাদি গ্রহণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণকে স্বহস্তে খাওয়াইবার নিমিত্ত গোপনে ব্যাকুল ক্রন্দন করিতে থাকিবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও উহাতে প্রসন্ন হইয়া গোপবালকবেশে সহসা আগমন করিয়া ঐসকল গ্রহণ করিবেন এবং অপরের অগোচরে ঐরূপে তাঁহার নিকটে নিত্য গমনাগমন করিতে থাকিবেন। ঠাকুরের মনের ঐ বাসনা ঐভাবে পূর্ণ না হইলেও, মধুরভাব-সাধনকালে পূর্বোক্ত প্রকারে সিদ্ধ হইয়াছিল।

যৌবনের প্রারম্ভে ঠাকুরের মনে প্রকৃতি হইবার বাসনা

'ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিন এক, এক তিন,' রূপ দর্শন

মধুরভাবে অবস্থানকালে ঠাকুরের আর একটি দর্শনের কথা এখানে লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা বর্তমান বিষয়ের উপসংহার করিব। ঐকালে বিষ্ণুমন্দিরের সম্মুখস্থ দালানে বসিয়া তিনি একদিন শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ শুনিতেছিলেন। শুনিতে শুনিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জ্যোতির্ময় মূর্তির সন্দর্শন লাভ করিলেন। পরে দেখিতে পাইলেন, ঐ মূর্তির পাদপদ্ম হইতে দড়ার মত একটা জ্যোতি বহির্গত হইয়া প্রথমে ভাগবতগ্রন্থকে স্পর্শ করিল এবং পরে তাঁহার নিজ বক্ষঃস্থলে সংলগ্ন হইয়া ঐ তিন বস্তুকে একত্র কিছুকাল সংযুক্ত করিয়া রাখিল।

ঠাকুর বলিতেন—ঐরূপ দর্শন করিয়া তাঁহার মনে দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান তিনপ্রকার ভিন্নরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও এক পদার্থ বা এক পদার্থের প্রকাশসম্ভূত। "ভাগবত (শাস্ত্র), ভক্ত ও ভগবান—তিন এক, এক তিন!"

পঞ্চদশ অধ্যায়

ঠাকুরের বেদান্তসাধন

মধুরভাবসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর এখন ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপস্থিত হইলেন। অতএব তাঁহার অপূর্ব সাধনকথা অতঃপর লিপিবদ্ধ করিবার পূর্বে, তাঁহার এইকালের মানসিক অবস্থার কথা একবার আলোচনা করা ভাল।

আমরা দেখিয়াছি, কোনরূপ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইতে হইলে সাধকের সংসারের রূপরসাদি ভোগ্যবিষয়সমূহকে দূরে পরিহার করিয়া উহা অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সিদ্ধভক্ত তুলসীদাস যে বলিয়াছেন, 'যাঁহা রাম তাঁহা কাম* নেহি'†—একথা বাস্তবিকই সত্য। ঠাকুরের অদৃষ্টপূর্ব সাধনেতিহাস ঐ বিষয়ে সম্পূর্ণ সাক্ষ্য প্রদান করে।

ঠাকুরের এই কালের মানসিক অবস্থার আলোচনা (১) কাম-কাঞ্চনত্যাগে দৃঢ়প্রতিষ্ঠা

কামকাঞ্চনত্যাগরূপ ভিত্তির উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়াই তিনি ভাব-সাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং ঐ ভিত্তি কখনও তিলমাত্র পরিত্যাগ করেন নাই বলিয়া তিনি যখন যে ভাবসাধনে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, অতি

---

* সকাম কর্ম

† যাঁহা রাম তাঁহা কাম নেহি,
যাঁহা কাম তাঁহা নেহি রাম।
দুঁহু একসাথ মিলত নেহি,
রবি রজনী এক ঠাম॥
—তুলসীদাস-কৃত দোঁহা

স্বল্পকালেই তাহা নিজ জীবনে আয়ত্ত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতএব কামকাঞ্চনের প্রলোভন-ভূমির সীমা বহুদূর পশ্চাতে রাখিয়া তাঁহার মন যে এখন নিরন্তর অবস্থান করিত, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়।

(২) নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক ও ইহামুত্রফলভোগে বিরাগ

বিষয়কামনা ত্যাগপূর্বক নয় বৎসর নিরন্তর ঈশ্বরলাভে সচেষ্ট থাকায় অভ্যাসযোগে তাঁহার মন এখন এমন এক অবস্থায় উপনীত হইয়াছিল যে, ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন বিষয়ের স্মরণ মনন করা উহার নিকট বিষবৎ বলিয়া প্রতীত হইত। কায়-মনোবাক্যে ঈশ্বরকেই সারাৎসার পরাৎপর বস্তু বলিয়া সর্বতোভাবে ধারণা করায় উহা ইহকালে বা পরকালে তদতিরিক্ত অপর কোন বস্তুলাভে এককালে উদাসীন ও স্পৃহাশূন্য হইয়াছিল।

(৩) শমদমাদি ষট্ সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব

রূপরসাদি বাহ্যবিষয়সকল এবং শরীরের সুখদুঃখাদি বিস্মৃত হইয়া অভীষ্ট বিষয়ের একাগ্র ধ্যানে তাঁহার মন এখন এতদূর অভ্যস্ত হইয়াছিল যে, সামান্য আয়াসেই উহা সম্পূর্ণরূপে সমাহৃত হইয়া লক্ষ্য বিষয়ে তন্ময় হইয়া আনন্দানুভব করিত। দিন, মাস ও বৎসর একে একে অতিক্রান্ত হইলেও উহার ঐ আনন্দের কিছুমাত্র বিরাম হইত না এবং ঈশ্বর ভিন্ন জগতে অপর কোন লব্ধব্য বস্তু আছে বা থাকিতে পারে, এ চিন্তার উদয় উহাতে ক্ষণেকের জন্যও উপস্থিত হইত না।

পরিশেষে ঠাকুরের মনে জগৎকারণের প্রতি 'গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ' বলিয়া একান্ত অনুরাগ, বিশ্বাস ও নির্ভরতার এখন সীমা ছিল না। উহাদিগের সহায়ে তিনি যে এখন আপনাকে তাঁহার সহিত সপ্রেম সম্বন্ধে কেবলমাত্র নিত্যযুক্ত দেখিতেন

তাহা নহে, কিন্তু মাতার প্রতি বালকের ন্যায় ঈশ্বরের প্রতি একান্ত অনুরাগে সাধক যে তাঁহাকে সর্বদা নিজ সকাশে দেখিতে পায়, তাঁহার মধুর বাণী সর্বদা কর্ণগোচর করিয়া কৃতকৃতার্থ হয় এবং তাঁহার প্রবল হস্ত দ্বারা রক্ষিত হইয়া সংসারপথে সতত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে সমর্থ হয়—একথার বহুশঃ প্রমাণ পাইয়া তাঁহার মন জীবনের ক্ষুদ্র বৃহৎ সকল কার্য শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশে ও ইঙ্গিতে নির্ভয়ে অনুষ্ঠান করিতে এখন সম্পূর্ণরূপে অভ্যস্ত হইয়াছিল।

(৪) ঈশ্বরনির্ভরতা ও দর্শনজন্য ভয়শূন্যতা

প্রশ্ন উঠিতে পারে—জগৎকারণকে ঐরূপে স্নেহময়ী মাতার ন্যায় সর্বদা নিজ সমীপে পাইয়া ঠাকুর আবার সাধনপথে নিযুক্ত হইয়াছিলেন কেন? যাঁহাকে লাভ করিবার জন্য সাধকের যোগ-তপস্যাদি সাধনের অনুষ্ঠান, তাঁহাকেই যদি পরম আত্মীয়রূপে প্রাপ্ত হইলাম, তবে আবার সাধন কিসের জন্য? ঐ কথার উত্তর আমরা পূর্বে একভাবে করিয়া আসিলেও তৎসম্বন্ধে অন্য একভাবে এখন দুই-চারিটি কথা বলিব। ঠাকুরের শ্রীপদপ্রান্তে বসিয়া তাঁহার সাধনেতিহাস শুনিতে শুনিতে আমাদিগের মনে একদিন ঐরূপ প্রশ্নের উদয় হইয়াছিল এবং উহা প্রকাশ করিতেও সঙ্কুচিত হই নাই। তদুত্তরে তিনি তখন আমাদিগকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই এখানে বলিব। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "সমুদ্রের তীরে যে ব্যক্তি সর্বদা বাস করে, তাহার মনে যেমন কখন কখন বাসনার উদয় হয়—রত্নাকরের গর্ভে কত প্রকার রত্ন আছে তাহা দেখি, তেমনি মাকে পাইয়া এবং মার কাছে সর্বদা থাকিয়াও আমার তখন মনে হইত, অনন্তভাবময়ী অনন্তরূপিণী তাঁহাকে নানাভাবে

ঈশ্বর দর্শনের পরেও ঠাকুর কেন সাধন করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে তাঁহার কথা

ও নানারূপে দেখিব। বিশেষ কোন ভাবে তাঁহাকে দেখিতে ইচ্ছা হইলে উহার জন্য তাঁহাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিতাম। কৃপাময়ী মাও তখন তাঁহার ঐ ভাব দেখিতে বা উপলব্ধি করিতে যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা যোগাইয়া এবং আমার দ্বারা করাইয়া লইয়া সেই ভাবে দেখা দিতেন। ঐরূপেই ভিন্ন ভিন্ন মতের সাধন করা হইয়াছিল।”

পূর্বে বলিয়াছি, মধুরভাবে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুর ভাবসাধনের চরম ভূমিতে উপনীত হইয়াছিলেন। উহার পরেই ঠাকুরের মনে সর্বভাবাতীত বেদান্তপ্রসিদ্ধ অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবল প্রেরণা আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতে ঐ প্রেরণা তাঁহার জীবনে কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল এবং কিরূপেই বা তিনি এখন শ্রীশ্রীজগন্মাতার নির্গুণ নিরাকার নির্বিকল্প তুরীয় রূপের সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাহাই এখন আমরা পাঠককে বলিতে প্রবৃত্ত হইব।

ঠাকুর যখন অদ্বৈতভাবসাধনে প্রবৃত্ত হন, তখন তাঁহার বৃদ্ধা মাতা দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে অবস্থান করিতেছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকুমারের মৃত্যু হইলে, শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা অপর দুইটি পুত্রের মুখ চাহিয়া কোনরূপে বুক বাঁধিয়া ছিলেন। কিন্তু অনতিকাল পরে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর পাগল হইয়াছে বলিয়া লোকে যখন রটনা করিতে লাগিল, তখন তাঁহার দুঃখের আর অবধি রহিল না। পুত্রকে গৃহে আনাইয়া নানা চিকিৎসা ও শান্তিস্বস্ত্যয়নাদির অনুষ্ঠানে তাঁহার ঐ ভাবের যখন কথঞ্চিৎ উপশম হইল, তখন বৃদ্ধা আবার আশায় বুক বাঁধিয়া তাহার বিবাহ দিলেন। কিন্তু বিবাহের পর দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়া গদাধরের ঐ অবস্থা আবার যখন উপস্থিত হইল, তখন

ঠাকুরের জননীর গঙ্গাতীরে বাস করিবার সংকল্প এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমন

বৃদ্ধা আর আপনাকে সামলাইতে পারিলেন না—পুত্রের আরোগ্য-কামনায় হত্যা দিয়া পড়িয়া রহিলেন। পরে মহাদেবের প্রত্যাদেশে পুত্রের দিব্যোন্মাদ হইয়াছে জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্তা হইলেও তিনি উহার অনতিকাল পরে সংসারে বীতরাগ হইয়া দক্ষিণেশ্বরে পুত্রের নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং জীবনের অবশিষ্ট কাল ভাগীরথীতীরে যাপন করিবেন বলিয়া দৃঢ়সংকল্প করিলেন। কারণ, যাহাদের জন্য এবং যাহাদের লইয়া তাঁহার সংসার করা, তাহারাই যদি একে একে সংসার ও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিল, তবে বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার আর উহাতে লিপ্ত থাকিবার প্রয়োজন কি? শ্রীযুত মথুরের অন্নমেরু-অনুষ্ঠানের কথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। ঠাকুরের মাতা ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং এখন হইতে দ্বাদশবৎসরান্তে তাঁহার শরীরত্যাগের কালের মধ্যে তিনি কামারপুকুরে পুনর্বার আগমন করেন নাই। অতএব ঠাকুরের জটাধারী বাবাজীর নিকট হইতে 'রাম'-মন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণ এবং মধুরভাব ও বেদান্তভাব প্রভৃতির সাধন যে তাঁহার মাতার দক্ষিণেশ্বর অবস্থানকালে হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ঠাকুরের মাতার উদার হৃদয়ের পরিচায়ক একটি ঘটনা আমরা পাঠককে এখানে বলিতে চাহি। ঘটনাটি তাঁহার দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরেই উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বে বলিয়াছি, ঐকালে কালীবাটীতে মথুরবাবুর অক্ষুণ্ণ প্রভাব ছিল এবং মুক্তহস্ত হইয়া তিনি নানা সৎকার্যের অনুষ্ঠান ও প্রভূত অন্নদান করিতেছিলেন। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভালবাসা ও ভক্তির অবধি না থাকায় তিনি ঠাকুরের শারীরিক সেবার যাহাতে কোনকালে ত্রুটি না হয়, তদ্বিষয়ে বন্দোবস্ত করিয়া দিবার

ঠাকুরের জননীর লোভরাহিত্য

জন্য ভিতরে ভিতরে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন ; কিন্তু ঠাকুরের কঠোর ত্যাগশীলতা দেখিয়া তাঁহাকে ঐ কথা মুখ ফুটিয়া বলিতে এপর্যন্ত সাহসী হন নাই। তাঁহার শ্রবণগোচর হয়, এরূপ স্থলে দাঁড়াইয়া তিনি ইতিপূর্বে একদিন ঠাকুরের নামে একখানি তালুক লেখাপড়া করিয়া দিবার পরামর্শ হৃদয়ের সহিত করিতে যাইয়া বিষম অনর্থে পতিত হইয়াছিলেন। কারণ, ঐকথা কর্ণগোচর হইবামাত্র ঠাকুর উন্মত্তপ্রায় হইয়া 'শালা, তুই আমাকে বিষয়ী করতে চাস্' বলিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে ধাবিত হইয়াছিলেন। সুতরাং মনে জাগরূক থাকিলেও মথুর নিজ অভিপ্রায় সম্পাদনের কোনরূপ সুযোগলাভ করেন নাই। ঠাকুরের মাতার আগমনে তিনি এখন সুযোগ বুঝিয়া বৃদ্ধা চন্দ্রাদেবীকে পিতামহী সম্বোধনে আপ্যায়িত করিলেন এবং প্রতিদিন তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার সহিত নানা কথার আলোচনা করিতে করিতে ক্রমে ক্রমে তাঁহার বিশেষ স্নেহের পাত্র হইয়া উঠিলেন। পরে অবসর বুঝিয়া একদিন তাঁহাকে ধরিয়া বসিলেন— "ঠাকুরমা, তুমি ত আমার নিকট হইতে কখন কিছু সেবা গ্রহণ করিলে না? তুমি যদি যথার্থই আমাকে আপনার বলিয়া ভাব, তাহা হইলে আমার নিকট হইতে তোমার যাহা ইচ্ছা চাহিয়া লও।" সরলহৃদয়া বৃদ্ধা মথুরের ঐরূপ কথায় বিশেষ বিপন্না হইলেন। কারণ, ভাবিয়া চিন্তিয়া কোন বিষয়ের অভাব অনুভব করিলেন না। সুতরাং কি চাহিয়া লইবেন, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহাকে বলিতে হইল— "বাবা, তোমার কল্যাণে আমার ত এখন কোন বিষয়ের অভাব নাই, যখন কোন জিনিসের আবশ্যক বুঝিব তখন চাহিয়া লইব।" এই বলিয়া বৃদ্ধা আপনার পেঁট্‌রা খুলিয়া মথুরকে বলিলেন—"দেখিবে, এই দেখ, আমার এত পরিবার কাপড় রহিয়াছে! আর তোমার কল্যাণে

এখানে খাবার ত কোন কষ্টই নাই, সকল বন্দোবস্তই ত তুমি করিয়া দিয়াছ ও দিতেছ ; তবে আর কি চাহি, বল ?” মথুর কিন্তু ছাড়িবার পাত্র নহেন, ‘যাহা ইচ্ছা কিছু লও’ বলিয়া বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরের জননীর একটি অভাবের কথা মনে পড়িল ; তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন—“যদি নেহাত দেবে, তবে আমার এখন মুখে দিবার গুলের অভাব, এক আনার দোক্তা তামাক কিনিয়া দাও।” বিষয়ী মথুরের ঐকথায় চক্ষে জল আসিল। তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন—“এমন মা না হইলে কি অমন ত্যাগশীল পুত্র হয়!” এই বলিয়া বৃদ্ধার অভিপ্রায়মত দোক্তা তামাক আনাইয়া দিলেন।

হলধারীর কর্মত্যাগ ও অক্ষয়ের আগমন

ঠাকুরের বেদান্তসাধনে নিযুক্ত হইবার কালে তাঁহার পিতৃব্যপুত্র হলধারী দক্ষিণেশ্বর-দেবালয়ে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীউর সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া এবং ভাগবতাদি গ্রন্থে তাঁহার সামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল বলিয়া তিনি অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া কখন কখন ঠাকুরকে কিরূপে শ্লেষ করিতেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শন ও অবস্থাসমূহকে মস্তিষ্কের বিকার-প্রসূত বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন এবং ঠাকুর তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ঐকথা নিবেদন করিয়া কিরূপে বারংবার আশ্বস্ত হইতেন—সেসকল কথা আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিয়াছি। হলধারীর তীব্র শ্লেষপূর্ণ বাক্যে তিনি এক সময়ে বিষণ্ণ হইলে ভাবাবেশে এক সৌম্য মূর্তির দর্শন ও ‘ভাবমুখে থাক’ বলিয়া প্রত্যাদেশ লাভ করিয়াছিলেন। বোধ হয় ঐ দর্শন ঠাকুরের বেদান্ত-সাধনে নিযুক্ত হইবার কিছু পূর্বে ঘটিয়াছিল এবং মধুরভাবসাধনের সময়

তাঁহাকে স্ত্রীবেশ ধারণপূর্বক রমণীর স্থায় থাকিতে দেখিয়াই হলধারী তাঁহাকে আত্মজ্ঞানবিহীন বলিয়া ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। পরমহংস পরিব্রাজক শ্রীমদাচার্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও অবস্থানের সময় হলধারী কালীবাটীতে ছিলেন এবং সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত একত্রে শাস্ত্রচর্চা করিতেন, একথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। শ্রীমৎ তোতা ও হলধারীর ঐরূপে অধ্যাত্মরামায়ণ-চর্চাকালে ঠাকুর একদিন জায়া ও অনুজ লক্ষ্মণসহ ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দিব্যদর্শন-লাভ করিয়াছিলেন। শ্রীমৎ তোতা সম্ভবতঃ সন ১২৭১ সালের শেষভাগে দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করিয়াছিলেন। এ ঘটনার কয়েক মাস পরে শারীরিক অসুস্থতাদি নিবন্ধন হলধারী কালীবাটীর কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ করেন এবং ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র অক্ষয় তাঁহার স্থলে নিযুক্ত হয়েন।

ভাবসমাধিতে সিদ্ধ ঠাকুরের অদ্বৈত-ভাবসাধনে প্রবৃত্ত হইবার কারণ

ভক্তের স্বভাব—তাঁহারা সাযুজ্য বা নির্বাণ মুক্তিলাভে কখন প্রয়াসী হন না। শান্তদাস্যাদি ভাববিশেষ অবলম্বনপূর্বক ঈশ্বরের প্রেমের মহিমা ও মাধুর্য সম্ভোগ করিতেই তাঁহারা সর্বদা সচেষ্ট থাকেন। দেবীভক্ত শ্রীরামপ্রসাদের 'চিনি হওয়া ভাল নয়, মা, চিনি খেতে ভালবাসি'-রূপ কথা ভক্তহৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস বলিয়া সর্বকালপ্রসিদ্ধ আছে। অতএব ভাবসাধনের পরাকাষ্ঠায় উপনীত হইয়া ঠাকুরের ভাবাতীত অদ্বৈতাবস্থালাভের জন্য প্রয়াস অনেকের বিসদৃশ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইতে পারে। কিন্তু ঐরূপ ভাবিবার পূর্বে আমাদিগের স্মরণ করা কর্তব্য যে, ঠাকুর স্বপ্রণোদিত হইয়া এখন আর কোন কার্যের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ ছিলেন না। জগদম্বার বালক ঠাকুর এখন তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া তাঁহারই মুখ চাহিয়া সর্বদা অবস্থান করিতে-

ছিলেন এবং তিনি তাঁহাকে যেভাবে যখন ঘুরাইতে ফিরাইতেছিলেন, সেইভাবেই তখন পরমানন্দে অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতাও ঐ কারণে তাঁহার সম্পূর্ণ ভার গ্রহণপূর্বক নিজ উদ্দেশ্যবিশেষ সাধনের জন্য ঠাকুরের অজ্ঞাতসারে তাঁহাকে অদৃষ্টপূর্ব অভিনব আদর্শে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। সর্বপ্রকার সাধনের অন্তে ঠাকুর জগদম্বার ঐ উদ্দেশ্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং উহা বুঝিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল মাতার সহিত প্রেমে এক হইয়া লোককল্যাণসাধনরূপ তাঁহার সুমহৎ দায়িত্ব আপনার বলিয়া অনুভবপূর্বক সানন্দে বহন করিয়াছিলেন।

মধুরভাবসাধনের পরে ঠাকুরের অদ্বৈতভাবসাধনের যুক্তিযুক্ততা আর একদিক দিয়া দেখিলে বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায়। ভাব ও ভাবাতীত রাজ্য পরস্পর কার্যকারণ সম্বন্ধে সর্বদা অবস্থিত। কারণ, ভাবাতীত অদ্বৈতরাজ্যের ভূমানন্দই সীমাবদ্ধ হইয়া ভাবরাজ্যের দর্শন-স্পর্শনাদি সম্ভোগানন্দরূপে প্রকাশিত রহিয়াছে। অতএব মধুরভাবে পরাকাষ্ঠা-লাভে ভাবরাজ্যের চরম ভূমিতে উপনীত হইবার পরে ভাবাতীত অদ্বৈত ভূমি ভিন্ন অন্য কোথায় আর তাঁহার মন অগ্রসর হইবে?

ভাবসাধনের চরমে অদ্বৈতভাবলাভের চেষ্টার যুক্তিযুক্ততা

শ্রীশ্রীজগদম্বার ইঙ্গিতেই যে ঠাকুর এখন অদ্বৈতভাবসাধনে অগ্রসর হইয়াছিলেন, একথা আমরা নিম্নলিখিত ঘটনায় সম্যক বুঝিতে পারিব—

শ্রীমৎ তোতাপুরীর আগমন

সাগরসঙ্গমে স্নান ও পুরুষোত্তমক্ষেত্রে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সাক্ষাৎ প্রকাশ দর্শন করিবেন বলিয়া পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ তোতা এইকালে মধ্যভারত হইতে যদৃচ্ছা ভ্রমণ করিতে করিতে বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন। পুণ্যতোয়া নর্মদাতীরে বহুকাল একান্তবাসপূর্বক সাধনভজনে নিমগ্ন থাকিয়া

তিনি ইতিপূর্বে নির্বিকল্পসমাধিপথে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন, একথার পরিচয় তথাকার প্রাচীন সাধুরা এখনও প্রদান করিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞ হইবার পরে তাঁহার মনে কিছুকাল যদৃচ্ছা পরিভ্রমণের সঙ্কল্প উদিত হয় এবং উহার প্রেরণায় তিনি পূর্বভারতে আগমনপূর্বক তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে ভ্রমণ করিতে থাকেন। আত্মারাম পুরুষদিগের সমাধি-ভিন্ন-কালে বাহ্যজগতের উপলব্ধি হইলেও উহাকে ব্রহ্ম বলিয়া অনুভব হইয়া থাকে। মায়াকল্পিত জগদন্তর্গত বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি দেশ, কাল ও পদার্থে উচ্চাবচ ব্রহ্মপ্রকাশ উপলব্ধি করিয়া তাঁহারা ঐকালে দেবস্থান, তীর্থ ও সাধুদর্শনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। অতএব ব্রহ্মজ্ঞ তোতার তীর্থদর্শনে প্রবৃত্ত হওয়া বিচিত্র নহে। পূর্বোক্ত তীর্থদ্বয়-দর্শনান্তে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ফিরিবার কালে তিনি দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। তিন দিবসের অধিক কাল একস্থানে যাপন করা তাঁহার নিয়ম ছিল না। ঐজন্য কালীবাটীতে তিনি দিবসত্রয় মাত্র অতিবাহিত করিবেন স্থির করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার জ্ঞানের মাত্রা সম্পূর্ণ করিয়া দিবেন বলিয়া এবং তাঁহার দ্বারা নিজ বালককে বেদান্ত সাধন করাইবেন বলিয়া যে তাঁহাকে এখানে আনয়ন করিয়াছেন, একথা তাঁহার তখন হৃদয়ঙ্গম হয় নাই।

ঠাকুর ও তোতাপুরীর প্রথম সম্ভাষণ এবং ঠাকুরের বেদান্তসাধন-বিষয়ে প্রত্যাদেশলাভ

কালীবাটীতে আগমন করিয়া তোতাপুরী প্রথমেই ঘাটের সুবৃহৎ চাঁদনীতে আসিয়া উপস্থিত হন। ঠাকুর তখন তথায় অন্যমনে একপার্শ্বে বসিয়াছিলেন। তাঁহার তপোদীপ্ত ভাবোজ্জ্বল বদনের প্রতি দৃষ্টি পড়িবামাত্র শ্রীমৎ তোতা আকৃষ্ট হইলেন এবং প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, ইনি সামান্য পুরুষ নহেন—বেদান্তসাধনের এরূপ

উত্তমাধিকারী বিরল দেখিতে পাওয়া যায়। তন্ত্রপ্রাণ বঙ্গে বেদান্তের এরূপ অধিকারী আছে ভাবিয়া তিনি বিস্ময়ে অভিভূত হইলেন এবং ঠাকুরকে বিশেষরূপে নিরীক্ষণপূর্বক স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে উত্তম অধিকারী বলিয়া বোধ হইতেছে, তুমি বেদান্তসাধন করিবে ?"

জটাজুটধারী দীর্ঘবপু উলঙ্গ সন্ন্যাসীর ঐ প্রশ্নে ঠাকুর উত্তর করিলেন, "কি করিব না করিব, আমি কিছুই জানি না—আমার মা সব জানেন, তিনি আদেশ করিলে করিব।"

শ্রীমৎ তোতা—"তবে যাও, তোমার মাকে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। কারণ আমি এখানে দীর্ঘকাল থাকিব না।"

ঠাকুর ঐকথায় আর কোন উত্তর না করিয়া ধীরে ধীরে ৺জগদম্বার মন্দিরে উপস্থিত হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার বাণী শুনিতে পাইলেন—"যাও শিক্ষা কর, তোমাকে শিখাইবার জন্যই সন্ন্যাসীর এখানে আগমন হইয়াছে।"

অর্ধবাহ্যভাবাবিষ্ট ঠাকুর তখন হর্ষোৎফুল্লবদনে তোতাপুরী গোস্বামীর সমীপে আসিয়া তাঁহার মাতার ঐরূপ প্রত্যাদেশ নিবেদন করিলেন।

শ্রীশ্রীজগদম্বা সম্বন্ধে শ্রীমৎ তোতার যেরূপ ধারণা ছিল

মন্দিরাভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠিত ৺দেবীকেই ঠাকুর প্রেমে ঐরূপে মাতৃসম্বোধন করিতেছেন বুঝিয়া শ্রীমৎ তোতা তাঁহার বালকের ন্যায় সরল ভাবে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার ঐ প্রকার আচরণ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারনিবন্ধন বলিয়া ধারণা করিলেন। ঐরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহার অধরপ্রান্তে করুণা ও ব্যঙ্গমিশ্রিত হাস্যের ঈষৎ রেখা দেখা দিয়াছিল, একথা আমরা অনুমানি করিতে পারি। কারণ শ্রীমৎ তোতার তীক্ষ্ণবুদ্ধি বেদান্তোক্ত কর্মফলদাতা

ঈশ্বর ভিন্ন অপর কোন দেবদেবীর নিকট মস্তক অবনত করিত না এবং ব্রহ্মধ্যানপরায়ণ সংযত সাধকের ঐরূপ ঈশ্বরের অস্তিত্বমাত্রে শ্রদ্ধাপূর্ণ বিশ্বাস ভিন্ন কৃপাপ্রার্থী হইয়া তাঁহাকে ভক্তি ও উপাসনাদি করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিত না। আর ত্রিগুণময়ী ব্রহ্মশক্তি মায়া? —গোস্বামীজী উহাকে ভ্রমমাত্র বলিয়া ধারণা করিয়া উহার ব্যক্তিগত অস্তিত্ব স্বীকারের বা উহার প্রসন্নতার জন্য উপাসনার কোনরূপ আবশ্যকতা অনুভব করিতেন না। ফলতঃ অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য সাধকের পুরুষকার অবলম্বন ভিন্ন ঈশ্বর বা শক্তিসংযুক্ত ব্রহ্মের করুণা ও সহায়তা প্রার্থনার কিঞ্চিন্মাত্র সাফল্য তিনি প্রাণে অনুভব করিতেন না এবং যাহারা ঐরূপ করে, তাহারা ভ্রান্তসংস্কারবশতঃ করিয়া থাকে বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতেন।

সে যাহা হউক, তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হইয়া জ্ঞানমার্গের সাধনে প্রবৃত্ত হইলে ঠাকুরের মনের পূর্বোক্ত সংস্কার অচিরে দূর হইবে ভাবিয়া তোতা তাঁহাকে ঐ সম্বন্ধে আর কিছু এখন না বলিয়া অন্য কথার অবতারণা করিলেন এবং বলিলেন—বেদান্তসাধনে উপদিষ্ট ও প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে তাঁহাকে শিখাসূত্র পরিত্যাগপূর্বক যথাশাস্ত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে হইবে। ঠাকুর উহাতে স্বীকৃত হইতে কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন—গোপনে করিলে যদি হয়, তাহা হইলে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে তাঁহার কিছুমাত্র আপত্তি নাই। কিন্তু প্রকাশ্যে ঐরূপ করিয়া তাঁহার শোকসন্তপ্তা বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত প্রদান করিতে তিনি কিছুতেই সমর্থ হইবেন না। গোস্বামীজী উহাতে ঠাকুরের ঐরূপ অভিপ্রায়ের কারণ বুঝিতে পারিলেন এবং 'উত্তম কথা, শুভ মুহূর্ত

ঠাকুরের গুপ্তভাবে সন্ন্যাসগ্রহণের অভিপ্রায় ও উহার কারণ

উপস্থিত হইলে তোমাকে গোপনেই দীক্ষিত করিব' বলিয়া পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্বক আসন বিস্তীর্ণ করিলেন।

ঠাকুরের সন্ন্যাস-দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব কার্যসকল সম্পাদন

অনন্তর শুভদিনের উদয় জানিয়া শ্রীমৎ তোতা ঠাকুরকে পিতৃপুরুষগণের তৃপ্তির জন্য শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে আদেশ করিলেন এবং ঐ কার্য সমাধা হইলে শিষ্যের নিজ আত্মার তৃপ্তির জন্য যথাবিধানে পিণ্ডপ্রদান করাইলেন। কারণ সন্ন্যাস-দীক্ষাগ্রহণের সময় হইতে সাধক ভূরাদি সমস্ত লোকপ্রাপ্তির আশা ও অধিকার নিঃশেষে বর্জন করেন বলিয়া শাস্ত্র তাঁহাকে তৎপূর্বে আপন প্রেত-পিণ্ড আপনি প্রদান করিতে বলিয়াছেন।

ঠাকুর যখন যাঁহাকে গুরুপদে বরণ করিয়াছেন, তখন নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আত্মসমর্পণপূর্বক তিনি যেরূপ করিতে আদেশ করিয়াছেন, অসীম বিশ্বাসের সহিত তাহা অনুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব শ্রীমৎ তোতা তাঁহাকে এখন যেরূপ করিতে বলিতেছিলেন, তাহাই তিনি বর্ণে বর্ণে অনুষ্ঠান করিতেছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। শ্রাদ্ধাদি পূর্বক্রিয়া সমাপন করিয়া তিনি সংযত হইয়া রহিলেন এবং পঞ্চবটীস্থ নিজ সাধনকুটীরে গুরুনির্দিষ্ট দ্রব্যসকল আহরণ করিয়া সানন্দে শুভমুহূর্তের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রাত্রি-অবসানে শুভ ব্রাহ্মমুহূর্তের উদয় হইলে গুরু ও শিষ্য উভয়ে কুটীরে সমাগত হইলেন। পূর্বকৃত্য সমাপ্ত হইল, হোমাগ্নি প্রজ্বলিত হইল এবং ঈশ্বরার্থে সর্বস্ব-ত্যাগরূপ যে ব্রত সনাতন কাল হইতে—গুরুপরম্পরাগত হইয়া ভারতকে এখনও ব্রহ্মজ্ঞপদবীতে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছে, সেই ত্যাগব্রতাবলম্বনের পূর্বোচ্চার্য মন্ত্রসকলের পূত-গম্ভীর

ধ্বনিতে পঞ্চবটী-উপবন মুখরিত হইয়া উঠিল। পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর স্নেহসম্পূর্ণ কম্পিতবক্ষে সেই ধ্বনির সুখস্পর্শ যেন নূতন জীবনের সঞ্চার আনয়ন করিল এবং যুগযুগান্তরের অলৌকিক সাধক বহুকাল পরে আবার ভারতের এবং সমগ্র জগতের বহুজনহিতার্থ সর্বস্বত্যাগরূপ ব্রতাবলম্বন করিতেছেন—ঐ সংবাদ জানাইতেই ভাগীরথী যেন আনন্দকলগানে দিগন্তে প্রবাহিত হইতে লাগিলেন।

গুরু মন্ত্রপাঠে প্রবৃত্ত হইলেন, শিষ্য অবহিতচিত্তে তাঁহাকে অনুসরণপূর্বক সেইসকল কথা উচ্চারণ করিয়া সমিদ্ধ হুতাশনে আহুতিপ্রদানে প্রস্তুত হইলেন। প্রথমে প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারিত হইল—

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে প্রার্থনামন্ত্র

"পরব্রহ্মতত্ত্ব আমাকে প্রাপ্ত হউক। পরমানন্দলক্ষণোপেত বস্তু আমাকে প্রাপ্ত হউক। অখণ্ডৈকরস মধুময় ব্রহ্মবস্তু আমাতে প্রকাশিত হউক। হে ব্রহ্মবিদ্যাসহ নিত্য বর্তমান পরমাত্মন্! দেব-মনুষ্যাদি তোমার সমগ্র সন্তানগণের মধ্যে আমি তোমার বিশেষকরুণাযোগ্য বালক সেবক। হে সংসার-দুঃস্বপ্নহারিন্ পরমেশ্বর! দ্বৈত-প্রতিভারূপ আমার যাবতীয় দুঃস্বপ্ন বিনাশ কর। হে পরমাত্মন্! আমার যাবতীয় প্রাণবৃত্তি আমি নিঃশেষে তোমাতে আহুতি প্রদানপূর্বক ইন্দ্রিয়সকলকে নিরুদ্ধ করিয়া তদেকচিত্ত হইতেছি। হে সর্বপ্রেরক দেব! জ্ঞানপ্রতিবন্ধক যাবতীয় মলিনতা আমা হইতে বিদূরিত করিয়া অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনাদিরহিত তত্ত্বজ্ঞান যাহাতে আমাতে উপস্থিত হয়, তাহাই কর। সূর্য, বায়ু, নদীসকলের স্নিগ্ধ নির্মল বারি, ব্রীহিযবাদি শস্য, বনস্পতিসমূহ, জগতের সকল পদার্থ তোমার নির্দেশে অনুকূলপ্রকাশযুক্ত হইয়া আমাকে তত্ত্বজ্ঞান-লাভে সহায়তা করুক। হে ব্রহ্মন্! তুমিই জগতে বিশেষশক্তিমান

নানা রূপে প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছ। শরীর-মন-শুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান-ধারণের যোগ্যতালাভের জন্য আমি অগ্নিস্বরূপ তোমাতে আহুতিপ্রদান করিতেছি—প্রসন্ন হও।*

সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বসম্পাদ্য বিরজাহোমের সংক্ষেপ সারার্থ

অনন্তর বিরজাহোম আরম্ভ হইল—"পৃথ্বী, অপ্‌, তেজঃ, বায়ু ও আকাশরূপে আমাতে অবস্থিত ভূতপঞ্চক শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যানাদি আমাতে অবস্থিত বায়ুসকল শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় নামক আমার কোষ-পঞ্চক শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ-প্রসূত আমাতে অবস্থিত বিষয়সংস্কারসমূহ শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"আমার মন, বাক্য, কায়, কর্মাদি শুদ্ধ হউক; আহুতিপ্রভাবে রজোগুণপ্রসূত মলিনতা হইতে বিমুক্ত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"হে অগ্নিশরীরে শয়ান! জ্ঞান-প্রতিবন্ধ-হরণ-কুশল, লোহিতাক্ষ,

---

* ত্রিসুপর্ণমন্ত্রের ভাবার্থ।

পুরুষ, জাগরিত হও। হে অভীষ্টপূরণকারিন্! তত্ত্বজ্ঞানলাভের পথে আমার যত কিছু প্রতিবন্ধক আছে, সেই সকলের নাশ কর এবং চিত্তের সমগ্র সংস্কার সম্পূর্ণরূপে শুদ্ধ হইয়া যাহাতে গুরুমুখে শ্রুত জ্ঞান আমার অন্তরে সম্যক্ উদিত হয়, তাহা করিয়া দাও; আহুতি দ্বারা রজোগুণ-প্রসূত মলিনতা বিদূরিত হইয়া আমি যেন জ্যোতিঃস্বরূপ হই—স্বাহা।

"চিদাভাস ব্রহ্মস্বরূপ আমি দারা, পুত্র, সম্পদ, লোকমান্য, সুন্দর শরীরাদি লাভের সমস্ত বাসনা অগ্নিতে আহুতিপ্রদানপূর্বক নিঃশেষে ত্যাগ করিতেছি—স্বাহা।"

ঐরূপে বহু আহুতি প্রদত্ত হইবার পর 'ভূরাদি সকল লোকলাভের প্রত্যাশা আমি এইক্ষণ হইতে ত্যাগ করিলাম' এবং 'জগতের সর্বভূতকে অভয়প্রদান করিতেছি'—বলিয়া হোমপরিসমাপ্তি হইল। অনন্তর শিখা, সূত্র ও যজ্ঞোপবীত যথাবিধানে আহুতি দিয়া আবহমানকাল হইতে সাধকপরম্পরানিষেবিত গুরুপ্রদত্ত কৌপীন, কাষায় ও নামে* ভূষিত হইয়া ঠাকুর শ্রীমৎ তোতার নিকটে উপদেশ-গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হইলেন।

ঠাকুরের শিখাসূত্রাদি পরিত্যাগপূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণ

অনন্তর ব্রহ্মজ্ঞ তোতা ঠাকুরকে এখন বেদান্তপ্রসিদ্ধ 'নেতি নেতি' উপায়াবলম্বনপূর্বক ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। বলিলেন—

ঠাকুরের ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থানের জন্য শ্রীমৎ তোতার প্রেরণা

---

* আমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, সন্ন্যাসদীক্ষাদানের সময় শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী ঠাকুরকে 'শ্রীরামকৃষ্ণ' নাম প্রদান করিয়াছিলেন। অন্য কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের পরমভক্ত সেবক শ্রীযুত মথুরামোহনই তাঁহাকে ঐ নামে প্রথম অভিহিত করেন। প্রথম মতটিই আমাদিগের নিকট সমীচীন বলিয়া বোধ হয়।

নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব, দেশকালাদি দ্বারা সর্বদা অপরিচ্ছিন্ন একমাত্র ব্রহ্মবস্তুই নিত্য সত্য। অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়া নিজপ্রভাবে তাঁহাকে নামরূপের দ্বারা খণ্ডিতবৎ প্রতীত করাইলেও তিনি কখনও বাস্তবিক ঐরূপ নহেন। কারণ সমাধিকালে মায়াজনিত দেশকাল বা নামরূপের বিন্দুমাত্র উপলব্ধি হয় না। অতএব নামরূপের সীমার মধ্যে যাহা কিছু অবস্থিত, তাহা কখনও নিত্য বস্তু হইতে পারে না, তাহাকেই দূরে পরিহার কর। নামরূপের দৃঢ় পিঞ্জর সিংহবিক্রমে ভেদ করিয়া নির্গত হও। আপনাতে অবস্থিত আত্মতত্ত্বের অন্বেষণে ডুবিয়া যাও। সমাধি-সহায়ে তাঁহাতে অবস্থান কর; দেখিবে, নামরূপাত্মক জগৎ তখন কোথায় লুপ্ত হইবে, ক্ষুদ্র 'আমি'-জ্ঞান বিরাটে লীন ও স্তব্ধীভূত হইবে এবং অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে নিজ স্বরূপ বলিয়া সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিবে। "যে জ্ঞানাবলম্বনে এক ব্যক্তি অপরকে দেখে, জানে বা অপরের কথা শুনে, তাহা অল্প বা ক্ষুদ্র; যাহা অল্প, তাহা তুচ্ছ—তাহাতে পরমানন্দ নাই; কিন্তু যে জ্ঞানে অবস্থিত হইয়া এক ব্যক্তি অপরকে দেখে না, জানে না বা অপরের বাণী ইন্দ্রিয়গোচর করে না—তাহাই ভূমা বা মহান্, তৎসহায়ে পরমানন্দে অবস্থিতি হয়। যিনি সর্বথা সকলের অন্তরে বিজ্ঞাতা হইয়া রহিয়াছেন, কোন্ মনবুদ্ধি তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হইবে?"

শ্রীমৎ তোতা পূর্বোক্ত প্রকারে নানা যুক্তি ও সিদ্ধান্তবাক্যসহায়ে ঠাকুরকে সেদিন সমাহিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মুখে শুনিয়াছি, তিনি যেন তাঁহার আজীবন সাধনালব্ধ উপলব্ধিসমূহ অন্তরে প্রবেশ করাইয়া তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ অদ্বৈতভাবে সমাহিত করিয়া দিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "দীক্ষাপ্রদান করিয়া

ন্যাংটা নানা সিদ্ধান্তবাক্যের উপদেশ করিতে লাগিল এবং মনকে সর্বতোভাবে নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে নিমগ্ন হইয়া যাইতে বলিল। আমার কিন্তু এমনি হইল যে, ধ্যান করিতে বসিয়া চেষ্টা করিয়াও মনকে নির্বিকল্প করিতে বা নামরূপের গণ্ডি ছাড়াইতে পারিলাম না। অন্য সকল বিষয় হইতে মন সহজেই গুটাইয়া আসিতে লাগিল, কিন্তু ঐরূপে গুটাইবামাত্র তাহাতে শ্রীশ্রীজগদম্বার চিরপরিচিত চিদ্‌ঘনোজ্জ্বল মূর্তি জলন্ত জীবন্তভাবে সমুদিত হইয়া সর্বপ্রকার নামরূপ ত্যাগের কথা এককালে ভুলাইয়া দিতে লাগিল। সিদ্ধান্তবাক্যসকল শ্রবণপূর্বক ধ্যানে বসিয়া যখন উপর্যুপরি তিন দিন ঐরূপ হইতে লাগিল, তখন নির্বিকল্প সমাধিসম্বন্ধে একপ্রকার নিরাশ হইলাম এবং চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ন্যাংটাকে বলিলাম, 'হইল না, মনকে সম্পূর্ণ নির্বিকল্প করিয়া আত্মধ্যানে মগ্ন হইতে পারিলাম না।' ন্যাংটা তখন বিষম উত্তেজিত হইয়া তীব্র তিরস্কার করিয়া বলিল, 'কেঁও, হোগা নেহি' অর্থাৎ—কি! হইবে না, এত বড় কথা! বলিয়া কুটীরের মধ্যে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া ভগ্ন কাচখণ্ড দেখিতে পাইয়া উহা গ্রহণ করিল এবং সূচের ন্যায় উহার তীক্ষ্ণ অগ্রভাগ ভ্রূমধ্যে সজোরে বিদ্ধ করিয়া বলিল, 'এই বিন্দুতে মনকে গুটাইয়া আন।' তখন পুনরায় দৃঢ়সঙ্কল্প করিয়া ধ্যানে বসিলাম এবং ৺জগদম্বার শ্রীমূর্তি পূর্বের ন্যায় মনে উদিত হইবামাত্র জ্ঞানকে অসি কল্পনা করিয়া উহা দ্বারা ঐ মূর্তিকে মনে মনে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিলাম! তখন আর মনে কোনরূপ বিকল্প রহিল না; একেবারে হু হু করিয়া উহা সমগ্র নামরূপ রাজ্যের উপরে উঠিয়া গেল এবং সমাধিনিমগ্ন হইলাম।"

ঠাকুরের মনকে নির্বিকল্প করিবার চেষ্টা নিষ্ফল হওয়ায় তোতার আচরণ এবং ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিলাভ

ঠাকুর পূর্বোক্ত প্রকারে সমাধিস্থ হইলে শ্রীমৎ তোতা অনেকক্ষণ তাঁহার নিকটে উপবিষ্ট রহিলেন। পরে নিঃশব্দে কুটীরের বাহিরে আগমনপূর্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে পাছে কেহ কুটীরে প্রবেশপূর্বক ঠাকুরকে বিরক্ত করে, এজন্য দ্বারে তালা লাগাইয়া দিলেন। অনন্তর কুটীরের অনতিদূরে পঞ্চবটীতলে নিজ আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য ঠাকুরের আহ্বান প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

ঠাকুর নির্বিকল্প সমাধি যথার্থ লাভ করিয়াছেন কি-না, তদ্বিষয়ে তোতার পরীক্ষা ও বিস্ময়

দিন যাইল, রাত্রি আসিল। দিনের পর দিন আসিয়া দিবসত্রয় অতিবাহিত হইল। তথাপি ঠাকুর শ্রীমৎ তোতাকে দ্বার খুলিয়া দিবার জন্য আহ্বান করিলেন না। তখন বিস্ময়কৌতূহলে তোতা আপনিই আসন ত্যাগ করিয়া উঠিলেন এবং শিষ্যের অবস্থা পরিজ্ঞাত হইবেন বলিয়া অর্গলমোচন করিয়া কুটীরে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন, যেমন বসাইয়া গিয়াছিলেন, ঠাকুর সেইভাবেই বসিয়া আছেন—দেহে প্রাণের প্রকাশমাত্র নাই, কিন্তু মুখ প্রশান্ত, গম্ভীর, জ্যোতিপূর্ণ! বুঝিলেন—বহির্জগৎ সম্বন্ধে শিষ্য এখনও সম্পূর্ণ মৃতকল্প—নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদীপবৎ তাঁহার চিত্ত ব্রহ্মে লীন হইয়া অবস্থান করিতেছে!

সমাধিরহস্যজ্ঞ তোতা স্তম্ভিতহৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—যাহা দেখিতেছি, তাহা কি বাস্তবিক সত্য—চল্লিশ বৎসরব্যাপী কঠোর সাধনায় যাহা জীবনে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছি, তাহা কি এই মহাপুরুষ সত্য সত্যই তিন দিবসে আয়ত্ত করিলেন! সন্দেহাবেগে তোতা পুনরায় পরীক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন, তন্ন তন্ন করিয়া শিষ্যদেহে প্রকাশিত লক্ষণসকল অনুধাবন করিতে লাগিলেন। হৃদয় স্পন্দিত হইতেছে কি-না, নাসিকাদ্বারে বিন্দুমাত্র বায়ু নির্গত হইতেছে কি-না

বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিলেন। ধীর স্থির কাষ্ঠখণ্ডের স্থায় অচলভাবে অবস্থিত শিষ্যশরীর বারংবার স্পর্শ করিলেন। কিছুমাত্র বিকার, বৈলক্ষণ্য বা চেতনার উদয় হইল না! তখন বিস্ময়ানন্দে অভিভূত হইয়া তোতা চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন—

'য়হ ক্যা দৈবী মায়া'—সত্য সত্যই সমাধি! বেদান্তোক্ত জ্ঞানমার্গের চরম ফল—নির্বিকল্প-সমাধি! তিন দিনে* হইয়াছে! দেবতার এ কি অত্যদ্ভুত মায়া!

অনন্তর সমাধি হইতে শিষ্যকে ব্যুত্থিত করিবেন বলিয়া তোতা প্রক্রিয়া আরম্ভ করিলেন এবং 'হরি ওম্'-মন্ত্রের সুগভীর আরাবে পঞ্চবটীর স্থল-জল-ব্যোম পূর্ণ হইয়া উঠিল।

শ্রীমৎ তোতার ঠাকুরের সমাধি ভঙ্গ করিবার চেষ্টা

শিষ্যপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া এবং নির্বিকল্প ভূমিতে তাঁহাকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করিবেন বলিয়া শ্রীমৎ তোতা কিরূপে এখানে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস অতিবাহিত করিতে লাগিলেন এবং ঠাকুরের সহায়ে কিরূপে নিজ আধ্যাত্মিক জীবন সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ করিলেন, সে সকল কথা আমরা অন্যত্র† সবিস্তারে বলিয়াছি বলিয়া এখানে তাহার পুনরুল্লেখ করিলাম না।

একাদিক্রমে একাদশ মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতা উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রস্থান করিলেন। ঐ ঘটনার অব্যবহিত পরেই

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ (৯ম সং), ৫১ ও ১০৪ পৃঃ, 'কথামৃত', ৪র্থ ভাগ (৮ম সং), ৩১০ পৃঃ।—প্রঃ

† গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৮ম অধ্যায়

ঠাকুরের মনে দৃঢ় সঙ্কল্প উপস্থিত হইল, তিনি এখন হইতে নিরন্তর নির্বিকল্প অদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিবেন। কিরূপে তিনি ঐ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিয়াছিলেন—জীবকোটি সাধকবর্গের কথা দূরে থাকুক, অবতারপ্রতিম আধিকারিক পুরুষেরাও যে ঘনীভূত অদ্বৈতাবস্থায় বহুকাল অবস্থান করিতে সক্ষম হয়েন না, সেই ভূমিতে কিরূপে তিনি নিরন্তর ছয়মাস কাল অবস্থান করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং ঐকালে কিরূপে জনৈক সাধুপুরুষ কালীবাটীতে আগমনপূর্বক ঠাকুরের দ্বারা পরে লোক-কল্যাণ বিশেষরূপে সাধিত হইবে, একথা জানিতে পারিয়া ছয়মাস কাল তথায় অবস্থান করিয়া নানা উপায়ে তাঁহার শরীররক্ষা করিয়াছিলেন, সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র* বলিয়াছি। অতএব ঠাকুরের সহায়ে এইকালে মথুরবাবুর জীবনে যে বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিয়া আমরা এই অধ্যায়ের উপসংহার করিব।

ঠাকুরের ভিতর নানা প্রকার দৈবশক্তির দর্শনে শ্রীযুক্ত মথুরামোহনের ভক্তি বিশ্বাস ইতিপূর্বেই তাঁহার প্রতি বিশেষভাবে বর্ধিত হইয়াছিল।

ঠাকুরের জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা

এই কালের একটি ঘটনায় সেই ভক্তি অধিকতর অচলভাব ধারণপূর্বক চিরকাল তাঁহাকে ঠাকুরের শরণাপন্ন করিয়া রাখিয়াছিল।

মথুরামোহনের দ্বিতীয়া পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী এইকালে গ্রহণীরোগে আক্রান্তা হয়েন। রোগ ক্রমশঃ এত বাড়িয়া উঠে যে, কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার-বৈদ্যসকল তাঁহার জীবনরক্ষা সম্বন্ধে প্রথমে সংশয়াপন্ন এবং পরে হতাশ হয়েন।

ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, মথুরামোহন সুপুরুষ ছিলেন, কিন্তু দরিদ্রের

---

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়

ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। রূপবান দেখিয়াই রাসমণি তাঁহাকে প্রথমে নিজ তৃতীয়া কন্যা শ্রীমতী করুণাময়ীর সহিত এবং ঐ কন্যার মৃত্যু হইলে পুনরায় নিজ কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর সহিত বিবাহ দিয়াছিলেন। অতএব বিবাহের পরেই শ্রীযুক্ত মথুরের অবস্থার পরিবর্তন হয় এবং স্বয়ং বুদ্ধিবলে ও কর্মকুশলতায় ক্রমে তিনি নিজ শশ্রূঠাকুরানীর দক্ষিণহস্তস্বরূপ হইয়া উঠেন। অনন্তর রাণী রাসমণির মৃত্যু হইলে কিরূপে তিনি রাণীর বিষয়সংক্রান্ত সকল কার্যপরিচালনায় একরূপ একাধিপত্য লাভ করেন, তাহা আমরা পাঠককে জানাইয়াছি।

জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়ায় মথুরামোহন এখন যে কেবল প্রিয়তমা পত্নীকে হারাইতে বসিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজ শশ্রূঠাকুরানীর বিষয়ের উপর পূর্বোক্ত আধিপত্যও হারাইতে বসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার মনের এখনকার অবস্থা সম্বন্ধে অধিক কথা বলা নিষ্প্রয়োজন।

রোগীর অবস্থা দেখিয়া যখন ডাক্তার-বৈদ্যরা জবাব দিয়া গেলেন, মথুর তখন কাতর হইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কালীমন্দিরে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া ঠাকুরের অনুসন্ধানে পঞ্চবটীতে আসিলেন। তাঁহার ঐপ্রকার উন্মত্তপ্রায় অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহাকে সযত্নে পার্শ্বে বসাইলেন এবং ঐরূপ হইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মথুর তাহাতে তাঁহার পদপ্রান্তে পতিত হইয়া সজলনয়নে গদগদ বাক্যে সকল কথা নিবেদন করিয়া দীনভাবে বারংবার বলিতে লাগিলেন, "আমার যাহা হইবার তাহা ত হইতে চলিল; বাবা, তোমার সেবাধিকার হইতেও এইবার বঞ্চিত হইলাম, তোমার সেবা আর করিতে পাইব না।"

মথুরের ঐরূপ দৈন্য দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় পূর্ণ হইল। তিনি

ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, "ভয় নাই, তোমার পত্নী আরোগ্যলাভ করিবে।" বিশ্বাসী মথুর ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতা বলিয়া জানিতেন; সুতরাং তাঁহার অভয়বাণীতে প্রাণ পাইয়া সেদিন বিদায় গ্রহণ করিলেন। অনন্তর জানবাজারে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি দেখিলেন, সহসা জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক অবস্থার পরিবর্তন হইয়াছে। ঠাকুর বলিতেন, "সেইদিন হইতে জগদম্বা দাসী ধীরে ধীরে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল এবং তাহার ঐ রোগটার ভোগ (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই শরীরের উপর দিয়া হইতে থাকিল; জগদম্বা দাসীকে ভাল করিয়া ছয়মাস কাল পেটের পীড়া ও অন্যান্য যন্ত্রণায় ভুগিতে হইয়াছিল।"

শ্রীযুক্ত মথুরের ঠাকুরের প্রতি অদ্ভুত প্রেমপূর্ণ সেবার কথা আলোচনা করিবার সময় ঠাকুর একদিন আমাদিগের নিকট পূর্বোক্ত ঘটনার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "মথুর যে চৌদ্দ বৎসর সেবা করিয়াছিল, তাহা কি অমনি করিয়াছিল? মা তাহাকে (নিজ শরীর দেখাইয়া) ইহার ভিতর দিয়া নানাপ্রকার অদ্ভুত অদ্ভুত সব দেখাইয়াছিলেন, সেইজন্যই সে অত সেবা করিয়াছিল।"

ষোড়শ অধ্যায়

বেদান্তসাধনের শেষ কথা ও ইসলামধর্মসাধন

জগদম্বা দাসীর সাংঘাতিক পীড়া পূর্বোক্ত প্রকারে আরোগ্য করিয়া হউক, অথবা অদ্বৈত-ভাবভূমিতে নিরন্তর অবস্থানের জন্য ঠাকুর দীর্ঘ ছয়মাস কাল পর্যন্ত যে অমানুষী চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার ফলেই হউক, তাঁহার দৃঢ় শরীর ভগ্ন হইয়া এখন কয়েক মাস রোগগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহার নিকটে শুনিয়াছি, ঐ সময়ে তিনি আমাশয় পীড়ায় কঠিনভাবে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। ভাগিনেয় হৃদয় নিরন্তর তাঁহার সেবায় নিযুক্ত ছিল এবং শ্রীযুক্ত মথুর তাঁহাকে সুস্থ ও রোগমুক্ত করিবার জন্য প্রসিদ্ধ কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসা ও পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু শরীর ঐরূপে ব্যাধিগ্রস্ত হইলেও ঠাকুরের দেহবোধবিবর্জিত মন এখন যে অপূর্ব শান্তি ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দে অবস্থান করিত, তাহা বলিবার নহে। বিন্দুমাত্র উত্তেজনায়* উহা শরীর, ব্যাধি এবং সংসারের সকল বিষয় হইতে পৃথক হইয়া দূরে নির্বিকল্পভূমিতে এককালে উপনীত হইত এবং ব্রহ্ম, আত্মা বা ঈশ্বরের স্মরণমাত্রেই অন্য সকল কথা ভুলিয়া তন্ময় হইয়া কিছুকালের জন্য আপনার পৃথগস্তিত্ববোধ সম্পূর্ণরূপে হারাইয়া ফেলিত। সুতরাং ব্যাধির প্রকোপে শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইলেও তিনি যে উহার সামান্যমাত্রই

ঠাকুরের কঠিন ব্যাধি—ঐকালে তাঁহার মনের অপূর্ব আচরণ

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়

উপলব্ধি করিতেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। তবে ঐ ব্যাধির যন্ত্রণা সময়ে সময়ে তাঁহার মনকে উচ্চভাবভূমি হইতে নামাইয়া শরীরে যে নিবিষ্ট করিত, একথাও আমরা তাঁহার শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ঠাকুর বলিতেন, এইকালে তাঁহার নিকটে বেদান্তমার্গবিচরণশীল সাধকাগ্রণী পরমহংস সকলের আগমন হইয়াছিল এবং 'নেতি নেতি', 'অস্তিভাতি-প্রিয়', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' প্রভৃতি বেদান্তপ্রসিদ্ধ তত্ত্বসমূহের বিচারধ্বনিতে তাঁহার বাসগৃহ নিরন্তর মুখরিত হইয়া থাকিত।* ঐসকল উচ্চতত্ত্বের বিচারকালে তাঁহারা যখন কোন বিষয়ে সুমীমাংসায় উপনীত হইতে পারিতেন না, ঠাকুরকেই তখন মধ্যস্থ হইয়া উহার মীমাংসা করিয়া দিতে হইত। বলা বাহুল্য, ইতরসাধারণের ন্যায় ব্যাধির প্রকোপে নিরন্তর মুহ্যমান হইয়া থাকিলে কঠোর দার্শনিক বিচারে ঐরূপে প্রতিনিয়ত যোগদান করা তাঁহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইত না।

অদ্বৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ঠাকুরের দর্শন—ঐ দর্শনের ফলে তাঁহার উপলব্ধিসমূহ

আমরা অন্যত্র বলিয়াছি, নির্বিকল্প ভূমিতে নিরন্তর অবস্থানকালের শেষভাগে ঠাকুরের এক বিচিত্র দর্শন বা উপলব্ধি উপস্থিত হইয়াছিল। ভাবমুখে অবস্থান করিবার জন্য তিনি তৃতীয়বার আদিষ্ট হইয়াছিলেন † 'দর্শন' বলিয়া ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিলেও উহা যে তাঁহার প্রাণে প্রাণে উপলব্ধির কথা, ইহা পাঠক বুঝিয়া লইবেন। কারণ পূর্ব দুইবারের ন্যায় ঠাকুর এইকালে কোন দৃষ্ট মূর্তির মুখে ঐকথা শ্রবণ করেন নাই। কিন্তু তুরীয় অদ্বৈততত্ত্বে একেবারে একীভূত হইয়া অবস্থান না করিয়া যখনই তাঁহার মন ঐ তত্ত্ব

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ২য় অধ্যায়। † এই গ্রন্থের অষ্টম অধ্যায় দেখ

হইতে কথঞ্চিৎ পৃথক হইয়া আপনাকে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের বা শ্রীশ্রীজগদম্বার অংশ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতেছিল, তখন উহা ঐ বিরাট ব্রহ্মের বিরাট মনে ঐরূপ ভাব বা ইচ্ছার বিদ্যমানতা সাক্ষাৎ উপলব্ধি করিয়াছিল।* ঐ উপলব্ধি হইতে তাঁহার মনে নিজ জীবনের ভবিষ্যৎ প্রয়োজনীয়তা সম্যক প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিয়াছিল। কারণ শরীররক্ষা করিবার নিমিত্ত বিন্দুমাত্র বাসনা অন্তরে না থাকিলেও শ্রীশ্রীজগদম্বার বিচিত্র ইচ্ছায় বারংবার ভাবমুখে অবস্থান করিতে আদিষ্ট হইয়া ঠাকুর বুঝিয়াছিলেন, নিজ প্রয়োজন না থাকিলেও ভগবল্লীলাপ্রয়োজনের জন্য তাঁহাকে দেহরক্ষা করিতে হইবে এবং নিত্যকাল ব্রহ্মে অবস্থান করিলে শরীর থাকা সম্ভবপর নহে বলিয়াই তিনি এখন ঐরূপ করিতে আদিষ্ট হইয়াছেন। জাতিস্মরত্বসহায়ে ঠাকুর এইকালেই সম্যক বুঝিয়াছিলেন, তিনি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাববান আধিকারিক অবতারপুরুষ, বর্তমান যুগের ধর্মগ্লানি দূর করিয়া লোক-কল্যাণসাধনের জন্যই তাঁহাকে দেহধারণ ও তপস্যাদি করিতে হইয়াছে। একথাও তাঁহার এই সময়ে হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল যে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা উদ্দেশ্য-বিশেষ-সাধনের জন্যই এবার তাঁহাকে বাহ্যৈশ্বর্যের আড়ম্বরপরিশূন্য ও নিরক্ষর করিয়া দরিদ্র ব্রাহ্মণকুলে আনয়ন করিয়াছেন এবং ঐ লীলারহস্য তাঁহার জীবৎকালে স্বল্পলোকে বুঝিতে সমর্থ হইলেও, যে প্রবল আধ্যাত্মিক তরঙ্গ তাঁহার শরীরমনের দ্বারা জগতে উদিত হইবে, তাহা সর্বতোভাবে অমোঘ থাকিয়া অনন্তকাল জনসাধারণের কল্যাণসাধন করিতে থাকিবে।

ঐরূপ অসাধারণ উপলব্ধিসকল ঠাকুরের কিরূপে উপস্থিত হইয়াছিল বুঝিতে হইলে শাস্ত্রের কয়েকটি কথা আমাদিগকে স্মরণ করিতে হইবে। শাস্ত্র বলেন, অদ্বৈতভাবসহায়ে জ্ঞানস্বরূপে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পূর্বে

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৩য় অধ্যায়

সাধক জাতিস্মরত্ব লাভ করিয়া থাকেন।* অথবা ঐ ভাবের পরিপাকে তাঁহার স্মৃতি তখন এতদূর পরিণত অবস্থায় উপস্থিত হয় যে, ইতিপূর্বে তিনি যেভাবে যথায় যতবার শরীর পরিগ্রহপূর্বক যাহা কিছু সুকৃত-দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, সে সকল কথা তাঁহার স্মরণপথে উদিত হইয়া থাকে। ফলে সংসারের সকল বিষয়ের নশ্বরতা ও রূপরসাদি ভোগসুখের পশ্চাৎ ধাবিত হইয়া বারংবার একই ভাবে জন্মপরিগ্রহের নিষ্ফলতা সম্যক প্রত্যক্ষীভূত হইয়া তাঁহার মনে তীব্র বৈরাগ্য উপস্থিত হয় এবং ঐ বৈরাগ্যসহায়ে তাঁহার প্রাণ সর্ববিধ বাসনা হইতে এককালে পৃথক হইয়া দণ্ডায়মান হয়।

ব্রহ্মজ্ঞানলাভের পূর্বে সাধকের জাতিস্মরত্বলাভ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা

উপনিষদ্ বলেন†, ঐরূপ পুরুষ সিদ্ধসঙ্কল্প হয়েন এবং দেব, পিতৃ প্রভৃতি যখন যে লোক প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়, তখনই তাঁহার মন সমাধি-বলে ঐসকল লোক সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ হয়। মহামুনি পতঞ্জলি তৎকৃত যোগশাস্ত্রে ঐ বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ পুরুষের সর্ববিধ বিভূতি বা যোগৈশ্বর্যের স্বতঃ উদয় হইয়া থাকে। পঞ্চদশীকার সায়ন-মাধব ঐরূপ পুরুষের বাসনারাহিত্য এবং যোগৈশ্বর্যলাভ—উভয় কথার সামঞ্জস্য করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ বিচিত্র ঐশ্বর্যসকল লাভ করিলেও অন্তরে বিন্দুমাত্র বাসনা না থাকায় তাঁহারা ঐসকল শক্তি কখনও প্রয়োগ করেন না। পুরুষ সংসারে যে অবস্থায় থাকিতে থাকিতে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে, জ্ঞানলাভের

ব্রহ্মজ্ঞানলাভে সাধকের সর্বপ্রকার যোগ বিভূতি ও সিদ্ধ-সঙ্কল্প-লাভসম্বন্ধে শাস্ত্রীয় কথা

* সংস্কারসাক্ষাৎকরণাৎ পূর্বজাতিজ্ঞানং। —পাতঞ্জলসূত্র বিভূতিপাদ, ১৮শ সূত্র
† ছান্দোগ্যোপনিষৎ, ৮ম প্রপাঠক, ২য় খণ্ড

পরে তদবস্থাতে কালাতিপাত করে। কারণ চিত্ত সর্বপ্রকারে বাসনাশূন্য হওয়ায় সমর্থ হইলেও ঐ অবস্থার পরিবর্তন করিবার আবশ্যকতা সে কিছুমাত্র অনুভব করে না। আধিকারিক পুরুষেরাই* কেবল সর্বতোভাবে ঈশ্বরেচ্ছাধীন থাকিয়া বহুজনহিতায় ঐ শক্তিসকলের প্রয়োগ সময়ে সময়ে করিয়া থাকেন।

পূর্বোক্ত শাস্ত্রীয় কথাসকল স্মরণ রাখিয়া ঠাকুরের বর্তমান জীবনের অনুশীলনে তাঁহার এইকালের বিচিত্র অনুভূতিসকল সম্যক্ না হইলেও অনেকাংশে বুঝিতে পারা যায়। বুঝা যায় যে তিনি ভগবৎপাদপদ্মে অন্তরের সহিত সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া সর্বপ্রকারে বাসনাপরিশূন্য হইয়াছিলেন বলিয়াই, অত স্বল্পকালে ব্রহ্মজ্ঞানের নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিতে এবং দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

পূর্বোক্ত শাস্ত্রকথা অনুসারে ঠাকুরের জীবনালোচনায় তাঁহার অপূর্ব উপলব্ধি-সকলের কারণ বুঝা যায়

বুঝা যায়, জাতিস্মরত্বলাভ করিয়াই তিনি এইকালে সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে যিনি 'শ্রীরাম' এবং 'শ্রীকৃষ্ণ'-রূপে আবির্ভূত হইয়া লোককল্যাণসাধন করিয়াছিলেন, তিনিই বর্তমানকালে পুনরায় শরীর পরিগ্রহপূর্বক 'শ্রীরামকৃষ্ণ'রূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। বুঝা যায়, লোককল্যাণসাধনের জন্য পরজীবনে তাঁহাতে বিচিত্র বিভূতি সকলের প্রকাশ নিত্য দেখিতে পাইলেও কেন আমরা তাঁহাকে নিজ শরীরমনের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য ঐসকল দিব্যশক্তির প্রয়োগ করিতে কখনও দেখিতে পাই না। বুঝা যায়, কেন তিনি সঙ্কল্পমাত্রেই আধ্যাত্মিক তত্ত্বসমূহ প্রত্যক্ষ করিবার শক্তি অপরের মধ্যে জাগরিত করিতে সমর্থ হইতেন

* লোককল্যাণসাধনের জন্য যাঁহারা বিশেষ অধিকার বা শক্তি লইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

এবং কেনই বা তাঁহার দিব্যপ্রভাব দিন দিন পৃথিবীর সকল দেশে অপূর্ব আধিপত্য লাভ করিতেছে।

অদ্বৈতভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভাবরাজ্যে অবরোহণ করিবার কালে ঠাকুর ঐরূপে নিজ জীবনের ভূতভবিষ্যৎ সম্যক্ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐ উপলব্ধি সকল তাঁহাতে যে সহসা একদিন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় না। আমাদিগের অনুমান, ভাব-ভূমিতে অবরোহণের পরে বৎসরকালের মধ্যে তিনি ঐসকল কথা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগন্মাতা ঐকালে তাঁহার চক্ষুর সম্মুখ হইতে আবরণের পর আবরণ উঠাইয়া দিন দিন তাঁহাকে ঐসকল কথা স্পষ্ট বুঝাইয়া দিয়াছিলেন। পূর্বোক্ত উপলব্ধিসকল তাঁহার মনে যুগপৎ কেন উপস্থিত হয় নাই, তদ্বিষয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে আমাদিগকে বলিতে হয়—অদ্বৈতভাবে অবস্থান-পূর্বক গভীর ব্রহ্মানন্দসম্ভোগে তিনি এইকালে নিরন্তর ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং যতদিন না তাঁহার মন পুনরায় বহির্মুখী বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল, ততদিন ঐসকল বিষয় উপলব্ধি করিবার তাঁহার অবসর এবং প্রবৃত্তি হয় নাই। ঐরূপে সাধনকালের প্রারম্ভে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিকটে যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, 'মা, আমি কি করিব, তাহা কিছুই জানি না, তুই স্বয়ং আমাকে যাহা শিখাইবি তাহাই শিখিব'—তাহা এইকালে পূর্ণ হইয়াছিল।

পূর্বোক্ত উপলব্ধিসকল ঠাকুরের যুগপৎ উপস্থিত না হইবার কারণ

অদ্বৈতভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া ঠাকুরের এইকালে আর একটি বিষয়ও উপলব্ধি হইয়াছিল। তিনি হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন যে, অদ্বৈতভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়াই সর্ববিধ সাধনভজনের চরম উদ্দেশ্য। কারণ ভারতের প্রচলিত প্রধান প্রধান সকল ধর্মসম্প্রদায়ের মতাবলম্বনে সাধন করিয়া

অদ্বৈতভাব লাভ করাই সকল সাধনের উদ্দেশ্য বলিয়া ঠাকুরের উপলব্ধি

তিনি ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, উহারা প্রত্যেকেই সাধককে উক্ত ভূমির দিকে অগ্রসর করে। অদ্বৈতভাবের কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি সেইজন্য আমাদিগকে বারংবার বলিতেন, "উহা শেষ কথা রে, শেষ কথা ; ঈশ্বর-প্রেমের চরম পরিণতিতে সর্বশেষে উহা সাধকজীবনে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয় ; জানিবি সকল মতেরই উহা শেষ কথা এবং যত মত, তত পথ।"

পূর্বোক্ত উপলব্ধি তাঁহার পূর্বে অন্য কেহ পূর্ণভাবে করে নাই

ঐরূপে অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিয়া ঠাকুরের মন অসীম উদারতা লাভ করিয়াছিল। ঈশ্বরলাভকে যাহারা মানবজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া শিক্ষা-প্রদান করে, ঐরূপ সকল সম্প্রদায়ের প্রতি উহা এখন অপূর্ব সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল। কিন্তু ঐরূপ উদারতা ও সহানুভূতি যে তাঁহার সম্পূর্ণ নিজস্ব সম্পত্তি এবং পূর্বযুগের কোন সাধকাগ্রণী যে উহা তাঁহার ন্যায় পূর্ণভাবে লাভ করিতে সমর্থ হন নাই, একথা প্রথমে তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে এবং প্রসিদ্ধ তীর্থ সকলে নানা সম্প্রদায়ের প্রবীণ সাধকসকলের সহিত মিলিত হইয়া ক্রমে তাঁহার ঐ কথার উপলব্ধি হইয়াছিল। কিন্তু এখন হইতে তিনি ধর্মের একদেশী ভাব অপরে অবলোকন করিলেই প্রাণে বিষম আঘাত প্রাপ্ত হইয়া ঐরূপ হীনবুদ্ধি দূর করিতে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হইতেন।

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের মনের উদারতা সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত—তাঁহার ইসলামধর্মসাধন

অদ্বৈতবিজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ঠাকুরের মন এখন কিরূপ উদার-ভাবসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা আমরা এইকালের একটি ঘটনায় স্পষ্ট বুঝিতে পারি। আমরা দেখিয়াছি, ঐ ভাবসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে ঠাকুরের শরীর কয়েক মাসের জন্য রোগাক্রান্ত হইয়াছিল। সেই ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইবার পরে উল্লিখিত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল।

গোবিন্দ রায় নামক এক ব্যক্তি এই সময়ের কিছুকাল পূর্ব হইতে ধর্মান্বেষণে প্রবৃত্ত হন। হৃদয় বলিত, ইনি জাতিতে ক্ষত্রিয় ছিলেন। সম্ভবতঃ পারসী ও আরবী ভাষায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি ছিল। ধর্মসম্বন্ধীয় নানা মতামত আলোচনা করিয়া এবং নানা সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইয়া ইনি পরিশেষে ইসলামধর্মের উদার মতে আকৃষ্ট হইয়া যথারীতি দীক্ষাগ্রহণ করেন। ধর্মপিপাসু গোবিন্দ ইসলামধর্মমত গ্রহণ করিলেও উহার সামাজিক নিয়মপদ্ধতি কতদূর অনুসরণ করিতেন, বলিতে পারি না। কিন্তু দীক্ষাগ্রহণ করিয়া অবধি তিনি যে কোরানপাঠ এবং তদুক্ত প্রণালীতে সাধনভজনে মহোৎসাহে নিযুক্ত ছিলেন, একথা আমরা শ্রবণ করিয়াছি। গোবিন্দ প্রেমিক ছিলেন। বোধ হয়, ইসলামের সুফি সম্প্রদায়ের প্রচলিত শিক্ষা এবং ভাবসহায়ে ঈশ্বরের উপাসনা করিবার পদ্ধতি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। কারণ ঐ সম্প্রদায়ের দরবেশ-দিগের মত তিনি এখন ভাবসাধনে অহোরাত্র নিযুক্ত থাকিতেন।

সুফি গোবিন্দ রায়ের আগমন

যেরূপেই হউক; গোবিন্দ এখন দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হয়েন এবং সাধনানুকূল স্থান বুঝিয়া পঞ্চবটীর শান্তিপ্রদ ছায়ায় আসন বিস্তীর্ণ করিয়া কিছুকাল কাটাইতে থাকেন। রাণী রাসমণির কালীবাটীতে তখন হিন্দু সংসারত্যাগীদের ন্যায় মুসলমান ফকিরগণেরও সমাদর ছিল এবং জাতিধর্মনির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের ত্যাগী ব্যক্তিদিগের প্রতি এখানে সমভাবে আতিথ্য প্রদর্শন করা হইত। অতএব এখানে থাকিবার কালে গোবিন্দের অন্যত্র ভিক্ষাটনাদি করিতে হইত না এবং ইষ্টচিন্তায় নিযুক্ত হইয়া তিনি সানন্দে দিনযাপন করিতেন।

প্রেমিক গোবিন্দকে দেখিয়া ঠাকুর তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়েন এবং

তাঁহার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার সরল বিশ্বাস ও প্রেমে মুগ্ধ হয়েন। ঐরূপে ঠাকুরের মন এখন ইসলামধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ভাবিতে থাকেন, 'ইহাও ত ঈশ্বরলাভের এক পথ, অনন্ত-লীলাময়ী মা এপথ দিয়াও ত কত লোককে তাঁহার শ্রীপাদপদ্মলাভে ধন্য করিতেছেন ; কিরূপে তিনি এই পথ দিয়া তাঁহার আশ্রিতদিগকে কৃতার্থ করেন, তাহা দেখিতে হইবে ; গোবিন্দের নিকট দীক্ষিত হইয়া এ ভাবসাধনে নিযুক্ত হইব।'

গোবিন্দের সহিত আলাপ করিয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প

যে চিন্তা, সেই কাজ। ঠাকুর গোবিন্দকে নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন এবং দীক্ষাগ্রহণ করিয়া যথাবিধি ইসলামধর্মসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ঐ সময়ে 'আল্লা'মন্ত্র জপ করিতাম, মুসলমানদিগের ন্যায় কাছা খুলিয়া কাপড় পরিতাম, ত্রিসন্ধ্যা নমাজ পড়িতাম এবং হিন্দুভাব মন হইতে এককালে লুপ্ত হওয়ায় হিন্দুদেবদেবীকে প্রণাম দূরে থাকুক, দর্শন পর্যন্ত করিতে প্রবৃত্তি হইত না। ঐভাবে তিন দিবস অতিবাহিত হইবার পরে ঐ মতের সাধনফল সম্যক্ হস্তগত হইয়াছিল।" ইসলামধর্মসাধনকালে ঠাকুর প্রথমে এক দীর্ঘশ্মশ্রুবিশিষ্ট, সুগম্ভীর, জ্যোতির্ময় পুরুষপ্রবরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়াছিলেন। পরে সগুণ বিরাট ব্রহ্মের উপলব্ধিপূর্বক তুরীয় নির্গুণ ব্রহ্মে তাঁহার মন লীন হইয়া গিয়াছিল।

গোবিন্দের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সাধনে ঠাকুরের সিদ্ধিলাভ

হৃদয় বলিত, মুসলমানধর্মসাধনের সময় ঠাকুর মুসলমানদিগের প্রিয় খাদ্যসকল, এমন কি গো-মাংস পর্যন্ত গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন। মথুরামোহনের সানুনয় অনুরোধই তখন তাঁহাকে ঐ কর্ম হইতে নিরস্ত করিয়াছিল। বালকস্বভাব ঠাকুরের ঐরূপ ইচ্ছা অন্ততঃ আংশিক পূর্ণ না হইলে তিনি কখন নিরস্ত

মুসলমান ধর্মসাধনকালে ঠাকুরের আচরণ

হইবেন না ভাবিয়া মথুর ঐ সময়ে এক মুসলমান পাচক আনাইয়া তাহার নির্দেশে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা মুসলমানদিগের প্রণালীতে খাদ্যসকল রন্ধন করাইয়া ঠাকুরকে খাইতে দিয়াছিলেন। মুসলমানধর্মসাধনের সময় ঠাকুর কালীবাটীর অভ্যন্তরে একবারও পদার্পণ করেন নাই। উহার বাহিরে অবস্থিত মথুরামোহনের কুঠিতেই বাস করিয়াছিলেন।

বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের মন অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি কিরূপ সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়াছিল, তাহা পূর্বোক্ত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায় এবং একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হইয়াই যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমানকুল পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে নিবদ্ধ হইতে পারে, একথাও হৃদয়ঙ্গম হয়। নতুবা ঠাকুর যেমন বলিতেন, "হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত-ব্যবধান রহিয়াছে—পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপ এতকাল একত্রবাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হইয়া রহিয়াছে।" ঐ পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হইবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করিবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমানধর্মসাধন কি তাহারই সূচনা করিয়া যাইল?

ভারতের হিন্দু ও মুসলমান জাতি কালে ভ্রাতৃভাবে মিলিত হইবে, ঠাকুরের ইসলামমতসাধনে ঐ বিষয় বুঝা যায়

নির্বিকল্প ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে ঠাকুরের এখন দ্বৈত-ভূমির সীমান্তরালে অবস্থিত বিষয় ও ব্যক্তিসকলকে দেখিয়া অদ্বৈতস্মৃতি অনেক সময় সহসা প্রবুদ্ধ হইয়া উঠিত এবং তাঁহাকে তুরীয়ভাবে লীন করিত। স্বতন্ত্র-না করিলেও সামান্যমাত্র উদ্দীপনায় আমরা তাঁহার ঐরূপ অবস্থা উপস্থিত হইতে দেখিয়াছি। অতএব, এখন হইতে তিনি সঙ্কল্প করিবামাত্র যে ঐ

পরবর্তী কালে ঠাকুরের মনে অদ্বৈতস্মৃতি কতদূর প্রবল ছিল

ভূমিতে আরোহণে সমর্থ ছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। অদ্বৈতভাব যে তাঁহার কতদূর অন্তরের পদার্থ ছিল, তাহা উহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। ঐরূপ কয়েকটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন, ঐ ভাব তাঁহার হৃদয়ে যেমন দুরবগাহ তেমনই দূরপ্রসারী ছিল।

দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রশস্ত উদ্যান বর্ষাকালে তৃণাচ্ছন্ন হওয়ায় মালীদিগের তরিতরকারী বপনের বিশেষ অসুবিধা হইয়া থাকে। তজ্জন্য ঘেসেড়াদিগকে ঐ সময়ে ঘাস কাটিয়া লইবার অনুমতি প্রদান করা হয়। একজন বৃদ্ধ ঘেসেড়া একদিন ঐরূপে বিনামূল্যে ঘাস লইবার অনুমতিলাভে সানন্দে সারাদিন ঐ কর্মে নিযুক্ত থাকিয়া অপরাহ্ণে মোট বাঁধিয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইবার উপক্রম করিতেছিল। ঠাকুর দেখিতে পাইলেন, লোভে পড়িয়া সে এত ঘাস কাটিয়াছে যে, ঐ ঘাসের বোঝা লইয়া যাওয়া বৃদ্ধের শক্তিতে সম্ভবে না। দরিদ্র ঘেসেড়া কিন্তু ঐ বিষয় কিছুমাত্র বুঝিতে না পারিয়া বৃহৎ বোঝাটি মাথায় তুলিয়া লইবার জন্য নানারূপে পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিয়াও উহা উঠাইতে পারিতেছিল না। ঐ বিষয় দেখিতে দেখিতে ঠাকুরের ভাবাবেশ হইল। ভাবিলেন, অন্তরে পূর্ণজ্ঞান-স্বরূপ আত্মা বিদ্যমান এবং বাহিরে এত নির্বুদ্ধিতা, এত অজ্ঞান! 'হে রাম, তোমার বিচিত্র লীলা!' —বলিতে বলিতে ঠাকুর সমাধিস্থ হইলেন।

ঐ বিষয়ক কয়েকটি দৃষ্টান্ত—(১) বৃদ্ধ ঘেসেড়া

একদিন ঠাকুর দেখিলেন, একটি পতঙ্গ (ফড়িং) উড়িয়া আসিতেছে এবং উহার গুহ্যদেশে একটি লম্বা কাটি বিদ্ধ রহিয়াছে। কোন দুষ্ট বালক ঐরূপ করিয়াছে ভাবিয়া তিনি প্রথমে ব্যথিত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই ভাবাবিষ্ট হইয়া 'হে রাম, তুমি আপনার দুর্দশা আপনি করিয়াছ' বলিয়া হাস্যের রোল উঠাইলেন।

(২) আহত পতঙ্গ

কালীবাটীর উদ্যানের স্থানবিশেষ নবীন দূর্বাদলে সমাচ্ছন্ন হইয়া এক সময়ে রমণীয়দর্শন হইয়াছিল। ঠাকুর উহা দেখিতে দেখিতে ভাবাবিষ্ট হইয়া এতদূর তন্ময় হইয়া গিয়াছিলেন যে, ঐ স্থানকে সর্বতোভাবে নিজ অঙ্গ বলিয়া অনুভব করিতেছিলেন। সহসা এক ব্যক্তি ঐ সময়ে ঐ স্থানের উপর দিয়া অন্যত্র গমন করিতে লাগিল। তিনি উহাতে অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করিয়া এককালে অস্থির হইয়া পড়িলেন। ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "বুকের উপর দিয়া কেহ চলিয়া যাইলে যেমন যন্ত্রণার অনুভব হয় ঐকালে ঠিক সেইরূপ যন্ত্রণা অনুভব করিয়াছিলাম। ঐরূপ ভাবাবস্থা বড়ই যন্ত্রণাদায়ক, আমার উহা ছয় ঘণ্টাকাল মাত্র ছিল, তাহাতেই অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলাম।"

(৩) পদদলিত নবীন দূর্বাদল

কালীবাটীর চাঁদনি-সমাযুক্ত বৃহৎ ঘাটে দণ্ডায়মান হইয়া ঠাকুর একদিন ভাবাবেশে গঙ্গা দর্শন করিতেছিলেন। ঘাটে তখন দুইখানি নৌকা লাগিয়াছিল এবং মাঝিরা কোন বিষয় লইয়া পরস্পর কলহ করিতেছিল। কলহ ক্রমে বাড়িয়া উঠিয়া সবল ব্যক্তি দুর্বলের পৃষ্ঠদেশে বিষম চপেটাঘাত করিল। ঠাকুর উহাতে চীৎকার করিয়া ক্রন্দন করিয়া উঠিলেন। তাঁহার ঐরূপ কাতর ক্রন্দন কালীঘরে হৃদয়ের কর্ণে সহসা প্রবেশ করায় সে দ্রুতপদে তথায় আগমনপূর্বক দেখিল, তাঁহার পৃষ্ঠদেশ আরক্তিম হইয়াছে এবং ফুলিয়া উঠিয়াছে। ক্রোধে অধীর হইয়া হৃদয় বারংবার বলিতে লাগিল, "মামা, কে তোমায় মারিয়াছে দেখাইয়া দাও, আমি তার মাথাটা ছিঁড়িয়া লই। পরে ঠাকুর কথঞ্চিত শান্ত হইলে মাঝিদিগের বিবাদ হইতে তাঁহার পৃষ্ঠে

(৪) নৌকায় মাঝিদ্বয়ের পরস্পর কলহে ঠাকুরের নিজ শরীরে আঘাতানুভব

আঘাতজনিত বেদনাচিহ্ন উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া হৃদয় স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিল, ইহাও কি কখন সম্ভবপর! ঘটনাটি শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় ঠাকুরের শ্রীমুখে শ্রবণ করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। ঠাকুরের সম্বন্ধে ঐরূপ অনেক ঘটনার* উল্লেখ করা যাইতে পারে।

* গুরুভাব, পূর্বার্ধ—২য় অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়

জন্মভূমিসন্দর্শন

প্রায় ছয়মাস কাল ভুগিয়া ঠাকুরের শরীর অবশেষে ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্ত হইল এবং মন ভাবমুখে দ্বৈতাদ্বৈতভূমিতে অবস্থান করিতে অনেকাংশে অভ্যস্ত হইয়া আসিল। কিন্তু তাঁহার শরীর তখনও পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হয় নাই। সুতরাং বর্ষাগমে গঙ্গার জল লবণাক্ত হইলে বিশুদ্ধ পানীয়ের অভাবে তাঁহার পেটের পীড়া পুনরায় দেখা দিবার সম্ভাবনা ভাবিয়া মথুরবাবু প্রমুখ সকলে স্থির করিলেন, তাঁহার কয়েক মাসের জন্য জন্মভূমি কামারপুকুরে গমন করাই শ্রেয়ঃ। তখন সন ১২৭৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস হইবে। মথুরপত্নী ভক্তিমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরের কামারপুকুরের সংসার শিবের সংসারের ন্যায় চির-দরিদ্র বলিয়া জানিতেন। অতএব সেখানে যাইয়া 'বাবা'কে যাহাতে কোন দ্রব্যের অভাবে কষ্ট পাইতে না হয়, এই প্রকারে তন্ন তন্ন করিয়া সকল বিষয় গুছাইয়া তাঁহার সঙ্গে দিবার জন্য আয়োজন করিতে লাগিলেন।* অনন্তর শুভমুহূর্তের উদয় হইলে, ঠাকুর যাত্রা করিলেন। হৃদয় ও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার সঙ্গে যাইলেন। তাঁহার বৃদ্ধা জননী কিন্তু গঙ্গাতীরে বাস করিবেন বলিয়া ইতিপূর্বে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাই স্থির রাখিয়া দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন। ইতিপূর্বে প্রায় সাড়ে

ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন

* গুরুভাব, উত্তরার্ধ—১ম অধ্যায়

ছয় বৎসরকাল ঠাকুর কামারপুকুরে আগমন করেন নাই, সুতরাং তাঁহার আত্মীয়বর্গ যে তাঁহাকে দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছিলেন, একথা বলা বাহুল্য। কখনও স্ত্রীবেশ ধরিয়া 'হরি হরি' করিতেছেন, কখনও সন্ন্যাসী হইয়াছেন, কখনও 'আল্লা আল্লা' বলিতেছেন, প্রভৃতি তাঁহার সম্বন্ধে নানা কথা মধ্যে মধ্যে তাঁহাদিগের কর্ণগোচর হওয়ায় ঐরূপ হইবার বিশেষ কারণ যে ছিল, একথা বলিতে হইবে না। কিন্তু ঠাকুর তাঁহাদিগের মধ্যে আসিবামাত্র তাঁহাদিগের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হইল। তাঁহারা দেখিলেন, তিনি পুর্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন। সেই অমায়িকতা, সেই প্রেমপূর্ণ হাস্য-পরিহাস, সেই কঠোর সত্যনিষ্ঠা, সেই ধর্মপ্রাণতা, সেই হরিনামে বিহ্বল হইয়া আত্মহারা হওয়া—সেই সকলই তাঁহাতে পুর্বের ন্যায় পূর্ণমাত্রায় রহিয়াছে, কেবল কি একটা অদৃষ্টপূর্ব অনির্বচনীয় দিব্যাবেশ তাঁহার শরীরমনকে সর্বদা এমন সমুদ্ভাসিত করিয়া রাখিয়াছে যে, সহসা তাঁহার সম্মুখীন হইতে এবং তিনি স্বয়ং ঐরূপ না করিলে ক্ষুদ্র সংসারের বিষয় লইয়া তাঁহার সহিত আলাপ পরিচয় করিতে তাঁহাদিগের অন্তরে বিষম সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হয়। তদ্ভিন্ন অন্য এক বিষয় তাঁহারা এখন বিশেষরূপে এই ভাবে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা দেখিয়াছিলেন, তাঁহার নিকটে থাকিলে সংসারের সকল দুর্ভাবনা কোথায় অপসারিত হইয়া তাঁহাদিগের প্রাণে একটি ধীর স্থির আনন্দ ও শান্তির ধারা প্রবাহিত থাকে এবং দূরে যাইলে পুনরায় তাঁহার নিকটে যাইবার জন্য একটা অজ্ঞাত আকর্ষণে তাঁহারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হয়েন। সে যাহা হউক, বহুকাল পরে তাঁহাকে পাইয়া এই দরিদ্র সংসারে এখন আনন্দের হাটবাজার বসিল, এবং নববধূকে আনাইয়া

ঠাকুরকে তাঁহার আত্মীয়বন্ধুগণ যেভাবে দেখিয়াছিল

সুখের মাত্রা পূর্ণ করিবার জন্য রমণীগণের নির্দেশে ঠাকুরের শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামে লোক প্রেরিত হইল। ঠাকুর এ বিষয় জানিতে পারিয়া উহাতে বিশেষ সম্মতি বা আপত্তি কিছুই প্রকাশ করিলেন না। বিবাহের পর নববধূর ভাগ্যে একবার মাত্র স্বামিসন্দর্শনলাভ হইয়াছিল। কারণ, তাঁহার সপ্তম বর্ষ বয়সকালে কুলপ্রথানুসারে ঠাকুরকে একদিন জয়রামবাটীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। কিন্তু তখন তিনি নিতান্ত বালিকা; সুতরাং ঐ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহার এইটুকুমাত্রই মনে ছিল যে, হৃদয়ের সহিত ঠাকুর তাঁহার পিত্রালয়ে আসিলে বাটীর কোন নিভৃত অংশে তিনি লুকাইয়াও পরিত্রাণ পান নাই। কোথা হইতে অনেকগুলি পদ্মফুল আনিয়া হৃদয় তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়াছিল এবং লজ্জা ও ভয়ে তিনি নিতান্ত সঙ্কুচিতা হইলেও তাঁহার পাদপদ্ম পূজা করিয়াছিল। ঐ ঘটনার প্রায় ছয় বৎসর পরে তাঁহার ত্রয়োদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে তাঁহাকে কামারপুকুরে প্রথম লইয়া যাওয়া হয়। সেবার তাঁহাকে তথায় একমাস থাকিতেও হইয়াছিল। কিন্তু ঠাকুর ও ঠাকুরের জননী তখন দক্ষিণেশ্বরে থাকায় উভয়ের কাহাকেও দেখা তাঁহার ভাগ্যে হইয়া উঠে নাই। উহার ছয় মাস আন্দাজ পরে পুনরায় শ্বশুরালয়ে আগমনপূর্বক দেড়মাস কাল থাকিয়াও পূর্বোক্ত কারণে তিনি তাঁহাদের কাহাকেও দেখিতে পান নাই। মাত্র তিন-চারি মাস তাঁহার তথা হইতে পিত্রালয়ে ফিরিবার পরেই এখন সংবাদ আসিল—ঠাকুর আসিয়াছেন, তাঁহাকে কামারপুকুরে যাইতে হইবে। তিনি তখন ছয়-সাত মাস হইল চতুর্দশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছেন। সুতরাং বলিতে গেলে বিবাহের পরে ইহাই তাঁহার প্রথম স্বামিসন্দর্শন।

শ্রীশ্রীমার কামারপুকুরে আগমন

কামারপুকুরে ঠাকুর এবার ছয়-সাত মাস ছিলেন। তাঁহার বাল্য-বন্ধুগণ এবং গ্রামস্থ পরিচিত স্ত্রী-পুরুষ সকলে তাঁহার সহিত পূর্বের ন্যায় মিলিত হইয়া তাঁহার প্রীতিসম্পাদনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরও বহুকাল পরে তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল কঠোর পরিশ্রমের পর অবসরলাভে চিন্তাশীল মনীষিগণ বালক-বালিকাদিগের অর্থহীন উদ্দেশ্যরহিত ক্রীড়াদিতে যোগদান করিয়া যেরূপ আনন্দ অনুভব করেন, কামারপুকুরের স্ত্রী-পুরুষ সকলের ক্ষুদ্র সাংসারিক জীবনে যোগদান করিয়া ঠাকুরের বর্তমান আনন্দ তদ্রূপ হইয়াছিল। তবে, ইহজীবনের নশ্বরতা অনুভব করিয়া যাহাতে তাহারা সংসারে থাকিয়াও ধীরে ধীরে সংযত হইতে এবং সকল বিষয়ে ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষালাভ করে, তদ্বিষয়ে তিনি সর্বদা দৃষ্টি রাখিতেন, একথা নিশ্চয় বলা যায়। ক্রীড়া, কৌতুক, হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়া তিনি আমাদিগকে নিরন্তর ঐসকল বিষয় যেভাবে শিক্ষা দিতেন, তাহা হইতে আমরা পূর্বোক্ত কথা অনুমান করিতে পারি।

আত্মীয়বর্গ ও বাল্যবন্ধুগণের সহিত ঠাকুরের এই কালের আচরণ

আবার এই ক্ষুদ্র পল্লীর অন্তর্গত ক্ষুদ্র সংসারে থাকিয়া কেহ কেহ ধর্মজীবনে আশাতীত অগ্রসর হইয়াছে দেখিয়া তিনি ঈশ্বরের অচিন্ত্য মহিমা-ধ্যানে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। ঐ বিষয়ক একটি ঘটনার তিনি বহুবার আমাদিগের নিকট উল্লেখ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—এই সময়ে একদিন তিনি আহারান্তে নিজগৃহে বিশ্রাম করিতেছিলেন। প্রতিবেশিনী কয়েকটি রমণী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন এবং নিকটে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার সহিত ধর্মসম্বন্ধীয় নানা

উহাদিগের মধ্যে কোন কোন ব্যক্তির আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

প্রশ্নালাপে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ সময় সহসা তাঁহার ভাবাবেশ হয় এবং অনুভূতি হইতে থাকে তিনি যেন মীনরূপে সচ্চিদানন্দসাগরে পরমানন্দে ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন এবং নানাভাবে সন্তরণক্রীড়া করিতেছেন। কথা কহিতে কহিতে তিনি অনেক সময়ে ঐরূপে ভাবাবেশে মগ্ন হইতেন। সুতরাং রমণীগণ উহাতে কিছুমাত্র মন না দিয়া উপস্থিত বিষয়ে নিজ নিজ মতামত প্রকাশ করিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজন তাঁহাদিগকে ঐরূপ করিতে নিষেধ করিয়া ঠাকুরের ভাবাবেশ যতক্ষণ না ভঙ্গ হয়, ততক্ষণ স্থির হইয়া থাকিতে বলিলেন। বলিলেন, "উনি (ঠাকুর) এখন মীন হইয়া সচ্চিদানন্দসাগরে সন্তরণ দিতেছেন, গোলমাল করিলে উঁহার ঐ আনন্দে ব্যাঘাত হইবে।" রমণীর কথায় অনেকে তখন বিশ্বাস স্থাপন না করিলেও সকলে নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। পরে ভাবভঙ্গে ঠাকুরকে ঐকথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, "রমণী সত্যই বলিয়াছে। আশ্চর্য, কিরূপে ঐ বিষয় জানিতে পারিল!"

কামারপু[illegible] । দৈনন্দিন জীবন ঠাকুরের নিকটে এখন যে অনেকাংশে নবীন বলিয়া বোধ হইয়াছিল, একথা বুঝিতে পারা যায়।

কামারপুকুর-বাসীদিগকে ঠাকুরের অপূর্ব নূতন ভাবে দেখিবার কারণ

বিদেশ হইতে বহুকাল পরে প্রত্যাগত ব্যক্তির, স্বদেশের প্রত্যেক ব্যক্তি ও বিষয়কে যেমন নূতন বলিয়া বোধ হয়, ঠাকুরের এখন অনেকটা তদ্রূপ হইয়াছিল। কারণ ঐ কেবল সাড়ে ছয় বৎসরকাল মাত্র জন্মভূমি হইতে দূরে থাকিলেও ঐকালের মধ্যে ঠাকুরের অন্তরে সাধনার প্রবল ঝটিকা প্রবাহিত হইয়া উহাতে আমূল পরিবর্তন উপস্থিত করিয়াছিল। ঐ সময়ে তিনি

আপনাকে ভুলিয়াছিলেন, জগৎ ভুলিয়াছিলেন এবং দূরাৎ সুদূরে—দেশকালের সীমার বহির্ভাগে যাইয়া উহার ভিতরে পুনরায় ফিরিবার কালে সর্বভূতে ব্রহ্মদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া আগমনপূর্বক সকল ব্যক্তি ও বিষয়কে অপূর্ব নবীন ভাবে দেখিতে পাইয়াছিলেন। চিন্তাশ্রেণীসমূহের পারম্পর্য হইতেই আমাদিগের কালের অনুভূতি এবং উহার দৈর্ঘ্য-স্বল্পতাদি পরিমাণের উপলব্ধি হইয়া থাকে, একথা দর্শনপ্রসিদ্ধ। ঐজন্য স্বল্পকালের মধ্যে প্রভূত চিন্তারাশির অন্তরে উদয় ও লয় হইলে ঐকাল আমাদিগের নিকট সুদীর্ঘ বলিয়া প্রতীত হয়। পূর্বোক্ত আট বৎসরে ঠাকুরের অন্তরে কি বিপুল চিন্তারাশি প্রকটিত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়! সুতরাং এ কালকে তাহার যে এক যুগতুল্য বলিয়া অনুভব হইবে, ইহা বিচিত্র নহে।

কামারপুকুরে স্ত্রী-পুরুষ সকলকে ঠাকুর কি অদ্ভুত প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটী হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণ, কামার, সূত্রধর, সুবর্ণ-বণিক প্রভৃতি সকল জাতীয় প্রতিবেশিগণের পরিবারভুক্ত স্ত্রী-পুরুষদিগের সকলেই তাঁহার সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ প্রেমসম্বন্ধে নিয়ন্ত্রিত ছিল। শ্রীযুক্ত ধর্মদাস লাহার সরলহৃদয়া ভক্তিমতী বিধবা কন্যা প্রসন্নও ঠাকুরের বাল্যসখা, তৎপুত্র গয়াবিষ্ণু লাহা, সরল বিশ্বাসী শ্রীনিবাস শাঁখারী, পাইনদের বাটীর ভক্তি-পরায়ণা রমণীগণ, ঠাকুরের ভিক্ষামাতা কামারকন্যা ধনী প্রভৃতি অনেকের ভক্তিভালবাসার কথা ঠাকুর বিশেষ প্রীতির সহিত অনেক সময় আমাদিগকে বলিতেন এবং আমরাও শুনিয়া মুগ্ধ হইতাম। ইহারা সকলে প্রায় সর্বক্ষণ তাঁহার নিকট উপস্থিত থাকিতেন। বিষয় বা

জন্মভূমির সহিত ঠাকুরের চির-প্রেমসম্বন্ধ

গৃহকর্মের অনুরোধে যাঁহারা ঐরূপ করিতে পারিতেন না, তাঁহারা সকাল, সন্ধ্যা বা মধ্যাহ্নে অবসর পাইলেই আসিয়া উপস্থিত হইতেন। রমণীগণ তাঁহাকে ভোজন করাইয়া পরম পরিতৃপ্তি লাভ করিতেন, তজ্জন্য নানাবিধ খাদ্যসামগ্রী নিজ সঙ্গে লইয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইতেন। গ্রামবাসিগণের ঐসকল মধুর আচরণ এবং আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকিয়াও ঠাকুর নিরন্তর কিরূপ দিব্য ভাবাবেশে থাকিতেন, সেসকল কথার আভাস আমরা অন্যত্র পাঠককে দিয়াছি,* সেজন্য পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

ঠাকুরের নিজ পত্নীর প্রতি কর্তব্যপালনের আরম্ভ

কামারপুকুরে আসিয়া ঠাকুর এই সময়ে একটি সুমহৎ কর্তব্যপালনে যত্নপরায়ণ হইয়াছিলেন। নিজ পত্নীর তাঁহার নিকটে আসা না আসা সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলেও যখন তিনি তাঁহার সেবা করিতে কামারপুকুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ঠাকুর তখন তাঁহাকে শিক্ষাদীক্ষাদি প্রদানপূর্বক তাঁহার কল্যাণসাধনে তৎপর হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে বিবাহিত জানিয়া শ্রীমদাচার্য তোতাপুরী তাঁহাকে এক সময়ে বলিয়াছিলেন, "তাহাতে আসে যায় কি? স্ত্রী নিকটে থাকিলেও যাহার ত্যাগ, বৈরাগ্য, বিবেক, বিজ্ঞান সর্বতোভাবে অক্ষুণ্ণ থাকে, সেই ব্যক্তিই ব্রহ্মে যথার্থ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; স্ত্রী ও পুরুষ উভয়কেই যিনি সমভাবে আত্মা বলিয়া সর্বক্ষণ দৃষ্টি ও তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারেন, তাঁহারই যথার্থ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ হইয়াছে; স্ত্রী-পুরুষে ভেদদৃষ্টিসম্পন্ন অপর সকলে সাধক হইলেও ব্রহ্মবিজ্ঞান হইতে বহুদূরে রহিয়াছে।" শ্রীমৎ তোতার পূর্বোক্ত কথা ঠাকুরের স্মরণপথে উদিত হইয়া তাঁহাকে বহুকালব্যাপী সাধনলব্ধ

* গুরুভাব, উত্তরার্ধ—১ম অধ্যায়

নিজ বিজ্ঞানের পরীক্ষায় এবং নিজ পত্নীর কল্যাণসাধনে নিযুক্ত করিয়াছিল।

কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইলে ঠাকুর কখনও কোনও কার্য উপেক্ষা বা অর্ধসম্পন্ন করিয়া ফেলিয়া রাখিতে পারিতেন না; বর্তমান বিষয়েও তদ্রূপ হইয়াছিল। ঐহিক, পারত্রিক সকল বিষয়ে সর্বতোভাবে তাঁহার মুখাপেক্ষী বালিকা-পত্নীকে শিক্ষা প্রদান করিতে অগ্রসর হইয়া তিনি ঐ বিষয়ে অর্ধ নিষ্পন্ন করিয়া ক্ষান্ত হন নাই। দেবতা, গুরু ও অতিথি প্রভৃতির সেবা এবং গৃহকর্মে যাহাতে তিনি কুশলা হয়েন, টাকার সদ্ব্যবহার করিতে পারেন এবং সর্বোপরি ঈশ্বরে সর্বস্ব সমর্পণ করিয়া দেশকালপাত্রভেদে সকলের সহিত ব্যবহার করিতে নিপুণা হইয়া উঠেন,* তদ্বিষয়ে এখন হইতে তিনি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন। অখণ্ডব্রহ্মচর্য-সম্পন্ন নিজ আদর্শ জীবন সম্মুখে রাখিয়া পূর্বোক্তরূপ শিক্ষাপ্রদানের ফল কতদূর কিরূপ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের আমরা অন্যত্র আভাস প্রদান করিয়াছি। অতএব এখানে সংক্ষেপে ইহাই বলিলে চলিবে যে, শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী ঠাকুরের কামগন্ধরহিত বিশুদ্ধ প্রেমলাভে সর্বতোভাবে পরিতৃপ্তা হইয়া সাক্ষাৎ ইষ্টদেবতাজ্ঞানে ঠাকুরকে আজীবন পূজা করিতে এবং তাঁহার শ্রীপদানুসারিণী হইয়া নিজ জীবন গড়িয়া তুলিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ে ঠাকুর কতদূর সুসিদ্ধ হইয়াছিলেন

পত্নীর প্রতি কর্তব্যপালনে অগ্রসর ঠাকুরকে ভৈরবী ব্রাহ্মণী এখন অনেক সময় বুঝিতে পারেন নাই। শ্রীমৎ তোতার সহিত মিলিত হইয়া

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায় এবং ৪র্থ অধ্যায়

ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার কালে তিনি তাঁহাকে ঐ কর্ম হইতে বিরত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।* তাঁহার মনে হইয়াছিল, সন্ন্যাসী হইয়া অদ্বৈততত্ত্বের সাধনে অগ্রসর হইলে ঠাকুরের হৃদয় হইতে ঈশ্বরপ্রেমের এককালে উচ্ছেদ হইয়া যাইবে। ঐরূপ কোন আশঙ্কাই এই সময়ে তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। বোধ হয় তিনি ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর নিজ পত্নীর সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠভাবে মিলিত হইলে তাঁহার ব্রহ্মচর্যের হানি হইবে। ঠাকুর কিন্তু পূর্ববারের ন্যায় এবারেও ব্রাহ্মণীর উপদেশ রক্ষা করিয়া চলিতে পারেন নাই। ব্রাহ্মণী যে উহাতে নিতান্ত ক্ষুণ্ণা হইয়াছিলেন, একথা বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু ঐরূপেই এই বিষয়ের পরিসমাপ্তি হয় নাই। ঐ ঘটনায় তাঁহার অভিমান প্রতিহত হইয়া ক্রমে অহঙ্কারে পরিণত হইয়াছিল এবং কিছুকালের জন্য উহা তাঁহাকে ঠাকুরের প্রতি শ্রদ্ধাবিহীনা করিয়াছিল। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, সময়ে সময়ে তিনি ঐ বিষয়ের প্রকাশ্য পরিচয় পর্যন্ত প্রদান করিয়া বসিতেন। যথা—আধ্যাত্মিক বিষয়ে কোন প্রশ্ন তাঁহার সমীপে উত্থাপন করিয়া যদি কেহ বলিত, শ্রীরামকৃষ্ণদেবকে ঐকথা জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার মতামত গ্রহণ করিবে, তাহা হইলে ব্রাহ্মণী ক্রুদ্ধা হইয়া বলিয়া বসিতেন, "সে আবার বলিবে কি? তাহার চক্ষুদান ত আমিই করিয়াছি!" অথবা সামান্য কারণে এবং সময়ে সময়ে বিনা কারণে বাটীর স্ত্রীলোকদিগের উপরে অসন্তুষ্ট হইয়া তিরস্কার করিয়া বসিতেন। ঠাকুর কিন্তু তাঁহার ঐরূপ কথা বা অন্যায় অত্যাচারে অবিচলিত থাকিয়া তাঁহাকে পূর্বের ন্যায় ভক্তিশ্রদ্ধা

পত্নীর প্রতি ঠাকুরের ঐরূপ আচরণদর্শনে ব্রাহ্মণীর আশঙ্কা ও ভাবান্তর

* গুরুভাব, পূর্বার্ধ—২য় অধ্যায়

করিতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার নির্দেশে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী শ্বশ্রূতুল্যা জানিয়া ভক্তিপ্রীতির সহিত সর্বদা ব্রাহ্মণীর সেবাদিতে নিযুক্তা থাকিতেন এবং তাঁহার কোন কথা বা কার্যের কখনও প্রতিবাদ করিতেন না।

অভিমান-অহঙ্কারের বৃদ্ধিতে ব্রাহ্মণীর বুদ্ধিনাশ

অভিমান, অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইলে বুদ্ধিমান মনুষ্যেরও মতিভ্রম উপস্থিত হয়। অতএব ঐরূপ অহঙ্কার পদে পদে প্রতিহত হইতে দেখিয়াই মানব উহার বিপরীত ফল অবশ্যম্ভাবী বলিয়া জানিতে পারে এবং উহাকে পরিত্যাগপূর্বক নিজ কল্যাণসাধনের অবসর লাভ করে। বিদুষী সাধিকা ব্রাহ্মণীরও এখন ঐরূপ হইয়াছিল। অহঙ্কারের বশবর্তিনী হইয়া তিনি, 'যেখানে যেমন, সেখানে তেমন' ব্যবহার করিতে না পারিয়া এই সময়ে একদিন বিষম অনর্থ উপস্থিত করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ক ঘটনা

শ্রীনিবাস শাঁখারীর কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চ জাতিতে জন্মপরিগ্রহ না করিলেও শ্রীনিবাস ভগবদ্ভক্তিতে অনেক ব্রাহ্মণের অপেক্ষা বড় ছিলেন। শ্রীশ্রীরঘুবীরের প্রসাদ পাইবার জন্য ইনি একদিন এই সময়ে ঠাকুরের সমীপে আগমন করেন। ভক্ত শ্রীনিবাসকে পাইয়া ঠাকুর এবং তাঁহার পরিবারবর্গের সকলে সেদিন বিশেষ আনন্দিত হইয়াছিলেন। ভক্তিমতী ব্রাহ্মণীও শ্রীনিবাসের বিশ্বাসভক্তি-দর্শনে পরিতুষ্টা হইয়াছিলেন। মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত নানা ভক্তিপ্রসঙ্গে অতিবাহিত হইল এবং শ্রীশ্রীরঘুবীরের ভোগরাগাদি সম্পূর্ণ হইলে শ্রীনিবাস প্রসাদ পাইতে বসিলেন। ভোজনান্তে প্রচলিত প্রথামত তিনি আপন উচ্ছিষ্ট প'রষ্কার করিতে প্রবৃত্ত হইলে ব্রাহ্মণী তাঁহাকে নিষেধ করিলেন এবং বলিলেন, "আমরাই উহা করিব

এখন।” ব্রাহ্মণী বারংবার ঐরূপ বলায় শ্রীনিবাস অগত্যা নিরস্ত হইয়া নিজ বাটীতে গমন করিলেন।

ব্রাহ্মণীর সহিত হৃদয়ের কলহ

সমাজ-প্রবল পল্লীগ্রামে সামান্য সামাজিক নিয়মভঙ্গ লইয়া অনেক সময় বিষম গণ্ডগোল এবং দলাদলির সৃষ্টি হইয়া থাকে। এখনও ঐরূপ হইবার উপক্রম হইল। কারণ, ব্রাহ্মণকন্যা ভৈরবী শ্রীনিবাসের উচ্ছিষ্ট মোচন করিবেন, এই বিষয় লইয়া ঠাকুরকে দর্শন করিতে সমাগতা পল্লীবাসিনী ব্রাহ্মণকন্যাগণ বিশেষ আপত্তি করিতে লাগিলেন। ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহাদের ঐরূপ আপত্তি স্বীকার করিতে সম্মত হইলেন না। ক্রমে গণ্ডগোল বাড়িয়া উঠিল এবং ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয় ঐকথা শুনিতে পাইল। সামান্য বিষয় লইয়া বিষম গোল বাধিবার সম্ভাবনা দেখিয়া হৃদয় ব্রাহ্মণীকে ঐ কার্যে বিরত হইতে বলিলেও তিনি তাহার কথা গ্রহণ করিলেন না। তখন ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের মধ্যে তুমুল বিবাদ উপস্থিত হইল। হৃদয় উত্তেজিত হইয়া বলিল, “ঐরূপ করিলে তোমাকে ঘরে থাকিতে স্থান দিব না।” ব্রাহ্মণীও ছাড়িবার পাত্রী নহেন, বলিলেন—“না দিলে ক্ষতি কি? শীতলার ঘরে* মনসা† শোবে এখন!” তখন বাটীর অন্য সকলে মধ্যস্থ হইয়া নানা অনুনয়বিনয়ে ব্রাহ্মণীকে ঐ কার্য হইতে নিরস্ত করিয়া বিবাদশান্তি করিলেন।

অভিমানিনী ব্রাহ্মণী সেদিন নিরস্তা হইলেও অন্তরে বিষম আঘাত পাইয়াছিলেন। ক্রোধের উপশম হইলে তিনি শান্তভাবে চিন্তা করিয়া

* অর্থাৎ দেবমন্দিরে।

† ব্রাহ্মণী ঐরূপে ক্রুদ্ধ সর্পের সহিত আপনাকে সমতুল্য করেন।

আপন ভ্রম বুঝিতে পারিলেন এবং ভাবিলেন, এখানে উপস্থিত হইতেছে, তখন অতঃপর এইখানে তাঁহার আর অবস্থান করা শ্রেয়ঃ নহে। সদসদ্বিচারসম্পন্ন বিবেকী সাধক যখন অন্তরদর্শনে নিযুক্ত হয়েন, চিত্তের কোন মলিন ভাবই তখন তাঁহার নিকট আত্মগোপন করিতে পারে না—ব্রাহ্মণীরও এখন তদ্রূপ হইয়াছিল। ঠাকুরের প্রতি তাঁহার ভাবপরিবর্তনের আলোচনা করিয়া তিনি উহারও মূলে আত্মদোষ দেখিতে পাইলেন এবং মনে মনে সাতিশয় অনুতপ্তা হইলেন। অনন্তর কয়েক দিন গত হইলে এক দিবস তিনি ভক্তিসহকারে বিবিধ পুষ্পমাল্য স্বহস্তে রচনা ও চন্দনচর্চিত করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গজ্ঞানে ঠাকুরকে মনোহর বেশে ভূষিত করিলেন এবং সর্বান্তঃকরণে ক্ষমাপ্রার্থনা করিলেন। পরে সংযতা হইয়া মনপ্রাণ ঈশ্বরে অর্পণপূর্বক কামারপুকুর পশ্চাতে রাখিয়া কাশীধামের পথ অবলম্বন করিলেন। কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর কাল ঠাকুরের সঙ্গে নিরন্তর থাকিবার পরে ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকট বিদায়গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণীর নিজ ভ্রম বুঝিতে পারিয়া অপরাধের আশঙ্কা, অনুতাপ ও ক্ষমা চাহিয়া কাশীগমন

ঐরূপে প্রায় সাতমাসকাল নানাভাবে কামারপুকুরে অতিবাহিত করিয়া সম্ভবতঃ সন ১২৭৪ সালের অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুর পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার শরীর তখন পূর্বের ন্যায় সুস্থ ও সবল হইয়াছিল। এখানে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে তাঁহার জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহার কথা আমরা এখন পাঠককে বলিব।

ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন

অষ্টাদশ অধ্যায়

তীর্থদর্শন ও হৃদয়রামের কথা

মথুরবাবু এই সময়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পুণ্যতীর্থসকল দর্শনে গমন করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। তাঁহার পরিবারবর্গ এবং গুরুপুত্রাদি অন্যান্য অনেক ব্যক্তি সঙ্গে যাইবেন বলিয়া স্থির হইয়াছিল। সস্ত্রীক মথুরামোহন ঠাকুরকে সঙ্গে লইবার জন্য বিশেষরূপে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। ফলে বৃদ্ধা জননী* এবং ভাগিনেয় হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঠাকুর তাঁহাদিগের সহিত যাইতে সম্মত হইলেন।

ঠাকুরের তীর্থযাত্রা স্থির হওয়া

অনন্তর শুভদিন আগত দেখিয়া মথুরবাবু ঠাকুরপ্রমুখ সকলকে সঙ্গে লইয়া যাত্রা করিলেন। তখন সন ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের মধ্যভাগ, ইংরাজী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারি তারিখ হইবে। ঠাকুরের তীর্থযাত্রা-সম্বন্ধে অনেক কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।† সেজন্য হৃদয়ের নিকট ঐ সম্বন্ধে যাহা শুনিয়াছি, কেবলমাত্র তাহারই এখানে উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইব।

ঐ যাত্রার সময়-নিরূপণ

হৃদয় বলিত, শতাধিক ব্যক্তিকে সঙ্গে লইয়া মথুরবাবু এইকালে

---

* কেহ কেহ বলেন, ঠাকুরের জননী তাঁহার সহিত তীর্থে গমন করেন নাই। হৃদয় কিন্তু আমাদিগকে অন্যরূপ বলিয়াছিল।

† গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়

তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় শ্রেণীর একখানি এবং তৃতীয় শ্রেণীর তিনখানি গাড়ী রেলওয়ে কোম্পানির নিকট হইতে রিজার্ভ (reserve) করিয়া লওয়া হইয়াছিল এবং বন্দোবস্ত ছিল কলিকাতা হইতে কাশীর মধ্যে যে কোন স্থানে ঐ চারিখানি গাড়ী ইচ্ছামত কাটাইয়া লইয়া মথুরবাবু কয়েক দিন অবস্থান করিতে পারিবেন।

ঐ যাত্রার বন্দোবস্ত

দেওঘরে ৺বৈদ্যনাথজীকে দর্শন ও পূজাদি করিবার জন্য মথুরবাবু কয়েক দিন অবস্থান করেন। একটি বিশেষ ঘটনা এখানে উপস্থিত হইয়াছিল। এই স্থানের এক দরিদ্র পল্লীর স্ত্রী-পুরুষদিগের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয় করুণায় বিগলিত হইয়াছিল এবং মথুরবাবুকে বলিয়া তিনি তাহাদিগকে এক দিবস ভোজন এবং প্রত্যেককে এক একখানি বস্ত্র প্রদান করিয়াছিলেন।*

৺বৈদ্যনাথদর্শন ও দরিদ্রসেবা

বৈদ্যনাথ হইতে শ্রীযুক্ত মথুর একেবারে ৺কাশীধামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পথিমধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নাই। কেবল, কাশীর সন্নিকটে কোন স্থানে কার্যান্তরে গাড়ী হইতে নামিয়া শ্রীরামকৃষ্ণদেব ও হৃদয় উঠিতে না উঠিতেই গাড়ী ছাড়িয়া দিয়াছিল। শ্রীযুক্ত মথুর উহাতে ব্যস্ত হইয়া কাশী হইতে এই মর্মে তার করিয়া পাঠান যে, পরবর্তী গাড়ীতে যেন তাঁহাদিগকে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু পরবর্তী গাড়ীর জন্য তাঁহাদিগকে অপেক্ষা করিতে হয় নাই। কোম্পানির জনৈক বিশিষ্ট কর্মচারী শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কোন কার্যের তত্ত্বাবধানে একখানি স্বতন্ত্র

পথে বিঘ্ন

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়

(special) গাড়ীতে করিয়া স্বল্পক্ষণ পরেই ঐ স্থানে উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে বিপন্ন দেখিয়া নিজ গাড়ীতে উঠাইয়া লইয়া কাশীধামে নামাইয়া দেন। রাজেন্দ্রবাবু কলিকাতার বাগবাজার পল্লীতে বাস করিতেন।

কাশীধামে পৌঁছিয়া মথুরবাবু কেদার ঘাটের উপরে পাশাপাশি দুইখানি বাটী ভাড়া লইয়াছিলেন। পূজা, দান প্রভৃতি সকল বিষয়ে তিনি এখানে মুক্তহস্তে ব্যয় করিয়াছিলেন।* ঐ কারণে এবং বাটীর বাহিরে কোন স্থানে গমন করিবার কালে রূপার ছত্র ও আসাসোঁটা প্রভৃতি লইয়া তাঁহার অগ্র পশ্চাৎ দ্বারবানগণকে যাইতে দেখিয়া লোকে তাঁহাকে একজন রাজরাজড়া বলিয়া ধারণা করিয়াছিল।

কেদার ঘাটে অবস্থান ও ৺বিশ্বনাথদর্শন

এখানে থাকিবার কালে শ্রীরামকৃষ্ণদেব পানসিতে চাপিয়া প্রায় প্রত্যহ ৺বিশ্বনাথজীউর দর্শনে যাইতেন। হৃদয় তাঁহার সঙ্গে যাইত। যাইতে যাইতে ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন, দেবদর্শনকালের ত কথাই নাই। ঐরূপে সকল দেবস্থানে তাঁহার ভাবাবেশ হইলেও ৺কেদারনাথের মন্দিরে তাঁহার বিশেষ ভাবাবেশ হইত।

ঠাকুর ও শ্রীত্রৈলঙ্গ স্বামী

দেবস্থান ভিন্ন ঠাকুর কাশীর বিখ্যাত সাধুদিগকে দর্শন করিতে যাইতেন। তখনও হৃদয় সঙ্গে থাকিত। ঐরূপে পরমহংসাগ্রণী শ্রীযুক্ত ত্রৈলঙ্গ স্বামীজীকে দর্শন করিতে তিনি একাধিকবার গমন করিয়াছিলেন। স্বামীজী তখন মৌনাবলম্বনে মণিকর্ণিকার ঘাটে থাকিতেন। প্রথম দর্শনের দিন স্বামীজী আপন নস্যদানি ঠাকুরের সম্মুখে ধারণপূর্বক ঠাকুরকে

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়

অভ্যর্থনা ও সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন এবং ঠাকুর তাঁহার ইন্দ্রিয় ও অবয়বসকলের গঠন লক্ষ্য করিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "ইঁহাতে যথার্থ পরমহংসের লক্ষণসকল বর্তমান, ইনি সাক্ষাৎ বিশ্বেশ্বর।" স্বামীজী তখন মণিকর্ণিকার পার্শ্বে একটি ঘাট বাঁধাইয়া দিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। ঠাকুরের অনুরোধে হৃদয় কয়েক কোদাল মৃত্তিকা ঐ স্থানে নিক্ষেপ করিয়া ঐ বিষয়ে সহায়তা করিয়াছিল। তৎপরে ঠাকুর একদিন স্বামীজীকে দেখিতে গিয়া স্বহস্তে পায়সান্ন খাওয়াইয়া দিয়াছিলেন।

পাঁচ সাত দিন কাশীতে থাকিয়া ঠাকুর মথুরের সহিত প্রয়াগে গমনপূর্বক পুণ্যসঙ্গমে স্নান ও ত্রিরাত্রি বাস করিয়াছিলেন। মথুরপ্রমুখ সকলে তথায় শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে মস্তক মুণ্ডিত করিলেও ঠাকুর উহা করেন নাই। বলিয়াছিলেন, "আমার করিবার আবশ্যক নাই।" প্রয়াগ হইতে মথুরবাবু পুনরায় ৺কাশীতে ফিরিয়াছিলেন এবং এক পক্ষকাল তথায় বাস করিয়া শ্রীবৃন্দাবনদর্শনে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

৺প্রয়াগধামে ঠাকুরের আচরণ

শ্রীবৃন্দাবনে মথুর নিধুবনের নিকটে একটি বাটীতে অবস্থান করিয়াছিলেন। কাশীর ন্যায় এখানেও তিনি মুক্তহস্তে দান করিয়াছিলেন এবং পত্নীসমভিব্যাহারে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া প্রত্যেক স্থলে কয়েক খণ্ড গিনি প্রণামীস্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন। নিধুবন ভিন্ন ঠাকুর এখানে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরিগোবর্ধন দর্শন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থলে তিনি ভাবাবেশে গিরিশৃঙ্গে আরোহণ করিয়াছিলেন। এখানে তিনি খ্যাতনামা সাধকসাধিকাগণকে দর্শন করিতে গিয়াছিলেন এবং

শ্রীবৃন্দাবনে নিধুবনাদি স্থানদর্শন •

গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১৩১ পৃঃ এবং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি, ১৪৫ পৃঃ।—প্রঃ

নিধুবনে গঙ্গামাতার দর্শনলাভে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। হৃদয়কে তাঁহার অঙ্গের লক্ষণসকল দেখাইয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "ইঁহার বিশেষ উচ্চাবস্থা লাভ হইয়াছে।"

এক পক্ষকাল আন্দাজ শ্রীবৃন্দাবনে থাকিয়া মথুরপ্রমুখ সকলে পুনরায় কাশীধামে আগমন করেন এবং ৺বিশ্বনাথের বিশেষ বেশ দর্শনের জন্য ১২৭৫ সালের বৈশাখ মাস পর্যন্ত অবস্থান করেন। ঐ সময়ে ঠাকুর এখানে স্বর্ণময়ী অন্নপূর্ণা প্রতিমা দর্শন করিয়াছিলেন।

৺কাশীতে প্রত্যাগমন ও স্থিতি

কাশীধামে যোগেশ্বরী নাম্নী ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহিত ঠাকুরের পুনরায় দেখা হইয়াছিল এবং চৌষট্টিযোগিনী নামক পল্লীস্থ তাঁহার আবাসে তিনি কয়েকবার গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণী ঐস্থলে মোক্ষদা নাম্নী একটি রমণীর সহিত বাস করিতেছিলেন। ঐ রমণীর ভক্তি-বিশ্বাসদর্শনে ঠাকুর পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন যাইবার কালে ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সঙ্গে গমন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণীকে ঠাকুর এখন হইতে শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, ঠাকুর তথা হইতে ফিরিবার স্বল্পকাল পরে ব্রাহ্মণী শ্রীবৃন্দাবনে দেহরক্ষা করিয়াছিলেন।

কাশীতে ব্রাহ্মণীকে দর্শন—ব্রাহ্মণীর শেষ কথা

শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থানকালে ঠাকুরের বীণা শুনিতে ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু সে সময়ে তথায় কোনও বীনকার উপস্থিত না থাকায় উহা সফল হয় নাই। কাশীতে ফিরিয়া তাঁহার মনে পুনরায় ঐ ইচ্ছা উদয় হয় এবং শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র সরকার নামক একজন অভিজ্ঞ বীনকারের ভবনে হৃদয়ের

বীনকার মহেশকে দেখিতে যাওয়া

সহিত উপস্থিত হইয়া তিনি তাঁহাকে বীণা শুনাইবার জন্য অনুরোধ করেন। মহেশবাবু কাশীস্থ মদনপুরা নামক পল্লীতে অবস্থান করিতেন। ঠাকুরের অনুরোধে তিনি সেদিন পরম আহ্লাদে অনেকক্ষণ পর্যন্ত বীণা বাজাইয়াছিলেন। বীণার মধুর ঝঙ্কার শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন, পরে অর্ধবাহ্যদশা উপস্থিত হইলে তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে 'মা, আমায় হুঁশ দাও, আমি ভাল করিয়া বীণা শুনিব'—এইরূপে প্রার্থনা করিতে শুনা গিয়াছিল। ঐরূপ প্রার্থনার পরে তিনি বাহ্যভাব-ভূমিতে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং সদানন্দে বীণা শ্রবণ-পূর্বক মধ্যে মধ্যে উহার সুরের সহিত নিজ স্বর মিলাইয়া গীত গাহিয়াছিলেন। অপরাহ্ণ পাঁচটা হইতে রাত্রি আটটা পর্যন্ত ঐরূপে আনন্দে অতিবাহিত হইলে মহেশবাবুর অনুরোধে তিনি ঐস্থানে কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া মথুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। মহেশবাবু তদবধি ঠাকুরকে প্রত্যহ দর্শন করিতে আগমন করিতেন। ঠাকুর বলিতেন—বীণা বাজাইতে বাজাইতে ইনি এককালে মত্ত হইয়া উঠিতেন।

কাশী হইতে শ্রীযুক্ত মথুর গয়াধামে যাইবার বাসনা প্রকাশ করেন। কিন্তু ঠাকুরের ঐ বিষয়ে বিশেষ আপত্তি* থাকায় তিনি ঐ সঙ্কল্প পরিত্যাগপূর্বক কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। হৃদয় বলিত,

দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাবর্তন ও আচরণ

ঐরূপে চারি মাস কাল তীর্থে ভ্রমণ করিয়া সন ১২৭৫ সালে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর মথুরবাবুর সহিত পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবন হইতে ঠাকুর রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ডের রজ আনয়ন

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৭ম অধ্যায়

করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি উহার কিয়দংশ পঞ্চবটীর চতুর্দিকে ছড়াইয়া দেন এবং অবশিষ্টাংশ নিজ সাধনকুটীরমধ্যে স্বহস্তে প্রোথিত করিয়া বলিয়াছিলেন—"আজ হইতে এই স্থল শ্রীবৃন্দাবনতুল্য দেবভূমি হইল।" হৃদয় বলিত, উহার অনতিকাল পরে তিনি নানাস্থানের বৈষ্ণব গোস্বামী ও ভক্তসকলকে মথুরবাবু দ্বারা নিমন্ত্রিত করাইয়া আনিয়া পঞ্চবটীতে মহোৎসবের আয়োজন করিয়াছিলেন। মথুরবাবু ঐকালে গোস্বামীদিগকে ১৬৲ টাকা এবং বৈষ্ণব ভক্তদিগকে ১৲ টাকা করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিয়াছিলেন।

হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু ও বৈরাগ্য

তীর্থ হইতে ফিরিবার অল্পকাল পরে হৃদয়ের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। ঐ ঘটনায় তাহার মন সংসারের প্রতি কিছুকালের জন্য বিরাগসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, হৃদয়রাম ভাবুক ছিল না। নিজ ক্ষুদ্র সংসারের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া যথাসম্ভব ভোগ-সুখে কালযাপন করাই তাহার জীবনের আদর্শ ছিল। ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে তাহার মনে কখন কখন অন্যভাবের উদয় হইলেও উহা অধিককাল স্থায়ী হইত না। ভোগবাসনা পরিতৃপ্ত করিবার কোনরূপ সুযোগ উপস্থিত হইলেই হৃদয় সকল ভুলিয়া উহার পশ্চাৎ ধাবিত হইত এবং যতকাল উহা সংসিদ্ধ না হইত, ততকাল তাহার মনে অন্য চিন্তা প্রবেশলাভ করিত না। সেজন্য ঠাকুরের সমগ্র সাধন হৃদয়ের দক্ষিণেশ্বরে থাকিবার কালে অনুষ্ঠিত হইলেও, সে তাহার অল্পই দেখিবার ও বুঝিবার অবসর পাইয়াছিল। ঐরূপ হইলেও কিন্তু হৃদয় তাহার মাতুলকে যথার্থ ভালবাসিত এবং তাঁহার যখন যেরূপ সেবার আবশ্যক হইত, তাহা সম্পাদন করিতে যত্নের ত্রুটি করিত না। উহার ফলে হৃদয়ের সাহস, বুদ্ধি এবং কার্যকুশলতা

বিশেষ প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। আবার বিখ্যাত সাধকদিগের নিকটে মাতুলের অলৌকিকত্ব শ্রবণে এবং তাঁহাতে দৈবশক্তিসকলের প্রকাশদর্শনে তাহার মনে একটা বিশেষ বলের সঞ্চারও হইয়াছিল। সে ভাবিয়াছিল, মাতুল যখন তাহার আপনার হইতেও আপনার এবং সেবাদ্বারা যখন সে তাঁহার বিশেষ কৃপাপাত্র হইয়াছে, তখন আধ্যাত্মিক রাজ্যের ফলসকল তাহার একপ্রকার করায়ত্তই রহিয়াছে। যখনই তাহার মন ঐসকল লাভ করিতে প্রয়াসী হইবে, মাতুল নিজ দৈবশক্তিপ্রভাবে তাহাকে তখনই ঐসকল লাভ করাইয়া দিবেন। অতএব পরকাল-সম্বন্ধে তাহার ভাবিবার আবশ্যকতা নাই। কিছুকাল সংসারসুখ ভোগ করিবার পরে সে পারত্রিক বিষয়ে মনোনিবেশ করিবে। পত্নী-বিয়োগবিধুর হৃদয় ভাবিল, এখন সেইকাল উপস্থিত হইয়াছে। সে পূর্বাপেক্ষা নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীজগদম্বার পুজায় মনোনিবেশ করিল, পরিধানের কাপড় ও পৈতা খুলিয়া রাখিয়া মধ্যে মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিল এবং ঠাকুরকে ধরিয়া বসিল, তাহার যাহাতে তাঁহার ন্যায় আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল উপস্থিত হয়, তাহা করিয়া দিতে হইবে। ঠাকুর তাহাকে যত বুঝাইলেন যে, তাহার ঐরূপ করিবার আবশ্যক নাই, তাঁহার সেবা করিলেই তাহার সকল ফল লাভ হইবে, এবং হৃদয় ও তিনি উভয়েই যদি দিবারাত্র ভগবদ্ভাবে বিভোর হইয়া আহার-নিদ্রাদি শারীরিক সকল চেষ্টা ভুলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কে কাহাকে দেখিবে, ইত্যাদি—সে তাহাতে কর্ণপাত করিল না। ঠাকুর অগত্যা বলিলেন, "মার যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক, আমার ইচ্ছায় কি কিছু হয় রে!—মা-ই আমার বুদ্ধি পাল্‌টাইয়া দিয়া আমাকে এইরূপ অবস্থায় আনিয়া অদ্ভুত উপলব্ধিসকল করাইয়া দিয়াছেন—মার ইচ্ছা হয় যদি তোরও হইবে।"

ঐরূপ কথাবার্তার কয়েক দিন পরে পূজা ও ধ্যানকালে হৃদয়ের জ্যোতির্ময় দেবমূর্তিসকলের দর্শন এবং অর্ধবাহ্যভাব হইতে আরম্ভ হইল।

হৃদয়ের ভাবাবেশ

মথুরবাবু হৃদয়কে একদিন ঐরূপ ভাবাবিষ্ট দেখিয়া ঠাকুরকে বলিলেন—"হৃদুর আবার একি অবস্থা হইল, বাবা?" ঠাকুর তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "হৃদয় ঢং করিয়া ঐরূপ করিতেছে না—একটু আধটু দর্শনের জন্য সে মাকে ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিল, তাই ঐরূপ হইতেছে। ঐরূপ দেখাইয়া বুঝাইয়া মা আবার তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া দিবেন।" মথুর বলিলেন, "বাবা, এসব তোমারই খেলা, তুমিই হৃদয়কে ঐরূপ অবস্থা করিয়া দিয়াছ, তুমিই এখন তাহার মন ঠাণ্ডা করিয়া দাও—আমরা উভয়ে নন্দীভৃঙ্গীর মত তোমার কাছে থাকিব, সেবা করিব, আমাদের ঐসব অবস্থা কেন?"

মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ কথাবার্তার কয়েক দিন পরে একদিন রাত্রে ঠাকুরকে পঞ্চবটী অভিমুখে যাইতে দেখিয়া, তাঁহার প্রয়োজন হইতে পারে ভাবিয়া, হৃদয় গাড়ু ও গামছা লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল। যাইতে যাইতে হৃদয়ের এক অপূর্ব দর্শন উপস্থিত হইল। সে দেখিতে লাগিল, ঠাকুর স্থূল রক্ত-মাংসের দেহধারী মনুষ্য নহেন, তাঁহার দেহনিঃসৃত অপূর্ব জ্যোতিতে পঞ্চবটী আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে, এবং চলিবার কালে তাঁহার জ্যোতির্ময় পদযুগল ভূমি স্পর্শ না করিয়া শূন্যে শূন্যেই তাঁহাকে বহন করিতেছে! চক্ষুর দোষে ঐরূপ দেখিতেছি ভাবিয়া হৃদয় বারংবার চক্ষু মার্জন করিল, চতুষ্পার্শ্বস্থ

হৃদয়ের অদ্ভুত দর্শন

পদার্থসকল নিরীক্ষণ করিয়া পুনরায় ঠাকুরের দিকে দেখিতে লাগিল কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না—বৃক্ষ, লতা, গঙ্গা, কুটীর প্রভৃতি পদার্থনিচয়কে পূর্ববৎ দেখিতে পাইলেও

ঠাকুরকে পুনঃ পুনঃ ঐরূপ দেখিতে থাকিল! তখন বিস্মিত হইয়া হৃদয় ভাবিল, 'আমার ভিতরে কি কোনরূপ পরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছে, যাহাতে ঐরূপ দেখিতেছি?' ঐরূপ ভাবিয়া সে আপনার দিকে চাহিবামাত্র তাহার মনে হইল সেও দিব্যদেহধারী জ্যোতির্ময় দেবানুচর সাক্ষাৎ দেবতার সঙ্গে থাকিয়া চিরকাল তাঁহার সেবা করিতেছে। মনে হইল, সে যেন ঐ দেবতার জ্যোতিঃঘন-অঙ্গসম্ভূত অংশবিশেষ, এবং তাঁহার সেবার জন্যই তাহার ভিন্ন শরীর ধারণপূর্বক পৃথগ্‌ভাবে অবস্থিতি। ঐরূপ দেখিয়া এবং নিজ জীবনের ঐরূপ রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাহার অন্তরে আনন্দের প্রবল বন্যা উপস্থিত হইল। সে আপনাকে ভুলিল, সংসার ভুলিল, পৃথিবীর মানুষ তাহাকে উন্মাদ বলিবে, সে কথা ভুলিল এবং অর্ধবাহ্যভাবাবেশে উন্মত্তের ন্যায় চীৎকার করিয়া বারংবার বলিতে লাগিল —"ও রামকৃষ্ণ, ও রামকৃষ্ণ, আমরা ত মানুষ নহি, আমরা এখানে কেন? চল দেশে দেশে যাই, জীবোদ্ধার করি! তুমি যাহা, আমিও তাহাই!"

ঠাকুর বলিতেন, "তাহাকে ঐরূপ চীৎকার করিতে শুনিয়া বলিলাম, 'ওরে থাম্ থাম্, অমন বলিতেছিস্ কেন, কি একটা হইয়াছে ভাবিয়া এখনি লোকজন সব ছুটিয়া আসিবে!' কিন্তু সে কি তাহা শুনে! তখন তাড়াতাড়ি তাহার নিকটে আসিয়া তাহার বক্ষ স্পর্শ করিয়া বলিলাম, 'দে মা, শালাকে জড় কর দে'।"

হৃদয় বলিত, ঠাকুর ঐরূপ বলিবামাত্র তাহার পূর্বোক্ত দর্শন ও আনন্দ যেন কোথায় লুপ্ত হইল এবং সে পূর্বে যেমন ছিল, আবার তেমনি হইল। অপূর্ব আনন্দ হইতে সহসা বিচ্যুত হইয়া তাহার মন বিষাদে পূর্ণ হইল এবং সে রোদন করিতে করিতে ঠাকুরকে বলিতে লাগিল, "মামা,

হৃদয়ের মনের জড়ত্বপ্রাপ্তি

তুমি কেন অমন করিলে, কেন জড় হইতে বলিলে, ঐরূপ দর্শনানন্দ আমার আর হইবে না।" ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিলেন, "আমি কি তোকে একেবারে জড় হইতে বলিয়াছি, তুই এখন স্থির হইয়া থাক্ —এই কথা বলিয়াছি। সামান্য দর্শনলাভ করিয়া তুই যে গোল করিলি, তাহাতেই ত আমাকে ঐরূপ বলিতে হইল। আমি যে চব্বিশ ঘণ্টা কত কি দেখি, আমি কি ঐরূপ গোল করি? তোর এখনও ঐরূপ দর্শন করিবার সময় হয় নাই, এখন স্থির হইয়া থাক্, সময় হইলে আবার কত কি দেখিবি!"

ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথায় হৃদয় নীরব হইলেও নিতান্ত ক্ষুণ্ণ হইল। পরে অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া সে ভাবিল, যেরূপেই হউক সে ঐরূপ দর্শন আবার লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। সে ধ্যান-জপের মাত্রা বাড়াইল এবং রাত্রে পঞ্চবটীতলে যাইয়া ঠাকুর যেখানে বসিয়া পূর্বে জপ-ধ্যান করিতেন, সেই স্থলে

হৃদয়ের সাধনায় বিঘ্ন

শ্রীশ্রীজগদম্বাকে ডাকিবে, এইরূপ মনস্থ করিল। ঐরূপ ভাবিয়া একদিন সে গভীর রাত্রে শয্যাত্যাগপূর্বক পঞ্চবটীতে উপস্থিত হইল এবং ঠাকুরের আসনে ধ্যান করিতে বসিল। কিছুক্ষণ পরে ঠাকুরের মনে পঞ্চবটীতলে আসিবার বাসনা হওয়াতে তিনিও ঐদিকে আসিতে লাগিলেন এবং তথায় পৌছিতে না পৌছিতে শুনিতে পাইলেন, হৃদয় কাতর চীৎকারে তাঁহাকে ডাকিতেছে, "মামা গো, পুড়িয়া মরিলাম, পুড়িয়া মরিলাম!" ত্রস্তপদে অগ্রসর হইয়া ঠাকুর তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, কি হইয়াছে?" হৃদয় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া বলিতে লাগিল, "মামা, এইখানে ধ্যান করিতে বসিবামাত্র কে যেন এক মালসা আগুন গায়ে ঢালিয়া দিল, অসহ্য দাহ-যন্ত্রণা হইতেছে!"

ঠাকুর তাহার অঙ্গে হাত বুলাইয়া বলিলেন, "যা, ঠাণ্ডা হইয়া যাইবে, তুই কেন এরূপ করিস্ বল দেখি? তোকে বলিয়াছি, আমার সেবা করিলেই তোর সব হইবে।" হৃদয় বলিত, ঠাকুরের হস্তস্পর্শে বাস্তবিক তাহার সকল যন্ত্রণা তখনই শান্ত হইল। অতঃপর সে আর পঞ্চবটীতে ঐরূপে ধ্যান করিতে যাইত না এবং তাহার মনে বিশ্বাস হইল ঠাকুর তাহাকে যে কথা বলিয়াছেন, তাহার অন্যথা করিলে তাহার ভাল হইবে না।

হৃদয়ের ৺দুর্গোৎসব

ঠাকুরের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া হৃদয় এখন অনেকটা শান্তিলাভ করিলেও ঠাকুরবাটীর দৈনন্দিন কর্মসকল তাহার পূর্বের ন্যায় রুচিকর বোধ হইতে লাগিল না। তাহার মন নূতন কোন কর্ম করিয়া নবোল্লাস লাভ করিবার অনুসন্ধান করিতে লাগিল। সন ১২৭৫ সালের আশ্বিন মাস আগত দেখিয়া সে নিজ বাটীতে শারদীয়া পূজা করিতে মনস্থ করিল। হৃদয়রামের জ্যেষ্ঠ বৈমাত্রেয় ভ্রাতা গঙ্গানারায়ণের তখন মৃত্যু হইয়াছে, এবং রাঘব মথুরবাবুর জমিদারিতে খাজনা আদায়ের কর্মে বেশ দুই পয়সা উপার্জন করিতেছে। সময় ফিরায় বাটীতে নূতন চণ্ডীমণ্ডপখানি নির্মিত হইবার কালে গঙ্গানারায়ণ ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, একবার ৺জগদম্বাকে আনিয়া তথায় বসাইবেন; কিন্তু সে ইচ্ছা পূর্ণ করিবার তাঁহার সুযোগ হয় নাই। হৃদয় এখন তাঁহার ঐ ইচ্ছা স্মরণপূর্বক উহা পূর্ণ করিতে যত্নপর হইল। কর্মী হৃদয়ের ঐ কার্যে শান্তিলাভের সম্ভাবনা বুঝিয়া ঠাকুর তাহাতে সম্মত হইলেন এবং মথুরবাবু হৃদয়ের ঐরূপ অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া তাহাকে আর্থিক সাহায্য করিলেন। শ্রীযুক্ত মথুর ঐরূপে অর্থসাহায্য করিলেন বটে, কিন্তু পূজাকালে ঠাকুরকে নিজ বাটীতে রাখিবার জন্য বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ

করিতে লাগিলেন। হৃদয় তাহাতে ক্ষুণ্ণমনে পূজা করিবার জন্য একাকী দেশে যাইতে প্রস্তুত হইল। যাইবার কালে তাহাকে ক্ষুণ্ণ দেখিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তুই দুঃখ করিতেছিস কেন? আমি নিত্য সূক্ষ্ম শরীরে তোর পূজা দেখিতে যাইব, আমাকে অপর কেহ দেখিতে পাইবে না, কিন্তু তুই পাইবি। তুই অপর একজন ব্রাহ্মণকে তন্ত্রধারক রাখিয়া নিজে আপনার ভাবে পূজা করিস্ এবং একেবারে উপবাস না করিয়া মধ্যাহ্নে দুগ্ধ, গঙ্গাজল ও মিছরির শরবত পান করিস্। ঐরূপে পূজা করিলে ৺জগদম্বা তোর পূজা নিশ্চয় গ্রহণ করিবেন।" ঐরূপে ঠাকুর, কাহার দ্বারা প্রতিমা গড়াইতে হইবে, কাহাকে তন্ত্রধারক করিতে হইবে, কিভাবে অন্য সকল কার্য করিতে হইবে—সকল কথা তন্ন তন্ন করিয়া তাহাকে বলিয়া দিলেন এবং সে মহানন্দে পূজা করিতে যাত্রা করিল।

৺দুর্গোৎসবকালে হৃদয়ের ঠাকুরকে দেখা

বাটীতে আসিয়া হৃদয় ঠাকুরের কথামত সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিল এবং ষষ্ঠীর দিনে ৺দেবীর বোধন, অধিবাসাদি সকল কার্য সম্পন্ন করিয়া স্বয়ং পূজায় ব্রতী হইল। সপ্তমীবিহিতা পূজা সাঙ্গ করিয়া রাত্রে নীরাজন করিবার কালে হৃদয় দেখিতে পাইল, ঠাকুর জ্যোতির্ময় শরীরে প্রতিমার পার্শ্বে ভাবাবিষ্ট হইয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। হৃদয় বলিত, ঐরূপে প্রতিদিন ঐ সময়ে এবং সন্ধিপূজাকালে সে দেবীপ্রতিমাপার্শ্বে ঠাকুরের দিব্যদর্শন লাভ করিয়া মহোৎসাহে পূর্ণ হইয়াছিল। পূজা সাঙ্গ হইবার স্বল্পকাল পরে হৃদয় দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিল এবং ঐ বিষয়ক সকল কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর তাহাতে তাহাকে বলিয়াছিলেন, "আরতি ও সন্ধিপূজার সময় তোর পূজা দেখিবার জন্য বাস্তবিকই প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়া আমার ভাব হইয়া গিয়াছিল এবং অনুভব করিয়া-

ছিলাম যেন জ্যোতির্ময় শরীরে জ্যোতির্ময় পথ দিয়া তোর চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছি।"

হৃদয় বলিত, ঠাকুর তাহাকে এক সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিয়াছিলেন, "তুই তিন বৎসর পূজা করিবি।"—ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল।

৺দুর্গোৎসবের শেষ কথা

ঠাকুরের কথা না শুনিয়া চতুর্থবারে পূজার আয়োজন করিতে যাইয়া এমন বিঘ্নপরম্পরা উপস্থিত হইয়াছিল যে, পরিশেষে বাধ্য হইয়া তাহাকে পূজা বন্ধ করিতে হইয়াছিল। সে যাহা হউক, প্রথম বৎসরে পূজার কিছুকাল পরে হৃদয় পুনরায় দারপরিগ্রহ করিয়া পূর্বের ন্যায় দক্ষিণেশ্বরের পূজাকার্যে এবং ঠাকুরের সেবায় মনোনিবেশ করিয়াছিল।

উনবিংশ অধ্যায়

স্বজনবিয়োগ

ঠাকুরের অগ্রজ শ্রীযুক্ত রামকুমারের পুত্র অক্ষয়ের সহিত পাঠককে আমরা ইতিপূর্বে সামান্যভাবে পরিচিত করাইয়াছি। পূজ্যপাদ আচার্য তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বরে আগমনের স্বল্পকাল পরে সন ১২৭২ সালের প্রথম ভাগে অক্ষয় দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া বিষ্ণুমন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিল।

রামকুমার-পুত্র অক্ষয়ের কথা

তখন তাহার বয়স সতর বৎসর হইবে। তাহার সম্বন্ধে কয়েকটি কথা এখানে বলা প্রয়োজন।

জন্মগ্রহণকালে অক্ষয়ের প্রসূতির মৃত্যু হওয়ায় মাতৃহীন বালক নিজ আত্মীয়বর্গের বিশেষ আদরের পাত্র হইয়াছিল। সন ১২৫৯ সালে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অক্ষয়ের বয়স তিন চারি বৎসর মাত্র ছিল। অতএব ঐ ঘটনার পূর্বে দুই তিন বৎসরকাল পর্যন্ত ঠাকুর অক্ষয়কে ক্রোড়ে করিয়া মানুষ করিতে ও সর্বদা আদরযত্ন করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। পিতা রামকুমার কিন্তু অক্ষয়কে কখনও ক্রোড়ে করেন নাই, কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "মায়া বাড়াইবার প্রয়োজন নাই; এ ছেলে বাঁচিবে না!" পরে ঠাকুর যখন সংসার ভুলিয়া, আপনাকে ভুলিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইলেন, তখন সুন্দর শিশু তাঁহার অলক্ষ্যে কৈশোর অতিক্রমপূর্বক যৌবনে পদার্পণ করিয়া অধিকতর প্রিয়দর্শন হইয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুর এবং তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি,

অক্ষয় বাস্তবিকই অতি সুপুরুষ ছিল। তাঁহারা বলিতেন, অক্ষয়ের দেহের বর্ণ যেমন উজ্জ্বল ছিল, অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদির গঠনও তেমন সুঠাম ও সুললিত ছিল—দেখিলে জীবন্ত শিবমূর্তি বলিয়া জ্ঞান হইত।

অক্ষয়ের রূপ

বাল্যকাল হইতে অক্ষয়ের মন শ্রীশ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিল। কুলদেবতা ৺রঘুবীরের সেবায় সে প্রতিদিন অনেক কাল যাপন করিত। সুতরাং দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া অক্ষয় যখন পূজাকার্যে ব্রতী হইল, তখন আপনার মনের মত কার্যেই নিযুক্ত হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, "শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দজীর পূজা করিতে বসিয়া অক্ষয় ধ্যানে এমন তন্ময় হইত যে, ঐ সময় বিষ্ণুঘরে বহুলোকের সমাগম হইলেও সে জানিতে পারিত না—দুই ঘণ্টাকাল ঐরূপে অতিবাহিত হইবার পরে তাহার হুঁশ হইত!" হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি মন্দিরের নিত্যপূজা সুসম্পন্ন করিবার পরে অক্ষয় পঞ্চবটীতলে আগমনপূর্বক অনেকক্ষণ শিবপূজায় অতিবাহিত করিত; পরে স্বহস্তে রন্ধন করিয়া ভোজন-সমাপনান্তে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠে নিবিষ্ট হইত। তদ্ভিন্ন নবানুরাগের প্রেরণায় সে এইকালে ন্যাস ও প্রাণায়াম এত অতিমাত্রায় করিয়া বসিত যে, তজ্জন্য তাহার কণ্ঠ-তালুদেশ স্ফীত হইয়া কখন কখন রুধির নির্গত হইত। অক্ষয়ের ঐরূপ ভক্তি ও ঈশ্বরানুরাগ তাহাকে ঠাকুরের বিশেষ প্রিয় করিয়া তুলিয়াছিল।

অক্ষয়ের শ্রীরামচন্দ্রে ভক্তি ও সাধনানুরাগ

ঐরূপে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইয়া সন ১২৭৫ সালের অর্ধেকের অধিক অতীত হইল। অক্ষয়ের মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া খুল্লতাত রামেশ্বর তাহার বিবাহের জন্য এখন পাত্রী অন্বেষণ করিতে লাগিলেন।

কামারপুকুরের অনতিদূরে কুচেকোল নামক গ্রামে উপযুক্তা পাত্রীর সন্ধান পাইয়া রামেশ্বর যখন অক্ষয়কে লইয়া যাইবার জন্য দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলেন, তখন চৈত্র মাস। চৈত্র মাসে যাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া আপত্তি উঠিলেও রামেশ্বর উহা মানিলেন না। বলিলেন, বিদেশ হইতে নিজ বাটীতে আগমনকালে ঐ নিষেধ-বচন মানিবার আবশ্যকতা নাই। বাটীতে ফিরিয়া অনতিকাল পরে সন ১২৭৬ সালের বৈশাখে অক্ষয়ের বিবাহ হইল।

অক্ষয়ের বিবাহ

বিবাহের কয়েক মাস পরে শ্বশুরালয়ে যাইয়া অক্ষয়ের কঠিন পীড়া হইল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বর সংবাদ পাইয়া তাহাকে কামারপুকুরে আনাইলেন এবং চিকিৎসাদি দ্বারা আরোগ্য করাইয়া পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দিলেন। এখানে আসিয়া তাহার চেহারা ফিরিল এবং স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। এমন সময়ে সহসা একদিন অক্ষয়ের জ্বর হইল। ডাক্তার-বৈদ্যেরা বলিল, সামান্য জ্বর, শীঘ্র সারিয়া যাইবে।

বিবাহের পরে অক্ষয়ের কঠিন পীড়া ও দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন

হৃদয় বলিত, অক্ষয় শ্বশুরালয়ে পীড়িত হইয়াছে শুনিয়া ঠাকুর ইতিপূর্বে বলিয়াছিলেন, "হৃদু, লক্ষণ বড় খারাপ, রাক্ষসগণবিশিষ্টা কোন কন্যার সহিত বিবাহ হইয়াছে, ছোঁড়া মারা যাইবে দেখিতেছি!" যাহা হউক, তিন চারি দিনেও অক্ষয়ের জ্বরের উপশম হইল না দেখিয়া ঠাকুর এখন হৃদয়কে ডাকিয়া বলিলেন, "হৃদু, ডাক্তারেরা বুঝিতে পারিতেছে না অক্ষয়ের বিকার হইয়াছে, ভাল চিকিৎসক আনাইয়া আশ মিটাইয়া চিকিৎসা কর, ছোঁড়া কিন্তু বাঁচিবে না।"

অক্ষয়ের দ্বিতীয়বার পীড়া—অক্ষয়ের মৃত্যুঘটনা ঠাকুরের পূর্ব হইতে জানিতে পারা

হৃদয় বলিত, "তাঁহাকে ঐরূপ বলিতে শুনিয়া আমি বলিলাম, 'ছি ছি মামা, তোমার মুখ দিয়া ওরকম কথাগুলা কেন বাহির হইল?'—তাহাতে তিনি বলিলেন, 'আমি কি ইচ্ছা করিয়া ঐরূপ বলিয়াছি? মা যেমন জানান ও বলান, ইচ্ছা না থাকিলেও আমাকে তেমনি বলিতে হয়। আমার কি ইচ্ছা অক্ষয় মারা পড়ে?"

অক্ষয় বাঁচিবে না শুনিয়া হৃদয়ের আশঙ্কা ও আচরণ

ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া হৃদয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইল এবং সুচিকিৎসকসকল আনাইয়া অক্ষয়ের পীড়া-আরোগ্যের জন্য নানাভাবে চেষ্টা করিতে লাগিল। রোগ কিন্তু ক্রমশঃ বৃদ্ধিই পাইতে লাগিল। অনন্তর প্রায় মাসাবধি ভুগিবার পরে অক্ষয়ের অন্তিমকাল আগত দেখিয়া ঠাকুর তাহার শয্যাপার্শ্বে উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "অক্ষয়, বল্, গঙ্গা নারায়ণ ওঁ রাম!" অক্ষয় এক দুই করিয়া তিনবার ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিবার পরক্ষণেই তাহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি, অক্ষয়ের মৃত্যু হইলে হৃদয় যত কাঁদিতে লাগিল, ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া তত হাসিতে লাগিলেন!

অক্ষয়ের মৃত্যু ও ঠাকুরের আচরণ

প্রিয়দর্শন পুত্রসদৃশ অক্ষয়ের মৃত্যু উচ্চ ভাবভূমি হইতে দর্শন করিয়া ঠাকুর ঐরূপে হাস্য করিলেও প্রাণে বিষমাঘাত যে অনুভব করেন নাই, তাহা নহে। বহুকাল পরে আমাদের নিকট ঐ ঘটনার উল্লেখ করিয়া তিনি সময়ে সময়ে বলিয়াছেন যে, ঐ সময়ে ভাবাবেশে মৃত্যুটাকে অবস্থান্তরপ্রাপ্তি-মাত্র বলিয়া দেখিতে পাইলেও ভাবভঙ্গ হইয়া সাধারণ ভূমিতে অবরোহণ করিবার কালে অক্ষয়ের বিয়োগে তিনি বিশেষ অভাব বোধ করিয়া-

অক্ষয়ের মৃত্যুতে ঠাকুরের মনঃকষ্ট

ছিলেন।* অক্ষয়ের দেহত্যাগ ঐ বাটীতে হইয়াছিল বলিয়া তিনি মথুরবাবুর বৈঠকখানা বাটীতে অতঃপর আর কখনও বাস করিতে পারেন নাই।

অক্ষয়ের মৃত্যুর পরে ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য দক্ষিণেশ্বরে রাধাগোবিন্দজীউর পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভ্রাতা রামেশ্বরের পূজকের পদগ্রহণ

কিন্তু সংসারের সর্বপ্রকার তত্ত্বাবধান তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকায় তিনি সকল সময়ে দক্ষিণেশ্বরে থাকিতে পারিতেন না। বিশ্বাসী ব্যক্তির হস্তে ঐ কার্যের ভারার্পণপূর্বক মধ্যে মধ্যে কামারপুকুর গ্রামে যাইয়া থাকিতেন। শুনিয়াছি, শ্রীরামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দীননাথ নামক এক ব্যক্তি ঐ সময়ে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইয়া ঐ কর্ম সম্পন্ন করিত।

অক্ষয়ের মৃত্যুর স্বল্পকাল পরে শ্রীযুক্ত মথুর ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নিজ জমিদারি মহলে এবং গুরুগৃহে গমন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের মন হইতে অক্ষয়ের বিয়োগজনিত অভাববোধ প্রশমিত করিবার জন্যই বোধ হয়, তিনি এখন ঐরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কারণ, পরমভক্ত মথুর এক পক্ষে যেমন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে সকল বিষয়ে তাঁহার অনুবর্তী হইয়া চলিতেন, অপর পক্ষে তেমনি আবার তাঁহাকে সাংসারিক ব্যাপার মাত্রে অনভিজ্ঞ বালক-বোধে সর্বতোভাবে নিজরক্ষণীয় বিবেচনা করিতেন।

মথুরের সহিত ঠাকুরের রাণাঘাটে গমন ও দরিদ্রনারায়ণগণের সেবা

মথুরের জমিদারি মহল পরিদর্শন করিতে যাইয়া ঠাকুর এক স্থানের পল্লীবাসী স্ত্রী-পুরুষগণের দুর্দশা ও

---

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ১ম অধ্যায়

অভাব দেখিয়া তাহাদিগের দুঃখে কাতর হন এবং মথুরের দ্বারা নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাদিগকে 'একমাথা করিয়া তেল, এক একখানি নূতন কাপড় এবং উদর পুরিয়া একদিনের ভোজন' দান করাইয়াছিলেন। হৃদয় বলিত, রাণাঘাটের সন্নিকট কলাইঘাট নামক স্থানে পূর্বোক্ত ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। মথুরবাবু ঐ সময়ে ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া নৌকায় করিয়া চূর্ণীর খালে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।

হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি সাতক্ষীরার নিকট সোনাবেড়ে নামক গ্রামে মথুরের পৈতৃক ভিটা ছিল। ঐ গ্রামের সন্নিহিত গ্রামসকল তখন মথুরের জমিদারিভুক্ত। ঠাকুরকে সঙ্গে লইয়া মথুর এই সময়ে ঐ স্থানে গমন করিয়াছিলেন। এখান হইতে মথুরের গুরুগৃহ অধিক দূরবর্তী ছিল না।

মথুরের নিজবাটী ও গুরুগৃহ-দর্শন

বিষয়সম্পত্তির বিভাগ লইয়া গুরুবংশীয়দিগের মধ্যে এইকালে বিবাদ চলিতেছিল। সেই বিবাদ মিটাইবার জন্য মথুরকে তাঁহারা আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। গ্রামের নাম তালামাগ্‌রো। মথুর তথায় যাইবার কালে ঠাকুর ও হৃদয়কে নিজ হস্তীর উপর আরোহণ করাইয়া এবং স্বয়ং শিবিকায় আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন।* মথুরের গুরুপুত্রগণের সযত্ন পরিচর্যায় কয়েক সপ্তাহ এখানে অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন।

মথুরের বাটী ও গুরুস্থান দর্শন করিয়া ফিরিবার স্বল্পকাল পরে

* হৃদয় বলিত, যাইবার কালে পথ বন্ধুর ছিল বলিয়া শ্রীযুক্ত মথুর ঠাকুরকে শিবিকায় আরোহণ করাইয়া স্বয়ং হস্তিপৃষ্ঠে গমন করিয়াছিলেন এবং গ্রামে পৌঁছিবার পরে ঠাকুরের কৌতূহল-পরিতৃপ্তির জন্য তাঁহাকে কখন কখন হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়াছিলেন।

ঠাকুরকে লইয়া কলিকাতায় কলুটোলা নামক পল্লীতে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্বোক্ত পল্লীবাসী শ্রীযুক্ত কালীনাথ দত্ত বা ধরের বাটীতে তখন হরি-সভার অধিবেশন হইত। ঠাকুর তথায় নিমন্ত্রিত হইয়া গমনপূর্বক ভাবাবেশে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্য নির্দিষ্ট আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ আমরা পাঠককে অন্যত্র প্রদান করিয়াছি।* উহার অনতিকাল পরে ঠাকুরের শ্রীনবদ্বীপধাম দর্শন করিতে অভিলাষ হওয়ায় মথুরবাবু তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া কালনা, নবদ্বীপ প্রভৃতি স্থানে গমন করিয়াছিলেন। কালনায় গমন করিয়া ঠাকুর কিরূপে ভগবানদাস বাবাজী নামক সিদ্ধ ভক্তের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন এবং নবদ্বীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহার কিরূপ অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়াছিল, সেসকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।† সম্ভবতঃ সন ১২৭৭ সালে ঠাকুর ঐ সকল পুণ্যস্থানদর্শনে গমন করিয়াছিলেন। নবদ্বীপের সন্নিকট গঙ্গার চড়াসকলের নিকট দিয়া গমন করিবার কালে ঠাকুরের যেরূপ গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল, নবদ্বীপে যাইয়া তদ্রূপ হয় নাই। মথুরবাবু প্রভৃতি ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের লীলাস্থল পুরাতন নবদ্বীপ গঙ্গাগর্ভে লীন হইয়াছে; ঐ সকল চড়ার স্থলেই সেই সকল বিদ্যমান ছিল, সেইজন্যই ঐ স্থানে উপস্থিত হইলে তাঁহার গভীর ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়াছিল।

কলুটোলার হরিসভায় ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যদেবের আসনাধিকার ও কালনা, নবদ্বীপাদি দর্শন

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়

† গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৩য় অধ্যায়

মথুরের নিষ্কাম ভক্তি

একাদিক্রমে চতুর্দশ বৎসর ঠাকুরের সেবায় সর্বান্তঃকরণে নিযুক্ত থাকিয়া মথুরবাবুর মন এখন কতদূর নিষ্কাম ভাবে উপনীত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্তস্বরূপে হৃদয় আমাদিগকে একটি ঘটনা বলিয়াছিল। পাঠককে উহা এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

এক সময়ে মথুরবাবু শরীরের সন্ধিস্থলবিশেষে স্ফোটক হইয়া শয্যাগত হইয়াছিলেন। ঠাকুরকে দেখিবার জন্য ঐ সময়ে তাঁহার আগ্রহাতিশয় দেখিয়া হৃদয় ঐ কথা ঠাকুরকে নিবেদন করিল। ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "আমি যাইয়া কি করিব, তাহার ফোড়া আরাম করিয়া দিবার আমার কি শক্তি আছে?" ঠাকুর যাইলেন না দেখিয়া মথুর লোক পাঠাইয়া বারংবার কাতর প্রার্থনা জানাইতে লাগিলেন। তাঁহার ঐরূপ ব্যাকুলতায় ঠাকুরকে অগত্যা যাইতে হইল। ঠাকুর উপস্থিত হইলে মথুরের আনন্দের অবধি রইল না। তিনি অনেক কষ্টে উঠিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, একটু পায়ের ধূলা দাও।"

ঠাকুর বলিলেন, "আমার পায়ের ধূলা লইয়া কি হইবে, উহাতে তোমার ফোড়া কি আরোগ্য হইবে?"

মথুর তাহাতে বলিলেন, "বাবা, আমি কি এমনি, তোমার পায়ের ধূলা কি ফোড়া আরাম করিবার জন্য চাহিতেছি? তাহার জন্য ত ডাক্তার আছে। আমি ভবসাগর পার হইবার জন্য তোমার শ্রীচরণের ধূলা চাহিতেছি।"

ঐ কথা শুনিবামাত্র ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইলেন। মথুর ঐ অবকাশে তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপনপূর্বক আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিলেন—তাঁহার দুনয়নে আনন্দাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল।

মথুরবাবু ঠাকুরকে এখন কতদূর ভক্তিবিশ্বাস করিতেন তদ্বিষয়ের নানা কথা আমরা ঠাকুরের এবং হৃদয়ের নিকটে শুনিয়াছি। এক কথায় বলিতে হইলে, তিনি তাঁহাকে ইহকালপরকালের সম্বল ও গতি বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিয়াছিলেন। অন্য পক্ষে ঠাকুরের কৃপাও তাঁহার প্রতি তেমনি অসীম ছিল। স্বাধীনচেতা ঠাকুর মথুরের কোন কোন কার্যে সময়ে সময়ে বিরক্ত হইলেও ঐ ভাব ভুলিয়া তখনই আবার তাঁহার সকল অনুরোধ রক্ষাপূর্বক তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণের জন্য চেষ্টা করিতেন। ঠাকুর ও মথুরের সম্বন্ধ যে কত গভীর প্রেমপূর্ণ ও অবিচ্ছেদ্য ছিল, তাহা নিম্নলিখিত ঘটনায় বুঝিতে পারা যায়—

ঠাকুরের সহিত মথুরের গভীর প্রেমসম্বন্ধ

একদিন ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া মথুরকে বলিলেন, 'মথুর, তুমি যতদিন (জীবিত) থাকিবে, আমি ততদিন এখানে (দক্ষিণেশ্বরে) থাকিব।' মথুর শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। কারণ তিনি জানিতেন, সাক্ষাৎ জগদম্বাই ঠাকুরের শরীরাবলম্বনে তাঁহাকে ও তাঁহার পরিবারবর্গকে সর্বদা রক্ষা করিতেছেন—সুতরাং ঠাকুরের ঐরূপ কথা শুনিয়া বুঝিলেন, তাঁহার অবর্তমানে ঠাকুর তাঁহার পরিবারবর্গকে ত্যাগ করিয়া যাইবেন। অনন্তর তিনি দীনভাবে ঠাকুরকে বলিলেন, 'সে কি বাবা, আমার পত্নী ও পুত্র দ্বারকানাথও যে তোমাকে বিশেষ ভক্তি করে।' মথুরকে কাতর দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, 'আচ্ছা, তোমার পত্নী ও দোয়ারি যতদিন থাকিবে, আমি ততদিন থাকিব!' ঘটনাও বাস্তবিক ঐরূপ হইয়াছিল। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ও দ্বারকানাথের দেহাবসানের অনতিকাল পরে ঠাকুর চিরকালের নিমিত্ত দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ১৮৮১

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

খৃষ্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন।* উহার পরে কিঞ্চিদধিক তিন বৎসর মাত্র ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়াছিলেন।

ঐ বিষয়ে দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত

অন্য এক দিবস মথুরবাবু ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন, 'কই বাবা, তুমি যে বলিয়াছিলে তোমার ভক্তগণ আসিবে, তাহারা কেহই ত এখনও আসিল না?' ঠাকুর তাহাতে বলিলেন, 'কি জানি বাবু, মা তাহাদিগকে কত দিনে আনিবেন—তাহারা সব আসিবে, একথা কিন্তু মা আমাকে স্বয়ং জানাইয়াছেন। অপর যাহা যাহা দেখাইয়াছেন সে-সকলি ত একে একে সত্য হইয়াছে, এটি কেন সত্য হইল না কে জানে!' ঐ বলিয়া ঠাকুর বিষণ্ণমনে ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার ঐ দর্শনটি কি তবে ভুল হইল? মথুর তাঁহাকে বিষণ্ণ দেখিয়া মনে বিশেষ ব্যথা পাইলেন, ভাবিলেন ঐকথা পাড়িয়া ভাল করেন নাই। পরে বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে সান্ত্বনার জন্য বলিলেন, 'তারা আসুক আর নাই আসুক, বাবা, আমি ত তোমার চিরানুগত ভক্ত রহিয়াছি—তবে আর তোমার দর্শন সত্য হইল না কিরূপে? আমি একাই একশত ভক্তের তুল্য, তাই মা বলিয়াছিলেন অনেক ভক্ত আসিবে।' ঠাকুর বলিলেন, 'কে জানে বাবু, তুমি যা বলচ তাই বা হবে!' মথুর ঐ প্রসঙ্গে আর অধিক দূর অগ্রসর না হইয়া অন্য কথা পাড়িয়া ঠাকুরকে ভুলাইয়া দিলেন।

* "Jagadamba died on or about 1st January, 1881, intestate, leaving defendant Trayluksha, then the only son of Mathura, her surviving". Quoted from Plaintiff's statement in High Court, Suit No. 203 of 1889.

ঠাকুরের নিরন্তর সঙ্গগুণে মথুরের মনে কতদূর ভাবপরিবর্তন উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আমরা 'গুরুভাব' গ্রন্থের অনেক স্থলে পাঠককে বলিয়াছি। শাস্ত্র বলেন, মুক্ত পুরুষের সেবকেরা তদনুষ্ঠিত শুভ কর্মসকলের ফলের অধিকারী হয়েন। অতএব অবতার-পুরুষের সেবকেরা যে বিবিধ দৈবী সম্পদের অধিকারী হইবেন, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি?

মথুরের ঐরূপ নিষ্কামভক্তি লাভ করা আশ্চর্য নহে—ঐ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মত

সম্পদ-বিপদ, সুখ-দুঃখ, মিলন-বিয়োগ, জীবন-মৃত্যুরূপ তরঙ্গসমাকুল কালের অনন্ত প্রবাহ ক্রমে সন ১২৭৮ সালকে ধরাধামে উপস্থিত করিল। ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইয়া ঐ বৎসর পঞ্চদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। বৈশাখ যাইল, জ্যৈষ্ঠ যাইল, আষাঢ়েরও অর্ধেক দিন অতীতের গর্ভে লীন হইল, এমন সময় শ্রীযুক্ত মথুর জ্বররোগে শয্যাগত হইলেন। ক্রমশঃ উহা বৃদ্ধি হইয়া সাত-আট দিনেই বিকারে পরিণত হইল এবং মথুরের বাক্‌রোধ হইল। ঠাকুর পূর্ব হইতেই বুঝিয়াছিলেন, মা তাঁহার ভক্তকে নিজ স্নেহময় অঙ্কে গ্রহণ করিতেছেন—মথুরের ভক্তিব্রতের উদ্‌যাপন হইয়াছে। সেজন্য হৃদয়কে প্রতিদিন দেখিতে পাঠাইলেও স্বয়ং মথুরকে দর্শন করিতে একদিনও যাইলেন না। ক্রমে শেষদিন উপস্থিত হইল—অন্তিমকাল আগত দেখিয়া মথুরকে কালীঘাটে লইয়া যাওয়া হইল। সেইদিন ঠাকুর হৃদয়কেও দেখিতে পাঠাইলেন না, কিন্তু অপরাহ্ণ উপস্থিত হইলে দুই-তিন ঘণ্টাকাল গভীর ভাবে নিমগ্ন হইলেন এবং জ্যোতির্ময় বর্ত্মে দিব্য শরীরে ভক্তের পার্শ্বে উপনীত হইয়া তাহাকে কৃতার্থ করিলেন—বহুপুণ্যার্জিত লোকে তাহাকে স্বয়ং আরূঢ় করাইলেন।

মথুরের দেহত্যাগ

ভাবভঙ্গে ঠাকুর হৃদয়কে নিকটে ডাকিলেন (তখন পাঁচটা বাজিয়া

গিয়াছে) এবং বলিলেন, "শ্রীশ্রীজগদম্বার সখীগণ মথুরকে সাদরে দিব্য রথে উঠাইয়া লইলেন—তাহার তেজ শ্রীশ্রীদেবীলোকে গমন করিল।" পরে গভীর রাত্রে কালীবাটীর কর্মচারিগণ ফিরিয়া আসিয়া হৃদয়কে সংবাদ দিল, মথুরবাবু অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় দেহরক্ষা করিয়াছেন।* ঐরূপে পুণ্যলোকে গমন করিলেও ভোগ-বাসনার সম্পূর্ণ ক্ষয় না হওয়ায় পরম ভক্ত মথুরামোহনকে ধরাধামে পুনরায় ফিরিতে হইবে, ঠাকুরের মুখে একথা আমরা অন্য সময়ে শুনিয়াছি এবং পাঠককে অন্যত্র বলিয়াছি।†

ঠাকুরের ভাবাবেশে ঐ ঘটনাদর্শন

* "Mathura Mohan Biswas died in July, 1871, intestate, leaving him surviving Jagadamba, sole widow. Bhupal since deceased, a son by his another wife who had predeceased him—and Dwarka Nath Biswas since deceased, defendand Trayluksha Nath and Thakurdas alias Dhurmadas, three sons by the said Jagadamba".

Quoted from plaintiff's statement in High Court Suit No. 230 of 1889—Shyama Churun Biswas vs. Trayluksha Nath Biswas, Gurudas, Kalidas, Durgadas and Kumudini.

† গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৭ম অধ্যায়।

বিংশ অধ্যায়

৺ষোড়শী-পূজা

মথুর চলিয়া যাইলেন, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে মানবের জীবনপ্রবাহ কিন্তু সমভাবেই বহিতে লাগিল। দিন, মাস অতীত হইয়া ক্রমে ছয়মাস কাটিয়া গেল এবং ১২৭৮ সালের ফাল্গুন মাস সমাগত হইল। ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা ঐকালে উপস্থিত হইয়াছিল। উহা জানিতে হইলে আমাদিগকে জয়রামবাটী গ্রামে ঠাকুরের শ্বশুরালয়ে একবার গমন করিতে হইবে।

আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি, সন ১২৭৪ সালে ঠাকুর যখন ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া নিজ জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার আত্মীয়া রমণীগণ তাঁহার পত্নীকে তথায় আনয়ন করিয়াছিলেন। বলিতে হইলে বিবাহের পর ঐকালেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর স্বামিসন্দর্শন প্রথম লাভ হইয়াছিল। কামারপুকুর অঞ্চলের বালিকাদিগের সহিত কলিকাতার বালিকাদিগের তুলনা করিবার অবসর যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনি দেখিয়াছেন, কলিকাতা অঞ্চলের বালিকাদিগের দেহের ও মনের পরিণতি স্বল্প বয়সেই উপস্থিত হয়, কিন্তু কামারপুকুর প্রভৃতি গ্রামসকলের বালিকাদিগের তাহা হয় না। চতুর্দশ এবং কখন কখন পঞ্চদশ ও ষোড়শ-বর্ষীয়া কন্যাদিগেরও সেখানে যৌবনকালের অঙ্গলক্ষণসমূহ পূর্ণভাবে উদ্গত হয়

বিবাহের পরে ঠাকুরকে প্রথম দর্শনকালে শ্রীশ্রীমা বালিকামাত্র ছিলেন

না এবং শরীরের ন্যায় তাহাদিগের মনের পরিণতিও ঐরূপ বিলম্বে উপস্থিত হয়। পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিণী সকলের ন্যায় অল্পপরিসর স্থানে কালযাপন করিতে বাধ্য না হইয়া পবিত্র নির্মল গ্রাম্য বায়ু সেবন এবং গ্রামমধ্যে যথা তথা স্বচ্ছন্দবিহারপূর্বক স্বাভাবিকভাবে জীবন অতিবাহিত করিবার জন্যই বোধ হয় ঐরূপ হইয়া থাকে।

গ্রাম্য বালিকাদিগের বিলম্বে শরীর-মনের পরিণতি হয়

চতুর্দশ বৎসরে (বস্তুতঃ) প্রথমবার স্বামিসন্দর্শনকালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী নিতান্ত বালিকাস্বভাবসম্পন্না ছিলেন। দাম্পত্য-জীবনের গভীর উদ্দেশ্য এবং দায়িত্ব বোধ করিবার শক্তি তাঁহাতে তখন বিকাশোন্মুখ হইয়াছিল মাত্র। পবিত্রা বালিকা দেহবুদ্ধিবিরহিত ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ এবং নিঃস্বার্থ আদরযত্নলাভে ঐকালে অনির্বচনীয় আনন্দে উল্লসিতা হইয়াছিলেন। ঠাকুরের স্ত্রীভক্তদিগের নিকটে তিনি ঐ উল্লাসের কথা অনেক সময় এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন, হৃদয়মধ্যে আনন্দের পূর্ণঘট যেন স্থাপিত রহিয়াছে, ঐকাল হইতে সর্বদা এইরূপ অনুভব করিতাম—সেই ধীর স্থির দিব্য উল্লাসে অন্তর কতদূর কিরূপ পূর্ণ থাকিত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে।"

ঠাকুরকে প্রথমবার দেখিয়া শ্রীশ্রীমার মনের ভাব

কয়েক মাস পরে ঠাকুর যখন কামারপুকুর হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, বালিকা তখন অনন্ত আনন্দসম্পদের অধিকারিণী হইয়াছেন—এইরূপ অনুভব করিতে করিতে পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিলেন। পূর্বোক্ত উল্লাসের উপলব্ধিতে তাঁহার চলন, বলন, আচরণাদি সকল চেষ্টার ভিতর এখন একটি পরিবর্তন যে উপস্থিত হইয়াছিল, একথা আমরা বেশ বুঝিতে

ঐ ভাব লইয়া শ্রীশ্রীমার জয়রাম-বাটীতে বাসের কথা

পারি। কিন্তু সাধারণ মানব উহা দেখিতে পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ। কারণ উহা তাঁহাকে চপলা না করিয়া শান্তস্বভাবা করিয়াছিল, প্রগল্‌ভা না করিয়া চিন্তাশীলা করিয়াছিল, স্বার্থদৃষ্টিনিবদ্ধা না করিয়া নিঃস্বার্থ-প্রেমিকা করিয়াছিল এবং অন্তর হইতে সর্বপ্রকার অভাববোধ তিরোহিত করিয়া মানবসাধারণের দুঃখকষ্টের সহিত অনন্ত সমবেদনাসম্পন্না করিয়া ক্রমে তাঁহাকে করুণার সাক্ষাৎ প্রতিমায় পরিণত করিয়াছিল। মানসিক উল্লাসপ্রভাবে অশেষ শারীরিক কষ্টকে তাঁহার এখন হইতে কষ্ট বলিয়া মনে হইত না এবং আত্মীয়বর্গের নিকট হইতে আদর-যত্নের প্রতিদান না পাইলে মনে দুঃখ উপস্থিত হইত না। ঐরূপে সকল বিষয়ে সামান্যে সন্তুষ্টা থাকিয়া বালিকা আপনাতে আপনি ডুবিয়া তখন পিত্রালয়ে কাল কাটাইতে লাগিলেন। কিন্তু শরীর ঐস্থানে থাকিলেও তাঁহার মন ঠাকুরের পদানুসরণ করিয়া এখন হইতে দক্ষিণেশ্বরেই উপস্থিত ছিল। ঠাকুরকে দেখিবার এবং তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য মধ্যে মধ্যে মনে প্রবল বাসনার উদয় হইলেও তিনি উহা যত্নে সংবরণপূর্বক ধৈর্যাবলম্বন করিতেন ;—ভাবিতেন, প্রথম দর্শনে যিনি তাঁহাকে কৃপা করিয়া এতদূর ভালবাসিয়াছেন, তিনি তাঁহাকে ভুলিবেন না—সময় হইলেই নিজসকাশে ডাকিয়া লইবেন। ঐরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল এবং হৃদয়ে বিশ্বাস স্থির রাখিয়া তিনি ঐ শুভদিনের প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

চারিটি দীর্ঘ বৎসর একে একে কাটিয়া গেল। আশা-প্রতীক্ষার প্রবল প্রবাহ বালিকার মনে সমভাবেই বহিতে লাগিল। তাঁহার শরীর কিন্তু মনের ন্যায় সমভাবে থাকিল না, দিন দিন পরিবর্তিত হইয়া সন ১২৭৮ সালের পৌষে উহা তাঁহাকে অষ্টাদশবর্ষীয়া যুবতীতে পরিণত

করিল। দেবতুল্য স্বামীর প্রথম সন্দর্শনজনিত আনন্দ তাঁহাকে জীবনের দৈনন্দিন সুখ-দুঃখ হইতে উচ্চে উঠাইয়া রাখিলেও সংসারে নিরাবিল আনন্দের অবসর কোথায়?—গ্রামের পুরুষেরা জল্পনা করিতে বসিয়া যখন তাঁহার স্বামীকে 'উন্মত্ত' বলিয়া নির্দেশ করিত, 'পরিধানের কাপড় পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া হরি হরি করিয়া বেড়ায়' ইত্যাদি নানা কথা বলিত, অথবা সমবয়স্কা রমণীগণ যখন তাঁহাকে 'পাগলের স্ত্রী' বলিয়া করুণা বা উপেক্ষার পাত্রী বিবেচনা করিত, তখন মুখে কিছু না বলিলেও তাঁহার অন্তরে দারুণ ব্যথা উপস্থিত হইত। উন্মনা হইয়া তিনি তখন চিন্তা করিতেন—'তবে কি পূর্বে যেমন দেখিয়াছিলাম, তিনি সেরূপ আর নাই? লোকে যেমন বলিতেছে, তাঁহার কি ঐরূপ অবস্থান্তর হইয়াছে? বিধাতার নির্বন্ধে যদি ঐরূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমার ত আর এখানে থাকা কর্তব্য নহে, পার্শ্বে থাকিয়া তাঁহার সেবাতে নিযুক্তা থাকাই উচিত।' অশেষ চিন্তার পর স্থির করিলেন, তিনি দক্ষিণেশ্বরে স্বয়ং গমনপূর্বক চক্ষুকর্ণের বিবাদ-ভঞ্জন করিবেন, পরে যাহা কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইবে তদ্রূপ অনুষ্ঠান করিবেন।

ঐকালে শ্রীশ্রীমার মনোবেদনার কারণ ও দক্ষিণেশ্বরে আসিবার সঙ্কল্প

ফাল্গুনের দোলপূর্ণিমায়[১] শ্রীচৈতন্যদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পুণ্যতোয়া জাহ্নবীতে স্নান করিবার জন্য বঙ্গের সুদূর প্রান্ত হইতে অনেকে ঐদিন কলিকাতায় আগমন করে। শ্রীমতী মাতাঠাকুরাণীর দূরসম্পর্কীয়া কয়েকজন আত্মীয়া রমণী ঐ বৎসর ঐজন্য আগমন করিবেন

১ ১২৭৮ সালের দোলপূর্ণিমা ১৩ই চৈত্র পড়িয়াছিল (ইং ২৫শে মার্চ, ১৮৭২)।—গ্রঃ

বলিয়া ইতিপূর্বে স্থির করিয়াছিলেন। তিনি এখন তাঁহাদিগের সহিত গঙ্গাস্নানে যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। তাঁহার পিতার অভিমত না হইলে তাঁহাকে লইয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে ভাবিয়া রমণীরা তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে ঐ বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বুদ্ধিমান পিতা শুনিয়াই বুঝিলেন, কন্যা কেন এখন কলিকাতায় যাইতে অভিলাষিণী হইয়াছেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ং কলিকাতায় আসিবার জন্য সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিলেন।

ঐ সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিবার বন্দোবস্ত

রেল কোম্পানির প্রসাদে সুদূর কাশী, বৃন্দাবন কলিকাতার অতি সন্নিকট হইয়াছে, কিন্তু ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুর ও জয়রামবাটী উহাতে বঞ্চিত থাকিয়া যে দূরে সেই দূরেই পড়িয়া রহিয়াছে। এখনও ঐরূপ, অতএব তখনকার ত কথাই নাই—তখন বিষ্ণুপুর বা তারকেশ্বর কোন স্থানেই রেলপথ প্রস্তুত হয় নাই এবং ঘাটালকেও বাষ্পীয় জলযান কলিকাতার সহিত যুক্ত করে নাই। সুতরাং শিবিকা অথবা পদব্রজে গমনাগমন করা ভিন্ন ঐ সকল গ্রামের লোকের অন্য উপায় ছিল না এবং জমিদার প্রভৃতি ধনী লোক ভিন্ন মধ্যবিত্ত গৃহস্থেরা সকলেই শেষোক্ত উপায় অবলম্বন করিতেন। অতএব কন্যা ও সঙ্গিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীরামচন্দ্র দূরপথ পদব্রজে অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। ধান্যক্ষেত্রের পর ধান্যক্ষেত্র এবং মধ্যে মধ্যে কমলপূর্ণ দীর্ঘিকানিচয় দেখিতে দেখিতে, অশ্বত্থ বট প্রভৃতি বৃক্ষরাজির শীতল ছায়া অনুভব করিতে করিতে তাঁহারা সকলে প্রথম দুইতিন দিন সানন্দে

নিজ পিতার সহিত শ্রীশ্রীমার পদব্রজে গঙ্গাস্নান করিতে আগমন ও পথিমধ্যে জ্বর

পথ চলিতে লাগিলেন। কিন্তু গন্তব্য স্থলে পৌছান পর্যন্ত ঐ আনন্দ রহিল না। পথশ্রমে অনভ্যস্তা কন্যা পথিমধ্যে একস্থলে দারুণ জ্বরে আক্রান্তা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রকে বিশেষ চিন্তান্বিত করিলেন। কন্যার ঐরূপ অবস্থায় অগ্রসর হওয়া অসম্ভব বুঝিয়া তিনি চটিতে আশ্রয় লইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পীড়িতাবস্থায় শ্রীশ্রীমার অদ্ভুত দর্শনবিবরণ

পথিমধ্যে এরূপে পীড়িতা হওয়ায় শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর অন্তঃকরণে কতদূর বেদনা উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা বলিবার নহে। কিন্তু এক অদ্ভুত দর্শন উপস্থিত হইয়া ঐ সময়ে তাঁহাকে আশ্বস্তা করিয়াছিল। উক্ত দর্শনের কথা তিনি পরে স্ত্রীভক্তদিগকে কখন কখন নিম্নলিখিতভাবে বলিয়াছেন—

"জ্বরে যখন একেবারে বেহুঁশ, লজ্জাসরমরহিত হইয়া পড়িয়া আছি, তখন দেখিলাম পার্শ্বে একজন রমণী আসিয়া বসিল—মেয়েটির রং কাল, কিন্তু এমন সুন্দর রূপ কখনও দেখি নাই!—বসিয়া আমার গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল—এমন নরম ঠাণ্ডা হাত, গায়ের জ্বালা জুড়াইয়া যাইতে লাগিল। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কোথা থেকে আসচ গা?' রমণী বলিল, 'আমি দক্ষিণেশ্বর থেকে আসচি।' শুনিয়া অবাক হইয়া বলিলাম, 'দক্ষিণেশ্বর থেকে? আমি মনে করেছিলাম দক্ষিণেশ্বরে যাব, তাঁকে (ঠাকুরকে) দেখব, তাঁর সেবা করব। কিন্তু পথে জ্বর হওয়ায় আমার ভাগ্যে ঐসব আর হল না।' রমণী বলিল, 'সে কি! তুমি দক্ষিণেশ্বরে যাবে বই কি, ভাল হয়ে সেখানে যাবে, তাঁকে দেখবে। তোমার জন্যই ত তাঁকে সেখানে আটকে রেখেছি।' আমি বলিলাম, 'বটে? তুমি আমাদের কে হও গা?' মেয়েটি বললে,

'আমি তোমার বোন হই।' আমি বলিলাম, 'বটে? তাই তুমি এসেছ!' ঐরূপ কথাবার্তার পরেই ঘুমাইয়া পড়িলাম!"

প্রাতঃকালে উঠিয়া শ্রীরামচন্দ্র দেখিলেন, কন্যার জ্বর ছাড়িয়া গিয়াছে। পথিমধ্যে নিরুপায় হইয়া বসিয়া থাকা অপেক্ষা তিনি তাঁহাকে লইয়া ধীরে ধীরে পথ অতিবাহন করাই শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিলেন। রাত্রে পূর্বোক্ত দর্শনে উৎসাহিতা হইয়া শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী তাঁহার ঐ পরামর্শ সাগ্রহে অনুমোদন করিলেন। কিছু দূর যাইতে না যাইতে একখানি শিবিকাও পাওয়া গেল। তাঁহার পুনরায় জ্বর আসিল, কিন্তু পূর্ব দিবসের ন্যায় প্রবলবেগে না আসায় তিনি উহার প্রকোপে একেবারে অক্ষম হইয়া পড়িলেন না। ঐ বিষয়ে কাহাকেও কিছু বলিলেনও না। ক্রমে পথের শেষ হইল এবং রাত্রি নয়টার সময় শ্রীশ্রীমা দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সমীপে উপস্থিত হইলেন।

রুগ্ন অবস্থাতে শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে পৌঁছান ও ঠাকুরের আচরণ

ঠাকুর তাঁহাকে সহসা ঐরূপে রোগাক্রান্তা হইয়া আসিতে দেখিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। ঠাণ্ডা লাগিয়া জ্বর বাড়িবে বলিয়া নিজ গৃহে ভিন্ন শয্যায় তাঁহার শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন এবং দুঃখ করিয়া বারংবার বলিতে লাগিলেন, "তুমি এতদিনে আসিলে? আর কি আমার সেজবাবু (মথুরবাবু) আছে যে তোমার যত্ন হবে?" ঔষধ পথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্তে তিন-চারি দিনেই শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আরোগ্যলাভ করিলেন। ঐ তিন চারি দিন ঠাকুর তাঁহাকে দিবারাত্র নিজগৃহে রাখিয়া ঔষধ পথ্যাদি সকল বিষয়ের স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিলেন, পরে নহবতঘরে নিজ জননীর নিকটে তাঁহার থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন।

চক্ষুকর্ণের বিবাদ মিটিল ; পরের কথায় উদিত হইয়া যে সন্দেহ মেঘের ন্যায় বিশ্বাস-সূর্যকে আবৃত করিতে উপক্রম করিয়াছিল, ঠাকুরের যত্ন-প্রবৃদ্ধ অনুরাগপবনে তাহা ছিন্নভিন্ন হইয়া এখন কোথায় বিলীন হইল ! শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, ঠাকুর পূর্বে যেমন ছিলেন এখনও তদ্রূপ আছেন—সংসারী মানব না বুঝিয়া তাঁহার সম্বন্ধে নানা রটনা করিয়াছে। দেবতা দেবতাই আছেন এবং বিস্মৃত হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার প্রতি পূর্বের ন্যায় সমানভাবে কৃপাপরবশ রহিয়াছেন। অতএব কর্তব্য স্থির হইতে বিলম্ব হইল না। প্রাণের উল্লাসে তিনি নহবতে থাকিয়া দেবতার ও দেবজননীর সেবায় নিযুক্তা হইলেন –এবং তাঁহার পিতা কন্যার আনন্দে আনন্দিত হইয়া কয়েক দিন ঐস্থানে অবস্থানপূর্বক হৃষ্টচিত্তে নিজ গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

ঠাকুরের ঐরূপ আচরণে শ্রীশ্রীমার সানন্দে তথায় অবস্থিতি

সন ১২৭৪ সালে কামারপুকুরে অবস্থান করিবার কালে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর আগমনে ঠাকুরের মনে যে চিন্তাপরম্পরার উদয় হইয়াছিল তাহা আমরা পাঠককে বলিয়াছি। ব্রহ্মবিজ্ঞানে দৃঢ়প্রতিষ্ঠালাভসম্বন্ধীয় আচার্য শ্রীমৎ তোতাপুরীর কথা আলোচনাপূর্বক তিনি ঐ কালে নিজ সাধনলব্ধ বিজ্ঞানের পরীক্ষা করিতে এবং পত্নীর প্রতি নিজ কর্তব্যপরিপালনে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু ঐ সময়ে তদুভয় অনুষ্ঠানের আরম্ভ মাত্র করিয়াই তাঁহাকে কলিকাতায় ফিরিতে হইয়াছিল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে নিকটে পাইয়া তিনি এখন পুনরায় ঐ দুই বিষয়ে মনোনিবেশ করিলেন।

ঠাকুরের নিজ ব্রহ্ম-বিজ্ঞানের পরীক্ষা ও পত্নীকে শিক্ষা-প্রদান

প্রশ্ন উঠিতে পারে—পত্নীকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তিনি

ইতিপূর্বেই ত ঐরূপ করিতে পারিতেন, ঐরূপ করেন নাই কেন? উত্তরে বলিতে হয়—সাধারণ মানব ঐরূপ করিত, সন্দেহ নাই; ঠাকুর ঐ শ্রেণীভুক্ত ছিলেন না বলিয়া ঐরূপ আচরণ করেন নাই। ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া যাঁহারা জীবনে প্রতিক্ষণ প্রতি কার্য করিতে অভ্যস্ত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বয়ং মতলব আঁটিয়া কখন কোন কার্যে অগ্রসর হন না। আত্মকল্যাণ বা অপরের কল্যাণসাধন করিতে তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় পরিচ্ছিন্ন, ক্ষুদ্র বুদ্ধির সহায়তা না লইয়া শ্রীভগবানের বিরাট বুদ্ধির সহায়তা ও ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিয়া থাকেন। সেজন্য স্বেচ্ছায় পরীক্ষা দিতে তাঁহারা সর্বথা পরাঙ্মুখ হন। কিন্তু বিরাটেচ্ছার অনুগামী হইয়া চলিতে চলিতে যদি কখন পরীক্ষা দিবার কাল স্বতঃ উপস্থিত হয়, তবে তাঁহারা ঐ পরীক্ষা প্রদানের জন্য সানন্দে অগ্রসর হন। ঠাকুর স্বেচ্ছায় আপন ব্রহ্মবিজ্ঞানের গভীরতা পরীক্ষা করিতে অগ্রসর হয়েন নাই। কিন্তু যখন দেখিলেন পত্নী কামারপুকুরে তাঁহার সকাশে আগমন করিয়াছেন এবং তৎপ্রতি নিজ কর্তব্য প্রতিপালনে অগ্রসর হইলে তাঁহাকে ঐ বিষয়ে পরীক্ষা প্রদান করিতে হইবে, তখনই ঐ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। আবার ঈশ্বরেচ্ছায় ঐ অবসর চলিয়া যাইয়া যখন তাঁহাকে কলিকাতায় আগমনপূর্বক পত্নীর নিকট হইতে দূরে থাকিতে হইল, তখন তিনি ঐরূপ অবসর পুনরানয়নের জন্য স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইলেন না। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী যতদিন না স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেন, ততদিন পর্যন্ত তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়নের জন্য কিছুমাত্র চেষ্টা করিলেন না। সাধারণ বুদ্ধিসহায়ে আমরা ঠাকুরের আচরণের ঐরূপে সামঞ্জস্য করিতে পারি; তদ্ভিন্ন বলিতে পারি যে,

ইতিপূর্বে ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান না করিবার কারণ

যোগদৃষ্টিসহায়ে তিনি বিদিত হইয়াছিলেন, ঐরূপ করাই ঈশ্বরের অভিপ্রেত।

সে যাহা হউক, পত্নীর প্রতি কর্তব্য পালনপূর্বক পরীক্ষা প্রদানের অবসর উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ঠাকুর এখন তদ্বিষয়ে সানন্দে অগ্রসর হইলেন এবং অবসর পাইলেই মাতাঠাকুরানীকে মানবজীবনের উদ্দেশ্য এবং কর্তব্য সম্বন্ধে সর্বপ্রকার শিক্ষাপ্রদান করিতে লাগিলেন। শুনা যায়, এই সময়েই তিনি মাতাঠাকুরানীকে বলিয়াছিলেন, "চাঁদা মামা যেমন সকল শিশুর মামা, তেমনি ঈশ্বর সকলেরই আপনার, তাঁহাকে ডাকিবার সকলেরই অধিকার আছে; যে ডাকিবে তিনি তাহাকেই দর্শনদানে কৃতার্থ করিবেন, তুমি ডাক ত তুমিও তাঁহার দেখা পাইবে।" কেবল উপদেশ মাত্র দানেই ঠাকুরের শিক্ষার অবসান হইত না; কিন্তু শিষ্যকে নিকটে রাখিয়া ভালবাসায় সর্বতোভাবে আপনার করিয়া লইয়া তিনি তাহাকে প্রথমে উপদেশ প্রদান করিতেন, পরে শিষ্য উহা কার্যে কতদূর প্রতিপালন করিতেছে সর্বদা তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিতেন এবং ভ্রমবশতঃ সে বিপরীত অনুষ্ঠান করিলে তাহাকে বুঝাইয়া সংশোধন করিয়া দিতেন। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর সম্বন্ধে তিনি যে এখন পূর্বোক্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। প্রথম দিন হইতে ভালবাসায় তিনি তাঁহাকে কতদূর আপনার করিয়া লইয়াছিলেন, তাহা আগমনমাত্র তাঁহাকে নিজ গৃহে বাস করিতে দেওয়াতে এবং আরোগ্য হইবার পরে প্রত্যহ রাত্রে নিজ শয্যায় শয়ন করিবার অনুমতি প্রদানে বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়। মাতাঠাকুরানীর সহিত ঠাকুরের এইকালের দিব্য আচরণের কথা আমরা

ঠাকুরের শিক্ষাদানের প্রণালী ও শ্রীশ্রীমার সহিত এইকালে আচরণ

পাঠককে অন্যত্র* বলিয়াছি, এজন্য এখানে তাহার আর পুনরুল্লেখ করিব না। দুই একটি কথা, যাহা ইতিপূর্বে বলা হয় নাই, তাহাই কেবল বলিব।

শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী একদিন এই সময়ে ঠাকুরের পদসংবাহন করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমাকে তোমার কি বলিয়া বোধ হয়?" ঠাকুর তদুত্তরে বলিয়াছিলেন, "যে মা মন্দিরে আছেন তিনিই এই শরীরের জন্ম দিয়াছেন ও সম্প্রতি নহবতে বাস করিতেছেন এবং তিনিই এখন আমার পদসেবা করিতেছেন! সাক্ষাৎ আনন্দময়ীর রূপ বলিয়া তোমাকে সর্বদা সত্য সত্য দেখিতে পাই!"

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর কি ভাবে দেখিতেন

অন্য এক দিবস শ্রীশ্রীমাকে নিজ পার্শ্বে নিদ্রিতা দেখিয়া ঠাকুর আপন মনকে সম্বোধন করিয়া এইরূপ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন—"মন, ইহারই নাম স্ত্রীশরীর, লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত হয়; কিন্তু উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয়, সচ্চিদানন্দঘন ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না; ভাবের ঘরে চুরি করিও না, পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও না, সত্য বল তুমি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও? যদি উহা চাও ত এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ কর।" ঐরূপ বিচারপূর্বক ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর অঙ্গ স্পর্শ করিতে উদ্যত হইবামাত্র মন কুণ্ঠিত হইয়া সহসা সমাধিপথে এমন বিলীন হইয়া গেল যে, সে রাত্রিতে উহা আর সাধারণ ভাবভূমিতে অবরোহণ করিল না। ঈশ্বরের নাম

ঠাকুরের নিজ মনের সংযম পরীক্ষা

* গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়

শ্রবণ করাইয়া পরদিন বহুযত্নে তাঁহার চৈতন্য সম্পাদন করাইতে হইয়াছিল।

ঐরূপে পূর্ণযৌবন ঠাকুর এবং নবযৌবনসম্পন্না শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এই কালের দিব্য লীলাবিলাস সম্বন্ধে যে সকল কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শ্রবণ করিয়াছি, তাহা জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে অপর কোনও মহাপুরুষের সম্বন্ধে শ্রবণ করা যায় না। উহাতে মুগ্ধ হইয়া মানব-হৃদয় স্বতঃই ইঁহাদিগের দেবত্বে বিশ্বাসবান হইয়া উঠে এবং অন্তরের ভক্তি-শ্রদ্ধা ইঁহাদিগের শ্রীপাদপদ্মে অর্পণ করিতে বাধ্য হয়। দেহবোধবিরহিত ঠাকুরের প্রায় সমস্ত রাত্রি এইকালে সমাধিতে অতিবাহিত হইত এবং সমাধি হইতে ব্যুত্থিত হইয়া বাহ্যভূমিতে অবরোহণ করিলেও তাঁহার মন এত উচ্চে অবস্থান করিত যে, সাধারণ মানবের ন্যায় দেহবুদ্ধি উহাতে এককক্ষণের জন্যও উদিত হইত না।

পত্নীকে লইয়া ঠাকুরের আচরণের ন্যায় আচরণ কোন অবতারপুরুষ করেন নাই—উহার ফল

ঐরূপে দিনের পর দিন এবং মাসের পর মাস[১] অতীত হইয়া ক্রমে বৎসরাধিক কাল অতীত হইল—কিন্তু এই অদ্ভুত ঠাকুর ও ঠাকুরানীর সংযমের বাঁধ ভঙ্গ হইল না! —এককক্ষণের জন্য ভুলিয়াও তাঁহাদের মন, প্রিয়

শ্রীশ্রীমার অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

১ 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা' ২য় খণ্ড, ১২৮ পৃষ্ঠায় আছে, "দক্ষিণেশ্বরে মাস দেড়েক থাকবার পরেই ষোড়শীপূজা করলেন।" শ্রীশশিভূষণ ঘোষ প্রণীত 'শ্রীরামকৃষ্ণদেব' গ্রন্থের ৩৩১ পৃষ্ঠায় "শ্রীশ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে আসিবার ৩ মাসের মধ্যেই" ষোড়শীপূজার উল্লেখ আছে। অধিকন্তু 'শ্রীশ্রীমায়ের কথা', ১ম খণ্ড, ৩০৯ পৃঃ এবং 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত', ২য় ভাগ, ১৭৮ পৃষ্ঠায় ৮ মাস একত্রে শয়নের উল্লেখ আছে। 'গুরুভাব—পূর্বার্ধ', ১৫২ পৃষ্ঠায়ও ৮ মাস শয়নের কথাই সমর্থিত হয়।—প্রঃ

বোধ করিয়া দেহের রমণকামনা করিল না। ঐ কালের কথা স্মরণ করিয়া ঠাকুর পরে আমাদিগকে কখন কখন বলিয়াছেন, "ও (শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরানী) যদি এত ভাল না হইত, আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কি না, কে বলিতে পারে? বিবাহের পরে মাকে (৺জগদম্বাকে) ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম, 'মা আমার পত্নীর ভিতর হইতে কামভাব এককালে দূর করিয়া দে'—ওর (শ্রীশ্রীমার) সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এইকালে বুঝিয়াছিলাম, মা সে কথা সত্যসত্যই শ্রবণ করিয়াছিলেন।"

পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ঠাকুরের সঙ্কল্প

বৎসরাধিক কাল অতীত হইলেও মনে একক্ষণের জন্য যখন দেহবুদ্ধির উদয় হইল না এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে কখন ৺জগদম্বার অংশভাবে এবং কখন সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা বা ব্রহ্মভাবে দৃষ্টি করা ভিন্ন অপর কোন ভাবে দেখিতে ও ভাবিতে যখন সমর্থ হইলেন না, তখন ঠাকুর বুঝিলেন শ্রীশ্রীজগন্মাতা কৃপা করিয়া তাঁহাকে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করিয়াছেন এবং মার কৃপায় তাঁহার মন এখন সহজ স্বাভাবিক ভাবে দিব্যভাবভূমিতে আরূঢ় হইয়া সর্বদা অবস্থান করিতেছে। শ্রীশ্রীজগন্মাতার প্রসাদে তিনি এখন প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন, তাঁহার সাধনা সম্পূর্ণ হইয়াছে এবং গন্মাতার শ্রীপাদপদ্মে মন এতদূর তন্ময় হইয়াছে যে, জ্ঞাত বা াতসারে মার ইচ্ছার বিরোধী কোন ইচ্ছাই এখন আর উহাতে উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। অতঃপর শ্রীশ্রীজগদম্বার নিয়োগে তাঁহার প্রাণে এক অদ্ভুত বাসনার উদয় হইল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি এখন উহা কার্যে পরিণত করিলেন। ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর

নিকটে ঐ বিষয়ে সময়ে সময়ে যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন সম্বদ্ধভাবে আমরা পাঠককে বলিব।

সন ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের অর্ধেকের উপর গত হইয়াছে।[১] আজ অমাবস্যা, ফলহারিণী কালিকাপূজার পুণ্যদিবস। সুতরাং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আজ বিশেষ পর্ব উপস্থিত। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বাকে পূজা করিবার মানসে আজ বিশেষ আয়োজন করিয়াছেন। ঐ আয়োজন কিন্তু মন্দিরে না হইয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে গুপ্তভাবে তাঁহার গৃহেই হইয়াছে। পূজাকালে ৺দেবীকে বসিতে দিবার জন্য আলিম্পনভূষিত একখানি পীঠ পূজকের আসনের দক্ষিণপার্শ্বে স্থাপিত হইয়াছে। সূর্য অস্তগমন করিল, ক্রমে গাঢ় তিমিরাবগুণ্ঠনে অমাবস্যার নিশি সমাগতা হইল। ঠাকুরের ভাগিনেয় হৃদয়কে অদ্য রাত্রিকালে মন্দিরে ৺দেবীর বিশেষ পূজা করিতে হইবে, সুতরাং ঠাকুরের পূজার আয়োজনে যথাসাধ্য সহায়তা করিয়া সে মন্দিরে চলিয়া যাইল এবং ৺রাধাগোবিন্দের রাত্রিকালে সেবা-পূজা-সমাপনানন্তর দীনু পূজারী আসিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে সহায়তা করিতে লাগিল। ৺দেবীর রহস্যপূজার সকল আয়োজন সম্পূর্ণ হইতে রাত্রি নয়টা বাজিয়া গেল। শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীকে পূজাকালে উপস্থিত থাকিতে ঠাকুর ইতিপূর্বে বলিয়া পাঠাইয়াছিলেন, তিনিও ঐ গৃহে এখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর পূজায় বসিলেন।

৺ষোড়শীপূজার আয়োজন

পূজাদ্রব্যসকল সংশোধিত হইয়া পূর্বকৃত্য সম্পাদিত হইল। ঠাকুর এইবার আলিম্পনভূষিত পীঠে শ্রীশ্রীমাকে উপবেশনের জন্য ইঙ্গিত

১ শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় ভাগ, ১২৮-১৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। —প্রঃ

করিলেন। পূজা দর্শন করিতে করিতে শ্রীমতী মাতাঠাকুরানী ইতিপূর্বে অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং কি করিতেছেন, তাহা সম্যক্ না বুঝিয়া মন্ত্রমুগ্ধার ন্যায় তিনি এখন পূর্বমুখে উপবিষ্ট ঠাকুরের দক্ষিণভাগে উত্তরাস্যা হইয়া উপবিষ্টা হইলেন। সম্মুখস্থ কলসের মন্ত্রপূত বারি দ্বারা ঠাকুর বারংবার শ্রীশ্রীমাকে যথাবিধানে অভিষিক্তা করিলেন। অনন্তর মন্ত্র শ্রবণ করাইয়া তিনি এখন প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণ করিলেন—

শ্রীশ্রীমাকে অভিষেকপূর্বক ঠাকুরের পূজা-করণ

"হে বালে, হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাতঃ ত্রিপুরাসুন্দরি, সিদ্ধিদ্বার উন্মুক্ত কর, ইহার (শ্রীশ্রীমার) শরীরমনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর!"

অতঃপর শ্রীশ্রীমার অঙ্গে মন্ত্রসকলের যথাবিধানে ন্যাসপূর্বক ঠাকুর সাক্ষাৎ ৺দেবীজ্ঞানে তাঁহাকে ষোড়শোপচারে পূজা করিলেন এবং ভোগ নিবেদন করিয়া নিবেদিত বস্তুসকলের কিয়দংশ স্বহস্তে তাঁহার মুখে প্রদান করিলেন। বাহ্যজ্ঞান-তিরোহিতা হইয়া শ্রীশ্রীমা সমাধিস্থা হইলেন! ঠাকুরও অর্ধবাহ্যদশায় মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে সম্পূর্ণ সমাধিমগ্ন হইলেন! সমাধিস্থ পূজক সমাধিস্থা দেবীর সহিত আত্মস্বরূপে পূর্ণভাবে মিলিত ও একীভূত হইলেন।

পূজাশেষে সমাধি ও ঠাকুরের জপ-পূজাদি ৺দেবীচরণে সমর্পণ

কতক্ষণ কাটিয়া গেল। নিশার দ্বিতীয় প্রহর বহুক্ষণ অতীত হইল। আত্মারাম ঠাকুরের এইবার বাহ্যসংজ্ঞার কিছু কিছু লক্ষণ দেখা গেল। পূর্বের ন্যায় অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইয়া তিনি এখন ৺দেবীকে আত্মনিবেদন করিলেন। অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা

প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রীশ্রীদেবীপাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জনপূর্বক মন্ত্রোচ্চারণ করিতে করিতে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন—

"হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গলস্বরূপে, হে সর্বকর্মনিষ্পন্নকারিণি, হে শরণদায়িনি ত্রিনয়নি শিব-গেহিনি গৌরি, হে নারায়ণি, তোমাকে প্রণাম, তোমাকে প্রণাম করি।"

পূজা শেষ হইল—মূর্তিমতী বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীর উপাসনাপূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হইল—তাঁহার দেব-মানবত্ব সর্বতোভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করিল।

৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর প্রায় পাঁচমাস কাল ঠাকুরের নিকটে অবস্থান করিয়াছিলেন। পূর্বের ন্যায় ঐকালে তিনি ঠাকুর এবং ঠাকুরের জননীর সেবায় নিযুক্তা থাকিয়া দিবাভাগ নহবতঘরে অতিবাহিত করিয়া রাত্রিকালে ঠাকুরের শয্যাপার্শ্বে শয়ন করিতেন। দিবারাত্র ঠাকুরের ভাবসমাধির বিরাম ছিল না এবং কখন কখন নির্বিকল্প সমাধিপথে তাঁহার মন সহসা এমন বিলীন হইত যে, মৃতের লক্ষণসকল তাঁহার দেহে প্রকাশিত হইত। কখন ঠাকুরের ঐরূপ সমাধি হইবে, এ আশঙ্কায় শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে নিদ্রা হইত না। বহুক্ষণ সমাধিস্থ হইবার পরেও ঠাকুরের সংজ্ঞা হইতেছে না দেখিয়া ভীতা ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইয়া তিনি একরাত্রিতে হৃদয় এবং অন্যান্য সকলের নিদ্রাভঙ্গ করিয়াছিলেন। পরে হৃদয় আসিয়া বহুক্ষণ নাম শুনাইলে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইয়াছিল। সমাধিভঙ্গের পর ঠাকুর সকল কথা জানিতে পারিয়া শ্রীশ্রীমার রাত্রিকালে প্রত্যহ নিদ্রার ব্যাঘাত হইতেছে জানিয়া নহবতে তাঁহার জননীর নিকটে মাতাঠাকুরানীর

ঠাকুরের নিরন্তর সমাধির জন্য শ্রীশ্রীমার নিদ্রার ব্যাঘাত হওয়ায় অন্যত্র শয়ন এবং কামারপুকুরে প্রত্যাগমন

শয়নের বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন। ঐরূপে প্রায় এক বৎসর চারি মাসকাল ঠাকুরের নিকটে দক্ষিণেশ্বরে অতিবাহিত করিয়া ১২৮০ সালের আরম্ভে কোন সময়ে শ্রীশ্রীমা কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।[১]

[১] শ্রীশ্রীমায়ের কথা, ২য় খণ্ড, ১৩০ পৃঃ

একবিংশ অধ্যায়

সাধকভাবের শেষ কথা

৺ষোড়শী-পূজা সম্পন্ন করিয়া ঠাকুরের সাধন-যজ্ঞ সম্পূর্ণ হইল। ঈশ্বরানুরাগরূপ যে পুণ্য হুতবহ হৃদয়ে নিরন্তর প্রজ্বলিত থাকিয়া তাঁহাকে দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অস্থির করিয়া নানাভাবে সাধনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিল এবং ঐকালের পরেও সম্পূর্ণরূপে শান্ত হইতে দেয় নাই, পূর্ণাহুতি প্রাপ্ত হইয়া এতদিনে তাহা প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। ঐরূপ না হইয়াই বা উহা এখন করিবে কি—ঠাকুরের আপনার বলিবার এখন আর কি আছে, যাহা তিনি উহাতে ইতিপূর্বে আহুতি প্রদান না করিয়াছেন?—ধন, মান, নাম, যশাদি পৃথিবীর সমস্ত ভোগাকাঙ্ক্ষা বহুপূর্বেই তিনি উহাতে বিসর্জন করিয়াছেন! হৃদয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কারাদি সকলকেও উহার করাল মুখে একে একে আহুতি দিয়াছেন!—ছিল কেবল বিবিধ সাধনপথে অগ্রসর হইয়া নানাভাবে শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে দেখিবার বাসনা—তাহাও এখন তিনি উহাতে নিঃশেষে অর্পণ করিলেন! অতএব প্রশান্ত না হইয়া উহা এখন আর করিবে কি?

৺ষোড়শী-পূজার পরে ঠাকুরের সাধন-বাসনার নিবৃত্তি

ঠাকুর দেখিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহার প্রাণের ব্যাকুলতা দেখিয়া তাঁহাকে সর্বাগ্রে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছেন—পরে, নানা অদ্ভুত গুণসম্পন্ন ব্যক্তিসকলের সহিত তাঁহাকে পরিচিত করাইয়া বিবিধ শাস্ত্রীয় পথে অগ্রসর করিয়া ঐ দর্শন মিলাইয়া লইবার অবসর দিয়াছেন—অতএব

তাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি চাহিবেন! দেখিলেন চৌষট্টিখানা তন্ত্রের সকল সাধন একে একে সম্পন্ন হইয়াছে, বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত পঞ্চ-ভাবাশ্রিত যতপ্রকার সাধনপথ ভারতে প্রবর্তিত আছে, সে সকল যথাবিধি অনুষ্ঠিত হইয়াছে, সনাতন বৈদিক মার্গানুসারী হইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণ নিরাকার রূপের দর্শন হইয়াছে এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার অচিন্ত্যলীলায় ভারতের বাহিরে উদ্ভূত ইসলাম মতের সাধনায় প্রবর্তিত হইয়াও যথাযথ ফল হস্তগত হইয়াছে—সুতরাং তাঁহার নিকটে তিনি এখন আর কি দেখিতে বা শুনিতে চাহিবেন!

কারণ, সর্বধর্মমতের সাধনা সম্পূর্ণ করিয়া অপর আর কি করিবেন

এই কালের এক বৎসর পরে কিন্তু ঠাকুরের মন আবার অন্য এক সাধনপথে শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দর্শন করিবার জন্য উন্মুখ হইয়াছিল। তখন তিনি শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের সহিত পরিচিত হইয়াছেন এবং তাঁহার নিকটে বাইবেল শ্রবণপূর্বক শ্রীশ্রীঈশার পবিত্র জীবনের এবং সম্প্রদায়-প্রবর্তনের কথা জানিতে পারিয়াছেন। ঐ বাসনা মনে ঈষন্মাত্র উদয় হইতে না হইতে শ্রীশ্রীজগদম্বা উহা অদ্ভুত উপায়ে পূর্ণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সেই হেতু উহার জন্য তাঁহাকে বিশেষ কোনরূপ চেষ্টা করিতে হয় নাই। ঘটনা এইরূপ হইয়াছিল—দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর দক্ষিণপার্শ্বে যদুলাল মল্লিকের উদ্যানবাটী; ঠাকুর ঐ স্থানে মধ্যে মধ্যে বেড়াইতে যাইতেন। যদুলাল ও তাঁহার মাতা ঠাকুরকে দর্শন করিয়া অবধি তাঁহাকে বিশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা করিতেন, সুতরাং উদ্যানে তাঁহারা উপস্থিত না থাকিলেও ঠাকুর তথায় বেড়াইতে যাইলে কর্মচারিগণ বাবুদের বৈঠকখানা উন্মুক্ত করিয়া তাঁহাকে কিছুকাল বসিবার ও বিশ্রাম

শ্রীশ্রীঈশা-প্রবর্তিত ধর্মে ঠাকুরের অদ্ভুত উপায়ে সিদ্ধিলাভ

করিবার জন্য অনুরোধ করিত। উক্ত গৃহের দেয়ালে অনেকগুলি উত্তম চিত্র বিলম্বিত ছিল। মাতৃক্রোড়ে অবস্থিত শ্রীশ্রীঈশার বালগোপালমূর্তিও একখানি তন্মধ্যে ছিল। ঠাকুর বলিতেন, একদিন উক্ত ঘরে বসিয়া তিনি ঐ ছবিখানি তন্ময় হইয়া দেখিতেছিলেন এবং শ্রীশ্রীঈশার অদ্ভুত জীবনকথা ভাবিতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন ছবিখানি যেন জীবন্ত জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিয়াছে এবং ঐ অদ্ভুত দেবজননী ও দেবশিশুর অঙ্গ হইতে জ্যোতিরশ্মিসমূহ তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার মানসিক ভাবসকল আমূল পরিবর্তন করিয়া দিতেছে! জন্মগত হিন্দুসংস্কারসমূহ অন্তরের নিভৃত কোণে লীন হইয়া ভিন্ন সংস্কারসকল উহাতে উদয় হইতেছে দেখিয়া ঠাকুর তখন নানাভাবে আপনাকে সামলাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বাকে কাতর হইয়া বলিতে লাগিলেন —"মা আমাকে এ কি করিতেছিস্!" কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ঐ সংস্কারতরঙ্গ প্রবলবেগে উত্থিত হইয়া তাঁহার মনের হিন্দুসংস্কারসমূহকে এককালে তলাইয়া দিল। তখন দেবদেবীসকলের প্রতি ঠাকুরের অনুরাগ, ভালবাসা কোথায় বিলীন হইল এবং শ্রীশ্রীঈশার ও তৎপ্রবর্তিত সম্প্রদায়ের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসিয়া হৃদয় অধিকারপূর্বক খ্রীষ্টীয় পাদরিসমূহ প্রার্থনামন্দিরে শ্রীশ্রীঈশার মূর্তির সম্মুখে ধূপ-দীপ দান করিতেছে, অন্তরের ব্যাকুলতা কাতর প্রার্থনায় নিবেদন করিতেছে—এই সকল বিষয় ঠাকুরকে দেখাইতে লাগিল। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে ফিরিয়া নিরন্তর ঐসকল বিষয়ের ধ্যানেই মগ্ন রহিলেন এবং শ্রীশ্রীজগন্মাতার মন্দিরে যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করিবার কথা এককালে ভুলিয়া যাইলেন। তিন দিন পর্যন্ত ঐ ভাবতরঙ্গ তাঁহার উপর ঐরূপে প্রভুত্ব করিয়া বর্তমান রহিল। পরে তৃতীয় দিবসের অবসানে ঠাকুর পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে

বেড়াইতে দেখিলেন, এক অদৃষ্টপূর্ব দেবমানব, সুন্দর গৌরবর্ণ, স্থিরদৃষ্টিতে তাঁহাকে অবলোকন করিতে করিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইতেছেন। ঠাকুর দেখিয়াই বুঝিলেন, ইনি বিদেশী এবং বিজাতিসম্ভূত। দেখিলেন, বিশ্রান্ত নয়নযুগল ইঁহার মুখের অপূর্ব শোভা সম্পাদন করিয়াছে এবং নাসিকা 'একটু চাপা' হইলেও উহাতে ঐ সৌন্দর্যের কিছুমাত্র ব্যতিক্রম সাধিত হয় নাই। ঐ সৌম্য মুখমণ্ডলের অপূর্ব দেবভাব দেখিয়া ঠাকুর মুগ্ধ হইলেন এবং বিস্মিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন—কে ইনি? দেখিতে দেখিতে ঐ মূর্তি নিকটে আগমন করিল এবং ঠাকুরের পূত হৃদয়ের অন্তস্তল হইতে ধ্বনিত হইতে লাগিল, 'ঈশামসি—দুঃখ-যাতনা হইতে জীবকুলকে উদ্ধারের জন্য যিনি হৃদয়ের শোণিত দান এবং মানবহস্তে অশেষ নির্যাতন সহ্য করিয়াছিলেন, সেই ঈশ্বরাভিন্ন পরম যোগী ও প্রেমিক শ্রীষ্ট ঈশামসি!' তখন দেবমানব ঈশা ঠাকুরকে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার শরীরে লীন হইলেন এবং ভাবাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া ঠাকুরের মন সগুণ বিরাটব্রহ্মের সহিত কতক্ষণ পর্যন্ত একীভূত হইয়া রহিল! ঐরূপে শ্রীশ্রীঈশার দর্শনলাভ করিয়া ঠাকুর তাঁহার অবতারত্বসম্বন্ধে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীঈশাসম্বন্ধীয় ঠাকুরের দর্শন কিরূপে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয়

উহার বহুকাল পরে আমরা যখন ঠাকুরকে দর্শন করিতে যাইতেছি, তখন তিনি একদিন শ্রীশ্রীঈশার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "হাঁ রে, তোরা ত বাইবেল পড়িয়াছিস্, বল দেখি উহাতে ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে কি লেখা আছে? তাঁহাকে দেখিতে কিরূপ ছিল?" আমরা বলিলাম, "মহাশয়, ঐ কথা বাইবেলের কোন স্থানে উল্লিখিত দেখি নাই; তবে ঈশা য়াহুদি জাতিতে

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অতএব সুন্দর গৌরবর্ণ ছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু বিশ্রান্ত এবং নাসিকা দীর্ঘ টিকাল ছিল নিশ্চয়!" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "কিন্তু আমি দেখিয়াছি তাঁহার নাক একটু চাপা! কেন ঐরূপ দেখিয়াছিলাম কে জানে!" ঠাকুরের ঐ কথায় তখন কিছু না বলিলেও আমরা ভাবিয়াছিলাম তাঁহার ভাবাবেশে দৃষ্ট মূর্তি ঈশার বাস্তবিক মূর্তির সহিত কেমন করিয়া মিলিবে? য়াহুদিজাতীয় পুরুষ-সকলের ন্যায় ঈশার নাসিকা টিকাল ছিল নিশ্চয়। কিন্তু ঠাকুরের শরীর রক্ষার কিছুকাল পরে জানিতে পারিলাম, ঈশার শারীরিক গঠন সম্বন্ধে তিন প্রকার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে এবং উহার মধ্যে একটিতে তাঁহার নাসিকা চাপা ছিল বলিয়া উল্লিখিত আছে।

ঠাকুরকে ঐরূপে পৃথিবীতে প্রচলিত প্রধান প্রধান যাবতীয় ধর্মমত-সকলে সিদ্ধ হইতে দেখিয়া পাঠকের মনে প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে তাঁহার কিরূপ ধারণা ছিল। সেজন্য ঐ বিষয়ে আমাদের যাহা জানা আছে তাহা এখানে লিপিবদ্ধ করা ভাল। ভগবান শ্রীবুদ্ধদেব সম্বন্ধে ঠাকুর হিন্দুসাধারণে যেমন বিশ্বাস করিয়া থাকে সেইরূপ বিশ্বাস করিতেন; অর্থাৎ শ্রীবুদ্ধদেবকে তিনি ঈশ্বরাবতার বলিয়া শ্রদ্ধা ও পূজা সর্বকাল অর্পণ করিতেন এবং পুরীধামস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ-সুভদ্রা-বলভদ্ররূপ ত্রিরত্নমূর্তিতে শ্রীভগবান্ বুদ্ধাবতারের প্রকাশ অদ্যাপি বর্তমান বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদে ভেদ-বুদ্ধির লোপ হইয়া মানবসাধারণের জাতিবুদ্ধি বিরহিত হওয়া-রূপ উক্ত ধামের মাহাত্ম্যের কথা শুনিয়া তিনি তথায় যাইবার জন্য সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু তথায় গমন করিলে নিজ শরীরনাশের সম্ভাবনা

শ্রীশ্রীবুদ্ধের অবতারত্ব ও তাঁহার ধর্মমত-সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

জানিতে পারিয়া এবং যোগদৃষ্টিসহায়ে শ্রীশ্রীজগদম্বার ঐ বিষয়ে অন্যরূপ অভিপ্রায় বুঝিয়া সেই সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।* গাঙ্গবারিকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবারি বলিয়া ঠাকুরের সতত বিশ্বাসের কথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদী অন্নগ্রহণে মানবের বিষয়াসক্ত মন তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয় এবং আধ্যাত্মিক ভাবধারণের উপযোগী হয়, এ কথাতেও তিনি ঐরূপ দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। বিষয়ী লোকের সঙ্গে কিছুকাল অতিবাহিত করিতে বাধ্য হইলে তিনি উহার পরেই কিঞ্চিৎ গাঙ্গবারি ও 'আটকে' মহাপ্রসাদ গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার শিষ্য-বর্গকেও ঐরূপ করিতে বলিতেন। শ্রীভগবান বুদ্ধাবতারে ঠাকুরের বিশ্বাস সম্বন্ধে উপরোক্ত কথাগুলি ভিন্ন আরও একটি কথা আমরা জানিতে পারিয়াছিলাম। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় শ্রীশ্রীবুদ্ধাবতারের লীলাময় জীবন যখন নাটকাকারে প্রকাশিত করেন, তখন ঠাকুর উহা শ্রবণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "শ্রীশ্রীবুদ্ধদেব ঈশ্বরাবতার ছিলেন ইহা নিশ্চয়, তৎপ্রবর্তিত মতে ও বৈদিক জ্ঞানমার্গে কোন প্রভেদ নাই।" আমাদিগের ধারণা, ঠাকুর যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ কথা জানিয়াই ঐরূপ বলিয়াছিলেন।

জৈনধর্মপ্রবর্তক তীর্থঙ্করসকলের এবং শিখধর্মপ্রবর্তক গুরু নানক হইতে আরম্ভ করিয়া গুরু গোবিন্দ পর্যন্ত দশ গুরুর অনেক কথা ঠাকুর পর জীবনে জৈন এবং শিখধর্মাবলম্বীদিগের নিকটে শুনিতে পাইয়া-ছিলেন। উহাতে তাঁহার ঐসকল সম্প্রদায়-প্রবর্তকের উপরে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধার উদয় হইয়াছিল। অন্যান্য দেবদেবীর আলেখ্যের সহিত

ঠাকুরের জৈন ও শিখধর্মমতে ভক্তিবিশ্বাস

* গুরুভাব, উত্তরার্ধ—৩য় অধ্যায়

তাঁহার গৃহের এক পার্শ্বে মহাবীর তীর্থঙ্করের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্তি এবং শ্রীশ্রীঈশার একখানি আলেখ্য স্থাপিত ছিল। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় ঐসকল আলেখ্যের এবং তদুভয়ের সম্মুখে ঠাকুর ধূপ ধুনা প্রদান করিতেন। ঐরূপে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করিলেও কিন্তু আমরা তাঁহাকে তীর্থঙ্করদিগের অথবা দশ গুরুর মধ্যে কাহাকেও ঈশ্বরাবতার বলিয়া নির্দেশ করিতে শ্রবণ করি নাই। শিখদিগের দশ গুরু সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "উঁহারা সকলে জনক ঋষির অবতার—শিখদিগের নিকট শুনিয়াছি, রাজর্ষি জনকের মনে মুক্তিলাভ করিবার পূর্বে লোককল্যাণ-সাধন করিবার কামনার উদয় হইয়াছিল এবং সেজন্য তিনি নানকাদি গোবিন্দ পর্যন্ত দশ গুরুরূপে দশবার জন্মগ্রহণ করিয়া শিখজাতির মধ্যে ধর্মসংস্থাপনপূর্বক পরব্রহ্মের সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইয়াছিলেন ; শিখদিগের ঐ কথা মিথ্যা হইবার কোনও কারণ নাই।"

সে যাহা হউক, সর্বসাধনে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের কতকগুলি অসাধারণ উপলব্ধি হইয়াছিল। ঐ উপলব্ধিগুলির কতকগুলি ঠাকুরের নিজ সম্বন্ধে ছিল এবং কতকগুলি সাধারণ আধ্যাত্মিক বিষয়-সম্বন্ধে ছিল। উহার কিছু কিছু বর্তমান গ্রন্থে আমরা ইতিপূর্বে পাঠককে বলিলেও প্রধান প্রধানগুলির এখানে উল্লেখ করিতেছি। সাধনকালের অবসানে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া ভাবমুখে থাকিবার কালে ঐ উপলব্ধিগুলির সম্যক অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন বলিয়া আমাদিগের ধারণা। তিনি যোগদৃষ্টিসহায়ে ঐ উপলব্ধিসকল প্রত্যক্ষ করিলেও সাধারণ মানববুদ্ধিতে উহাদিগের সম্বন্ধে যতটা বুঝিতে পারা যায়, তাহাও আমরা এখানে পাঠককে বলিতে চেষ্টা করিব।

সর্বধর্মমতে সিদ্ধ হইয়া ঠাকুরের অসাধারণ উপলব্ধি সকলের আবৃত্তি

প্রথম—ঠাকুরের ধারণা হইয়াছিল তিনি ঈশ্বরাবতার, আধিকারিক পুরুষ, তাঁহার সাধন-ভজন অন্যের জন্য সাধিত হইয়াছে। আপনার সহিত অপরের সাধকজীবনের তুলনা করিয়া তিনি তদুভয়ের বিশেষ পার্থক্য সাধারণ দৃষ্টিসহায়ে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। দেখিয়াছিলেন, সাধারণ সাধক একটিমাত্র ভাবসহায়ে আজীবন চেষ্টা করিয়া ঈশ্বরের দর্শনলাভপূর্বক শান্তির অধিকারী হয়; তাঁহার কিন্তু ঐরূপ না হইয়া যতদিন পর্যন্ত তিনি সকল মতের সাধনা না করিয়াছেন, ততদিন কিছুতেই শান্ত হইতে পারেন নাই এবং প্রত্যেক মতের সাধনে সিদ্ধ হইতে তাঁহার অত্যল্প সময় লাগিয়াছে। কারণ ভিন্ন কার্যের উৎপত্তি অসম্ভব; পূর্বোক্ত বিষয়ের কারণানুসন্ধানই ঠাকুরকে এখন যোগারূঢ় করাইয়া উহার কারণ পূর্বোক্ত প্রকারে দেখাইয়া দিয়াছিল। দেখাইয়াছিল, তিনি শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের বিশেষাবতার বলিয়াই তাঁহার ঐরূপ হইয়াছে এবং বুঝাইয়াছিল যে, তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব সাধনাসমূহ আধ্যাত্মিক রাজ্যে নূতন আলোক আনয়নপূর্বক জীবের কল্যাণসাধনের জন্যই অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহার ব্যক্তিগত অভাবমোচনের জন্য নহে।

(১) তিনি ঈশ্বরাবতার

দ্বিতীয়—তাঁহার ধারণা হইয়াছিল, অন্য জীবের ন্যায় তাঁহার মুক্তি হইবে না। সাধারণ যুক্তিসহায়ে ঐকথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ যিনি ঈশ্বর হইতে সর্বদা অভিন্ন—তাঁহার অংশবিশেষ, তিনি ত সর্বদাই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব, তাঁহার অভাব বা পরিচ্ছিন্নতাই নাই; অতএব মুক্তি হইবে কিরূপে? ঈশ্বরের জীবকল্যাণসাধন-রূপ কর্ম যতদিন থাকিবে, ততদিন তাঁহাকেও যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া উহা করিতে হইবে—অতএব তাঁহার মুক্তি কিরূপে

(২) তাঁহার মুক্তি নাই

হইবে? ঠাকুর যেমন বলিতেন, "সরকারী কর্মচারীকে জমিদারীর যেখানে গোলমাল উপস্থিত হইবে সেখানেই ছুটিতে হইবে।" যোগদৃষ্টি-সহায়ে তিনি নিজ সম্বন্ধে কেবল ঐ কথাই জানিয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম কোণ নির্দেশ করিয়া আমাদিগকে অনেক সময়ে বলিয়াছিলেন, আগামী বারে তাঁহাকে ঐদিকে আগমন করিতে হইবে। আমাদিগের কেহ কেহ* বলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ঐ আগমনের সময়নিরূপণ পর্যন্ত করিয়া বলিয়াছিলেন, "দুই শত বৎসর পরে ঐদিকে আসিতে হইবে, তখন অনেকে মুক্তিলাভ করিবে; যাহারা তখন মুক্তি-লাভ না করিবে, তাহাদিগকে উহার জন্য অনেক কাল অপেক্ষা করিতে হইবে!"

(৩) নিজ দেহরক্ষার কাল জানিতে পারা

তৃতীয়—যোগারূঢ় হইয়া ঠাকুর নিজ দেহরক্ষার কাল বহু পূর্বে জানিতে পারিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে একদিন ঐ বিষয়ে তিনি ভাবাবেশে এইরূপ বলিয়াছিলেন—

"যখন দেখিবে যাহার তাহার হাতে খাইব, কলিকাতায় রাত্রিযাপন করিব এবং খাদ্যের অগ্রভাগ অন্যকে পূর্বে খাওয়াইয়া পরে স্বয়ং অবশিষ্টাংশ গ্রহণ করিব, তখন জানিবে দেহরক্ষা করিবার কাল নিকটবর্তী হইয়াছে।"—ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথাগুলি বর্ণে বর্ণে সত্য হইয়াছিল।

আর একদিন ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীমাকে দক্ষিণেশ্বরে বলিয়াছিলেন, "শেষকালে আর কিছু খাইব না, কেবল পায়সান্ন খাইব"—উহা সত্য হইবার কথা আমরা ইতিপূর্বে বলিয়াছি।†

* মহাকবি শ্রীগিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতি

† গুরুভাব—পূর্বার্ধ, ২য় অধ্যায়

আধ্যাত্মিক বিষয় সম্বন্ধে ঠাকুরের দ্বিতীয় প্রকারের উপলব্ধিগুলি এখন আমরা লিপিবদ্ধ করিব—

প্রথম—সর্বমতের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, 'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত, তত পথ মাত্র'। যোগবুদ্ধি এবং সাধারণবুদ্ধি উভয় সহায়েই ঠাকুর যে ঐ কথা বুঝিয়াছিলেন, ইহা বলিতে পারা যায়। কারণ, সকল প্রকার ধর্মমতের সাধনায় অগ্রসর হইয়া তিনি উহাদিগের প্রত্যেকের যথার্থ ফল জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। যুগাবতার ঠাকুরের উহা প্রচারপূর্বক পৃথিবীর ধর্ম-বিরোধ ও ধর্মগ্লানি নিবারণের জন্যই যে বর্তমান কালে আগমন, একথা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কারণ, কোন ঈশ্বরাবতারই ইতিপূর্বে সাধনসহায়ে ঐ কথা নিজ জীবনে পূর্ণ উপলব্ধিপূর্বক জগৎকে ঐ বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করেন নাই। আধ্যাত্মিক মতের উদারতা লইয়া অবতারসকলের স্থাননির্দেশ করিতে হইলে, ঐ বিষয় প্রচারের জন্য ঠাকুরকে নিঃসন্দেহে সর্বোচ্চাসন প্রদান করিতে হয়।

(৪) সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত তত পথ

দ্বিতীয়—দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত প্রত্যেক মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্বতঃ আসিয়া উপস্থিত হয়—অতএব ঠাকুর বলিতেন, উহারা পরস্পরবিরোধী নহে, কিন্তু মানব-মনের আধ্যাত্মিক উন্নতি ও অবস্থাসাপেক্ষ। ঠাকুরের ঐ প্রকার প্রত্যক্ষ অনন্ত শাস্ত্র বুঝিবার পক্ষে যে কতদূর সহায়তা করিবে, তাহা অল্প চিন্তার ফলেই উপলব্ধি হইবে। বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রে পূর্বোক্ত তিন মতের কথা ঋষিগণ কর্তৃক লিপিবদ্ধ থাকায় কি অনন্ত গণ্ডগোল বাধিয়া শাস্ত্রোক্ত ধর্মমার্গকে জটিল করিয়া রাখিয়াছে, তাহা বলিবার নহে। প্রত্যেক

(৫) দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত মত মানবকে অবস্থাভেদে অবলম্বন করিতে হইবে

সম্প্রদায় ঋষিগণের ঐ তিন প্রকারের প্রত্যক্ষ এবং উক্তিসকলকে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া ভাষা মোচড়াইয়া উহাদিগকে একই ভাবাত্মক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। টীকাকারগণের ঐপ্রকার চেষ্টার ফলে ইহাই দাঁড়াইয়াছে যে, শাস্ত্রবিচার বলিলেই লোকের মনে একটা দারুণ ভীতির সঞ্চার হইয়া থাকে। ঐ ভীতি হইতেই শাস্ত্রে অবিশ্বাস এবং উহার ফলে ভারতের আধ্যাত্মিক অবনতি উপস্থিত হইয়াছে। যুগাবতার ঠাকুরের সেইজন্য ঐ তিন মতকে অবস্থাবিশেষে স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া উহাদিগের ঐরূপ অদ্ভুত সামঞ্জস্যের কথা প্রচারের প্রয়োজন হইয়াছিল। তাঁহার ঐ মীমাংসা সর্বদা স্মরণ রাখা আমাদিগের শাস্ত্রে প্রবেশাধিকার-লাভের একমাত্র পথ। ঐ বিষয়ক তাঁহার কয়েকটি উক্তি এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছি—

"অদ্বৈতভাব শেষ কথা জানবি, উহা বাক্যমনাতীত উপলব্ধির বিষয়।

"মন-বুদ্ধি-সহায়ে বিশিষ্টাদ্বৈত পর্যন্ত বলা ও বুঝা যায়; তখন নিত্য যেমন নিত্য, লীলাও তেমনি নিত্য—চিন্ময় নাম, চিন্ময় ধাম, চিন্ময় শ্যাম!

"বিষয়বুদ্ধিপ্রবল সাধারণ মানবের পক্ষে দ্বৈতভাব, নারদপঞ্চরাত্রের উপদেশ মত উচ্চ নাম-সঙ্কীর্তনাদি প্রশস্ত।"

(৩) কর্মযোগ-অবলম্বনে সাধারণ মানবের উন্নতি হইবে

কর্ম সম্বন্ধেও ঠাকুর ঐরূপে সীমানির্দেশ করিয়া বলিতেন—"সত্ত্বগুণী ব্যক্তির কর্ম স্বভাবতঃ ত্যাগ হইয়া যায়—চেষ্টা করিলেও সে আর কর্ম করিতে পারে না, অথবা ঈশ্বর তাহাকে উহা করিতে দেন না। যথা, গৃহস্থের বধূর গর্ভবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্মত্যাগ এবং পুত্র হইলে সর্বপ্রকার গৃহকর্মত্যাগ করিয়া উহাকে লইয়াই নাড়াচাড়া করিয়া অবস্থান। অন্য সকল মানবের পক্ষে কিন্তু ঈশ্বরে নির্ভর করিয়া সংসারে যত কিছু

কার্য বড়লোকের বাটীর দাসদাসীর ভাবে সম্পাদন করার চেষ্টা কর্তব্য। ঐরূপ করার নামই কর্মযোগ। যতটা সাধ্য ঈশ্বরের নাম, জপ ও ধ্যান করা এবং পূর্বোক্তরূপে সকল কর্ম সম্পাদন করা—ইহাই পথ।

তৃতীয়—ঠাকুরের উপলব্ধি হইয়াছিল, শ্রীশ্রীজগদম্বার হস্তের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া নিজ জীবনে প্রকাশিত উদার মতের বিশেষভাবে অধিকারী নব সম্প্রদায় তাঁহাকে প্রবর্তিত করিতে হইবে। ঐ বিষয়ে ঠাকুর প্রথমে যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা মথুরবাবু জীবিত থাকিবার কালে। তিনি তখন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, তাঁহার নিকট ধর্মলাভ করিতে অনেক ভক্ত আসিবে। পরে ঐ বিষয় যে সত্য হইয়াছিল, তাহা বলা বাহুল্য। কাশীপুরের বাগানে অবস্থানকালে ঠাকুর নিজ ছায়ামূর্তি (photograph) দেখিতে দেখিতে আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, "ইহা অতি উচ্চ যোগাবস্থার মূর্তি—কালে এই মূর্তির* ঘরে ঘরে পূজা হইবে।"

(৭) উদার মতে সম্প্রদায় প্রবর্তন করিতে হইবে

চতুর্থ—যোগদৃষ্টিসহায়ে জানিতে পারিয়া ঠাকুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, 'যাহাদের শেষ জন্ম, তাহারা তাঁহার নিকটে (ধর্মলাভ করিতে) আসিবে।' ঐ বিষয়ে আমাদিগের মতামত আমরা পাঠককে অন্যত্র † বলিয়াছি। সেজন্য উহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

(৮) যাহাদের শেষ জন্ম তাহারা তাঁহার মত গ্রহণ করিবে

ঠাকুরের সাধনকালে তিনটি বিশেষ সময়ে তিনজন বিশেষ শাস্ত্রজ্ঞ সাধক পণ্ডিত তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার আধ্যাত্মিক অবস্থা

* ঠাকুরের বসিয়া সমাধিস্থ থাকিবার মূর্তি।

† গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ৪র্থ অধ্যায়

স্বচক্ষে দর্শনপূর্বক তদ্বিষয়ে আলোচনা করিবার অবসর লাভ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত পদ্মলোচন, ঠাকুর তন্ত্রসাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিলেন—পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণ, ঠাকুর বৈষ্ণব তন্ত্রোক্ত সাধনকালে সিদ্ধিলাভের পরে তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলেন—এবং গৌরী পণ্ডিত, দিব্যসাধনশ্রীসম্পন্ন ঠাকুরকে সাধনকালের অবসানে দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন। পদ্মলোচন ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "আপনার ভিতরে আমি ঈশ্বরীয় আবির্ভাব ও শক্তি দেখিতেছি।" বৈষ্ণবচরণ সংস্কৃত ভাষায় স্তব রচনা করিয়া ভাবাবিষ্ট ঠাকুরের সম্মুখে তাঁহার অবতারত্ব কীর্তন করিয়াছিলেন। পণ্ডিত গৌরীকান্ত ঠাকুরকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "শাস্ত্রে যেসকল উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থার কথা পাঠ করিয়াছি, সে সকলি তোমাতে সাক্ষাৎ বর্তমান দেখিতেছি। তদ্ভিন্ন শাস্ত্রে যাহা লিপিবদ্ধ নাই, এরূপ উচ্চাবস্থাসকলের প্রকাশও তোমাতে বিদ্যমান দেখিতেছি—তোমার অবস্থা বেদবেদান্তাদি শাস্ত্রসকল অতিক্রম করিয়া বহুদূর অগ্রসর হইয়াছে, তুমি মানুষ নহ, অবতারসকলের যাঁহা হইতে উৎপত্তি হয়, সেই বস্তু তোমার ভিতরে রহিয়াছে!" ঠাকুরের অলৌকিক জীবন-কথা এবং পূর্বোক্ত অপূর্ব উপলব্ধিসকলের আলোচনা করিয়া বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, ঐ সকল সাধক পণ্ডিতাগ্রণীগণ তাঁহাকে বৃথা চাটুবাদ করিয়া পূর্বোক্ত কথাসকল বলিয়া যান নাই। ঐ সকল পণ্ডিতের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল নিম্নলিখিত ভাবে নিরূপিত হয়—

তিনজন বিশিষ্ট শাস্ত্রজ্ঞ সাধক ঠাকুরকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে দেখিয়া যে মত প্রকাশ করিয়াছেন

দক্ষিণেশ্বরে প্রথমবার অবস্থানকালে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী গৌরী পণ্ডিতকে তথায় দেখিয়াছিলেন। আবার, মথুরবাবু জীবিত থাকিবার

কালে গৌরী পণ্ডিত যে দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিয়াছিলেন, একথা আমরা ঠাকুরের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। অতএব বোধ হয়, শ্রীযুক্ত গৌরী সন ১২৭৭ সালের কোন সময়ে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক সন ১২৭৯ সাল পর্যন্ত ঠাকুরের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। শাস্ত্রজ্ঞান লাভ করিয়া নিজ জীবনে যাঁহারা ঐ জ্ঞান পরিণত করিতে চেষ্টা করিতেন, ঐরূপ সাধক পণ্ডিতদিগকে দেখিবার জন্য ঠাকুরের নিরন্তর আগ্রহ ছিল। ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণ পূর্বোক্ত শ্রেণীভুক্ত ছিলেন বলিয়াই ঠাকুরের তাঁহাকে দেখিতে অভিলাষ হয় এবং মথুরবাবুর দ্বারা নিমন্ত্রণ করাইয়া তিনি তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে আনয়ন করেন। পণ্ডিতজীর বাস ঠাকুরের জন্মভূমির নিকটে ইঁদেশ নামক গ্রামে ছিল। হৃদয়ের ভ্রাতা রামরতন মথুরবাবুর নিমন্ত্রণপত্র লইয়া যাইয়া শ্রীযুক্ত গৌরীকান্তকে দক্ষিণেশ্বরের শ্রীমন্দিরে আনয়ন করিয়াছিলেন। গৌরী পণ্ডিতের সাধনপ্রসূত অদ্ভুত শক্তির কথা এবং দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে দেখিয়া তাঁহার মনে ক্রমে প্রবল বৈরাগ্যের উদয় হইয়া তিনি যেভাবে সংসারত্যাগ করেন সে সকল কথা আমরা পাঠককে অন্যত্র* বলিয়াছি।

ঐ পণ্ডিতদিগের আগমনকাল নিরূপণ

'রাণী রাসমণির জীবনবৃত্তান্ত' শীর্ষক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত মথুরের অন্নমেরু-অনুষ্ঠানের কাল সন ১২৭০ সাল বলিয়া নিরূপিত আছে। পণ্ডিত পদ্মলোচনকে ঐকালে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া দানগ্রহণ করাইবার জন্য শ্রীযুক্ত মথুরের আগ্রহের কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। অতএব বেদান্তবিৎ ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত পদ্মলোচন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের ঠাকুরের নিকট আগমনকাল সন ১২৭০ সাল বলা যাইতে পারে।

* গুরুভাব—উত্তরার্ধ, ১ম অধ্যায়

শ্রীযুক্ত উৎসবানন্দ গোস্বামীর পুত্র পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের দক্ষিণেশ্বরে আগমনকাল সহজেই নিরূপিত হয়। কারণ, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীমতী যোগেশ্বরীর সহিত এবং পরে ভট্টাচার্য শ্রীযুক্ত গৌরীকান্ত তর্কভূষণের সহিত দক্ষিণেশ্বর-ঠাকুরবাটীতে তাঁহার ঠাকুরের অলৌকিকত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবার কথা আমরা ঠাকুরের নিকটে শুনিয়াছি। ব্রাহ্মণীর স্থায় তিনিও ঠাকুরের শরীরমনে বৈষ্ণবশাস্ত্রোক্ত মহাভাবের লক্ষণসমুদয় প্রকাশিত দেখিয়াছিলেন এবং স্তম্ভিত হৃদয়ে শ্রীযুক্তা ব্রাহ্মণীর সহিত একমত হইয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গদেব পুনরবতীর্ণ বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন। ঠাকুরের নিকটে পূর্বোক্ত কথাসকল শুনিয়া মনে হয়, শ্রীযুক্ত বৈষ্ণবচরণ সন ১২৭১ সালে ঠাকুরের মধুরভাব-সাধনে সিদ্ধ হইবার পরে তাঁহার নিকটে আসিয়া সন ১২৭৯ সাল পর্যন্ত দক্ষিণেশ্বরে মধ্যে মধ্যে যাতায়াত করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের নিজ সাঙ্গোপাঙ্গসকলকে দেখিতে বাসনা ও আহ্বান

পূর্বোক্ত উপলব্ধিসকল করিবার পরে ঈশ্বরপ্রেরিত হইয়া ঠাকুরের মনে এক অভিনব বাসনা প্রবলভাবে উদিত হইয়াছিল। যোগারূঢ় হইয়া পূর্বপরিদৃষ্ট ভক্তসকলকে দেখিবার জন্য এবং তাহাদিগের অন্তরে নিজ ধর্মশক্তি সঞ্চার করিবার জন্য তিনি বিশেষ ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, সেই ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। দিবাভাগে সর্বকাল ঐ ব্যাকুলতা হৃদয়ে কোনরূপে ধারণ করিয়া থাকিতাম। বিষয়ী লোকের মিথ্যা বিষয়প্রসঙ্গ শুনিয়া যখন বিষবৎ বোধ হইত তখন ভাবিতাম, তাহারা সকলে আসিলে ঈশ্বরীয় কথা কহিয়া প্রাণ শীতল করিব, শ্রবণ জুড়াইব, নিজ আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল তাহাদিগকে বলিয়া অন্তরের বোঝা লঘু করিব। ঐরূপে প্রত্যেক বিষয়ে তাহাদিগের

আগমনের কথার উদ্দীপনা হইয়া তাহাদিগের বিষয়ই নিরন্তর চিন্তা করিতাম—কাহাকে কি বলিব, কাহাকে কি দিব, ঐ সকল কথা ভাবিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকিতাম। কিন্তু দিবাবসানে যখন সন্ধ্যার সমাগম হইত, তখন ধৈর্যের বাঁধ দিয়া ঐ ব্যাকুলতাকে আর রাখিতে পারিতাম না, মনে হইত আবার একটা দিন চলিয়া গেল, তাহাদিগের কেহই আসিল না। যখন দেবালয় আরাত্রিকের শঙ্খ ঘণ্টারোলে মুখরিত হইয়া উঠিত তখন বাবুদিগের কুঠির উপরের ছাদে যাইয়া হৃদয়ের যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে 'তোরা সব কে কোথায় আছিস্, আয় রে—তোদের না দেখে আর থাকতে পারচি না' বলিয়া চীৎকারে গগন পূর্ণ করিতাম! মাতা তাহার বালককে দেখিবার জন্য ঐরূপ ব্যাকুলতা অনুভব করে কি না সন্দেহ; সখা সখার সহিত এবং প্রণয়ি-যুগল পরস্পরের সহিত মিলনের জন্য কখনও ঐরূপ করে বলিয়া শুনি নাই—এত ব্যাকুলতায় প্রাণ চঞ্চল হইয়াছিল। ঐরূপ হইবার কয়েক দিন পরেই ভক্তসকলে একে একে উপস্থিত হইতে লাগিল।"

ঐরূপে ঠাকুরের ব্যাকুল আহ্বানে ভক্তসকলের দক্ষিণেশ্বরে আগমনের পূর্বে কয়েকটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। বর্তমান গ্রন্থের সহিত ঐ সকলের মুখ্যভাবে সম্বন্ধ না থাকায় আমরা উহাদিগকে পরিশিষ্টমধ্যে লিপিবদ্ধ করিলাম।

পরিশিষ্ট

পরিশিষ্ট

৺ষোড়শী-পূজার পর হইতে পূর্বপরিদৃষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্তসকলের আগমনকালের পূর্ব পর্যন্ত ঠাকুরের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনাবলী

আমরা পাঠককে বলিয়াছি, ৺ষোড়শী-পূজার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী সন ১২৮০ সালের কার্তিক মাসে কামারপুকুরে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমার ঐ স্থানে পৌঁছিবার স্বল্পকাল পরেই ঠাকুরের মধ্যমাগ্রজ শ্রীযুক্ত রামেশ্বর ভট্টাচার্য জ্বরাতিসাররোগে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঠাকুরের পিতার বংশের প্রত্যেক স্ত্রী-পুরুষের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার বিশেষ প্রকাশ ছিল। শ্রীযুক্ত রামেশ্বরের সম্বন্ধে ঐ বিষয়ে যাহা শ্রবণ করিয়াছি, তাহা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

রামেশ্বরের মৃত্যু

রামেশ্বর বড় উদারপ্রকৃতির লোক ছিলেন। সন্ন্যাসী-ফকিরেরা দ্বারে আসিয়া যে যাহা চাহিত, গৃহে থাকিলে তিনি তাহাদিগকে উহা তৎক্ষণাৎ প্রদান করিতেন। তাঁহার আত্মীয়বর্গের নিকটে শুনিয়াছি, ঐরূপে কোন ফকির আসিয়া বলিত রন্ধনের জন্য আমার একটি বোক্‌নোর অভাব, কেহ বলিত আমার লোটা বা জলপাত্রের অভাব, কেহ বলিত আমার কম্বলের অভাব—রামেশ্বরও ঐ সকল তৎক্ষণাৎ গৃহ হইতে বাহির করিয়া তাহাদিগকে দিতেন। বাটীর যদি কেহ উহাতে আপত্তি করিত, তাহা হইলে রামেশ্বর তাহাকে শান্তভাবে বলিতেন—লইয়া যাউক, কিছু বলিও না, ঐরূপ দ্রব্য আবার কত আসিবে, ভাবনা কি? জ্যোতিষশাস্ত্রে রামেশ্বরের সামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল।

রামেশ্বরের উদার প্রকৃতি

দক্ষিণেশ্বর হইতে রামেশ্বরের শেষবার বাটী ফিরিয়া আসিবার কালে আর যে তাঁহাকে তথা হইতে ফিরিতে হইবে না, একথা ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন—'বাটী যাচ্ছ, যাও, কিন্তু স্ত্রীর নিকটে শয়ন করিও না ; তাহা হইলে তোমার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়।' ঐ কথা ঠাকুরের মুখে আমাদিগের কেহ কেহ* শ্রবণ করিয়াছেন।

রামেশ্বরের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঠাকুরের পূর্ব হইতে জানিতে পারা ও তাঁহাকে সতর্ক করা

রামেশ্বর বাটীতে পৌছিবার কিছুকাল পরে সংবাদ আসিল, তিনি পীড়িত। ঠাকুর ঐ কথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন—"সে নিষেধ মানে নাই, তাহার প্রাণরক্ষা হওয়া সংশয়!" ঐ ঘটনার পাঁচসাত দিন পরেই সংবাদ আসিল, শ্রীযুক্ত রামেশ্বর পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু-সংবাদে ঠাকুর তাঁহার বৃদ্ধা জননীর প্রাণে বিষমাঘাত লাগিবে বলিয়া বিশেষ চিন্তান্বিত হইয়াছিলেন এবং মন্দিরে গমনপূর্বক জননীকে শোকের হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকটে কাতর প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ঐরূপ করিবার পরে তিনি জননীকে সান্ত্বনাপ্রদানের জন্য মন্দির হইতে নহবতে আগমন করিলেন এবং সজলনয়নে তাঁহাকে ঐ দুঃসংবাদ নিবেদন করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "ভাবিয়াছিলাম, মা ঐ কথা শুনিয়া একেবারে হতজ্ঞান হইবেন এবং তাঁহার প্রাণরক্ষা-সংশয় হইবে, কিন্তু ফলে দেখিলাম তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। মা ঐ কথা শুনিয়া অল্প-স্বল্প দুঃখ প্রকাশপূর্বক 'সংসার অনিত্য, সকলেরই একদিন

রামেশ্বরের মৃত্যু সংবাদে জননীর শোকে প্রাণসংশয় হইবে ভাবিয়া ঠাকুরের প্রার্থনা ও তৎফল

* শ্রীমৎ প্রেমানন্দ স্বামী

মৃত্যু নিশ্চিত, অতএব শোক করা বৃথা'—ইত্যাদি বলিয়া আমাকেই শান্ত করিতে লাগিলেন। দেখিলাম, তানপুরার কান টিপিয়া সুর যেমন চড়াইয়া দেয়, শ্রীশ্রীজগদম্বা যেন ঐরূপে মার মনকে উচ্চ গ্রামে চড়াইয়া রাখিয়াছেন, পার্থিব শোকদুঃখ ঐজন্য তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারিতেছে না। ঐরূপ দেখিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে বার বার প্রণাম করিলাম এবং নিশ্চিন্ত হইলাম।"

রামেশ্বর পাঁচ-সাত দিন পূর্বে নিজ মৃত্যুকাল জানিতে পারিয়াছিলেন এবং আত্মীয়গণকে ঐ কথা বলিয়া নিজ সংকার ও শ্রাদ্ধের জন্য সকল আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। বাটীর সম্মুখে একটি আমগাছ কোন কারণে কাটা হইতেছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন—"ভাল হইল, আমার কার্যে লাগিবে।" মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূত নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, পরে সংজ্ঞা হারাইয়া অল্পক্ষণ থাকিয়া তাঁহার প্রাণবায়ু দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিল। মৃত্যুর পূর্বে রামেশ্বর আত্মীয়বর্গকে অনুরোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার দেহটাকে শ্মশানমধ্যে অগ্নিসাৎ না করিয়া, উহার পার্শ্বের রাস্তার উপরে যেন অগ্নিসাৎ করা হয়। কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়াছিলেন, কত সাধুলোকে ঐ রাস্তার উপর দিয়া চলিবেন, তাঁহাদের পদরজে আমার সদ্গতি হইবে। রামেশ্বরের মৃত্যু গভীর রাত্রিতে হইয়াছিল।

মৃত্যু উপস্থিত জানিয়া রামেশ্বরের আচরণ

পল্লীর গোপাল নামক এক ব্যক্তির সহিত রামেশ্বরের বহুকালাবধি বিশেষ সৌহৃদ্য ছিল। গোপাল বলিতেন, তাঁহার মৃত্যু যে দিন যে সময়ে হইয়াছিল, সেই দিন সেই সময়ে তিনি তাঁহার বাটীর দ্বারে কাহাকেও শব্দ করিতে শুনিয়া জিজ্ঞাসা করায় উত্তর পাইয়াছিলেন,

'আমি রামেশ্বর, গঙ্গাস্নান করিতে যাইতেছি, বাটীতে ৺রঘুবীর রহিলেন, তাঁহার সেবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে যাহাতে গোল না হয়, তদ্বিষয়ে তুমি নজর রাখিও!' গোপাল বন্ধুর আহ্বানে দ্বার খুলিতে যাইয়া পুনরায় শুনিলেন, 'আমার শরীর নাই, অতএব দ্বার খুলিলেও তুমি আমাকে দেখিতে পাইবে না।' গোপাল তথাপি দ্বার খুলিয়া যখন কাহাকেও কোথাও দেখিতে পাইলেন না, তখন সংবাদ সত্য কি মিথ্যা জানিবার জন্য রামেশ্বরের বাটীতে উপস্থিত হইলেন এবং দেখিলেন, সত্য সত্যই রামেশ্বরের দেহত্যাগ হইয়াছে।

মৃত্যুর পরে রামেশ্বরের নিজ বন্ধু গোপালের সহিত কথোপকথন

রামেশ্বরের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীযুক্ত রামলাল চট্টোপাধ্যায় বলেন, তাঁহার পিতার মৃত্যু সন ১২৮০ সালের অগ্রহায়ণের ২৭শে তারিখে হইয়াছিল এবং তখন তাঁহার বয়স আন্দাজ ৪৮ বৎসর ছিল। পিতার অস্থি সঞ্চয়পূর্বক কলিকাতার নিকটবর্তী বৈদ্যবাটী নামক স্থানে আসিয়া তিনি উহা গঙ্গায় বিসর্জন করিয়াছিলেন। পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকটে আসিবার জন্য ঐস্থলে নৌকায় করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন। পার হইবার কালে বারাকপুরের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতে পাইয়াছিলেন, মথুরবাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী তথায় যে মন্দিরে অন্নপূর্ণা দেবীকে পরে প্রতিষ্ঠিতা করেন, তাহার অর্ধেক ভাগ মাত্র তখন গাঁথা হইয়াছে। অনন্তর ১২৮১ সালের ৩০শে চৈত্র, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১২ই এপ্রিল তারিখে ঐ মন্দিরে ৺দেবীপ্রতিষ্ঠা নিষ্পন্ন হইয়াছিল। রামেশ্বরের মৃত্যুর পরে তৎপুত্র রামলাল দক্ষিণেশ্বরে পূজকের পদ স্বীকার করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও পূজকের পদগ্রহণ—চানকের অন্নপূর্ণার মন্দির

পরিশিষ্ট

মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে কলিকাতার সিঁদুরিয়াপটি-পল্লী-নিবাসী শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিক মহাশয় ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে বিশেষরূপ ভক্তি-শ্রদ্ধা করিতে আরম্ভ করেন।* শম্ভুবাবু ইতিপূর্বে ব্রাহ্মসমাজ-প্রবর্তিত ধর্মমতে বিশেষ অনুরাগসম্পন্ন ছিলেন এবং তাঁহার অজস্র দানের জন্য কলিকাতাবাসী সকলের পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রতি শম্ভুবাবুর ভক্তি ও ভালবাসা দিন দিন অতি গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল এবং কয়েক বৎসর কাল তিনি তাঁহার সেবা করিয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের এবং শ্রীমতী মাতাঠাকুরানীর যখন যাহা কিছুর অভাব হইত, জানিতে পারিলে শম্ভুবাবু তৎসমস্ত পরম আনন্দে পূরণ করিতেন। শ্রীযুক্ত শম্ভু ঠাকুরকে 'গুরুজী' বলিয়া সম্বোধন করিতেন। ঠাকুর তাহাতে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেন, "কে কার গুরু? তুমি আমার গুরু!" শম্ভু কিন্তু তাহাতে নিরস্ত না হইয়া চিরকাল তাঁহাকে ঐরূপে সম্বোধন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের দিব্য সঙ্গ-গুণে শম্ভুবাবু যে আধ্যাত্মিক পথে বিশেষ আলোক দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং উহার প্রভাবে তাঁহার ধর্মবিশ্বাসসকল যে পূর্ণতা ও সফলতা লাভ

ঠাকুরের দ্বিতীয় রসদদার শ্রীযুক্ত শম্ভুচরণ মল্লিকের কথা

* ঠাকুরের ভক্তসকলের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, তাঁহারা ঠাকুরকে বলিতে শুনিয়াছেন যে, মথুরবাবুর মৃত্যুর পরে পানিহাটিনিবাসী শ্রীযুক্ত মণিমোহন সেন তাঁহার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইবার ভার লইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মণিমোহন তখন ঠাকুরের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সর্বদাই তাঁহার নিকটে গমনাগমন করিতেন। তাঁহার পরে শম্ভুবাবু ঐ সেবাভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। আমাদিগের মনে হয়, শম্ভুবাবুকে ঠাকুর স্বয়ং তাঁহার দ্বিতীয় রসদদার বলিয়া যখন নির্দেশ করিয়াছেন, তখন মণিবাবু ঠাকুরের সেবাভার গ্রহণ করিলেও, অধিক কাল উহা সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

করিয়াছিল, তাহা তাঁহার ঠাকুরকে ঐরূপ সম্বোধনে হৃদয়ঙ্গম হয়। শম্ভুবাবুর পত্নীও ঠাকুরকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে ভক্তি করিতেন এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে তাঁহাকে প্রতি জয়মঙ্গলবারে নিজালয়ে লইয়া যাইয়া ষোড়শোপচারে তাঁহার শ্রীচরণপূজা করিতেন।

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আগমন বোধ হয় সন ১২৮১ সালের বৈশাখ মাসে হইয়াছিল। পূর্বের ন্যায় তখন তিনি নহবতের ঘরে ঠাকুরের জননীর সহিত বাস করিতে থাকেন। শম্ভুবাবু ঐ কথা জানিতে পারিয়া সঙ্কীর্ণ নহবত ঘরে তাঁহার থাকিবার কষ্ট হইতেছে অনুমান করিয়া, দক্ষিণেশ্বর-মন্দিরের সন্নিকটে কিছু জমি ২৫০৲ টাকা প্রদানপূর্বক মৌরুসী করিয়া লন এবং তদুপরি একখানি সুপরিসর চালাঘর বাঁধিয়া দিবার সঙ্কল্প করেন। তখন কাপ্তেন-উপাধিপ্রাপ্ত নেপাল-রাজসরকারের কর্মচারী শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ উপাধ্যায় মহাশয় ঠাকুরের নিকট গমনাগমন করিতেছেন এবং তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছেন। কাপ্তেন বিশ্বনাথ উক্ত ঘর করিবার সঙ্কল্প শুনিয়া, উহার নিমিত্ত যত কাঠ লাগিবে দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। নেপাল-রাজসরকারের শালকাঠের কারবারের ভার তখন তাঁহার হস্তে ন্যস্ত থাকায়, উহা দেওয়া তাঁহার পক্ষে বিশেষ ব্যয়সাধ্য ছিল না। গৃহনির্মাণ আরম্ভ হইলে শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ গঙ্গার অপর পারে বেলুড় গ্রামস্থ তাঁহার কাঠের গদি হইতে তিনখানি শালের চকোর পাঠাইয়া দিলেন। কিন্তু রাত্রে গঙ্গায় বিশেষ প্রবলভাবে জোয়ার আসায় উহার একখানি ভাসিয়া গেল। হৃদয় উহাতে অসন্তুষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীমাকে 'ভাগ্যহীনা' বলিয়া নির্দেশ করিয়া-

শ্রীশ্রীমার জন্য শম্ভুবাবুর ঘর করিয়া দেওয়া, কাপ্তেনের ঐ বিষয়ে সাহায্য, ঐ গৃহে ঠাকুরের একরাত্রি বাস

ছিলেন। সে যাহা হউক, কাঠ ভাসিয়া যাইবার কথা শুনিয়া কাপ্তেন আর একখানি কাঠ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন এবং গৃহনির্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছিল। অতঃপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী উক্ত গৃহে প্রায় বৎসরকাল বাস করিয়াছিলেন। গৃহকর্মে সাহায্য করিবে এবং সর্বদা শ্রীশ্রীমার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া একটি রমণীকে তখন নিযুক্তা করা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীমা এই গৃহে রন্ধন করিয়া ঠাকুরের জন্য নানাবিধ খাদ্য প্রত্যহ দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে লইয়া যাইতেন এবং তাঁহার ভোজনান্তে পুনরায় এখানে ফিরিয়া আসিতেন। তাঁহার সন্তোষ ও তত্ত্বাবধানের জন্য ঠাকুরও দিবাভাগে কখন কখন ঐ গৃহে আগমন করিতেন এবং কিছুকাল তাঁহার নিকটে থাকিয়া পুনরায় মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। একদিন কেবল ঐ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়াছিল। সেদিন অপরাহ্ণে ঠাকুর শ্রীশ্রীমার নিকটে আগমন-মাত্র গভীর রাত্রি পর্যন্ত এমন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হয় যে, মন্দিরে ফিরিয়া আসা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছিল। ঐরূপে সে রাত্রি তিনি তথায় বাস করিতে বাধ্য হন এবং শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে ঝোল-ভাত রাঁধিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন।

ঐ গৃহে বাসকালে শ্রীশ্রীমার কঠিন পীড়া ও জয়রামবাটীতে গমন

এক বৎসর ঐ গৃহে বাস করিবার পরে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী আমাশয়-রোগে কঠিনভাবে আক্রান্তা হইলেন। শম্ভুবাবু তাঁহাকে আরোগ্য করিবার জন্য বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহার নিয়োগে প্রসাদ ডাক্তার এই সময়ে শ্রীশ্রীমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। একটু আরোগ্য হইলে শ্রীশ্রীমা পিত্রালয় জয়রামবাটী গ্রামে গমন করিলেন। সম্ভবতঃ সন ১২৮২ সালের আশ্বিন মাসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু তথায় যাইবার অল্পকাল পরে পুনরায় তিনি ঐ রোগে শয্যাশায়িনী

হইলেন। ক্রমে উহার এত বৃদ্ধি হইল যে, তাঁহার শরীররক্ষা সংশয়ের বিষয় হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর পূজ্যপাদ পিতা শ্রীরামচন্দ্র তখন মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন; স্মৃতরাং তাঁহার জননী এবং ভ্রাতৃবর্গই তাঁহার যথাসাধ্য সেবা করিতে লাগিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুর ঐ সময়ে তাঁহার নিদারুণ পীড়ার কথা শুনিয়া হৃদয়কে বলিয়াছিলেন, "তাই ত রে হৃদে, ও (শ্রীশ্রীমা) কেবল আসবে আর যাবে, মনুষ্যজন্মের কিছুই করা হবে না!"

৺সিংহবাহিনীর নিকট হত্যাদান ও ঔষধপ্রাপ্তি

রোগের যখন কিছুতেই উপশম হইল না, তখন শ্রীশ্রীমার প্রাণে ৺দেবীর নিকট হত্যা-প্রদানের কথা উদিত হইল এবং জননী ও ভ্রাতৃগণ জানিতে পারিলে ঐ বিষয়ে বাধা প্রদান করিতে পারেন ভাবিয়া তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া গ্রাম্যদেবী ৺সিংহবাহিনীর মাড়ে (মন্দিরে) যাইয়া ঐ উদ্দেশ্যে প্রায়োপবেশন করিয়া পড়িয়া রহিলেন। কয়েক ঘণ্টাকাল ঐরূপে থাকিবার পরেই ৺দেবী প্রসন্না হইয়া তাঁহাকে আরোগ্যের জন্য ঔষধ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন।

৺দেবীর আদেশে উক্ত ঔষধ-সেবনমাত্রেই তাঁহার রোগের শান্তি হইল এবং ক্রমে তাঁহার শরীর পূর্বের ন্যায় সবল হইয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমার হত্যা-প্রদানপূর্বক ঔষধপ্রাপ্তির কাল হইতে ঐ দেবী বিশেষ জাগ্রতা বলিয়া চতুষ্পার্শ্বের গ্রামসমূহে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন।

প্রায় চারি বৎসরকাল ঠাকুর ও শ্রীশ্রীমার ঐরূপে সেবা করিবার পরে শম্ভুবাবু রোগে শয্যাশায়ী হইলেন। পীড়িতাবস্থায় ঠাকুর তাঁহাকে একদিন দেখিতে গিয়াছিলেন এবং ফিরিয়া আসিয়া বলিয়াছিলেন, "শম্ভুর প্রদীপে তৈল নাই!" ঠাকুরের কথাই সত্য হইল—বহুমূত্ররোগে

বিকার উপস্থিত হইয়া শ্রীযুক্ত শম্ভু শরীররক্ষা করিলেন। শম্ভুবাবু পরম উদার ও তেজস্বী ঈশ্বরভক্ত ছিলেন। পীড়িতাবস্থাতে তাঁহার মনের প্রসন্নতা একদিনের জন্যও নষ্ট হয় নাই। মৃত্যুর কয়েক দিন পূর্বে তিনি হৃদয়কে হৃষ্টচিত্তে বলিয়াছিলেন, "মরণের নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র চিন্তা নাই, আমি পুঁটলি-পাঁটলা বেঁধে প্রস্তুত হয়ে বসে আছি!" শম্ভুবাবুর সহিত পরিচয় হইবার বহুপূর্বে ঠাকুর যোগারূঢ় অবস্থায় দেখিয়াছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বা শম্ভুকেই তাঁহার দ্বিতীয় রসদদাররূপে মনোনীত করিয়াছেন এবং দেখিবামাত্র তাঁহাকে সেই ব্যক্তি বলিয়া চিনিয়া লইয়াছিলেন।

মৃত্যুকালে শম্ভুবাবুর নির্ভীক আচরণ

পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী পিত্রালয়ে যাইবার কয়েক মাস পরে ঠাকুরের জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮২ সালে ৮৫ বৎসর বয়ঃক্রমকালে চন্দ্রাদেবী প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। শুনা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জন্মতিথিদিবসে ঐ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। উহার কিছুকাল পূর্ব হইতে জরার আক্রমণে তাঁহার ইন্দ্রিয় ও মনের শক্তিসমূহ অনেকাংশে লুপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুসংবাদ আমরা হৃদয়ের নিকটে যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপ লিপিবদ্ধ করিতেছি—

ঠাকুরের জননী চন্দ্রমণি দেবীর শেষাবস্থা ও মৃত্যু

ঐ ঘটনা উপস্থিত হইবার চারিদিন পূর্বে হৃদয় কিছুদিনের জন্য অবসর লইয়া বাটী যাইতেছিল। যাত্রা করিবার পূর্বে একটি অনির্দেশ্য আশঙ্কায় তাহার প্রাণ চঞ্চল হইয়া উঠিল এবং ঠাকুরকে ছাড়িয়া তাহার কিছুতেই যাইতে ইচ্ছা হইল না। ঠাকুরকে উহা নিবেদন করায় তিনি বলিলেন, তবে যাইয়া কাজ নাই। উহার পরে তিন দিন নির্বিঘ্নে কাটিয়া গেল।

ঠাকুর প্রত্যহ তাঁহার জননীর নিকট কিছুকালের জন্য যাইয়া তাঁহার সেবা স্বহস্তে যথাসাধ্য সম্পাদন করিতেন। হৃদয়ও ঐরূপ করিতেন এবং 'কালীর মা' নাম্নী চাকরানী দিবাভাগে প্রায় সর্বদা বৃদ্ধার নিকটে থাকিত। হৃদয়কে বৃদ্ধা ইদানীং দেখিতে পারিতেন না। অক্ষয়ের মৃত্যুর সময় হইতে বৃদ্ধার মনে কেমন একটা ধারণা হইয়াছিল যে, হৃদয়ই অক্ষয়কে মারিয়া ফেলিয়াছে এবং ঠাকুরকে ও তাঁহার পত্নীকে মারিয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতেছে। সেজন্য বৃদ্ধা ঠাকুরকে কখন কখন সতর্ক করিয়া দিতেন, বলিতেন—"হৃদুর কথা কখন শুনিবি না!" জরাজীর্ণ হইয়া বুদ্ধিভ্রংশের পরিচয় অন্য নানা বিষয়েও পাওয়া যাইত। যথা— দক্ষিণেশ্বর বাগানের সন্নিকটেই আলমবাজারের পাটের কল। মধ্যাহ্নে ঐ কলের কর্মচারীদিগকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দেওয়া হয় এবং অর্দ্ধঘণ্টা কাল বাদে বাঁশী বাজাইয়া পুনরায় কাজে লাগাইয়া দেওয়া হয়। কলের বাঁশীর আওয়াজকে বৃদ্ধা ৺বৈকুণ্ঠের শঙ্খধ্বনি বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন এবং যতক্ষণ না ঐ ধ্বনি শুনিতে পাইতেন, ততক্ষণ আহারে বসিতেন না। ঐ বিষয়ে অনুরোধ করিলে বলিতেন—"এখন কি পাব গো, এখনও শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের ভোগ হয় নাই, বৈকুণ্ঠে শঙ্খ বাজে নাই, এখন কি খাইতে আছে?" কলের যেদিন ছুটি থাকিত, সেদিন বাঁশী বাজিত না, বৃদ্ধাকে আহারে বসান সেদিন বিষম মুশকিল হইত; হৃদয় এবং ঠাকুরকে ঐদিন নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া বৃদ্ধাকে আহার করাইতে হইত।

সে যাহা হউক চতুর্থ দিবস সমাগত হইল, বৃদ্ধার অসুস্থতার কোন চিহ্ন দেখা গেল না। সন্ধ্যার পরে ঠাকুর তাঁহার নিকট গমনপূর্বক তাঁহার পূর্বজীবনের নানা কথার উত্থাপন ও গল্প করিয়া বৃদ্ধার মন

আনন্দে পূর্ণ করিলেন। রাত্রি দুই প্রহরের সময় ঠাকুর তাঁহাকে শয়ন করাইয়া নিজ গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন প্রভাত হইয়া ক্রমে আটটা বাজিয়া গেল। বৃদ্ধা তথাপ ঘরের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া বাহিরে আসিলেন না। 'কালীর মা' নহবতের উপরের ঘরের দ্বারে যাইয়া অনেক ডাকাডাকি করিল, কিন্তু বৃদ্ধার সাড়া পাইল না। দ্বারে কান পাতিয়া শুনিতে পাইল, তাঁহার গলা হইতে কেমন একটা বিকৃত রব উত্থিত হইতেছে! তখন ভীত হইয়া সে ঠাকুর ও হৃদয়কে ঐ বিষয় নিবেদন করিল। হৃদয় যাইয়া কৌশলে বাহির হইতে দ্বারের অর্গল খুলিয়া দেখিল, বৃদ্ধা সংজ্ঞারহিত হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। তখন কবিরাজী ঔষধ আনিয়া হৃদয় তাঁহার জিহ্বায় লাগাইয়া দিতে লাগিল এবং মধ্যে মধ্যে বিন্দু বিন্দু করিয়া দুগ্ধ ও গঙ্গাজল তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। তিন দিন ঐভাবে থাকিবার পরে বৃদ্ধার অন্তিমকাল উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাকে অন্তর্জলি করা হইল এবং ঠাকুর ফুল, চন্দন ও তুলসী লইয়া তাঁহার পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। পরে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে করিতে নাই বলিয়া ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল তাঁহার নিয়োগে বৃদ্ধার দেহের সৎকার করিলেন। অনন্তর অশৌচ উত্তীর্ণ হইলে, ঠাকুরের নির্দ্দেশে রামলালই বৃষোৎসর্গ করিয়া ঠাকুরের জননীর শ্রাদ্ধক্রিয়া যথারীতি সম্পাদন করিয়াছিলেন।

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুর শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে সন্ন্যাসগ্রহণের মর্যাদা রক্ষা করিয়া অশৌচগ্রহণাদি কোন কার্য করেন নাই। জননীর পুত্রোচিত কোন কার্য করিলাম না ভাবিয়া একদিন তিনি তর্পণ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু অঞ্জলি ভরিয়া জল তুলিবামাত্র ভাবাবেশ উপস্থিত হইয়া তাঁহার অঙ্গুলিসকল অসাড় ও অসংলগ্ন হইয়া সমস্ত জল

হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছিল। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তখন তিনি ঐ বিষয়ে কৃতকার্য হন নাই এবং দুঃখিত অন্তরে ক্রন্দন করিয়া পরলোকগতা জননীকে নিজ অসামর্থ্য নিবেদন করিয়াছিলেন। পরে এক পণ্ডিতের মুখে শুনিয়াছিলেন, গলিত-কর্ম অবস্থা হইলে, অথবা আধ্যাত্মিক উন্নতিতে স্বভাবতঃ কর্ম এককালে উঠিয়া যাইলে ঐরূপ হইয়া থাকে ; শাস্ত্রবিহিত কর্মানুষ্ঠান না করিতে পারিলেও, তখন ঐরূপ ব্যক্তিকে দোষ স্পর্শে না।

মাতৃবিয়োগ হইলে ঠাকুরের তর্পণ করিতে যাইয়া তৎকরণে অপারগ হওয়া—তাঁহার গলিত-কর্মাবস্থা

ঠাকুরের মাতৃবিয়োগের একবৎসর পূর্বে শ্রীশ্রীজগদম্বার ইচ্ছায় তাঁহার জীবনে একটি বিশেষ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল। সন ১২৮১ সালের চৈত্র মাসের মধ্যভাগে, ইংরাজী ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে ঠাকুরের প্রাণে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের নেতা শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়কে দেখিবার বাসনা উদিত হইয়াছিল। যোগারূঢ় ঠাকুর উহাতে শ্রীশ্রীমাতার ইঙ্গিত দেখিয়াছিলেন এবং শ্রীযুক্ত কেশব তখন কলিকাতার কয়েক মাইল উত্তরে বেলঘরিয়া নামক স্থানে শ্রীযুক্ত জয়গোপাল সেন মহাশয়ের উদ্যানবাটিকায় সশিষ্যে সাধনভজনে নিযুক্ত আছেন জানিতে পারিয়া হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া ঐ উদ্যানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। হৃদয়ের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহারা কাপ্তেন বিশ্বনাথ উপাধ্যায়ের গাড়ীতে করিয়া গমন করিয়াছিলেন এবং অপরাহ্ণে আন্দাজ এক ঘটিকার সময় ঐ স্থানে পৌঁছিয়াছিলেন। ঠাকুরের পরিধানে সেদিন একখানি লালপেড়ে কাপড় মাত্র ছিল এবং উহার কোঁচার খুঁটটি তাঁহার বাম স্কন্ধোপরি লম্বিত হইয়া পৃষ্ঠদেশে ঝুলিতেছিল।

ঠাকুরের কেশববাবুকে দেখিতে গমন

গাড়ী হইতে নামিয়া হৃদয় দেখিলেন, শ্রীযুক্ত কেশব অনুচরবর্গের সহিত উদ্যানমধ্যস্থ পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে বসিয়া আছেন। অগ্রসর হইয়া তিনি তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, "আমার মাতুল হরিকথা ও হরিগুণগান শুনিতে বড় ভালবাসেন এবং উহা শ্রবণ করিতে করিতে মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে; আপনার নাম শুনিয়া আপনার মুখে ঈশ্বরগুণানুকীর্তন শুনিতে তিনি এখানে আগমন করিয়াছেন, আদেশ পাইলে তাঁহাকে এখানে লইয়া আসিব।" শ্রীযুক্ত কেশব সম্মতিপ্রকাশ করিলে হৃদয় গাড়ী হইতে ঠাকুরকে নামাইয়া সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কেশব প্রভৃতি সকলে ঠাকুরকে দেখিবার জন্য এতক্ষণ উদ্গ্রীব হইয়াছিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া এখন স্থির করিলেন, ইনি সামান্য ব্যক্তি মাত্র।

বেলঘরিয়া উদ্যানে কেশব

ঠাকুর কেশবের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "বাবু, তোমরা নাকি ঈশ্বরকে দর্শন করিয়া থাক। ঐ দর্শন কিরূপ, তাহা জানিতে বাসনা, সেজন্য তোমাদিগের নিকটে আসিয়াছি।" ঐরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরব্ধ হইল। ঠাকুরের পূর্বোক্ত কথার উত্তরে শ্রীযুক্ত কেশব কি বলিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর যে "কে জানে কালী কেমন—ষড়্দর্শনে না পায় দরশন"-রূপ রামপ্রসাদী সঙ্গীতটি গাহিতে গাহিতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, একথা আমরা হৃদয়ের নিকট শ্রবণ করিয়াছি। ঠাকুরের ভাবাবস্থা দেখিয়া তখন কেশব প্রভৃতি সকলে উহাকে আধ্যাত্মিক উচ্চাবস্থা বলিয়া মনে করেন নাই; ভাবিয়াছিলেন উহা মিথ্যা ভান বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত। সে যাহা হউক, ঠাকুরের বাহ্যচৈতন্য আনয়নের জন্য হৃদয় তাঁহার কর্ণে এখন প্রণব শুনাইতে লাগিলেন এবং উহা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মুখমণ্ডল মধুর হাস্যে উজ্জ্বল

হইয়া উঠিল। ঐরূপে অর্ধবাহ্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া ঠাকুর এখন গভীর আধ্যাত্মিক বিষয়সকল সামান্য সামান্য দৃষ্টান্তসহায়ে এমন সরল ভাষায় বুঝাইতে লাগিলেন যে, সকলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার মুখপানে চাহিয়া বসিয়া রহিলেন।

কেশবের সহিত প্রথমালাপ

স্নানাহারের সময় অতীত হইয়া ক্রমে পুনরায় উপাসনার সময় উপস্থিত হইতে বসিয়াছে, সে কথা কাহারও মনে হইল না। ঠাকুর তাঁহাদিগের ঐ প্রকার ভাব দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "গরুর পালে অন্য কোন পশু আসিলে তাহারা তাহাকে গুঁতাইতে যায়, কিন্তু গরু আসিলে গা চাটাচাটি করে—আমাদের আজ সেইরূপ হইয়াছে।" অনন্তর কেশবকে সম্বোধন করিয়া ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "তোমার ল্যাজ খসিয়াছে!" শ্রীযুক্ত কেশবের অনুচরবর্গ ঐ কথার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যেন অসন্তুষ্ট হইয়াছে দেখিয়া, ঠাকুর তখন ঐ কথার অর্থ বুঝাইয়া সকলকে মোহিত করিলেন। বলিলেন, "দেখ, ব্যাঙাচির যতদিন ল্যাজ থাকে ততদিন সে জলেই থাকে, স্থলে উঠিতে পারে না, কিন্তু ল্যাজ যখন খসিয়া পড়ে তখন জলেও থাকিতে পারে, ড্যাঙাতেও বিচরণ করিতে পারে—সেইরূপ মানুষের যতদিন অবিদ্যারূপ ল্যাজ থাকে, ততদিন সে সংসার-জলেই কেবল থাকিতে পারে; ঐ ল্যাজ খসিয়া পড়িলে, সংসার এবং সচ্চিদানন্দ উভয় বিষয়েই ইচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে। কেশব, তোমার মন এখন ঐরূপ হইয়াছে, উহা সংসারেও থাকিতে পারে এবং সচ্চিদানন্দেও যাইতে পারে!" ঐরূপে নানা প্রসঙ্গে অনেকক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ঠাকুর সেদিন দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিলেন।

ঠাকুরের দর্শন পাইবার পরে শ্রীযুক্ত কেশবের মন তাঁহার প্রতি

এতদূর আকৃষ্ট হইয়াছিল যে, এখন হইতে তিনি প্রায়ই ঠাকুরের পুণ্য দর্শনলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবার জন্য দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে আগমন করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার কলিকাতার 'কমল কুটীর' নামক বাটীতে লইয়া যাইয়া তাঁহার দিব্যসঙ্গলাভে আপনাকে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করিতেন। ঠাকুর ও কেশবের সম্বন্ধ ক্রমে এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছিল যে, পরস্পর পরস্পরকে কয়েক দিন দেখিতে না পাইলে উভয়েই বিশেষ অভাব বোধ করিতেন ; তখন ঠাকুর কলিকাতায় তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন, অথবা শ্রীযুক্ত কেশব দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিতেন। তদ্ভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের উৎসবের সময় প্রতি বৎসর ঠাকুরের নিকট আগমন করিয়া অথবা ঠাকুরকে লইয়া যাইয়া তাঁহার সহিত ঈশ্বরপ্রসঙ্গে একদিন অতিবাহিত করাকে শ্রীযুক্ত কেশব ঐ উৎসবের অঙ্গ মধ্যে পরিগণিত করিতেন। ঐরূপে অনেক বার তিনি ঐ সময়ে জাহাজে করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে সদলবলে দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক ঠাকুরকে উহাতে উঠাইয়া লইয়া তাঁহার অমৃতময় উপদেশ শুনিতে শুনিতে গঙ্গাবক্ষে বিচরণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুর ও কেশবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ

দক্ষিণেশ্বরে আগমনকালে শ্রীযুক্ত কেশব শাস্ত্রীয় প্রথা স্মরণ করিয়া কখন রিক্তহস্তে আসিতেন না, ফলমূলাদি কিছু আনয়নপূর্বক ঠাকুরের সম্মুখে রক্ষা করিতেন এবং অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার পদপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া বাক্যালাপে প্রবৃত্ত হইতেন। ঠাকুর রহস্য করিয়া তাঁহাকে একসময়ে বলিয়াছিলেন, "কেশব, তুমি এত লোককে বক্তৃতায় মুগ্ধ কর, আমাকে কিছু বল ?" শ্রীযুক্ত কেশব তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিয়াছিলেন,

দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া কেশবের আচরণ

"মহাশয়, আমি কি কামারের দোকানে ছুঁচ বেচিতে বসিব! আপনি বলুন, আমি শুনি। আপনার মুখের দুই চারিটি কথা লোককে বলিবামাত্র তাহারা মুগ্ধ হয়।"

ঠাকুরের কেশবকে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ এবং ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিনে এক, একে তিন বুঝান

ঠাকুর একদিন কেশবকে দক্ষিণেশ্বরে বুঝাইয়াছিলেন যে, ব্রহ্মের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মশক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করিতে হয় এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি সর্বদা অভেদভাবে অবস্থিত। শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের ঐ কথা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। অনন্তর ঠাকুর তাঁহাকে বলেন যে, ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তির সম্বন্ধের ন্যায় ভাগবত, ভক্ত ও ভগবান-রূপ তিন পদার্থ অভিন্ন বা নিত্যযুক্ত—ভাগবত, ভক্ত, ভগবান—তিনে এক, একে তিন। কেশব তাঁহার ঐ কথা বুঝিয়া উহাও অঙ্গীকার করিয়া লইলেন। অতঃপর ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "গুরু, কৃষ্ণ ও বৈষ্ণব তিনে এক, একে তিন—তোমাকে এখন একথা বুঝাইয়া দিতেছি।" কেশব তাহাতে কি চিন্তা করিয়া বলিতে পারি না, বিনয়নম্রবচনে বলিলেন, "মহাশয়, পূর্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার অধিক এখন আর অগ্রসর হইতে পারিতেছি না; অতএব বর্তমান প্রসঙ্গ এখন আর উত্থাপনে প্রয়োজন নাই।" ঠাকুরও তাহাতে বলিলেন, "বেশ বেশ, এখন ঐ পর্যন্ত থাক।" ঐরূপে পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত কেশবের মন ঠাকুরের দিব্যসঙ্গলাভে জীবনে বিশেষালোক উপলব্ধি করিয়াছিল এবং বৈদিক ধর্মের সার-রহস্য দিন দিন বুঝিতে পারিয়া সাধনায় নিমগ্ন হইয়াছিল। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতে তাঁহার ধর্মমত দিন দিন পরিবর্তিত হওয়ায় ঐকথা বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম হয়।

পরিশিষ্ট

আঘাত না পাইলে মানবমন সংসার হইতে উত্থিত হইয়া ঈশ্বরকে নিজ সর্বস্ব বলিয়া ধারণে সমর্থ হয় না। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার প্রায় তিন বৎসর পরে শ্রীযুক্ত কেশব কুচবিহার প্রদেশের রাজার সহিত নিজ কন্যার বিবাহ দিয়া ঐরূপ আঘাতপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ঐ বিবাহ লইয়া ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজে বিশেষান্দোলন উপস্থিত হইয়া উহাকে বিভক্ত করিয়া ফেলে এবং শ্রীযুক্ত কেশবের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা আপনাদিগকে পৃথক করিয়া 'সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ' নাম দিয়া অন্য এক নূতন সমাজের সৃষ্টি করিয়া বসেন। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে বসিয়া সামান্য বিষয় লইয়া উভয় পক্ষীয়গণের ঐরূপ বিরোধশ্রবণে মর্মাহত হইয়াছিলেন। কন্যার বিবাহযোগ্য বয়স-সম্বন্ধীয় ব্রাহ্মসমাজের নিয়ম শুনিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ঈশ্বরেচ্ছাধীন ব্যাপার। উহাদিগকে কঠিন নিয়মে নিবদ্ধ করা চলে না; কেশব কেন ঐরূপ করিতে গিয়াছিল!"

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ৬ই মার্চ কুচবিহার-বিবাহ—ঐ কালে আঘাত পাইয়া কেশবের আধ্যাত্মিক গভীরতা লাভ—ঐ বিবাহ সম্বন্ধে ঠাকুরের মত

কুচবিহার-বিবাহের কথা তুলিয়া ঠাকুরের নিকটে যদি কেহ শ্রীযুক্ত কেশবের নিন্দাবাদ করিত, তাহা হইলে তিনি তাহাকে উত্তরে বলিতেন, "কেশব উহাতে নিন্দনীয় এমন কি করিয়াছে? কেশব সংসারী, নিজ পুত্রকন্যাগণের যাহাতে কল্যাণ হয়, তাহা করিবে না? সংসারী ব্যক্তি ধর্মপথে থাকিয়া ঐরূপ করিলে নিন্দার কথা কি আছে? কেশব উহাতে ধর্মহানিকর কিছুই করে নাই, পরন্তু পিতার কর্তব্যপালন করিয়াছে।" ঠাকুর ঐরূপে সংসারধর্মের দিক দিয়া দেখিয়া কেশবকৃত ঐ ঘটনা নির্দোষ বলিয়া সর্বদা প্রতিপন্ন করিতেন। সে যাহা হউক, কুচবিহার-বিবাহরূপ ঘটনায় বিষম আঘাতপ্রাপ্ত হইয়া শ্রীযুক্ত কেশব যে

আপনাতে আপনি ডুবিয়া যাইয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক উন্নতিপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের বিশেষ ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া এবং তাঁহাকে দেখিবার বহু অবসর পাইয়াও কিন্তু তাঁহাকে সম্যক বুঝিয়াছিলেন কি না, সন্দেহ। কারণ, দেখা যায়, এক পক্ষে তিনি ঠাকুরকে জীবন্ত ধর্মমূর্তি বলিয়া জ্ঞান করিতেন—নিজ বাটীতে লইয়া যাইয়া তিনি যেখানে শয়ন, ভোজন, উপবেশন ও সমাজের কল্যাণচিন্তা করিতেন, সেই সকল স্থান ঠাকুরকে স্বয়ং দেখাইয়া আশীর্বাদ করিতে বলিয়াছিলেন, যাহাতে ঐ সকল স্থানের কোথাও অবস্থান করিয়া তাঁহার মন ঈশ্বরকে ভুলিয়া সংসারচিন্তা না করে—আবার যেখানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন, ঠাকুরকে সেখানে লইয়া যাইয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিয়াছিলেন দক্ষিণেশ্বরে আগমনপূর্বক 'জয় বিধানের জয়' বলিয়া ঠাকুরকে প্রণাম করিতে আমাদিগের অনেকে তাঁহাকে দেখিয়াছে।

ঠাকুরের ভাব কেশব সম্পূর্ণরূপে ধরিতে পারেন নাই—ঠাকুরের সম্বন্ধে কেশবের দুই প্রকার আচরণ

সেইরূপ অন্যপক্ষে আবার দেখা গিয়াছে, তিনি ঠাকুরের 'সর্ব ধর্ম সত্য—যত মত, তত পথ' রূপ বাক্য সম্যক লইতে না পারিয়া নিজ বুদ্ধির সহায়ে সকল ধর্মমত হইতে সারভাগ গ্রহণ এবং অসারভাগ পরিত্যাগপূর্বক 'নববিধান' আখ্যা দিয়া এক নূতন মতের স্থাপনে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ঠাকুরের সহিত পরিচিত হইবার কিছুকাল পরে উক্ত মতের আবির্ভাবে

নববিধান ও ঠাকুরের মত

শ্রীযুক্ত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের নিকটে আমরা এই ঘটনা শুনিয়াছি।

হৃদয়ঙ্গম হয়, শ্রীযুক্ত কেশব ঠাকুরের সর্বধর্মমতসম্বন্ধীয় চরম মীমাংসাটিকে ঐরূপ আংশিকভাবে প্রচার করিয়াছিলেন।

পাশ্চাত্ত্যবিদ্যা ও সভ্যতার প্রবল তরঙ্গ আসিয়া ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবিদ্যা ও সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির যখন আমূল পরিবর্তন সাধন করিতে বসিল, তখন ভারতের প্রত্যেক মনীষী ব্যক্তি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের শিক্ষা ও ধর্ম প্রভৃতির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আনয়নের জন্য সচেষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত রামমোহন রায়, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশব প্রভৃতি মনীষীগণ বঙ্গদেশে যেমন ঐ চেষ্টায় জীবনপাত করিয়াছেন, ভারতের অন্যত্রও সেইরূপ অনেক মহাত্মার ঐরূপ করিবার কথা শ্রুতিগোচর হয়। কিন্তু ঠাকুরের আবির্ভাবের পূর্বে তাঁহাদিগের কেহই ঐবিষয়ে সম্পূর্ণ সমাধান করিয়া যাইতে পারেন নাই। ঠাকুর নিজ জীবনে ভারতের ধর্মমতসমূহের সাধনা যথাযথ সম্পন্ন করিয়া এবং উহাদিগের প্রত্যেকে সাফল্য লাভ করিয়া বুঝিলেন যে, ভারতের ধর্ম ভারতের অবনতির কারণ নহে; উহার কারণ অন্যত্র অনুসন্ধান করিতে হইবে। দেখাইলেন যে, ঐ ধর্মের উপর ভিত্তি করিয়াই ভারতের সমাজ, রীতি, নীতি, সভ্যতা প্রভৃতি সকল বিষয় দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীনকালে ভারতকে গৌরবসম্পদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। এখনও ঐ ধর্মের সেই জীবন্ত শক্তি রহিয়াছে এবং উহাকে সর্বতোভাবে অবলম্বন করিয়া আমরা সকল বিষয়ে সচেষ্ট হইলে তবেই সকল বিষয়ে সিদ্ধকাম হইতে পারিব, নতুবা নহে। ঐ ধর্ম যে মানবকে কতদূর উদার করিতে পারে, তাহা ঠাকুর সর্বাগ্রে নিজ জীবনাদর্শে দেখাইয়া যাইলেন, পরে পাশ্চাত্ত্যভাবে ভাবিত নিজ শিষ্যবর্গের—বিশেষতঃ স্বামী বিবেকানন্দের ভিতর ঐ উদার

ভারতের জাতীয় সমস্যা ঠাকুরই সমাধান করিয়াছেন

ধর্মশক্তি সঞ্চারপূর্বক তাহাদিগকে সংসারের সকল কার্য কি ভাবে ধর্মের সহায়করূপে সম্পন্ন করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে শিক্ষাপ্রদানপূর্বক ভারতের পূর্বোক্ত জাতীয় সমস্যার এক অপূর্ব সমাধান করিয়া যাইলেন। সর্ব ধর্মমতের সাধনে সাফল্যলাভ করিয়া ঠাকুর যেমন পৃথিবীর আধ্যাত্মিক বিরোধ তিরোহিত করিবার উপায় নির্ধারণ করিয়া গিয়াছেন—ভারতীয় সকল ধর্মমতের সাধনায় সিদ্ধ হইয়া তেমনি আবার তিনি ভারতের ধর্মবিরোধ নাশপূর্বক কোন্ বিষয়াবলম্বনে আমাদিগের জাতিত্ব সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত হইয়া রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতে থাকিবে, তদ্বিষয়েরও নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

কেশবের দেহত্যাগে ঠাকুরের আচরণ

সে যাহা হউক, শ্রীযুক্ত কেশবের প্রতি ঠাকুরের ভালবাসা কতদূর গভীর ছিল, তাহা আমরা ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে কেশবের শরীর-রক্ষার পরে ঠাকুরের আচরণে সম্যক হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ঠাকুর বলিয়াছিলেন, ঐ সংবাদ শ্রবণ করিয়া আমি তিন দিন শয্যাত্যাগ করিতে পারি নাই। মনে হইয়াছিল, যেন আমার একটা অঙ্গ (পক্ষাঘাতে) পড়িয়া গিয়াছে!"

কেশবের সহিত প্রথম পরিচয়ের পরে ঠাকুরের জীবনের অন্য একটি ঘটনার এখানে উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। ঠাকুরের ঐ সময়ে শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের সর্বজন-মোহকর নগরকীর্তন দেখিতে বাসনা হইয়াছিল। শ্রীশ্রীজগদম্বা তখন তাঁহাকে নিম্নলিখিতভাবে ঐ বিষয় দেখাইয়া পূর্ণমনোরথ করিয়াছিলেন—নিজগৃহের বাহিরে দাঁড়াইয়া ঠাকুর দেখিয়াছিলেন, পঞ্চবটীর দিক হইতে ঐ অদ্ভুত সংকীর্তন-তরঙ্গ তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া দক্ষিণেশ্বর-উদ্যানের প্রধান ফটকের

দিকে প্রবাহিত হইতেছে এবং বৃক্ষান্তরালে লীন হইয়া যাইতেছে ; দেখিলেন, নবদ্বীপচন্দ্র শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গদেব শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে সঙ্গে লইয়া ঈশ্বরপ্রেমে তন্ময় হইয়া ঐ জনতরঙ্গের মধ্যভাগে ধীরপদে আগমন করিতেছেন এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলে তাঁহার প্রেমে তন্ময় হইয়া কেহ বা অবশভাবে এবং কেহ বা উদ্দাম তাণ্ডবে আপনাপন অন্তরের উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। এত জনতা হইয়াছে যে, মনে হইতেছে লোকের যেন আর অন্ত নাই। ঐ অদ্ভুত সংকীর্তনদলের ভিতর কয়েকখানি মুখ ঠাকুরের স্মৃতিপটে উজ্জ্বলবর্ণে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল এবং ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে তাহাদিগকে নিজ ভক্তরূপে আগমন করিতে দেখিয়া, ঠাকুর তাহাদিগের সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, পূর্বজীবনে তাহারা শ্রীচৈতন্যদেবের সাঙ্গোপাঙ্গ ছিল।

ঠাকুরের সংকীর্তনে শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে দর্শন

সে যাহা হউক, ঐ দর্শনের কিছুকাল পরে ঠাকুর কামারপুকুরে এবং হৃদয়ের বাটী সিহড়গ্রামে গমন করিয়াছিলেন। শেষোক্ত স্থানের কয়েক ক্রোশ দূরে ফুলুই-শ্যামবাজার নামক স্থান। সেখানে অনেক বৈষ্ণবের বসতি আছে এবং তাহারা নিত্য কীর্তনাদি করিয়া ঐ স্থানকে আনন্দপূর্ণ করে শুনিয়া ঠাকুরের ঐ স্থানে যাইয়া কীর্তন শুনিতে অভিলাষ হয়। শ্যামবাজার গ্রামের পার্শ্বেই বেলটে নামক গ্রাম। ঐ গ্রামের শ্রীযুক্ত নটবর গোস্বামী ঠাকুরকে ইতিপূর্বে দেখিয়াছিলেন এবং তাঁহার বাটীতে পদধূলি দিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর তখন হৃদয়কে সঙ্গে লইয়া তাঁহার বাটীতে যাইয়া সাতদিন অবস্থানপূর্বক শ্যামবাজারের বৈষ্ণবসকলের কীর্তনানন্দ দর্শন করিয়াছিলেন। উক্ত

ঠাকুরের ফুলুই-শ্যামবাজারে গমন ও অপূর্ব কীর্তনানন্দ—ঐ ঘটনার সময়নিরূপণ

স্থানের শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র মল্লিক তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া তাঁহাকে নিজ বাটীতে কীর্তনানন্দে সাদরে আহ্বান করিয়াছিলেন। কীর্তনকালে তাঁহার অপূর্ব ভাব দেখিয়া বৈষ্ণবেরা বিশেষ আকর্ষণ অনুভব করে এবং ক্রমে সর্বত্র ঐ কথা প্রচার হইয়া পড়ে। শুধু শ্যামবাজার গ্রামেই যে ঐ কথা প্রচার হইয়াছিল, তাহা নহে। রামজীবনপুর, কৃষ্ণগঞ্জ প্রভৃতি চতুষ্পার্শ্বস্থ দূর দূরান্তর গ্রামসকলেও ঐ কথা রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। ক্রমে ঐ সকল গ্রাম হইতে দলে দলে সংকীর্তনদল সমূহ তাঁহার সহিত আনন্দ করিতে আগমনপূর্বক শ্যামবাজারকে বিষম জনতাপূর্ণ করে এবং দিবারাত্র কীর্তন চলিতে থাকে। ক্রমে রব উঠিয়া যায় যে, একজন ভগবদ্ভক্ত এইক্ষণে মৃত এবং পরক্ষণেই জীবিত হইয়া উঠিতেছে! তখন ঠাকুরকে দর্শনের জন্য লোকে গাছে চড়িয়া, ঘরের চালে উঠিয়া আহার-নিদ্রা ভুলিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকে। ঐরূপে সাত দিবারাত্র তথায় আনন্দের বন্যা প্রবাহিত হইয়া লোকে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার পাদস্পর্শ করিবার জন্য যেন উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল এবং ঠাকুর স্নানাহারের অবকাশ পর্যন্ত প্রাপ্ত হন নাই! পরে হৃদয় তাঁহাকে লইয়া লুকাইয়া সিহড়ে পলাইয়া আসিলে ঐ আনন্দমেলার অবসান হয়। শ্যামবাজার গ্রামের ঈশান চৌধুরী, নটবর গোস্বামী, ঈশান মল্লিক, শ্রীনাথ মল্লিক প্রভৃতি ব্যক্তিসকল ও তাঁহাদের বংশধরগণ ঐ ঘটনার কথা এখনও উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং ঠাকুরকে বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। কৃষ্ণগঞ্জের প্রসিদ্ধ খোলবাদক শ্রীযুক্ত রাইচরণ দাসের সহিতও ঠাকুরের পরিচয় হইয়াছিল। ইঁহার খোলবাদন শুনিলেই ঠাকুরের ভাবাবেশ হইত। ঘটনাটির পূর্বোক্ত বিবরণ আমরা কিয়দংশ ঠাকুরের নিকটে এবং কিয়দংশ হৃদয়ের নিকটে শ্রবণ করিয়া-

ছিলাম। উহার সময় নিরূপণ করিতে নিম্নলিখিত ভাবে সক্ষম হইয়াছি—

বরানগর-আলমবাজার-নিবাসী ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রলাল পাল কবিরাজ মহাশয় কেশব বাবুর পরে ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন। তিনি আমাদিগকে বলিয়াছিলেন যে, ঠাকুরকে যখন তিনি প্রথমবার দর্শন করিতে গমন করেন, তখন ঠাকুর ঐ ঘটনার পরে সিহড় হইতে অল্পদিন মাত্র ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐদিন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্র বাবুর নিকট ফুলুই-শ্যামবাজারের ঘটনার কথা গল্প করিয়াছিলেন।

৺যোগানন্দ স্বামীজীর বাটী দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের অনতিদূরে ছিল। সেজন্য তাঁহার কথা ছাড়িয়া দিলে ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণ সন ১২৮৫ সাল, ইংরাজী ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার নিকটে আগমন করিতে আরম্ভ করেন। স্বামী বিবেকানন্দ সন ১২৮৮ সালে, ইংরাজী ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার নিকট আগমন করিয়াছিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রথম তারিখে শ্রীমতী জগদম্বা দাসী মৃত্যুমুখে পতিত হন। ঐ ঘটনার ছয় মাস আন্দাজ পরে হৃদয় বুদ্ধিহীনতাবশতঃ মথুর বাবুর স্বল্পবয়স্কা পৌত্রীর চরণ পূজা করে। কন্যার পিতা উহাতে তাঁহার অকল্যাণ আশঙ্কা করিয়া বিশেষ রুষ্ট হয়েন এবং হৃদয়কে কালীবাটীর কর্ম হইতে চিরকালের জন্য অবসর প্রদান করেন।

পূর্বোক্ত ঘটনাবলীর সময়নিরূপণের তালিকা

ঠাকুরের জন্ম সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন, বুধবার, ব্রাহ্ম-মুহূর্তে, শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে, ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি তারিখে সূর্যোদয়ের কিছু পূর্বে হইয়াছিল।

সন	খৃষ্টাব্দ	ঘটনা
১২৫৯	১৮৫২—১৮৫৩	কলিকাতার চতুষ্পাঠীতে আগমন। (ঠাকুরের বয়স ১৬ বৎসর পূর্ণ হইয়া কয়েক মাস)
১২৬০	১৮৫৩—১৮৫৪	চতুষ্পাঠীতে বাস, পাঠ ও পূজাদি।
১২৬১	১৮৫৪—১৮৫৫	ঐ ঐ
১২৬২	১৮৫৫—১৮৫৬	১৮ই জ্যৈষ্ঠ দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরপ্রতিষ্ঠা; ঠাকুর কালীমন্দিরে বেশকারীর পদে ও হৃদয় সাহায্যকারীর পদে নিযুক্ত; বিষ্ণু-বিগ্রহ ভগ্ন হওয়া, ঠাকুরের বিষ্ণুঘরের পূজকের পদগ্রহণ; ১৪ই ভাদ্র, ইং ২৯শে আগষ্ট রাণীর দেবসেবার জন্য জমিদারি কেনা; কেনারাম ভট্টের নিকট ঠাকুরের দীক্ষাগ্রহণ; ঠাকুরের ৺কালীপূজকের ও রামকুমারের বিষ্ণুপূজকের পদগ্রহণ।
১২৬৩	১৮৫৬—১৮৫৭	হৃদয়ের বিষ্ণুপূজকের পদগ্রহণ; রাম-কুমারের মৃত্যু; ঠাকুরের পাপপুরুষ দগ্ধ হওয়া ও গাত্রদাহ; ঠাকুরের প্রথমবার

পরিশিষ্ট

		দেবোন্মত্তভাব ও দর্শন; ভূকৈলাসের বৈদ্যের ঔষধসেবন।
১২৬৪	১৮৫৭—১৮৫৮	ঠাকুরের রাগানুগা পূজা দেখিয়া মথুরের আশ্চর্য হওয়া; ঠাকুরের রাণী রাসমণিকে দণ্ডদান; হলধারীর পূজকরূপে নিযুক্ত হওয়া ও ঠাকুরকে অভিশাপ।
১২৬৫	১৮৫৮—১৮৫৯	আশ্বিন বা কার্তিকে ঠাকুরের কামারপুকুর গমন; চণ্ড নামান।
১২৬৬	১৮৫৯—১৮৬০	বৈশাখ মাসে ঠাকুরের বিবাহ।
১২৬৭	১৮৬০—১৮৬১	ঠাকুরের দ্বিতীয়বার জয়রামবাটী গমন, পরে কলিকাতায় প্রত্যাগমন; মথুরের শিব ও কালীরূপে ঠাকুরকে দর্শন; ঠাকুরের দ্বিতীয়বার দেবোন্মত্ততা ও কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদের চিকিৎসা; ১৮৬১, ১৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে রাণী রাসমণির দেবোত্তর দলিলে সহি করা ও পরদিন মৃত্যু; ঠাকুরের জননীর বুড়ো শিবের নিকটে হত্যা দেওয়া; ব্রাহ্মণীর আগমন ও ঠাকুরের তন্ত্রসাধন আরম্ভ।
১২৬৯	১৮৬২—১৮৬৩	ঠাকুরের তন্ত্রসাধন সম্পূর্ণ হওয়া।
১২৭০	১৮৬৩—১৮৬৪	পদ্মলোচন পণ্ডিতের সহিত দেখা; মথুরের অন্নমেরু-অনুষ্ঠান; ঠাকুরের জননীর গঙ্গাবাস করিতে আগমন;

		জটাধারীর আগমন, ঠাকুরের বাৎসল্য ও মধুরভাব-সাধন।
১২৭১	১৮৬৪—১৮৬৫	তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাস গ্রহণ।
১২৭২	১৮৬৫—১৮৬৬	হলধারীর কর্ম হইতে অবসরগ্রহণ ও অক্ষয়ের পূজকের পদগ্রহণ; শ্রীমৎ তোতাপুরীর দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যাওয়া।
১২৭৩	১৮৬৬—১৮৬৭	ঠাকুরের ছয়মাস কাল অদ্বৈত ভূমিতে অবস্থান সম্পূর্ণ হওয়া; শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর কঠিন পীড়া আরোগ্য করা; পরে ঠাকুরের শারীরিক পীড়া ও মুসলমানধর্ম-সাধন।
১২৭৪	১৮৬৭—১৮৬৮	ব্রাহ্মণী ও হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের কামারপুকুরে গমন; শ্রীশ্রীমার কামার-পুকুরে আগমন; অগ্রহায়ণ মাসে ঠাকুরের কলিকাতায় প্রত্যাগমন ও মাঘ মাসে তীর্থযাত্রা।
১২৭৫	১৮৬৮—১৮৬৯	জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন; হৃদয়ের প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু এবং দুর্গোৎসব ও দ্বিতীয়বার বিবাহ।
১২৭৬	১৮৬৯—১৮৭০	অক্ষয়ের বিবাহ ও মৃত্যু।

পরিশিষ্ট

১২৭৭	১৮৭০—১৮৭১	ঠাকুরের মথুরের বাটীতে ও গুরুগৃহে গমন; কলুটোলায় শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবের আসনগ্রহণ; পরে কালনা, নবদ্বীপ ও ভগবানদাস বাবাজীকে দর্শন।
১২৭৮	১৮৭১—১৮৭২	জুলাই মাসের ১৬ই তারিখে (১লা শ্রাবণ) মথুরের মৃত্যু; ফাল্গুন মাসে রাত্রি ৯টার সময় শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে প্রথম আগমন।
১২৭৯	১৮৭২—১৮৭৩	শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে বাস।
১২৮০	১৮৭৩—১৮৭৪	জ্যৈষ্ঠ মাসে ঠাকুরের ৺ষোড়শী-পূজা; শ্রীশ্রীমার গৌরী পণ্ডিতকে দর্শন ও আন্দাজ আশ্বিনে (১৮৭৩, সেপ্টেম্বর) কামারপুকুরে প্রত্যাগমন; অগ্রহায়ণে রামেশ্বরের মৃত্যু।
১২৮১	১৮৭৪—১৮৭৫	(আন্দাজ ১৮৭৫ এপ্রিল) শ্রীশ্রীমার দ্বিতীয়বার দক্ষিণেশ্বরে আসা; শম্ভু মল্লিকের ঘর করিয়া দেওয়া, চানকে ৺অন্নপূর্ণাদেবীর মন্দির প্রতিষ্ঠা; ঠাকুরের শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনকে প্রথমবার দেখা।
১২৮২	১৮৭৫—১৮৭৬	(আন্দাজ ১৮৭৫ নবেম্বর) পীড়িতা হইয়া শ্রীশ্রীমার পিত্রালয়ে গমন; ঠাকুরের জননীর মৃত্যু।
১২৮৩	১৮৭৬—১৮৭৭	কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

১২৮৪	১৮৭৭—১৮৭৮	কেশবের সহিত ঠাকুরের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। (আন্দাজ ১৮৭৭ নবেম্বর) শ্রীশ্রীমার দক্ষিণেশ্বরে আগমন।
১২৮৫	১৮৭৮—১৮৭৯	ঠাকুরের চিহ্নিত ভক্তগণের আগমন-আরম্ভ।
১২৮৭	১৮৮০—১৮৮১	শ্রীশ্রীমার পুনরায় দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও হৃদয়ের কটু কথায় পুনরায় ঐ দিবসেই চলিয়া যাওয়া; শ্রীমতী জগদম্বা দাসীর মৃত্যু।
১২৮৮	১৮৮১—১৮৮২	হৃদয়ের পদচ্যুতি ও দক্ষিণেশ্বর হইতে অন্যত্র গমন; শ্রীবিবেকানন্দ স্বামীর ঠাকুরের নিকট আগমন।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

গুরুভাব—পূর্ব্বার্দ্ধ

গ্রন্থ-পরিচয়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গে গুরুভাব প্রকাশিত হইল। ঠাকুরের সাধনকালের সময় হইতে বিশেষ প্রকটভাবের পূর্ব পর্যন্ত জীবনের ঘটনাবলীই ইহাতে প্রধানতঃ সন্নিবেশিত হইয়াছে। তবে কেবল-মাত্র ঐ সকল ঘটনা বা ঠাকুরের ঐ সময়ের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হই নাই। যে মনের ভাবের দ্বারা পরিচালিত হইয়া, যে উদ্দেশ্যে, তিনি ঐ সকল কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন তাহারও যথাযথ আলোচনা করিয়াছি। কারণ, শরীর ও মনের সমষ্টিভূত মানবের জীবনেতিহাস কেবলমাত্র তাহার জড় দেহ ও তৎকৃত কার্যকলাপের পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুশীলনে পাওয়া যায় না। জড়বাদী পাশ্চাত্য জীবনী ও ইতিহাস লিখিতে যাইয়া প্রধানতঃ ঘটনাবলীর সংগ্রহেই দক্ষতার পরিচয় দেয় এবং আত্মবাদী হিন্দু মনোভাবের সুনিপুণ সংস্থানেই মনোনিবেশ করে। আমাদের ধারণা, ঐ উভয় ভাবের সম্মিলনেই যথার্থ জীবনী বা ইতিহাস সম্ভবে এবং মনের ইতিহাসকে পুরোবর্তী রাখিয়াই সর্বত্র জড়ের কার্যকলাপ লিপিবদ্ধ করা কর্তব্য।

আর এক কথা, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবন আমরা বর্তমান গ্রন্থে শাস্ত্রসহায়েও অনেকস্থলে অনুশীলন করিয়াছি; তাঁহার অসাধারণ মনোভাব, অনুভব ও কার্যকলাপের সহিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য প্রভৃতি ভারতের এবং ঈশাদি ভারতেতর দেশের মহাপুরুষগণের অনুভব ও কার্যকলাপের তুলনায় আলোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছি। কারণ ঠাকুর আমাদিগের নিকট

স্পষ্টাক্ষরে বারংবার নির্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, পূর্ব পূর্ব যুগে, "যে রাম, যে কৃষ্ণ (ইত্যাদি হইয়াছিল) সে-ই ইদানীং (নিজ শরীর দেখাইয়া) এই খোলটার ভিতর রহিয়াছে!"—এবং "এখানকার (আমার) অনুভবসকল বেদ-বেদান্ত ছাড়াইয়া গিয়াছে!" বাস্তবিক 'ভাবমুখে' অবস্থিত শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবন যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিতে অগ্রসর হইয়া আমাদিগকে বাধ্য হইয়াই স্বীকার করিতে হইয়াছে যে, ঈদৃশ অলৌকিক জীবন আধ্যাত্মিক জগতে আর ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই।

আবার পূর্ব পূর্ব অবতারসকলের মতানুগ হইয়া সকল প্রকার সাধনমার্গে স্বল্পকালেই সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি 'যত মত তত পথ'রূপ যে নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার ও লোকহিতার্থ ঘোষণা করিয়াছেন, তদ্বিষয় আলোচনা করিয়া আমরা তাঁহাকে পূর্ব পূর্ব যুগাবির্ভূত সকল অবতার-পুরুষগণের ঘনীভূত সমষ্টি ও নবাভিব্যক্তি বলিয়া বুঝিতেই বাধ্য হইয়াছি। বাস্তবিকই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র জীবনের আমরা যতই অনুশীলন করিয়াছি, ততই উহাকে বৈদিক সার্বজনীন ও সনাতন অধ্যাত্ম-ভাববৃক্ষের সারসমষ্টিসমুদ্ভূত প্রথমোৎপন্ন ফলস্বরূপেই নির্ধারিত করিতে বাধ্য হইয়াছি।

শ্রীরামকৃষ্ণপদাশ্রিত পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের ধর্মপ্রচারের পর হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকথা জানিবার জন্য সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া বর্তমান কালে অনেকে অনেক কথা তৎসম্বন্ধে লিপিবদ্ধ করিলেও ঐ অলোকসামান্য জীবনের সহিত সনাতন হিন্দু বা বৈদিক ধর্মের যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা স্পষ্ট নির্দেশ করিয়া কেহই এ পর্যন্ত উহার অনুশীলন করেন নাই

বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ফলে শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেন সনাতন হিন্দুধর্ম হইতে বিচ্ছিন্ন পৃথক্ এক ব্যক্তি এবং সাম্প্রদায়িক মতবিশেষেরই সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন—এইরূপ বিপরীত ধারণাই ঐ সকল পুস্তকপাঠে মনে উদিত হইয়া থাকে। আবার ঐ সকল গ্রন্থের অনেকগুলি ঠাকুরের জীবনাখ্যায়িকা সম্বন্ধে নানা ভ্রমপ্রমাদপূর্ণ এবং অপরগুলিতে ঐ সকল জীবনঘটনার প্রকৃত অর্থ এবং পূর্বাপর সম্বন্ধ ও পারম্পর্য লক্ষিত হয় না। সাধারণের তদভাব কথঞ্চিৎ দূর করিবার জন্য ঐ মহদুদার জীবন আমাদের নিকটে যে ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে এবং যে ভাবোপলব্ধি করিয়া শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ আমরা ঠাকুরের শ্রীপাদপদ্মে জীবনোৎসর্গ করিয়াছি, তাহারই কিছু স্বামী শ্রীবিবেকানন্দের পদানুগ হইয়া বর্তমান গ্রন্থে পাঠককে বলিবার প্রযত্ন করিয়াছি। ঠাকুরের অলৌকিক জীবনাদর্শ যদি উহাতে কথঞ্চিৎ যথার্থ ভাবেও অঙ্কিত হইয়া থাকে, তবে উহা তাঁহারই গুণে হইয়াছে; এবং যাহা কিছু অসম্পূর্ণতা ও অঙ্গহানিত্ব রহিয়া গিয়াছে, তাহা আমাদের বুঝিবার ও বলিবার দোষেই হইয়াছে, পাঠক এ কথা বুঝিয়া লইবেন। ভবিষ্যতে ঠাকুরের অমূল্য জীবনের পূর্ব ও শেষভাগের পরিচয়ও এইভাবে পাঠককে উপহার দিবার আমাদের ইচ্ছা রহিল। এক্ষণে 'ভাবমুখে' অবস্থিত ভূরবগাহী শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের সনাতন বৈদিক ধর্মের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধালোচনা করিয়া স্বামী শ্রীবিবেকানন্দ যে সূত্রগুলি নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখানে পাঠকের নয়নগোচর করিয়া আমরা গ্রন্থারম্ভে প্রবৃত্ত হই। অলমিতি—

বিনীত

গ্রন্থকার

হিন্দুধর্ম ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

আচণ্ডালাপ্রতিহতরয়ো যস্য প্রেমপ্রবাহঃ
লোকাতীতোঽপ্যহহ ন জহৌ লোককল্যাণমার্গম
ত্রৈলোক্যেঽপ্যপ্রতিমমহিমা জানকীপ্রাণবন্ধঃ
ভক্ত্যা জ্ঞানং বৃতবরবপুঃ সীতয়া যো হি রামঃ ॥
স্তব্ধীকৃত্য প্রলয়কলিতম্বাহবোত্থং মহান্তম্
হিত্বা রাত্রিং প্রকৃতিসহজামন্ধতামিস্রমিশ্রাম্।
গীতং শান্তং মধুরমপি যঃ সিংহনাদং জগর্জ
সোঽয়ং জাতঃ প্রথিতপুরুষো রামকৃষ্ণস্ত্বিদানীম্ ॥[১]

শাস্ত্র শব্দে অনাদি অনন্ত 'বেদ' বুঝা যায়। ধর্মশাসনে এই বেদই একমাত্র সক্ষম।

পুরাণাদি অন্যান্য পুস্তক স্মৃতিশব্দবাচ্য, এবং তাহাদের প্রামাণ্য, যে পর্যন্ত তাহারা শ্রুতিকে অনুসরণ করে, সেই পর্যন্ত।

১। প্রেমের প্রবাহ যাঁর আচণ্ডালে অবারিত।
লোকহিতে রত সদা হয়ে যিনি লোকাতীত ॥
জানকীর প্রাণবন্ধু উপমা নাহিক যাঁর।
ভক্ত্যাবৃত জ্ঞানবপু যিনি রাম অবতার ॥
স্তব্ধ করি কুরুক্ষেত্রে প্রলয়ের হুহুঙ্কার।
দূর করি সহজাত মহামোহ-অন্ধকার ॥
উঠেছিল সুগম্ভীর গীতাসিংহনাদ যাঁর।
সেই এবে রামকৃষ্ণ খ্যাতনামা ত্রিসংসার ॥

'সত্য' দুই প্রকার :—(১) যাহা মানব-সাধারণ-পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য ও তদুপস্থাপিত অনুমানের দ্বারা গৃহীত।

(২) যাহা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম যোগজ শক্তি গ্রাহ্য।

প্রথম উপায় দ্বারা সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বিজ্ঞান' বলা যায়। দ্বিতীয় প্রকারের সঙ্কলিত জ্ঞানকে 'বেদ' বলা যায়।

'বেদ' নামধেয় অনাদি অনন্ত অলৌকিক জ্ঞানরাশি সদা বিদ্যমান ; সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং উহার সহায়তায় এই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করিতেছেন।

ঐ অতীন্দ্রিয় শক্তি যে পুরুষে আবির্ভূত হন তাঁহার নাম ঋষি ও সেই শক্তির দ্বারা তিনি যে অলৌকিক সত্য উপলব্ধি করেন তাহার নাম 'বেদ'।

এই ঋষিত্ব ও বেদদ্রষ্টৃত্ব লাভ করাই যথার্থ ধর্মানুভূতি। সাধকের জীবনে যতদিন উহার উন্মেষ না হয়, ততদিন 'ধর্ম' কেবল 'কথার কথা' ও ধর্মরাজ্যের প্রথম সোপানেও তাহার পদস্থিতি হয় নাই, জানিতে হইবে।

সমস্ত দেশ-কাল-পাত্র ব্যাপিয়া বেদের শাসন, অর্থাৎ বেদের প্রভাব দেশবিশেষে, কালবিশেষে বা পাত্রবিশেষে বদ্ধ নহে।

সার্বজনীন ধর্মের ব্যাখ্যাতা একমাত্র 'বেদ'।

অলৌকিক জ্ঞানবের্তৃত্ব কিঞ্চিৎ পরিমাণে অস্মদ্দেশীয় ইতিহাস পুরাণাদি পুস্তকে ও ম্লেচ্ছাদিদেশীয় ধর্মপুস্তকসমূহে যদিও বর্তমান, তথাপি অলৌকিক জ্ঞানরাশির সর্বপ্রথম, সম্পূর্ণ এবং অবিকৃত সংগ্রহ বলিয়া আর্য জাতির মধ্যে প্রসিদ্ধ 'বেদ' নামধেয় চতুর্বিভক্ত অক্ষররাশি সর্বতোভাবে সর্বোচ্চ স্থানের অধিকারী, সমগ্র জগতের পূজার্হ এবং আর্য বা ম্লেচ্ছ সমস্ত ধর্মপুস্তকের প্রমাণভূমি।

আর্য জাতির আবিষ্কৃত উক্ত বেদনামক শব্দরাশির সম্বন্ধে ইহাও বুঝিতে হইবে যে, তন্মধ্যে যাহা লৌকিক, অর্থবাদ বা ঐতিহ্য নহে তাহাই 'বেদ'।

এই বেদরাশি জ্ঞানকাণ্ড ও কর্মকাণ্ড দুই ভাগে বিভক্ত। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া ও ফলসমূহ মায়াধিকৃত জগতের মধ্যে সর্বকাল অবস্থিত বলিয়া দেশ, কাল, পাত্রাদি নিয়মাধীনে তাহার পরিবর্তন হইয়াছে, হইতেছে ও হইবে। সামাজিক রীতিনীতিও এই কর্মকাণ্ডের উপর উপস্থাপিত বলিয়া কালে কালে পরিবর্তিত হইতেছে ও হইবে। লোকাচারসকলও সৎশাস্ত্র এবং সদাচারের অবিসম্বাদী হইয়াই কালে কালে গৃহীত হইয়াছে ও হইবে। সৎশাস্ত্রবিগর্হিত ও সদাচারবিরোধী একমাত্র লোকাচারের বশবর্তী হওয়াই আর্যজাতির অধঃপতনের এক প্রধান কারণ।

জ্ঞানকাণ্ড অথবা বেদান্তভাগই—নিষ্কামকর্ম, যোগ, ভক্তি, ও জ্ঞানের সহায়তায়—মুক্তিপ্রদ এবং মায়াপারনেতৃত্ব-পদে সর্বকাল প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে; এবং দেশ, কাল, পাত্রাদির দ্বারা সর্বথা অপ্রতিহত থাকা বিধায় উহাই সার্বলৌকিক, সার্বভৌমিক ও সার্বকালিক ধর্মের একমাত্র উপদেষ্টা।

মন্বাদি তন্ত্র কর্মকাণ্ডকে আশ্রয় করিয়া দেশ-কাল-পাত্রভেদে সামাজিক কল্যাণকর কর্মের শিক্ষাই প্রধানতঃ দিয়াছেন। পুরাণাদি তন্ত্র বেদান্তনিহিত তত্ত্বসকল লইয়া অবতারাদির মহান্ চরিত-বর্ণনমুখে ঐ সকল তত্ত্বের বিস্তৃত ব্যাখ্যানই করিতেছেন; এবং অনন্ত ভাবময় প্রভু ভগবানের কোন কোন ভাবকে প্রধান করিয়া সেই সেই ভাবের উপদেশ করিয়াছেন।

কিন্তু কালবশে সদাচারভ্রষ্ট, বৈরাগ্যবিহীন, একমাত্র

লোকাচারনিষ্ঠ ও ক্ষীণবুদ্ধি আর্যসন্তান—এই সকল ভাববিশেষের বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য আপাতপ্রতিযোগীর ন্যায় অবস্থিত, ও অল্পবুদ্ধি মানবের জন্য স্থূল ও বহুবিস্তৃত ভাষায় স্থূলভাবে বৈদান্তিক সূক্ষ্মতত্ত্বের প্রচারকারী—পুরাণাদি তন্ত্রেরও মর্মগ্রহে অসমর্থ, অনন্তভাবসমষ্টি অখণ্ড সনাতন ধর্মকে বহু খণ্ডে বিভক্ত এবং সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা ও ক্রোধ প্রজ্বলিত করিয়া তন্মধ্যে পরস্পরকে আহুতি দিবার জন্য সতত চেষ্টিত থাকিয়া যখন এই ধর্মভূমি ভারতবর্ষকে প্রায় নরকভূমিতে পরিণত করিয়াছেন, তখন আর্য জাতির প্রকৃত ধর্ম কি এবং সতত-বিবদমান, আপাতদৃষ্টে বহুধা-বিভক্ত, সর্বথা-বিপরীত-আচারসঙ্কুল সম্প্রদায়ে সমাচ্ছন্ন, স্বদেশীর ভ্রান্তিস্থান ও বিদেশীর ঘৃণাস্পদ হিন্দুধর্ম নামক যুগযুগান্তরব্যাপী বিখণ্ডিত ও দেশকালযোগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধর্মখণ্ডসমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায় তাহা দেখাইতে এবং কালবশে নষ্ট এই সনাতন ধর্মের সার্বলৌকিক ও সার্বদৈশিক স্বরূপ স্বীয় জীবনে নিহিত করিয়া সনাতন ধর্মের জীবন্ত উদাহরণস্বরূপ হইয়া লোকহিতায় সর্বসমক্ষে নিজ জীবন প্রদর্শন করিবার জন্য শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন।

অনাদি বর্তমান, সৃষ্টি-স্থিতি-লয়কর্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষিহৃদয়ে স্বতঃ আবির্ভূত হন তাহা দেখাইবার জন্য ও এবম্প্রকারে শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্মের পুনরুদ্ধার, পুনঃস্থাপন ও পুনঃপ্রচার হইবে এই জন্য বেদমূর্তি ভগবান এই কলেবরে বহিঃশিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

বেদ—অর্থাৎ প্রকৃত ধর্মের, এবং ব্রাহ্মণত্ব—অর্থাৎ

ধর্মশিক্ষকত্বের রক্ষার জন্য ভগবান যে বারংবার শরীরধারণ করেন, ইহা স্মৃত্যাদিতে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রপতিত নদীর জলরাশি সমধিক বেগবান হয়, পুনরুত্থিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়, তদ্রূপ প্রত্যেক পতনের পর আর্যসমাজও যে শ্রীভগবানের কারুণিক নিয়ন্তৃত্বে বিগতাময় হইয়া পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যবান হইতেছে, ইহা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ।

প্রত্যেক পতনের পর আমাদের পুনরুত্থিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছে এবং সর্বভূতান্তর্যামী প্রভুও প্রত্যেক অবতারে আত্মস্বরূপ সমধিক অভিব্যক্ত করিতেছেন।

বারংবার এই ভারতভূমি মূর্চ্ছাপন্না হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইঁহাকে পুনরুজ্জীবিতা করিয়াছেন।

কিন্তু ঈষন্মাত্রযামা, গতপ্রায়া, বর্তমান গভীর বিষাদরজনীর ন্যায় কোনও অমানিশা ইতিপূর্বে এই পুণ্যভূমিকে সমাচ্ছন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতন সমস্ত গোষ্পদের তুল্য।

সেইজন্য এই প্রবোধনের সমুজ্জলতায় আর্য-সমাজের পূর্ব পূর্ব যুগের বোধনসমূহ সূর্যালোকে তারকাবলীর ন্যায় মহিমাবিহীন হইবে এবং উহার এই পুনরুত্থানের মহাবীর্যের সমক্ষে পূর্ব পূর্ব যুগে পুনঃপুনর্লব্ধ প্রাচীন বীর্য বাললীলাপ্রায় হইয়া যাইবে।

সনাতন ধর্মের সমগ্র-ভাবসমষ্টি, বর্তমান পতনাবস্থাকালে,

অধিকারিহীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায়-আকারে কোথাও আংশিকভাবে পরিরক্ষিত এবং কোথাও বা সম্পূর্ণ লুপ্ত হইয়াছিল।

এই নবোত্থানে নববলে বলীয়ান মানবসন্তান যে, সেই বিখণ্ডিত ও বিক্ষিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকৃত করিয়া নিজ জীবনে ধারণা ও অভ্যাস করিতে এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ হইবে, ইহারই নিদর্শনস্বরূপ পরম কারুণিক শ্রীভগবান বর্তমান যুগে সর্বযুগাপেক্ষা সমধিক সম্পূর্ণ, সর্বভাবসমন্বিত, সর্ববিদ্যা-সহায়, পূর্বোক্ত যুগাবতাররূপ প্রকাশ করিলেন।

অতএব এই মহাযুগের প্রত্যূষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনন্ত ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্র ও ধর্মে নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচ্ছন্ন ছিল, তাহা পুনরাবিষ্কৃত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

এই নব-যুগধর্ম সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কল্যাণের নিদান ; এবং এই নব-যুগধর্মপ্রবর্তক শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ পূর্বগ শ্রীযুগধর্মপ্রবর্তকদিগের পুনঃসংস্কৃত প্রকাশ।—হে মানব, ইহা বিশ্বাস কর, ধারণা কর !

হে মানব, মৃতব্যক্তি পুনরাগত হয় না—গতরাত্রি পুনর্বার আসে না—বিগতোচ্ছ্বাস পূর্বরূপ আর প্রদর্শন করে না—জীবও দুইবার এক দেহ ধারণ করে না। অতএব অতীতের পূজা হইতে আমরা তোমাদিগকে প্রত্যক্ষের পূজাতে আহ্বান করিতেছি—গতানুশোচনা হইতে বর্তমান প্রযত্নে আহ্বান করিতেছি—লুপ্ত পন্থার পুনরুদ্ধারে বৃথা শক্তিক্ষয় হইতে, সদ্যোনির্মিত বিশাল ও সন্নিকট পথে আহ্বান করিতেছি ; বুদ্ধিমান, বুঝিয়া লও !

যে শক্তির উন্মেষমাত্রে দিগ্‌দিগন্তব্যাপিনী প্রতিধ্বনি জাগরিতা হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবস্থা কল্পনায় অনুভব কর ; এবং বৃথা সন্দেহ, দুর্বলতা ও দাসজাতিসুলভ ঈর্ষা-দ্বেষ ত্যাগ করিয়া এই মহাযুগচক্র-পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর !

আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক—এই বিশ্বাস হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও !

বিবেকানন্দ

বিস্তারিত

সূচীপত্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ

প্রথম অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণ—ভাবমুখে

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি ॥
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥

—গীতা, ৭।১২-১৩

দ্বাদশবর্ষব্যাপী অদৃষ্টপূর্ব অলৌকিক তপস্যান্তে শ্রীশ্রীজগদম্বা ঠাকুরকে বলেন—"ওরে, তুই ভাবমুখে থাক্"; ঠাকুরও তাহাই করেন—একথা এখন অনেকেই জানিয়াছেন। কিন্তু ভাবমুখে থাকা যে কি ব্যাপার এবং উহার অর্থ যে কত গভীর তাহা বুঝা ও বুঝান বড় কঠিন। আটাশ বৎসর পূর্বে স্বামী বিবেকানন্দ একদিন জনৈক বন্ধুকে[১] বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের এক একটি কথা অবলম্বন করিয়া ঝুড়ি-ঝুড়ি দর্শন-গ্রন্থ লেখা যাইতে পারে।" বন্ধুটি তৎশ্রবণে অবাক হইয়া বলেন—"বটে? আমরা তো ঠাকুরের কথার অত গভীর ভাব বুঝতে পারি না! তাঁর কোন একটি কথা ঐ ভাবে আমাকে বুঝিয়ে বলবে?"

ঠাকুরের কথার গভীর ভাব

১ শ্রীযুত হরমোহন মিত্র

রেখো।—এই বলিয়া গিরিশের দিকে চাহিলেন, যেন তাঁহার উত্তর প্রতীক্ষা করিতেছেন।

গিরিশ শুনিয়া বিষণ্নমনে ভাবিতে লাগিলেন, 'আমার যে কাজ তাহাতে স্নান-আহার-নিদ্রা প্রভৃতি নিত্যকর্মেরই একটা নিয়মিত সময় রাখিতে পারি না। সকালে-বিকালে স্মরণ-মনন করিতে নিশ্চয়ই ভুলিয়া যাইব। তাহা হইলে তো মুশকিল—শ্রীগুরুর আজ্ঞালঙ্ঘনে মহা দোষ ও অনিষ্ট হইবে। অতএব এ কথা কি করিয়া স্বীকার করি? সংসারে অন্য কাহারও কাছে কথা দিয়াই সে কথা না রাখিতে পারিলে দোষ হয়, তা যাঁহাকে পরকালের নেতা বলিয়া গ্রহণ করিতেছি তাঁহার কাছে—!' গিরিশ মনের কথা-গুলি বলিতেও কুণ্ঠিত হইতে লাগিলেন। আবার ভাবিলেন, 'কিন্তু ঠাকুর আমাকে তো আর কোন একটা বিশেষ কঠিন কাজ করিতে বলেন নাই। অপরকে এ কথা বলিলে এখনি আনন্দের সহিত স্বীকার পাইত।' কিন্তু তিনি কি করিবেন, আপনার একান্ত বহির্মুখ অবস্থা ঠিক ঠিক দেখিতে পাইয়াই বুঝিতেছিলেন যে, ধর্মকর্মের অতটুকু প্রতিদিন করা যেন তাঁহার সামর্থ্যের অতীত। আবার নিজের স্বভাবের দিকে চাহিয়া দেখিতে পাইলেন,—কোনরূপ ব্রত বা নিয়মে, 'চিরকালের নিমিত্ত আবদ্ধ হইলাম'—এ কথা মনে করিতে গেলেও যেন হাঁপাইয়া উঠেন এবং যতক্ষণ না ঐ নিয়ম ভঙ্গ হয় ততক্ষণ যেন প্রাণে অশান্তি। আজীবন এইরূপ ঘটিয়া আসিয়াছে। নিজের ইচ্ছায় ভাল-মন্দ যাহা হয় করিতে কোন গোল নাই, কিন্তু যেমন মনে

গিরিশের মনের অবস্থা

হইল—বাধ্য হইয়া অমুক কাজটা আমাকে করিতে হইতেছে বা হইবে, অমনি মন বাঁকিয়া দাঁড়াইল! কাজেই আপনার নিতান্ত অপারক ও অসহায় অবস্থা উপলব্ধি করিতে করিতে কাতর হইয়া চুপ করিয়া রহিলেন—'করিব' বা 'করিতে পারিব না' কোন কথাই বলিতে পারিলেন না! আর অত সোজা কাজটা করিতে পারিবেন না, একথা লজ্জার মাথা খাইয়া বলেনই বা কিরূপে—বলিলেও ঠাকুর ও উপস্থিত সকলে মনে করিবেনই বা কি? তাঁহার একান্ত অসহায় অবস্থার কথা হয়ত বুঝিতেই পারিবেন না, আর মুখ ফুটিয়া না বলিলেও মনে নিশ্চয় করিবেন—তিনি একটা ঢঙ করিয়া কথাগুলি বলিতেছেন।

ঠাকুর, গিরিশকে ঐরূপ নীরব দেখিয়া, তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং তাঁহার মনোগত ভাব বুঝিয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তা যদি না পার তো খাবার শোবার আগে তাঁহার একবার স্মরণ ক'রে নিও।"

গিরিশ নীরব। ভাবিলেন উহাই কি করিতে পারিবেন। দেখিলেন—কোন দিন খান বেলা দশটায়, আর কোন দিন বৈকাল পাঁচটায়; রাত্রির খাওয়া-সম্বন্ধেও ঐ নিয়ম। আবার মামলা-মোকদ্দমার ফ্যাসাদে পড়িয়া এমন দিন গিয়াছে যে, খাইতে বসিয়াছেন বলিয়াই হুঁশ নাই! কেবলই উদ্বিগ্নচিত্তে ভাবিতেছেন—'ব্যারিষ্টারকে যে ফি পাঠাইয়াছি তাহা ঠিক সময়ে তাঁহার হাতে পৌঁছিল কিনা খবরটা পাইলাম না, মোকদ্দমার সময় যদি তিনি উপস্থিত না হন তাহা হইলেই তো বিপদ' ইত্যাদি। কার্যগতিকে ঐরূপ দিন যদি আবার আসে—আর আসাও কিছু অসম্ভব নয়—তাহা হইলে সেদিন ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে তো

নিশ্চয় ভুলিবেন! হায় হায়, ঠাকুর এত সোজা কাজ করিতে বলিতেছেন, আর তিনি 'করিব' বলিতে পারিতেছেন না! গিরিশ বিষম ফাঁপরে পড়িয়া স্থির, নীরব রহিলেন, আর তাঁহার প্রাণের ভিতরে যেন একটা চিন্তা, ভয় ও নৈরাশ্যের ঝড় বহিতে লাগিল। ঠাকুর গিরিশের দিকে আবার চাহিয়া হাসিতে হাসিতে এইবার বলিলেন—"তুই বলবি, 'তাও যদি না পারি'—আচ্ছা, তবে আমায় বকল্‌মা[1] দে।" ঠাকুরের তখন অর্ধবাহ্যদশা!

বকলমা দেওয়ার পর গিরিশের মনের অবস্থা

কথাটি মনের মত হইল। গিরিশের প্রাণ ঠাণ্ডা হইল। শুধু ঠাণ্ডা হইল না, ঠাকুরের অপার দয়ার কথা ভাবিয়া তাঁহার উপর ভালবাসা ও বিশ্বাস একেবারে অনন্তধারে উছলিয়া উঠিল। গিরিশ ভাবিলেন, 'যাক্—নিয়মবন্ধনগুলিকে বাঘ মনে হয়, তাহার ভিতর আর পড়িতে হইল না। এখন যাহাই করি না কেন এইটি মনে দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করিলেই হইল যে, ঠাকুর তাঁহার অসীম দিব্যশক্তি বলে কোন-না-কোন উপায়ে তাঁহাকে উদ্ধার করিবেন।' শ্রীযুত গিরিশ তখন বকল্‌মা বা ঠাকুরের উপর সমস্ত ভার দেওয়ার এইটুকু অর্থই বুঝিলেন—বুঝিলেন তাঁহাকে নিজে চেষ্টা বা সাধন-ভজন করিয়া কোন বিষয় ছাড়িতে হইবে না; ঠাকুরই তাঁহার মন হইতে সকল বিষয় নিজশক্তিবলে ছাড়াইয়া

[1] অর্থাৎ ভার দাও। বিষয়কর্মে একব্যক্তি তাহার হইয়া কাজ করিবার ক্ষমতা বা অধিকার অপর কোন ব্যক্তিকে দিলে সে ব্যক্তি তাহার হইয়া সমস্ত লেন-দেন করে, রসিদ চিঠিপত্র লিখে এবং তাহার নামে ঐসকলে সহি করিয়া নিয়ে 'ব: (অর্থাৎ বকলম)—অমুক' বলিয়া নিজের নাম লিখিয়া দেয়।

লইবেন! কিন্তু নিয়মের বন্ধন গলায় পরা অসহ্য বোধ করিয়া তাহার পরিবর্তে যে তদপেক্ষা শতগুণে অধিক ভালবাসার বন্ধন স্বেচ্ছায় গলায় তুলিয়া লইলেন তাহা তখন বুঝিতে পারিলেন না। ভাল মন্দ যে অবস্থায় পড়ুন না কেন, যশ অপযশ যাহাই আসুক না কেন, দুঃখ-কষ্ট যতই উপস্থিত হউক না কেন, নিঃশব্দে তাহা সহ্য করা ভিন্ন তাহার বিরুদ্ধে তাঁহার যে আর বলিবার বা করিবার কিছুই রহিল না, সে কথা তখন আর তলাইয়া দেখিলেন না;—দেখিবার শক্তিও হইল না। অন্য সকল চিন্তা মন হইতে সরিয়া যাইয়া কেবল দেখিতে লাগিলেন—শ্রীরামকৃষ্ণের অপার করুণা! আর বাড়িয়া উঠিল—শ্রীরামকৃষ্ণকে ধরিয়া শতগুণে অহঙ্কার। মনে হইল—'সংসারে যে যা বলে বলুক, যতই ঘৃণা করুক, ইনি তো সকল সময়ে সকল অবস্থায় আমার—তবে আর কি? কাহাকে ডরাই?' ভক্তিশাস্ত্র[1] এ অহঙ্কারকে যে সাধনের মধ্যে গণ্য করেন এবং মানবের বহুভাগ্যে আসে বলেন—তাহাই বা তখন কেমন করিয়া জানিবেন? যাহাই হউক, শ্রীযুত গিরিশ এখন নিশ্চিন্ত এবং খাইতে-শুইতে বসিতে ঐ এক চিন্তা—'শ্রীরামকৃষ্ণ আমার সম্পূর্ণ ভার লইয়াছেন'—সর্বদা মনে উদিত থাকিয়া তাঁহাকে যে ঠাকুরের ধ্যান করাইয়া লইতেছে এবং তাঁহার সকল কর্ম ও মনোভাবের উপর একটা ছাপ দিয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়া আমূল পরিবর্তন আনিয়া দিতেছে তাহা বুঝিতে

বকলমা ভালবাসার বন্ধন

১ নারদ-ভক্তিসূত্র।

না পারিলেও সুখী—কারণ তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) যে তাঁহাকে ভালবাসেন এবং আপনার হইতেও আপনার !

ঠাকুর চিরকাল শিক্ষা দিয়াছেন, 'কখন কাহারও ভাব নষ্ট করিতে নাই' এবং প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঐরূপ ব্যবহারও নিত্য করিতেন। শ্রীযুত গিরিশকে পূর্বোক্ত ভাব দিয়া ধরিয়া এখন হইতে ঐ ভাবের উপযোগী শিক্ষা-সকলও তাঁহাকে দিতে লাগিলেন। একদিন শ্রীযুত গিরিশ ঠাকুরের সম্মুখে কোন একটি সামান্য বিষয়ে 'আমি করিব' বলায় ঠাকুর বলিয়া উঠিলেন, "ও কি গো? অমন করে 'আমি করব' বল কেন? যদি না করতে পার? বলবে—ঈশ্বরের ইচ্ছা হয় তো করবো।" গিরিশও বুঝিলেন, 'ঠিক কথা; আমি যখন ভগবানের উপর সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়াছি এবং তিনিও সেই ভার লইয়াছেন, তখন তিনি যদি ঐ কার্য আমার পক্ষে করা উচিত বা মঙ্গলকর বলিয়া করিতে দেন তবেই তো করিতে পারিব; নতুবা উহা কেমন করিয়া আপনার সামর্থ্যে করিতে পারিব?'—বুঝিয়া তদবধি আমি করিব, যাইব, ইত্যাদি বলা ও ভাবগুলো ত্যাগ করিতে লাগিলেন।

গিরিশের অতঃপর শিক্ষা

এইরূপে দিনের পর দিন যাইতে লাগিল। ক্রমে ঠাকুরের অদর্শন হইল; স্ত্রী-পুত্রাদির বিয়োগরূপ নানা দুঃখ-কষ্ট আসিয়া উপস্থিত হইল; তাঁহার মন কিন্তু পূর্বের ন্যায় প্রতি ব্যাপারে বলিয়া উঠিতে লাগিল—'তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণদেব) ঐরূপ হওয়া তোর পক্ষে মঙ্গলকর বলিয়াই ঐ সকল হইতে দিয়াছেন।

গিরিশের বকলমার গূঢ় অর্থবোধ

তুই তাঁহার উপর ভার দিয়াছিস্, তিনিও লইয়াছেন; কিন্তু কোন্ পথ দিয়া তিনি তোকে লইয়া যাইবেন, তাহা তো আর তোকে লেখাপড়া করিয়া বলেন নাই? তিনি এই পথই তোর পক্ষে সহজ বুঝিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে তোর 'না' বলিবার বা বিরক্ত হইবার তো কথা নাই। তবে কি তাঁহার উপর বকল্‌মা বা ভার দেওয়াটা একটা মুখের কথামাত্র বলিয়াছিলি?' ইত্যাদি। এইরূপে যত দিন যাইতে লাগিল ততই গিরিশের বকল্‌মা দেওয়ার গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম হইতে লাগিল। এখনই কি উহার সম্পূর্ণ অর্থ বুঝিতে পারা গিয়াছে? শ্রীযুত গিরিশকে জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "এখনও ঢের বাকি আছে! বকল্‌মা দেওয়ার ভিতর যে এতটা আছে তখন কি তা বুঝেছি! এখন দেখি যে সাধন-ভজন-জপ-তপরূপ কাজের একটা সময়ে অন্ত আছে, কিন্তু যে বকল্‌মা দিয়েছে তার কাজের আর অন্ত নাই—তাকে প্রতি পদে, প্রতি নিঃশ্বাসে দেখতে হয় তাঁর (ভগবানের) উপর ভার রেখে তাঁর জোরে পা-টি, নিঃশ্বাসটি ফেল্‌লে, না এই হতচ্ছাড়া 'আমি'টার জোরে সেটি কর্‌লে।"

অবতারেরাই বকল্‌মার ভাব লইতে পারেন.

বকল্‌মার প্রসঙ্গে নানা কথা মনে উদয় হইতেছে। জগতের ইতিহাসে দেখিতে পাই ভগবান যীশু, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণই কখন কখন কাহাকেও ঐরূপে অভয় দিয়াছেন। সাধারণ গুরুর ঐরূপ করিবার সামর্থ্য বা অধিকার নাই। সাধারণ গুরু বা সাধুরা মন্ত্র-তন্ত্র বা ক্রিয়াবিশেষ, যাহা দ্বারা তাঁহারা নিজে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করিয়াছেন, তাহাই বড জোর অপরকে

বলিয়া দিতে পারেন। অথবা পবিত্রভাবে নিজ জীবন যাপন করিয়া লোককে পবিত্রতার দিকে আকৃষ্ট করিতে পারেন। কিন্তু নানা বন্ধনে জড়ীভূত হইয়া মানুষ যখন একেবারে অসহায় অবস্থায় উপস্থিত হয়, যখন 'এইরূপ কর' বলিলে সে হতাশ হইয়া বলিয়া উঠে, 'করিব কিরূপে? করিবার শক্তি দাও তো করি', তখন তাহাকে সাহায্য করা সাধারণ গুরুর সাধ্যাতীত। 'তোমার দুষ্কৃতির সকল ভার লইলাম, আমিই তোমার হইয়া ঐ সকলের ফলভোগ করিব'—একথা মানবকে মানবের বলা ও তদ্রূপ করা সাধ্যাতীত। মানবহৃদয়ে ধর্মের ঐরূপ গ্লানি উপস্থিত হইলেই কৃপায় শ্রীভগবান অবতীর্ণ হন এবং তাহার হইয়া ফলভোগ করিয়া তাহাকে সেই বন্ধনের আবর্ত হইতে উদ্ধার করেন। কিন্তু ঐরূপ করিলেও তিনি তাহাকে একেবারে রেহাই দেন না। শিক্ষার নিমিত্ত তাহাকে দিয়া কিছু-না-কিছু করাইয়া লন। ঠাকুর যেমন বলিতেন—"তাঁদের (অবতারপুরুষদিগের) কৃপায় মানবের দশ জন্মের ভোগটা এক জন্মে হয়ে যায়।" ব্যক্তির সম্বন্ধে যেরূপ, জাতির সম্বন্ধেও উহা সেইরূপ সত্য। ইহাই গীতায়—বিশ্বরূপ-দর্শনের জন্য অর্জুনের দিব্যচক্ষুলাভ বলিয়া, পুরাণে—শ্রীভগবানের কৃপালাভ বলিয়া, বৈষ্ণবশাস্ত্রে—জগাই-মাধাইয়ের উদ্ধারসাধন বা পাষণ্ডদলন বলিয়া, এবং ক্রিশ্চান-ধর্মে—ঈশার অপরের ভোগটা নিজের ঘাড়ে লইয়া ভগবানের কোপশমন করা (Atonement) বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণজীবনে যদি ইহার আভাস না পাইতাম, তাহা

তদ্দৃষ্টান্ত

হইলে কথাটিতে যে সত্য আছে তাহা কখনই বুঝিতে পারিতাম না।

বকল্‌মা সম্বন্ধে ঠাকুরের দর্শন

কলিকাতার শ্যামপুকুরে চিকিৎসার জন্য আসিয়া ঠাকুর যখন থাকেন, তখন একদিন দেখিয়াছিলেন—তাঁহার নিজের সূক্ষ্মশরীরটা স্থূলশরীর হইতে বাহিরে আসিয়া বেড়াইয়া বেড়াইতেছে! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, "দেখলুম তার পিঠময় ঘা হয়েছে! ভাব্‌চি কেন এমন হোল? আর মা দেখিয়ে দিচ্ছে—যা তা করে এসে যত লোকে ছোঁয়, আর তাদের দুর্দশা দেখে মনে দয়া হয়—সেইগুলো (দুষ্কর্মের ফল) নিতে হয়! সেই সব নিয়ে নিয়ে ঐরূপ হয়েছে। সেইজন্যই তো (নিজের গলা দেখাইয়া) এই হয়েছে। নইলে এ শরীর কখনও কিছু অন্যায় করে নি—এত (রোগ) ভোগ কেন?" আমরা শুনিয়া অবাক! ভাবিতে লাগিলাম—বাস্তবিকই তবে একজন অপরের কৃতকর্মের ফলভোগ করিয়া তাহাকে ধর্মপথে অগ্রসর করিয়া দিতে পারে? অনেকে তখন ঠাকুরের ঐ কথা শুনিয়া তাঁহার প্রতি ভালবাসায় ভাবিয়াছিলেন—'হায় হায়, কেন আমরা ঠাকুরকে মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি নানা দুষ্কর্ম করিয়া আসিয়া ছুঁইয়াছি! আমাদের জন্য তাঁহার এত ভোগ, এত কষ্ট! আর কখনও ঠাকুরের দেবশরীর স্পর্শ করিব না।'

ঠাকুরের ধবলকুষ্ঠ আরোগ্য করা

এ সম্বন্ধে ঠাকুরের আর একটি কথা এখানে মনে পড়িতেছে। কোন সময় একটি কুষ্ঠরোগাক্রান্ত (ধবল বা শ্বেতকুষ্ঠ) ব্যক্তি আসিয়া ঠাকুরকে কাতর হইয়া ধরে ও বলে যে, তিনি একবার হাত বুলাইয়া দিলেই তাহার

ঐ রোগ হইতে নিষ্কৃতি হয়। ঠাকুর তাহার প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া বলেন, "আমি তো কিছু জানি না, বাবু; তবে তুমি বল্ছ, আচ্ছা, হাত বুলিয়ে দিচ্ছি। মার ইচ্ছা হয় তো সেরে যাবে।"—এই বলিয়া হাত বুলাইয়া দেন। সে দিন সমস্ত দিন ধরিয়া ঠাকুরের হাতে এমন যন্ত্রণা হয় যে, তিনি অস্থির হইয়া জগদম্বাকে বলেন, "মা, আর কখন এমন কাজ কর্‌ব না।" ঠাকুর বলিতেন, "তার রোগ সারিয়া গেল—কিন্তু তার ভোগটা (নিজের দেহ দেখাইয়া) এইটের উপর দিয়ে হ'য়ে গেল।" ঠাকুরের জীবনের ঐ সকল ঘটনা হইতেই মনে হয়, বেদ বাইবেল পুরাণ কোরান তন্ত্র মন্ত্র প্রভৃতি আধ্যাত্মিক শাস্ত্রসকল শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনালোক-সহায়ে বুঝিলে এ যুগে অতি সহজেই বুঝিতে পারা যাইবে। ঠাকুরও আমাদের বলিয়াছেন—"ওরে, নবাবি আমলের টাকা বাদশাই আমলে চলে না!"

বকল্‌মা দেওয়া সহজ নয়

আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়, বকল্‌মা দেওয়াটা বড় সোজা কথা—দিলেই হইল আর কি। মানুষ প্রবৃত্তির দাস, ধর্মকর্ম করিতে আসিয়াও কেবল সুবিধাই খোঁজে—কিরূপে এদিক-ওদিক, সংসারসুখ ও ভগবদানন্দ, দুইটাই পাইতে পারে তাহাই কেবল দেখিতে থাকে। সংসারের ভোগসুখগুলোকে এত মধুর, এত অমৃতোপম বলিয়া বোধ করে যে, সেগুলোকে ছাড়িতে হইবে মনে হইলেও দশদিক শূন্য দেখে, মনে করে তাহা হইলে কি লইয়া থাকিব! সেজন্য আধ্যাত্মিক জগতে বকল্‌মা দেওয়া চলে শুনিয়াই সে

লাফাইয়া উঠে! মনে করে, তবে আর কি?—আমি চুরি জুয়াচুরি বাটপারি যাহা ইচ্ছা তাহা করিয়া যতটা পারি সংসারে সুখভোগ করি আর শ্রীচৈতন্য, যীশু বা শ্রীরামকৃষ্ণ, আমি পরকালটায়—কারণ মরিতে তো একদিন হইবেই—যাহাতে সুখী হইতে পারি, তাহা দেখুন। সে তখন বোঝে না যে, উহা আর কিছুই নহে, কেবল পাজি মনের জুয়াচুরি—বোঝে না যে ঐরূপে সে নিরন্তর আপনাকে আপনি ঠকাইতেছে। বোঝে না যে উহা আর কিছুই নহে, কেবল আপনার দুষ্কৃতসকলের ভীষণ মূর্তি দেখিতে হইবে বলিয়া সাধ করিয়া চক্ষে ঠুলি পরিয়া সর্বনাশের দিকে অগ্রসর হওয়া—বোঝে না যে ঐ ঠুলি একদিন জোর করিয়া একজন খুলিয়া দিবে এবং সে অকূল পাথার দেখিবে—দেখিবে জুয়াচোরের বকল্‌মা কেহ লয় নাই! হায় মানব! কত রকমেই না তুমি আপনাকে আপনি ঠকাইতেছ এবং মনে করিতেছ যে, 'বড় জিতিয়াছি!' আর ধন্য মহামায়া! তুমি কি ভেল্কিই না মানবমনে লাগাইয়াছ! শ্রীরামপ্রসাদ স্বরচিত গীতে তোমায় সম্বোধন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই সম্পূর্ণ সত্য—

সাবাস্ মা দক্ষিণাকালী, ভুবন ভেল্কি লাগিয়ে দিলি
তোর ভেল্কির গুটি চরণ দুটি ভবের ভাগ্যে ফেলে দিলি।
এমন বাজিকরের মেয়ে, বাখলি বাবাবে পাগল সাজায়ে
নিজে গুণময়ী হয়ে পুরুষ প্রকৃতি হলি।
মনেতে তাই সন্দ করি, যে চরণ পায়নি ত্রিপুরারি,
প্রসাদ রে সেই চরণ পাবি?—তুইও বুঝি পাগল হলি!

বকল্‌মা অমনি দিলেই দেওয়া যায় না। নানা উদ্যম-অধ্যবসায়ের

ফলে মনে বকল্‌মা দিবার অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইলে, তখনই মানব উহা ঠিক ঠিক দিতে পারে; আর তখনই শ্রীভগবান তাহার ভার লইয়া থাকেন।

কোন্ অবস্থায় বকল্‌মা দেওয়া চলে

সুখী হইবার আশায় সংসারের নানাকাজে ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়ি করিয়া মানব যখন বাস্তবিকই দেখে—"প্রাণহীন ধরেছি ছায়ায়", সাধন-ভজন-জপ-তপ করিয়া মানব যখন প্রাণে প্রাণে বুঝে অনন্ত ভগবানকে পাইবার উহা কখনই উপযুক্ত মূল্য হইতে পারে না, অদম্য উদ্যমে পাহাড় কাটিয়া পথ করিয়া লইব ভাবিয়া সকল বিষয়ে লাগিয়া মানব যখন বুঝিতে পারে তাহার কোনও ক্ষমতাই নাই, তখন সে 'কে কোথায় আছ গো, রক্ষা কর' বলিয়া কাতর কণ্ঠে ডাকিতে থাকে, আর তখনই শ্রীভগবান তাহার বকল্‌মা লইয়া থাকেন! নতুবা সাধন ভজন করিতে বা শ্রীভগবানকে ডাকিতে আমার ভাল লাগে না, যথেচ্ছাচার করিতেই ভাল লাগে, অতএব তাহাই করিব, আর কেহ ঐ বিষয়ে প্রতিবাদ করিলে বলিব—'কেন? আমি তো ভগবানকে বকল্‌মা দিয়াছি? তিনি আমায় ঐরূপ করাইতেছেন তা কি করিব? মনটি কেন তিনি ফিরাইয়া দেন্ না?'—এ বকল্‌মা কেবল পরকে ফাঁকি দিবার এবং নিজেও ফাঁকিতে পড়িবার বকল্‌মা; উহাতে 'ইতো নষ্টস্ততো ভ্রষ্টঃ' হইতে হয়।

মনের জুয়াচুরি হইতে সাবধান

আর একদিক দিয়া কথাটির আলোচনা করিলে আরও পরিষ্কার বুঝিতে পারা যাইবে। আচ্ছা বুঝিলাম—তুমি বকল্‌মা দিয়াছ, তোমার শ্রীভগবানকে ডাকিবার বা সাধন-ভজন

করিবার কোনও আবশ্যকতা নাই। কিন্তু ঠিক ঠিক বকল্‌মা দিলে তোমার প্রাণে প্রাণে সর্বক্ষণ তাঁহার করুণার কথা উদয় হইতে থাকিবেই থাকিবে—মনে হইবে যে, এই অপার সংসারসমুদ্রে পড়িয়া এতদিন হাবু-ডুবু খাইতেছিলাম, আহা, তিনি আমায় কৃপা করিয়া উদ্ধার করিয়াছেন! বল দেখি, ঐরূপ অনুভবে তাঁহার উপর তোমার কতটা ভক্তি-ভালবাসার উদয় হইবে! তোমার হৃদয় তাঁহার উপর কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পূর্ণ হইয়া সর্বদাই যে তাঁহার কথা ভাবিতে ও তাঁহার নাম লইতে থাকিবে—উহা করিতে তোমাকে কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সর্পের ন্যায় ক্রূর প্রাণীও আশ্রয়দাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া বাস্তুসাপ হয় ও বাটির কাহাকেও দংশন করে না। তোমার হৃদয় কি উহা অপেক্ষাও নীচ যে, যিনি তোমার ইহকাল পরকালের ভার লইলেন, তত্রাচ তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ভালবাসায় পূর্ণ হইল না? অতএব বকল্‌মা দিয়া যদি দেখ—তোমার ভগবানকে ডাকিতে ভাল লাগে না, তাহা হইলে বুঝিও তোমার বকল্‌মা দেওয়া হয় নাই এবং তিনিও তোমার ভার গ্রহণ করেন নাই। 'বকল্‌মা দিয়াছি' বলিয়া আর আপনাকে ঠকাইও না এবং অপাপবিদ্ধ, নিষ্কলঙ্ক ভগবানে নিজকৃত দুষ্কৃতির কালিমা অর্পণ করিও না। উহাতে আপনারই সমূহ ক্ষতি ও অমঙ্গল। ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণের গোহত্যা' গল্পটি মনে রাখিও:

বকল্‌মার শেষ কথা

এক ব্রাহ্মণ অনেক যত্ন ও পরিশ্রমে একখানি সুন্দর বাগান করিয়াছিল। নানাজাতীয় ফল-ফুলের গাছ পুঁতিয়াছিল ও

সেগুলি দিন দিন নধর হইয়া বাড়িয়া উঠিতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণের আনন্দের আর সীমা ছিল না। এখন একদিন দরজা খোলা পাইয়া একটা গরু ঢুকিয়া সেই গাছগুলি মুড়াইয়া খাইতে লাগিল। ব্রাহ্মণ কার্যান্তরে গিয়াছিল। আসিয়া দেখে তখনও গরুটা গাছ খাইতেছে! বিষম কোপে তাড়া করিয়া সেটাকে যেমন এক ঘা লাঠি মারিয়াছে, আর অমনি মর্মস্থানে আঘাত লাগায় গরুটা মরিয়া গেল! ব্রাহ্মণের তখন প্রাণে ভয়—তাইতো হিন্দু হইয়া গোহত্যা করিলাম? গোহত্যার তুল্য যে পাপ নাই! ব্রাহ্মণ একটু-আধটু বেদান্ত পড়িয়াছিল। দেখিয়াছিল তাহাতে লেখা আছে যে, বিশেষ বিশেষ দেবতার শক্তিতে শক্তিমান হইয়া মানবের ইন্দ্রিয়সকল স্ব-স্ব কার্য করে। যথা—সূর্যের শক্তিতে চক্ষু দেখে, পবনের শক্তিতে কর্ণ শুনে, ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত কার্য করে, ইত্যাদি। ব্রাহ্মণের সেই কথাগুলি এখন মনে পড়ায় ভাবিল—'তবে তো আমি গোহত্যা করি নাই। ইন্দ্রের শক্তিতে হস্ত চালিত হইয়াছে—ইন্দ্রই তবে তো গোহত্যা করিয়াছে!' কথাটি মনে মনে পাকা করিয়া ব্রাহ্মণ নিশ্চিন্ত হইল।

ঠাকুরের 'ব্রাহ্মণ ও গোহত্যা'র গল্প

এদিকে গোহত্যা-পাপ ব্রাহ্মণের শরীরে প্রবেশ করিতে আসিল, কিন্তু ব্রাহ্মণের মন তাহাকে তাড়াইয়া দিল। বলিল, "যাও, এখানে তোমার স্থান নাই; গোহত্যা ইন্দ্র করিয়াছে, তাহার কাছে যাও।" কাজেই পাপ ইন্দ্রকে ধরিতে গেল। ইন্দ্র পাপকে বলিলেন, "একটু অপেক্ষা কর, আমি ব্রাহ্মণের

সহিত দুটো কথা কহিয়া আসি, তারপর আমায় ধরিও।' ঐকথা বলিয়া ইন্দ্র মানবরূপ ধারণ করিয়া ব্রাহ্মণের উদ্যানের ভিতর প্রবেশ করিলেন ও দেখিলেন ব্রাহ্মণ অদূরে দাঁড়াইয়া গাছপালার তদারক করিতেছে। ইন্দ্র উদ্যানের শোভা দেখিয়া ব্রাহ্মণের যাহাতে কানে যায় এমনভাবে প্রশংসা করিতে করিতে ধীরপদে ব্রাহ্মণের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। বলিলেন—"আহা, কি সুন্দর বাগান, কি রুচির সহিত গাছপালাগুলি লাগান হইয়াছে, যেখানে যেটি দরকার ঠিক সেখানে সেটি পোঁতা রহিয়াছে!" এই প্রকার বলিতে বলিতে ব্রাহ্মণের কাছে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"মহাশয়, বলিতে পারেন বাগানখানি কার? এমন সুন্দরভাবে গাছ-পালাগুলি কে লাগাইয়াছে?" ব্রাহ্মণ উদ্যানের প্রশংসা শুনিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল—"আজ্ঞা, এখানি আমার; আমিই এগুলি সব পুঁতিয়াছি। আসুন না, ভাল করিয়া বেড়াইয়া দেখুন না।" এই বলিয়া উদ্যান সম্বন্ধে নানাকথা বলিতে বলিতে ইন্দ্রকে উদ্যানমধ্যস্থ সব দেখাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং ক্রমে ভুলিয়া মৃত গরুটা যথায় পড়িয়াছিল তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তখন ইন্দ্র যেন একেবারে চমকিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"রাম, রাম, এখানে গোহত্যা করিল কে?" ব্রাহ্মণ এতক্ষণ উদ্যানের সকল পদার্থই 'আমি করিয়াছি, আমি করিয়াছি' বলিয়া আসিয়াছে; কাজেই গোহত্যা কে করিল জিজ্ঞাসায় বিষম ফাঁপরে পড়িয়া একেবারে নির্বাক—চুপ! তখন ইন্দ্র নিজরূপ পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণকে বলিলেন, "তবে রে ভণ্ড,

উদ্যানের যাহা কিছু ভাল সব তুমি করিয়াছ, আর গোহত্যাটাই কেবল আমি করিয়াছি, বটে? নে তোর গোহত্যা-কৃত পাপ!” এই বলিয়া ইন্দ্র অন্তর্হিত হইলেন এবং পাপও আসিয়া ব্রাহ্মণের শরীর অধিকার করিল।

যাক এখন বকল্‌মার কথা, আমরা পূর্বপ্রসঙ্গের অনুসরণ করি। ঠাকুরের প্রত্যেক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিলেই তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিবেন, ঠাকুরের কথাগুলির পূর্বে তাঁহারা যে অর্থগ্রহণে সমর্থ হইতেন, এখন যত দিন যাইতেছে তত সেইগুলির ভিতর আরও কত গভীর অর্থ তাঁহার কৃপায় বুঝিতে পারিতেছেন।

সাধকের মনের উন্নতির সহিত ঠাকুরের কথার গভীর অর্থবোধ

আবার ঠাকুরের অনেক কথা বা ব্যবহার, যাহার অর্থ আমরা তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই, কেবল হাঁ করিয়া শুনিয়া গিয়াছি মাত্র, তাহাদের ভিতর এখন অপূর্ব অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করিয়া অবাক হইয়া থাকিতে হয়! ঠাকুরের কথাই ছিল—“ওরে, কালে হবে, কালে বুঝবি। বিচিটা পুঁতলেই কি অমনি ফল পাওয়া যায়? আগে অঙ্কুর হবে, তারপর চারা গাছ হবে, তারপর সেই গাছ বড় হয়ে তাতে ফুল ধরবে, তারপর ফল—সেই রকম। তবে লেগে থাকতে হবে, ছাড়লে হবে না; এই গানটায় কি বলছে শোন।” এই বলিয়া ঠাকুর মধুর কণ্ঠে গান ধরিতেন—

‘কালে হবে’

হরিষে লাগি রহো রে ভাই।
তেরা বনত বনত বনি যাই—তেরা বিগড় বাত বনি যাই।
অঙ্কা তারে বঙ্কা তারে তারে সুজন কসাই
(আওর্) শুগা পড়ায়কে গণিকা তারে, তারে মীরাবাঈ।

দৌলত ছুনিয়া মাল খাজানা, বেনিয়া বয়েল চালাই
(আওর্) এক বাতকো টাণ্টা পড়ে তো খোঁজ খবর না পাই।
এর্‌সী ভক্তি কর ঘট ভিতর, ছোড় কপট চতুরাঈ
সেবা বন্দি আওব্ অধীন্‌তা সহজ মিলি রঘুরাঈ ॥

—গান গাহিয়া আবার বলিতেন, "তাঁর সেবা, বন্দনা ও অধীনতা—কি না দীনভাব, এই নিয়ে বিশ্বাস করে পড়ে থাকতে থাকতে সব হবে, তাঁর দর্শন পাওয়া যাবেই যাবে। তা' না করে ছেড়ে দিলে কিন্তু ঐ পর্যন্তই হ'ল। একজন চাকরি করে কষ্টে-স্হষ্টে কিছু কিছু করে টাকা জমাত। একদিন গুণে দেখে যে হাজার টাকা জমেছে। অমনি আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে মনে করলে, তবে আর কেন চাকরি করা? হাজার টাকা তো জমেছে, আর কি? এই বলে চাকরি ছেড়ে দিলে। এতটুকু আধার, এতটুকু আশা! ঐ পেয়েই সে ফুলে উঠলো, ধরাকে সরাখানা দেখতে লাগল। তারপর—হাজার টাকা খরচ হতে আর ক'দিন লাগে? অল্প দিনেই ফুরিয়ে গেল। তখন দুঃখে-কষ্টে আবার চাকরির জন্য ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াতে লাগল। ও রকম করলে চলবে না, তাঁর (ভগবানের) দ্বারে পড়ে থাকতে হবে; তবে তো হবে!"

সাধনে লাগিয়া থাকা আবশ্যক

আবার কখন কখন গানটির দ্বিতীয় চরণ—'তেরা বনত বনত বনি যাই' অর্থাৎ ভক্তি করিতে করিতে ফল পাওয়া যাইবে—গাহিতে গাহিতে বলিয়া উঠিলেন—"দূর শালা! 'বনত বনত' কি? অমন ম্যাদাটে

ম্যাদাটে ভক্তি ত্যাগ করা

ভক্তি করতে নাই। মনে জোর করতে হয়—এখনি হবে, এখনি তাঁকে পাব। ম্যাদাটে ভক্তির কর্ম কি তাঁকে পাওয়া ?"

ঠাকুরকে দেখিলেই বাস্তবিকই মনে হইত, যেন একটি জ্বলন্ত ভাবঘনমূর্তি !—যেন পুঞ্জীকৃত ধর্মভাবরাশি একত্র সম্বদ্ধ হইয়া জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে বলিয়াই আমরা তাঁহার একটা আকার ও রূপ দেখিতে পাইতেছি ! মনের ভাবপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটার পরিবর্তন হওয়ার কথা আমরা বলিয়াই থাকি ও কালে-ভদ্রে কখন একটু-আধটু প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি ; কিন্তু মনের ভাবতরঙ্গ যে শরীরে এতটা পরিবর্তন আনিয়া দিতে পারে, তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবি নাই। নির্বিকল্প সমাধিতে 'আমি'-জ্ঞানের একেবারে লোপ হইল—আর অমনি সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের হাতের নাড়ি, হৃদয়ের স্পন্দন, সব বন্ধ হইয়া গেল ; শ্রীযুত মহেন্দ্র লাল সরকার প্রভৃতি ডাক্তারেরা যন্ত্রসহায়ে পরীক্ষা করিয়াও হৃৎপিণ্ডের কার্য কিছুই পাইলেন না।[১] তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া জনৈক ডাক্তারবন্ধু ঠাকুরের চক্ষুর তারা বা মণি অঙ্গুলির দ্বারা স্পর্শ করিলেন—তথাচ উহা মৃত ব্যক্তির ন্যায় কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হইল না। 'সখীভাব'-সাধনকালে আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের দাসী ভাবিতে ভাবিতে মন তন্ময় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শরীরেও স্ত্রী-সুলভ

ভাবঘনমূর্তি ঠাকুরের প্রত্যেক ভাবের সহিত দৈহিক পরিবর্তন

১ গলরোগের চিকিৎসার জন্য শ্যামপুকুরের বাসায় যখন ঠাকুর থাকেন, তখন আমাদের সম্মুখে এই পরীক্ষা হয়।

ভাব, উঠা-বসা, দাঁড়ান, কথাকহা প্রভৃতি প্রত্যেক কার্যে এমন প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, শ্রীযুত মথুরানাথ মাড় প্রভৃতি যাহারা চব্বিশঘণ্টা ঠাকুরের সঙ্গে উঠা-বসা করিত, তাহারাও তাঁহাকে দেখিয়া অনেকবার কোন আগন্তুক স্ত্রীলোক হইবে বলিয়া ভ্রমে পড়িল। এইরূপ কত ঘটনাই না আমরা দেখিয়াছি ও ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে শুনিয়াছি—যাহাতে বর্তমান মনোবিজ্ঞান ও শারীরবিজ্ঞানের বাঁধা-ধরা নিয়মগুলিকে পাল্‌টাইয়া বাঁধিতে হয়। সে সব কথা বলিলেও কি লোকে বিশ্বাস করিবে?

ঠাকুরের সকলের সকলপ্রকার ভাব ধরিবার ক্ষমতা

কিন্তু সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয় দেখিয়াছি ঠাকুরের ভাবরাজ্যের সর্বত্র বিচরণ করিবার ক্ষমতা—ছোট-বড় সব রকম ভাব বুঝিতে পারা! বালক, যুবা, বৃদ্ধ সকলের মনোভাব—বিষয়ী, সাধু, জ্ঞানী, ভক্ত, স্ত্রী, পুরুষ সকলের হৃদ্‌গত ভাব ধরিয়া কে কোন্ পথে কতদূর ধর্মরাজ্যে অগ্রসর হইয়াছে, পূর্ব সংস্কারানুযায়ী ঐ পথ দিয়া অগ্রসর হইতে তাহার কিরূপ সাধনেরই বা বর্তমানে প্রয়োজন, সকল কথা বুঝিতে পারা ও তাহাদের প্রত্যেকের অবস্থানুযায়ী ঠিক ঠিক ব্যবস্থা করা! দেখিয়া শুনিয়া মনে হয়, ঠাকুর যেন মানবমনে যতপ্রকার ভাব উঠিয়াছে, উঠিতে পারে বা পরে উঠিবে, সে সকল ভাবই নিজ জীবনে অনুভব করিয়া বসিয়া আছেন এবং ঐ সকল ভাবের প্রত্যেকটি তাঁহার নিজের মনের ভিতর আবির্ভাব হইতে তিরোভাবকাল পর্যন্ত পর পর তাঁহার যে যে অবস্থা হইয়াছিল, তাহাও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্মরণ করিয়া রাখিতে পারিয়াছেন! আর

তজ্জন্যই ইতরসাধারণ মানব যে যখন আসিয়া যে ভাবের কথা বলিতেছে, নিজের ঐ সকল পূর্বানুভূত ভাবের সহিত মিলাইয়া তখনি তাহা ধরিতেছেন, বুঝিতেছেন ও তদুপযোগী বিধান করিতেছেন। সকল বিষয়েই যেন এইরূপ। মায়ামোহ, সংসার-তাড়না, ত্যাগ-বৈরাগ্যের অনুষ্ঠান প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেহ কোন অবস্থায় পড়িয়া উহা হইতে উদ্ধার হইবার পথ খুঁজিয়া না পাইয়া কাতর-জিজ্ঞাসু হইয়া আসিলে ঠাকুর পথের সন্ধান তো দিয়া দিতেনই, আবার অনেক সময়েই সঙ্গে সঙ্গে নিজের ঐ অবস্থায় পড়িয়া যেরূপ অনুভূতি হইয়াছিল তাহাও বলিতেন। বলিতেন, "ওগো, তখন এইরূপ হইয়াছিল ও এইরূপ করিয়াছিলাম" ইত্যাদি। বলিতে হইবে না—ঐরূপ করায় জিজ্ঞাসুর মনে কত ভরসার উদয় হইত এবং ঠাকুর তাহার জন্য যে পথ নির্দিষ্ট করিয়া দিতেন, কতদূর বিশ্বাস ও উৎসাহে সে সেই পথে অগ্রসর হইত! শুধু তাহাই নহে, এইরূপে নিজ জীবনের ঘটনা বলায় জিজ্ঞাসুর মনে হইত, ঠাকুর তাহাকে কত ভালবাসেন!—আপনার মনের কথাগুলি পর্যন্ত বলেন! দুই একটি দৃষ্টান্তেই বিষয়টি সম্যক্ বুঝিতে পারা যাইবে।

সিঁদুরিয়াপটির শ্রীযুত মণিমোহন মল্লিকের একটি উপযুক্ত পুত্রের মৃত্যু হইল। মণিমোহন পুত্রের সংকার করিয়াই ঠাকুরের নিকট আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে অভিবাদন করিয়া বিমর্ষভাবে ঘরের একপাশে বসিলেন। দেখিলেন, ঘরে স্ত্রী-পুরুষ অনেকগুলি জিজ্ঞাসু ভক্ত বসিয়া রহিয়াছেন এবং ঠাকুর তাঁহাদের

১ম দৃষ্টান্ত—মণিমোহনের পুত্রশোকের কথা

সহিত নানা সৎপ্রসঙ্গ করিতেছেন। বসিবার অল্পক্ষণ পরেই ঠাকুরের দৃষ্টি তাঁহার উপর পড়িল এবং ঘাড় নাড়িয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি গো? আজ এমন শুকনো দেখছি কেন?"

মণিমোহন বাষ্পগদ্গদ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—(পুত্রের নাম করিয়া) অমুক আজ মারা পড়িয়াছে।

বৃদ্ধ মণিমোহনের সেই রুক্ষবেশ ও শোকনিরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনিয়া গৃহাভ্যন্তরস্থ সকলেই স্তম্ভিত, নীরব! সকলেই বুঝিলেন, বৃদ্ধের হৃদয়ের সেই গভীর মর্মবেদনা ও উথলিত শোকাবেগ বাক্যে রুদ্ধ হইবার নহে। তথাচ বৃদ্ধের বিলাপ ও ক্রন্দনে ব্যথিত হইয়া—সংসারের ধারাই ঐ প্রকার, সকলকেই একদিন মরিতে হইবে, যাহা হইয়াছে সহস্র ক্রন্দনেও তাহা ফিরিবার নহে, অতএব শোক পরিত্যাগ কর, সহ্য কর—এইরূপ নানা কথায় তাঁহাকে শান্ত করিতে লাগিলেন। সৃষ্টির প্রাক্কাল হইতেই মানব শোকসন্তপ্ত নরনারীকে ঐ সকল কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিয়া আসিতেছে; কিন্তু হায়, কয়টা লোকের প্রাণ তাহাতে শান্ত হইতেছে? কেনই বা হইবে? মন, মুখ এবং অনুষ্ঠিত কর্ম—তিনটি পদার্থ একই ভাবে ভাবিত থাকিলে তবেই আমাদের উচ্চারিত বাক্যসমূহ অপরের প্রাণস্পর্শ করিয়া তাহাতে সমভাবের তরঙ্গ উত্থাপিত করিতে পারে। এখানে যে তাহার একান্তাভাব! আমরা মুখে সংসার অনিত্য বলিয়া প্রতি চিন্তায় ও কার্যে তাহার বিপরীত অনুষ্ঠান করিয়া থাকি; নিশার স্বপ্নসম সংসারটা অনিত্য বলিয়া ভাবিতে অপরকে উপদেশ করিয়া নিজে সর্বদা প্রাণে প্রাণে উহাকে নিত্য বলিয়া ভাবি এবং

চিরকালের মত এখানে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকি? আমাদের কথায় সে শক্তি কোথা হইতে আসিবে?

অপর সকলে মণিমোহনকে ঐরূপে নানা কথা কহিলেও ঠাকুর এক্ষেত্রে অনেকক্ষণ কোন কথাই না কহিয়া মণিমোহনের শোকোচ্ছ্বাস কেবল শুনিয়াই যাইতে লাগিলেন। তাঁহার তখনকার সেই উদাসীন ভাব দেখিয়া কেহ কেহ বিস্মিত হইয়া ভাবিতেও লাগিলেন—ইঁহার হৃদয় কি কঠোর, কি করুণাশূন্য!

বৃদ্ধের কথা শুনিতে শুনিতে কতক্ষণ পরে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশা প্রাপ্ত হইলেন এবং সহসা তাল ঠুকিয়া দাঁড়াইয়া শ্রীযুক্ত মণিমোহনকে লক্ষ্য করিয়া অপূর্ব তেজের সহিত গান ধরিলেন—

জীব সাজ সমরে।
ঐ দেখ্ রণবেশে কাল প্রবেশে তোর ঘরে।
আরোহণ করি মহাপুণ্য-রথে ভজন-সাধন দুটো অশ্ব জুড়ে তাতে
দিয়ে জ্ঞান ধনুকে টান ভক্তি-ব্রহ্মবাণ সংযোগ কর রে।
আর এক যুক্তি আছে শুন সুসঙ্গতি,
সব শত্রু নাশের চাইনে রথরথী
রণভূমি যদি করেন দাশরথি ভাগীরথীর তীরে।

গানের বীরত্বব্যঞ্জক সুর ও তদনুরূপ অঙ্গভঙ্গি ঠাকুরের নয়ন হইতে নিঃসৃত বৈরাগ্য ও তেজের সহিত মিলিত হইয়া সকলের প্রাণে তখন এক অপূর্ব আশা ও উত্তমের স্রোত প্রবাহিত করিল। সকলেরই মন তখন শোক-মোহের রাজ্য হইতে উত্থিত হইয়া এক অপূর্ব ইন্দ্রিয়াতীত, সংসারাতীত, বিমল ঈশ্বরীয় আনন্দে, পূর্ণ হইল। মণিমোহনও উহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এখন শোক-তাপ ভুলিয়া স্থির, গম্ভীর, শান্ত।

গীত সাঙ্গ হইল—কিন্তু গীতোক্ত কয়েকটি বাক্যের সহায়ে ঠাকুর যে দিব্য ভাবতরঙ্গ উত্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহাতে ঘর অনেকক্ষণ অবধি জমজম করিতে লাগিল। ঈশ্বরই একমাত্র আপনার, মন-প্রাণ তাঁহাকে অর্পণ করিলাম—তিনি কৃপা করুন, দর্শন দিন—এইভাবে আত্মহারা হইয়া সকলে স্থির হইয়া বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুরের সমাধিভঙ্গ হইলে তিনি মণিমোহনের নিকটে বসিয়া বলিতে লাগিলেন—

"আহা! পুত্রশোকের মত কি আর জ্বালা আছে? খোলটা (দেহ) থেকে বেরোয় কি না? খোলটার সঙ্গে সম্বন্ধ—যত দিন খোলটা থাকে ততদিন থাকে।"

এই বলিয়া ঠাকুর নিজ ভ্রাতৃষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যুর কথা দৃষ্টান্ত-স্বরূপে তাহাকে বলিতে লাগিলেন। এমন বিমর্ষ-গম্ভীরভাবে ঠাকুর কথাগুলি বলিতে লাগিলেন যে, স্পষ্ট বোধ হইতে লাগিল তিনি যেন আপনার আত্মীয়ের মৃত্যু পুনরায় চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছেন! বলিলেন, "অক্ষয় মোলো—তখন কিছু হ'ল না। কেমন করে মানুষ মরে, বেশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম। দেখলুম— যেন খাপের ভেতর তলোয়ারখানা ছিল, সেটাকে খাপ থেকে বার করে নিলে; তলোয়ারের কিছু হলো না—যেমন তেমনি থাকল, খাপটা পড়ে রইল। দেখে খুব আনন্দ হলো—খুব হাসলুম, গান করলুম, নাচলুম। তার শরীরটাকে তো পুড়িয়ে-ঝুড়িয়ে এল। তার পরদিন (ঘরের পূবে, কালীবাড়ীর উঠানের সাম্‌নের বারাণ্ডার দিকে দেখাইয়া) ঐখানে দাঁড়িয়ে আছি আর দেখছি কি, যেন প্রাণের ভিতরটায় গামছা

'যেমন নিংড়ায় তেমনি নেংড়াচ্চে, অক্ষয়ের জন্ম প্রাণটা এমনি কচ্চে! ভাবলুম, মা, এখানে (আমার) পোঁদের কাপড়ের সঙ্গেই সম্বন্ধ নেই, তা ভাইপোর সঙ্গে তো কতই ছিল! এখানেই (আমার) যখন এরকম হচ্চে তখন গৃহীদের শোকে কি না হয়!—তাই দেখাচ্ছিস্, বটে!"

কিছুক্ষণ পরে ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, "তবে কি জান? যারা তাঁকে (ভগবানকে) ধরে থাকে তারা এই বিষম শোকেও একেবারে তলিয়ে যায় না। একটু নাড়াচাড়া খেয়েই সাম্‌লে যায়। চুনোপুঁটির মত আধারগুলো একেবারে অস্থির হয়ে ওঠে বা তলিয়ে যায়। দেখনি? গঙ্গায় ষ্টীমারগুলো গেলে জেলেডিঙ্গিগুলো কি করে? মনে হয় যেন একেবারে গেল—আর সামলাতে পারলে না। কোনখানা বা উলটেই গেল! আর বড় বড় হাজারমুণে কিস্তিগুলো দু'চারবার টাল্-মাটাল্ হয়েই যেমন তেমনি—স্থির হলো। দু'চারবার নাড়াচাড়া কিন্তু খেতেই হবে।"

আবার কিছুক্ষণ বিমর্ষ-গম্ভীরভাবে থাকিয়া ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, "কয়দিনের জন্যেই বা সংসারের এ সকলের (পুত্রাদির) সঙ্গে সম্বন্ধ! মানুষ সুখের আশায় সংসার করতে যায়—বিয়ে করলে, ছেলে হলো, সেই ছেলে আবার বড় হলো, তার বিয়ে দিলে—দিন কতক বেশ চল্‌লো। তারপর এটার অসুখ, ওটা মলো, এটা ব'য়ে গেল—ভাবনায়, চিন্তায় একেবারে ব্যতিব্যস্ত; যত রস মরে তত একেবারে 'দশ ডাক' ছাড়তে থাকে। দেখনি?—ভিয়েনের উনুনে কাঁচা

সুঁদরীর চেলাগুলো প্রথমটা বেশ জ্বলে। তারপর কাঠখানা যত পুড়ে আসে কাঠের সব রসটা পেছনের দিক দিয়ে ঠেলে বেরিয়ে গ্যাঁজলার মত হয়ে ফুটতে থাকে আর চুঁ-চাঁ, ফুস্-ফাস্ নানারকম আওয়াজ হতে থাকে—সেই রকম।" এইপ্রকারে সংসারের অনিত্যতা ও অসারতা এবং শ্রীভগবানের শরণাপন্ন হওয়াতেই একমাত্র সুখ—ইত্যাদি বিষয়ে নানাকথা কহিয়া মণিমোহনকে বুঝাইতে লাগিলেন। মণিমোহনও সামলাইয়া বলিলেন, "এই-জন্যই তো আপনার কাছে ছুটে এলুম। বুঝলুম—এ জ্বালা আর কেউ শান্ত করতে পারবে না।"

আমরা তখন ঠাকুরের এই অদৃষ্টপূর্ব ব্যবহার দেখিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—ইঁহাকেই আমরা পূর্বে কঠোর উদাসীন ভাবিতেছিলাম। যিনি যথার্থ মহৎ, তাঁহার ছোট ছোট কাজ-গুলিও অপর সাধারণের ন্যায় হয় না। ছোট-বড় প্রত্যেক কার্যেই তাঁহার মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। এইমাত্র কিছুক্ষণ পূর্বে সমাধি বা ঈশ্বরের সহিত নৈকট্য-উপলব্ধিতে যাঁহার হৃদয়ের স্পন্দন পর্যন্ত রহিত হইয়া গিয়াছিল, ইনি কি তিনি? সেই ঠাকুরই কি বাস্তবিক মণিমোহনের অবস্থার সহিত সহানুভূতিতে একেবারে সাধারণ মানবের ন্যায় হইয়াছেন? 'মায়া হায়'—ছোট কথা বলিয়া বৃদ্ধের কথা ইনি তো উড়াইয়া দিতে পারিতেন? সে ক্ষমতা যে ইঁহার নাই তাহা তো নহে? কিন্তু ঐরূপে মহত্ত্বখ্যাপন করিলে বুঝিতাম, ইনি বড় হন বা আর যাহা কিছু হন, লোকগুরু —জগদ্‌গুরু ঠাকুর নহেন। বুঝিতাম, মানবসাধারণের ভাব বুঝিবার ইঁহার ক্ষমতা নাই এবং বলিতাম, স্ত্রী-পুত্রের প্রতি

:মত্তায় দুর্বল মানব আমাদের মত অসহায় অবস্থায় ইনি যদি একবার পড়িতেন, তবে কেমন করিয়া মায়ার খেলায় উদাসীন থাকিতে পারিতেন তাহা দেখিতাম!

পরক্ষণেই আবার হয়তো কোন যুবক আসিয়া বিষণ্ণচিত্তে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিল, "মশায় কাম কি করে যায়? এত চেষ্টা করি, তবুও মধ্যে মধ্যে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য ও কুভাব মনে উপস্থিত হয়ে বড় অশান্তি আসে।"

২য় দৃষ্টান্ত—কাম দূর করা সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

ঠাকুর—"ওরে, ভগবদ্দর্শন না হলে কাম একেবারে যায় না। তা (ভগবানের দর্শন) হলেও শরীর যতদিন থাকে ততদিন একটু-আধটু থাকে, তবে মাথা তুলতে পারে না। তুই কি মনে করিস্ আমারই একেবারে গেছে? এক সময়ে মনে হয়েছিল যে কামটাকে জয় করেছি। তারপর পঞ্চবটীতে বসে আছি, আর এমনি কামের তোড় এল যে আর যেন সামলাতে পারি নি। তারপর ধুলোয় মুখ ঘস্‌ড়ে কাঁদি আর মাকে বলি, 'মা, বড় অন্যায় করেছি, আর কখন ভাবব না যে কাম জয় করেছি' —তবে যায়। কি জানিস্—(তোদের) এখন যৌবনের বন্যা এসেছে! তাই বাঁধ দিতে পাচ্ছিস্ না। বান যখন আসে তখন কি আর বাঁধ-টাধ মানে? বাঁধ উছলে ভেঙ্গে জল ছুটতে থাকে। লোকের ধান-ক্ষেতের ওপর এক বাঁশ সমান জল দাঁড়িয়ে যায়! তবে বলে—কলিতে মনের পাপ, পাপ নয়। আর মনে একবার আধবার কখন কুভাব এসে পড়ে তো—'কেন এল' বলে বসে বসে তাই ভাবতে থাক্‌বি কেন? ওগুলো কখন কখন শরীরের ধর্মে

আসে যায়—শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টার মত মনে করবি। শৌচ-পেচ্ছাপের চেষ্টা হয়েছিল বলে লোকে কি মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে? সেই রকম ঐ ভাবগুলোকে অতি সামান্য, তুচ্ছ, হেয় জ্ঞান করে মনে আর আন্‌বি না। আর তাঁর নিকটে খুব প্রার্থনা করবি, হরিনাম করবি ও তাঁর কথাই ভাববি। ও ভাবগুলো এল কি গেল—সেদিকে নজর দিবি না। এরপর ওগুলো ক্রমে ক্রমে বাঁধ মান্‌বে।" যুবকের কাছে ঠাকুর যেন এখন যুবকই হইয়া গিয়াছেন!

৩য় দৃষ্টান্ত—যোগানন্দকে ঐ সম্বন্ধে উপদেশ

এই প্রসঙ্গে শ্রীযুত যোগেনের কথা মনে পড়িতেছে স্বামী যোগানন্দ, যাঁহার মত ইন্দ্রিয়জিৎ পুরুষ বিরল দেখিয়াছি, দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে একদিন ঐ প্রশ্ন করেন। তাঁহার বয়স তখন অল্প, বোধ হয় ১৪।১৫ হইবে এবং অল্পদিনই ঠাকুরের নিকট গতায়াত করিতেছেন। সে সময় নারায়ণ নামে এক হঠযোগীও দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীতলে কুটীরে থাকিয়া নেতি-ধৌতি[১] ইত্যাদি ক্রিয়া দেখাইয়া কাহাকেও কাহাকেও কৌতূহলাকৃষ্ট করিতেছে। যোগেন স্বামীজী বলিতেন, তিনিও তাহাদের মধ্যে একজন ছিলেন এবং ঐ সকল ক্রিয়া দেখিয়া ভাবিয়াছিলেন, ঐ

[১] দুই অঙ্গুলি চওড়া ও দশ-পনর হাত লম্বা একটা ন্যাকড়ার ফালি ভিজাইয়া আস্তে আস্তে গিলিয়া ফেলা ও পরে তাহা আবার টানিয়া বাহির করার নাম নেতি। আর ২।৩ সের জল খাইয়া পুনরায় বমন করিয়া ফেলার নাম ধৌতি। গুহ্যদ্বার দিয়া জল টানিয়া বাহির করাকেও ধৌতি বলে। হঠযোগীরা এইরূপে শরীর-মধ্যস্থ সমস্ত শ্লেষ্মাদি বাহির করিয়া ফেলেন। তাঁহারা বলেন—ইহাতে শরীরে রোগ আসিতে পারে না এবং উহা দৃঢ় হয়।

সকল না করিলে বোধ হয় কাম যায় না এবং ভগবদ্দর্শনও হয় না। তাই প্রশ্ন করিয়া বড় আশায় ভাবিয়াছিলেন, ঠাকুর কোন একটা আসন-টাসন বলিয়া দিবেন, বা হরিতকী কি অন্য কিছু খাইতে বলিবেন, বা প্রাণায়ামের কোন ক্রিয়া শিখাইয়া দিবেন। যোগেন স্বামীজী বলিতেন—"ঠাকুর আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, 'খুব হরিনাম করবি, তা হলেই যাবে।' কথাটা আমার একটুও মনের মত হলো না। মনে মনে ভাবলুম—উনি কোন ক্রিয়া-ট্রিয়া জানেন না কিনা, তাই একটা যা তা বলে দিলেন। হরিনাম করলে আবার কাম যায়! তা হলে এত লোক তো কচ্চে, যাচ্চে না কেন? তারপর একদিন কালীবাটীর বাগানে এসে ঠাকুরের কাছে আগে না গিয়ে পঞ্চবটীতে হঠযোগীর কাছে দাঁড়িয়ে তার কথাবার্তা মুগ্ধ হয়ে শুনছি, এমন সময় দেখি ঠাকুর স্বয়ং সেখানে এসে উপস্থিত! আমাকে দেখেই ডেকে আমার হাত ধরে নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, 'তুই ওখানে গিয়েছিলি কেন? ওখানে যাস্ নি। ওসব (হঠযোগের ক্রিয়া) শিখলে ও করলে শরীরের উপরেই মন পড়ে থাকবে। ভগবানের দিকে যাবে না।' আমি কিন্তু ঠাকুরের কথাগুলি শুনে ভাবলুম—পাছে আমি ওঁর (ঠাকুরের) কাছে আর না আসি, তাই এই সব বলছেন। আমার বরাবরই আপনাকে বড় বুদ্ধিমান বলে ধারণা, কাজেই বুদ্ধির দৌড়ে ঐরূপ ভাবলুম আর কি! আমি তাঁর কাছে আসি বা না-ই আসি তাতে তাঁর (ঠাকুরের) যে কিছুই লাভ-লোকসান নাই—একথা তখন মনেও এল না! এমন পাজী সন্দিগ্ধ মন ছিল! ঠাকুরের কৃপার শেষ নাই, তাই এত

সব অন্যায় ভাব মনে এনেও স্থান পেয়েছিলাম। তারপর ভাবলুম —উনি (ঠাকুর) যা বলেছেন, তা করেই দেখি না কেন—কি হয়? এই বলে একমনে খুব হরিনাম করতে লাগলুম। আর বাস্তবিকই অল্পদিনেই, ঠাকুর যেমন বলেছিলেন, প্রত্যক্ষ ফল পেতে লাগলুম।”

এইরূপে সকলের সকল অবস্থা ও ভাব ধরিবার কথার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। সিঁদুরিয়াপটির মল্লিক মহাশয়ের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। তাঁহার ভক্তিমতী জনৈকা আত্মীয়াও ঠাকুরের নিকট যাওয়া-আসা করিতেন। একদিন আসিয়া তিনি বিশেষ কাতরভাবে জানাইলেন যে, ভগবানের ধ্যান করিতে বসিলে সংসারের চিন্তা, এর কথা, তার মুখ ইত্যাদি মনে পড়িয়া বড়ই অশান্তি আসে। ঠাকুর অমনি তাঁর ভাব ধরিলেন; বুঝিলেন, ইনি কাহাকেও ভালবাসেন—যাহার কথা ও মুখ মনে পড়ে। জিজ্ঞাসা করিলেন, “কার মুখ মনে পড়ে গো? সংসারে কাকে ভালবাস বল দেখি?” তিনি উত্তর করিলেন, “একটি ছোট ভ্রাতুষ্পুত্রকে”—যাহাকে তিনি মানুষ করিতেছিলেন। ঠাকুর বলিলেন, “বেশ তো, তার জন্য যা কিছু করবে, তাকে খাওয়ান-পরান ইত্যাদি সব, গোপাল ভেবে করো। যেন গোপাল-রূপী ভগবান তার ভেতরে রয়েছেন—তুমি তাকেই খাওয়াচ্ছ, পরাচ্ছ, সেবা করচ—এই রকম ভাব নিয়ে করো। মানুষের করচি ভাববি কেন গো? যেমন ভাব তেমন লাভ।” শুনিতে পাই ঐরূপ করার ফলে অল্পদিনেই তাঁহার বিশেষ মানসিক উন্নতি, এমন কি ভাবসমাধি পর্যন্ত হইয়াছিল।

৪র্থ দৃষ্টান্ত—মণিমোহনের আত্মীয়ার কথা।

ঠাকুরের নিজের পুরুষ শরীর ছিল, সেজন্ত তাঁহার পুরুষের ভাব বুঝা ও ধরাটা কতক বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু স্ত্রীজাতি—কোমলতা, সন্তানবাৎসল্য প্রভৃতি মনোভাবের জন্ত ভগবান যাহাদের পুরুষ অপেক্ষা একটা অঙ্গই অধিক দিয়াছেন—তাহাদের সকল ভাব ঠাকুর কি করিয়া ঠিক ঠিক ধরিতেন, তাহা ভাবিলে আর আশ্চর্যের সীমা থাকে না। ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তেরা বলেন, "ঠাকুরকে আমাদের পুরুষ বলিয়াই অনেক সময় মনে হইত না। মনে হইত—যেন আমাদেরই একজন! সেজন্ত পুরুষের নিকটে আমাদের যেমন সঙ্কোচ-লজ্জা আসে, ঠাকুরের নিকটে তাহার কিছুই আসিত না। যদি বা কখন আসিত তো তৎক্ষণাৎ আবার ভুলিয়া যাইতাম ও আবার নিঃসঙ্কোচে মনের কথা খুলিয়া বলিতাম।"

ঠাকুরের স্ত্রী-জাতির সর্বপ্রকার মনোভাব ধরিবার ক্ষমতা

'ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সখী বা দাসী আমি'—এই ভাবনা দীর্ঘকাল ধরিয়া ভাবিয়া ভাবিয়া তন্ময় হইয়া 'পুরুষ আমি' এ ভাবটি ঠাকুর একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন বলিয়াই কি ঐরূপ হইত? পতঞ্জলি তাঁহার যোগসূত্রে বলিয়াছেন, 'তোমার মন হইতে হিংসা যদি একেবারে ত্যাগ হয়, তো মানুষের তো কথাই নাই, জগতে কেহই—বাঘ সাপ প্রভৃতিও—তোমাকে আর হিংসা করিবে না! তোমাকে দেখিয়া তাহাদের মনে হিংসা-প্রবৃত্তিরই উদয় হইবে না।' হিংসার ন্যায় কাম-ক্রোধাদি অন্ত সকল বিষয়েও তদ্রূপ বুঝিতে হইবে। পুরাণে এ বিষয়ের অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি বলিলেই চলিবে। মায়াহীন নিষ্কলঙ্ক যুবক শুক ভগবদ্ভাবে অহরহঃ

উহার কারণ

নিমগ্ন থাকিয়া সংসার ছাড়িয়া যাইতেছেন, আর বৃদ্ধ পিতা ব্যাস পুত্রমায়ায় অন্ধ হইয়া 'কোথা যাও, কোথা যাও' বলিতে বলিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিয়াছেন। পথিমধ্যে সরোবর-তীরে বস্ত্র রাখিয়া অপ্সরাগণ স্নান করিতেছিলেন। শুককে দেখিয়া তাঁহাদের মনে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বা লজ্জার উদয় হইল না—যেমন স্নান করিতে-ছিলেন তেমনই করিতে লাগিলেন। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যাস তথায় উপস্থিত হইবামাত্র সকলে সসম্ভ্রমে শরীর বস্ত্রাচ্ছাদিত করিলেন! ব্যাস ভাবিলেন—'এতো বেশ! আমার যুবক পুত্র অগ্রে যাইল, তাহাতে কেহ একটু নড়িলও না, আর আমি বৃদ্ধ, আমাকে দেখিয়া এত লজ্জা!' কারণ জিজ্ঞাসায় রমণীরা বলিলেন, "শুক এত পবিত্র যে, 'তিনি আত্মা' এই চিন্তাই তাঁহার সর্বক্ষণ রহিয়াছে! তাঁহার নিজের স্ত্রীশরীর কি পুরুষশরীর সে বিষয়ে আদৌ হুঁশই নাই! কাজেই তাঁহাকে দেখিয়া লজ্জা আসিল না। আর তুমি বৃদ্ধ, রমণীর হাবভাব কটাক্ষের অনেক পরিচয় পাইয়াছ ও রূপলাবণ্যের অনেক বর্ণনাও করিয়াছ; তোমার শুকের মত স্ত্রীপুরুষে আত্মদৃষ্টি নাই এবং হইবেও না; কাজেই তোমাকে দেখিয়া আমাদের পুরুষবুদ্ধির উদয় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে লজ্জা আসিল।"

স্ত্রীজাতির ঠাকুরের নিকট সর্বথা নিঃসঙ্কোচ ব্যবহারের কারণ

ঠাকুরের সম্বন্ধে ঠিক ঐ কথাই মনে হয়। তাঁহার জলন্ত আত্মজ্ঞান ও স্ত্রী-পুরুষ সকলের ভিতর, সর্বভূতে আত্মদৃষ্টি, তাঁহার নিকটে যতক্ষণ থাকা যাইত ততক্ষণ সকলের মন এত উচ্চে উঠাইয়া রাখিত যে, 'আমি পুরুষ', 'উনি স্ত্রী'—এসকল ভাব অনেক সময়ে মনেই উঠিত না। কাজেই পুরুষের ন্যায় স্ত্রীজাতিরও

তাঁহার নিকট সঙ্কোচাদি না হইবারই কথা। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের সংসর্গে ঐ আত্মদৃষ্টি তাঁহাদের ভিতর তৎকালে এত বদ্ধমূল হইয়া যাইত যে, যে-সকল কাজকে মেয়েরা অসীম সাহসের কাজ বলেন ও কখনও কাহারও দ্বারা আদিষ্ট হইয়া করিতে পারেন না, ঠাকুরের কথায় সেই-সকল কাজ অবাধে অনায়াসে সম্পন্ন করিয়া আসিতেন! সম্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোক যাঁহারা গাড়ী-পালকি ভিন্ন কোথায়ও কখনও গমনাগমন করিতেন না, ঠাকুরের আজ্ঞায় তাঁহারাও কখন কখন তাঁহার সহিত দিনের বেলায় পদব্রজে সদর রাস্তা দিয়া গঙ্গাতীর পর্যন্ত অনায়াসে হাঁটিয়া আসিয়া নৌকা করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে গমন করিয়াছেন; শুধু তাহাই নহে, সেখানে যাইয়া হয়তো আবার ঠাকুরের আজ্ঞায় নিকটস্থ বাজার হইতে বাজার করিয়া আনিয়াছেন এবং সন্ধ্যার সময় পুনরায় হাঁটিয়া কলিকাতায় নিজ বাড়ীতে ফিরিয়াছেন। এ বিষয়ে দু একটি দৃষ্টান্ত এখানে দিলেই কথাটি বেশ বুঝিতে পারা যাইবে।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ভাদ্র বা আশ্বিন মাস। শ্রীশ্রীমা তখন পিত্রালয় জয়রামবাটীতে গিয়াছেন। শ্রীযুক্ত বলরাম বসু তাঁহার পিতার সহিত বৃন্দাবন গিয়াছেন। সঙ্গে শ্রীযুত রাখাল (ব্রহ্মানন্দ স্বামীজি), শ্রীযুত গোপাল (অদ্বৈতানন্দ স্বামী) প্রভৃতি ও অন্যান্য অনেকগুলি স্ত্রী-পুরুষ গিয়াছেন। বাগবাজারের একটি সম্রান্তবংশীয়া স্ত্রীলোকের—যিনি ঠাকুরকে কখন দেখেন নাই, কথামাত্রই শুনিয়াছেন—ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল; পরিচিতা

ঐ সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত

আর একটি স্ত্রীলোককে ঐ কথা বলিলেন। পরিচিতা স্ত্রী-ভক্তটি দুই বৎসর পূর্ব হইতে ঠাকুরের নিকট যাওয়া-আসা করিতেছেন, সেজন্যই তাঁহাকে বলা। পরামর্শ স্থির হইল; পরদিন অপরাহ্ণে নৌকায় করিয়া উভয়ে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। দেখিলেন—ঠাকুরের ঘরের দ্বার রুদ্ধ। ঘরের উত্তরের দেয়ালে দুটি ফোকর আছে, তাহার ভিতর দিয়া উঁকি মারিয়া দেখিলেন—ঠাকুর বিশ্রাম করিতেছেন। কাজেই নহবতে, যেখানে শ্রীশ্রীমা থাকিতেন, গিয়া বসিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। একটু পরেই ঠাকুর উঠিলেন এবং উত্তরের দরজা খুলিয়া নহবতের দ্বিতলের বারাণ্ডায় তাঁহারা বসিয়া আছেন দেখিতে পাইয়া "ওগো, তোরা এখানে আয়" বলিয়া ডাকিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরা আসিয়া আসন গ্রহণ করিলে ঠাকুর তক্তা হইতে নামিয়া পরিচিতা স্ত্রী-ভক্তটির নিকট যাইয়া বসিলেন। তিনি তাহাকে সঙ্কুচিতা হইয়া সরিয়া বসিবার উপক্রম করিলে ঠাকুর বলিলেন, "লজ্জা কিগো? লজ্জা ঘৃণা ভয়—তিন থাকতে নয়। (হাত নাড়িয়া) তোরাও যা, আমিও তাই। তবে (দাড়ির চুলগুলি দেখাইয়া) এইগুলি আছে বলে লজ্জা হচ্চে, না?"

এই বলিয়া ভগবৎপ্রসঙ্গ পাড়িয়া নানা কথার উপদেশ করিতে লাগিলেন। স্ত্রী-ভক্তেরাও স্ত্রী-পুরুষ-ভেদ ভুলিয়া যাইয়া নিঃসঙ্কোচে প্রশ্ন করিতে ও শুনিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ কথাবার্তার পর বিদায়কালে ঠাকুর বলিলেন, "সপ্তাহে একবার করে আসবে। নূতন নূতন এখানে আসা-যাওয়াটা বেশী রাখতে হয়।" আবার সম্ভ্রান্তবংশীয়া হইলেও গরীব দেখিয়া নৌকা বা

গাড়ীর ভাড়া নিত্য নিত্য কোথা পাবেন ভাবিয়া ঠাকুর আবার বলিতে লাগিলেন, "আসবার সময় তিন-চার জনে মিলে নৌকায় করে আসবে। আর যাবার সময় এখান থেকে হেঁটে বরানগরে গিয়ে 'সেয়ারে' গাড়ী করবে।" বলা বাহুল্য, স্ত্রী-ভক্তেরা তদবধি তাহাই করিতে লাগিলেন।

আর একজন আমাদের একদিন বলিয়াছিলেন—"ভোলা ময়রার দোকানে বেশ সর করেছিল। ঠাকুর সর খেতে ভালবাসতেন জানতুম, তাই বড় একখানি সর কিনে আমরা পাঁচজনে মিলে নৌকা করে দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত। ওমা, এসে শুনলুম ঠাকুর কলিকাতায় গিয়াছেন। সকলে তো একেবারে বসে পড়লুম। কি হবে? রামলাল দাদা ছিলেন—তাঁকে ঠাকুর কোথায় গিয়াছেন জিজ্ঞাসা করায়, বলে দিলেন, 'কম্বুলেটোলায় মাস্টার মহাশয়ের বাড়ীতে।' অ—র মা শুনে বললে, 'সে বাড়ী আমি জানি, আমার বাপের বাড়ীর কাছে—যাবি? চল্ যাই; এখানে বসে আর কি করব?' সকলেই তাই মত করলে। রামলাল দাদার হাতে সরখানি দিয়ে বলে গেলুম 'ঠাকুর এলে দিও।' নৌকা তো ছেড়ে দিয়েছিলুম—হেঁটে হেঁটেই সকলে চললুম। কিন্তু এমনি ঠাকুরের ইচ্ছে, আলমবাজারটুকু গিয়েই একখানা ফেরতা গাড়ী পাওয়া গেল। ভাড়া করে তো শ্যামপুকুরে সব এলুম। এসে আবার বিপদ। অ—র মা বাড়ী চিনতে পারলেন না। শেষে ঘুরে ঘুরে তাঁর বাপের বাড়ীর সামনে গাড়ী দাঁড় করিয়ে একটা চাকরকে ডেকে আনলে। সে সঙ্গে এসে দেখিয়ে দেয়, তবে

ঐ সম্বন্ধে ২য় দৃষ্টান্ত

হয়! অ—র মা'রই বা দোষ দেব কি, আমাদের চেয়ে ৩।৪ বছরের ছোট তো? তখন ছাব্বিশ-সাতাশ বছরের হবে। বউ মানুষ, রাস্তাঘাটে কখনও বেরোয় নি, আর গলির ভেতরে বাড়ী[১] —সে চিনবেই বা কেমন করে গা?

"যা হোক করে তো পৌছুলুম। তখন মাস্টারদের (পরিবারের) সঙ্গেও চেনাশুনা হয় নি। বাড়ী ঢুকে দেখি একখানি ছোট ঘরে তক্তাপোশের ওপর ঠাকুর বসে, কাছে কেউ নাই। আমাদের দেখেই হেসে বলে উঠলেন, 'তোরা এখানে কেমন করে এলি গো?' আমরা তাঁকে প্রণাম করে সব কথা বললুম। তিনি খুব খুশী, ঘরের ভেতর বসতে বললেন, আর অনেক কথাবার্তা কইতে লাগলেন। এখন সকলে বলে, মেয়েদের তিনি ছুঁতে দিতেন না! কাছে যেতে দিতেন না। আমরা শুনে হাসি ও মনে করি—তবু আমরা এখনও মরি নি! তাঁর যে কি দয়া ছিল, তা কে জানবে! স্ত্রী-পুরুষে সমান ভাব! তবে স্ত্রীলোকের হাওয়া অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারতেন না, অনেকক্ষণ থাকলে বলতেন, 'যা গো, এইবার একবার মন্দিরে দর্শন করে আয়।' পুরুষদেরও ঐরূপ বলতে আমরা শুনেছি।

"যা'ক্। আমরা তো বসে কথা কইছি। আমাদের ভেতর যে দুজনের বেশী বয়েস ছিল তারা দরজার সামনেই বসেছে,

১ ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত—যিনি 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত' প্রকাশ করিয়া সাধারণের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন—তখন কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলায় একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে থাকিতেন।

আর আমরা তিন জনে ঘরের ভেতর, এককোণে ; এমন সময়ে ঠাকুর যাকে 'মোটা বামুন' বলতেন (শ্রীযুত প্রাণকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) তিনি এসে উপস্থিত। বেরিয়ে যাব—তারও জো নেই! কোথায় যাই! বুড়ীরা, দরজার সামনেই একটা জানালা ছিল, তাইতে বসে রইল। আর আমরা তিনটেয় ঠাকুর যে তক্তাপোশে বসেছিলেন তার নীচে ঢুকে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে রইলুম! মশার কামড়ে সর্বাঙ্গ ফুলে উঠলো, কি করি, নড়বার জো নেই, স্থির হয়ে পড়ে রইলুম। কথাবার্তা কয়ে বামুন প্রায় এক ঘণ্টা বাদে চলে গেল, তখন বেরুই!—আর হাসি!

"তারপর বাড়ীর ভেতর জল খাবার জন্য ঠাকুরকে নিয়ে গেল। তখন তাঁর সঙ্গে বাড়ীর ভেতর গেলুম। তারপর খেয়ে-দেয়ে কতক্ষণ বাদে ঠাকুর গাড়ীতে উঠলেন (দক্ষিণেশ্বরে ফিরিবেন বলিয়া); তখন সকলে হেঁটে বাড়ী ফিরি। রাত তখন ৯টা হবে।

"তার পরদিন আবার দক্ষিণেশ্বরে গেলুম। যাবামাত্র ঠাকুর কাছে এসে বললেন, 'ওগো, তোমার সর প্রায় সবটা খেয়েছিলুম, একটু বাকি ছিল; কোন অসুখ করে নি, পেটটা একটু সামান্য গরম হয়েছে।' আমি তো শুনে অবাক! তাঁর পেটে কিছু সয় না, আর একখানা সর তিনি একেবারে খেয়েছেন! তারপর শুনলুম—ভাবাবস্থায় খেয়েছেন। শুনলুম—মাস্টার মহাশয়ের বাড়ী থেকে ঠাকুর খেয়ে-দেয়ে তো রাত্রি সাড়ে দশটায় এসে

স্ত্রী-ভক্তদিগের প্রতি ঠাকুরের সমান কৃপা

পৌঁছুলেন; এসে খানিক বাদে তাঁর ভাব হয় ও অর্ধবাহ্য দশায় রামলাল দাদাকে বলেন, 'বড় ক্ষুধা পেয়েছে, ঘরে কি আছে দে তো রে।' রামলাল দাদা শুনে আমার সেই সরখানি এনে সামনে দেন ও ঠাকুর তা প্রায় সব খেয়ে ফেলেন! ভাবের ঘোরে তাঁর কখন কখন অমন অসম্ভব খাওয়াও খেয়ে হজম করার কথা মা-র কাছে ও লক্ষ্মীদিদির কাছে শুনেছিলুম, সেই সব কথা মনে পড়ল। এত কৃপা আমরা তাঁর কাছ থেকে পেয়েছি' সে যে কি দয়া, তা বলে বোঝাবার নয়' আর সে কি টান, কেমন করে যে আমরা সব যেতুম, করতুম—তা আমরাই জানি না, বুঝি না। কই—এখন তো আর সে রকম করে কোথাও হেঁটে হেঁটে বলা নেই কওয়া নেই অচেনা লোকের বাড়ীতে সাধু দেখতে বা ধর্মকথা শুনতে যেতে পারি নে! সে যার শক্তিতে করতুম তাঁর সঙ্গে গিয়েছে! তাঁকে হারিয়ে এখনও কেন যে বেঁচে আছি, তা জানি না!"

এইরূপ আরও কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা কখনও বাটীর বাহির হন নাই—তাঁহাদের দিয়া বাজার করাইয়া আনিয়াছেন, অভিমান অহঙ্কার দূরে যাইবে বলিয়া সাধারণ ভিখারীর ন্যায় লোকের বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করাইয়াছেন, সঙ্গে লইয়া পেনেটির মহোৎসব ইত্যাদি দেখাইয়া আনিয়াছেন—আর তাঁহারাও মনে কোন দ্বিধা না করিয়া মহানন্দে যাহা ঠাকুর বলিয়াছেন, তাহাই করিয়াছেন! ভাবিয়া দেখিলে ইহা একটি কম ব্যাপার বলিয়া মনে হয় না; সে প্রবল জ্ঞানতরঙ্গের সম্মুখে সকলেরই ভেদজ্ঞানপ্রসূত দ্বিধাভাব তখনকার মত ভাসিয়া

গিয়াছে। সে উজ্জ্বল ভাবঘনতনু ঠাকুরের ভিতর সকলেই নিজ নিজ ভাবের পূর্ণাদর্শ দেখিতে পাইয়া আপনাদের কৃতার্থ জ্ঞান করিয়াছে! পুরুষ পুরুষত্বের পূর্ণবিকাশ দেখিয়া নতশির হইয়াছে; স্ত্রী স্ত্রীজনসুলভ সকল ভাবের বিকাশ তাঁহাতে দেখিতে পাইয়া নিঃসঙ্কোচে তাঁহাকে আপনার হইতেও আপনার জ্ঞান করিয়াছে!

ঠাকুরের স্ত্রীসুলভ হাবভাবের অনুকরণ

স্ত্রীজাতিসুলভ হাবভাবাদি ঠাকুর কখন কখন আমাদের সাক্ষাতে নকল করিতেন। উহা এত ঠিক হইত যে, আমরা অবাক হইতাম। জনৈকা স্ত্রী-ভক্ত ঐ সম্বন্ধে একদিন আমাদের বলিয়াছিলেন, ঠাকুর একদিন তাঁহাদের সামনে, স্ত্রীলোকেরা পুরুষ দেখিলে যেরূপ হাবভাব করে, তাহা দেখাইতে আরম্ভ করিলেন—"সে মাথায় কাপড় টানা, কানের পাশে চুল সরিয়ে দেওয়া, বুকে কাপড় টানা, ঢং করে নানারূপ কথা কওয়া—একেবারে হুবহু ঠিক। দেখে আমরা হাসতে লাগলুম, কিন্তু মনে লজ্জা আর কষ্টও হল যে, ঠাকুর মেয়েদের এই রকম করে হেয় জ্ঞান করচেন। ভাবলুম—কেন, সকল স্ত্রীলোকেরাই কি ওই রকম? হাজার হোক আমরা মেয়ে কিনা, মেয়েদের ওরকম করে কেউ ব্যাখ্যানা করলে মনে কষ্ট হতেই পারে। ওমা, ঠাকুর অমনি আমাদের মনের ভাব বুঝতে পেরেছেন! আর বলছেন, 'ওগো, তোদের বলচি না। তোরা তো অবিদ্যাশক্তি নোস্, ওসব অবিদ্যাশক্তিগুলো করে!"

ঠাকুরে স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের এইরূপ একত্র সমাবেশ তাঁহার প্রত্যেক ভক্তই কিছু-না-কিছু উপলব্ধি করিয়াছে। শ্রীযুত গিরিশ ঐরূপ উপলব্ধি করিয়া একদিন ঠাকুরকে জিজ্ঞাসাই করিয়া ফেলেন, "মশাই, আপনি পুরুষ না প্রকৃতি?" ঠাকুর হাসিয়া তদুত্তরে বলিলেন, "জানি না।" ঠাকুর ঐ কথাটি আত্মজ্ঞ পুরুষেরা যেমন বলেন, 'আমি পুরুষও নহি, স্ত্রীও নহি'—সেইভাবে বলিলেন, অথবা নিজের ভিতর উভয় ভাবের সমান সমাবেশ দেখিয়া বলিলেন, সে কথা এখন কে মীমাংসা করিবে?

ঠাকুরে স্ত্রী-পুরুষ উভয় ভাবের একত্র সমাবেশ

এইরূপে ভাবময় ঠাকুর ভাবমুখে থাকিয়া স্ত্রীর কাছে স্ত্রী ও পুরুষের কাছে পুরুষ হইয়া তাহাদের প্রত্যেকের সকল ভাব ঠিক ঠিক ধরিতেন। আমাদের কাহারও কাহারও কাছে একথা তিনি স্বয়ংই ব্যক্ত করিয়াছেন। পরম ভক্তিমতী জনৈকা স্ত্রীভক্ত[১] আমাদিগকে বলিয়াছেন, ঠাকুর তাঁহাকে একদিন বলিতেছেন, "লোকের দিকে চেয়েই—কে কেমন বুঝতে পারি, কে ভাল কে মন্দ, কে সুজন্মা, কে বেজন্মা, কে জ্ঞানী, কে ভক্ত, কার হবে, কার হবে না। ধর্মলাভ)—সব জানতে পারি; কিন্তু বলি না—তাদের মনে কষ্ট হবে, তাই।" ভাবমুখে থাকায় সমগ্র জগৎটাই তাঁহার নিকট সদা সর্বক্ষণ ভাবময় বলিয়াই প্রতীত হইত। বোধ হইত—স্ত্রী-পুরুষ, গরু-ঘোড়া, কাঠ-মাটি সকলই যেন বিরাট মনে এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবসমষ্টিরূপে

ভাবমুখে থাকাতেই ঠাকুর সকলের ভাব বুঝিতে সমর্থ হইতেন

১ স্বামী প্রেমানন্দজীর মাতাঠাকুরানী।

উঠিতেছে, ভাসিতেছে—আর ঐ ভাবাবরণের ভিতর দিয়া অনন্ত অখণ্ড সচ্চিদাকাশ কোথাও অল্প, কোথাও অধিক পরিমাণে প্রকাশিত রহিয়াছে; আবার কোথাও বা আবরণের নিবিড়তায় একেবারে আচ্ছন্ন হইয়া যেন নাই বলিয়া বোধ হইতেছে! আনন্দময়ীর নিষ্কলঙ্ক মানসপুত্র ঠাকুর জগদম্বার পাদপদ্মে স্বেচ্ছায় শরীর-মন, চিত্তবৃত্তি, সর্বস্ব অর্পণ করিয়া সমাধিবলে অশরীরী আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সহিত চিরকালের নিমিত্ত মিলিত হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় পৌঁছিয়া জগন্মাতার অন্যরূপ ইচ্ছা জানিতে পারিলেন এবং তাঁহারই আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া দ্বৈতাদ্বৈতবিবর্জিত অনির্বচনীয় অবস্থায় লীন আপনার মনকে জোর করিয়া আবার বিদ্যার আবরণে আবরিত করিয়া নিয়ত মা-র আদেশ পালন করিতে থাকিলেন! অনন্তভাবময়ী জগজ্জননীও ঠাকুরের প্রতি প্রসন্না হইয়া ঠাকুরকে শরীরী করিয়া রাখিয়াও একত্বের এত উচ্চপদে তাঁহার মনটি সর্বক্ষণ রাখিয়া দিলেন যে, অনন্ত বিরাট মনে যতকিছু ভাবের উদয় হইতেছে, তৎসকলই সেখান হইতে তাঁহার নিজস্ব বলিয়া সর্বকালে অনুভূত হইত এবং এতদূর আয়ত্তীভূত হইয়া থাকিত যে, দেখিলেই মনে হইত—যিনিই মাতা তিনিই সন্তান এবং যিনিই সন্তান তিনিই মাতা—'চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম!'

আমরা যতটুকু বলিতে পারিলাম বলিলাম; পাঠক, এইবার তুমি ভাবিয়া দেখ অনন্তভাবরূপী এ ঠাকুর কে?

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্‌॥

—গীতা, ১৮।৬৪

ঠাকুরের আবির্ভাব বা প্রকাশের পূর্বে কলিকাতায় শিক্ষিত বা অশিক্ষিত সকলেই যে ভাব, সমাধি বা আধ্যাত্মিক রাজ্যের অপূর্ব দর্শন ও উপলব্ধিসমূহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল, একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। অশিক্ষিত জনসাধারণের ঐ সম্বন্ধে ভয়-বিস্ময়-সম্ভূত একটা কিম্ভূতকিমাকার ধারণা ছিল; এবং নবীন শিক্ষিতসম্প্রদায় তখন ধর্মজ্ঞানবিবর্জিত বিদেশী শিক্ষার স্রোতে সম্পূর্ণরূপে অঙ্গ ঢালিয়া ঐরূপ দর্শনাদি হওয়া অসম্ভব বা মস্তিষ্কের বিকারপ্রসূত বলিয়া মনে করিতেন। আধ্যাত্মিক রাজ্যের ভাবসমাধি হইতে উৎপন্ন শারীরিক বিকারসমূহ তাঁহাদের নয়নে মূর্ছা ও শারীরিক রোগবিশেষ বলিয়াই প্রতিভাত হইত! বর্তমান কালে ঐ অবস্থার অনেকটা পরিবর্তন হইলেও ভাব এবং সমাধি-রহস্য যথাযথ বুঝিতে এখনও অতি অল্প লোকেই সক্ষম। আবার শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভাবমুখাবস্থা কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে হইলে সমাধিতত্ত্ব সম্বন্ধে একটা মোটামুটি জ্ঞান থাকার নিতান্ত প্রয়োজন।

সেজন্য ঐ বিষয়েরই কিছু-কিছু আমরা এখন পাঠককে বুঝাইবার প্রয়াস পাইব।

সাধারণ মানবে যাহা উপলব্ধি করে না তাহাকেই আমরা সচরাচর 'বিকার' বলিয়া থাকি। ধর্মজগতের সূক্ষ্ম উপলব্ধি-সমূহ কিন্তু কখনই সাধারণ মানবমনের অনুভবের বিষয় হইতে পারে না; উহাতে শিক্ষা, দীক্ষা ও নিরন্তর অভ্যাসাদির প্রয়োজন। ঐ সকল অসাধারণ দর্শন ও অনুভবাদি সাধককে দিন দিন পবিত্র করে ও নিত্য নূতন বলে বলীয়ান এবং নব নব ভাবে পূর্ণ করিয়া ক্রমে চিরশান্তির অধিকারী করে। অতএব ঐ সকল দর্শনাদিকে 'বিকার' বলা যুক্তিসঙ্গত কি? 'বিকার' মাত্রই যে মানবকে দুর্বল করে ও তাহার বুদ্ধি-শুদ্ধি হ্রাস করে, এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ধর্মজগতের দর্শনানুভূতিসকলের ফল যখন উহার সম্পূর্ণ বিপরীত, তখন ঐ সকলের কারণও সম্পূর্ণ বিপরীত বলিতে হইবে এবং তজ্জন্য ঐ সকলকে মস্তিষ্ক-বিকার বা রোগ কখনও বলা চলে না।

সমাধি মস্তিষ্ক-বিকার নহে

বিশেষ বিশেষ ধর্মানুভূতিসকল ঐরূপ দর্শনাদি দ্বারাই চিরকাল অনুভূত হইয়া আসিয়াছে। তবে যতক্ষণ না মনের সকল বৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া মানব নির্বিকল্প অবস্থায় উপনীত ও অদ্বৈতভাবে অবস্থিত হয়, ততক্ষণ সে আধ্যাত্মিক জগতের চিরশান্তির অধিকারী হইতে পারে না। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন— "একটা কাঁটা ফুটেছে, আর একটা কাঁটা দিয়ে পূর্বের সেই

সমাধি দ্বারাই ধর্মলাভ হয় ও চিরশান্তি পাওয়া যায়

কাঁটাটা তুলে ফেলে দুটো কাঁটাই ফেলে দিতে হয়।" শ্রীভগবানকে ভুলিয়া এই জগৎ-রূপ বিকার উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল নানা রূপ-রসাদির অনুভবরূপ বিকার ধর্মজগতের পূর্বোক্ত দর্শনানুভবাদির দ্বারা প্রতিহত হইয়া মানবকে ক্রমশঃ ঐ অদ্বৈতানুভূতিতে উপস্থিত করে। তখন 'রসো বৈ সঃ'—এই ঋষিবাক্যের উপলব্ধি হইয়া মানব ধন্য হয়; ইহাই প্রণালী। ধর্ম জগতের যত কিছু মত, অনুভব, দর্শনাদি সব ঐ লক্ষ্যেই মানবকে অগ্রসর করে। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজি ঐ সকল দর্শনাদিকে, সাধক লক্ষ্যাভিমুখে কতদূর অগ্রসর হইল, তাহারই পরিচায়ক-স্বরূপ (mile-stones on the way to progress) বলিয়া নির্দেশ করিতেন। অতএব পাঠক যেন না মনে করেন, ভাববিশেষের কিঞ্চিৎ প্রাবল্যে অথবা ধ্যানসহায়ে দুই-একটি দেবমূর্তি দর্শনাদিতেই ধর্মের 'ইতি' হইল! তাহা হইলে বিষম ভ্রমে পতিত হইতে হইবে। সাধকেরা ধর্মজগতে ঐরূপ বিষম ভ্রমে পতিত হইয়াই লক্ষ্য হারাইয়া থাকেন এবং লক্ষ্য হারাইয়াই একদেশী ভাবাপন্ন হইয়া পরস্পরের প্রতি দ্বেষ-হিংসাদিতে পূর্ণ হইয়া পড়েন। শ্রীভগবানে ভক্তি করিতে যাইয়া ঐ ভ্রম উপস্থিত হইলেই মানুষ 'গোঁড়া' 'একঘেয়ে' হয়। ঐ দোষই ভক্তি-পথের বিষম কণ্টক-স্বরূপ এবং মানবের 'হীনবুদ্ধি'-প্রসূত।

আবার ঐরূপ দর্শনাদিতে বিশ্বাসী হইয়া অনেকে বুঝিয়া বসেন, যাহার ঐরূপ দর্শনাদি হয় নাই, সে আর ধার্মিক নহে। ধর্ম ও লক্ষ্য-বিহীন অদ্ভুত-দর্শন-পিপাসা (miracle-mongering) তাঁহাদের নিকট একই ব্যাপার বলিয়া প্রতিভাত হয়। কিন্তু

ঐরূপ পিপাসায় ধর্মলাভ না হইয়া মানব দিন দিন সকল বিষয়ে দুর্বলই হইয়া পড়ে। যাহাতে একনিষ্ঠ বুদ্ধি ও চরিত্রবল না আসে, যাহাতে মানব পবিত্রতার দৃঢ়ভূমিতে দাঁড়াইয়া সত্যের জন্য সমগ্র জগৎকে তুচ্ছ করিতে না পারে, যাহাতে কামগন্ধহীন না হইয়া মানব দিন দিন নানা বাসনা-কামনায় জড়ীভূত হয়, তাহা ধর্মরাজ্যের বহির্ভূত। অপূর্ব দর্শনাদি যদি তোমার জীবনে ঐরূপ ফল প্রসব না করিয়া থাকে, অথচ দর্শনাদিও হইতে থাকে, তবে জানিতে হইবে—তুমি এখনও ধর্মরাজ্যের বাহিরে রহিয়াছ, তোমার ঐ সকল দর্শনাদি মস্তিষ্ক-বিকারজনিত, উহার কোন মূল্য নাই। আর যদি অপূর্ব দর্শনাদি না করিয়াও তুমি ঐরূপ বলে বলীয়ান হইতেছ দেখ, তবে বুঝিবে তুমি ঠিক পথে চলিয়াছ, কালে যথার্থ দর্শনাদিও তোমার উপস্থিত হইবে।

দেবমূর্ত্যাদি-দর্শন না হইলেই যে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, তাহা নহে

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্তদিগের মধ্যে অনেকের ভাবসমাধি হইতেছে, অথচ তাঁহার অনেকদিন গতায়াত করিয়াও ওরূপ কিছু হইল না দেখিয়া আমাদের জনৈক বন্ধু[১] কোন সময়ে বিশেষ ব্যাকুল হন এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিকট সজলনয়নে উপস্থিত হইয়া প্রাণের কাতরতা নিবেদন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাহাতে তাঁহাকে বুঝাইয়া বলেন, "তুই ছোঁড়া তো

ত্যাগ, বিশ্বাস এবং চরিত্রের বলই ধর্ম-লাভের পরিচায়ক

১ শ্রীযুত গোপালচন্দ্র ঘোষ।

ভারি বোকা, ভাবচিস্ বুঝি ঐটে হলেই সব হল? ঐটেই ভারি বড়? ঠিক ঠিক ত্যাগ, বিশ্বাস ওর চেয়ে ঢের বড় জিনিস জান্‌বি। নরেন্দ্রের (স্বামী বিবেকানন্দের) তো ওসব বড় একটা হয় না; কিন্তু দেখ দেখি—তার কি ত্যাগ, কি বিশ্বাস, কি মনের তেজ ও নিষ্ঠা!"

'পাকা আমি' ও শুদ্ধ বাসনা। জীবন্মুক্ত, আধিকারিক বা ঈশ্বরকোটি ও জীবকোটি

একনিষ্ঠ বুদ্ধি, দৃঢ় বিশ্বাস ও ঐকান্তিক ভক্তিসহায়ে সাধকের যখন বাসনাসমূহ ক্ষীণ হইয়া শ্রীভগবানের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের সময় আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন পূর্বসংস্কারবশে কাহারও কাহারও মনে কখন কখন 'আমি লোক-কল্যাণ সাধন করিব, যাহাতে বহুজন সুখী হইতে পারে তাহা করিব'—এইরূপ শুদ্ধ বাসনার উদয় হইয়া থাকে। ঐ বাসনাবশে সে আর তখন পূর্ণরূপে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করিতে পারে না। ঐ উচ্চ ভাবভূমি হইতে কিঞ্চিন্মাত্র নামিয়া আসিয়া 'আমি, আমার'-রাজ্যে পুনরায় আগমন করে। কিন্তু সে 'আমি' শ্রীভগবানের দাস, সন্তান বা অংশ 'আমি' এইরূপে শ্রীভগবানের সহিত একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ লইয়াই অনুক্ষণ থাকে। সে 'আমি' দ্বারায় আর অহর্নিশি কাম-কাঞ্চনের সেবা করা চলে না। সে 'আমি' শ্রীভগবানকে সারাৎসার জানিয়া আর সংসারের রূপ-রসাদি-ভোগের জন্য লালায়িত হয় না। যতটুকু রূপ-রসাদিবিষয়-গ্রহণ তাঁহার উদ্দেশ্য বা লক্ষ্যের সহায়ক, ততটুকুই সে ইচ্ছামত গ্রহণ করিয়া থাকে, এই পর্যন্ত। যাঁহারা পূর্বে বদ্ধ ছিলেন, পরে সাধন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং

জীবনের অবশিষ্টকাল কোনরূপ ভগবদ্ভাবে কাটাইতেছেন, তাঁহাদিগকেই 'জীবন্মুক্ত' কহে। যাঁহারা ঈশ্বরের সহিত ঐরূপ বিশিষ্ট সম্বন্ধের ভাব লইয়াই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন এবং এ জন্মে কোন সময়েই সাধারণ মানবের ন্যায় বন্ধনযুক্ত হইয়া পড়েন নাই, তাঁহারাই শাস্ত্রে 'আধিকারিক পুরুষ', 'ঈশ্বরকোটি' বা 'নিত্যমুক্ত' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত হইয়াছেন। আবার একদল সাধক আছেন, যাঁহারা অদ্বৈতভাব লাভ করিবার পরে এ জন্মে বা পরজন্মে সংসারে লোককল্যাণ করিতেও আর ফিরিলেন না—ইঁহারাই 'জীবকোটি' বলিয়া অভিহিত হন এবং ইঁহাদের সংখ্যাই অধিক বলিয়া আমরা গুরুমুখে শ্রুত আছি।

অদ্বৈত ভাবোপলব্ধির তারতম্য

আবার যাঁহারা পূর্বোক্তরূপে অদ্বৈতভাব-লাভের পর লোককল্যাণের জন্য সমাধিভূমি হইতে নামিয়া আসেন, সে সকল সাধকদিগের মধ্যেও অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ জগৎকারণের সহিত অদ্বৈতভাব উপলব্ধি করিবার তারতম্য আছে। কেহ ঐ ভাবসমুদ্র দূর হইতে দর্শন করিয়াছেন মাত্র, কেহ বা উহা আরো নিকটে অগ্রসর হইয়া স্পর্শ করিয়াছেন, আবার কেহ বা ঐ সমুদ্রের জল অল্প-স্বল্প পান করিয়াছেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "দেবর্ষি নারদ দূর হ'তে ঐ সমুদ্র দেখেই ফিরেছেন, শুকদেব তিনবার স্পর্শমাত্র করেছেন, আর জগদ্গুরু শিব তিন গণ্ডূষ জল খেয়ে শব হয়ে পড়ে আছেন!" এই অদ্বৈতভাবে অল্পক্ষণের নিমিত্তও তন্ময় হওয়াকেই 'নির্বিকল্প সমাধি' কহে।

অদ্বৈতভাব-উপলব্ধির যেমন তারতম্য আছে, সেইরূপ

নিম্নস্তরের শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্যাদি ভাবসমূহের অথবা যে ভাবসমূহ অদ্বৈতভাবে সাধককে উপনীত করে, সে সকলের উপলব্ধি করিবার মধ্যেও আবার তারতম্য আছে। কেহ বা উহার কোনটি সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হন, আবার কেহ বা উহার আভাসমাত্রই পাইয়া থাকেন। এই নিম্নাঙ্গের ভাবসকলের মধ্যে কোন একটির সম্পূর্ণ উপলব্ধিই 'সবিকল্প সমাধি' নামে যোগশাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে।

শান্ত, দাস্যাদি ভাবের গভীরতায় সবিকল্প সমাধি

উচ্চাঙ্গের অদ্বৈতভাব বা নিম্নাঙ্গের সবিকল্পভাব, সকল প্রকার ভাবেই সাধকের অপূর্ব শারীরিক পরিবর্তন এবং অদ্ভুত দর্শনাদি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঐ শরীরবিকার ও অদ্ভুত দর্শনাদির প্রকাশ আবার ভিন্ন ভিন্ন জনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে লক্ষিত হয়। কাহারও অল্প উপলব্ধিতেই শারীরিক বিকার ও দর্শনাদি দেখা যায়, আবার কাহারও বা অতি গভীরভাবে ঐসকল ভাবোপলব্ধিতেও শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদি অতি অল্পই দেখা যায়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "গেড়ে ডোবার অল্প জলে যদি দু-একটা হাতী নামে তো জল ওছল্-পাছল্ হয়ে তোলপাড় হয়ে উঠে; কিন্তু সায়ের দীঘিতে অমন বিশগণ্ডা হাতী নামলেও যেমন জল স্থির, তেমনই থাকে।" অতএব শারীরিক বিকার এবং দর্শনাদিই যে ভাবের গভীরতার ধ্রুব লক্ষণ, তাহাও নহে। ভাবের গভীরতার যদি পরিমাণের আবশ্যক হয়,

মানসিক ও আধ্যাত্মিক ভাবে শারীরিক বিকার অবশ্যম্ভাবী

উচ্চাবচ ভাব-সমাধি কিরূপে বুঝা যাইবে

তবে পূর্বে যেরূপ বলিয়াছি—নিষ্ঠা, ত্যাগ, চরিত্রবল, বিষয়-কামনার হ্রাস প্রভৃতি দেখিয়াই অনুমান করিতে হইবে। ভাব-সমাধিতে কত খাদ আছে, তাহা কেবল ঐ কষ্টিপাথরেই পরীক্ষিত হইতে পারে, নতুবা আর অন্য উপায় নাই। অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে যে, যাঁহারা সকল প্রকার বিষয়বাসনা-বর্জিত হইয়া শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের ভিতরেই কেবল শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য বা মধুর—যে কোন ভাবের যথাযথ সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ছবি দেখিতে পাওয়া সম্ভব; যাহারা কামকাঞ্চন-বাসনাবিজড়িত তাহাদের ভিতর নহে। কামান্ধ, কামনার টানই বুঝে—কামগন্ধরহিত যে মনের আবেগ, তাহা কেমন করিয়া বুঝিবে?

ভাবসমাধির দার্শনিক তত্ত্ব শ্রীগুরুর মুখ হইতে আমরা যেরূপ শুনিয়াছি, তাহাই সংক্ষেপে এখানে বিবৃত করিতে চেষ্টা করিতেছি। আরও কয়েকটি কথা ঐ সম্বন্ধে এখানে বলা প্রয়োজন। তবেই পাঠক উহা বিশদরূপে বুঝিতে পারিবেন।

সর্বপ্রকার ভাব সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে অবতারেরাই সক্ষম। দৃষ্টান্ত—ঠাকুরের সমাধির কথা

সাধকদিগের মধ্যে শান্ত দাস্যাদি ও অদ্বৈত-ভাবোপলব্ধির তারতম্য লক্ষিত হওয়া সম্বন্ধে যেসকল কথা পূর্বে বলা হইল, তাহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, ঈশ্বরাবতারেরাও ভাবরাজ্যে কোনরূপ গণ্ডির ভিতর আবদ্ধ থাকেন। তাঁহারা শান্ত-দাস্যাদি যখন যে ভাব ইচ্ছা, পূর্ণমাত্রায় নিজ জীবনে প্রদর্শন করিতে পারেন, আবার অদ্বৈতভাবালম্বনে শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবে এতদূর অগ্রসর হইতে

পারেন যে, জীবন্মুক্ত, নিত্যমুক্ত বা ঈশ্বরকোটি কোনপ্রকার জীবেরই তাহা সাধ্যায়ত্ত নহে। রসস্বরূপ, আনন্দস্বরূপের সহিত অতদূর একত্বে অগ্রসর হইয়া আবার তাহা হইতে বিযুক্ত হওয়া এবং 'আমি আমার' রাজ্যে পুনরায় নামিয়া আসা—জীবের কখনই সম্ভবপর নহে। উহা কেবল একমাত্র অবতারপ্রথিত পুরুষসকলে সম্ভবে। তাঁহাদের অদৃষ্টপূর্ব উপলব্ধিসমূহ লিপিবদ্ধ করিয়াই আধ্যাত্মিক জগতে বেদাদি সর্বশাস্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে। অতএব তাঁহাদের আধ্যাত্মিক উপলব্ধিসকল অনেক স্থলে যে বেদাদিশাস্ত্রনিবদ্ধ উপলব্ধিসকল অতিক্রম করিবে—ইহাতে বিচিত্র কি আছে? শ্রীরামকৃষ্ণদেব যেমন বলিতেন, "এখানকার অবস্থা (আমরা উপলব্ধি) বেদ বেদান্তে যা লেখা আছে, সে সকলকে ঢের ছাড়িয়ে চলে গেছে!" শ্রীরামকৃষ্ণদেব ঐ শ্রেণীর পুরুষসকলের অগ্রণী ছিলেন বলিয়াই নিরন্তর ছয়মাস কাল অদ্বৈতভাবে পূর্ণরূপে অবস্থান করিবার পরেও আবার 'বহুজনহিতায়' লোকশিক্ষার জন্য 'আমি আমার' রাজ্যে ফিরিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে বড় অদ্ভুত কথা। ঐ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা পাঠককে এখানে বলা অসঙ্গত হইবে না।

বেদান্ত-চর্চা করিতে ব্রাহ্মণীর নিষেধ

শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পর ঠাকুরের তৃতীয় দিবসে বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত নির্বিকল্প সমাধি বা শ্রীভগবানের সহিত অদ্বৈতভাবে অবস্থানের চরম উপলব্ধি হয়। সে সময় ঠাকুরের তন্ত্রোক্ত সকলপ্রকার সাধন হইয়া গিয়াছে এবং যিনি ঐসকল সাধনার সময় বৈধ দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া এবং ঐ

সকল দ্রব্যের ব্যবহারপ্রণালী প্রভৃতি দেখাইয়া তাঁহাকে সহায়তা করিয়াছিলেন, সে বিদুষী ভৈরবীও (ঠাকুর ইঁহাকে আমাদের নিকট 'বাম্‌নী' বলিয়া নির্দেশ করিতেন) দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট বাস করিতেছেন। কারণ, ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা শুনিয়াছি, উক্ত 'বাম্‌নী' বা ভৈরবী তাঁহাকে শ্রীমৎ তোতাপুরীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশামিশি করিতে নিষেধ করিয়া বলিতেন—"বাবা, ওর সঙ্গে অত মেশামিশি করো না, ওদের সব শুক্‌নো ভাব ; ওর অত সঙ্গ কর্‌লে তোমার ভাব-প্রেম আর কিছু থাকবে না।" ঠাকুর কিন্তু ঐ কথায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া অহর্নিশি তখন বেদান্ত-বিচার ও উপলব্ধিতে নিমগ্ন থাকিতেন।

ঠাকুরের নির্বিকল্প ভূমিতে সর্বদা থাকিবার সঙ্কল্প ও উক্ত ভূমির স্বরূপ

এগার মাস দক্ষিণেশ্বরে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ তোতাপুরী চলিয়া গেলেন। ঠাকুরের তখন দৃঢ়সঙ্কল্প হইল—'আমি আমার' রাজ্যে আর না থাকিয়া নিরন্তর শ্রীভগবানের সহিত একাত্মভাবে বা অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান করিব এবং তিনি তদ্রূপ আচরণও করিতে লাগিলেন। সে বড় অপূর্ব কথা—তখন ঠাকুরের শরীরটা যে আছে, সে বিষয়ের আদৌ হুঁশ ছিল না! খাইব, শুইব, শৌচাদি করিব—এসকল কথারও মনে উদয় হইত না তো অপরের সহিত কথাবার্তা কহিব—সে তো অনেক দূরের কথা! সে অবস্থায় 'আমি আমার'ও নাই—আর 'তুমি তোমার'ও নাই! 'দুই' নাই ; 'এক'ও নাই! কারণ, 'দুই'-এর স্মৃতি থাকিলে তবে তো 'একে'র উপলব্ধি হইবে। সেখানে মনের সব বৃত্তি স্থির—শান্ত! কেবল—

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং
নিরুপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধিগগনাভং নিষ্কলং নির্বিকল্পং
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥
প্রকৃতি-বিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং।[১]

* * * *

কেবল আনন্দ! আনন্দ!—তার দিক্ নাই, দেশ নাই, আলম্বন নাই, রূপ নাই, নাম নাই! কেবল অশরীরী আত্মা আপনার অনির্বচনীয় আনন্দময় অবস্থায়, মনবুদ্ধির গোচরে অবস্থিত যতপ্রকার ভাবরাশি আছে, সে সকলের অতীত এক প্রকার ভাবাতীত ভাবে অবস্থিত। যাহাকে শাস্ত্র 'আত্মায় আত্মায় রমণ' বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।—এইপ্রকার এক অনির্বচনীয় অবস্থার উপলব্ধিই ঠাকুরের তখন নিরন্তর হইয়াছিল।

ঠাকুর বলিতেন, বেদান্তের নির্বিকল্প সমাধি-উপলব্ধিতে উঠিবার পথে সংসারের কোনও পদার্থ বা কোন সম্বন্ধই তাঁহার অন্তরায় হয় নাই। কারণ, পূর্ব হইতেই তো তিনি শ্রীশ্রীজগদম্বার শ্রীপাদপদ্ম সাক্ষাৎকার করিবার নিমিত্ত যতপ্রকার ভোগবাসনা ত্যাগ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের মনের অদ্ভুত গঠন

"মা, এই নে তোর জ্ঞান, এই নে তোর অজ্ঞান—এই নে তোর ধর্ম, এই নে তোর অধর্ম—এই নে তোর ভাল, এই নে তোর মন্দ—এই নে তোর পাপ, এই নে তোর পুণ্য—এই নে তোর যশ, এই নে তোর অযশ—আমায় তোর শ্রীচরণে

১ বিবেকচূড়ামণি, ৪০৮-৯।

শ্রদ্ধা-ভক্তি দে, দেখা দে'—এই বলিয়া মন হইতে ঠিক ঠিক সকল প্রকার বাসনা কামনা শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ভালবাসিয়া তাঁহার জন্ত ত্যাগ করিয়াছিলেন। হায়, সে একাঙ্গী ভক্তি-প্রেমের কথা কি আমরা, উপলব্ধি দূরে থাক্, একটুও কল্পনা করিতে পারি? আমরা মুখে যদি কখনও শ্রীভগবানকে বলি, 'ঠাকুর, এই নাও আমার যাহা কিছু সব' তো বলিবার পরই আবার কাজের সময় ঠাকুরকে তাড়াইয়া সে সব 'আমার আমার' বলিতে থাকি এবং লাভ-লোকসান খতাই। প্রতি কার্যে 'লোকে কি বলবে' ভাবিয়া নানাপ্রকারে তোলাপাড়া, ছুটাছুটি করি; ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিয়া কখন অকূলপাথারে, আবার কখন বা আনন্দে ভাসি; এবং মনে মনে একথা স্থিরনিশ্চয় করিয়া বসিয়া আছি যে, দুনিয়াটা আমরা আমাদের উদ্যমে একেবারে ওলটপালট করিয়া না দিতে পারিলেও কতকটাও ঘুরাইতে ফিরাইতে পারি। ঠাকুরের তো আমাদের মত জুয়াচোর মন ছিল না; তিনি যেমন বলিলেন, "মা, এই তোর দেওয়া জিনিস তুই নে," অমনি তদ্দণ্ড হইতে তাঁহার মন আর সে সকলের প্রতি লালসাপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিল না। 'বলে ফেলেছি কি করি? না বললে হত'—মনের এইরূপ ভাব পর্যন্তও তখন হইতে আর উদিত হইল না! সেইজন্যই দেখিতে পাই, ঠাকুর যখনই যাহা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে দিবেন বলিয়াছেন তাহা আর কখনও 'আমার' নিজের বলিতে পারেন নাই।

এখানে ঐ বিষয়ে আর একটি কথাও আমরা পাঠককে বলিতে ইচ্ছা করি। ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে ধর্মাধর্ম, পুণ্য-পাপ,

ভাল-মন্দ, যশ-অযশ প্রভৃতি শরীর-মনের সর্ব্বস্ব অর্পণ করিয়াও 'মা, এই নে তোর সত্য, এই নে তোর মিথ্যা'—এ কথাটি বলিতে পারেন নাই। উহার কারণ ঠাকুর নিজ মুখেই এক সময়ে আমাদের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, ঐরূপে সত্য ত্যাগ করিলে "শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সর্বস্ব যে অর্পণ করিলাম—এ সত্য রাখিব কিরূপে ?" বাস্তবিক সর্বস্ব অর্পণ করিয়াও কি সত্যনিষ্ঠাই না আমরা তাঁহাতে দেখিয়াছি ! যেদিন যেখানে যাইব বলিয়াছেন, সেদিন ঠিক সময়ে তথায় উপস্থিত হইয়াছেন ; যাহার নিকট হইতে যে জিনিস লইব বলিয়াছেন, তাহার নিকট ভিন্ন অপর কাহারও নিকট তাহা লইতে পারেন নাই ! যেদিন বলিয়াছেন, আর অমুক জিনিসটা খাইব না, বা আমুক কাজ আর করিব না, সেই দিন হইতে আর তাহা খাইতে বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুর বলিতেন, "যার সত্যনিষ্ঠা আছে, সে সত্যের ভগবানকে পায়। যার সত্যনিষ্ঠা আছে, মা তার কথা কখনও মিথ্যা হতে দেয় না।" বাস্তবিকও ঐ বিষয়ের কতই না দৃষ্টান্ত আমরা তাঁহার জীবনে দেখিয়াছি ! তাহার মধ্যে কয়েকটি পাঠককে এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

ঠাকুরের সত্যনিষ্ঠা

দক্ষিণেশ্বরে একদিন পরমা ভক্তিমতী গোপালের মা ঠাকুরকে ভাত রাঁধিয়া খাওয়াইবেন। সব প্রস্তুত ; ঠাকুর খাইতে বসিলেন। বসিয়া দেখেন, ভাতগুলি শক্ত রহিয়াছে—সুসিদ্ধ হয় নাই। ঠাকুর বিরক্ত হইলেন এবং বলিলেন, "এ ভাত কি আমি খেতে পারি ? ওর

ঐ বিষয়ের ১ম দৃষ্টান্ত

হাতে আর কখনও ভাত খাব না।" ঠাকুরের মুখ দিয়া ঐ কথাগুলি বাহির হওয়ায় সকলে ভাবিলেন, ঠাকুর গোপালের মাকে ভবিষ্যতে সতর্ক করিবার নিমিত্ত ঐরূপ বলিয়া ভয় দেখাইলে মাত্র, নতুবা গোপালের মাকে যেরূপ আদর-যত্ন করেন, তাহাতে তাঁহার হাতে আর খাইবেন না—ইহা কি হইতে পারে? কিছুক্ষণ বাদেই আবার গোপালের মাকে ক্ষমা করিবেন এবং ঐ কথাগুলির আর কোন উচ্চবাচ্য হইবে না। কিন্তু ফলে তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। কারণ, উহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলায় অসুখ হইল। ক্রমে উহা বাড়িয়া ঠাকুরের ভাত খাওয়া বন্ধ হইল এবং গোপালের মা-র হাতে আর একদিনও ভাত খাওয়া হইল না।

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বরে ভাবাবস্থায় বলিতেছেন, "এর পরে আর কিছু খাব না, কেবল পায়সান্ন, কেবল পায়সান্ন।"

ঐ ২য় দৃষ্টান্ত

শ্রীশ্রীমা ঐ সময়ে ঠাকুরের খাবার লইয়া আসিতেছিলেন। ঐ কথা শুনিতে পাইয়া এবং ঠাকুরের শ্রীমুখ দিয়া যে কথা যখনি নির্গত হয় তাহা কখনই নিরর্থক হয় না জানিয়া, ভয় পাইয়া বলিলেন—"আমি মাছের ঝোল ভাত রেঁধে দেব, খাবে—পায়েস কেন?" ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় বলিয়া উঠিলেন, "না—পায়সান্ন।" তাহার অল্পকাল পরেই ঠাকুরের গলদেশে অসুখ হওয়ায় বাস্তবিকই আর কোনরূপ ব্যঞ্জনাদি খাওয়া চলিল না—কেবল দুধ-ভাত, দুধ-বার্লি ইত্যাদি খাইয়াই কাল কাটিতে লাগিল।

কলিকাতার প্রসিদ্ধ দানশীল ধনী ৺শম্ভুচন্দ্র মল্লিক মহাশয়কেই

ঠাকুর তাঁহার চারিজন 'রসদ্দারে'র ভিতর দ্বিতীয় রসদ্দার বলিয়া নির্দেশ করিতেন। রাণী রাসমণির কালীবাটীর নিকটই তাঁহার একখানি বাগান ছিল। উহাতে তিনি ভাগবৎ-চর্চায় ঠাকুরের সঙ্গে অনেক কাল কাটাইতেন। ঐ বাগানে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত একটি দাতব্য ঔষধালয়ও ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পেটের অসুখ অনেক সময়ই লাগিয়া থাকিত। একদিন ঐরূপ পেটের অসুখের কথা শম্ভুবাবু জানিতে পারিয়া তাহাকে একটু আফিম সেবন করিতে ও রাসমণির বাগানে ফিরিবার সময় উহা তাঁহার নিকট হইতে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলেন। ঠাকুরও সে কথায় সম্মত হইলেন। তাহার পর কথাবার্তায় ঐ কথা দুইজনেই ভুলিয়া যাইলেন।

ঐ তৃতীয় দৃষ্টান্ত

শম্ভুবাবুর নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া পথে আসিয়া ঠাকুরের ঐ কথা মনে পড়িল এবং আফিম লইবার জন্য পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, শম্ভুবাবু অন্দরে গিয়াছেন। ঠাকুর ঐ বিষয়ের জন্য তাঁহাকে আর না ডাকাইয়া তাঁহার কর্মচারীর নিকট হইতে একটু আফিম চাহিয়া লইয়া রাসমণির বাগানে ফিরিতে লাগিলেন। কিন্তু পথে আসিয়াই ঠাকুরের কেমন একটা ঝোঁক আসিয়া পথ আর দেখিতে পাইলেন না! রাস্তার পাশে যে জলনালী আছে, তাহাতে যেন কে পা টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল! ঠাকুর ভাবিলেন—এ কি? এ তো পথ নয়! অথচ পথও খুঁজিয়া পান না। অগত্যা কোনরূপে দিক ভুল হইয়াছে ঠাওরাইয়া, পুনরায় শম্ভুবাবুর বাগানের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—

জগদম্বা 'বেচালে পা পড়িতে' দেন না

সে দিকের পথ বেশ দেখা যাইতেছে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া পুনরায় শম্ভুবাবুর বাগানের ফটকে আসিয়া সেখান হইতে ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া পুনরায় সাবধানে রাসমণির বাগানের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু দুই-এক পা আসিতে না আসিতে আবার পূর্বের মত হইল—পথ আর দেখিতে পান না! বিপরীত দিকে যাইতে পা টানে! এইরূপ কয়েকবার হইবার পর ঠাকুরের মনে উদয় হইল—"ওঃ, শম্ভু বলিয়াছিল, 'আমার নিকট হইতে আফিম চাহিয়া লইয়া যাইও'; তাহা না করিয়া আমি তাহাকে না বলিয়া তাহার কর্মচারীর নিকট হইতে উহা চাহিয়া লইয়া যাইতেছি, সেজন্যই মা আমাকে যাইতে দিতেছেন না! কর্মচারীর শম্ভুর হুকুম ব্যতীত দেওয়া উচিত নয়, আর আমারও শম্ভু যেমন বলিয়াছে—তাহার নিকট হইতেই লওয়া উচিত। নহিলে যেভাবে আমি আফিম লইয়া যাইতেছি, উহাতে মিথ্যা ও চুরি এই দুটি দোষ হইতেছে; সেইজন্যই মা আমায় অমন করিয়া ঘুরাইতেছেন, ফিরিয়া যাইতে দিতেছেন না!" এই কথা মনে করিয়া শম্ভুবাবুর ঔষধালয়ে প্রত্যাগমন করিয়া দেখেন, সে কর্মচারীও সেখানে নাই—সেও আহারাদি করিতে অন্যত্র গিয়াছে। কাজেই জানালা গলাইয়া আফিমের মোড়কটি ঔষধালয়ের ভিতর নিক্ষেপ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওগো, এই তোমাদের আফিম রহিল"—বলিয়া রাসমণির বাগানের দিকে চলিলেন। এবার যাইবার সময় আর তেমন ঝোঁক নাই; রাস্তাও বেশ পরিষ্কার দেখা যাইতেছে; বেশ চলিয়া গেলেন। ঠাকুর বলিতেন, "মার উপর সম্পূর্ণ ভার

দিয়েছি কিনা ?—তাই মা হাত ধরে আছে। একটুকু বেচালে পা পড়তে দেন না।" ঐরূপ কতই না দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের জীবনে শুনিয়াছি ! চমৎকার ব্যাপার ! আমরা কি এ সত্যনিষ্ঠা, এ সর্বাঙ্গীণ নির্ভরতার এতটুকু কল্পনাতেও অনুভব করিতে পারি ? ইহা কি সেই প্রকারের নির্ভর, ঠাকুর যাহা আমাদিগকে রূপকচ্ছলে বারংবার বলিতেন—"ওদেশে (ঠাকুরের জন্মস্থান কামারপুকুরে) মাঠের মাঝে আল্‌পথ আছে। তার উপর দিয়ে সকলে এক গাঁ থেকে আর এক গাঁয়ে যায়। সরু আল্‌পথ—চলে গেলে পাছে পড়ে যায়, সেজন্য বাপ ছোট ছেলেটিকে কোলে করে নিয়ে যাচ্ছে ; আর বড় ছেলেটি সেয়ানা বলে নিজেই বাপের হাত ধরে সঙ্গে যাচ্ছে। যেতে যেতে একটা শঙ্খচিল বা আর কিছু দেখে ছেলেগুলো আহ্লাদে হাততালি দিচ্ছে। কোলের ছেলেটি জানে বাপ আমায় ধরে আছে, নির্ভয়ে আনন্দ করতে করতে চলেছে। আর যে ছেলেটা বাপের হাত ধরে যাচ্ছিল, সে যেই পথের কথা ভুলে বাপের হাত ছেড়ে হাততালি দিতে গেছে—আর অমনি ঢিপ করে পড়ে গিয়ে কেঁদে উঠলো ! সেই রকম মা যার হাত ধরেছেন, তার আর ভয় নেই ; আর যে মার হাত ধরেছে, তার ভয় আছে—হাত ছাড়লেই পড়ে যাবে।"

এইরূপে ঈশ্বরানুরাগের প্রাবল্যে সংসারের কোনও বস্তু বা ব্যক্তির উপরে মনের একটা বিশেষ আকর্ষণ বা পশ্চাৎটান ছিল না বলিয়াই নির্বিকল্প সমাধিলাভের পথে সাংসারিক কোনরূপ বাসনা-কামনা ঠাকুরের অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায় নাই। দাঁড়াইয়াছিল

কেবল, ঠাকুর যাঁহাকে এতকাল ভক্তিভরে পূজা করিয়া, ভালবাসিয়া, 'সারাৎসারা পরাৎপরা বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতে-ছিলেন—শ্রীশ্রীজগদম্বার সেই 'সৌম্যাঽসৌম্যতরা-শেষসৌমেভ্যস্ত্বতিসুন্দরী' মূর্তি! ঠাকুর বলিতেন, "মন কুড়িয়ে এক করে যাই এনেচি আর অমনি মা-র মূর্তি এসে সামনে দাঁড়াল!—তখন আর তাঁকে ত্যাগ করে তার পারে আগিয়ে যেতে ইচ্ছা হয় না! যতবার মন থেকে সব জিনিস তাড়িয়ে নিরালম্ব হয়ে থাকতে চেষ্টা করি, ততবারই ঐরূপ হয়। শেষে ভেবে চিন্তে মনে খুব জোর এনে, জ্ঞানকে অসি ভেবে, সেই অসি দিয়ে ঐ মূর্তিটাকে মনে মনে দুখানা করে কেটে ফেললুম! তখন মনে আর কিছুই রহিল না—হু হু করে একেবারে নির্বিকল্প অবস্থায় পৌছুল!" আমাদের কাছে এগুলি যেন অর্থহীন কথার কথা মাত্র। কারণ, কখন তো জগদম্বার কোন মূর্তি বা ভাব ঠিক ঠিক আপনার করিয়া লই নাই। কখন তো কাহাকেও সমস্ত প্রাণ দিয়া ভালবাসিতে শিখি নাই। ঐ প্রকার পূর্ণ ভালবাসা, মনের অন্তঃস্থল পর্যন্ত ব্যাপিয়া ভালবাসা রহিয়াছে আমাদের—এই মাংসপিণ্ড শরীর ও মনের উপর! সেজন্যই মৃত্যুতে বা মনের হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্তনে আমাদের এত ভয় হয়! ঠাকুরের তো তাহা ছিল না। সংসারে একমাত্র জগদম্বার পাদপদ্মই মনে-জ্ঞানে সার জানিয়াছিলেন, এবং সেই পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া তাঁহার শ্রীমূর্তির দিবানিশি সেবা করিয়াই কাল কাটাইতেছিলেন; কাজেই ঐ মূর্তিকে যখন একবার কোন

ঠাকুরের নির্বিকল্প ভূমিতে উঠিবার পথে অন্তরায়

প্রকারে মন হইতে সরাইয়া ফেলিলেন, তখন আর মন কি লইয়া সংসারে থাকিবে? একেবারে আলম্বনবিহীন হইয়া, বৃত্তিরহিত হইয়া নির্বিকল্প অবস্থায় যাইয়া দাঁড়াইল। পাঠক, এ কথা বুঝিতে না পার, একবার কল্পনা করিতেও চেষ্টা করিও। তাহা হইলেই বুঝিবে, ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে কতদূর আপনার করিয়াছিলেন—কি 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' মন দিয়া তিনি জগদম্বাকে ভালবাসিয়াছিলেন!

একুশ দিন যে ভাবে থাকিলে শরীর নষ্ট হয়, সেই ভাবে ছয় মাস থাকা

এই নির্বিকল্প অবস্থায় প্রায় নিরন্তর থাকা ঠাকুরের ছয় মাস কাল ব্যাপিয়া হইয়াছিল। ঠাকুর বলিতেন, "যে অবস্থায় সাধারণ জীবেরা পৌঁছুলে আর ফিরতে পারে না, একুশ দিন মাত্র শরীরটে থেকে শুকনো পাতা যেমন গাছ থেকে ঝরে পড়ে তেমনি পড়ে যায়, সেইখানে ছ মাস ছিলুম। কখন কোন্ দিক দিয়ে যে দিন আস্‌ত, রাত যেত, তার ঠিকানাই হ'ত না। মরা মানুষের নাকে মুখে যেমন মাছি ঢোকে—তেমনি ঢুকতো, কিন্তু সাড় হত না। চুলগুলো ধুলোয় ধুলোয় জটা পাকিয়ে গিয়েছিল! হয়তো অসাড়ে শৌচাদি হয়ে গেছে, তারও হুঁশ হয় নাই! শরীরটে কি আর থাকত?—এই সময়েই যেত। তবে এই সময়ে একজন সাধু এসেছিল। তার হাতে রুলের মত একগাছা লাঠি ছিল। সে অবস্থা দেখেই চিনেছিল; আর বুঝেছিল—এ শরীরটে দিয়ে মা-র অনেক কাজ এখনও বাকি আছে, এটাকে রাখতে পারলে অনেক লোকের কল্যাণ হবে! তাই খাবার সময় খাবার এনে মেরে মেরে হুঁশ আনবার চেষ্টা

করত। একটু হুঁশ হচ্চে দেখেই মুখে খাবার গুঁজে দিত। এই রকমে কোন দিন একটু আধটু পেটে যেতো, কোন দিন যেতো না। এই ভাবে ছ মাস গেছে! তারপর এই অবস্থার কতদিন পরে শুনতে পেলুম মার কথা—'ভাবমুখে থাক্, লোকশিক্ষার জন্য ভাবমুখে থাক্!' তারপর অসুখ হল—রক্ত-আমাশয়। পেটে খুব মোচড়, খুব যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণায় প্রায় ছ মাস ভুগে ভুগে তবে শরীরে একটু একটু করে মন নাব্‌লো—সাধারণ মানুষের মত হুঁশ এলো! নতুবা থাক্‌ত থাক্‌ত মন আপনা-আপনি ছুটে গিয়ে সেই নির্বিকল্প অবস্থায় চলে যেত!"

ঠাকুরের সমাধি সম্বন্ধে 'কাপ্তেনের' কথা

বাস্তবিক ঠাকুরের শরীরত্যাগের দশ-বার বৎসর পূর্বেও তাঁহার দর্শনলাভ যাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছিল, তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি তখনও ঠাকুরের কথাবার্তা শুনা বড একটা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিত না। চব্বিশ ঘণ্টা ভাব-সমাধি লাগিয়াই আছে! কথা কহিবে কে? নেপাল রাজসরকারের কর্মচারী শ্রীবিশ্বনাথ উপাধ্যায়—যাঁহাকে ঠাকুর 'কাপ্তেন' বলিয়া ডাকিতেন—মহাশয়ের মুখে আমরা শুনিয়াছি, তিনি একাদিক্রমে তিন অহোরাত্র ঠাকুরকে নিরন্তর সমাধিমগ্ন হইয়া থাকিতে দেখিয়াছেন! তিনি আরও বলিয়াছিলেন, ঐরূপ বহুকালব্যাপী গভীর সমাধির সময় ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে—গ্রীবাদেশ হইতে মেরুদণ্ডের শেষ পর্যন্ত এবং জানু হইতে পদতল পর্যন্ত, উপর হইতে নিম্নের দিকে—মধ্যে মধ্যে গব্যঘৃত মালিশ করা হইত এবং ঐরূপ করা হইলে

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

সমাধির উচ্চভাবভূমি হইতে 'আমি আমার' রাজ্যে আবার নামিতে ঠাকুরের সুবিধা বোধ হইত।

আমাদের নিকট ঠাকুর কতদিন স্বয়ং বলিয়াছেন, "এখানকার মনের স্বাভাবিক গতি উর্দ্ধ্বদিকে (নির্বিকল্পের দিকে)। সমাধি হলে আর নাম্‌তে চায় না। তোদের জন্য জোর করে নামিয়ে আনি। কোন একটা নীচেকার বাসনা না ধর্‌লে নাম্‌বার তো জোর হয় না, তাই 'তামাক খাব,' 'জল খাব,' 'সুক্তো খাব,' 'অমুককে দেখব,' 'কথা কইব,'—এইরূপ একটা ছোটখাট বাসনা মনে তুলে বার বার সেইটে আওড়াতে আওড়াতে তবে মন ধীরে ধীরে নীচে (শরীরে) নামে। আবার নাম্‌তে নাম্‌তে হয়তো সেই দিকে (উর্দ্ধ্বে) চোঁচা দৌড়ুল। আবার তাকে তখন ঐরূপ বাসনা দিয়ে ধরে নামিয়ে আনতে হয়!" চমৎকার ব্যাপার! শুনিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া বসিয়া থাকিতাম, আর ভাবিতাম 'অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছে তাই কর' এ কথার যদি ঐ মানে হয়, তাহা হইলেই ঐরূপ করা আমাদের জীবনে হইয়াছে আর কি! শরণাগত হইয়া থাকাই দেখিতেছি আমাদের একমাত্র উপায়। ঐরূপ করিতে যাইয়াও কিছুদিন বাদে দেখি, বিষম হাঙ্গামা! ঐ পথ আশ্রয় করিতে যাইয়াও দুষ্ট মন মাঝে মাঝে বলিয়া বসে—আমাকে ঠাকুর সকলের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিবেন না কেন? নরেন্দ্রনাথকে যতটা ভালবাসেন আমাকেও ততটা কেন না ভালবাসিবেন? আমি তদপেক্ষা ছোট কিসে? —ইত্যাদি! যাহা হউক এখন সে কথা—আমরা পূর্বানুসরণ করি।

ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের নিজের কথা।

উচ্চাঙ্গের ভাব এবং সমাধিতত্ত্ব সম্বন্ধে আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে যতদূর বুঝিয়াছি, অতঃপর তাহারই কিছু কিছু পাঠককে বলিয়া 'ভাবমুখ' অবস্থাটা যে কি, তাহাই এখন বুঝাইবার চেষ্টা করিব। পূর্বেই বলিয়াছি—উচ্চাবচ যে ভাবই মনে আসুক না কেন, উহার সহিত কোন না কোন প্রকার শারীরিক পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। ইহা আর বুঝাইতে হয় না—নিত্য প্রত্যক্ষের বিষয়। ক্রোধের উদয়ে, একপ্রকার, ভালবাসায় অন্য প্রকার—এইরূপ নিত্যানুভূত সাধারণ ভাবসমূহের আলোচনাতেই উহা সহজে বুঝা যায়। আবার সৎ বা অসৎ কোনপ্রকার চিন্তার সবিশেষ আধিক্য কাহারও মনে থাকিলে তাহার শরীরেও এতটা পরিবর্তন আসিয়া উপস্থিত হয় যে, তাহাকে দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে—ইহার এরূপ প্রকৃতি। 'অমুককে দেখিলেই মনে হয় রাগী, কামুক বা সাধু'—এরূপ কথার নিত্য ব্যবহার হওয়াই ঐ বিষয়ের প্রমাণ। আবার দানব-তুল্য বিকটাকৃতি বিকৃত-স্বভাবাপন্ন লোক যদি, কোন কারণে সৎচিন্তায়, সাধুভাবে নিরন্তর ছয় মাস কাল কাটায় তো তাহার আকৃতি হাব-ভাব পূর্বাপেক্ষা কত কোমল ও সরল হইয়া আসে, তাহাও বোধ হয় আমাদের ভিতর অনেকের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে। পাশ্চাত্য শরীরতত্ত্ববিৎ বলেন—যে প্রকার ভাবই তোমার মনে উঠুক না কেন, উহা তোমার মস্তিষ্কে চিরকালের নিমিত্ত একটি দাগ অঙ্কিত করিয়া যাইবে। এইরূপে ভাল-মন্দ দুই প্রকার ভাবের দুই প্রকার দাগের সমষ্টির স্বল্পাধিক্য লইয়াই

মনোভাবপ্রসূত শারীরিক পরিবর্তন সম্বন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মত

তোমার চরিত্র গঠিত ও তুমি ভাল বা মন্দ লোক বলিয়া পরিগণিত। প্রাচ্যের, বিশেষতঃ ভারতের যোগি-ঋষিগণ বলেন, ঐ দুই প্রকার ভাব মস্তিষ্কে দুই প্রকার দাগ অঙ্কিত করিয়াই শেষ হইল না—ভবিষ্যতে আবার তোমাকে পুনরায় ভাল-মন্দ কর্মে প্রবৃত্ত করিতে পারে এরূপ সূক্ষ্ম প্রেরণাশক্তিতে পরিণত হইয়া মেরুদণ্ডের শেষভাগে অবস্থিত 'মূলাধার' নামক মেরুচক্রে নিত্যকাল অবস্থান করিতে থাকে; জন্মজন্মান্তরে সঞ্চিত ঐরূপ প্রেরণাশক্তিসমূহের উহাই আবাসভূমি। ঐ সকলের নামই সংস্কার বা পূর্ব-সংস্কার, এবং ঐ সকলের নাশ একমাত্র শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হইলে বা নির্বিকল্পসমাধি-লাভ হইলে তবেই হইয়া থাকে। নতুবা দেহ হইতে দেহান্তরে যাইবার সময়ও জীব ঐ সংস্কারের পুঁটুলিটি 'বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ' বগলে করিয়া লইয়া যায়।

কুণ্ডলিনী সঞ্চিত পূর্বসংস্কারের আবাসস্থান ও ঐসকলের নাশ কিরূপে হয়

অদ্বৈতজ্ঞান বা শ্রীভগবানের প্রত্যক্ষ সাক্ষাৎকার হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত শরীর ও মনের পূর্বোক্তরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে। শরীরে কিছু হইলে মনে আঘাত লাগে, আবার মনে কিছু হইলে শরীরে আঘাত অনুভব হয়। আবার ব্যক্তির শরীর-মনের ন্যায়, ব্যক্তির সমষ্টি -সমগ্র মনুষ্যজাতির শরীর :ন এই প্রকার সম্বন্ধ বর্তমান তোমার শরীর-মনের ঘাত-প্রতিঘাত আমার ও অপর সকলের শরীর-মনে লাগে। এইরূপে বাহ্য ও আন্তর, স্থূল ও সূক্ষ্ম জগৎ নিত্য সম্বন্ধে অবস্থিত ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি নিরন্তর

শরীর ও মনের সম্বন্ধ

ঘাত-প্রতিঘাত করিতেছে। সেইজন্যই দেখা যায়—যেখানে সকলে শোকাকুল, সেখানে তোমারও মনে শোকের উদয় হইবে। যেখানে সকলে ভক্তিমান, সেখানে তোমারও মনে বিনা চেষ্টায় ভক্তিভাব আসিবে। এইরূপ অন্যান্য বিষয়েও বুঝিতে হইবে।

সেজন্যই দেখা যায় শারীরিক রোগ ও স্বাস্থ্যের ন্যায় মানসিক বিকার বা ভাবসকলেরও সংক্রামিকা শক্তি আছে। উহারাও অধিকারিভেদে সংক্রমণ করিয়া থাকে। ভগবদনুরাগ উদ্দীপিত করিবার জন্য শাস্ত্র সাধুসঙ্গের এত মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। সেজন্যই ঠাকুর যাহারা তাঁহার নিকট একবার যাইত তাহাদের "এখানে যাওয়া-আসা কোর—প্রথম প্রথম এখানে বেশী বেশী যাওয়া-আসাটা রাখতে হয়" ইত্যাদি বলিতেন। যাক্ এখন সে কথা।

ভাবসকল সংক্রামক বলিয়াই সাধুসঙ্গ অনুষ্ঠেয়

সাধারণ মানসিক ভাবসমূহের ন্যায় শ্রীভগবানের প্রতি একান্ত একনিষ্ঠ তীব্র অনুরাগে যে সমস্ত ভাব মনে উদয় হয়, সে সকলেও অপূর্ব শারীরিক পরিবর্তন আনিয়া দেয়। যথা—ঐরূপ অনুরাগ উপস্থিত হইলে সাধকের রূপরসাদির উপর টান কমিয়া যায়—স্বল্পাহার, স্বল্পনিদ্রা হয়—খাদ্যবিশেষে রুচি ও অন্য প্রকার খাদ্যে বিতৃষ্ণা উপস্থিত হয়—স্ত্রীপুত্রাদি যে সকল ব্যক্তির সহিত মায়িক সম্বন্ধ তাহাকে শ্রীভগবান হইতে বিমুখ করে, তাহাদিগকে বিষবৎ পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয়—বায়ুপ্রধান ধাত্ (ধাতু) হয়—ইত্যাদি; ঠাকুর যেমন বলিতেন, "বিষয়ী লোকের হাওয়া সইতে

একনিষ্ঠা-প্রসূত শারীরিক পরিবর্তন

পারতুম না, আত্মীয়-স্বজনের সংসর্গে যেন দম বন্ধ হয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবার মত হ'ত"; আবার বলিতেন, "ঈশ্বরকে যে ঠিক ঠিক ডাকে, তার শরীরে মহাবায়ু গর-গর করে মাথায় গিয়ে উঠবেই উঠবে" ইত্যাদি।

অতএব দেখা যাইতেছে, ভগবদনুরাগে যে সকল মানসিক পরিবর্তন বা ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, ঐ সকলেরও এক একটা শারীরিক প্রতিকৃতি বা রূপ আছে। মনের দিক দিয়া দেখিয়া বৈষ্ণবতন্ত্র ঐ সকল ভাবকে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; আর ঐ সকল মানসিক বিকারকে আশ্রয় করিয়া যে সকল শারীরিক পরিবর্তন উপস্থিত হয়, তাহার দিক দিয়া দেখিয়া যোগশাস্ত্র মেরুদণ্ড ও মস্তিষ্কান্তর্গত কুণ্ডলিনীশক্তি ও ষট্চক্রাদির বর্ণনা করিয়াছেন।

ভক্তিপথ ও যোগমার্গের সামঞ্জস্য

কুণ্ডলী বা কুণ্ডলিনীশক্তির সংক্ষেপে পরিচয় আমরা ইতঃপূর্বেই দিয়াছি। ইহজন্মে এবং পূর্ব পূর্ব জন্মজন্মান্তরে যত মানসিক পরিবর্তন বা ভাব জীবের উপস্থিত হইতেছে ও হইয়াছিল, তৎসমূহের সূক্ষ্ম শারীরিক প্রতিকৃতি-অবলম্বনে অবস্থিতা মহা ওজস্বিনী প্রেরণাশক্তিকেই পতঞ্জলিপ্রমুখ ঋষিগণ ঐ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। যোগী বলেন, উহা বদ্ধজীবে প্রায় সম্পূর্ণ সুপ্ত বা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে। উহার ঐরূপ সুপ্তাবস্থাতেই জীবের স্মৃতি, কল্পনা প্রভৃতি বৃত্তির উদয়। উহা যদি কোনরূপে সম্পূর্ণ জাগরিত বা প্রকাশাবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তবেই

কুণ্ডলিনী কাহাকে বলে ও তাহার সুপ্ত এবং জাগ্রৎ অবস্থা

জীবকে পূর্ণজ্ঞানলাভে প্রেরণ করিয়া শ্রীভগবানের সাক্ষাৎকার করাইয়া দেয়। যদি বল, সুষুপ্তাবস্থায় কুণ্ডলিনী-শক্তি হইতে কেমন করিয়া স্মৃতি-কল্পনা প্রভৃতির উদয় হ'তে পারে? তদুত্তরে বলি, সুপ্ত হইলেও বাহিরের রূপ-রসাদি পদার্থ পঞ্চেন্দ্রিয়-দ্বার দিয়া নিরন্তর মস্তিষ্কে যে আঘাত করিতেছে তজ্জন্য একটু-আধটু ক্ষণমাত্রস্থায়ী চেতনা তাহার আসিয়া উপস্থিত হয়। যেমন মশকদষ্ট নিদ্রিত ব্যক্তির হস্ত স্বতই মশককে আঘাত বা কণ্ডূয়নাদি করে, সেইরূপ।

জাগরিতা কুণ্ডলিনীর গতি—ষট্চক্রভেদ ও সমাধি

যোগী বলেন, মস্তিষ্কমধ্যগত ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ অবকাশ বা আকাশে অখণ্ডসচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মার বা শ্রীভগবানের জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান। তাঁহার প্রতি পূর্বোক্ত কুণ্ডলীশক্তির বিশেষ অনুরাগ অথবা শ্রীভগবান তাহাকে নিরন্তর আকর্ষণ করিতেছেন। কিন্তু জাগরিতা না থাকায় কুণ্ডলীশক্তির সে আকর্ষণ অনুভব হইতেছে না। জাগরিতা হইবামাত্র উহা শ্রীভগবানের ঐ আকর্ষণ অনুভব করিবে এবং তাঁহার নিকটস্থ হইবে। ঐরূপে কুণ্ডলীর শ্রীভগবানের নিকটস্থ হইবার পথও আমাদের প্রত্যেকের শরীরে বর্তমান। মস্তিষ্ক হইতে আরব্ধ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়া বরাবর ঐ পথ মেরুদণ্ডের মূলে 'মূলাধার' নামক মেরুচক্র পর্যন্ত আসিয়াছে। ঐ পথই যোগশাস্ত্র-কথিত 'সুষুম্নাবর্ত্ম'। পাশ্চাত্য শারীরতত্ত্ববিৎ ঐ পথকেই canal centralis (মধ্যপথ) বলিয়া নির্দেশ করিয়াছে, কিন্তু উহার কোনরূপ আবশ্যকতা বা কার্যকারিতা এ পর্যন্ত খুঁজিয়া পায় নাই। ঐ পথ দিয়াই কুণ্ডলী পূর্বে

পরমাত্মা হইতে বিযুক্তা হইয়া মস্তিষ্ক হইতে মেরুচক্রে বা মূলাধারে আসিয়া উপস্থিত হইয়া নিদ্রিতা হইয়াছে। আবার ঐ পথ দিয়াই উহা মেরুদণ্ডমধ্যে ঊর্ধ্বে ঊর্ধ্বে অবস্থিত ছয়টি চক্র ক্রমে ক্রমে অতিক্রম করিয়া পরিশেষে মস্তিষ্কে আসিয়া উপনীত হয়।[১] কুণ্ডলী জাগরিতা হইয়া এক চক্র হইতে অন্য চক্রে যেমনি আসিয়া উপস্থিত হয়, অমনি জীবের এক এক প্রকার অভূতপূর্ব উপলব্ধি হইতে থাকে; এবং ঐ প্রকারে যখনি উহা মস্তিষ্কে উপনীত হয়, তখনি জীবের ধর্মবিজ্ঞানের চরমোপলব্ধি বা অদ্বৈতজ্ঞানে 'কারণং কারণানাং' পরমাত্মার সহিত তন্ময়ত্ব আসে। তখনই জীবের ভাবেরও চরমোপলব্ধি হয় বা যে মহাভাবঅবলম্বনে অপর সকল ভাব মানবমনে সর্বক্ষণ উদিত হইতেছে, সেই 'ভাবাতীত ভাবে' তন্ময় হইয়া অবস্থানকরা-রূপ অবস্থা আসে।

ঐ সম্বন্ধে ঠাকুরের অনুভব

কি সরল কথা দিয়াই না ঠাকুর যোগের এই সকল জটিল তত্ত্ব আমাদিগকে বুঝাইতেন! বলিতেন, "দ্যাখ, সড় সড় করে একটা পা থেকে মাথায় গিয়ে উঠে! যতক্ষণ না সেটা মাথায় গিয়ে উঠে ততক্ষণ হুঁশ থাকে; আর যেই সেটা মাথায় গিয়ে উঠলো আর একেবারে বেব্‌ভুল হয়ে যাই, তখন আর দেখাশুনাই থাকে না, তা কথা

১ যোগশাস্ত্রে এই ছয়টি মেরুচক্রের নাম ও বিশেষ বিশেষ অবস্থানস্থল পর পর নির্দিষ্ট আছে। যথা—মেরুদণ্ডের শেষভাগে 'মূলাধার' (১) তদূর্ধ্বে লিঙ্গমূলে 'স্বাধিষ্ঠান' (২), তদূর্ধ্বে নাভিস্থলে 'মণিপুর' (৩), তদূর্ধ্বে হৃদয়ে 'অনাহত' (৪), তদূর্ধ্বে কণ্ঠে 'বিশুদ্ধ' (৫), তদূর্ধ্বে ভ্রূমধ্যে 'আজ্ঞা' (৬), অবশ্য এই ছয়টি চক্রই মেরুদণ্ডের মধ্যস্থ সুষুম্না পথেই বর্তমান—অতএব 'হৃদয়' 'কণ্ঠ' ইত্যাদি শব্দের দ্বারা তদ্বিপরীতে অবস্থিত মেরুমধ্যস্থ স্থলই লক্ষিত হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

কওয়া ! কথা কইবে কে ?—'আমি' 'তুমি' এ বুদ্ধিই চলে যায় ! মনে করি তোদের সব বলবো—সেটা উঠতে উঠতে কত কি দর্শন-টর্শন হয় সব কথা বলবো। যতক্ষণ সেটা (হৃদয় ও কণ্ঠ দেখাইয়া) এ অবধি বা এই অবধি বড় জোর উঠেছে, ততক্ষণ বলা চলে ও বলি ; কিন্তু যেই সেটা (কণ্ঠ দেখাইয়া) এখান ছাড়িয়ে উঠলো, আর অমনি যেন কে মুখ চেপে ধরে, আর বেব্‌ভুল হয়ে যায়—সামলাতে পারি নি ! (কণ্ঠ দেখাইয়া) ওর উপরে গেলে কি রকম সব দর্শন হয় তা বলতে গিয়ে যেই ভাবচি কি রকম দেখিছি, আর অমনি মন হুস্ করে উপরে উঠে যায়—আর বলা যায় না !"

আহা, কতদিন যে ঠাকুর কণ্ঠের উপরিস্থ চক্রে মন উঠিলে কিরূপ দর্শনাদি হয় তাহা অশেষ প্রয়াসপূর্বক সামলাইয়া আমাদের নিকট বলিতে যাইয়া অপারক হইয়াছেন, তাহা বলা যায় না ! আমাদের এক বন্ধু বলেন, "এক দিন ঐরূপে খুব জোর করিয়া বলিলেন, 'আজ তোদের কাছে সব কথা বলবো, একটুও লুকোবো না'—বলিয়া আরম্ভ করিলেন। হৃদয় ও কণ্ঠ পর্যন্ত সকল চক্রাদির কথা বেশ বলিলেন, তারপর ভ্রূমধ্যস্থল দেখাইয়া বলিলেন, 'এইখানে মন উঠলেই পরমাত্মার দর্শন হয় ও জীবের সমাধি হয়। তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে কেবল একটি স্বচ্ছ পাতলা পর্দামাত্র আড়াল (ব্যবধান) থাকে। সে তখন এইরকম ছাখে',—বলিয়া যেই পরমাত্মার দর্শনের কথা বিশেষ করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, অমনি সমাধিস্থ হইলেন। সমাধিভঙ্গে পুনরায় বলিতে চেষ্টা করিলেন, পুনরায় সমাধিস্থ

ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিকালের অনুভব বলিবার চেষ্টা

হইলেন! এইরূপ বার বার চেষ্টার পর সজলনয়নে আমাদের বলিলেন, 'ওরে, আমি তো মনে করি সব কথা বলি, এতটুকুও তোদের কাছে লুকোবো না, কিন্তু মা কিছুতেই বলতে দিলে না —মুখ চেপে ধরলে!' আমরা অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলাম— এ কি ব্যাপার! দেখিতেছি উনি এত চেষ্টা করিতেছেন, বলিবেন বলিয়া। না বলিতে পারিয়া উঁহার কষ্টও হইতেছে বুঝিতেছি, কিন্তু কিছুতেই পারিতেছেন না—মা বেটী কিন্তু ভারি দুষ্ট! উনি ভাল কথা বলিবেন, ভগবদ্দর্শনের কথা বলিবেন, তাহাতে মুখ চাপিয়া ধরা কেন বাপু? তখন কি আর বুঝি যে, মন-বুদ্ধি যাহাদের সাহায্যে বলা-কহাগুলো হয়, তাহাদের দৌড় বড় বেশী দূর নয়; আর তাহারা যতদূর দৌড়াইতে পারে তাহার বাহিরে না গেলে পরমাত্মার পূর্ণ দর্শন হয় না! ঠাকুর যে আমাদের প্রতি ভালবাসায় অসম্ভবকে সম্ভব করিবার চেষ্টা করিতেছেন—এই কথা কি তখন বুঝিতে পারিতাম?"

কুণ্ডলিনী-শক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে যে যে রূপ অনুভব হয়, তৎসম্বন্ধে ঠাকুর আরও বিশেষ করিয়া বলিতেন, "দেখ, যেটা সড় সড় করে মাথায় উঠে, সেটা সব সময় এক রকম ভাবে উঠে না। শাস্ত্রে সেটার পাঁচ রকম গতির কথা আছে—যথা, পিপীলিকাগতি—যেমন পিঁপড়েগুলো খাবার মুখে করে সার দিয়ে সুড়সুড় করে যায়, সেই রকম পা থেকে একটা সুড়সুড়ানি আরম্ভ হয়ে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে, মাথা পর্যন্ত যায় আর সমাধি হয়! ভেকগতি—ব্যাঙগুলো

সমাধিপথে কুণ্ডলিনীর পাঁচ প্রকারের গতি।

যেমন টুপ টুপ টুপ—টুপ টুপ টুপ ক'রে দু-তিন বার লাফিয়ে একটু থামে, আবার দু-তিন বার লাফিয়ে আবার একটু থামে, সেইরকম ক'রে কি একটা পায়ের দিক থেকে মাথায় উঠছে বোঝা যায়; আর যেই মাথায় উঠলো আর সমাধি! সর্পগতি—সাপগুলো যেমন লম্বা হয়ে বা পুঁটুলি পাকিয়ে চুপ ক'রে পড়ে আছে, আর যেই সামনে খাবার (শিকার) দেখেছে বা ভয় পেয়েছে, অমনি কিলবিল কিলবিল ক'রে এঁকে বেঁকে ছোটে, সেইরকম কোরে ওটা কিলবিল ক'রে একেবারে মাথায় গিয়ে উঠে আর সমাধি! পক্ষিগতি—পক্ষিগুলো যেমন এক জায়গা থেকে আর এক যায়গায় গিয়ে বসবার সময় হুস ক'রে উড়ে কখন একটু উঁচুতে উঠে, কখন একটু নীচুতে নাবে, কিন্তু কোথাও বিশ্রাম করে না, একেবারে যেখানে বসবে মনে করেছে সেইখানে গিয়ে বসে, সেইরকম ক'রে ওটা মাথায় উঠে ও সমাধি হয়! বাঁদরগতি—হনুমানগুলো যেমন একগাছ থেকে আর এক গাছে যাবার সময় 'উউপ' ক'রে এক ডাল থেকে আর এক ডালে গিয়ে পড়লো, সেখান থেকে 'উউপ' ক'রে আর এক ডালে গিয়ে পড়লো এইরূপে দু-তিন লাফে যেখানে মনে করেছে সেখানে উপস্থিত হয়, সেই রকম ক'রে ওটাও দু-তিন লাফে মাথায় গিয়ে উঠে বোঝা যায় ও সমাধি হয়।"

কুণ্ডলিনীশক্তি সুষুম্নাপথে উঠিবার কালে প্রতি চক্রে কি কি প্রকার দর্শন হয় তদ্বিষয়ে বলিতেন, "বেদান্তে আছে সপ্ত ভূমিকার কথা। এক এক ভূমি হতে এক এক রকম দর্শন হয়। মনের স্বভাবতঃ নীচের তিন ভূমিতে ওঠা-নামা, ঐ

দিকেই দৃষ্টি—গুহ্য, লিঙ্গ, নাভি—খাওয়া, পরা, রমণ ইত্যাদিতে। ঐ তিন ভূমি ছাড়িয়ে যদি হৃদয়ে উঠে তো তখন তাঁর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। কিন্তু হৃদয়ে কখন কখন উঠলেও মন আবার নীচের তিন ভূমি—গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যায়। হৃদয় ছাড়িয়ে যদি কারো মন কণ্ঠে ওঠে তো সে আর ঈশ্বরীয় কথা ছাড়া আর কোন কথা,—যেমন বিষয়ের কথা-টথা, কইতে পারে না।

বেদান্তের সপ্তভূমি ও প্রত্যেক ভূমিলব্ধ আধ্যাত্মিক দর্শন সম্বন্ধে ঠাকুরের কথা

তখন তখন এমনি হ'ত—বিষয়কথা যদি কেউ কয়েছে তো মনে হ'ত মাথায় লাঠি মার্‌লে; দূরে, পঞ্চবটীতে পালিয়ে যেতাম, যেখানে ওসব কথা শুনতে পাব না। বিষয়ী দেখ্‌লে ভয়ে লুকোতুম! আত্মীয়-স্বজনকে যেন কূপ বলে মনে হ'ত—মনে হ'ত তারা যেন টেনে কূপে ফেল্‌বার চেষ্টা কর্‌ছে, পড়ে যাব আর উঠ্‌তে পারব না। দম বন্ধ হয়ে যেতো, মনে হ'ত যেন প্রাণ বেরোয় বেরোয়—সেখান থেকে পালিয়ে এলে তবে শান্তি হ'ত!—কণ্ঠে উঠলেও মন আবার গুহ্য, লিঙ্গ, নাভিতে নেমে যেতে পারে, তখনও সাবধানে থাকতে হয়। তারপর কণ্ঠ ছাড়িয়ে যদি কারো মন ভ্রূমধ্যে ওঠে তো তার আর পড়বার ভয় নেই। তখন পরমাত্মার দর্শন হয়ে নিরন্তর সমাধিস্থ থাকে। এখানটায় আর সহস্রারের মাঝে একটা কাঁচের মত স্বচ্ছ পর্দা-মাত্র আড়াল আছে। তখন পরমাত্মা এত নিকটে যে, মনে হয় যেন তাঁতে মিশে গেছি, এক হয়ে গেছি; কিন্তু তখনও এক হয় নি। এখান থেকে মন যদি নামে তো বড় জোর কণ্ঠ বা হৃদয় পর্যন্ত নামে—তার নীচে আর নামতে পারে না।

জীবকোটিরা এখান থেকে আর নামে না—একুশ দিন নিরন্তর সমাধিতে থাকবার পর ঐ আড়ালটা বা পর্দাটা ভেদ হয়ে যায়, আর তাঁর সঙ্গে একেবারে মিশে যায়। সহস্রারে পরমাত্মার সঙ্গে একেবারে মেশামেশি হয়ে যাওয়াই সপ্তম ভূমিতে উঠা।"

ঠাকুরকে ঐ সব বেদ-বেদান্ত, যোগ-বিজ্ঞানের কথা কহিতে শুনিয়া আমাদের কেহ কেহ আবার কখন কখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিত, 'মশাই, আপনি তো লেখা-পড়ার কখন ধার ধারেন নি, এত সব জানলেন কোথা থেকে ?' অদ্ভুত ঠাকুরের ঐ অদ্ভুত প্রশ্নেও বিরক্তি নাই ! একটু হাসিয়া বলিতেন, "নিজে পড়ি নাই, কিন্তু ঢের সব যে শুনেছি গো ? সে সব মনে আছে। অপরের কাছ থেকে, ভাল ভাল পণ্ডিতের কাছ থেকে, বেদ-বেদান্ত দর্শন-পুরাণ সব শুনেছি। শুনে, তাদের ভেতর কি আছে জেনে, তারপর সেগুলোকে (গ্রন্থগুলোকে) দড়ি দিয়ে মালা ক'রে গেঁথে গলায় পরে নিয়েচি—'এই নে তোর শাস্ত্র-পুরাণ, আমায় শুদ্ধা ভক্তি দে' ব'লে মার পাদপদ্মে ফেলে দিয়েছি !"

ঠাকুরের শ্রুতিধরত্ব

বেদান্তের অদ্বৈতভাব বা ভাবাতীত ভাব সম্বন্ধে বলিতেন, "ওটা সব শেষের কথা। কি রকম জানিস ?—যেমন অনেক দিনের পুরোণো চাকর। মনিব তার গুণে খুশী হ'য়ে তাকে সকল কথায় বিশ্বাস ক'রে, সব বিষয়ে পরামর্শ করে। একদিন খুব খুশী হয়ে তার হাত ধরে নিজের গদিতেই বসাতে গেল ! চাকর সঙ্কোচ ক'রে 'কি

ঠাকুরের অদ্বৈতভাব সহজে বুঝান

কর, কি কর' বল্‌লেও মনিব জোর ক'রে টেনে বসিয়ে বল্‌লে, 'আঃ, বস্ না! তুইও যে, আমিও সে'—সেই রকম।"

আমাদের জনৈক বন্ধু[১] এক সময়ে বেদান্তচর্চায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন। ঠাকুর তখন বর্তমান, এবং উঁহার আকুমার ব্রহ্মচর্য, ভক্তি, নিষ্ঠা প্রভৃতির জন্য উঁহাকে বিশেষ ভালবাসিতেন। বেদান্তচর্চা ও ধ্যান-ভজনাদিতে নিবিষ্ট হইয়া বন্ধুটি ঠাকুরের নিকট পূর্বে পূর্বে যেমন ঘন ঘন যাতায়াত করিতেন সেরূপ কিছুদিন করেন নাই বা করিতে পারেন নাই। ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে বিষয় অলক্ষিত থাকে নাই। বন্ধুটির সঙ্গে যাতায়াত করিতে এমন এক ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে একাকী দেখিয়া ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি রে, তুই যে একলা—সে আসে নি?" জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি বলিল, "সে মশাই আজকাল খুব বেদান্তচর্চায় মন দিয়েছে। রাত দিন পাঠ, বিচারতর্ক নিয়ে আছে। তাই বোধ হয় সময় নষ্ট হবে ব'লে আসে নি।" ঠাকুর শুনিয়া আর কিছুই বলিলেন না।

ঐ দৃষ্টান্ত—স্বামী তুরীয়ানন্দ

উহার কিছুদিন পরেই, আমরা যাঁহার কথা বলিতেছি তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "কি গো, তুমি নাকি আজকাল খুব বেদান্তবিচার কর্‌চ? তা বেশ, বেশ। তা বিচার তো খালি এই গো—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,—না আর কিছু?"

বেদান্ত আর কি? ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—এই ধারণা

বন্ধু—আজ্ঞা হাঁ, আর কি?

১। স্বামী তুরীয়ানন্দ।

বন্ধু বলেন, বাস্তবিকই ঠাকুর সেদিন ঐ কয়টি কথায় বেদান্ত সম্বন্ধে তাঁহার চক্ষু যেন সম্পূর্ণ খুলিয়া দিয়াছিলেন। কথাগুলি শুনিয়া তিনি বিস্মিত হইয়া ভাবিয়াছিলেন—বাস্তবিকই তো, ঐ কয়টি কথা হৃদয়ে ধারণা হইলে বেদান্তের সকল কথাই বুঝা হইল!

ঠাকুর—শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা—আগে শুন্‌লে; তারপর মনন—বিচার ক'রে মনে মনে পাকা কর্‌লে; তারপর নিদিধ্যাসন—মিথ্যা বস্তু জগৎকে ত্যাগ ক'রে সত্যবস্তু ব্রহ্মের ধ্যানে মন লাগালে—এই। কিন্তু তা না হয়ে শুন্‌লুম, বুঝলুম কিন্তু যেটা মিথ্যা সেটাকে ছাড়্‌তে চেষ্টা করলুম না—তা হ'লে কি হবে? সেটা হচ্ছে সংসারীদের জ্ঞানের মত; ও রকম জ্ঞানে বস্তুলাভ হয় না। ধারণা চাই, ত্যাগ চাই—তবে হবে। তা না হ'লে, মুখে বল্‌চ বটে, 'কাঁটা নেই, খোঁচা নেই', কিন্তু যেই হাত দিয়েছ অমনি প্যাট্‌ ক'রে কাঁটা ফুটে উহুঃ উহুঃ ক'রে উঠতে হবে, মুখে বল্‌চ 'জগৎ নেই, অসৎ—একমাত্র ব্রহ্মই আছেন' ইত্যাদি, কিন্তু যেই জগতের রূপরসাদি বিষয় সম্মুখে আসা, অমনি সেগুলো সত্যজ্ঞান হয়ে বন্ধনে পড়া। পঞ্চবটীতে এক সাধু এসেছিল। সে লোকজনের সঙ্গে খুব বেদান্ত-টেদান্ত বলে। তারপর একদিন শুনলুম, একটা মাগীর সঙ্গে নষ্ট-ঘষ্ট হয়েছে। তারপর ওদিকে শৌচে গিয়েছি, দেখি সে বসে আছে। বল্‌লুম, 'তুমি এত বেদান্ত-টেদান্ত বল, আবার এ সব কি?' সে বল্‌লে, 'তাতে কি? আমি তোমাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি তাতে দোষ নেই। যখন জগৎটাই তিন কালে মিথ্যা হল, তখন ঐটেই কি সত্য হবে? ওটাও মিথ্যা।'

আমি তো শুনে বিরক্ত হয়ে বলি, 'তোর অমন বেদান্তজ্ঞানে আমি মুতে দি!' ও সব হচ্ছে সংসারী, বিষয়ী জ্ঞানীর জ্ঞান। ও জ্ঞান জ্ঞানই নয়।

বন্ধু বলেন, সেদিন ঐ পর্যন্ত কথাই হইল। কথাগুলি ঠাকুর তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পঞ্চবটীতলে বেড়াইতে বেড়াইতে বলিলেন। ইতিপূর্বে তাঁহার ধারণা ছিল—উপনিষৎ, পঞ্চদশী ইত্যাদি নানা জটিল গ্রন্থ অধ্যয়ন না করিলে, সাংখ্য ন্যায়াদি দর্শনে ব্যুৎপত্তিলাভ না করিলে বেদান্ত কখনই বুঝা যাইবে না এবং মুক্তিলাভও সুদূর-পরাহত থাকিবে। ঠাকুরের সেদিনকার কথাতেই বুঝিলেন, বেদান্তের যত কিছু বিচার সব ঐ ধারণাটি হৃদয়ে দৃঢ় করিবার জন্য। ঝুড়ি ঝুড়ি দর্শন ও বিচার-গ্রন্থ পড়িয়া যদি কাহারও মনে 'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা' কথাটি নিশ্চয় ধারণা না হয়, তবে ঐ সকল পড়া না পড়া উভয়ই সমান। ঠাকুরের নিকট সেদিন তিনি বিদায় গ্রহণ করিলেন এবং তখন হইতে গ্রন্থপাঠাদি অপেক্ষা সাধন-ভজনেই অধিক মনোনিবেশ করিবেন—ঐরূপ নানাকথা ভাবিতে ভাবিতে কলিকাতার দিকে ফিরিলেন। এইরূপে তিনি সাধন-সহায়ে ঈশ্বর প্রত্যক্ষ করিবার সঙ্কল্প মনে স্থির ধারণা করিয়া তদবধি তদনুরূপ কার্যেই বিশেষভাবে মনোনিবেশ করিলেন।

ঠাকুর কলিকাতায় কাহারও বাটীতে আগমন করিলে অল্পক্ষণের মধ্যেই সে কথা তাঁহার বিশিষ্ট ভক্তগণের মধ্যে জানাজানি হইয়া যাইত। কতকগুলি লোক যে ঐ কার্যের বিশেষভাবে ভার লইয়া ঐ কথা সকলকে জানাইয়া আসিতেন তাহা নহে। কিন্তু ভক্তদিগের প্রাণ ঠাকুরকে সর্বদা দর্শন

করিবার জন্য এতই উন্মুখ হইয়া থাকিত এবং কার্যগতিকে দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যাইতে না পারিলে পরস্পরের বাটীতে সর্বদা গমনাগমন করিয়া তাঁহার কথাবার্তায় এত আনন্দানুভব করিত যে, তাহাদের ভিতর একজন কোনরূপে ঠাকুরের আগমন-সংবাদ জানিতে পারিলেই অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উহা অনেকের ভিতর বিনা চেষ্টায় মুখে মুখে রাষ্ট্র হইয়া পড়িত। ঠাকুরের শক্তিতে ভক্তগণ পরস্পরে কি যে এক অনির্বচনীয় প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহা পাঠককে বুঝান দুষ্কর। কলিকাতায় বাগবাজার, সিমলা ও আহিরীটোলা পল্লীতেই ঠাকুরের অনেক ভক্তেরা বাস করিতেন, তজ্জন্য ঐ তিন স্থানেই ঠাকুরের আগমন অধিকাংশ সময়ে হইত। তন্মধ্যে আবার বাগবাজারেই তাঁহার অধিক পরিমাণে আগমন হইত।

পূর্বোক্ত ঘটনার কিছুকাল পরে ঠাকুর একদিন বাগবাজারে ৺বলরাম বসু মহাশয়ের বাটীতে শুভাগমন করিয়াছেন। বাগবাজার অঞ্চলের ভক্তগণ সংবাদ পাইয়া অনেকে উপস্থিত হইলেন। আমাদের পূর্বোক্ত বন্ধুর আবাস অতি নিকটেই ছিল। ঠাকুর তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করায় পাড়ার পরিচিত জনৈক প্রতিবেশী যুবক যাইয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া আসিলেন। বলরামবাবুর বাটীর দ্বিতলের প্রশস্ত বৈঠকখানায় প্রবেশ করিয়াই বন্ধু ভক্তমণ্ডলীপরিবৃত ঠাকুরকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিয়া নিকটেই একপার্শ্বে উপবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরও তাঁহাকে সহাস্যে কুশলপ্রশ্নমাত্র করিয়াই উপস্থিত প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন।

ভাব, সমাধি ও দর্শন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

দুই-একটি কথার ভাবেই বন্ধু বুঝিতে পারিলেন, ঠাকুর উপস্থিত সকলকে বুঝাইতেছেন—জ্ঞান বল, ভক্তি বল, দর্শন বল, কিছুই ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন হইবার নহে। শুনিতে শুনিতে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর তাঁহার মনের ভুল ধারণাটি দূর করিবার জন্যই অদ্য যেন ঐ প্রসঙ্গ উঠাইয়াছেন। মনে হইতে লাগিল, ঠাকুর ঐ সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিতেছেন তাহা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছেন!

ঈশ্বরকৃপা ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হয় না

শুনিলেন, ঠাকুর বলিতেছেন—"কি জান? কাম-কাঞ্চনকে ঠিক ঠিক মিথ্যা ব'লে বোধ হওয়া জগৎটা তিন কালেই অসৎ ব'লে ঠিক ঠিক মনে জ্ঞানে ধারণা হওয়া কি কম কথা? তাঁর দয়া না হলে কি হয়? তিনি কৃপা করে ঐরূপ ধারণা যদি করিয়ে দেন তো হয়। নইলে মানুষ নিজে সাধন ক'রে সেটা কি ধারণা কর্‌তে পারে? তার কতটুকু শক্তি! সেই শক্তি দিয়ে সে কতটুকু চেষ্টা কর্‌তে পারে?" এইরূপে ঈশ্বরের দয়ার কথা বলিতে বলিতে ঠাকুরের সমাধি হইল। কিছুক্ষণ পরে অর্ধবাহ্যদশাপ্রাপ্ত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "একটা ঠিক কর্‌তে পারে না, আবার আর একটা চায়!" ঐ কথাগুলি বলিয়াই ঠাকুর ঐরূপ ভাবাবস্থায় গান ধরিলেন—

"ওরে কুশীলব, করিস কি গৌরব,
ধরা না দিলে কি পারিস্ ধরিতে।"

গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের দুই চক্ষে এত জলধারা বহিতে লাগিল যে, বিছানার চাদরের খানিকটা ভিজিয়া গেল! বন্ধুও

সে অপূর্ব শিক্ষায় দ্রবীভূত হইয়া কাঁদিয়া আকুল। কতক্ষণে তবে দুইজনে প্রকৃতিস্থ হইলেন। বন্ধু বলেন, "সে শিক্ষা চিরকাল আমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। সেদিন হইতেই বুঝিলাম ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন কিছুই হইবার নহে।"

শশধর পণ্ডিত ঠাকুরকে যোগ-শক্তিবলে রোগ সারাইতে বলায় ঠাকুরের উত্তর

ঠাকুরের অদ্বৈতজ্ঞানসম্বন্ধীয় গভীরতা সম্বন্ধে আর একটি কথা এখানে আমরা না বলিয়া থাকিতে পারিতেছিনা। ঠাকুরের তখন অসুখ—কাশীপুরের বাগানে—বাড়াবাড়ি। শ্রীযুত শশধর তর্কচূড়ামণি, সঙ্গে কয়েকজন, অসুখের কথা শুনিয়া দেখিতে আসিলেন। পণ্ডিতজী কথায় কথায় ঠাকুরকে বলিলেন, "মহাশয়, শাস্ত্রে পড়েছি আপনাদের ন্যায় পুরুষ ইচ্ছামাত্রেই শারীরিক রোগ আরাম করিয়া ফেলিতে পারেন। আরাম হোক মনে ক'রে মন একাগ্র ক'রে একবার অসুস্থ স্থানে কিছুক্ষণ রাখ্‌লেই সব সেরে যায়। আপনার একবার ঐরূপ করলে হয় না?"

ঠাকুর বলিলেন, "তুমি পণ্ডিত হ'য়ে একথা কি ক'রে বল্লে গো? যে মন সচ্চিদানন্দকে দিয়েছি, তাকে সেখান থেকে তুলে এনে এ ভাঙ্গা হাড়-মাসের খাঁচাটার উপর দিতে কি আর প্রবৃত্তি হয়?"

স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতি ভক্তগণের ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে অনুরোধ ও ঠাকুরের উত্তর

পণ্ডিতজী নিরুত্তর হইলেন; কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ-প্রমুখ ভক্তেরা নিশ্চেষ্ট রহিলেন না। পণ্ডিতজী চলিয়া যাইবার পরেই ঠাকুরকে ঐরূপ করিবার জন্য একেবারে বিশেষভাবে ধরিয়া বসিলেন। বলিলেন, "আপনাকে অসুখ সারাতেই হবে, আমাদের জন্য সারাতে হবে।"

ঠাকুর—আমার কি ইচ্ছা রে, যে আমি রোগে ভুগি; আমি তো মনে করি সারুক, কিন্তু সারে কই? সারা, না সারা, মা-র হাত।

স্বামী বিবেকানন্দ—তবে মাকে বলুন সারিয়ে দিতে, তিনি আপনার কথা শুন্‌বেনই শুন্‌বেন।

ঠাকুর—তোরা তো বল্‌ছিস্, কিন্তু ও কথা যে মুখ দিয়ে বেরোয় না রে!

শ্রীযুত স্বামীজি—তা হবে না মশাই, আপনাকে বল্‌তেই হবে। আমাদের জন্য বল্‌তে হবে।

ঠাকুর—আচ্ছা, দেখি, পারি তো বল্‌বো।

কয়েক ঘণ্টা পরে শ্রীযুত স্বামীজি পুনরায় ঠাকুরের নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মশায়, বলেছিলেন? মা কি বললেন?"

ঠাকুর—মাকে বল্‌লুম (গলার ক্ষত দেখাইয়া), 'এইটের দরুন কিছু খেতে পারি না; যাতে দুটি খেতে পারি করে দে।' তা মা বললেন—তোদের সকলকে দেখিয়ে—'কেন? এই যে এত মুখে খাচ্চিস্!' আমি আর লজ্জায় কথাটি কইতে পারলুম না।

কি অদ্ভুত দেহবুদ্ধির অভাব! কি অপূর্ব অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থান! তখন ছয়মাস কাল ধরিয়া ঠাকুরের নিত্য আহার, বোধ হয় চারি-পাঁচ ছটাক বার্লি মাত্র, সেই অবস্থায় জগন্মাতা যাই বলিয়াছেন, 'এই যে এত মুখে খাচ্চিস্', অমনি "কি কুকর্ম করিয়াছি, এই একটা ক্ষুদ্র শরীরকে 'আমি' বলিয়াছি!"—মনে করিয়া ঠাকুর

ঠাকুরের অদ্বৈতভাবের গভীরতা

লজ্জায় হেঁটমুখ ও নিরুত্তর হইলেন। পাঠক, এ ভাব কি একটুও কল্পনায় আনিতে পার?

কি অদ্ভুত ঠাকুরের সঙ্গে দেখাই না আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে! জ্ঞান-ভক্তি, যোগ-কর্ম, পুরান-নবীন, সকলপ্রকার ধর্মভাবের কি অদৃষ্টপূর্ব সামঞ্জস্যই না তাঁহাতে প্রত্যক্ষ করিয়াছি! উপনিষদ্‌কার ঋষি বলেন, ঠিক ঠিক ব্রহ্মজ্ঞানী পুরুষ সর্বজ্ঞ ও সত্যসংকল্প হন। সংকল্প বা ইচ্ছামাত্রেই তাঁহার ইচ্ছা, বাহ্য জগতের সকল পদার্থ, সকল শক্তি ঘাড় পাতিয়া মানিয়া লয় ও সেই ভাবে পরিবর্তিত হয়। অতএব উক্ত পুরুষের নিজের শরীর-মন যে তদ্রূপ করিবে ইহাতে বিচিত্র কি আছে! উপনিষদ্‌কারের ঐ বাক্যের সত্যতা পরীক্ষা করা সাধারণ মানবের সাধ্যায়ত্ত নহে—তবে একথা বেশ বলা যাইতে পারে যে, যতদূর পরীক্ষা করা আমাদের ক্ষুদ্র শক্তিতে সম্ভব, তাহার বোধ হয় কিছু অভাব বা ত্রুটি, আমরা সকল বিষয়ে অনুক্ষণ যেভাবে ঠাকুরকে পরীক্ষা করিয়া লইতাম, তাহাতে হয় নাই। ঠাকুর প্রতিবারই কিন্তু সে সকল পরীক্ষায় হাসিতে হাসিতে অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়া যেন ব্যঙ্গ করিয়াই আমাদের বলিতেন, "এখনও অবিশ্বাস! বিশ্বাস কর্—পাকা ক'রে ধর্—যে রাম, যে কৃষ্ণ হয়েছিল, সেই ইদানীং (নিজের শরীরটা দেখাইয়া) এ খোলটার ভিতর—তবে এঁবার গুপ্তভাবে আসা! যেমন রাজার ছদ্মবেশে নিজ রাজ্য-পরিদর্শন! যেমনি জানাজানি কানাকানি হয় অমনি সে সেখান থেকে সরে পড়ে—সেই রকম!"

ঠাকুরের সকল প্রকার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া

ঠাকুরের জীবনের অনেক ঘটনা উপনিষদুক্ত ঐ বিষয়ে আমাদের চক্ষু ফুটাইয়া দেয়। সাধারণতঃ দেখা যায়, মানবমনে যত প্রকার ভাবের উদয় হয় সেগুলি প্রকৃতপক্ষে তাহারই 'স্বয়ংবেদ্য' অর্থাৎ ঐ সকল ভাবের পরিমাণ, তীব্রতা ইত্যাদি সে নিজেই ঠিক ঠিক জানিতে পারে। অপরে কেবল ভাবের বাহ্যিক বিকাশ দেখিয়া ঐ সকলের অনুমান মাত্র করিয়া থাকে। ভাব-সমাধির ঐরূপ স্বসংবেদ্য প্রকৃতি (subjective nature) সকলেরই প্রত্যক্ষের অন্তর্ভূত। সকলেই জানে ভাবসকল অন্যান্য চিন্তাসমূহের ন্যায় মানসিক বিকার বা শক্তি-প্রকাশ মাত্র—মনেতেই উহাদের উদয়, মনেতেই লয়; বাহ্য-জগতে উহার ছবি বা অনুরূপ প্রতিকৃতি দেখা ও দেখান অসম্ভব। ঠাকুরের ভাবসমাধির অনেকগুলিতে কিন্তু উহার বৈপরীত্য দেখা যায়। ধর—সাধনকালে ঠাকুরের স্বহস্তরোপিত পঞ্চবটীর চারাগাছগুলি ছাগল-গরুতে মুড়াইয়া খাইয়াছে দেখিয়া ঐ স্থানের চতুর্দিকে ঠাকুরের বেড়া দিবার ইচ্ছা হওয়া এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই গঙ্গায় বান ডাকিয়া ঐ বেড়া-নির্মাণের জন্য আবশ্যকীয় যত কিছু দ্রব্যাদি, কতগুলি গরাণের খুঁটি, বাঁকারি, নারিকেল-দড়ি, মায় একখানি কাটারি পর্যন্ত—সেইস্থানে ভাসিয়া আসিয়া লাগা ও তাঁহার কালীবাটীর ভর্তাভারি নামক মালীর সাহায্যে ঐ বেড়া-নির্মাণ! অথবা ধর—রাসমণির জামাতা মথুরানাথের সহিত তর্কে তাঁহার বলা "ঈশ্বরের ইচ্ছায় সব হতে পারে—

ঠাকুরের ভাবকালে দৃষ্ট বিষয়গুলি বাহ্যজগতে সত্য হইতে দেখা

ঐ দৃষ্টান্ত—পঞ্চবটীর বেড়া ইত্যাদি

লাল ফুলের গাছে সাদা ফুলও হতে পারে”, মথুরের তাহা অস্বীকার করা এবং পরদিনই ঠাকুরের, বাগানের জবাগাছের একটি ডালের দুটি ফ্যাকড়ায় ঐরূপ দুটি ফুল দেখিতে পাওয়া ও ফুলসুদ্ধ ঐ ডালটি ভাঙ্গিয়া আনিয়া মথুরানাথকে দেওয়া! অথবা ধর—তন্ত্র বেদান্ত বৈষ্ণব ইস্‌লামাদি যখন যে মতের সাধনা করিবারই অভিলাষ ঠাকুরের প্রাণে উদয় হওয়া, তখনি সেই সেই মতের এক একজন সিদ্ধ ব্যক্তির দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে উপস্থিত হওয়া এবং তাঁহাকে ঐ ঐ মতে দীক্ষিত করা! অথবা ধর—ঠাকুরের ভক্তদিগকে আহ্বান ও তাহারা উপস্থিত হইলে তাহাদের প্রত্যেককে ঠাকুরের চিনিয়া গ্রহণ করা —ঐরূপ অনেক কথার উল্লেখ করা যাইতে পারে। অনুধাবন করিলে ঐ সকল ঘটনায় এইটি দেখিতে পাওয়া যায় যে, ঠাকুরের মানসিক ভাবের অনেকগুলি সাধারণ মানবমনের ভাবসকলের ন্যায় কেবলমাত্র মানসিক চিন্তা বা প্রকাশরূপেই পর্যবসিত ছিল না। কিন্তু বাহ্যজগতের অন্তর্গত ঘটনাবলী ঐ সকলের দ্বারা আমাদের অপরিজ্ঞাত কি এক নিয়মবশে তদনুরূপভাবে পরিবর্তিত হইত! আমরা এখানে উক্ত সত্যের নির্দেশমাত্র করিয়াই ছাড়িয়া দিলাম। উহা হইতে পাঠকেরা যাঁহার যেরূপ অভিরুচি তিনি তদ্রূপ আলোচনা ও অনুমানাদি করুন—ঘটনা কিন্তু সত্যই ঐরূপ।

পূর্বেই বলিয়াছি, ঠাকুর নির্বিকল্পসমাধি-অবস্থার সময় ভিন্ন অপর সকল সময়ে ‘ভাবমুখে’ থাকিতেন। এইজন্যই দেখা যায় তিনি তাঁহার সমীপাগত প্রত্যেক ভক্তের সহিত এক একটি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া বরাবর সেই সেই সম্বন্ধ

অক্ষুন্ন রাখিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বার হ্লাদিনী ও সন্ধিনী শক্তির বিশেষবিকাশক্ষেত্রস্বরূপ যত স্ত্রীমূর্তির সহিত ঠাকুরের আজীবন মাতৃ-সম্বন্ধের কথা এখন সাধারণে প্রসিদ্ধ। কিন্তু পুরুষভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত তাঁহার ঐরূপ এক একটি সম্বন্ধ থাকার কথা বোধ হয় সাধারণে এখনও জ্ঞাত নহে। সেজন্য ঐ সম্বন্ধে কিছু বলা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। সাধারণতঃ ঠাকুর তাঁর ভক্তদিগকে দুই থাকে বা শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিতেন—শিবাংশসম্ভূত ও বিষ্ণু-অংশোদ্ভূত। ঐ দুই শ্রেণীর ভক্তদিগের প্রকৃতি, আচার-ব্যবহার, ভজনানুরাগ প্রভৃতি সকল বিষয়ে পার্থক্য আছে বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং নিজে তাহা সম্যক্ বুঝিতে পারিতেন—কিন্তু ঐ পার্থক্য যে কি, তাহা বিশেষ করিয়া পাঠককে বুঝান আমাদের একপ্রকার সাধ্যাতীত।

প্রত্যেক ভক্তের সহিত ঠাকুরের বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ

অতএব সংক্ষেপে পাঠক ইহাই বুঝিয়া লউন যে, শিব ও বিষ্ণু-চরিত্র যেন দুইটি আদর্শ ছাঁচ (type or model) এবং ঐ দুই ভিন্ন ছাঁচে যেন ভক্তদিগের প্রত্যেকের মানসিক প্রকৃতি গঠিত—এই পর্যন্ত। ঐ সকল ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি সকলপ্রকার ভাবেরই সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল—অবশ্য বিভিন্ন জনের সহিত বিভিন্ন ভাবের সম্বন্ধ স্থাপিত ছিল। যথা, শ্রীযুত নরেন্দ্রনাথ বা স্বামী বিবেকানন্দের কথায় বলিতেন, "নরেন্দর যেন আমার শ্বশুরঘর—(আপনাকে দেখাইয়া) এর ভেতর যেটা আছে সেটা যেন মাদি, আর (নরেন্দ্রকে দেখাইয়া) ওর ভেতর

ভক্তদিগের দুই শ্রেণী

যেটা আছে সেটা যেন মদ্দা"; শ্রীযুত ব্রহ্মানন্দ স্বামী বা রাখাল মহারাজকে ঠিক ঠিক নিজ পুত্রস্থানীয় বিবেচনা করিতেন—সন্ন্যাসী ও গৃহী বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগের প্রত্যেকের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ এক একটা বিশেষ বিশেষ ভাব বা সম্বন্ধ ছিল এবং সাধারণ ভক্তমণ্ডলীর প্রত্যেকের প্রতি ঠাকুরের নারায়ণ-বুদ্ধি সর্বদা স্থির থাকায় তাহাদের সহিত শান্তভাবের সম্বন্ধ যে তিনি অবলম্বন করিয়া থাকিতেন, একথা বলা বাহুল্য। ভক্তদিগের প্রত্যেকের ভিতরকার প্রকৃতি দেখিয়াই ঠাকুরের তাহাদের সহিত ঐরূপ ভাব বা সম্বন্ধ স্থাপিত হইত। কারণ ঠাকুর বলিতেন, "মানুষগুলোর ভেতর কি আছে, তা সব দেখতে

ভক্তদিগের প্রকৃতি দেখিয়া ঠাকুরের প্রত্যেকের সহিত ভাব-সম্বন্ধ পাতান

পাই; যেমন কাঁচের আলমারির ভেতর যা যা জিনিস থাকে সব দেখা যায়, সেইরকম।" যাহার যেরূপ প্রকৃতি সে তদ্বিপরীতে কখনই আচরণ করিতে পারে না—কাজেই ভক্তদিগের কাহারও ঠাকুরের ঐ সম্বন্ধ বা ভাবের বিপরীতে গমন বা আচরণ কখন সাধ্যায়ত্ত ছিল না। যদি কখনও কেহ অপর কাহারও দেখাদেখি বিপরীত ভাবের আচরণ করিত তো ঠাকুর তাহাতে বিশেষ বিরক্ত হইতেন ও তাহার ভুল বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। যথা, শ্রীযুত গিরিশকে ঠাকুর ভৈরব বলিতেন। দক্ষিণেশ্বরে কালিকা মাতার মন্দিরে ভাব-সমাধিতে তাঁহাকে একদিন ঐরূপ দেখিয়াছিলেন। শ্রীযুত গিরিশের অনেক আবদার ও কঠিন ভাষা তিনি হাসিয়া সহ্য করিতেন—কারণ তাঁহার ঐরূপ ভাষার আবরণে অপূর্ব কোমল একান্ত-নির্ভরতার ভাব

যে লুক্কায়িত তাহা তিনি দেখিতে পাইতেন। গিরিশের দেখাদেখি ঠাকুরের অপর জনৈক প্রিয় ভক্ত একদিন ঐরূপ ভাষা-প্রয়োগ করায় ঠাকুর তাহার প্রতি বিশেষ বিরক্ত হন ও পরে তাহার ভুল তাহাকে বুঝাইয়া দেন। যাক, এখন সে সব কথা, আমাদের বক্তব্য বিষয়ই বলিয়া যাই।

ভাবমুখাবস্থিত ঠাকুর ঐরূপে স্ত্রী বা পুরুষ প্রত্যেক ভক্তের নিজ নিজ প্রকৃতিগত আধ্যাত্মিক ভাব সম্যক্ বুঝিয়া তাহাদের সহিত তত্তদ্ভাবানুযায়ী একটা সপ্রেম সম্বন্ধ সর্বকালের জন্য পাতাইয়া রাখিয়াছিলেন। তত্তৎ ভাবসম্বন্ধাশ্রয়ে তাহাদের প্রত্যেককে ভগবদ্দর্শন লাভের পথে যে কিরূপে কত প্রকারে অগ্রসর করাইয়া দিতেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় এখানে পাঠককে দিয়া আমরা এ অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি করিব। অদ্বৈত-ভাবভূমি হইতে নামিয়া আসিয়াই ঠাকুর স্বয়ং সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসোপলব্ধির জন্য সাধনা করিয়া তত্তৎভাবের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার অনেকদিন পরে যখন ভক্তেরা অনেকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়াছেন, তখন একদিন ঠাকুরের ভাবাবস্থায় ইচ্ছা হয় ভক্তদেরও ভাবসমাধি হউক এবং জগদম্বার নিকট ঐ বিষয়ে প্রার্থনা করেন। তাহার পরই ভক্তদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও ঐরূপ হইতে থাকে। ঐরূপ ভাবাবস্থায় তাঁহাদের বাহ্যজগৎ ও দেহাদি-বোধ কতকটা কমিয়া যাইয়া ভিতরের কোন একটি বিশেষ ভাবপ্রবাহ, যথা—কোন মূর্তিচিন্তা, এত পরিস্ফুট হইত যে, ঐ মূর্তি যেন জলন্ত জীবন্তরূপে

ঠাকুর ভক্তদিগকে কত প্রকারে ধর্মপথে অগ্রসর করাইতেন

তাঁহাদের সম্মুখে অবস্থিত হইয়া হাসিতেছেন, কথা কহিতেছেন ইত্যাদি তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। ভজন-সঙ্গীতাদি শুনিলেই তাঁহাদের প্রধানতঃ ঐরূপ হইত।

ভক্তদিগের দেবদেবীর মূর্তিদর্শন

ঠাকুরের আর একদল ভক্ত ছিলেন যাঁহাদের সঙ্গীতাদি শুনিলে ওরূপ হইত না, কিন্তু ধ্যানাদি করিবার কালে দেবমূর্ত্যাদির সন্দর্শন হইত। প্রথম প্রথম কেবলমাত্র দর্শনই হইত, পরে ধ্যান যত গাঢ় বা গভীর হইতে থাকিত, তত ঐ সকল মূর্তির নড়াচড়া, কথাকওয়া ইত্যাদিও তাঁহারা দেখিতে পাইতেন। আবার কেহ কেহ প্রথম প্রথম নানাপ্রকার দর্শনাদি করিতেন, কিন্তু ধ্যান আরও গভীরভাবপ্রাপ্ত হইলে আর ঐরূপ দর্শনাদি করিতেন না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রীরামকৃষ্ণদেব ইঁহাদের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভবাদির কথা শ্রবণ করিয়াই বুঝিতেন, কে কোন্ 'থাক্' বা শ্রেণীর এবং কাহার পক্ষে কি প্রয়োজন এবং পরেই বা তাঁহারা প্রত্যেকে কি দর্শনাদি করিবেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা এখানে একজনের কথাই বলি। আমাদের একটি বন্ধু[১] শ্রীরামকৃষ্ণদেবের দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া ধ্যানাদি করিতে আরম্ভ করিলেন এবং প্রথম প্রথম ধ্যানের সময় ইষ্টমূর্তির নানাভাবে সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। যেমন যেমন দেখিতেন, কয়েকদিন অন্তর দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উহা ঠাকুরকে জানাইতেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিতেন, "বেশ হইয়াছে," অথবা "এইরূপ করিস" ইত্যাদি। পরে একদিন ঐ বন্ধুটি ধ্যানের সময় দেখিলেন, যত প্রকার দেবদেবীর

১ স্বামী অভেদানন্দ।

মূর্তি একটি মূর্তির অঙ্গে মিলিত হইয়া গেল। ঠাকুরকে ঐকথা নিবেদন করায় ঠাকুর বলিলেন, "যা, তোর বৈকুণ্ঠ-দর্শন হয়ে গেল। ইহার পর আর দর্শন হবে না।" আমাদের বন্ধু বলেন, "বাস্তবিকই তাহাই হইল—ধ্যান করিতে করিতে কোন মূর্তিই আর দেখিতে পাইতাম না। শ্রীভগবানের সর্বব্যাপিত্বাদি অন্য প্রকারের উচ্চ ভাবসমূহ আসিয়া হৃদয় অধিকার করিয়া বসিত। আমার তখন মূর্তিদর্শন করা বেশ লাগিত, যাহাতে আবার ঐরূপ দর্শনাদি হয় তাহার চেষ্টাও খুব করিতাম; কিন্তু করিলে কি হইবে, কিছুতেই আর কোন মূর্তির দর্শন হইত না!"

জনৈক ভক্তের বৈকুণ্ঠদর্শন

সাকারবাদী ভক্তদের বলিতেন, "ধ্যান করবার সময় ভাববে, যেন মনকে রেশমের রশি দিয়ে ইষ্টের পাদপদ্মে বেঁধে রাখচ, যেন সেখান থেকে আর কোথাও যেতে না পারে। রেশমের দড়ি বলছি কেন?—সে পাদপদ্ম যে বড় নরম। অন্য দড়ি দিয়ে বাঁধলে লাগবে তাই।" আবার বলিতেন, "ধ্যান করবার সময় ইষ্টচিন্তা করে তারপর কি অন্য সময় ভুলে থাকতে হয়? কতকটা মন সেইদিকে সর্বদা রাখবে। দেখেচ তো, দুর্গাপূজার সময় একটা যাগ-প্রদীপ জ্বালতে হয়। ঠাকুরের কাছে সর্বদা একটা জ্যোৎ (জ্যোতিঃ) রাখতে হয়, সেটাকে নিবতে দিতে নেই। নিবলে গেরস্তর অকল্যাণ হয়। সেইরকম হৃদয়পদ্মে ইষ্টকে এনে বসিয়ে তাঁর চিন্তারূপ যাগ-প্রদীপ সর্বদা জ্বেলে রাখতে হয়।

সাকারবাদীদের প্রতি ঠাকুরের উপদেশ

রেশমের দড়ি ও 'জ্যোৎ' প্রদীপ

সংসারের কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে ভেতরে চেয়ে দেখতে হয়, সে প্রদীপটা জ্বলচে কিনা ?”

আবার বলিতেন, “ওগো, তখন তখন ইষ্টচিন্তা করবার আগে ভাবতুম, যেন মনের ভেতরটা বেশ করে ধুয়ে দিচ্চি! মনের ভেতর নানান্ আবর্জনা, ময়লা-মাটি (চিন্তা, বাসনা ইত্যাদি) থাকে কিনা? সেগুলো সব বেশ করে ধুয়ে ধেয়ে সাফ্ করে তার ভেতর ইষ্টকে এনে বসাচ্চি!—এই রকম কোরো!” ইত্যাদি।

ধ্যান করবার আগে মনটা ধুয়ে ফেলা

শ্রীরামকৃষ্ণদেব এক সময়ে শ্রীভগবানের সাকার ও নিরাকার-ভাব-চিন্তা-সম্বন্ধে আমাদের বলেন, “কেহ বা সাকার দিয়ে নিরাকারে পৌছায়, আবার কেহ বা নিরাকার দিয়ে সাকারে পৌছায়।” ঠাকুরের পরমভক্ত শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্রের বাড়ীতে বসিয়া একদিন আমাদের এক বন্ধু[1] ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করেন—‘মহাশয়, সাকার বড় না নিরাকার বড় ?’ তাহাতে ঠাকুর বলেন, “নিরাকার দু’রকম আছে, পাকা ও কাঁচা। পাকা নিরাকার উঁচু ভাব বটে; সাকার ধরে সে নিরাকারে পৌছুতে হয়। কাঁচা নিরাকারে চোখ বুঁজলেই অন্ধকার—যেমন ব্রাহ্মদের[2]।” পাশ্চাত্ত্য-শিক্ষার ফলে ঐরূপ

সাকার বড় না নিরাকার বড়

১ শ্রীযুত দেবেন্দ্রনাথ বসু।

২ সত্যের অনুরোধে এ কথাটি আমরা বলিলাম বলিয়া কেহ না মনে করেন, ঠাকুর বর্তমান ব্রাহ্মসমাজ বা ব্রহ্মজ্ঞানীদের নিন্দা করিতেন। কীর্তনান্তে যখন সকল সম্প্রদায়ের সকল ভক্তদের প্রণাম করিতেন, তখন

কাঁচা নিরাকার ধরিয়া সাধনায় অগ্রসর ঠাকুরের আর একদল ভক্তও ছিলেন। তাঁহাদের ঠাকুর, ক্রীশ্চান পাদ্রীদের মত সাকারভাব চিন্তার নিন্দা অথবা শ্রীভগবানের সাকারমূর্ত্যাদি-অবলম্বনে সাধনায় অগ্রসর ভক্তদিগকে 'পৌত্তলিক' 'অন্ধবিশ্বাসী' ইত্যাদি বলিয়া দ্বেষ করিতে নিষেধ করিতেন। বলিতেন, "ওরে, তিনি সাকারও বটে আবার নিরাকারও বটে, আবার তা ছাড়া আরও কি তা কে জানে? সাকার কেমন জানিস্—যেমন জল আর বরফ। জল জমেই বরফ হয়; বরফের ভিতরে বাহিরে জল। জল ছাড়া বরফ আর কিছুই নয়। কিন্তু ছাখ্, জলের রূপ নেই (একটা কোন বিশেষ আকার নাই), কিন্তু বরফের আকার আছে। তেমনি ভক্তিহিমে অখণ্ড সচ্চিদানন্দসাগরের জল জমে বরফের মত নানা আকার ধারণ করে। ঠাকুরের ঐ দৃষ্টান্তটি যে কত লোকের মনে শ্রীভগবানের সাকার নিরাকার উভয় ভাবের একত্রে এক সময়ে সমাবেশ সম্ভবপর বলিয়া ধারণা করাইয়া শান্তি দিয়াছে, তাহা বলিবার নহে।

সাকার ও নিরাকারের সামঞ্জস্য

এখানে আর একটি কথাও না বলিয়া থাকিতে পারিতেছি

'আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানীদের প্রণাম'—একথাটি তাঁহাকে বার বার আমরা বলিতে শুনিয়াছি। সুবিখ্যাত ব্রাহ্মসমাজের নেতা ভক্তপ্রবর কেশবই সর্বপ্রথম ঠাকুরের কথা কলিকাতার জনসাধারণে প্রচার করেন, একথা সকলেই জানেন এবং ঠাকুরের সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যে শ্রীবিবেকানন্দ-প্রমুখ কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজের নিকট চিরঋণী, একথাও তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন।

না। ঠাকুরের কাঁচা নিরাকারবাদী ভক্তদলের ভিতর সর্বপ্রধান ছিলেন—শুধু ঐ দলের কেন ঠাকুর তাঁহাকে সকল থাক্ বা শ্রেণীর সকল ভক্তদিগের অগ্রে আসন প্রদান করিতেন—শ্রীযুত নরেন্দ্র বা স্বামী বিবেকানন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দ ও অন্ধ-বিশ্বাস

তাঁহার তখন পাশ্চাত্যশিক্ষা ও ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে সাকারবাদীদের উপর একটু আধটু কঠিন কটাক্ষ কখন কখন আসিয়া পড়িত। তর্কের সময়েই ঐ ভাবটি তাঁহাতে বিশেষ লক্ষিত হইত। ঠাকুর কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহার সহিত সাকারবাদী কোন কোন ভক্তের ঘোরতর তর্ক বাধাইয়া দিয়া মজা দেখিতেন। ঐরূপ তর্কে স্বামীজির মুখের সামনে বড় একটা কেহ দাঁড়াইতে পারিতেন না এবং স্বামীজির তীক্ষ্ণ যুক্তির সম্মুখে নিরুত্তর হইয়া কেহ কেহ মনে মনে ক্ষুণ্ণও হইতেন। ঠাকুরও সে কথা অপরের নিকট অনেক সময় আনন্দের সহিত বলিতেন, "অমুকের কথাগুলো নরেন্দর সে দিন কঁ্যাচ্ কঁ্যাচ্ করে কেটে দিলে!—কি বুদ্ধি!" ইত্যাদি। সাকারবাদী গিরিশের সহিত তর্কে কিন্তু স্বামীজিকে একদিন নিরুত্তর হইতে হইয়াছিল। সেদিন ঠাকুর শ্রীযুত গিরিশের বিশ্বাস আরও দৃঢ় ও পুষ্ট করিবার জন্যই যেন তাঁহার পক্ষে ছিলেন বলিয়া আমাদের বোধ হইয়াছিল! সে যাহা হউক, স্বামী বিবেকানন্দ একদিন শ্রীভগবানে বিশ্বাস সম্বন্ধে কথার সময় ঠাকুরের নিকট সাকারবাদীদের বিশ্বাসকে 'অন্ধবিশ্বাস' বলিয়া নির্দেশ করেন। ঠাকুর তদুত্তরে তাঁহাকে বলেন, "আচ্ছা, অন্ধবিশ্বাসটা কাকে বলিস্ আমায় বোঝাতে পারিস্? বিশ্বাসের তো সবটাই অন্ধ; বিশ্বাসের আবার

চক্ষু কি? হয় বল্ 'বিশ্বাস', আর নয় বল্ 'জ্ঞান'। তা নয়, বিশ্বাসের ভেতর আবার কতগুলো অন্ধ আর কতকগুলোর চোখ আছে—এ আবার কি রকম?" স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, "বাস্তবিকই সেদিন আমি ঠাকুরকে অন্ধবিশ্বাসের অর্থ বুঝাইতে যাইয়া ফাঁপরে পড়িয়াছিলাম। ও কথাটার কোনও অর্থই খুঁজিয়া পাই নাই। ঠাকুরের কথাই ঠিক বলিয়া বুঝিয়া সেদিন হইতে আর ও কথাটা বলা ছাড়িয়া দিয়াছি।"

নিরাকার-বাদীদের প্রতি উপদেশ

কাঁচা নিরকারবাদীদেরও ঠাকুর সাকারবাদীদের সহিত সমান চক্ষে দেখিতেন। তাহাদেরও কিরূপভাবে ধ্যান করিলে সহায়ক হইবে বলিয়া দিতেন। বলিতেন, "ছাখ্, আমি তখন তখন ভাবতুম, ভগবান যেন সমূদ্রের জলের মত সব জায়গা পূর্ণ করে রয়েছেন, আর আমি যেন একটি মাছ—সেই সচ্চিদানন্দ-সাগরে ডুবছি, ভাসছি, সাঁতার দিচ্ছি! আবার কখন মনে হ'ত আমি যেন একটি কুম্ভ, সেই জলে ডুবে রয়েছি, আর আমার ভিতরে বাহিরে সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ পূর্ণ হয়ে রয়েছেন।" আবার বলিতেন, "ছাখ্, ধ্যান করতে বসবার আগে একবার (আপনাকে দেখাইয়া) একে ভেবে নিবি। কেন বলছি?—এখানকার ওপর তোদের বিশ্বাস আছে কি না? একে ভাবলেই তাঁকে (ভগবানকে) মনে পড়ে যাবে। ঐ যে গো, যেমন গরুর পাল দেখলেই রাখালকে মনে পড়ে, ছেলেকে দেখলেই তার বাপের কথা মনে পরে, উকিল দেখলেই কাছারির কথা মনে পড়ে, সেই রকম—

বুঝলে কি না? মন নানান জায়গায় ছড়িয়ে থাকে কি না, একে ভাবলেই মনটা এক জায়গায় গুটিয়ে আসবে, আর সেই মনে ঈশ্বরকে চিন্তা করলে তাতে ঠিক ঠিক ধ্যান লাগবে—এই জন্যে বলছি।" আবার বলিতেন, "যাকে ভাল লাগে, যে ভাব ভাল লাগে, এক জনকে বা একটাকে পাকা করে ধর তবে তো আঁট হবে। 'সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।'—ভাব চাই। একটা ভাব নিয়ে তাঁকে ডাকতে হয়। 'যেমন ভাব তেমনি লাভ, মূল সে প্রত্যয়। ভাবিলে ভাবের উদয় হয়।'—ভাব চাই, বিশ্বাস চাই, পাকা করে ধরা চাই—তবে তো হবে। ভাব কি জান?—তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একট সম্বন্ধ পাতান—এরই নাম। সেইটে সর্বক্ষণ মনে রাখা, যেমন—তাঁর দাস আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি; এই হচ্ছে পাকা আমি, বিদ্যার আমি—এইটি খেতে শুতে বসতে সব সময় স্মরণ রাখা। আর এই যে বামুন আমি, কায়েৎ আমি, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি—এ সব হচ্চে অবিদ্যার আমি; এগুলোকে ছাড়তে হয়, ত্যাগ করতে হয়—ওগুলোতে অভিমান-অহঙ্কার বাড়িয়ে বন্ধন এনে দেয়। স্মরণ-মননটা সর্বদা রাখা চাই, খানিকটে মন সব সময় তাঁর দিকে ফিরিয়ে রাখবে—তবে তো হবে।' একটা ভাব পাকা করে ধরে তাঁকে আপনার করে নিতে হবে, তবে তো তাঁর উপর জোর চলবে। এই ছাখ না, প্রথম প্রথম একটু-

ঠাকুরের নিজ মূর্তি ধ্যান করিতে উপদেশ

'কাঁচা আমি ও পাকা আমি'; একটা ভাব পাকা করে ধরলে তবে ঈশ্বরের উপর জোর চলে

ভাব, সমাধি ও দর্শন-সম্বন্ধে কয়েকটি কথা

আধটু ভাব যতক্ষণ, ততক্ষণ, 'আপনি, মশাই' ইত্যাদি লোকে ব'লে থাকে ; সেই ভাব যেই বাড়ল, অমনি 'তুমি তুমি'—আর তখন 'আপনি টাপ্‌নি, গুলো বলা আসে না ; যেই আরও বাড়ল, আর তখন 'তুমি টুমি'তেও মানে না—তখন 'তুই মুই'! তাঁকে আপনার হ'তে আপনার ক'রে নিতে হবে, তবে তো হবে। যেমন নষ্ট মেয়ে, পরপুরুষকে প্রথম প্রথম ভালবাসতে শিখচে—তখন কত লুকোলুকি, কত ভয়, কত লজ্জা, তারপর যেই ভাব বেড়ে উঠলো, তখন আর কিছু নেই! একেবারে তার হাত ধরে সকলের সাম্‌নে কুলের বাইরে এসে দাঁড়ালো! তখন যদি সে পুরুষটা তাকে আদর-যত্ন না করে, ছেড়ে যেতে চায়, তো তার গলায় কাপড় দিয়ে টেনে ধ'রে বলে 'তোর জন্যে পথে দাঁড়ালুম, এখন তুই খেতে দিবি কি না বল্‌।' সেই রকম, যে ভগবানের জন্য সব ছেড়েছে, তাঁকে আপনার করে নিয়েচে, সে তাঁর ওপর জোর ক'রে বলে, 'তোর জন্যে সব ছাড়লুম, এখন দ্যাখা দিবি কি-না—বল্‌' !"

নষ্ট মেয়ের দৃষ্টান্ত

কাহারও ভগবদনুরাগে জোর কমিয়াছে দেখিলে বলিতেন, "এ জন্মে না হোক্ পর জন্মে পাব, ও কি কথা? অমন ম্যাদাটে ভক্তি করতে নেই। তাঁর কৃপায় তাঁকে এ জন্মেই পাব, এখনি পাব—মনে এইরকম জোর রাখতে হয়, বিশ্বাস রাখতে হয়, তা না হলে কি হয়? ওদেশে চাষীরা সব গরু কিনতে গিয়ে গরুর ল্যাজে আগে হাত দেয়। কতকগুলো গরু আছে ল্যাজে হাত দিলে কিছু বলে না, গা এলিয়ে শুয়ে পড়ে—অমনি তারা বোঝে

এ জন্মে ঈশ্বর-লাভ করবো—মনে এই জোর রাখা চাই

সেগুলো ভাল নয়। আর যেগুলোর ল্যাজে হাত দেবামাত্র তিড়িং মিড়িং ক'রে লাফিয়ে ওঠে—অমনি বোঝে এইগুলো খুব কাজ দেবে—ঐগুলোর ভিতর থেকে পছন্দ করে কেনে। ম্যাদাটে ভাব ভাল নয়; জোর নিয়ে এসে, বিশ্বাস ক'রে বল—তাঁকে পাবই পাব, এখনি পাব—তবে তো হবে।"

এক এক ক'রে বাসনাত্যাগ করা চাই

আবার বলিতেন, "এ দিককার বাসনাকামনাগুলো সব এক এক ক'রে ছাড়, তবে তো হবে। কোথা ও গুলোকে সব এক এক ক'রে ছাড়বে—না আরও বাড়াতে চল্‌লে!—তা হলে কেমন ক'রে হবে?"

যখন ধ্যান-ভজন, প্রার্থনাদি করিয়া শ্রীভগবানের সাড়া না পাইয়া মন নিরাশার সাগরে ভাসিত, তখন সাকার নিরাকার উভয় বাদীদেরই বলিতেন, "মাছ ধরতে গেলে প্রথম চার করতে হয়। হয়তো চার ক'রে ছিপ ফেলে বসেই আছে—মাছের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না, মনে হচ্চে তবে বুঝি পুকুরে মাছ নেই।

চার করে মাছ ধরার মত অধ্যবসায় চাই

তারপর হয়তো একদিন দেখলে একটা বড় মাছ ঘাই দিলে—অমনি বিশ্বাস হল পুকুরে মাছ আছে। তারপর হয়তো একদিন ছিপের ফাৎনাটা নড়লো—অমনি মনে হলো চারে মাছ এয়েছে। তারপর হয়তো একদিন ফাৎনাটা ডুবলো, তুলে দেখলে—মাছ টোপ খেয়ে পালিয়েছে; আবার টোপ গেঁথে ছিপ ফেঁলে খুব সাবধানে বসে রইল তারপর একদিন যেমন টোপ খেয়েছে, অমনি টেনে তুলতেই মাছ আড়ায় উঠলো।" কখন বলিতেন, "তিনি খুব কানখড়্‌কে, সব

ভগবান 'কানখড়্‌কে' —সব শুনেন

শুনতে পান গো। যত ডেকেছ সব শুনেছেন। একদিন না একদিন দেখা দেবেনই দেবেন। অন্ততঃ মৃত্যুসময়েও দেখা দেবেন।" কাহাকেও বলিতেন—"সাকার কি নিরাকার যদি ঠিক করতে না পারিস তো এই বলে প্রার্থনা করিস্ যে, 'হে ভগবান, তুমি সাকার কি নিরাকার আমি বুঝতে পারি না; তুমি যাহাই হও আমায় কৃপা কর, দেখা দাও'।" আবার কাহাকেও বলিতেন—"সত্য সত্যই ঈশ্বরের দেখা পাওয়া যায় রে, এই যেমন তোতে আমাতে এখন বসে কথা কইচি এইরকম ক'রে তাঁকে দেখা যায়, তাঁর সঙ্গে কথা কহা যায়—সত্য বলছি, মাইরি বলছি!"

গভীর ভাব-প্রবণতার সহিত ঠাকুরের সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখা

আর এক কথা—চব্বিশঘণ্টা 'ভাবমুখে' থাকিলে ভাবুকতার এত বৃদ্ধি হয় যে, তাহার দ্বারা আর সংসারের অপর কোন কর্ম চলে না, অথবা সে সংসারের ছোটখাট ব্যাপার আর মনে রাখিতে পারে না—সর্বত্র আমরা এইরূপই দেখিতে পাই উহার দৃষ্টান্ত—ধর্ম-জগতে তো কথাই নাই, বিজ্ঞান, রাজনীতি বা অন্য সকল স্থানেও বিশেষ মনস্বী পুরুষগণের জীবনা-লোচনায় দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, তাঁহারা হয়ত নিজের অঙ্গসংস্কার বা নিত্যব্যবহার্য জিনিস-পত্রের যথাযথ স্থানে রাখা ইত্যাদি সামান্য বিষয়সকলে একেবারেই অপটু ছিলেন। ঠাকুরের জীবনে কিন্তু দেখিতে পাই যে, অত অধিক ভাবপ্রবণতার ভিতরেও তাঁহার ঐ প্রকার সামান্য বিষয়সকলেরও হুঁশ থাকিত! যখন থাকিত না তখন নিজের দেহ বা জগৎ-সংসারের কোন

বস্তু বা ব্যক্তিরই হুঁশ থাকিত না—যেমন সমাধিতে, আর যখন থাকিত, তখন সকল বিষয়েরই থাকিত! ইহা কম আশ্চর্যের বিষয় নহে! এখানে দুই-একটি মাত্র ঐরূপ দৃষ্টান্তেরই আমরা উল্লেখ করিব।

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত

একদিন ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর হইতে বলরাম বাবুর বাটী গমন করিতেছেন; সঙ্গে নিজ ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল ও শ্রীযুত যোগানন্দ স্বামী যাইতেছেন। সকলে গাড়ীতে উঠিলেন। গাড়ী ছাড়িয়া বাগানের 'গেট' পর্যন্ত আসিয়াছে মাত্র, ঠাকুর শ্রীযুত যোগানন্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিরে, নাইবার কাপড় গামছা এনেছিস তো?"—তখন প্রাতঃকাল।

শ্রীযুত যোগেন—না মশাই, গামছা এনেছি, কাপড়খানা আনতে ভুল হয়েছে। তা তারা (বলরামবাবু) আপনার জন্য একখানা নূতন কাপড় দেখে-শুনে দেবে এখন।

ঠাকুর—ও কি তোর কথা? লোকে বলবে, কোথা থেকে একটা হাবাতে এসেছে। তাদের কষ্ট হবে, আতান্তরে পড়বে—যা, গাড়ী থামিয়ে নেবে গিয়ে নিয়ে আয়।

কাজেই যোগীন স্বামীজি তদ্রূপ করিলেন।

ঠাকুর বলিতেন—ভাল লোক, লক্ষ্মীমন্ত লোক বাড়ীতে এলে সকল বিষয়ে কেমন সুসার হ'য়ে যায়, কাকেও কিছুতে বেগ পেতে হয় না। আর হাবাতে হতচ্ছাড়াগুলো এলে সকল বিষয়ে বেগ পেতে হয়, যে দিন ঘরে কিছু নেই, তার জন্য গেরস্থকে বিশেষ কষ্ট পেতে হবে, ঠিক সেই দিনেই সে এসে উপস্থিত হয়।

শ্রীযুত প্রতাপ হাজরা নামক এক ব্যক্তি ঠাকুরের সময়ে দক্ষিণেশ্বরে অনেককাল সাধুভাবে কাটাইতেন। আমরা সকলে ইঁহাকে হাজরা মহাশয় বলিয়া ডাকিতাম। ইনিও মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের কলিকাতার ভক্তদিগের নিকট আগমনকালে তাঁহার সঙ্গে আসিতেন। একবার ঐরূপে আসিয়া প্রত্যাগমনকালে নিজের গামছাখানি ভুলিয়া কলিকাতায় ফেলিয়া যান। দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিত হইয়া ঐ কথা জানিতে পারিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন—"ভগবানের নামে আমার পরণের কাপড়ের হুঁশ থাকে না, কিন্তু আমি তো একদিনও নিজের গামছা বা বেটুয়া কলিকাতায় ভুলিয়া আসি না। আর তোর একটু জপ ক'রে এত ভুল!"

ঐ বিষয়ে ২য় দৃষ্টান্ত

শ্রীশ্রীমাকে ঠাকুর শিখাইয়াছিলেন—"গাড়ীতে বা নৌকায় যাবার সময় আগে গিয়ে উঠবে, আর নামবার সময় কোনও জিনিসটা নিতে ভুল হয়েছে কি না দেখে-শুনে সকলের শেষে নামবে।" ঠাকুরের অতি সামান্য বিষয়েও এত নজর ছিল।

ঐ বিষয়ে ৩য় দৃষ্টান্ত—শ্রীশ্রীমার প্রতি উপদেশ

এইরূপে 'ভাবমুখে' নিরন্তর থাকিয়াও ঠাকুরের আবশ্যকীয় সকল বিষয়ের হুঁশ থাকিত; যে জিনিসটি যেখানে রাখিতেন তাহা সর্বদা সেইখানেই রাখিতেন, নিজের কাপড়-চোপড় বেটুয়া প্রভৃতি সকল নিত্য ব্যবহার্য-দ্রব্যের নিজে খোঁজ রাখিতেন, কোথাও যাইবার আসিবার সময় আবশ্যকীয় সকল দ্রব্যাদি আনিতে ভুল হইয়াছে কি না সন্ধান লইতেন এবং ভক্তদিগের মানসিক ভাবসমূহের

ঐ বিষয়ে শেষ কথা

যেমন পুঙ্খানুপুঙ্খ সন্ধান রাখিতেন, তেমনি তাহাদের সংসারের সকল বিষয়ের সন্ধান রাখিয়া কিসে তাহাদের বাহ্যিক সকল বিষয়ও সাধনার অনুকূল হইতে পারে তদ্বিষয়ে নিরন্তর চিন্তা করিতেন !

ঠাকুর ভাব-রাজ্যের মূর্তিমান রাজা

ঠাকুরের কথা অনুধাবন করিলে বুঝা যায়, তিনি যেন সর্ব-প্রকার ভাবের মূর্তিমান সমষ্টি ছিলেন। ভাবরাজ্যের অত বড় রাজা মানবজগতে আর কখনও দেখা যায় নাই। ভাবময় ঠাকুর 'ভাবমুখে' অবস্থান করিয়া নির্বিকল্প অদ্বৈতভাব হইতে সবিকল্প সকল প্রকার ভাবের পূর্ণ প্রকাশ নিজে দেখাইয়া সকল শ্রেণীর ভক্তদিগকে স্ব স্ব পথের ও গন্তব্য স্থলের সংবাদ দিয়া অন্ধকারে অপূর্ব জ্যোতিঃ, নিরাশায় অদৃষ্টপূর্ব আশা এবং সংসারের নিদারুণ দুঃখকষ্টের ভিতর নিরুপম শান্তি আনিয়া দিতেন। ঠাকুর যে, সকলের কি ভরসার স্থল ছিলেন তাহা বলিয়া বুঝান দায়। মনোরাজ্যে—

মানবমনের উপর তাঁহার অপূর্ব আধিপত্য। স্বামী বিবেকানন্দের ঐ বিষয়ক কথা

তাঁহার যে কি প্রবল প্রতাপ দেখিয়াছি তাহা বলা অসম্ভব। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন—"মনের বাহিরের জড়-শক্তিসকলকে কোন উপায়ে আয়ত্ত ক'রে কোন একটা অদ্ভুত ব্যাপার (miracle) দেখান বড় বেশী কথা নয়—কিন্তু এই যে পাগলা বামুন লোকের মনগুলোকে কাদার তালের মত হাতে নিয়ে ভাঙ্গত, পিট্‌ত, গড়ত, স্পর্শমাত্রেই নূতন ছাঁচে ফেলে নূতন ভাবে পূর্ণ করত, এর বাড়া আশ্চর্য ব্যাপার (miracle) আমি আর কিছুই দেখি না !"

তৃতীয় অধ্যায়

শ্রীরামকৃষ্ণের গুরুভাব

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্যবদ্বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥

গীতা, ২।২৯

ঠাকুরকে যাঁহারা দু'চারবার মাত্র দেখিয়াছেন অথবা যাঁহারা তাঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ হন নাই, উপর উপর দেখিয়াছেন মাত্র, তাঁহারা গুরুভাবে ভক্তদিগের সহিত ঠাকুরের লীলার কথা কাহারও মুখে শুনিতে পাইলে একেবারে অবাক হইয়া থাকেন। ভাবেন, 'লোকটা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথাগুলো বলছে।' আবার যখন দেখেন অনেকে ঐ ভাবের কথা বলিতেছে তখনও মনে করেন, "এরা সব একটা মতলব ক'রে দল পাকিয়েচে, আর শ্রীরাম-কৃষ্ণকে ঠাকুর ক'রে তুলচে; তিন শ' তেত্রিশ কোটীর ওপর আবার একটা বাড়াতে চলেচে! কেন রে বাপু, অতগুলো ঠাকুরেও কি তোদের শানে না? যাকে ইচ্ছা, যতগুলো ইচ্ছা, ওরি ভেতর থেকে নে না—আবার একটা বাড়ান কেন? কি আশ্চর্য

ঠাকুর 'গুরু' 'বাবা' বা 'কর্তা' বলিয়া সম্বোধিত হইলে বিরক্ত হইতেন। তবে গুরুভাব তাঁহাতে কিরূপে সম্ভবে?

এরা একবার ভাবেও না গা যে, মিথ্যা কথাগুলো ধরা পড়লে অমন পবিত্র লোকটার উপরে লোকের ভক্তি, একেবারে চটে যাবে! আমরাও তো তাঁকে দেখেচি!—সকলের কাছে নীচু, নম্রভাব—একেবারে যেন মাটি, যেন সকলের চাইতে ছোট—এতটুকু অহঙ্কার নাই! তারপর একথা তো তোরাও বলিস্, আর আমরাও দেখেচি যে, 'গুরু' কি 'বাবা' কি 'কর্তা' ব'লে তাঁকে কেউ ডাকলে তিনি একেবারে সইতেই পারতেন না; ব'লে উঠতেন, 'ঈশ্বরই একমাত্র গুরু, পিতা ও কর্তা—আমি হীনের হীন, দাসের দাস, তোমার গায়ের একগাছি ছোট রোমের সমান—একগাছি বড়র সমানও নই!'—বলেই হয়ত আবার তার পায়ের ধূলো তুলে নিজের মাথায় দিতেন! এমন দীনভাব কোথাও কেউ কি দেখেচে? আর সেই লোককে কিনা এরা 'গুরু', 'ঠাকুর',—যা নয় তাই বলচে, যা নয় তাই করচে!"

এইরূপ অনেক বাদানুবাদ চলা অসম্ভব নহে বলিয়াই আমরা ঠাকুরের গুরুভাব-সম্বন্ধে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি তাহার কিছু বলিতে প্রবৃত্ত হইলাম। কারণ বাস্তবিকই ঠাকুর যখন সাধারণভাবে থাকিতেন, তখন আব্রহ্মস্তম্বপর্যন্ত সর্বভূতে ঠিক ঠিক নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির রাখিয়া মানুষের তো কথাই নাই, সকল প্রাণীরই 'দাস আমি' এই ভাব লইয়া থাকিতেন; বাস্তবিকই তখন তিনি আপনাকে হীনের হীন, দীনের দীন জ্ঞানে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেন; এবং বাস্তবিকই সে সময় তিনি 'গুরু' 'কর্তা' বা 'পিতা' বলিয়া সম্বোধিত হইলে সহিতে পারিতেন না।

সর্বভূতে নারায়ণ-বুদ্ধি স্থির থাকায় ঠাকুরের দাস-ভাব সাধারণ

কিন্তু সাধারণ ভাবে অবস্থানের সময় ঐরূপ করিলেও ঠাকুরের গুরুভাবের অপূর্ব লীলার কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করি? সে অদৃষ্টপূর্ব দিব্যভাবাবেশে যখন তিনি যন্ত্রস্বরূপ হইয়া কাহাকেও স্পর্শমাত্রেই সমাধি, গভীর ধ্যান বা ভগবদানন্দের অভূতপূর্ব নেশার ঝোঁকে[১] নিমগ্ন করিতেন, অথবা কি এক আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তাহার মনের তমোগুণ বা মলিনতা এতটা টানিয়া লইতেন যে, সে তৎক্ষণাৎ পূর্বে যেরূপ কখনও অনুভব করে নাই, এ প্রকার একটা মনের একাগ্রতা, পবিত্রতা ও আনন্দ লাভ করিত এবং আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিয়া ঠাকুরের চরণতলে চিরকালের নিমিত্ত আত্মবিক্রয় করিত—তখন তাঁহাকে দেখিলেই মনে হইত এ ঠাকুর পূর্বের সেই দীনের দীন ঠাকুর নহেন; ইঁহাতে কি একটা ঐশ্বরিক শক্তি স্বেচ্ছায় বা লীলায় প্রকটিত হইয়া ইঁহাকে আত্মহারা করিয়া ঐরূপ করাইতেছে; ইনি বাস্তবিকই অজ্ঞানতিমিরান্ধ, ত্রিতাপে তাপিত, ভবরোগগ্রস্ত অসহায় মানবের গুরু, ত্রাতা এবং শ্রীভগবানের পরম পদের দর্শয়িতা! ভক্তেরা ঠাকুরের ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই গুরু, কৃপাময়, ভগবান্ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। আপাতবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইলেও যথার্থ

কিন্তু দিব্য-ভাবাবেশে তাঁহাতে গুরুভাবের লীলা নিত্য দেখা যাইত। ঠাকুরের তখনকার ব্যবহারে ভক্তদিগের কি মনে হইত

১। বাস্তবিকই তখন অধিক পরিমাণে সিদ্ধি খাইলে যেমন নেশা হয়, তেমনি একটা নেশার ঘোর উপস্থিত হইত। কাহারও কাহারও পা-ও টলিতে দেখিয়াছি। ঠাকুরের নিজের তো কথাই ছিল না। ঐরূপ নেশার ঝোঁকে পা এমন টলিত যে, আমাদের কাহাকেও ধরিয়া তখন চলিতে হইত। লোকে মনে করিত, বিপরীত নেশা করিয়াছেন।

দীনভাব এবং এই দিব্য ঐশ্বরিক গুরুভাব যে একত্রে একজনে অবস্থান করিতে পারে, তাহা আমরা বর্তমান যুগে শ্রীভগবান রামকৃষ্ণে যথার্থ ই দেখিয়াছি ; এবং দেখিয়াছি বলিয়াই উহারা কেমনে একত্রে একই মনে থাকে সে বিষয়ে যাহা বুঝিয়াছি তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিতে চেষ্টা করিতেছি। ঐরূপ চেষ্টা করিলেও যতটুকু বুঝিয়াছি ততটুকুও ঠিক ঠিক বুঝাইতে পারিব কি না জানি না ; আর সম্যক বুঝা বা বুঝান, লেখক ও পাঠক উভয়েরই সাধ্যাতীত ; কারণ ভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুরের ভাবের ইয়ত্তা নাই। ঠাকুর বলিতেন, "শ্রীভগবানের 'ইতি' নাই।" আমাদের প্রত্যক্ষ, এ লোকোত্তর পুরুষেরও তদ্রূপ ভাবের 'ইতি' নাই।

ভাবময় ঠাকুরের ভাবের ইতি নাই

সচরাচর লোকে ঠাকুর 'ভাবমুখে' থাকিতেন শুনিলেই ভাবিয়া বসে যে, তিনি জ্ঞানী ছিলেন না। ভগবদনুরাগ ও বিরহে মনে যে সুখদুঃখাদি ভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাই লইয়া সদা সর্বক্ষণ থাকিতেন। কিন্তু 'ভাবমুখে' থাকাটি যে কি ব্যাপার বা কিরূপ অবস্থায় উহা সম্ভব, তাহা যদি আমরা বুঝিতে পারি তবে বর্তমান বিষয়টি বুঝিতে পারিব ; সেজন্য 'ভাবমুখে থাকা' অবস্থাটির সংক্ষেপ আলোচনা এখানে একবার আর এক প্রকারে করিয়া লওয়া যাক। পাঠক মনে মনে ভাবিয়া লউন—তিন দিনের সাধনে ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধি হইল।

সাধারণের বিশ্বাস—ঠাকুর ভক্ত ছিলেন, জ্ঞানী ছিলেন না। 'ভাবমুখে থাকা' কখনও কিরূপে সম্ভবে বুঝিলে ঐ কথা আর বলা চলে না

প্র—নির্বিকল্প সমাধিটি কি ?

উ—মনকে একেবারে সংকল্পবিকল্পরহিত অবস্থায় আনয়ন করা।

প্র—সংকল্প-বিকল্প কাহাকে বলে ?

উ—বাহ্য জগতের রূপরসাদি বিষয়সকলের জ্ঞান বা অনুভব, সুখদুঃখাদি ভাব, কল্পনা, বিচার, অনুমান প্রভৃতি মানসিক চেষ্টা এবং ইচ্ছা বা 'এটা করিব', 'ওটা বুঝিব', 'এটা ভোগ করিব', 'ওটা ত্যাগ করিব' ইত্যাদি মনের সমস্ত বৃত্তিকে।

প্র—বৃত্তিসকল কোন্ জিনিসটা থাকিলে তবে উঠিতে পারে ?

উ—'আমি' 'আমি' এই জ্ঞান বা বোধ। 'আমি'-বোধ যদি চলিয়া যায় বা কিছুক্ষণের জন্য একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, তবে সে সময়ের মত কোনও বৃত্তিই আর মনে খেলা বা রাজত্ব করিতে পারে না।

'আমি'-বোধাশ্রয়ে মানসিক বৃত্তিসমূহের উদয়। উহার আংশিক লোপে সবিকল্প ও পূর্ণ লোপে নির্বিকল্প সমাধি হয়। সমাধি, মূর্ছা ও সুষুপ্তির প্রভেদ

প্র—মূর্ছা বা গভীর নিদ্রাকালেও তো 'আমি' বোধ থাকে না—তবে কি নির্বিকল্প সমাধিটা ঐরূপ একটা কিছু ?

উ—না ; মূর্ছা বা সুষুপ্তিতে 'আমি'-বোধ ভিতরে ভিতরে থাকে, তবে মস্তিষ্করূপ (brain) যে যন্ত্রটার সহায়ে মন 'আমি' 'আমি' করে সেটা কিছুক্ষণের জন্য কতকটা জড়ভাবাপন্ন হয় বা চুপ করিয়া থাকে, এইমাত্র ;—ভিতরে বৃত্তিসমূহ গজ্-গজ্ করিতে থাকে—ঠাকুর যেমন দৃষ্টান্ত দিতেন, "পায়রাগুলো মটর খেয়ে গলা ফুলিয়ে ব'সে আছে বা বক্-বকম্ ক'রে আওয়াজ করচে—তুমি মনে করচ তাদের গলার ভিতরে কিছুই নাই—কিন্তু যদি গলায় হাত দিয়ে দেখ তো দেখবে মটর গজ্‌গজ্ করচে !"

প্র—মূর্ছা বা সুষুপ্তিতে যে 'আমি'-বোধটা ঐরূপে থাকে তা বুঝিব কিরূপে ?

উ—ফল দেখিয়া ; যথা—ঐ সকল সময়েও হৃদয়ের স্পন্দন, হাতের নাড়ি, রক্তসঞ্চালন প্রভৃতি বন্ধ হয় না—ঐ সকল শারীরিক ক্রিয়াও 'আমি'-বোধটাকে আশ্রয় করিয়া হয় ; দ্বিতীয় কথা, মূর্ছা ও সুষুপ্তির বাহ্যিক লক্ষণ কতকটা সমাধির মত হইলেও ঐ সকল অবস্থা হইতে মানুষ যখন আবার সাধারণ বা জাগ্রত অবস্থায় আসে, তখন তাহার মনে জ্ঞান ও আনন্দের মাত্রা পূর্বের ন্যায়ই থাকে, কিছুমাত্র বাড়ে বা কমে না—কামুকের যেমন কাম তেমনি থাকে, ক্রোধীর যেমন ক্রোধ তেমনি থাকে, লোভীর লোভ সমান থাকে ইত্যাদি। নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা লাভ হইলে কিন্তু ঐ সকল বৃত্তি আর মাথা তুলিতে পারে না ; অপূর্ব জ্ঞান ও অসীম আনন্দ আসিয়া উপস্থিত হয় এবং জগৎকারণ ভগবানের সাক্ষাৎদর্শনে মনে আর পরকাল আছে কি না, ভগবান আছেন কি না—এ সকল সংশয়-সন্দেহ উঠে না।

সমাধির ফল—জ্ঞান ও আনন্দের বৃদ্ধি এবং ভগবদ্দর্শন

প্র—আচ্ছা বুঝিলাম—ঠাকুরের নির্বিকল্প সমাধিতে কিছুক্ষণের জন্য 'আমি'-বোধের একেবারে লয় হইল—তাহার পর ?

উ—তাহার পর, ঐরূপে 'আমি-'বোধটার লোপ হইয়া কারণরূপিণী শ্রীশ্রীজগন্মাতার কিছুক্ষণের জন্য সাক্ষাৎ দর্শনে ঠাকুর তৃপ্ত না হইয়া সদা-সর্বক্ষণ ঐ অবস্থায় থাকিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

প্র—সে চেষ্টার ফলে ঠাকুরের মনের কিরূপ অবস্থা হইল এবং কিরূপ লক্ষণই বা শরীরে প্রকাশিত হইল ?

উ—কখন 'আমি'-বোধের লোপ হইয়া শরীরে মৃতব্যক্তির লক্ষণসকল প্রকাশিত হইয়া ভিতরে জগদম্বার পূর্ণ বাধামাত্রশূন্য সাক্ষাৎ দর্শন—আবার কখন অত্যল্পমাত্র 'আমি'-বোধ উদিত হইয়া শরীরে জীবিতের লক্ষণ একটু-আধটু প্রকাশ পাওয়া ও সত্ত্বগুণের অতিশয় আধিক্যে শুদ্ধ স্বচ্ছ পবিত্র মন-রূপ ব্যবধান বা পর্দার ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার কিঞ্চিৎ বাধাযুক্ত দর্শন !—এইরূপে কখন 'আমি'-বোধের লোপ, মনের বৃত্তিসকলের একেবারে লয় ও শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণ দর্শন ও কখন 'আমি'-বোধের একটু উদয়, মনের বৃত্তিসকলের ঈষৎ প্রকাশ ও সঙ্গে সঙ্গে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূর্ণ দর্শন ঈষৎ আবরিত হওয়া। এইরূপ বারবার হইতে লাগিল।

ঠাকুরের ছয় মাস নির্বিকল্প সমাধিতে থাকিবার কালের দর্শন ও অনুভব

প্র—কতদিন ধরিয়া ঠাকুর ঐরূপ চেষ্টা করেন ?

উ—নিরন্তর ছয়মাস কাল ধরিয়া।

প্র—বল কি ? তবে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে ? কারণ, ছয়মাস না খাইলে তো আর মানবদেহ থাকিতে পারে না এবং তোমরা তো বল যতটা শরীরবোধ আসিলে আহারাদি কার্য করা চলে, ঠাকুরের ঐকালে মাঝে মাঝে 'আমি'-বোধের উদয় হইলেও ততটা কখনই আসে নাই।

'আমি'-বোধের সম্পূর্ণ লোপে ঐ কালে তাঁহার শরীর রহিল কিরূপে

উ—সত্যই ঠাকুরের শরীর থাকিত না এবং 'শরীরটা কিছুকাল

থাকুক' এরূপ ইচ্ছার লেশমাত্রও তখন ঠাকুরের মনে ছিল না ; তবে তাঁহার শরীরটা যে ছিল সে কেবল জগদম্বা ঠাকুরের শরীরটার সহায়ে তাঁহার অদ্ভুত আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশ দেখাইয়া বহুজন-কল্যাণ সাধিত করিবেন বলিয়া।

প্র—তা তো বটে, কিন্তু ঐ ছয়মাস কাল জগদম্বা নিজে মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়া কি ঠাকুরকে জোর করিয়া আহার করাইয়া দিতেন ?

উ—কতকটা সেইরূপই বটে ; কারণ, ঐ সময়ে একজন সাধু কোথা হইতে আপনা আপনি আসিয়া জোটেন, ঠাকুরের ঐরূপ মৃতকল্প অবস্থা যে যোগসাধনা বা শ্রীভগবানের সহিত একত্বানুভবের ফলে তাহা সম্যক বুঝেন এবং ঐ ছয়মাস কাল দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে থাকিয়া সময়ে সময়ে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে আঘাত পর্যন্ত করিয়া একটু আধটু হুঁশ আনিতে নিত্য চেষ্টা করিতেন ; আর একটু হুঁশ আসিতেছে দেখিলেই দুই-এক গ্রাস যাহা পারিতেন, খাওয়াইয়া দিতেন। একেবারে অপরিচিত জড়প্রায় মৃতকল্প একটি লোককে ঐরূপে বাঁচাইয়া রাখিতে সাধুটির এত আগ্রহ, এতটা মাথাব্যথা কেন হইয়াছিল জানি না, তবে ঐরূপ ঘটনাবলীকেই আমরা ভগবদিচ্ছায় সাধিত বলিয়া থাকি। অতএব শ্রীশ্রীজগদম্বার সাক্ষাৎ ইচ্ছা ও শক্তিতেই যে ঐ অসম্ভব সম্ভব হইয়া ঠাকুরের শরীরটা রক্ষা পাইয়াছিল ইহা ছাড়া আর কি বলিব ?

জনৈক যোগী সাধুর আগমন ও ঠাকুরের অবস্থা বুঝিয়া তাঁহাকে জোর করিয়া আহার করাইয়া দেওয়া

প্র—আচ্ছা বুঝিলাম, তারপর?

উ—তাহার পর, শ্রীশ্রীজগদম্বা বা শ্রীভগবান বা যে বিরাট-চৈতন্য ও বিরাট শক্তি জগদ্রূপে প্রকাশিত আছেন এবং জড় চেতন সকলের মধ্যে ওতপ্রোতভাবে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আপাতবিভিন্ন নামরূপে অবস্থান করিতেছেন তিনি ঠাকুরকে আদেশ করিলেন—'ভাবমুখে থাক'!

শ্রীশ্রীজগদম্বার আদেশ—'ভাবমুখে থাক'

প্র—সেটা আবার কি?

উ—বলিতেছি, কিন্তু ঠাকুরের ঐ সময়কার কথা বুঝিতে হইলে কল্পনাসহায়ে যতদূর সম্ভব ঠাকুরের ঐ সময়ের অবস্থাটা একবার ভাবিয়া লওয়া আবশ্যক। পূর্বে বলিয়াছি, ঠাকুরের তখন, কখন 'আমি'-জ্ঞানের লোপ এবং কখন উহার ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল। যখন 'আমি'-বোধটার ঐরূপ ঈষৎ প্রকাশ হইতেছিল তখনও ঠাকুরের নিকট জগৎটা, আমরা যেমন দেখি তেমন দেখাইতেছিল না। দেখাইতেছিল, যেন একটা বিরাট মনে নানা ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, ভাসিতেছে, ক্রীড়া করিতেছে, আবার লয় হইতেছে! অপর সকলের তো কথাই নাই, ঠাকুরের নিজের শরীরটা, মনটা ও আমিত্ববোধটাও ঐ বিরাট মনের ভিতরের একটা তরঙ্গ বলিয়া বোধ হইতেছিল! পাশ্চাত্ত্য জড়বাদী পণ্ডিতমূর্খের দল যে জগচ্চৈতন্য ও শক্তিকে নিজের বুদ্ধি ও বুদ্ধিপ্রসূত যন্ত্রাদি সহায়ে মাপিতে

একমেবাদ্বিতীয়ং-বস্তুতে নির্গুণ ও সগুণ ভাবে স্বগত-ভেদ এবং জগদ্ব্যাপী বিরাট আমিত্বই বর্তমান। ঐ বিরাট আমিত্বই ঈশ্বর বা শ্রীশ্রীজগদম্বার আমিত্ব এবং উহারে দ্বারাই জগদ্ব্যাপার নিষ্পন্ন হয়

যাইয়া বলিয়া বসে 'ওটা এক হলেও জড়', ঠাকুর এই অবস্থায় পৌঁছাইয়া তাঁহারই সাক্ষাৎ স্বরূপ দর্শন বা অনুভব করিলেন—জীবন্ত, জাগ্রত, একমেবাদ্বিতীয়ম্, ইচ্ছা ও ক্রিয়ামাত্রেরই প্রসূতি, অনন্ত কৃপাময়ী জগজ্জননী! আর দেখিলেন—সেই একমেবা-দ্বিতীয়ম, নির্গুণ ও সগুণ ভাবে আপনাতে আপনি বিভক্ত থাকায় —ইহাকেই শাস্ত্রে স্বগতভেদ বলিয়াছে—তাঁহাতে একটা আব্রহ্ম-স্তম্বপর্যন্ত-ব্যাপী বিরাট আমিত্ব বিকশিত রহিয়াছে! শুধু তাহাই নহে, সেই বিরাট 'আমিটা' থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে; আর সেই ভাবতরঙ্গই স্বল্পাধিক পরিমাণে খণ্ড খণ্ড ভাবে দেখিতে পাইয়া মানবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'আমি'গুলো উহাকেই বাহিরের জগৎ ও বহির্জগতের ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া ধরিতেছে ও বলা-কহা ইত্যাদি করিতেছে! ঠাকুর দেখিলেন বড় 'আমি'টার শক্তিতেই মানবের ছোট 'আমি'গুলো রহিয়াছে ও স্ব-স্ব কার্য করিতেছে এবং বড় 'আমি'টাকে দেখিতে-ধরিতে পাইতেছে না বলিয়াই ছোট 'আমি'গুলো ভ্রমে পড়িয়া আপনাদিগকে স্বাধীন ইচ্ছা ও ক্রিয়াশক্তিমান মনে করিতেছে। এই দৃষ্টিহীনতাকেই শাস্ত্র অবিদ্যা ও অজ্ঞান বলেন।

নির্গুণ ও সগুণের মধ্যস্থলে এইরূপে যে বিরাট 'আমিত্ব'টা বর্তমান, উহাই 'ভাবমুখ'—কারণ, উহা থাকাতেই বিরাট মনে অনন্ত ভাবের স্ফুরণ হইতেছে। এই বিরাট আমিই জগজ্জননীর আমিত্ব বা ঈশ্বরের আমিত্ব। এই বিরাট আমিত্বের স্বরূপ বর্ণনা করিতে যাইয়াই গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যগণ বলিয়াছেন, অচিন্ত্যভেদাভেদ

ঐ বিরাট আমিত্বেরই নাম 'ভাবমুখ', কারণ সংসারের সকল প্রকার

ভাবই উহাকে আশ্রয় করিয়া উদয় হইতেছে

স্বরূপ জ্যোতির্ঘনমূর্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। ঠাকুরের আমিত্ব-জ্ঞানের যখন একেবারে লোপ হইতেছিল তখন এই বিরাট আমিত্বের গণ্ডির পারে অবস্থিত জগদম্বার নিগুর্ণ ভাবে অবস্থান করিতেছিলেন—তখন ঐ 'বিরাট আমি' ও তাহার অনন্তভাবতরঙ্গ, যাহাকে আমরা জগৎ বলিতেছি, তাহার কিছুরই অস্তিত্ব অনুভব হইতেছিল না; আর যখন ঠাকুরের 'আমি'-জ্ঞানের ঈষৎ উন্মেষ হইতেছিল তখন তিনি দেখিতেছিলেন, শ্রীশ্রীজগদম্বার নিগুর্ণ ভাবের সহিত সংযুক্ত এই সগুণ বিরাট 'আমি' ও তদন্তর্গত ভাবতরঙ্গসমূহ। অথবা নিগুর্ণভাবে উঠিবামাত্র সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরের অনুভবে ঐ একমেবাদ্বিতীয়মের ভিতর স্বগতভেদের অস্তিত্বও লোপ হইতেছিল; আর ঐ সগুণ বিরাট আমিত্বের যখন বোধ করিতেছিলেন, তখন দেখিতেছিলেন—যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, যে নিগুর্ণ সেই সগুণ, যে পুরুষ সেই প্রকৃতি, যে সাপ স্থির ছিল সেই এখন চলিতেছে, অথবা যিনিই স্বরূপে নিগুর্ণ তিনিই আবার লীলায় সগুণ! শ্রীশ্রীজগদম্বার এই নিগুর্ণ-সগুণ উভয় ভাবে জড়িত স্বরূপের পূর্ণ দর্শন পাইবার পর ঠাকুর আদেশ পাইলেন 'ভাবমুখে থাক্'—অর্থাৎ আমিত্বের একেবারে লোপ করিয়া নিগুর্ণভাবে অবস্থান করিও না; কিন্তু যাহা হইতে যত প্রকার বিশ্বভাবের উৎপত্তি হইতেছে সেই বিরাট 'আমিই' তুমি, তাঁহার ইচ্ছাই তোমার ইচ্ছা, তাঁহার কার্যই তোমার কার্য—এই ভাবটি ঠিক ঠিক সর্বদা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া জীবনযাপন

পূর্ণ নির্বিকল্প এবং ঈষৎ সবিকল্প বা 'ভাবমুখ' অবস্থায় ঠাকুরের অনুভব ও দর্শন

কর ও লোককল্যাণসাধন কর। অতএব 'ভাবমুখে' থাকার অর্থই হইতেছে—মনে সর্বতোভাবে, সকল সময় সকল অবস্থায় দেখা, ধারণা বা বোধ করা যে আমি সেই 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'। 'ভাব-মুখ'-অবস্থায় পৌঁছিলে, আমি অমুকের সন্তান, অমুকের পিতা, ব্রাহ্মণ বা শূদ্র ইত্যাদি সমস্ত কথা একেবারে মন হইতে ধুইয়া-পুঁছিয়া যায় এবং 'আমি সেই বিশ্বব্যাপী আমি' এই কথাটি সর্বদা মনে অনুভব হয়। ঠাকুর তাই আমাদের বার-বার শিক্ষা দিতেন—"ওগো, অমুকের ছেলে আমি, অমুকের বাপ আমি, ব্রাহ্মণ আমি, শূদ্র আমি, পণ্ডিত আমি, ধনী আমি—এ সব হচ্ছে কাঁচা আমি; ওতে বন্ধন নিয়ে আসে। ও সব ছেড়ে মনে করবে তাঁর (ভগবানের) দাস আমি, তাঁর ভক্ত আমি, তাঁর সন্তান আমি, তাঁর অংশ আমি। এই ভাবটি মনে পাকা করে রাখবে।" অথবা বলিতেন—"ওরে, অদ্বৈতজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তা কর্!"

'ভাবমুখে থাক'—কথার অর্থ

পাঠক হয়তো বলিবে, ঠাকুর কি তবে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী ছিলেন না? শ্রীশ্রীজগদম্বার মধ্যে স্বগতভেদ স্বীকার করিয়া ঠাকুর যখন জগন্মাতার নির্গুণ সগুণ দুই ভাবে অবস্থান দেখিতেন, তখন তো বলিতে হইবে তিনি আচার্য শঙ্করপ্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ, যাহাতে জগতের অস্তিত্বই স্বীকৃত হয় নাই, তাহা মানিতেন না? তাহা নহে! ঠাকুর অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও দ্বৈত সকল ভাব বা মতই মানিতেন। তবে বলিতেন, ঐ তিন প্রকার মত

সাধকের আধ্যাত্মিক উন্নতিতে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত ভাব পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়

মানবমনের উন্নতির অবস্থানুযায়ী পর পর আসিয়া উপস্থিত হয়। এক অবস্থায় দ্বৈতভাব আসে—তখন অপর দুই ভাবই মিথ্যা বলিয়া বোধ হয়। ধর্মোন্নতির উচ্চতর সোপানে উঠিয়া অপর অবস্থায় বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ আসে—তখন নিত্য নির্গুণ বস্তু লীলায় সতত সগুণ হইয়া রহিয়াছেন, এইরূপ বোধ হয়। তখন দ্বৈতবাদ তো মিথ্যা বোধ হয়ই, আবার অদ্বৈতবাদে যে সত্য নিহিত আছে তাহাও মনে উপলব্ধি হয় না। আর মানব যখন ধর্মোন্নতির শেষ সীমায় সাধনসহায়ে উপস্থিত হয় তখন শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণরূপেরই কেবলমাত্র উপলব্ধি করিয়া তাঁহাতে অদ্বৈতভাবে অবস্থান করে। তখন আমি-তুমি, জীব-জগৎ, ভক্তি-মুক্তি, পাপ-পুণ্য, ধর্মাধর্ম—সব একাকার। এই প্রসঙ্গে ঠাকুরের দাস্যভাবের উজ্জ্বল নিদর্শন মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ের উপলব্ধিটি দৃষ্টান্তস্বরূপে বলিতেন। বলিতেন—

মহাজ্ঞানী হনুমানের ঐ বিষয়ক কথা

শ্রীরামচন্দ্র কোন সময়ে নিজ দাস হনুমানকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আমায় কি ভাবে দেখ, বা ভাবনা ও পূজা কর?' হনুমান তদুত্তরে বলেন, 'হে রাম, যখন আমি দেহবুদ্ধিতে থাকি অথবা আমি এই দেহটা এইরূপ অনুভব করি, তখন দেখি—তুমি প্রভু, আমি দাস; তুমি সেব্য, আমি সেবক; তুমি পূজ্য, আমি পূজক; যখন আমি মন বুদ্ধি ও আত্মাবিশিষ্ট জীবাত্মা বলিয়া আপনাকে বোধ করিতে থাকি, তখন দেখি—তুমি পূর্ণ, আমি অংশ; আর যখন আমি উপাধিমাত্ররহিত শুদ্ধ আত্মা, সমাধিতে এই ভাব লইয়া থাকি, তখন দেখি—তুমিও যাহা, আমিও তাহা—তুমি আমি এক, কোনই ভেদ নাই।' "

ঠাকুর বলিতেন, "যে ঠিক ঠিক অদ্বৈতবাদী সে চুপ হইয়া যায়! অদ্বৈতবাদ বলবার বিষয় নয়। বলতে-কইতে গেলেই দুটো এসে পড়ে, ভাবনা-কল্পনা যতক্ষণ ততক্ষণও ভিতরে দুটো—ততক্ষণও ঠিক অদ্বৈতজ্ঞান হয় নাই। জগতে একমাত্র ব্রহ্মবস্তু বা শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণভাবই কখনও উচ্ছিষ্ট হয় নাই।" অর্থাৎ মানবের মুখ দিয়া বাহির হয় নাই, অথবা মানব ভাষা দ্বারা উহা প্রকাশ করিতে পারে নাই। কারণ ঐ ভাব মানবের মন-বুদ্ধির অতীত; বাক্যে তাহা কেমন করিয়া বলা বা বুঝান যাইবে? অদ্বৈতভাব সম্বন্ধে ঠাকুর সেজন্য বার বার বলিতেন, "ওরে, ওটা শেষকালের কথা।" অতএব দেখা যাইতেছে ঠাকুর বলিতেন, "যতক্ষণ 'আমি তুমি' 'বলা কহা' প্রভৃতি রহিয়াছে ততক্ষণ নির্গুণ-সগুণ, নিত্য ও লীলা—দুই ভাবই কার্যে মানিতে হইবে। ততক্ষণ অদ্বৈতভাব মুখে বলিলেও কার্যে, ব্যবহারে তোমাকে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী থাকিতে হইবে।" ঐ সম্বন্ধে ঠাকুর আরও কতই না দৃষ্টান্ত দিতেন! বলিতেন—

অদ্বৈতভাব চিন্তা, কল্পনা ও বাক্যাতীত; যতক্ষণ বলা-কহা আছে ততক্ষণ নিত্য ও লীলা, ঈশ্বরের উভয় ভাব লইয়া থাকিতেই হইবে

"যেমন গানের অনুলোম-বিলোম—সা ঋ গা মা পা ধা নি সা করিয়া সুর তুলিয়া আবার সা নি ধা পা মা গা ঋ সা— করিয়া সুর নামান। সমাধিতে অদ্বৈত-বোধটা অনুভব করিয়া আবার নীচে নামিয়া 'আমি' বোধটা লইয়া থাকা।

"যেমন বেলটা হাতে লইয়া বিচার করা যে, খোলা, বিচি, শাঁস—ইহার কোন্‌টা বেল। প্রথম খোলাটাকে অসার বলিয়া

ফেলিয়া দিলাম, বিচিগুলোকেও ঐরূপ করিলাম; আর শাঁসটুকু আলাদা করিয়া বলিলাম, এইটিই বেলের সার—এইটিই আদৎ বেল। তারপর আবার বিচার আসিল যে, যাহারই শাঁস তাহারই খোলা ও বিচি—খোলা, বিচি ও শাঁস সব একত্র করিয়াই বেলটা; সেই রকম নিত্য ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিয়া তারপর বিচার—যে নিত্য সেই লীলায় জগৎ!

ঐ বিষয়ে ঠাকুরের কয়েকটি

যথা—গানের অনুলোম-বিলোম; বেল, থোড়, প্যাজের খোলা

"যেমন থোড়খানার খোলা ছাড়াতে ছাড়াতে মাঝটায় পৌঁছুলুম আর সেটাকেই সার ভাবলুম। তারপর বিচার এল—খোলেরই মাঝ, মাঝেরই খোল—দুই জড়িয়েই থোড়টা।

"যেমন প্যাজটা—খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে আর কিছুই থাকে না, সেই রকম কোন্‌টা 'আমি' বিচার ক'রে দেখতে গিয়ে শরীরটা নয়, মনটা নয়, বুদ্ধিটা নয় ক'রে ছাড়াতে ছাড়াতে গিয়ে দেখা যায়, 'আমি' ব'লে একটা আলাদা কিছুই নাই—সবই 'তিনি' 'তিনি' তিনি' (ঈশ্বর); যেমন গঙ্গার খানিকটা জল বেড়া দিয়ে ঘিরে বলা—এটা আমার গঙ্গা!"

যাক্, এখন ওসকল কথা, আমরা পূর্ব-কথার অনুসরণ করি।

ভাবমুখে থাকিয়া যখন বিশ্বব্যাপী আমিত্বের ঠিক ঠিক অনুভব হইত তখন 'এক' হইতে 'বহু'র বিকাশ দেখিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার নির্গুণভাব হইতে কয়েক পদ নীচে বিদ্যা-মায়ার রাজ্যে যে বিচরণ করিতেন, এ কথা আর বলিতে হইবে না। কিন্তু সে রাজ্যেও

ভাবমুখ, নির্গুণ হইতে কয়েকপদ

নিম্নে অবস্থিত থাকিলেও ঐ অবস্থায় অদ্বৈত বস্তুর বিশেষ অনুভব থাকে। ঐ অবস্থার কিরূপ অনুভব হয়—ঠাকুরের দৃষ্টান্ত

একের বিকাশ ও অনুভব এত অধিক যে, এই ব্রহ্মাণ্ডে যে যাহা করিতেছে, ভাবিতেছে, বলিতেছে, সে সকলই আমি করিতেছি, ভাবিতেছি, বলিতেছি বলিয়া ঠাকুরের ঠিক ঠিক মনে হইত! এই অবস্থার অল্প বা আভাস মাত্র অনুভবও অতি অদ্ভুত! ঠাকুর বলিয়াছিলেন, একদিন ঘাসের উপর দিয়া একজন চলিয়া যাইতেছে, আর তাঁহার বুকে বিষম আঘাত লাগিতেছে!—যেন তাঁহার বুকের উপর দিয়াই সে যাইতেছে। বাস্তবিকই তখন তাঁহার বুকে রক্ত জমিয়া কাল দাগ হইয়া তিনি বেদনায় ছটফট করিয়াছিলেন।

বিদ্যা-মায়ার রাজ্যে আরও নিম্নস্তরে নামিলে তবে ঈশ্বরের দাস, ভক্ত, সন্তান বা অংশ আমি—এইরূপ অনুভব হয়

ঐ অবস্থা হইতে মায়ার রাজ্যের আরও নিম্নস্তরে নামিয়া যখন থাকিতেন, তখন ঠাকুরের মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার দাস আমি, ভক্ত আমি, সন্তান আমি বা অংশ আমি—এই ভাবটি সর্বদা জাগরূক থাকিত। উহা হইতেও নিম্নে অবিদ্যা মায়ার বা কাম ক্রোধ লোভ মোহাদির রাজত্ব। সে রাজ্য ঠাকুর যত্নপূর্বক নিরন্তর অভ্যাস সহকারে ত্যাগ করায় তাঁহার মন তথায় আর কখনও নামিত না বা শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে নামিতে দিতেন না। ঠাকুর যেমন বলিতেন, "যে মার উপর একান্ত নির্ভর করেছে, মা তার পা বেতালে পড়তে দেন না।"

অতএব বুঝা যাইতেছে, নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঠাকুরের

ভিতরের ছোট আমি বা কাঁচা আমিটার একেবারে লোপ হইয়াছিল। আর যে আমিত্বটুকু ছিল সেটি আপনাকে 'বড় আমি' বা 'পাকা আমি'টার সঙ্গে চিরসংযুক্ত দেখিত—কখন আপনাকে দেখিত সেই বিশ্বব্যাপী আমিটার অঙ্গ বা অংশ, আবার কখন তাহার নিকট নিকটতর নিকটতম দেশে উঠিয়া সেই বিশ্বব্যাপী 'আমি'তে লীন হইয়া যাইত। এই পথেই ঠাকুরের সকল মনের সকল ভাব আয়ত্তীভূত হইত। কারণ ঐ 'বড় আমি'কে আশ্রয় করিয়াই জগতে সকলের মনের যত প্রকার ভাব উঠিতেছে। ঠাকুর ঐ বিশ্বব্যাপী 'আমি'কে আশ্রয় করিয়া অনুক্ষণ থাকিতে পারিতেন বলিয়াই বিশ্বমনে যত ভাবতরঙ্গ উঠিতেছে, সকলই ধরিতে ও বুঝিতে সক্ষম হইতেন। ঐরূপ উচ্চাবস্থায় 'ভগবানের অংশ আমি', ঠাকুরের এ ভাবটিও ক্রমশঃ লীন হইয়া যাইত, এবং 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগন্মাতার আমিত্বই ঠাকুরের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া নিগ্রহানুগ্রহ-সমর্থ গুরুরূপে প্রতিভাত হইত! কাজেই ঠাকুরকে দেখিলে তখন আর 'দীনের দীন' বলিয়া বোধ হইত না। তখন ঠাকুরের চাল-চলন, অপরের সহিত ব্যবহার প্রভৃতি সমস্ত ক্রিয়াকলাপই অন্য আকার ধারণ করিত। তখন কল্পতরুর মত হইয়া তিনি ভক্তকে জিজ্ঞাসা করিতেন, "তুই কি চাস্?"—যেন ভক্ত যাহা চাহেন তাহা তৎক্ষণাৎ অমানুষী শক্তিবলে পূরণ করিতে বসিয়াছেন! দক্ষিণেশ্বরে

ঠাকুরের 'কাঁচা আমি'টার এককালে নাশ হইয়া বিরাট 'পাকা আমি'তে অনেককাল অবস্থিতি। ঐ অবস্থাতেই তাঁহাতে গুরুভাব প্রকাশ পাইত। অতএব দীনভাব ও গুরুভাব অবস্থানুসারে এক ব্যক্তিতে আসা অসম্ভব নহে

বিশেষ বিশেষ ভক্তদিগকে কৃপা করিবার জন্য ঐরূপ ভাবাপন্ন হইতে ঠাকুরকে আমরা নিত্য দেখিয়াছি; আর দেখিয়াছি, ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারীতে। সেদিন ঠাকুর ঐরূপ ভাবাপন্ন হইয়া তৎকালে উপস্থিত সকল ভক্তদিগকে স্পর্শ করিয়া তাহাদের ভিতর ধর্মশক্তি সঞ্চারিত বা সুপ্ত ধর্মভাবকে জাগ্রত করিয়া দেন! সে এক অপূর্ব কথা—এখানে বলিলে মন্দ হইবে না।

গুরুভাবে ঠাকুরের ইচ্ছা ও স্পর্শমাত্রে অপরে ধর্মশক্তি জাগ্রত করিয়া দিবার দৃষ্টান্ত—১৮৮৬ খৃঃ ১লা জানুয়ারীর ঘটনা

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী, পৌষ মাস। কিঞ্চিদধিক দুই সপ্তাহ হইল ভক্তেরা শ্রীযুত মহেন্দ্রলাল সরকার ডাক্তার মহাশয়ের পরামর্শানুসারে ঠাকুরকে কলিকাতার উত্তরে কাশীপুরে রাণী কাত্যায়নীর জামাতা গোপাল বাবুর বাগানবাটীতে আনিয়া রাখিয়াছেন। ডাক্তার বলিয়াছেন কলিকাতার বায়ু অপেক্ষা বাগান অঞ্চলের বায়ু নির্মল ও যতদূর সম্ভব নির্মল বায়ুতে থাকিলে ঠাকুরের গলরোগের উপশম হইতে পারে। বাগানে আসিবার কয়েক দিন পরেই ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল দত্ত ঠাকুরকে দেখিতে আসেন এবং লাইকোপোডিয়ম (২০০) ঔষধ প্রয়োগ করেন। উহাতে গলরোগটার কিছু উপকারও বোধ হয়। ঠাকুর কিন্তু এখানে আসা অবধি বাটীর দ্বিতল হইতে একদিন একবারও নীচের তলে নামেন নাই বা বাগানে বেড়াইয়া বেড়ান নাই। আজ শরীর অনেকটা ভাল থাকায় অপরাহ্নে বাগানে বেড়াইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই ভক্তদিগের আজ বিশেষ আনন্দ।

স্বামী বিবেকানন্দের তখন তীব্র বৈরাগ্য—সাংসারিক উন্নতি-কামনাসমূহ ত্যাগ করিয়া ঠাকুরের নিকটে বাস করিতেছেন ও তাঁহার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া শ্রীভগবানের দর্শনের জন্য নানা-প্রকার সাধন করিতেছেন। সমস্ত রাত্রি বৃক্ষতলে ধুনি বা অগ্নি জ্বালাইয়া ধ্যান, জপ, ভজন, পাঠ ইত্যাদিতেই থাকেন! অপর কয়েক জন ভক্তও, যথা—ছোট গোপাল, কালী (অভেদানন্দ) ইত্যাদি, আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি আনয়ন প্রভৃতি করিয়া তাঁহাকে ঐ বিষয়ে সাহায্য করেন এবং আপনারাও যথাসাধ্য ধ্যান-ভজন করেন। গৃহী ভক্তেরা বিষয়-কর্মাদিতে নিযুক্ত থাকায় সর্বদা ঠাকুরের নিকটে থাকিতে পারেন না; সুবিধা পাইলেই আসা যাওয়া করেন, এবং যাহারা ঠাকুরের সেবায় নিরন্তর ব্যাপৃত, তাঁহাদের আহারাদির সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন ও কখন কখন এক-আধ দিন থাকিয়াও যান। আর ইংরেজী বর্ষের প্রথম দিন বলিয়া ছুটি থাকায় অনেকেই কাশীপুরের বাগানে উপস্থিত হইয়াছেন।

অপরাহ্ণ বেলা ৩টা বাজিয়া গিয়াছে। ঠাকুর লালপেড়ে ধুতি, একটি পিরান, লালপাড় বসান একখানি মোটা চাদর, কানঢাকা টুপি ও চটি জুতাটি পরিয়া স্বামী অদ্ভুতানন্দের সহিত উপর হইতে ধীরে ধীরে নীচে নামিলেন এবং নীচেকার হল ঘরটি দেখিয়া পশ্চিমের দরজা দিয়া বাগানের পথে বেড়াইতে চলিলেন। গৃহী ভক্তেরা কেহ কেহ ঠাকুর ঐরূপে বেড়াইতে যাইতেছেন দেখিতে পাইয়া সানন্দে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত নরেন্দ্র (স্বামী বিবেকানন্দ) প্রমুখ বালক বা

যুবক ভক্তেরা তখন সমস্ত রাত্রি জাগরণে ক্লান্ত থাকায় হল ঘরের পাশে যে-ছোট ঘরটি ছিল, তাহার ভিতর নিদ্রা যাইতেছেন। শ্রীযুত লাটু (স্বামী অদ্ভুতানন্দ) তাঁহাদিগকে ঐরূপে যাইতে দেখিয়া ঠাকুরের সহিত স্বয়ং আর অধিক দূর যাওয়া অনাবশ্যক বুঝিয়া হল ঘরের সম্মুখে ক্ষুদ্র পুষ্করিণীটির দক্ষিণ পার পর্যন্ত আসিয়াই ফিরিলেন এবং অপর একজন যুবক ভক্তকে ডাকিয়া লইয়া ঠাকুর উপরে যে ঘরটিতে থাকেন সেটি ঝাঁটপাট দিয়া পরিষ্কার করিতে ও ঠাকুরের বিছানা প্রভৃতি রৌদ্রে দিতে ব্যাপৃত হইলেন।

গৃহী ভক্তগণের ভিতর শ্রীযুত গিরিশের তখন প্রবল অনুরাগ। ঠাকুর কোনও সময়ে তাঁহার অদ্ভুত বিশ্বাসের ভূয়সী প্রশংসা করিয়া অন্য ভক্তগণকে বলিয়াছিলেন, "গিরিশের পাঁচ সিকে পাঁচ আনা বিশ্বাস! ইহার পর লোকে ওর অবস্থা দেখে অবাক হবে!" বিশ্বাস-ভক্তির প্রবল প্রেরণায় গিরিশ তখন হইতে ঠাকুরকে সাক্ষাৎ ভগবান—জীবোদ্ধারের জন্য কৃপায় অবতীর্ণ বলিয়া অনুক্ষণ দেখিতেন এবং ঠাকুর তাঁহাকে নিষেধ করিলেও তাঁহার ঐ ধারণা সকলের নিকট প্রকাশ্যে বলিয়া বেড়াইতেন। গিরিশও সেদিন বাগানে উপস্থিত আছেন এবং শ্রীযুত রাম প্রমুখ অন্য কয়েকটি গৃহী ভক্তের সহিত একটি আমগাছের তলায় বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন।

ঠাকুর ভক্তগণ পরিবৃত হইয়া উদ্যানমধ্যস্থ প্রশস্ত পথটি দিয়া বাগানের গেটের দিকে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে হইতে প্রায় মধ্যপথে আসিয়া পথের ধারে আমগাছের ছায়ায় শ্রীযুত রাম ও

শ্রীযুত গিরিশকে দেখিতে পাইলেন এবং গিরিশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "গিরিশ, তুমি কি দেখেছ (আমার সম্বন্ধে) যে অত কথা (আমি অবতার ইত্যাদি) যাকে তাকে বলে বেড়াও ?"

সহসা ঐরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়াও গিরিশের বিশ্বাস টলিল না। তিনি সসম্ভ্রমে উঠিয়া রাস্তার উপরে আসিয়া ঠাকুরের পদতলে জানু পাতিয়া করজোড়ে উপবিষ্ট হইলেন এবং গদগদ কণ্ঠে বলিলেন, "ব্যাস বাল্মীকি যাঁহার কথা বলিয়া অন্ত করিতে পারেন নাই আমি তাঁহার সম্বন্ধে অধিক আর কি বলিতে পারি !"

গিরিশের ঐরূপ অদ্ভুত বিশ্বাসের কথা শুনিয়া ঠাকুরের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল এবং মন উচ্চ ভূমিতে উঠিয়া তিনি সমাধিস্থ হইলেন। গিরিশও তখন ঠাকুরের সেই দেবভাবে প্রদীপ্ত মুখমণ্ডল দেখিয়া উল্লাসে চীৎকার করিয়া 'জয় রামকৃষ্ণ' 'জয় রামকৃষ্ণ' বলিয়া বার বার পদধূলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ঠাকুর অর্ধবাহ্যদশায় হাস্যমুখে উপস্থিত সকলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তোমাদের কি আর বলিব, তোমাদের সকলের চৈতন্য হোক।" ভক্তেরা সে অভয়বাণী শুনিয়া তখন আনন্দে জয় জয় রব করিয়া কেহ প্রণাম, কেহ পুষ্পবর্ষণ এবং কেহ বা আসিয়া তাঁহার পদস্পর্শ করিতে লাগিলেন। প্রথম ব্যক্তি পদস্পর্শ করিয়া দণ্ডায়মান হইবামাত্র ঠাকুর ঐরূপ অর্ধ-বাহ্যাবস্থায় তাহার বক্ষঃ স্পর্শ করিয়া নীচের দিক হইতে উপরদিকে হস্ত সঞ্চালিত করিয়া বলিলেন, "চৈতন্য হোক্!" দ্বিতীয় ব্যক্তি আসিয়া প্রণাম করিয়া উঠিবামাত্র তাহাকেও

ঐরূপ করিলেন! তৃতীয় ব্যক্তিকেও ঐরূপ! চতুর্থকেও ঐরূপ! এইরূপে সমাগত ভক্তদিগের সকলকে একে একে ঐরূপে স্পর্শ করিতে লাগিলেন। আর সে অদ্ভুত স্পর্শে প্রত্যেকের ভিতর অপূর্ব ভাবান্তর উপস্থিত হইয়া কেহ হাসিতে, কেহ কাঁদিতে, কেহ বা ধ্যান করিতে, আবার কেহ বা নিজে আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া অহেতুক-দয়ানিধি ঠাকুরের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হইবার জন্য অপর সকলকে চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন! সে চীৎকার ও জয়রবে ত্যাগী ভক্তেরা কেহ বা নিদ্রা ত্যাগ করিয়া, কেহ বা হাতের কাজ ফেলিয়া ছুটিয়া আসিয়া দেখেন, উদ্যানপথ মধ্যে সকলে ঠাকুরকে ঘিরিয়া ঐরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন! এবং দেখিয়াই বুঝিলেন, দক্ষিণেশ্বরে বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কৃপায় ঠাকুরের দিব্য-ভাবাবেশে যে অদৃষ্টপূর্ব লীলার অভিনয় হইত তাহারই অদ্য এখানে সকলের প্রতি কৃপায় সকলকে লইয়া প্রকাশ! ত্যাগী ভক্তেরা আসিতে আসিতেই ঠাকুরের সে অবস্থা পরিবর্তিত হইয়া আবার সাধারণ সহজ ভাব উপস্থিত হইল। পরে গৃহী ভক্তদিগের অনেককে ঐ সময়ে কিরূপ অনুভব হইয়াছিল তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল,

ঠাকুরের ঐরূপ স্পর্শে ভক্তদিগের প্রত্যেকের দর্শন ও অনুভব

কাহারও সিদ্ধির নেশার মত একটা নেশা ও আনন্দ—কাহারও চক্ষু মুদ্রিত করিবামাত্র যে মূর্তির নিত্য ধ্যান করিতেন অথচ দর্শন পাইতেন না, ভিতরে সেই মূর্তির জাজ্বল্য দর্শন—কাহারও ভিতরে পূর্বে অননুভূত একটা পদার্থ বা শক্তি যেন সড় সড় করিয়া উপরে উঠিতেছে, এইরূপ বোধ ও আনন্দ

এবং কাহারও বা পূর্বে যাহা কখনও দেখেন নাই এরূপ একটা জ্যোতির চক্ষু মুদ্রিত করিলেই দর্শন ও আনন্দানুভব হইয়াছিল! দর্শনাদি প্রত্যেকের ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একটা অসাধারণ দিব্য আনন্দে ভরপুর হইয়া যাইবার অনুভবটি সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ—এ কথাটি বেশ বুঝা গিয়াছিল। শুধু তাহাই নহে, ঠাকুরের ভিতরের অমানুষী শক্তি বিশেষই যে বাহ্যস্পর্শ দ্বারা সঞ্চারিত হইয়া প্রত্যেক ভক্তের ভিতর ঐরূপ অপূর্ব মানসিক অনুভব ও পরিবর্তন আনিয়া দিল, একথাটিও সকলের সাধারণ প্রত্যক্ষ বলিয়া বুঝিতে পারা গিয়াছিল। উপস্থিত ভক্তসকলের মধ্যে দুই জনকে কেবল ঠাকুর "এখন নয়" বলিয়া ঐরূপে স্পর্শ করেন নাই! এবং তাঁহারাই কেবল এ আনন্দের দিনে আপনাদিগকে হতভাগ্য জ্ঞান করিয়া বিষণ্ণ হইয়াছিলেন।[১] ইহা দ্বারা এ বিষয়টিও বুঝা গিয়াছিল যে, কখন্ কাহার প্রতি কৃপায় ঠাকুরের ভিতর দিয়া ঐ দিব্যশক্তির প্রকাশ হইবে তাহার কিছুই স্থিরতা নাই! সাধারণ অবস্থায় ঠাকুর নিজেও তাহা জানিতে বা বুঝিতে পারিতেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ।

কখন কাহাকে কৃপায় ঠাকুর ঐ ভাবে স্পর্শ করিবেন তাহা বুঝা যাইত না

অতএব বেশ বুঝা যাইতেছে, কাঁচা বা ছোট আমিত্বটাকে সম্পূর্ণরূপে বিসর্জন করিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর 'বিশ্বব্যাপী আমি' বা শ্রীশ্রীজগদম্বার শক্তিপ্রকাশের মহান্ যন্ত্রস্বরূপ হইতে পারিয়াছিলেন! এবং ঐ কাঁচা 'আমি'টাকে একেবারে ত্যাগ করিয়া যথার্থ 'দীনের দীন' অবস্থায় উপনীত

১ পরে একদিন ঠাকুর ইহাদেরও ঐরূপে স্পর্শ করিয়াছিলেন।

হইয়াছিলেন, বলিয়াই ঠাকুরের ভিতর দিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার লোকগুরু, জগদ্‌গুরু-ভাবটির এইরূপ অপূর্ব বিকাশ সম্ভব হইয়াছিল! এইরূপে আমিত্বের লোপেই গুরুভাব বা গুরুশক্তির বিকাশ যে, সকল ধর্মগত সকল অবতারপুরুষগণের জীবনেই উপস্থিত হইয়াছিল, জগতের ধর্মেতিহাস এ বিষয়ে চিরকাল সাক্ষ্য দিতেছে।

'কাঁচা আমি'টার লোপ বা নাশেই গুরুভাব-প্রকাশের কথা সকল ধর্মশাস্ত্রে আছে

গুরুতে মনুষ্যবুদ্ধি করিলে ধর্মলাভ বা ঈশ্বরলাভ হয় না, একথা আমরা আবহমান কাল ধরিয়া শুনিয়া আসিতেছি।

'গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণুর্গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।'

—ইত্যাদি স্তুতিকথা আমরা চিরকালই বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের সহিত মন্ত্রদীক্ষাদাতা গুরুর উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করিয়া আসিতেছি। অনেকে আবার বিদেশী শিক্ষার কুহকে পড়িয়া আপনাদের জাতীয় শিক্ষা ও ভাব বিসর্জন দিয়া মানববিশেষকে ঐরূপ বলা মহাপাপের ভিতর গণ্য করিয়া অনেক বাদানুবাদ করিতেও পশ্চাৎপদ হন নাই! কারণ কে-ই বা তখন বুঝে যে, কোন কোন মানবশরীরকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পাইলেও গুরুভাবটি মানবীয় ভাবরাজ্যেরই অন্তর্গত নহে। কে-ই বা তখন জানে যে, শরীররক্ষার উপযোগী জল-বায়ু, আহার প্রভৃতি নিত্যাবশ্যকীয় বস্তুসমস্তের ন্যায়, মায়াপাশে বদ্ধ ত্রিতাপে তাপিত মানবমনের সমস্ত জ্বালানিবারণ ও শান্তি-লাভের উপায়স্বরূপ হইয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতা স্বয়ংই ঐ ভাব ও

গুরুভাব মানবীয় ভাব নহে—সাক্ষাৎ জগদম্বার ভাব, মানবের শরীর ও মনকে যন্ত্রস্বরূপে অবলম্বন করিয়া প্রকাশিত

শক্তিরূপে শুদ্ধ, বুদ্ধ, অহমিকাশূন্য মানবমনের ভিতর দিয়া পূর্ণরূপে প্রকাশিত আছেন? এবং কে-ই বা তখন ধারণা করে যে, যাহার মন যতটা পরিমাণে অহঙ্কার ত্যাগ করিতে বা 'কাঁচা আমি'-টাকে ছাড়িতে পারে ততটা পরিমাণেই সে ঐ ভাব ও শক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়! সাধারণ মানবমনে ঐ দিব্যভাবের যৎসামান্য 'ছিটে ফোঁটা' মাত্র প্রকাশ, তাই আমরা ততটা ধরিতে ছুঁইতে পারি না। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, চৈতন্য শঙ্কর, যীশু প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব যুগাবতারসকলে এবং বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণে ঐ দিব্যশক্তির ঐরূপ অপূর্ব লীলা যখন বহুভাগ্যফলে কাহারও নয়নপথে পতিত হয়, তখনই সে প্রাণে-প্রাণে বুঝিয়া থাকে যে, এ শক্তিপ্রকাশ মানবের নহে—সাক্ষাৎ ঈশ্বরের! তখনই ভবরোগগ্রস্ত পথভ্রান্ত জিজ্ঞাসু মানবের মোহ মলিনতা দূরে অপসারিত হয় এবং সে বলিয়া উঠে, 'হে গুরু, তুমি কখনই মানুষ নও—তুমি তিনি!'

ঈশ্বর করুণায় ঐ ভাবাবলম্বনে মানব-মনের অজ্ঞানমোহ দূর করেন। সেজন্য গুরুভক্তি ও ঈশ্বরভক্তি একই কথা

অতএব বুঝা যাইতেছে, শ্রীশ্রীজগন্মাতা যে ভাবরূপে মানব-মনের সকল প্রকার অজ্ঞান-মলিনতা দূর করেন, সেই উচ্চ ভাবেরই নাম গুরুভাব বা গুরুশক্তি। ঐ ভাবকেই শাস্ত্র গুরু নামে নির্দেশ করিয়াছেন ও মানবকে উহার প্রতি মনের ষোল আনা শ্রদ্ধা, ভক্তি ও বিশ্বাস অর্পণ করিতে বলিয়াছেন। কিন্তু স্থূলবুদ্ধি, ভক্তি-শ্রদ্ধাদি সবেমাত্র শিখিতে আরম্ভ করিয়াছে, এ প্রকার মানব-মন তো আর একটা অশরীরী ভাবকে ধরিতে, ছুঁইতে, ভালবাসিতে পারে না;

এ জন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, দীক্ষাদাতা মানবকে গুরু বলিয়া ভক্তি করিবে। সেজন্য যাঁহারা বলেন, আমরা গুরুভাবটিকে শ্রদ্ধা-ভক্তি করিতে পারি, কিন্তু যে দেহটা আশ্রয় করিয়া ঐ ভাব আমাদের নিকট প্রকাশিত হয় তাহাকে মান্য-ভক্তি কেন করিব,—ঐ ভাব তো আর তাঁহার নহে? তাঁহাদিগকে আমরা বলি—'ভাই, করিতে পার কর, কিন্তু দেখিও যেন নিজের মনের জুয়াচুরিতে ঠকিতে না হয়; শক্তি বা ভাব এবং যদবলম্বনে ঐ ভাব প্রকাশিত থাকে তদুভয়কে কখনও তো পৃথক্ পৃথক্ থাকিতে দেখ নাই, তবে কেমন করিয়া আগুন ও আগুনের দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ করিয়া একটিকে গ্রহণ ও ভক্তি-শ্রদ্ধা করিবে এবং অপরটিকে ত্যাগ করিবে, তাহা বলিতে পারি না!' যে যাহাকে ভালবাসে বা ভক্তি করে সে প্রেমাস্পদের ব্যবহৃত অতি সামান্য জিনিসটাকেও হৃদয়ে ধারণ করে। তাঁহার স্পৃষ্ট ফুলটা বা কাপড়-চোপড়খানাও সে পবিত্র বলিয়া বোধ করে। তিনি যে স্থান দিয়া চলিয়া যান, সেখানকার মাটিটাও তাহার কাছে বহু মূল্যবান ও বহু আদরের জিনিস বলিয়া বোধ হয়। তবে তিনি যে শরীরটাতে অবস্থান করিয়া তাহার পূজা গ্রহণ করেন ও তাহাকে কৃপা করেন, সেটার প্রতি যে তাহার শ্রদ্ধা-ভক্তি হইবে—এটা কি আবার বুঝাইয়া বলিতে হইবে? যাহারা গুরুভাবটি কি তাহাই বুঝে না, তাহারাই ঐরূপ কথা বলিয়া থাকে। আর যাহার গুরুভাবের প্রতি ঠিক ঠিক ভক্তি হইবে তাহার, ঐ ভাবের আধার গুরুর শরীরটার উপরেও ভক্তি-শ্রদ্ধার বিকাশ হইবেই হইবে। ঠাকুর এই বিষয়টি

বিভীষণের ভক্তির দৃষ্টান্ত দিয়া আমাদিগকে বুঝাইতেন। যথা—

শ্রীরামচন্দ্রের মানবলীলাসংবরণের অনেককাল পরে কোন সময়ে নৌকা-ডুবি হইয়া একজন মানব লঙ্কার উপকূলে সমুদ্র-তরঙ্গের দ্বারা নিক্ষিপ্ত হয়। বিভীষণ অমর, তিন কালই তিনি লঙ্কায় রাজত্ব করিতেছেন—তাঁহার নিকট ঐ সংবাদ পৌঁছিল। সভাস্থ অনেক রাক্ষসের সুকোমল মানবদেহরূপ খাদ্যের আগমন-সংবাদে জিহ্বায় জল আসিল। রাজা বিভীষণের কিন্তু ঐ সংবাদ শুনিয়া এক অপূর্ব ভাবান্তর আসিয়া উপস্থিত হইল। তিনি গলদশ্রুলোচনে ভক্তি-গদগদ বাক্যে বার বার বলিতে লাগিলেন, 'অহো ভাগ্য!' রাক্ষসেরা তাঁহার ভাব না বুঝিতে পারিয়া সকলে একেবারে অবাক। তৎপরে বিভীষণ তাহাদের বুঝাইয়া বলিতে লাগিলেন, 'যে মানবশরীর আমার রামচন্দ্র ধারণ করিয়া লঙ্কায় পদার্পণ করেন ও আমাকে কৃতার্থ করেন, বহুকাল পরে আজ আবার সেই মানবশরীর দেখিতে পাইব—এ কি কম ভাগ্যের কথা! আমার মনে হইতেছে যেন সাক্ষাৎ রামচন্দ্রই পুনরায় ঐরূপে আসিয়াছেন!' এই বলিয়া রাজা পাত্র-মিত্র সভাসদ্‌সকলকে সঙ্গে লইয়া সমুদ্রোপকূলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বহু সম্মান ও আদর করিয়া উক্ত মানবকে প্রাসাদে লইয়া যাইলেন। পরে তাহাকেই সিংহাসনে বসাইয়া নিজে সপরিবারে অনুগত দাসভাবে তাহার সেবা ও বন্দনাদি করিতে লাগিলেন! এইরূপে কিছুকাল

গুরুভক্তি-বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ—বিভীষণের গুরুভক্তির কথা

তাহাকে লঙ্কায় রাখিয়া নানা ধন-রত্ন-উপহার দিয়া সজলনয়নে বিদায় দিলেন এবং অনুচরবর্গের দ্বারা বাটী পৌঁছাইয়া দিলেন!

গল্পটি বলিয়া ঠাকুর আবার বলিতেন, "ঠিক ঠিক ভক্তি হলে এইরূপ হয়। সামান্য জিনিস হতেও তার ঈশ্বরের উদ্দীপনা হয়ে ভাবে বিভোর হয়। শুনিস নি—'এই মাটিতে খোল হয়' ব'লে চৈতন্যদেবের ভাব হয়েছিল? এক সময়ে এক জায়গা দিয়ে যেতে যেতে তিনি শুনলেন যে সেই গ্রামে হরিসংকীর্তনের সময় যে খোল বাজে লোকে সেই খোল তৈয়ার ও উহা বিক্রয় ক'রে দিনপাত করে। শুনেই তিনি ব'লে উঠলেন, 'এই মাটিতে খোল হয়!'—ব'লেই ভাবে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হলেন! কেন না, উদ্দীপনা হলো; 'এই মাটিতে খোল হয়, সেই খোল বাজিয়ে হরিনাম হয়, সেই হরি সকলের প্রাণের প্রাণ—সুন্দরের চাইতেও সুন্দর!'—একেবারে এত কথা মনে হয়ে হরিতে চিত্ত স্থির হয়ে গেল। সেই রকম যার গুরুভক্তি হয় তার গুরুর আত্মীয়-কুটুম্বদের দেখ্‌লে তো গুরুর উদ্দীপনা হবেই, যে গ্রামে গুরুর বাড়ী সে গ্রামের লোকদের দেখলেও ঐরূপ উদ্দীপনা হয়ে তাদের প্রণাম করে, পায়ের ধূলো নেয়, খাওয়ায় দাওয়ায় ও সেবা করে! এই অবস্থা হলে গুরুর দোষ আর দেখতে পাওয়া যায় না। তখনই এ কথা বলা চলে—

ঠিক ঠিক ভক্তিতে অতি তুচ্ছ বিষয়েও ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। 'এই মাটিতে খোল হয়'—বলিয়াই শ্রীচৈতন্যের ভাব

"যদ্যপি আমার গুরু শুঁড়ীবাড়ী যায়।
তথাপি আমার গুরু নিত্যানন্দ রায়।'[১]

১ অর্থাৎ নিত্যানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান বা ঈশ্বর।

নইলে মানুষের তো দোষ-গুণ আছেই। সে তার ভক্তিতে কিন্তু তখন আর মানুষকে মানুষ দেখে না, ভগবান বলেই দেখে! যেমন হ্যাবা-লাগা চোখে সব হলুদবর্ণ দেখে—সেই রকম; তখন তার ভক্তি তাকে দেখিয়ে দেয় যে, ঈশ্বরই সব—তিনিই গুরু, পিতা, মাতা, মানুষ, গরু, জড, চেতন সব হয়েছেন।"

দক্ষিণেশ্বরে একদিন একজন সরল উদ্ধত যুবক ভক্ত[১] ঠাকুর যে বিষয়টি তাহাকে বলিতেছিলেন তৎসম্বন্ধে নানা আপত্তি-তর্ক উত্থাপিত করিতেছিল। ঠাকুর তিন চারি বার তাহাকে ঐ বিষয়টি বলিলেও যখন সে বিচার করিতে লাগিল তখন ঠাকুর তাহাকে সুমিষ্ট ভৎর্সনা করিয়া বলিলেন, "তুমি কেমন গো? আমি বলচি আর তুমি কথাটা নিচ্চ না!" যুবকের এইবার ভালবাসায় হাত পড়িল। সে বলিল, "আপনি যখন বল্‌চেন তখন নিলুম বই কি। আগেকার কথাগুলো তর্কের খাতিরে বলেছিলাম।"

ঠাকুর শুনিয়া প্রসন্নমুখে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "গুরুভক্তি কেমন জান? গুরু যা বলবে তা তখনি দেখতে পাবে—সে ভক্তি ছিল অর্জ্জুনের। একদিন শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গে রথে চড়ে বেড়াতে বেড়াতে আকাশের দিকে চেয়ে বললেন, 'দেখ সখা, কেমন এক ঝাঁক পায়রা উড়ছে!' অর্জ্জুন অমনি দেখিয়া বলিলেন, 'হাঁ সখা, অতি সুন্দর পায়রা!' পরক্ষণেই শ্রীকৃষ্ণ আবার দেখিয়া বলিলেন, 'না সখা, ও তো পায়রা নয়!' অর্জ্জুন

অর্জুনের গুরুভক্তির কথা

১ শ্রীযুত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল।

দেখিয়া বলিলেন, 'তাই তো সখা, ও পায়রা নয়।' কথাটি এখন বোঝ—অর্জুন মহা-সত্যনিষ্ঠ, তিনি তো আর কৃষ্ণের খোশামোদ করিয়া ঐরূপ বলিলেন না? কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের কথায় তাঁর এত বিশ্বাস-ভক্তি যে, যেমন যেমন শ্রীকৃষ্ণ বল্লেন অর্জুনও তখন ঠিক ঠিক তা দেখতে পেলেন!"

শাস্ত্র যাঁহাকে অজ্ঞানান্ধকার-দূরীকরণসমর্থ গুরু বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন তাহা পূর্বোক্তরূপে ঐশ্বরিক ভাববিশেষ বলিয়া নির্ণীত হইলে সঙ্গে সঙ্গে আর একটি কথাও সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা এই—গুরু অনেক নহেন, এক। আধার বা যে যে শরীরাবলম্বনে ঈশ্বরের ঐ ভাব প্রকাশিত হয় তাহা ভিন্ন ভিন্ন হইলেও তোমার গুরু, আমার গুরু পৃথক নহেন—ভাবরূপে এক। মৃন্ময় মূর্তিতে দ্রোণকে আচার্যরূপে গ্রহণ ও ভক্তিপূর্বক একলব্যের ধনুর্বেদ-লাভরূপ মহাভারতীয় কথাটি ইহারই দৃষ্টান্তস্বরূপে বলা যাইতে পারে। অবশ্য একথাটি যুক্তিতে দাঁড়াইলেও ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হওয়া অনেক সময় ও সাধন-সাপেক্ষ এবং হৃদয়ঙ্গম হইলেও যতক্ষণ মানবের নিজের দেহবোধ থাকে, ততক্ষণ, যে শরীরের ভিতর দিয়া গুরুশক্তি তাঁহাকে কৃপা করেন সেই শরীরাবলম্বনেই শ্রীগুরুর পূজা করা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। ঠাকুর এই কথাটির দৃষ্টান্তে নিষ্ঠা-ভক্তির জলন্ত নিদর্শন হনুমানের কথা আমাদিগকে বলিতেন। যথা—

ঈশ্বরীয় ভাবরূপে গুরু এক। তথাপি নিজ গুরুতে ভক্তি, বিশ্বাস ও নিষ্ঠা চাই। ঐ বিষয়ে হনুমানের কথা

লঙ্কাসমরে শ্রীরামচন্দ্র ও তাঁহার ভ্রাতা লক্ষ্মণ মহাবীর

মেঘনাদ কর্তৃক কোন সময়ে নাগপাশে আবদ্ধ হন এবং উহা হইতে মুক্তি পাইবার জন্য নাগকুলের চিরশত্রু গরুড়কে স্মরণ করিয়া আনয়ন করেন। গরুড়কে দেখিবামাত্র নাগকুল ভয়ত্রস্ত হইয়া যে যেদিকে পারিল পলায়ন করিল। রামচন্দ্রও নিজভক্ত গরুড়ের প্রতি প্রসন্ন হইয়া গরুড়ের চিরকালপূজিত ইষ্টমূর্তি বিষ্ণুরূপে তাহার সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন ও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন—যিনি বিষ্ণু তিনিই তখন রামরূপে অবতীর্ণ! হনুমানের কিন্তু শ্রীরামচন্দ্রকে ঐরূপে বিষ্ণুমূর্তি পরিগ্রহ করিতে দেখা ভাল লাগিল না এবং কতক্ষণে তিনি পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিবেন এই কথাই ভাবিতে লাগিলেন। হনুমানের ঐ প্রকার মনোভাব বুঝিতে রামচন্দ্রের বিলম্ব হইল না। তিনি গরুড়কে বিদায় দিয়াই পুনরায় রামরূপ পরিগ্রহ করিয়া হনুমানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, আমার বিষ্ণুরূপ দেখিয়া তোমার ঐরূপ ভাবান্তর হইল কেন? তুমি মহাজ্ঞানী, তোমার তো আর জানিতে ও বুঝিতে বাকী নাই যে, যে রাম সেই বিষ্ণু?" হনুমান তাহাতে বিনীতভাবে উত্তর করিলেন, 'সত্য বটে, এক পরমাত্মাই উভয় রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন এবং সেজন্য শ্রীনাথ ও জানকীনাথে কোন প্রভেদ নাই, কিন্তু তথাপি আমার প্রাণ সতত জানকী-নাথেরই দর্শন চায়—কারণ তিনিই আমার সর্বস্ব! ঐ মূর্তির ভিতর দিয়াই আমি ভগবানের প্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হইয়াছি—

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ কমললোচনঃ॥"

এইরূপে গুরুভাবটি শ্রীশ্রীজগন্মাতার শক্তিবিশেষ ও সেই শক্তি

সকল মানবমনেই সুপ্ত বা ব্যক্তভাবে নিহিত রহিয়াছে বলিয়াই গুরুভক্তিপরায়ণ সাধক শেষে এমন এক অবস্থায় উপনীত হন যে, তখন ঐ শক্তি তাঁহার নিজের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া ধর্মের জটিল নিগূঢ় তত্ত্বসকল তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে থাকে। তখন সাধককে আর বাহিরের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করিয়া ধর্মবিষয়ক কোনরূপ সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতে হয় না। গীতায় শ্রীভগবান অর্জুনকে বলিয়াছেন—

সকল মানবেই গুরুভাব সুপ্তভাবে বিদ্যমান

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

গীতা—২।৫২

যখন তোমার বুদ্ধি অজ্ঞান-মোহ হইতে বিমুক্ত হইবে তখন আর এটা শুনা উচিত, ওটা শাস্ত্রে আছে ইত্যাদি কথায় আর তোমার প্রয়োজন থাকিবে না, তুমি ঐ সকলের পারে চলিয়া যাইয়া আপনিই তখন সকল বিষয় বুঝিতে পারিবে; সাধকের তখন ঐরূপ অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়।

ঠাকুর ঐ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেন, "শেষে মনই গুরু হয় বা গুরুর কাজ করে। মানুষ গুরু মন্ত্র দেয় কানে, (আর) জগদ্‌গুরু মন্ত্র দেয় প্রাণে।" কিন্তু সে মন আর এ মনে অনেক প্রভেদ। সে সময় মন শুদ্ধসত্ত্ব পবিত্র হইয়া ঈশ্বরের উচ্চ শক্তিপ্রকাশের যন্ত্রস্বরূপ হয়, আর এ সময়ে মন ঈশ্বর হইতে বিমুখ হইয়া ভোগসুখ ও কামক্রোধাদিতেই মাতিয়া থাকিতে চায়।

ঠাকুরের কথা —"শেষে মনই গুরু হয়"

ঠাকুর বলিতেন, "গুরু যেন সখী—যতদিন না শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার মিলন হয় ততদিন সখীর কাজের বিরাম নাই, সেইরূপ যতদিন না ইষ্টের সহিত সাধকের মিলন হয় ততদিন গুরুর কাজের শেষ নাই।" এইরূপে মহামহিমান্বিত শ্রীগুরু জিজ্ঞাসু ভক্তের হাত ধরিয়া উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবরাজ্যে আরোহণ করেন এবং পরিশেষে তাহাকে ইষ্টমূর্তির সম্মুখে আনিয়া বলেন, "ও শিষ্য, ঐ দেখ!" ইহা বলিয়াই অন্তর্হিত হন।

"গুরু যেন সখী"

ঠাকুরকে একদিন ঐরূপ বলিতে শুনিয়া একজন অনুগত ভক্ত 'শ্রীগুরুর সহিত বিচ্ছেদ তবে তো একদিন অনিবার্য' ভাবিয়া ব্যথিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করেন —"গুরু তখন কোথায় যান, মশাই?" ঠাকুর তদুত্তরে বলেন, "গুরু ইষ্টে লয় হন। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনে এক, একে তিন।"

"গুরু শেষে ইষ্টে লয় হন। গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব—তিনে এক, একে তিন"

চতুর্থ অধ্যায়

গুরুভাবের পূর্ববিকাশ

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥—গীতা, ৯।১১

ঠাকুরের ‘ভতরে গুরুভাবের প্রকাশ বাল্যাবধিই দেখিতে পাওয়া যায়। তবে যৌবনে নির্বিকল্প-সমাধিলাভের পর ঐ ভাবের যে পূর্ণ বিকাশ, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। বাল্যাবধি তাঁহাতে ঐ ভাবের প্রকাশ বলাতে কেহ না মনে করেন, আমরা ঠাকুরকে বাড়াইবার জন্য কথাটি অতিরঞ্জিত করিয়া বলিতেছি। যথার্থ নিরপেক্ষভাবে যদি কেহ ঠাকুরের জীবন আলোচনা করেন তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন, ঐ দোষে কখনই তাঁহাকে লিপ্ত হইতে হইবে না। এ অদ্ভুত অলৌকিক জীবনের ঘটনাবলী যিনি যতদূর পারেন বিচার করিয়া দেখুন না কেন, দেখিবেন বিচার-শক্তিই পরিশেষে হার মানিয়া স্তম্ভিত ও মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে! আমাদের মনও বড় কম সন্দিগ্ধ ছিল না; আমাদের ভিতরের অনেকেই ঠাকুরকে যে ভাবে যাচাইয়া বাজাইয়া লইয়াছেন ঐরূপ করিতে এখনকার কাহারও মন-বুদ্ধিতে উঠিবেই না বলিয়া আমাদের বোধ হয় ঐরূপে ঠাকুরকে সন্দেহ করা এবং পরীক্ষা করিতে যাইয়া নিজেই

বাল্যাবস্থা হইতেই গুরুভাবের পরিচয় ঠাকুরের জীবনে পাওয়া যায়

পরাজিত হইয়া লজ্জায় অধোবদন হওয়া আমাদের ভিতর কতবার কত লোকেরই ভাগ্যে যে হইয়াছে তাহা বলা যায় না। 'লীলাপ্রসঙ্গে' ঐ বিষয়ের আভাস আমরা পূর্বেই পাঠককে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ দিয়াছি, পরে আরও অনেক দিতে হইবে। পাঠক তখন নিজেই বুঝিয়া লইবেন; এজন্য এ বিষয়ে এখন আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই।

"আগে ফল, তারপর ফুল—যেমন লাউ-কুমড়ার"—ঠাকুর এ কথাটি নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটিদের জীবনপ্রসঙ্গে সর্বদাই ব্যবহার করিতেন। অর্থ—ঐরূপ পুরুষেরা জগতে আসিয়া কোন বিষয়ে সিদ্ধ হইবার জন্য যাহা কিছু সাধন করেন, তাহা কেবল ইতর-সাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য যে, ঐ বিষয়ে ঐরূপ ফললাভ করিতে হইলে এইরূপ চেষ্টা তাহাদের করিতে হইবে। কারণ ঐরূপ পুরুষদিগের জীবনালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, যে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহারা এতটা চেষ্টা জীবনে দেখান, সেই জ্ঞান আজীবন থাকিলে সকল কার্য যেরূপভাবে করা যায়, ঐ সকল পুরুষেরা বাল্যাবধি ঠিক তদ্রূপ ব্যবহারই সর্বত্রই সকল বিষয়ে করিয়া আসিয়াছেন! যেন ঐ জ্ঞানলাভ করিবার ফল তাঁহারা পূর্ব হইতেই নিজস্ব করিয়া রাখিয়াছেন! নিত্যমুক্তদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা সত্য, তখন ঈশ্বরাবতারদের তো কথাই নাই! তাঁহাদের জীবনে ঐরূপ জ্ঞানের প্রকাশ আজীবনই দেখিতে পাওয়া যায়। সকল দেশের সকল যুগের ঈশ্বরাবতারদের সম্বন্ধেই শাস্ত্র একথা সত্য বলিয়া

"আগে ফল, তারপর ফুল।" সকল অবতার-পুরুষের জীবনেই ঐ ভাব

লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। আবার ইহাও দেখা যায় যে, ভিন্ন ভিন্ন যুগের ঈশ্বরাবতারদিগের অনেক ব্যবহারের মধ্যে একটা সৌসাদৃশ্য আছে। যথা—স্পর্শ দ্বারা ধর্মজীবন-সঞ্চারের কথা যীশু, শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণ সকলের জীবনেই দেখিতে পাই। ঐরূপ, তাঁহাদের জন্মগ্রহণকালে বিশেষ বিশেষ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ঐ বিষয় অলৌকিক উপায়ে জ্ঞাত হইবার কথা, বাল্যাবধি তাঁহাদের ভিতর গুরুভাব প্রকাশিত থাকিবার কথা, তাঁহারা যে মানবসাধারণকে উন্নত করিবার জন্য বিশেষ বিশেষ পথ দেখাইতে কৃপায় অবতীর্ণ, এ বিষয়টি বাল্যাবধি উপলব্ধি করিবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাই একরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব ঠাকুরের জীবনে বাল্যাবধি গুরুভাব প্রভৃতির প্রকাশ থাকার কথা শুনিয়া আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। কারণ 'অবতার'পুরুষদিগের থাক বা শ্রেণীই একটা পৃথক্। সাধারণ মানবের জীবনে ঐরূপ ঘটনা কখনও সম্ভবে না বলিয়া অবতারপুরুষদিগের জীবনেও ঐরূপ হওয়া অসম্ভব মনে করিলে বিষম ভ্রমে পড়িতে হইবে।

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথম জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাই তাঁহার জন্মভূমি কামারপুকুরে। তাঁহার তখন উপনয়ন হইয়া গিয়াছে; অতএব বয়স ৯।১০ বৎসর হইবে। গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের বাটীতে শ্রাদ্ধোপলক্ষে তদঞ্চলের খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গের নিমন্ত্রণ হয় এবং অনেক পণ্ডিতের একত্র সমাবেশ হইলে যাহা হইয়া থাকে—খুব তর্কের

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের প্রথম বিকাশ—কামারপুকুর

হুড়াহুড়ি পড়িয়া যায়। অনেক তর্কেও শাস্ত্রীয় প্রশ্নবিশেষের কোনরূপ মীমাংসা হইতেছিল না, এমন সময়ে বালক শ্রীরামকৃষ্ণ বা গদাধর পরিচিত জনৈক পণ্ডিতকে বলেন, "কথাটার এই ভাবে মীমাংসা হয় না কি?" সভায় পল্লীর অনেক বালকই

লাহাবাবুদের বাটীতে পণ্ডিতসভায় শাস্ত্রবিচার

কৌতূহলাকৃষ্ট হইয়া আসিয়াছিল এবং নানারূপ অঙ্গভঙ্গী করিয়া পণ্ডিতদিগের উচ্চরবে বাগ্‌যুদ্ধটার বিন্দুমাত্র অর্থবোধ না হওয়ায় কেহ বা উহাকে একটা রঙ্গরসের মধ্যে ভাবিয়া হাসিতেছিল, কেহ বা বিরক্ত হইয়া পণ্ডিতদিগের অঙ্গভঙ্গীর অনুকরণ করিয়া সোরগোল করিতেছিল, আবার কেহ বা একেবারে অন্যমনা হইয়া আপনাদের ক্রীড়াতেই মন দিয়াছিল। কাজেই এ অপূর্ব বালক যে পণ্ডিতদিগের সকল কথা ধৈর্যসহকারে শুনিয়াছে, বুঝিয়াছে এবং মনে ভাবিয়া একটা সুমীমাংসায় উপনীত হইয়াছে, ইহা ভাবিয়া পণ্ডিতটি প্রথম অবাক হইলেন; তাহার পর নিজের পরিচিত পণ্ডিতদের নিকট গদাধরের মীমাংসার কথা বলিতে লাগিলেন; তাহার পর তাঁহারা সকলে উহাই ঐ বিষয়ের একমাত্র মীমাংসা বুঝিয়া অপরাপর সকল পণ্ডিতকে ঐ বিষয় বুঝাইয়া বলিলেন। তখন ঐ প্রশ্নের উহাই যে একমাত্র সমাধান তাহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন এবং কাহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ঐ অপূর্ব সমাধান প্রথম দেখিতে পাইল, তাহারই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; এবং যখন নিশ্চিত জানিতে পারিলেন উহা বালক গদাধরই করিয়াছে, তখন কেহ বা স্তম্ভিতপ্রায় হইয়া বালককে দৈবশক্তিসম্পন্ন ভাবিয়া তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন,

আবার কেহ বা আনন্দপূরিত হইয়া বালককে ক্রোড়ে তুলিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিলেন!

ঈশার জীবনে ঐরূপ ঘটনা। জেরুজালেমের য়াভে মন্দির

কথাটির আর একটু আলোচনা আবশ্যক। ক্রীশ্চান ধর্ম-প্রবর্তক ভগবদবতার ঈশার জীবনেও ঠিক এইরূপ একটি কথা বাইবেলে[১] লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার বয়ঃক্রম তখন দ্বাদশবর্ষ। তাঁহার দরিদ্র ধর্মপরায়ণ পিতামাতা ইয়ুসুফ ও মেরি সে বৎসর তাঁহাকে লইয়া অন্যান্য যাত্রীদের সহিত পদব্রজে নিজেদের বাসভূমি গ্যালিলি প্রদেশস্থ নাজারেথ্ নামক গণ্ডগ্রাম হইতে জেরুজালেম তীর্থের সুবিখ্যাত মন্দিরে দেবদর্শন ও পূজা বলি ইত্যাদি দিবার জন্য যাত্রা করিয়াছেন। য়্যাহুদিদিগের এই তীর্থ হিন্দুদিগের তীর্থসকলের ন্যায়ই ছিল। এখানে স্বর্ণকৌটায় য়াভে দেবতার আবির্ভাব ভক্ত-সাধক প্রত্যক্ষ করিয়া আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিত; এবং উহার সম্মুখে একটি বেদীর উপর ধূপ-ধুনা জ্বালাইয়া পত্র-পুষ্প-ফলমূল ও মেষ-পায়রা প্রভৃতি পশু-পক্ষ্যাদি বলি দিয়া উক্ত দেবতার পূজা করিত। হিন্দুদিগের ৺কামাখ্যা পীঠ ও ৺বিন্ধ্যবাসিনী প্রভৃতি তীর্থে অদ্যাপি পায়রা প্রভৃতি পক্ষী বলি দেওয়া এখনও প্রচলিত।

সেকালের য়্যাহুদী তীর্থযাত্রী

ইয়সুফ্ ও মেরি শাস্ত্রানুসারে দর্শন, পূজা, বলি ও হোমাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করিয়া সঙ্গীদিগের সহিত নিজ গ্রামাভিমুখে ফিরিলেন। সে সময়ে নানা দিগ্‌দেশ হইতে জেরুজালেমদর্শনে আগত যাত্রীদিগের অবস্থা অনেকটা, রেল হইবার পূর্বে পদব্রজে ৺পুরী প্রভৃতি

১ লূক্ ২—৪২

তীর্থদর্শনে অগ্রসর যাত্রীদিগের মতই ছিল। সেই মধ্যে মধ্যে বৃক্ষ-কূপ-তড়াগাদিশোভিত একই প্রকার দীর্ঘ পথ, সেই মধ্যে মধ্যে বিশ্রামস্থান, চটী বা সরাই—ধর্মশালারও অভাব ছিল না শুনা যায়—সেই তীর্থযাত্রীর সহচর পাণ্ডা, সেই চাল-ডাল-আটা প্রভৃতি নিতান্ত আবশ্যকীয় খাদ্যাদিদ্রব্য-প্রাপ্তিস্থান মুদির দোকান, সেই ধূলা, সেই ধর্মভাববিস্মরণকারী নিদ্রালস্যের বৈরী যাত্রীদিগের পরমবন্ধু মশককুল, সেই বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের যাত্রিবর্গের দস্যু-তস্করাদি হইতে পরস্পরের সাহায্যলাভ করিতে পারিবে বলিয়া দলবদ্ধ হইয়া গমন এবং পরিশেষে সেই যাত্রীদিগের একান্ত ঈশ্বরনির্ভরতা ও ভগবদ্ভক্তি!

ঈশার পিতা-মাতা আপন দলের সহিত প্রত্যাবর্তনের সময় ঈশাকে নিকটে দেখিতে না পাইয়া ভাবিলেন, বোধ হয় অপর কোন যাত্রী-বালকের সহিত দলের পশ্চাতে আসিতেছে। কিন্তু অনেক দূর চলিয়া আসিয়াও যখন ঈশাকে দেখিতে পাইলেন না, তখন বিশেষ ভাবিত হইয়া তন্নতন্ন করিয়া দলমধ্যে অন্বেষণ করিয়া দেখিলেন ঈশা তাঁহাদের সঙ্গে নাই। কাজেই ব্যাকুল হইয়া পুনরায় জেরুজালেম অভিমুখে ফিরিলেন। সেখানে নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া কোথাও বালকের তত্ত্ব পাইলেন না। পরিশেষে মন্দিরমধ্যে অনুসন্ধান করিতে যাইয়া দেখেন বালক ঈশা শাস্ত্রজ্ঞ সাধককুলের ভিতর বসিয়া শাস্ত্রবিচার করিতেছে এবং শাস্ত্রের জটিল প্রশ্নসকলের (যাহা পণ্ডিতেরাও সমাধান করিতে পারিতেছেন না) অপূর্ব ব্যাখ্যা করিয়া সকলকে মোহিত করিতেছে!

য়্যাভে-মন্দিরে ঈশার শাস্ত্রব্যাখ্যা

পণ্ডিত মোক্ষমূলর তৎকৃত শ্রীরামকৃষ্ণজীবনীতে শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্বোক্ত বাল্যলীলার সহিত ঈশার বাল্যলীলার সৌসাদৃশ্য পাইয়া ঐ বিষয়ের সত্যতায় বিশেষ সন্দিহান হইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, একটু কটাক্ষ করিয়াও বলিয়াছেন যে, শ্রীরামকৃষ্ণের ইংরাজীবিদ্যাভিজ্ঞ শিষ্যেরা গুরুর মান বাড়াইবার জন্য ঈশার বাল্যলীলার কথাটি শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত ইচ্ছা করিয়াই জুড়িয়া দিয়াছেন! পণ্ডিত ঐরূপে আপন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেও আমরা নাচার, কারণ শ্রীরামকৃষ্ণের ঐরূপ বাল্যলীলার কথা আমরা ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুরের অনেক বৃদ্ধের মুখে শুনিয়াছি এবং ঠাকুরও কখন কখন ঐ বিষয় আমাদের কাহারও কাহারও নিকট নিজমুখে বলিয়াছেন। এই পর্যন্ত বলিয়াই এখানে ক্ষান্ত থাকা ভাল।

পণ্ডিত মোক্ষমূলরের মতখণ্ডন

ঠাকুরের জীবনালোচনা করিতে যাইয়া সকলেরই মনে হয়—ঠাকুর বিবাহিত হইলেন কেন? স্ত্রীর সহিত যাঁহার কোনকালেই শরীরসম্বন্ধ রাখিবার সঙ্কল্প ছিল না, তিনি কেন বিবাহ করিলেন, ইহার কারণ বাস্তবিকই খুঁজিয়া পাওয়া ভার। যদি বল, যৌবনে পদার্পণ করিয়াই ঠাকুর 'ভগবান' 'ভগবান' করিয়া উন্মাদপ্রায় হইলেন বলিয়াই আত্মীয়েরা জোর করিয়া বিবাহ দিলেন, তদুত্তরে আমরা বলি ওটা একটা কথাই নয়। জোর করিয়া একটা ছোট কাজও তাঁহাকে বাল্যাবধি কেহ করাইতে পারে নাই। যখন যাহা করিবেন মনে করিয়াছেন, তাহা কোনও না কোন উপায়ে নিশ্চিত সাধিত করিয়াছেন। উপনয়নকালে

ঠাকুর বিবাহ করিলেন কেন? আত্মীয়দিগের অনুরোধে?—না

ধনী নাম্নী জনৈকা কামারজাতীয়া কন্যাকে ভিক্ষামাতা করাতেই দেখ না। কামারপুকুরে কলিকাতার ন্যায় সমাজবন্ধন শিথিল ছিল না যে, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিবে; ঠাকুরের পিতামাতাও কম স্বধর্মনিষ্ঠ ছিলেন না, বংশগত প্রথাও ছিল—কোনও না কোন ব্রাহ্মণকন্যাকে ভিক্ষামাতারূপে নির্দিষ্ট করা এবং বালক গদাধরের অভিভাবকদিগের সকলেই বালকের কামারকন্যার নিকট হইতে প্রথম ভিক্ষাগ্রহণের বিরোধী ছিলেন। তথাপি কেবলমাত্র গদাধরের নির্বন্ধে ধনীর ভিক্ষামাতা হওয়া সাব্যস্ত হইল—ইহা একটি কম আশ্চর্যের বিষয় নহে! এইরূপে সকল ঘটনায় যখন দেখিতে পাই, ঠাকুরের ইচ্ছা ও কথাই সকল বিষয়ে অপর সকলের বিপরীত ভাব ও ইচ্ছাকে চিরকাল ফিরাইয়া দিয়াছে, তখন কেমন করিয়া বলি তাঁহার জীবনের অত বড় ঘটনাটা আত্মীয়দিগের ইচ্ছা ও অনুরোধের জোরে হইয়াছে?

আবার, যদি বল ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে সর্বস্বত্যাগের ভাবটা যে ঠাকুরের আজীবন ছিল, এ কথাটা স্বীকার করিবার আবশ্যকতা কি? ঐ কথাটা স্বীকার না করিয়া যদি বল যে, মানবসাধারণের ন্যায় ঠাকুরেরও বিবাহাদি করিয়া সংসার-সুখভোগ করিবার ইচ্ছাটা প্রথম প্রথম ছিল, কিন্তু যৌবনে পদার্পণ করিয়াই তাঁহার মনের গতির হঠাৎ একটা আমূল পরিবর্তন আসিয়া পড়িল; সংসার-বৈরাগ্য ও ঈশ্বরানুরাগের একটা প্রবল ঝটিকা তাঁহার প্রাণে বহিয়া তাঁহাকে এমন আত্মহারা করিয়া ফেলিল যে, তাঁহার

ভোগবাসনা ছিল বলিয়া?—না

পূর্বেকার বাসনাসমূহ একেবারে চিরকালের মত কোথায় উড়িয়া যাইল। ঠাকুরের বিবাহটা ঐ বিরাগ-অনুরাগের ঝড়টা বহিবার আগেই হইয়াছিল বলিলেই তো সকল কথা মিটিয়া যায়! আমরা বলি—কথাটি আপাততঃ বেশ যুক্তিযুক্ত বোধ হইলেও তৎসম্বন্ধে কতকগুলি অখণ্ডনীয় আপত্তি আছে। প্রথম—চব্বিশ বৎসর বয়সে ঠাকুরের বিবাহ হয়, তখন বৈরাগ্যের ঝড় তাঁহার প্রাণে তুমুল বহিতেছে। আর, আজীবন যিনি নিজের জন্য কাহাকেও এতটুকু কষ্ট দিতে কুণ্ঠিত হইতেন, তিনি যে কিছুমাত্র না ভাবিয়া একজন পরের মেয়ের চিরকাল দুঃখ-ভোগের সম্ভাবনা বুঝিয়াও ঐ কার্যে অগ্রসর হইলেন, ইহা হইতেই পারে না। দ্বিতীয়—ঠাকুরের জীবনের কোন ঘটনাই যে নিরর্থক হয় নাই, একথা আমরা যতই বিচার করিয়া দেখি ততই বুঝিতে পারি। তৃতীয়—তিনি ইচ্ছা করিয়াই যে বিবাহ করিয়াছিলেন ইহা সুনিশ্চিত; কারণ বিবাহের পাত্রী অনুসন্ধানকালে নিজের ভাগিনেয় হৃদয় ও বাটীর অন্যান্য সকলকে বলিয়া দেন যে, তাঁহার বিবাহ জয়রামবাটী-নিবাসী শ্রীযুত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কন্যার সহিত হইবে—ইহা পূর্ব হইতে স্থির আছে। কথাটি শুনিয়া পাঠক অবাক্ হইবে, অথবা অবিশ্বাস করিয়া বলিবে—"কেবলই অদ্ভুত কথার অবতারণা! বিংশ শতাব্দীতে ও-সকল কথা কি চলে?" তদুত্তরে আমাদের বলিতে হয়, "তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর বাপু, কিন্তু ঘটনা বাস্তবিকই ঐরূপ হইয়াছিল। এখনও অনেকে বাঁচিয়া

বিবাহের পাত্রী-অন্বেষণের সময় ঠাকুরের কথা—"কুটো বেঁধে রাখা আছে, দেখ গে যা।" অতএব স্বেচ্ছায় বিবাহ করা

আছেন যাঁহারা ঐ বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। অনুসন্ধান করিয়া দেখই না কেন?" পাত্রীর অন্বেষণে যখন কোনটিই আত্মীয়দিগের মনোমত হইতেছিল না, তখন ঠাকুর স্বয়ং বলিয়া দেন অমুক গাঁয়ের অমুকের "মেয়েটি কুটো বেঁধে[১] রাখা আছে দেখ্‌গে যা!" অতএব বুঝাই যাইতেছে ঠাকুর জানিতে পারিয়াছিলেন, তাঁহার বিবাহ হইবে এবং কোথায় কাহার কন্যার সহিত হইবে। তিনি তাহাতে কোন আপত্তিও করেন নাই। অবশ্য ঐরূপ জানিতে পারা তাঁহার ভাবসমাধিকালেই হইয়াছিল।

প্রারব্ধ কর্ম-ভোগের জন্যই কি ঠাকুরের বিবাহ?

তবে ঠাকুরের বিবাহ হইবার অর্থ কি? শাস্ত্রজ্ঞ কোন পাঠক এইবার হয়তো বিরক্ত হইয়া বলিবেন—তুমি তো বড় অর্বাচীন হে! সামান্য কথাটা লইয়া এত গোল করিতেছ? শাস্ত্র-টাস্ত্র একটু-আধটু দেখিয়া সাধু-মহাপুরুষের জীবনের ঘটনা লিখিতে কলম ধরিতে হয়। শাস্ত্র বলেন—ঈশ্বরদর্শন বা পূর্ণজ্ঞান হইলে জীবের সঞ্চিত ও আগামী কর্মের ক্ষয় হয়, কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ভোগ জীবকে জ্ঞানলাভ হইলেও এই দেহে করিতে হয়। একটা ব্যাধের পিঠে-বাঁধা তূণে কতকগুলি তীর রহিয়াছে, হাতে একটি তীর এখনি ছুড়িবে বলিয়া লইয়াছে, আর একটি তীর বৃক্ষোপরি একটি

১ পাড়াগাঁয়ে প্রথা আছে, শশা প্রভৃতি গাছের যে ফলটি ভাল বুঝিয়া ভগবানের ভোগ দিবে বলিয়া কৃষক মনে করে, স্মরণ রাখিবার জন্য সেটিতে একটি কুটো বাঁধিয়া চিহ্নিত করিয়া রাখে। ঐরূপ করায় কৃষক নিজে বা তাহার বাটীর আর কেহ সেটি ভুলক্রমে তুলিয়া বিক্রয় করিয়া ফেলে না। ঠাকুর ঐ প্রথা স্মরণ করিয়াই ঐ কথা বলেন। অর্থ—অমুকের মেয়ের সহিত তাঁহার বিবাহ হইবে একথা পূর্ব হইতে স্থির হইয়া আছে অথবা অমুক কন্যাটি তাঁহার বিবাহের পাত্রীস্বরূপে দৈবকর্তৃক রক্ষিত আছে।

পক্ষীকে লক্ষ্য করিয়া সে এইমাত্র ছুড়িয়াছে। এমন সময় ধর, ব্যাধের মনে হঠাৎ বৈরাগ্যের উদয় হইয়া সে ভাবিল আর হিংসা করিবে না। হাতের তীরটি সে ফেলিয়া দিল, পিঠের তীরগুলিও ঐরূপে ত্যাগ করিল, কিন্তু যে তীরটি সে পাখীটাকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়াছিল সেটাকে কি আর ফিরাইতে পারে? পিঠের তীরগুলি যেন তাহার জন্মজন্মান্তরের সঞ্চিত কর্ম, আর হাতের তীরটি আগামী কর্ম বা যে কর্মসকলের ফল সে এইবার ভোগ করিবে—ঐ উভয় কর্মগুলি জ্ঞানলাভে নাশ হয়। কিন্তু তাহার প্রারব্ধ কর্মগুলি হইতেছে—যে তীরটি সে ছুড়িয়া ফেলিয়াছে তাহার মত, তাহাদের ফল ভোগ করিতে হইবেই হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ন্যায় মহাপুরুষেরা কেবল প্রারব্ধ কর্মসকলের ভোগই শরীরে করিয়া থাকেন। ঐ ফলভোগ অবশ্যম্ভাবী; এবং তাঁহারা বুঝিতে বা জানিতেও পারেন যে, তাঁহাদের প্রারব্ধ অনুসারে তাঁহাদের জীবনে কিরূপ ঘটনাবলী আসিয়া উপস্থিত হইবে। কাজেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ঐরূপে নিজ বিবাহ কোন্ পাত্রীর সহিত কোথায় হইবে, তাহা বলিয়া দেওয়াটা কিছু বিচিত্র নহে।

ঐ কথার উত্তরে আমরা বলি—অবশ্য শাস্ত্রজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা বাস্তবিকই নিতান্ত অনভিজ্ঞ। কিন্তু যতটুকু দেখিয়াছি, তাহাতে যথার্থ-জ্ঞানী পুরুষকে প্রারব্ধ কর্মসকলেরও ফল-ভোগ করিতে হয় না। কারণ সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিবে যে মন, সে মন যে তিনি চিরকালের নিমিত্ত ঈশ্বরে অর্পণ করিয়াছেন—তাহাতে আর সুখ-দুঃখাদির স্থান কোথা? তবে যদি বল—তাঁহার শরীরটায়

না—যথার্থ-জ্ঞানী পুরুষের প্রারব্ধ ভোগ করা-না-করা ইচ্ছাধীন

প্রারব্ধ ভোগ হয়, তাহাই বা কিরূপে হইবে? তিনি যদি ইচ্ছা করিয়া অল্পমাত্র আমিত্ব কোন বিশেষ কারণে—যথা, পরোপকারাদির নিমিত্ত—রাখিয়া দেন, তবেই তাঁহার আবার শরীরমনের উপলব্ধি হয় ও সঙ্গে সঙ্গে প্রারব্ধ কর্মের ভোগ হয়। অতএব যথার্থ জ্ঞানী পুরুষ ইচ্ছা হইলে প্রারব্ধ ভোগ বা ত্যাগ করিতে পারেন; তাঁহাদের ঐরূপ ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেইজন্যই তাঁহাদিগকে 'লোকজিৎ', 'মৃত্যুঞ্জয়', 'সর্বজ্ঞ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হয়।

ঠাকুরের তো কথাই নাই; কারণ, তাঁহার কথা—'যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ'

আর এক কথা—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের নিজের অনুভব যদি বিশ্বাস করিতে হয় তাহা হইলে তাঁহাকে আর জ্ঞানী পুরুষ বলা চলে না; ঐ শ্রেণীমধ্যেই তাঁহাকে আর স্থান দিতে পারা যায় না। কেননা, তাঁহাকে বার বার বলিতে শুনিয়াছি, "যে রাম, যে কৃষ্ণ, সে-ই ইদানীং রামকৃষ্ণ", অর্থাৎ যিনি পূর্বে রামরূপে এবং কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তিনিই বর্তমান যুগে শ্রীরামকৃষ্ণশরীরে বর্তমান থাকিয়া অপূর্ব লীলার বিস্তার করিতেছেন! কথাটি বিশ্বাস করিলে তাঁহাকে নিত্যশুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্তস্বভাব ঈশ্বরাবতার বলিয়াই স্বীকার করিতে হয়। আর ঐরূপ করিলে, তাঁহাকে প্রারব্ধাদি কোন কর্মেরই বশীভূত আর বলা চলে না। অতএব ঠাকুরের বিবাহ সম্বন্ধে অন্যপ্রকার মীমাংসাই আমরা যুক্তিযুক্ত মনে করি এবং তাহাই এখানে বলিব।

বিবাহের কথা আমাদের নিকট উত্থাপন করিয়া ঠাকুর অনেক

সময় রঙ্গরসও করিতেন। উহাও বড় মধুর। দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন মধ্যাহ্নে ভোজন করিতে বসিয়াছেন; নিকটে শ্রীযুত বলরাম বসু ও অন্যান্য কয়েকটি ভক্ত বসিয়া তাঁহার সহিত নানা কথা কহিতেছেন। সেদিন শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী কামারপুকুরে যাত্রা করিয়াছেন কয়েক মাসের জন্য, কারণ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালের বিবাহ।

বিবাহের কথা লইয়া ঠাকুরের রঙ্গরস

ঠাকুর—(বলরাম বাবুকে লক্ষ্য করিয়া) আচ্ছা, আবার বিয়ে কেন হলো বল দেখি? স্ত্রী আবার কিসের জন্য হলো? পরনের কাপড়ের ঠিক নেই—আবার স্ত্রী কেন?

বলরাম ঈষৎ হাসিয়া চুপ করিয়া আছেন।

ঠাকুর—ওঃ বুঝেছি; (থাল হইতে একটু ব্যঞ্জন তুলিয়া ও বলরামকে দেখাইয়া) এই—এর জন্যে হ'য়েছে। নইলে কে আর এমন ক'রে রেঁধে দিত বল? (বলরামবাবু প্রভৃতি ভক্তগণের হাস্য) হাঁ গো, কে আর এমন ক'রে খাওয়াটা দেখত। ওরা সব আজ চলে গেল—(ভক্তেরা কে চলিয়া গেল বুঝিতে না পারায়) রামলালের খুড়ী গো; রামলালের বিয়ে হবে—তাই সব কামারপুকুরে গেল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলুম, কিছুই মনে হ'লো না! সত্যি বলছি; যেন কে তো কে গেল! কিন্তু তারপর কে রেঁধে দেবে ব'লে ভাবনা হ'ল! কি জান?—সব রকম খাওয়া তো আর পেটে সয় না, আর সব সময় খাওয়ার হুঁশও থাকে না। ও (শ্রীশ্রীমা) বোঝে কি রকম খাওয়া সয়; এটা ওটা ক'রে দেয়; তাই মনে হলো—কে ক'রে দেবে!

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন বিবাহের কথা উত্থাপন করিয়া বলেন, "বিয়ে ক'রতে কেন হয় জানিস্? ব্রাহ্মণশরীরের দশ রকম সংস্কার আছে—বিবাহ তারই মধ্যে একটা। ঐ দশ রকম সংস্কার হ'লে তবে আচার্য হওয়া যায়।" আবার কখন কখন বলিতেন, "যে পরমহংস হয়, পূর্ণ জ্ঞানী হয়, সে হাড়ি-মেথরের অবস্থা থেকে রাজা, মহারাজা, সম্রাটের অবস্থা পর্যন্ত সব ভুগে দেখে এসেছে। নইলে ঠিক ঠিক বৈরাগ্য আসবে কেন? যেটা দেখে নি (ভোগ করে নি), মন সেইটে দেখতে চাইবে ও চঞ্চল হবে;—বুঝলে? ঘুঁটিটা সব ঘর ঘুরে তবে চিকে উঠে—খেলার সময় দেখনি? সেই রকম।"

দশপ্রকারের সংস্কার পূর্ণ করিবার জন্যই সাধারণ আচার্যদিগের বিবাহ করা। ঠাকুরের বিবাহও কি সেজন্য?—না

সাধারণ গুরুদিগের বিবাহ করিবার ঐরূপ কারণ ঠাকুর নির্দেশ করিলেও, ঠাকুরের নিজের বিবাহের বিশেষ কারণ যাহা আমরা বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাই এখন বলিব। বিবাহটা ভোগের জন্য নয়—একথা শাস্ত্র আমাদের প্রতি পদে শিক্ষা দিতেছেন। ঈশ্বরের সৃষ্টি-রক্ষারূপ নিয়ম-প্রতিপালন ও গুণবান্ পুত্র উৎপাদন করিয়া সমাজের কল্যাণসাধন করাই হিন্দুর বিবাহরূপ কর্মটার উদ্দেশ্য হওয়া উচিত—শাস্ত্র বার বার এই কথাই আমাদের বলিয়া দিতেছেন। তবে কি উহাতে তাঁহার নিজ স্বার্থ কিছুমাত্র থাকিবে না—শাস্ত্র এইরূপ অসম্ভব কথা বলেন? না, তাহা নহে। শাস্ত্রকার ঋষিগণ

ধর্মবিরুদ্ধ ভোগসহায়ে ত্যাগে পৌঁছাইবার জন্যই হিন্দুর বিবাহ

দুর্বল মানবচরিত্রের অন্তস্তল পর্যন্ত দেখিয়াই বুঝিয়াছিলেন যে, দুর্বল মানব স্বার্থ ভিন্ন এ জগতে আর কোন কথাই বুঝে না; লাভ-লোকসান না খতাইয়া অতি সামান্য কার্যেও অগ্রসর হয় না। শাস্ত্রকার ঐ কথা বুঝিয়াও যে পূর্বোক্ত আদেশ করিয়াছেন তাহার কারণ—তিনি এ কথাও বুঝিয়াছেন যে, ঐ স্বার্থটাকে যদি একটা মহান্ উদ্দেশ্যের সহিত সর্বদা জড়িত রাখিতে পারে তবেই মঙ্গল; নতুবা মানবকে পুনঃ পুনঃ জন্ম-মৃত্যুর বন্ধনে পড়িয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতে হইবে। নিজের নিত্য-মুক্ত আত্মস্বরূপ ভুলিয়াই মানব ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়া বাহ্যজগতের রূপ-রসাদি ভোগের নিমিত্ত ছুটিতেছে; আর, মনে করিতেছে—ঐ সকল বড়ই মধুর, বড়ই মনোরম! কিন্তু জগতের প্রত্যেক সুখটাই যে দুঃখের সঙ্গে চিরসংযুক্ত, সুখটা ভোগ করিতে গেলেই যে সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটাও লইতে হইবে—এ কথা কয়টা লোক ধরিতে বা বুঝিতে পারে? শ্রীযুত বিবেকানন্দ স্বামীজী বলিতেন, "দুঃখের মুকুট মাথায় প'রে সুখ এসে মানুষের কাছে দাঁড়ায়,"—মানুষ তখন সুখকে লইয়াই ব্যস্ত! তাহার মাথায় যে দুঃখের মুকুট, উহাকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করিলে পরিণামে যে দুঃখটাকেও লইতে হইবে—একথা তখন সে আর ভাবিবার অবসর পায় না! শাস্ত্র সেজন্য তাহাকে ঐ কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া বলেন, ওরে, 'সুখলাভটাই নিজের স্বার্থ—একথা মনে করিস্ কেন? সুখ বা দুঃখের একটা লইতে গেলে যে অপরটাকেও লইতে হইবে! স্বার্থটাকে একটু উচ্চ সুরে বাঁধিয়া ভাব না যে, সুখটাও আমার

বিচার-সংযুক্ত ভোগ করিতে করিতে কালে বোধ হয়—"দুঃখের মুকুট পরিয়া সুখ" আসে

শিক্ষক, দুঃখটাও আমার শিক্ষক; আর যাহাতে ঐ দুয়ের হস্ত হইতে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্রাণ পাওয়া যায়—তাহাই আমার স্বার্থ বা জীবনের উদ্দেশ্য।' অতএব বুঝা যাইতেছে—বিবাহিত জীবনে বিচারসংযুক্ত ভোগের দ্বারা এবং সুখ-দুঃখপূর্ণ নানা অবশ্যম্ভাবী অবস্থার অনুভবের দ্বারা ক্ষণভঙ্গুর সংসারের সকল আপাতসুখের উপর বিরক্ত হইয়া যাহাতে জীব ঈশ্বরের প্রতি অনুরাগে পূর্ণ হয় এবং তাঁহাকেই সারাৎসার জানিয়া তাঁহার দর্শনলাভের দিকে মহোৎসাহে অগ্রসর হয়, ইহা শিক্ষা দেওয়াই শাস্ত্রকারের উদ্দেশ্য। বিচার করিতে করিতে সংসারের কোনও বিষয়টা ভোগ করিতে যাইলেই যে মন ঐ বিষয় ত্যাগ করিবে একথা নিশ্চিত; এজন্যই ঠাকুর বলিতেন, "ওরে, সদসদ্‌বিচার চাই। সর্বদা বিচার ক'রে মনকে বলতে হয় যে, মন তুমি এই জিনিসটা ভোগ ক'রবে, এটা খাবে, ওটা পরবে ব'লে ব্যস্ত হচ্ছ—কিন্তু যে পঞ্চভূতে আলু পটল চাল ডাল ইত্যাদি তৈরী হয়েছে, সেই পঞ্চভূতেই আবার সন্দেশ রসগোল্লা ইত্যাদি তৈরী হয়েছে; যে পঞ্চভূতের হাড়-মাংস-রক্ত-মজ্জায় নারীর সুন্দর শরীর হয়েছে, তাহাতেই আবার তোমার, সকল মানুষের ও গরু ছাগল ভেড়া ইত্যাদি প্রাণীরও শরীর হয়েছে; তবে কেন ওগুলো পাবার জন্য এত হাঁই-ফাঁই কর? ওতে তো আর সচ্চিদানন্দলাভ হবে না! তাতেও যদি না মানে তো বিচার ক'রতে ক'রতে দু-একবার ভোগ ক'রে সেটাকে ত্যাগ ক'রতে হয়। যেমন ধর, রসগোল্লা খাবে ব'লে মন ভারি ধরেছে,

ভোগসুখ ত্যাগ করিতে মনকে কি ভাবে বুঝাইতে হয়, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের উপদেশ

কিছুতেই আর বাগ্ মানচে না—যত বিচার ক'রচ সব যেন ভেসে যাচ্চে; 'তখন কতকগুলো রসগোল্লা এনে এগাল ওগাল ক'রে চিবিয়ে খেতে খেতে মনকে বলবি—'মন, এরই নাম রসগোল্লা; এ-ও আলু-পটলের মত পঞ্চভূতের বিকারে তৈয়ারী হয়েছে; এ-ও খেলে শরীরে গিয়ে রক্ত-মাংস-মল-মূত্র হবে; যতক্ষণ গালে আছে ততক্ষণই এটা মিষ্টি—গলার নীচে নাব্‌লে আর ঐ আস্বাদের কথা মনে থাকবে না; আবার বেশী খাও তো অসুখ হবে; এর জন্য এত লালায়িত হও! ছিঃ ছিঃ!—এই খেলে, আর খেতে চেও না। (সন্ন্যাসী ভক্তদিগকে লক্ষ্য করিয়া) সামান্য সামান্য বিষয়গুলো এই রকম ক'রে বিচারবুদ্ধি নিয়ে ভোগ ক'রে ত্যাগ করা চলে, কিন্তু বড় বড় গুলোতে ও রকম করা চলে না; ভোগ ক'রতে গেলেই বন্ধনে পড়ে যেতে হয়। সে জন্য বড় বড় বাসনা-গুলোকে বিচার ক'রে, তাতে দোষ দেখে, মন থেকে তাড়াতে হয়।"

বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্য পালন করিবার প্রথার উচ্ছেদ হওয়াতেই হিন্দুর বর্তমান জাতীয় অবনতি

শাস্ত্র বিবাহের ঐরূপ উচ্চ উদ্দেশ্য উপদেশ করিলেও কয়টা লোকের মনে সে কথা আজকাল স্থান পায়? কয়জন বিবাহিত জীবনে যথাসাধ্য ব্রহ্মচর্য পালন করিয়া আপনা-দিগকে এবং জনসমাজকে ধন্য করিয়া থাকেন? কয়জন স্ত্রী স্বামীর পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাঁহাকে লোকহিতকর উচ্চব্রতে—ঈশ্বরলাভের কথা দূরে থাকুক—প্রেরণা দিয়া থাকেন? কয়জন পুরুষই বা 'ত্যাগই জীবনের উদ্দেশ্য' জানিয়া স্ত্রীকে তাহা শিক্ষা দিয়া থাকেন? হায় ভারত! পাশ্চাত্যের ভোগ সর্বস্ব জড়বাদ ধীরে ধীরে তোমার অস্থি-মজ্জায় প্রবিষ্ট হইয়া

তোমাকে কি মেরুদণ্ডহীন পশুবিশেষে পরিণত করিয়াছে তাহা একবার ভাবিয়া দেখ দেখি! সাধে কি আর শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁহার সন্ন্যাসি-ভক্তদিগকে বর্তমান বিবাহিত জীবনে দোষ দেখাইয়া বলিতেন, "ওরে, (ভোগটাকে সর্বস্বজ্ঞান বা জীবনের উদ্দেশ্য করাই যদি দোষ হয়, তবে বিবাহের সময়) একটা ফুল ফেলে সেটা ক'র্‌লেই কি শুদ্ধ হয়ে গেল—তার দোষ কেটে গেল ?" বাস্তবিক বিবাহিত জীবনে ইন্দ্রিয়পরতা আর কখনও ভারতে এত প্রবল হইয়াছিল কি না সন্দেহ। ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি ভিন্ন বিবাহের যে অপর একটা মহাপবিত্র, মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে—এ কথা আমরা আজকাল একপ্রকার ভুলিয়াই গিয়াছি, আর দিন দিন ঐ কারণে পশুরও অধম হইতে বসিয়াছি! নব্য ভারত-ভারতীর ঐ পশুত্ব ঘুচাইবার জন্যই লোকগুরু ঠাকুরের বিবাহ। তাঁহার জীবনের সকল কার্যের ন্যায় বিবাহরূপ কার্যটাও লোককল্যাণের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত।

ঠাকুর বলিতেন, "এখানকার যা কিছু করা সে তোদের জন্য। ওরে, আমি ষোল টাং ক'র্‌লে তবে যদি তোরা এক টাং করিস্। আর আমি যদি দাঁড়িয়ে মুতি তো তোরা শালারা পাক্ দিয়ে দিয়ে তাই কর্‌বি।" এই জন্যই ঠাকুরের বিবাহিত জীবনের কর্তব্য ঘাড়ে লইয়া মহোচ্চ আদর্শ সকলের চক্ষুর সম্মুখে অনুষ্ঠান করিয়া দেখান। ঠাকুর যদি স্বয়ং বিবাহ না করিতেন তাহা হইলে গৃহস্থ মানব বলিত, 'বিবাহ তো করেন নাই, তাই অত ব্রহ্মচর্যের কথা বলা চলিতেছে। স্ত্রীকে

নিজে অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়া ঐ আদর্শ পুনরায় প্রচলনের জন্যই ঠাকুরের বিবাহ

আপনার করিয়া এক সঙ্গে একত্র তো বাস কখন করেন নাই, তাই আমাদের উপর লম্বা লম্বা উপদেশ দেওয়া চলিতেছে।' সে জন্যই ঠাকুর শুধু যে বিবাহ করিয়াছিলেন মাত্র তাহা নহে, শ্রীশ্রীজগন্মাতার পূর্ণদর্শনলাভের পর যখন দিব্যোন্মাদাবস্থা তাঁহার সহজ হইয়া গেল, তখন পূর্ণযৌবনা বিবাহিতা স্ত্রীকে দক্ষিণেশ্বরে নিজ সমীপে আনাইয়া রাখিলেন, তাঁহাতে জগদম্বার আবির্ভাব সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ করিয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীষোড়শী মহাবিদ্যাজ্ঞানে পূজা ও আত্মনিবেদন করিলেন, আটমাস কাল নিরন্তর একত্র বাস ও তাঁহার সহিত এক শয্যায় শয়ন পর্যন্ত করিলেন এবং স্ত্রীর শিক্ষা এবং প্রাণের শান্তি ও আনন্দের জন্য অতঃপর কামারপুকুরে এবং কখন কখন শ্বশুরালয় জয়রামবাটীতেও স্বয়ং যাইয়া দুই-এক মাস কাল অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। দক্ষিণেশ্বরে যখন ঠাকুর স্ত্রীর সহিত এইরূপে একত্র বাস করেন, তখনকার কথা স্মরণ করিয়া শ্রীশ্রীমা এখনও স্ত্রী-ভক্তদিগকে বলিয়া থাকেন, "সে যে কি অপূর্ব দিব্যভাবে থাক্‌তেন, তাহা বলে বোঝাবার নয়! কখন ভাবের ঘোরে কত কি কথা, কখন হাসি, কখন কান্না, কখন একেবারে সমাধিতে স্থির হয়ে যাওয়া—এই রকম, সমস্ত রাত! সে কি এক আবির্ভাব আবেশ, দেখে ভয়ে আমার সর্বশরীর কাঁপ্‌ত, আর ভাব্‌তুম কখন্ রাত্‌টা পোহাবে। ভাবসমাধির কথা তখন তো কিছু বুঝি না; এক দিন তাঁর আর সমাধি ভাঙ্গে না দেখে ভয়ে কেঁদে কেটে হৃদয়কে ডেকে পাঠালুম। সে এসে কানে নাম শুনাতে শুনাতে তবে

স্ত্রীর সহিত ঠাকুরের শরীর-সম্বন্ধ-রহিত অদৃষ্টপূর্ব প্রেমসম্বন্ধ। শ্রীশ্রীমার ঐ বিষয়ক কথা

কতক্ষণ পরে তাঁর চৈতন্য হয়! তারপর ঐরূপে ভয়ে কষ্ট পাই দেখে তিনি নিজে শিখিয়ে দিলেন—এই রকম ভাব দেখ্‌লে এই নাম শুনাবে, এই রকম ভাব দেখ্‌লে এই বীজ শুনাবে। তখন আর তত ভয় হত না, ঐ সব শুনালেই তাঁর আবার হুঁশ হত। তারপর অনেকদিন এইরূপে গেলেও, কখন তাঁর কি ভাবসমাধি হবে ব'লে সারা রাত্তির জেগে থাকি ও ঘুমুতে পারি না—একথা একদিন জান্‌তে পেরে, নহবতে আলাদা শুতে বল্‌লেন!" পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমা বলেন, এইরূপে প্রদীপে শল্‌তেটি কি ভাবে রাখিতে হইবে, বাড়ির প্রত্যেকে কে কেমন লোক ও কাহার সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, অপরের বাড়ি যাইয়া কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে প্রভৃতি সংসারের সকল কথা হইতে ভজন, কীর্ত্তন, ধ্যান, সমাধি ও ব্রহ্মজ্ঞানের কথা পর্যন্ত সকল বিষয় ঠাকুর তাঁহাকে শিক্ষা দিয়াছেন।—হে গৃহী মানব, কয়জন তোমরা এই ভাবে নিজ নিজ স্ত্রীকে শিক্ষা দিয়া থাক? তুচ্ছ শরীরসম্বন্ধটা যদি আজ হইতে কোন কারণে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে কয় জন তোমরা স্ত্রীকে ঐরূপে মান্য, ভক্তি ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা আজীবন দিতে পার? সেই জন্যই বলি, এ অপূর্ব যুগাবতারের বিবাহ করিয়া, একদিনের জন্যও শরীর-সম্বন্ধ না পাতাইয়া, স্ত্রীর সহিত এই অদ্ভুত, অদৃষ্টপূর্ব প্রেমলীলার বিস্তার কেবল তোমারই জন্য। তুমিই শিখিতে পারিবে বলিয়া যে—ইন্দ্রিয়পরতা ভিন্ন বিবাহের অপর মহোচ্চ উদ্দেশ্য আছে এবং এই উচ্চ আদর্শে

গৃহী মানবের শিক্ষার জন্যই ঠাকুরের ঐরূপ প্রেমলীলাভিনয়

লক্ষ্য স্থির রাখিয়া যাহাতে তুমিও বিবাহিত জীবনে ব্রহ্মচর্যের যথাসাধ্য অনুষ্ঠান করিয়া স্ত্রী-পুরুষে ধন্য হইতে পার এবং মহা মেধাবী, মহা তেজস্বী গুণবান সন্তানের পিতা-মাতা হইয়া ভারতের বর্তমান হীনবীর্য, হতশ্রী, হৃতশক্তিক সমাজকে ধন্য করিতে পার, সেইজন্য। শ্রীরামচন্দ্র, শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু, শ্রীশঙ্কর, শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি রূপে পূর্ব পূর্ব যুগে যে লীলা লোকগুরুদিগের জগৎকে দেখাইবার প্রয়োজন হয় নাই, তাহাই এই যুগে তোমার প্রয়োজনের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণ-শরীরে প্রদর্শিত হইয়াছে। আজীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা ও সাধনাবলে উদ্বাহবন্ধনের অদৃষ্টপূর্ব পবিত্র 'ছাঁচ' জগতে এই প্রথম প্রস্তুত হইয়াছে। এখন, ঠাকুর যেমন বলিতেন—তোমরা নিজ নিজ জীবন সেই আদর্শ ছাঁচে ফেল, আর নূতনভাবে গঠিত করিয়া তোল।

ঠাকুরের আদর্শে বিবাহিত জীবন গঠন করিতে এবং অন্ততঃ আংশিক-ভাবেও ব্রহ্মচর্য পালন করিতে হইবে। নতুবা আমাদের কল্যাণ নাই

'কিন্তু'—গৃহমেধিমানব এখনও বলিতেছে—'কিন্তু—'! ওঃ, বুঝিয়াছি; এবং শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ আমাদের সাধন-ভজন সম্বন্ধে যেমন বলিতেন তাহাই তদুত্তরে বলিতেছি, "তোরা মনে করেছিস্ বুঝি প্রত্যেকে এক একটা রামকৃষ্ণ পরমহংস হবি? সে নয় মণ তেলও পুড়্‌বে না, রাধাও নাচ্‌বে না। রামকৃষ্ণ পরমহংস জগতে একটাই হয়—বনে একটা সিঙ্গিই (সিংহ) থাকে।" হে গৃহী-মানব, আমরাও তোমার 'কিন্তু'-র উত্তরে সেইরূপ বলিতেছি—ঠাকুরের ন্যায় স্ত্রীর সহিত বাস করিয়া একেবারে অখণ্ড ব্রহ্মচর্য রাখা তোমার যে সাধ্যাতীত তাহা

ঠাকুর বিলক্ষণ জানিতেন এবং জানিয়াও যে ঐরূপ করিয়া তোমায় দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল তুমি অন্ততঃ 'ঐক টাং' বা আংশিকভাবে উহার অনুষ্ঠান করিবে বলিয়া। কিন্তু, জানিও, ঐ উচ্চ আদর্শের অনুষ্ঠান করিয়া যদি তুমি স্ত্রীজাতিকে জগদম্বার সাক্ষাৎ প্রতিরূপ বলিয়া না দেখিতে এবং হৃদয়ের যথাসাধ্য নিঃস্বার্থ ভালবাসা না দিতে চেষ্টা কর, জগতের মাতৃস্থানীয়া স্ত্রীমূর্তিসকলকে তোমার ভোগমাত্রৈকসহায়া পরাধীনা দাসী বলিয়া ভাবিয়া চিরকাল পশুভাবেই দেখিতে থাক, তবে তোমার আর গতি নাই ; তোমার বিনাশ ধ্রুব এবং অতি নিকটে। শ্রীকৃষ্ণের কথা উপেক্ষা করিয়া যদুবংশের কি হইল, তাহা ভাবিও, ঈশার কথা উপেক্ষা করিয়া য়্যাহুদী জাতিটার কি দুর্দশা, তাহা স্মরণ রাখিও। যুগাবতারকে উপেক্ষা করা সর্বকালেই জাতিসকলের ধ্বংসের কারণ হইয়াছে।

বিবাহ করিয়া ঠাকুরের শরীর-সম্বন্ধ সম্পূর্ণ রহিত হইয়া থাকা সম্বন্ধে কয়েকটি আপত্তি ও তাহার খণ্ডন

আর একটি প্রশ্নের এখানে উত্তর দিয়াই আমরা উদ্বাহবন্ধনের ভিতর দিয়া ঠাকুরের গুরুভাবের অদৃষ্টপূর্ব বিকাশের কথা সাঙ্গ করিয়া ঐ বিষয়ের অপর কথাসকল বলিব। রূপ-রসাদি বিষয়ের দাস, বহির্মুখ মানবমনে এখনও নিশ্চিত উদয় হইতেছে যে, ঠাকুর যদি বিবাহই করিলেন, তবে একটিও অন্ততঃ সন্তানোৎপাদন করিয়া স্ত্রীর সহিত শরীরসম্বন্ধ ত্যাগ করিলে ভাল হইত। ঐরূপ করিলে বোধ হয় ভগবানের সৃষ্টিরক্ষা করাটা যে মানুষমাত্রেরই কর্তব্য, তাহা দেখান হইত এবং সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রমর্যাদাটাও রক্ষা পাইত।

কারণ, শাস্ত্র বলেন—বিবাহিত পত্নীতে অন্ততঃ একটি সন্তানও উৎপাদন করিতে। উহাতে পিতৃ-ঋণের হস্ত হইতে মানবের নিষ্কৃতি হয়। তদুত্তরে আমরা বলি—

প্রথমতঃ, আমরা যতটুকু দেখি, শুনি বা চিন্তা ও কল্পনা করি, সৃষ্টিটা বাস্তবিক কি ততটুকুই? সৃষ্টির নিয়মই বৈচিত্র্য থাকা। আজ এই মুহূর্ত হইতে যদি আমরা সকলে সকল বিষয়ে এক প্রকার চিন্তা ও কার্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকি, তাহা হইলে সৃষ্টিধ্বংস হইতে আর বড় বিলম্ব হইবে না। তারপর জিজ্ঞাসা করি—সৃষ্টিরক্ষার সকল নিয়মগুলিই কি তুমি জানিয়াছ এবং সৃষ্টিরক্ষা করিতে যাইয়াই কি তুমি আজ ব্রহ্মচর্যবিহীন? বুকে হাত দিয়া উত্তর প্রদান করিও; দেখিও, ঠাকুর যেমন বলিতেন— "ভাবের ঘরে চুরি না থাকে।" আচ্ছা, না হয় ধরিলাম সৃষ্টিরক্ষার ঐ নিয়মটি তুমি পালন করিতেছ। অপরকে ঐরূপ করিতে বলিবার তোমার কি অধিকার আছে? ব্রহ্মচর্য বা উচ্চাঙ্গের মানসিক শক্তিবিকাশের জন্য সাধারণ বিষয়ে শক্তিক্ষয় না করাটাও সৃষ্টি-মধ্যগত একটা নিয়ম। সকলেই যদি তোমার মত নিম্নাঙ্গের শক্তিবিকাশেই ব্যস্ত থাকিবে, তবে উচ্চাঙ্গের আধ্যাত্মিক শক্তিবিকাশ দেখাইবে কে? ঐরূপ শক্তির বিকাশ তাহা হইলে তো লোপ পাইবে?

দ্বিতীয়তঃ, শাস্ত্রের ভিতর হইতে মনের মত কথাগুলি বাছিয়া লওয়াই আমাদের স্বভাব। সন্তানোৎপাদনবিষয়ক কথাটিও ঐ ভাবেই বাছিয়া লওয়া হয়। কারণ, শাস্ত্র অধিকারিভেদে আবার বলেন, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ'—যখনি ভগবানে

অনুরাগ বাড়িয়া সংসারে বৈরাগ্যের উদয় হইবে, তখনি সংসার ত্যাগ করিবে। অতএব ঠাকুর যদি তোমার মতে চলিতেন, তাহা হইলে এ শাস্ত্রবচনের মর্যাদাটি রক্ষা করিত কে? পিতৃ-ঋণ-শোধ করা সম্বন্ধেও ঐ কথা। শাস্ত্র বলেন—যথার্থ সন্ন্যাসী তাঁহার ঊর্ধ্বতন সপ্তপুরুষ এবং অধস্তন সপ্তপুরুষকে নিজ পুণ্যবলে উদ্ধার করিয়া থাকেন। অতএব ঠাকুরের পিতৃ-ঋণ-শোধ হইল না ভাবিয়া আমাদের কাতর হইবার প্রয়োজন নাই!

অতএব বুঝা যাইতেছে, ঠাকুরের জীবনে উদ্বাহবন্ধন কেবল আমাদের শিক্ষার নিমিত্তই হইয়াছিল। বিবাহিত জীবনের কি উচ্চ, পবিত্র আদর্শ তিনি আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিৎ পরিচয় শ্রীশ্রীমার আজীবন ঠাকুরকে সাক্ষাৎ জগন্মাতাজ্ঞানে পূজা করার কথাতেই বুঝিতে পারা যায়। মানুষ অপর সকলের নিকট আপন দুর্বলতা আবরিত রাখিতে পারিলেও, স্ত্রীর নিকট কখনই উহা লুক্কায়িত রাখিতে পারে না—ইহাই সংসারের নিয়ম। ঠাকুর ঐ বিষয়ে কখন কখন আমাদের বলিতেন, "যত সব দেখিস্ হোম্‌রা-চোম্‌রা বাবু ভায়া—কেউ জজ, কেউ মেজেষ্টর, বাইরের যত বোল্ বোলাও—স্ত্রীর কাছে সব একেবারে কেঁচো, গোলাম! অন্দর থেকে কোন হুকুম এলে, অন্যায় হলেও সেটা রদ করবার কারো ক্ষমতা নেই!" অতএব কাহারও বিবাহিতা পত্নী যদি তাহার পবিত্র, উচ্চ জীবন দেখিয়া তাহাকে অকপটে হৃদয়ের ভক্তি দেয় এবং আজীবন

গুরুভাবের প্রেরণাতেই যে ঠাকুরের বিবাহ—তৎপরিচয়

ঠাকুরকে জগদম্বাজ্ঞানে আজীবন পূজা করাতেই বুঝা যায়

ঈশ্বরজ্ঞানে পূজা করে, তাহা হইলে নিশ্চয় বুঝা যায়, সে লোকটা বাহিরে যে আদর্শ দেখায় তাহাতে কিছুমাত্র ভেল নাই। ঠাকুরের সম্বন্ধে সেজন্য ঐ কথা যত নিশ্চয় করিয়া আমরা বলিতে পারি, এমন আর কাহারও সম্বন্ধে নহে। পরিণীতা পত্নীর সহিত ঠাকুরের অপূর্ব প্রেমলীলার অনেক কথা বলিবার থাকিলেও, ইহা তাহার স্থান নহে। সেজন্য এখানে ঐ বিষয়ের ভিতর দিয়া ঠাকুরের অদ্ভুত গুরুভাব-বিকাশের কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়াই আমরা ক্ষান্ত রহিলাম।

পঞ্চম অধ্যায়

যৌবনে গুরুভাব

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥—গীতা, ৭।২৫

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের বিশেষ বিকাশ আরম্ভ হয়—যেদিন হইতে তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় ব্রতী হইয়া তথায় অবস্থান করিতে থাকেন। ঠাকুরের তখন সাধনার কাল—ঈশ্বরপ্রেমে উন্মাদাবস্থা। কিন্তু হইলে কি হয়? যিনি গুরু, তিনি চিরকালই গুরু—যিনি নেতা, তিনি বাল্যকাল হইতেই নেতা। লোকে কমিটি করিয়া পরামর্শ আঁটিয়া যে তাঁহাকে গুরু বা নেতার আসন ছাড়িয়া দেয়, তাহা নহে। তিনি যেমন আসিয়া লোকসমাজে দণ্ডায়মান হন, অমনি মানবসাধারণের মন তাঁহার প্রতি ভক্তিপূর্ণ হয়। অমনি নতশিরে তাহারা তাঁহার নিকট শিক্ষাগ্রহণ ও তাঁহার আজ্ঞাপালন করিতে থাকে—ইহাই নিয়ম। স্বামী বিবেকানন্দ বলিতেন, মানুষ মানুষকে যে নেতা বা গুরু করিয়া তোলে, তাহা নহে, যাঁহারা গুরু বা নেতা হন, তাঁহারা ঐ অধিকার লইয়াই জন্মগ্রহণ করেন। 'A leader is always born and never created'—সেজন্য দেখা যায়,

গুরু ও নেতা হওয়া মানবের ইচ্ছাধীন নহে

অপর সাধারণে যে সকল কাজ করিলে সমাজ চটিয়া দণ্ডবিধান করে, লোকগুরুরা সেই সকল কাজ করিলেও অবনতশিরে তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া থাকে। গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐ সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

'স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে।'

—তিনি যাহা কিছু করেন, তাহাই সৎকার্যের প্রমাণ বা পরিমাপক হইয়া দাঁড়ায় এবং লোকে তদ্রূপ আচরণই তদবধি করিতে থাকে। বড়ই আশ্চর্যের কথা, কিন্তু বাস্তবিকই ঐরূপ চিরকাল হইয়া আসিয়াছে এবং পরেও হইতে থাকিবে। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 'আজ হইতে ইন্দ্রের পূজা বন্ধ হইয়া গোবর্ধনের পূজা হইতে থাকুক'—লোকে তাহাই করিতে লাগিল! বুদ্ধ বলিলেন, 'আজ হইতে পশুহিংসা বন্ধ হউক,' অমনি 'যজ্ঞে হনন করিবার জন্যই পশুগণের সৃষ্টি,' 'যজ্ঞার্থে পশবো সৃষ্টাঃ'রূপ নিয়মটি সমাজ পাল্টাইয়া বাঁধিল! যীশু মহাপবিত্র উপবাসের দিনে শিষ্যদিগকে ভোজন করিতে অনুমতি দিলেন—তাহাই নিয়ম হইয়া দাঁড়াইল! মহম্মদ বহু বিবাহ করিলেন, তবুও লোকে তাঁহাকে ধর্মবীর, ত্যাগী ও নেতা বলিয়া মান্য করিতে লাগিল! সামান্য বা মহৎ সকল বিষয়েই ঐরূপ—তাঁহারা যাহা বলেন ও করেন, তাহাই সদাচরণের আদর্শ।

কেন যে ঐরূপ হয় তাহাও ইতিপূর্বে আমরা বলিয়াছি—লোকগুরুদিগের ক্ষুদ্র স্বার্থপর 'আমি'টা চিরকালের মত একেবারে বিনষ্ট হইয়া তাহার স্থলে বিরাটভাবমুখী 'আমিত্ব'টার বিকাশ আসিয়া উপস্থিত হয়। সে 'আমি'টার দশের কল্যাণ খোঁজাই

স্বভাব। আর ফুল ফুটিলে ভ্রমর যেমন আপনিই জানিতে পারিয়া মধুলোভে তথায় আসিয়া উপস্থিত হয়, ফুলকে আর ভ্রমরের নিকট সাদর নিমন্ত্রণ পাঠাইতে হয় না, সেইরূপ যেমনি কাহারও ভিতর ঐ বিরাট 'আমি'টার বিকাশ হয়, অমনি সংসারে তাপিত লোকসকল আপনিই তাহা কেমন করিয়া জানিতে পারিয়া শান্তিলাভের নিমিত্ত ছুটিয়া আসে। সাধারণ মানবের ভিতর ঐ বিরাট 'আমি'টার একটু-আধটু ছিটে-ফোঁটার মত বিকাশ অনেক কষ্টে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু লোকগুরুদিগের জীবনে বাল্য হইতেই উহার কিছু না কিছু বিকাশ, যৌবনে অধিকতর প্রকাশ এবং পরিশেষে পূর্ণ প্রকাশে অদ্ভুত লীলাসকল দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া ঈশ্বরের সহিত তাঁহাদিগকে একেবারে পৃথক-ভাবে দেখিতে থাকি। কারণ তখন ঐ অমানুষ-ভাবপ্রকাশ তাঁহাদের এত সহজ হইয়া দাঁড়ায় যে, উহা খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, নিঃশ্বাস-ফেলার মত একটা সাধারণ নিত্যকর্মের মধ্যে হইয়া দাঁড়ায়। কাজেই সাধারণ মানুষ আর কি করিবে?—দেখে যে, তাহার ক্ষুদ্র স্বার্থের মাপকাঠি দ্বারা তাঁহাদের দেবচরিত্র মাপা চলে না এবং তজ্জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া তাঁহাদের দেবতাজ্ঞানে ভক্তি-বিশ্বাস ও শরণ গ্রহণ করে।

লোকগুরু-দিগের ভিতরে বিরাট ভাবমুখী আমিত্বের বিকাশ সহজেই আসিয়া উপস্থিত হয়, সাধারণের ঐরূপ হয় না

ঠাকুরের জীবনালোচনায়ও আমরা ঐরূপ দেখিতে পাই—যৌবনে সাধকাবস্থায় দিনের পর দিন ঐ ভাবের ক্রমে ক্রমে বিকাশ হইতে হইতে দ্বাদশ বৎসর কঠোর সাধনান্তে ঐ ভাবের

পূর্ণ প্রকাশ হইয়া উহা একেবারে সহজভাব হইয়া দাঁড়ায়। তখন কখন যে তিনি কোন্ 'আমি'-বুদ্ধিতে রহিয়াছেন বা কখন যে তাঁহাতে বিরাট 'আমি'টার সহায়ে গুরুভাবাবেশ হইল, তাহা অনেক সময়ে সাধারণ-মানবমন-বুদ্ধির গোচর হইত না। কিন্তু ওটা ঐ ভাবের পূর্ণ পরিণত অবস্থার কথা এবং যেখানকার কথা সেইখানেই উহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যাইবে এখন যৌবনে সাধকাবস্থায় ঐ ভাবে আত্মহারা হইয়া তিনি অনেক সময়ে যেরূপ আচরণ করিতেন, তাহারই কিছু পাঠককে অগ্রে বলা আবশ্যক।

ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের পূর্ণ-বিকাশ হইয়া উহা সহজভাব হইয়া দাঁড়ায় কখন

যৌবনে ঠাকুরের গুরুভাবের প্রথম বিকাশ দেখিতে পাই, দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর প্রতিষ্ঠাত্রী, রাণী রাসমণি ও তাঁহার জামাতা মথুরানাথ বা মথুরাবাবুকে লইয়া। অবশ্য ইঁহাদের দুইজনের কাহাকেও দেখা আমাদের কাহারও ভাগ্যে হয় নাই। তবে ঠাকুরের নিজ মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছি, তাহাতে বেশ বুঝা যায় যে, প্রথম দর্শনেই ইঁহাদের মনে ঠাকুরের প্রতি একটা ভালবাসার উদয় হইয়া ক্রমে ক্রমে উহা এতই গভীরভাব ধারণ করে যে, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। মানুষকে মানুষ যে এতটা ভক্তি-বিশ্বাস করিতে—এতটা ভালবাসিতে পারে, তাহা আমাদের অনেকের মনে বোধ হয় ধারণা না হইয়া একটা রূপকথার মত মনে হইবে! অথচ উপর উপর দেখিলে ঠাকুর তখন একজন সামান্য নগণ্য পূজক ব্রাহ্মণমাত্র এবং

সাধনকালে ঐ ভাব—রাণী রাসমণি ও তদীয় জামাতা মথুরের সহিত ব্যবহার

তাঁহারা সমাজে জাত্যংশে বড় না হইলেও, ধনে, মানে, বিস্থায় ও বুদ্ধিতে সমাজের অগ্রণী বলিলে চলে।

আবার এদিকে ঠাকুরের স্বভাবও বাল্যাবাধ আত াবাচত্র! ধন, মান, বিস্থা, বুদ্ধি, নামের শেষে বড় বড় উপাধি প্রভৃতি যে সকল লইয়া লোকে লোককে বড় বলিয়া গণ্য করে, তাঁহার গণনায়, তাঁহার চক্ষে ওগুলো চিরকালই ধর্তব্যের মধ্যে বড় একটা ছিল না।

ঠাকুরের অপূর্ব স্বভাব

ঠাকুর বলিতেন, "মনুমেণ্টে উঠে দেখলে তিনতলা চারতলা বাড়ী, উঁচু উঁচু গাছ ও জমির ঘাস, সব এক সমান হয়ে গেছে দেখায়" আমরাও—দেখি ঠাকুরের নিজের মন বাল্যাবধি, সত্যনিষ্ঠা ও ঈশ্বরানুরাগ-সহায়ে সর্বদা এত উচ্চে উঠিয়া থাকিত যে সেখান হইতে ধন-মান-বিস্থাদির একটু আধটু তারতম্য—যাহা লইয়া আমরা একেবারে ফুলিয়া ফাটিয়া যাইবার মত হই ও 'ধরাকে সরা জ্ঞান' করি—সব এক সমান দেখা যাইত! অথবা ঠাকুরের মন, চিরকাল প্রত্যেক কার্যটা কেন করিব ও প্রত্যেক ব্যক্তি ও পদার্থের সহিত সম্বন্ধের চরম পরিণতিতে কি কতদূর দাঁড়াইবে—তাহা ভাবিয়া অপরের ঐ ঐ বিষয়ে কিরূপ বা অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহা দেখিয়া একটা বদ্ধমূল ধারণায় পূর্ব হইতেই উপস্থিত হইত। কাজেই ঐ সকল বিষয় যে, উদ্দেশ্য ও চরমপরিণতি লুকাইয়া মধুর ছদ্মবেশে তাঁহাকে ভুলাইয়া অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও মিছামিছি ঘুরাইবে, তাহার কোনও পথই ছিল না। পাঠক বলিবে, 'কিন্তু ওরূপ বুদ্ধিতে সকল বিষয়ের দোষগুলিই তো আগে চক্ষে পড়িয়া মানুষকে জড়ভাবাপন্ন করিয়া তুলিবে,

জগতের কোন কার্য করিতেই আর অগ্রসর হইতে দিবে না।' বাস্তবিকই তাহা। মন যদি পূর্ব হইতে বাসনাশূন্য বা পবিত্র না হইয়া থাকে এবং ঈশ্বরলাভরূপ মহৎ উদ্দেশ্যে যদি উহার গোড়া বাঁধা না থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ বুদ্ধি বাস্তবিকই মানবকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় করিয়া উদ্যমরহিত এবং কখন কখন উচ্ছৃঙ্খল ও যথেচ্ছাচারী করিয়া তুলে। নতুবা পবিত্রতা ও উচ্চ লক্ষ্যে যদি মনের সুর চড়াইয়া বাঁধা থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ সকল বিষয়ের অন্তস্তলস্পর্শী দোষদর্শী বুদ্ধিই মানবকে ঈশ্বরদর্শনের পথে দ্রুতপদে অগ্রসর করাইয়া দেয়। গীতাতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ঐজন্য শ্রদ্ধাভক্তিসম্পন্ন মানবকেই সর্বদা সংসারে 'জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ-দোষানুদর্শন' করিয়া বৈরাগ্যবান হইতে বলিয়াছেন। ঠাকুরের চরিত্রে বাল্যাবধি ঐ দোষদৃষ্টি কতদূর পরিস্ফুট তা দেখ। লেখা-পড়া করিতে গিয়া কোথায় 'তর্কালঙ্কার', 'বিদ্যাবাগীশ' প্রভৃতি উপাধি ও নাম-যশের দিকে দৃষ্টি পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিতে পাইলেন, বড় বড় 'তর্কবাগীশ', 'ন্যায়চুঞ্চু' মহাশয়দের ন্যায়-বেদান্তের লম্বা লম্বা কথা আওড়াইয়া ধনীর দ্বারে খোশামুদি করিয়া 'চাল কলা বাঁধা বা জীবিকার সংস্থান করা! বিবাহ করিতে যাইয়া কোথায় সংসারের ভোগসুখ আমোদ-প্রমোদের দিকে নজর পড়িবে, তাহা না হইয়া দেখিলেন দুদিনের সুখের নিমিত্ত চিরকালের মত বন্ধন গলায় পরা, অভাব-বৃদ্ধি করিয়া টাকার চিন্তায় ছুটাছুটি করিয়া বেড়ান ও সেই দুই দিনের সুখেরও অনিশ্চয়তা! টাকাতে সংসারে সব করিতে ও সব হইতে পারা যায় দেখিয়া কোথায় কোমর বাঁধিয়া রোজগারে

লাগিয়া যাইবেন,—না, দেখিলেন, টাকাতে কেবল ভাত, ডাল, কাপড় ও ইট, মাটি, কাঠ লাভই হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরলাভ হয় না! সংসারে গরীব-দুঃখীর প্রতি দয়া করিয়া পরের দুঃখমোচন করিয়া 'দাতা' 'পরোপকারী' ইত্যাদি নাম কিনিবেন, না, দেখিলেন, আজীবন চেষ্টার ফলে বড় জোর দু'চারটে ফ্রী-স্কুল ও দু'চারটে দাতব্য ডাক্তারখানা, না হয় দু'চারটে অতিথিশালা স্থাপন করা যায়; তারপর মৃত্যু ও জগতের যেমন অভাব ছিল, তেমনিই থাকিল!—এইরূপ সকল বিষয়ে।

ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ঠাকুরকে কাজেই ঠিক ঠিক ধরা বা বুঝা সাধারণ মানবের বড়ই কঠিন, বিশেষতঃ আবার বিদ্যাভিমানী ও ধনীদের; কারণ, স্পষ্ট কথা সংসারে কাহারও নিকট শুনিতে না পাইয়া, লোকমান্য ও ধনমদে শুনিবার ক্ষমতাটি পর্যন্ত তাঁহারা অনেকস্থলে হারাইয়া বসেন। কাজেই তাঁহারা ঠাকুরকে অনেক সময় না বুঝিতে পারিয়া যে অসভ্য, পাগল বা অহঙ্কারী মনে করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে। সেজন্যই রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর ভক্তি-ভালবাসা দেখিয়া আরও অবাক হইতে হয়! মনে হয়, ঈশ্বরকৃপায় মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল বলিয়াই তাঁহারা ঠাকুরের উপর ভালবাসা শুধু যে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছিলেন তাহা নহে, উপরন্তু তাঁহার দিব্য গুরুভাবের পরিচয় দিন দিন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার শ্রীচরণে সর্বতোভাবে আত্মবিক্রয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন! নতুবা, যে ঠাকুর কালীবাটী-প্রতিষ্ঠার দিনে আপনার অগ্রজ পূজায় ব্রতী হইলে এবং শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রসাদ

ধনী ও পণ্ডিতদের ঠাকুরকে চিনিতে পারা কঠিন উহার কারণ

ভোজন করিলেও শূদ্রান্ন ভোজন করিতে হইবে বলিয়া তথায় উপবাস করিয়াছিলেন এবং পরেও কিছুকাল পর্যন্ত ঐ নিমিত্ত কালীবাটীর গঙ্গাতীরে স্বহস্তে পাক করিয়া খাইয়াছিলেন, যে ঠাকুর মথুরবাবু বার বার ডাকিলেও বিষয়ী লোক বলিয়া তাঁহার সহিত আলাপ করিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং পরে মা কালীর পূজায় ব্রতী হইবার জন্য তাঁহার সাদর অনুরোধ বার বার প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন, অভিমান এবং ধনমদ ত্যাগ করিয়া সেই ঠাকুরকে প্রথম হইতে ভালবাসা এবং বরাবর ঐ ভাব ঠিক রাখা রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর সহজ হইত না।

বিবাহের পর ঠাকুরের অবস্থা। মথুরের উহা লক্ষ্য করিয়া ক্রমশঃ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। অপর সাধারণের ঠাকুরের বিষয়ে মতামত

ঠাকুরের তখন বিবাহ হইয়া গিয়াছে—পূর্ণ যৌবন। বিবাহ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমন করিয়াছেন এবং মা-কালীর পূজায় ব্রতী হইয়াছেন ; এবং পূজায় ব্রতী হইয়াই আবার ঈশ্বরপ্রেমে পাগলের মত হইয়াছেন। ঈশ্বরলাভ হইল না বলিয়া কখন কখন ভূমিতে গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘসড়াইয়া 'মা' 'মা' বলিয়া এত ক্রন্দন করেন যে, লোক দাঁড়াইয়া যায়! লোকে ব্যথিত হইয়া বলাবলি করে, আহা, লোকটির কোন উৎকট রোগ হইয়াছে নিশ্চয় ; পেটের শূলব্যথায় মানুষকে অমনি অস্থির করে।' কখন বা পূজার সময় যত ফুল নিজের মাথায় চাপাইয়া নিস্পন্দ হইয়া যান। কখন বা সাধকদিগের পদাবলী উন্মত্তভাবে কতক্ষণ ধরিয়া গাহিতে থাকেন। নতুবা যখন কতকটাও সাধারণভাবে থাকেন তখন যাহার সহিত যেমন ব্যবহার করা উচিত, যাহাকে

যেমন মান দেওয়া রীতি, সে সমস্ত পূর্বের ন্যায়ই করেন। কিন্তু জগন্মাতার ধ্যানে যখন ঐরূপ ভাবাবেশ হয়—এবং সে ভাবাবেশ যে, দিনের ভিতর এক আধবার একটু-আধটু হইত, তাহা নহে—তখন ঠাকুরের আর কোন ঠিক-ঠিকানাই থাকে না, কাহারও কোন কথা শুনেন না—বা উত্তর দেন না। কিন্তু তখনও সে দেবচরিত্রে মাধুর্যের অনেক সময় লোকে পরিচয় পায়। তখনও যদি কেহ বলে, 'মা-র নাম দুটো শুনাও না'—অমনি ঠাকুর তাহার প্রীতির জন্য মধুর কণ্ঠে গান ধরেন এবং গাহিতে গাহিতে গানের ভাবে নিজে বিভোর হইয়া আত্মহারা হন।

ইতিপূর্বেই রাণী রাসমণি ও মথুরবাবুর কর্ণে হীনবুদ্ধি নিম্নপদস্থ কর্মচারিগণ এবং ঠাকুরবাড়ীর প্রধান কর্মচারী, খাজাঞ্চী মহাশয়ও পূজার সময় ঠাকুরের অনাচারের অনেক কথা তুলিয়া বলিয়াছেন, 'ছোট ভট্‌চাজ্‌[১] সব মাটি করলে; মা-র (কালীর) পূজা, ভোগ, রাগ কিছুই হইতেছে না; ওরূপ অনাচার করলে মা কি কখন পূজা ভোগ গ্রহণ করেন?'—ইত্যাদি। কিন্তু বলিয়াও কিছুমাত্র সফলমনোরথ হন নাই; কারণ, মথুরবাবু স্বয়ং মাঝে মাঝে কাহাকেও কোন সংবাদ না দিয়া হঠাৎ মন্দিরে আসিয়া অন্তরালে থাকিয়া ঠাকুরের পূজার সময় ভক্তিবিহ্বল, বালকের ন্যায় ব্যবহার ও শ্রীশ্রীজগদম্বার প্রতি আবদার অনুরোধাদি দেখিয়া চক্ষের জল ফেলিতে ফেলিতে তাঁহাদের আজ্ঞা করিয়াছেন—"ছোট ভট্টাচার্য মহাশয় যেভাবে যাহাই করুন

১ ঠাকুরের অগ্রজকে 'বড় ভট্টাচার্য' বলিয়া ডাকায় ঠাকুর তখন এই নামে নির্দিষ্ট হইতেন।

না কেন, তোমরা তাঁহাকে বাধা দিবে না বা কোন কথা বলিবে না। আগে আমাকে জানাইবে, পরে আমি যেমন বলি তেমনি করিবে।"

রাণী রাসমণিও মধ্যে মধ্যে আসিয়া মা-র শিঙ্গার (ফুলের সাজ) ইত্যাদি দেখিয়া এবং ঠাকুরের মধুর কণ্ঠে মা-র নাম শুনিয়া এতই মোহিত হইয়াছেন যে, যখনই কালীবাড়ীতে আসেন, তখনই ছোট ভট্টাচার্যকে নিকটে ডাকাইয়া মা-র নাম (গান) করিতে অনুরোধ করেন। ঠাকুরও গান করিতে করিতে কাহাকেও যে শুনাইতেছেন একথা একেবারে ভুলিয়া যাইয়া ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বাকেই যেন শুনাইতেছেন, এই ভাবে গান গাহিতে থাকেন। এইরূপে দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে, জগৎরূপ বৃহৎ সংসারের ন্যায় ঠাকুর-বাড়ীর ক্ষুদ্র সংসারেও যে যাহার কাজ লইয়াই ব্যস্ত এবং সাংসারিক কাজকর্ম ও স্বার্থচিন্তা বাদে যতটুকু সময় পায় তাহাতে পরনিন্দা পরচর্চাদি রুচিকর বিষয়সকলের আন্দোলন করিয়া নিজ নিজ মনের একদেশিতার অবসাদ দূর করিয়া থাকে। কাজেই ছোট ভট্টাচার্যের ভিতরে ঈশ্বরপ্রেমে যে কি পরিবর্তন হইতেছে, তাহার খবর রাখে কে? 'ও একটা উন্মাদ, বাবুদের কেমন একটা সুনজরে পড়িয়াছে, তাই এখনও চাকরিটি বজায় আছে; তাই বা কদিন? কোন্ দিন এই একটা কি কাণ্ড করিয়া বসিবে ও তাড়িত হইবে! বড়লোকের মেজাজ—কিছু কি ঠিক ঠিকানা আছে? খুশী হইতেও যতক্ষণ, আর গরম হইতেও ততক্ষণ'—ঠাকুরের সম্বন্ধে এইরূপ কথাবার্তাই

৺শ্রীশ্রীভবতারিণী মাতা

কর্মচারীদের ভিতর কখন কখন হইয়া থাকে, এই মাত্র। ঠাকুরের ভাগিনেয় ও সেবক হৃদয়ও তৎপূর্বেই ঠাকুরবাটীতে আসিয়া জুটিয়াছে।

আজ রাণী রাসমণি স্বয়ং ঠাকুরবাড়ীতে আসিয়াছেন। কর্মচারীরা সকলে শশব্যস্ত। যে ফাঁকিদার সে-ও আজ আপন কর্তব্য অতি যত্নের সহিত করিতেছে। গঙ্গায় স্নানান্তে রাণী কালীঘরে দর্শন করিতে যাইলেন। তখন ৺কালীর পূজা ও বেশ হইয়া গিয়াছে। জগন্মাতাকে প্রণাম করিয়া রাণী মন্দিরমধ্যে শ্রীমূর্তির নিকট আসনে আহ্নিক-পূজা করিতে বসিলেন এবং ছোট ভট্টাচার্য বা ঠাকুরকে নিকটে দেখিয়া মা-র নাম গান করিতে অনুরোধ করিলেন। ঠাকুরও রাণীর নিকটে বসিয়া ভাবে বিভোর হইয়া রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি সাধকদিগের পদাবলী গাহিতে লাগিলেন; রাণী পূজা-জপাদি করিতে করিতে ঐসকল শুনিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিলে ঠাকুর হঠাৎ গান থামাইয়া বিরক্ত হইয়া উগ্রভাবে রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন, "কেবল ঐ ভাবনা, এখানেও ঐ চিন্তা?"—বলিয়াই রাণীর কোমল অঙ্গে করতল দ্বারা আঘাত করিলেন! সন্তানের কোনরূপ অন্যায়াচরণ দেখিয়া পিতা যেরূপ কুপিত হইয়া কখন কখন দণ্ডবিধান করেন, ঠাকুরেরও এখন ঠিক সেই ভাব! কিন্তু কে-ই বা তাহা বুঝে!

গুরুভাবে ঠাকুরের রাণী রাসমণিকে দণ্ডবিধান

মন্দিরের কর্মচারী ও রাণীর পরিচারিকারা সকলে হইচই করিয়া উঠিল। দ্বারপাল শশব্যস্তে ঠাকুরকে ধরিতে ছুটিল। বাহিরের কর্মচারীরাও মন্দিরমধ্যে এত গোল কিসের ভাবিয়া

কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সেদিকে অগ্রসর হইল। কিন্তু ঐ গোলযোগের প্রধান কারণ যাঁহারা—ঠাকুর ও রাণী রাসমণি—তাঁহারা উভয়েই এখন স্থির, গম্ভীর! কর্মচারীদের বকাবকি ছুটাছুটির দিকে লক্ষ্য না করিয়া একেবারে উদাসীন থাকিয়া ঠাকুর আপনাতে আপনি স্থির ও তাঁহার মুখে মৃদু মৃদু হাসি; শ্রীশ্রীজগদম্বার ধ্যান না করিয়া আজ কেবলই একটি বিশেষ মকদ্দমার ফলাফলের বিষয় ধ্যান করিতেছিলেন, রাণী রাসমণি নিজের অন্তর পরীক্ষা দ্বারা ইহা দেখিতে পাইয়া ঈষৎ অপ্রতিভ ও অনুতাপে গম্ভীর! আবার ঠাকুর ঐ কথা কি করিয়া জানিতে পারিলেন ভাবিয়া রাণীর ঐ ভাবের সহিত কতক বিস্ময়ের ভাবও মনে বর্তমান! পরে কর্মচারীদের গোলযোগে রাণীর চমক ভাঙ্গিল ও বুঝিলেন—নিরপরাধ ঠাকুরের প্রতি, এই ঘটনায় হীনবুদ্ধি লোকদিগের বিশেষ অত্যাচার হইবার সম্ভাবনা বুঝিয়া সকলকে গম্ভীরভাবে আজ্ঞা করিলেন, "ভট্টাচার্য মহাশয়ের কোন দোষ নাই। তোমরা উঁহাকে কেহ কিছু বলিও না।" পরে মথুরবাবুও নিজ শ্বশ্রূঠাকুরানীর নিকট হইতে ঘটনাটির সকল কথা আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কর্মচারী-দিগের উপর পূর্বোক্ত হুকুমই বাহাল রাখিলেন। ইহাতে তাহাদের কেহ্ কেহ বিশেষ দুঃখিত হইল; কিন্তু কি করিবে, 'বড় লোকের বড় কথায় আমাদের কাজ কি' ভাবিয়া চুপ করিয়া রহিল।

উহার ফল

ঘটনাটি শুনিয়া পাঠক হয়তো ভাবিবে—এ আবার কোন্ দেশী গুরুভাব? লোকের অঙ্গে আঘাত করিয়া এ আবার কি প্রকার

গুরুভাবের প্রকাশ ? আমরা বলি—জগতের ধর্মেতিহাস পাঠ কর, দেখিবে লোকগুরু আচার্যদিগের জীবনে এরূপ ঘটনার কথা উল্লিখিত আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনে কাজিদলন, গুরুভাবে আত্মহারা হইয়া অদ্বৈত প্রভুকে প্রহার করিয়া ভক্তিদান প্রভৃতির কথা স্মরণ কর। ভাবিয়া দেখ, মহামহিম ঈশার জীবনেও ঐরূপ ঘটনার অভাব নাই।

শ্রীচৈতন্য ও ঈশার জীবনে ঐরূপ ঘটনা

শিষ্যপরিবৃত ঈশা জেরুজালেমের 'য়্যাভে' দেবতার মন্দিরে দর্শন-পূজাদি করিবার জন্য আসিয়া উপস্থিত। ৺বারাণসী শ্রীবৃন্দাবনাদি তীর্থে দেবস্থানসকল দর্শন করিতে যাইয়া হিন্দুর মনে যেরূপ অপূর্ব পবিত্র ভাবের উদয় হয়, য়্যাহুদি-মনে জেরুজালেমের মন্দির-দর্শনেও ঠিক তদ্রূপ হইবে—ইহাতে আর সন্দেহ কি ? তাহার উপর আবার ভাবমুখে অবস্থিত ঈশার মন ! দূর হইতে মন্দির-দর্শনেই ঈশা ভগবৎপ্রেমে বিভোর হইয়া দেবদর্শন করিতে ছুটিলেন। মন্দিরের বাহিরে, দ্বারে, প্রাঙ্গণমধ্যে কত লোক কত প্রকারে দু'পয়সা রোজগার প্রভৃতি দুনিয়াদারিতেই ব্যস্ত। পাণ্ডা পুরোহিতরা দেবদর্শন হউক আর নাই হউক যাত্রীদিগের নিকট হইতে দু'পয়সা ঠকাইয়া লইতেই নিযুক্ত। আর দোকানী পসারিরা পূজায় পশু-পুষ্পাদি দ্রব্যসম্ভার এবং অন্যান্য দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া কিসে দু'পয়সা অধিক লাভ করিবে, এই চিন্তাতেই ব্যাপৃত। ভগবানের মন্দির তাঁহার নিকটে রহিয়াছি—একথা ভাবিতে কাহার আর মাথাব্যথা পড়িয়াছে ? যাহা হউক, ভাববিভোর ঈশার চক্ষে মন্দিরপ্রবেশকালে এ সকল কিছুই পড়িল না। সরাসরি মন্দিরমধ্যে যাইয়া

দেবদর্শন করিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইলেন এবং প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মারূপে তিনি অন্তরে রহিয়াছেন দেখিতে পাইয়া আত্মহারা হইলেন। মন্দির ও তন্মধ্যগত সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে আপনার হইতেও আপনার বলিয়া বোধ করিতে লাগিলেন; কারণ এখানে আসিয়াই তো তিনি প্রাণারামের দর্শন পাইলেন! পরে মন যখন আবার নীচে নামিয়া ভিতরের ভাবপ্রকাশ বাহিরের ব্যক্তি ও বস্তুর ভিতর দেখিতে যাইল, তখন দেখেন সকলই বিপরীত। কেহই তাঁহার প্রাণারামের সেবায় নিযুক্ত নহে; সকলেই কাম-কাঞ্চনের সেবাতেই ব্যাপৃত! তখন নিরাশা ও দুঃখে তাঁহার হৃদয় পূর্ণ হইল। ভাবিলেন—একি? তোরা বাহিরে, সংসারের ভিতর যাহা করিস্ কর্ না, কিন্তু এখানে, যেখানে ঈশ্বরের বিশেষ প্রকাশ—এখানে আবার এ সকল দুনিয়াদারি কেন? কোথায় এখানে আসিয়া দু'দণ্ড তাঁহার চিন্তা করিয়া সংসারের জ্বালা দূর করিবি, তাহা না হইয়া এখানেও সংসার আনিয়া পুরিয়াছিস্!—ভাবিয়া তাঁহার হৃদয় ক্রোধে পূর্ণ হইল এবং বেত্রহস্তে উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া তিনি সকল দোকানী পসারীদের বলপূর্বক মন্দিরের বাহিরে তাড়াইয়া দিলেন। তাহারাও তখন তাঁহার কথায় ক্ষণিক চৈতন্য লাভ করিয়া যথার্থই দুষ্কর্ম করিতেছি ভাবিতে ভাবিতে সুড় সুড় করিয়া বাহিরে গমন করিল; অতি বদ্ধ জীব—যাহার কথায় চৈতন্য হইল না, সে তাঁহার কশাঘাতে ঐ জ্ঞানলাভ করিয়া বহির্গমন করিল। কিন্তু কেহই ক্রোধপূর্ণ হইয়া তাঁহার উপর অত্যাচার করিতে সাহসী হইল না।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জীবনেও এইরূপে আহত ব্যক্তির জ্ঞানলাভ হইয়া তাঁহাকে ভগবদ্বুদ্ধিতে স্তবস্তুতি করার কথা, অতি বদ্ধ জীবকুলের তাঁহার প্রতি অত্যাচার করিতে আসিয়া তাঁহার হাস্যে বা কথায় স্তম্ভিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাইবার কথা প্রভৃতি অনেক ঘটনা দেখিতে পাওয়া যায়। যাক এখন ঐ সকল পৌরাণিকী কথা।

গুরুভাবের প্রেরণায় আত্মহারা ঠাকুরের অদ্ভুত প্রকারের শিক্ষাপ্রদান ও রাণী রাসমণির সৌভাগ্য

গুরুভাবে সম্পূর্ণ আত্মহারা ঠাকুর যে কি ভাবে অপরের সহিত ব্যবহার ও শিক্ষাদি প্রদান করিতেন, এই ঘটনাটি উহার একটি জ্বলন্ত নিদর্শন। ঘটনাটি তলাইয়া দেখিলে বড় কম ব্যাপার বলিয়া বোধ হয় না। কোথায় একজন সামান্য বেতনমাত্রভোগী নগণ্য পূজারী ব্রাহ্মণ এবং কোথায় রাণী রাসমণি —যাঁহার ধন, মান, বুদ্ধি, ধৈর্য, সাহস ও প্রতাপে কলিকাতার তখনকার মহা মহা বুদ্ধিমানেরাও স্তম্ভিত! এরূপ দরিদ্র ব্রাহ্মণ যে তাঁহার নিকট অগ্রসর হইতেই পারিবে না, ইহাই স্থির সিদ্ধান্ত করিতে হয়। অথবা যদি কখন কোন কারণে তাঁহার সমীপস্থ হয় তো চাটুকারিতা প্রভৃতি উপায়ে তাঁহার তিলমাত্র সন্তোষ উৎপাদন করিতে পারিলে আপনাকে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে এবং তন্নিমিত্তই অবসর অনুসন্ধান করিতে থাকিবে। তাহা না হইয়া একেবারে তদ্বিপরীত! তাঁহার অন্যায় আচরণের খালি প্রতিবাদ নহে, শারীরিক দণ্ডবিধান! ঠাকুরের দিক হইতে দেখিলে ইহা যেমন অল্প বিস্ময়ের কথা মনে হয় না, রাণীর দিক হইতে দেখিলে ঐরূপ ব্যবহারে যে তাঁহার

মনে ক্রোধ-অভিমান-হিংসাদির উদয় হইল না, ইহাও একটি কম কথা বলিয়া মনে হয় না। তবে পূর্বেই যেমন আমরা বলিয়া আসিয়াছি—স্বার্থগন্ধহীন বিরাট 'আমি'টার সহায়ে যখন মহাপুরুষদিগের মনে এইরূপে গুরুভাব আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন ইচ্ছা না থাকিলেও সাধারণ মানবকে তাঁহার নিকট নতশির হইতে হইবেই হইবে, রাণীর ন্যায় ভক্তিমতী সাত্ত্বিকপ্রকৃতির তো কথাই নাই। কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বার্থনিবদ্ধদৃষ্টি মানব-মন তখন তাঁহাদের কৃপা ও শক্তিতে উন্নত হইয়া তাঁহারা যাহা করিতে বলিতেছেন তাহাতেই তাহার বাস্তবিক স্বার্থ—এ কথাটি আপনা-আপনি বুঝিতে পারে। কাজেই তখন তদ্রূপ করা ভিন্ন আর উপায়ান্তর থাকে না। আর এক কথা, ঠাকুর যেমন বলিতেন—"তাঁহার (ঈশ্বরের) বিশেষ অংশ ভিতরে না থাকিলে কেহ কখন কোন বিষয়ে বড় হইতে পারে না, বা মান, ক্ষমতা প্রভৃতি হজম[১] করিতে পারে না!" সাত্ত্বিক-প্রকৃতি-সম্পন্না রাণীর ভিতর ঐরূপ ঐশী শক্তি বিদ্যমান ছিল বলিয়াই তিনি ঐরূপ কঠোরভাবে প্রকাশিত হইলেও ঠাকুরের গুরুভাবে কৃপা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "রাণী রাসমণি শ্রীশ্রীজগদম্বার অষ্ট নায়িকার একজন! ধরাধামে তাঁহার পূজা-প্রচারের জন্য আসিয়াছিলেন। জমিদারীর দলিল-পত্রাদি অঙ্কিত করিবার তাঁহার যে শীলমোহর ছিল তাহাতেও লেখা ছিল—'কালীপদ-

১ মান প্রভৃতি হজম করা অর্থাৎ ঐ সকল লাভ করিয়াও মাথা ঠিক রাখা; অহঙ্কৃত হইয়া ঐ সকলের অপব্যবহার না করা।

অভিলাষী, শ্রীমতী রাসমণি দাসী।' রাণীর প্রতি কার্যেই ঐরূপে জগন্মাতার উপর অচলা ভক্তি প্রকাশ পাইত।"

ঈশ্বরে তন্ময় মনের লক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রমত

আর এক কথা—সর্বতোভাবে ঈশ্বরে তন্ময় মনের নানা ভাবে অবস্থানের কথা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে। আচার্য শ্রীমৎ শঙ্কর তৎকৃত 'বিবেকচূড়ামণি' নামক গ্রন্থে উহা সুন্দরভাবে বর্ণনা করিয়াছেন—

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥ ৩৪০

—ঈশ্বরলাভ বা জ্ঞানলাভে সিদ্ধকাম পুরুষদিগের কেহ বা জ্ঞানরূপ বস্ত্রমাত্র পরিধান করিয়া সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়া, আবার কেহ বা বল্কল বা সাধারণ লোকের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিয়া কেহ বা উন্মাদের ন্যায় আবার কেহ বা বহির্দৃষ্টে কামকাঞ্চনগন্ধহীন বালক, বা শৌচাচারবিবর্জিত পিশাচের ন্যায় পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকেন।

লোকগুরুদিগের এবং বিশেষতঃ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ব্যবহার বুঝা এত কঠিন কেন?

'বিরাট আমি'টার সহিত তন্ময়ভাবে অনেকক্ষণ অবস্থান করায় সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে ইহাদের ঐরূপ অবস্থা লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু ঈশ্বরের অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণসমর্থ গুরুভাব ইহাদের ভিতর দিয়াই বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি—ক্ষুদ্র স্বার্থময় 'আমি'টার লোপ বা বিনাশেই জগদ্ব্যাপী বিরাট আমিত্ব এবং তৎসহ লোককল্যাণসাধনকারী শ্রীগুরুভাবের প্রকাশ। ঐ সকল জ্ঞানী পুরুষদিগের ভিতর আবার যাঁহারা ঈশ্বরেচ্ছায় সর্বদা গুরু বা

ঋষি-পদবীতে অবস্থান করেন, তাঁহাদের আবার অপরের শিক্ষার নিমিত্ত সদ্বিষয়ে তীব্রানুরাগ, অসদ্বিষয়ে তীব্র বিরাগ বা ক্রোধ, আচার, নিষ্ঠা, নিয়ম, তর্ক, যুক্তি, শাস্ত্রজ্ঞান বা পাণ্ডিত্য ইত্যাদি সকল ভাবই অবস্থানুযায়ী সাধারণ পুরুষদিগের ন্যায় দেখাইতে হয়। 'দেখাইতে হয়' বলিতেছি এজন্য যে, ভিতরে 'একমেবাদ্বিতীয়ং' ব্রহ্মভাবে ভালমন্দ ধর্মাধর্ম, পাপ-পুণ্যাদি মায়ারাজ্যের অন্তর্গত সকল পদার্থে ও ভাবে একাকার জ্ঞান বা দৃষ্টি পূর্ণভাবে বিদ্যমান থাকিলেও, অপরকে মায়ারাজ্যের পারে যাইবার পথ দেখাইবার জন্য ঐ সকল ভাব লইয়া তাঁহারা কালযাপন করিয়া থাকেন। সাধারণ গুরু বা ঋষিদিগেরই যখন ঐরূপে লোককল্যাণের নিমিত্ত অনেক সময় কালযাপন করিতে হয়, তখন ঈশ্বরাবতার বা জগদ্‌গুরুপদবীস্থ আচার্যকুলের তো কথাই নাই। এজন্য তাঁহাদের বুঝা, ধরা সাধারণ মানবের এত কঠিন হইয়া উঠে; বিশেষতঃ আবার বর্তমান যুগাবতার ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের চেষ্টা ও ব্যবহারাদি ধরা ও বুঝা। কারণ অবতারকুলে যে সকল বাহিক ঐশ্বর্য, শক্তি বা বিভূতির প্রকাশ শাস্ত্রে এ পর্যন্ত লিপিবদ্ধ আছে, সে সকল ইঁহাতে এত গুপ্তভাবে প্রকাশিত ছিল যে, যথার্থ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইয়া ইঁহার কৃপালাভ করিয়া ইঁহার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে নিবদ্ধ না হইলে, ইঁহাকে দুই-চারি বার ভাসা ভাসা, উপর উপর মাত্র দেখিয়া কাহারও ঐ সকলের পরিচয় পাইবার উপায় ছিল না। দেখ না, বাহ্যিক কোন্ গুণ দেখিয়া তুমি তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? বিদ্যায়— একেবারে নিরক্ষর বলিলেই চলে! শ্রুতিধরত্বগুণে বেদ বেদান্তাদি

সকল শাস্ত্র শুনিয়া যে তিনি সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া রাখিয়াছেন, একথা তুমি কেমন করিয়া বুঝিবে? বুদ্ধিতে তাঁহাকে ধরিবে? "আমি কিছু নহি, কিছু জানি না—সব আমার মা জানেন"—সর্বদা এইরূপ বুদ্ধির যাঁহাতে প্রকাশ, তাঁহার নিকট তুমি কোন্ বিষয়ে কি বুদ্ধি লইতে যাইবে? আর লইতে যাইলেও তিনি যখন বলিবেন, "মাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনি বলিবেন", তখন কি তুমি তাঁহার কথায় বিশ্বাস স্থির রাখিয়া ঐরূপ করিতে পারিবে? তুমি ভাবিবে—"কি পরামর্শই দিলেন! ও কথা তো আমরা সকলে 'কথামালা' 'বোধোদয়' পড়িবার সময় হইতেই শুনিয়া আসিতেছি—ঈশ্বর সর্বজ্ঞ সর্বশক্তিমান্ নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ, ইচ্ছা করিলে সকল বিষয় জানাইয়া ও বুঝাইয়া দিতে পারেন; কিন্তু ঐ কথা লইয়া কাজ করিতে যাইলে কি চলে?" ধনে, নাম-যশে তাঁহাকে ধরিবে? ঠাকুরের নিজের তো ও সকল খুবই ছিল! আবার ও সকল তো ত্যাগ করিতেই প্রথম হইতেই উপদেশ! এইরূপ সকল বিষয়ে। কেবল আকৃষ্ট হইয়া ধরিবার একমাত্র উপায় ছিল—তাঁহার পবিত্রতা, ঈশ্বরানুরাগ ও প্রেম দেখিয়া। ইহাতে তুমি যদি আকৃষ্ট হইলে তো হইলে, নতুবা তাঁহাকে ধরা ও বুঝা তোমার পক্ষে বহু দূরে! তাই বলি, রানী রাসমণি যে ঐরূপ কঠোরভাবে প্রকাশিত ঠাকুরের গুরুভাব ধরিতে পারিলেন এবং তিনি ঐরূপে যে শিক্ষা দান করিলেন, তাহা অভিমান-অহঙ্কারে ভাসাইয়া না দিয়া হৃদয়ে ধারণ করিয়া ধন্য হইলেন—ইহা তাঁহার কম ভাগ্যোদয়ের কথা নহে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

গুরুভাব ও মথুরানাথ

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥—গীতা, ১০।১৯

পূর্বেই বলিয়াছি, ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবের ধীর বিকাশ রানী রাসমণি ও মথুর বাবুর চক্ষের সম্মুখেই অনেকটা হইতে থাকে। উচ্চাঙ্গের ভাববিকাশ সম্বন্ধে ঠাকুর বলিতেন, "বড় ফুল ফুটতে দেরী লাগে, সারবান্ গাছ অনেক দেরীতে বাড়ে।" ঠাকুরের জীবনেও অদৃষ্টপূর্ব গুরুভাবের বিকাশ হইতে বড় কম সময় ও সাধনা লাগে নাই; দ্বাদশবর্ষব্যাপী নিরন্তর কঠোর সাধনার আবশ্যক হইয়াছিল। সে সাধনার যথাসাধ্য পরিচয় দিবার ইহা স্থান নহে। এখানে চিৎসূর্যের কিরণমালায় সম্যক্ সমুদ্ভাসিত গুরুভাবরূপ কুসুমটির সহিতই আমাদের বিশেষ সম্বন্ধ; তাহার কথাই বিশেষ করিয়া বলিয়া যাইব। তবে ঐ ভাববিকাশের কথা পূর্বাবধি শেষ পর্যন্ত বলিতে যাইয়া প্রসঙ্গক্রমে কোনও কোন কথা আসিয়া পড়িবে। যে সকল ভক্তের সহিত ঠাকুরের ঐ ভাবের পূর্ব-পূর্বাবস্থার সময় সম্বন্ধ, তাহাদের কথাও কিছু না কিছু আসিয়া পড়িবে নিশ্চয়।

'বড় ফুল ফুটতে দেরী লাগে।'

মথুর বাবুর সহিত ঠাকুরের সম্বন্ধ এক অদ্ভুত ব্যাপার! মথুর ধনী অথচ উচ্চপ্রকৃতিসম্পন্ন, বিষয়ী হইলেও ভক্ত, হটকারী হইয়াও বুদ্ধিমান, ক্রোধপরায়ণ হইলেও ধৈর্যশীল এবং ধীরপ্রতিজ্ঞ ছিলেন। মথুর ইংরাজী-বিদ্যাভিজ্ঞ ও তার্কিক, কিন্তু কেহ কোন কথা বুঝাইয়া দিতে পারিলে উহা বুঝিয়াও বুঝিব না—এরূপ স্বভাবসম্পন্ন ছিলেন না; ঈশ্বরবিশ্বাসী ও ভক্ত, কিন্তু তাই বলিয়া ধর্মসম্বন্ধে যে যাহা বলিবে তাহাই যে চোখ-কান বুঁজিয়া অবিচারে গ্রহণ করিবেন, তাহা ছিল না, তা তিনি ঠাকুরই হউন বা গুরুই হউন বা অন্য যে কেহই হউন; উদার-প্রকৃতি ও সরল, কিন্তু তাই বলিয়া বিষয়-কর্মে বা অন্য কোন বিষয়ে যে বোকার মত ঠকিয়া আসিবেন, তাহা ছিলেন না, বরং বিষয়ী জমিদারগণ যে কূটবুদ্ধি এবং সময়ে সময়ে অসদুপায়-সহায়ে প্রতিনিয়ত বিষয়বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, সে সকলেরও তাঁহাতে কখন কখন প্রকাশ দেখা গিয়াছে। বাস্তবিকই পুত্রহীনা রানী রাসমণির অন্যান্য জামাতা বর্তমান থাকিলেও, বিষয়কর্মের তত্ত্বাবধান ও সুবন্দোবস্তে কনিষ্ঠ মথুরবাবুই তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন; এবং শাশুড়ী ও জামাই উভয়ের বুদ্ধি একত্রিত হওয়াতেই রানী রাসমণির নামের তখন এতটা দপ্‌দপা হইয়া উঠিয়াছিল।

মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্ভুত সম্বন্ধ। মথুর কিরূপ প্রকৃতির লোক ছিল

পাঠক হয়ত বলিবে—'এ ধান ভান্‌তে শিবের গীত' কেন? ঠাকুরের কথা বলিতে বলিতে আবার মথুরবাবু কেন? কারণ, গুটী কাটিয়া ভাবরূপী প্রজাপতিটি যখন বাহির হইতেছিল,

তখন মথুরই তাহার ভাবী সৌন্দর্যের আভাস কিঞ্চিৎ প্রাপ্ত হইয়া তাহাঁর প্রধান রক্ষক ও সহায়স্বরূপ হইয়াছিলেন! রানী রাসমণি একটা মহা শুদ্ধ পবিত্র প্রেরণায় এ অদ্ভুত চরিত্রের বিকাশ ও প্রসারোপযোগী স্থান নির্মাণ করিলেন, আর তাঁহার জামাতা মথুর ঐরূপ উচ্চ প্রেরণায় সেই দেবচরিত্র-বিকাশের সময় অন্য যাহা কিছু প্রয়োজন হইল, তৎসমস্ত যোগাইলেন। অবশ্য এ কথা আমরা এখন এতদিন পরে ধরিতে পারিতেছি; তাঁহারা উভয়ে কিন্তু এই বিষয়ের আভাস কখন কখন কিছু কিছু পাইলেও ঐ সকল কার্য যে কেন করিতেছেন, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পরেও যে সম্পূর্ণ সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না।

ঠাকুরের গুরু-ভাব-বিকাশে রানী রাসমণি ও মথুরের অজ্ঞাতভাবে সহায়তা। বন্ধু বা শত্রুভাবে সম্বন্ধ যাবতীয় লোক অবতার-পুরুষের শক্তি-বিকাশের সহায়তা করে

যুগে যুগে সকল মহাপুরুষদিগের জীবনালোচনা করিতে যাইলেই ঐরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। দেখা যায়, কি একটা অজ্ঞাত শক্তি অলক্ষ্যে থাকিয়া কোথা হইতে তাঁহাদের সকল বিষয়ের পথ পরিষ্কার করিয়া দেন, সকল সময়ে সর্বাবস্থায় তাঁহাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করেন, অপর সকল ব্যক্তির শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া তাঁহাদের অধীনে আনিয়া দেন; অথচ ঐ সকল ব্যক্তি জানিতেও পারে না যে, তাহারা নিজে স্বাধীন-ভাবে, প্রেমে বা ঐ সকল দেবচরিত্রের উপর বিদ্বেষে যাহা করিয়া যাইতেছে, তাহা তাঁহাদেরই জন্য—তাঁহাদেরই কার্যের সহায়ক হইবে বলিয়া—তাঁহাদেরই গন্তব্য পথের বাধা-বিঘ্নগুলি সরাইয়া

তাঁহাদের ভিতরের শক্তি উদ্দীপিত করিবে বলিয়া!—আর মানুষ বহুকাল পরে উহা বুঝিতে পারিয়া অবাক হইয়া থাকে! কৈকেয়ীর শ্রীরামচন্দ্রকে বনে পাঠাইবার ফল দেখ; বসুদেব দেবকীকে কারাগারে রাখিয়া কংসের আজীবন চেষ্টার শেষ দেখ; সিদ্ধার্থের পাছে বৈরাগ্যোদয় হয় বলিয়া রাজা শুদ্ধোদনের প্রমোদকানন-নির্মাণ দেখ; ক্রূর কাপালিক বৌদ্ধদিগের আচার্য শঙ্করকে অভিচারাদি সহায়ে বিনষ্ট করিবার চেষ্টা দেখ; রাজপুরুষাদির সহায়ে শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মপ্রচারের বিদ্বেষ ও বিপক্ষতাচরণের ফল দেখ; আর দেখ মহামহিম ঈশাকে মিথ্যাপরাধে নিহত করিবার ফল!—সর্বত্রই 'উল্টা বুঝিলু রাম'[১] হইয়া গেল! অথচ মহাপরাক্রান্ত বুদ্ধিমান্ বিপক্ষ ও স্নেহপরবশ

১ নিম্নলিখিত গল্পটি হইতে প্রচলিত উক্তিটির উৎপত্তি হইয়াছে। যথা—এক বৈরাগী সাধু বহুকাল পর্যন্ত তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। সঙ্গের সাথী—ভসলা, লোটা প্রভৃতি আবশ্যকীয় দ্রব্যগুলির মোটটি নিজেই বহন করিতেন। একদিন সাধুর মনে হইল, একটি ঘোড়া পাই তো মোটটি আর নিজে বহিয়া কষ্ট পাই না। ভাবিয়াই 'এক ঘোড়া, দেলায় দে রাম' বলিয়া চীৎকার করিয়া ঘোড়া-ভিক্ষার চেষ্টায় ফিরিতে লাগিলেন। তখন সেই স্থান দিয়া রাজার পল্টন যাইতেছিল। পথিমধ্যে একটি ঘোটকীর শাবক হওয়ায় উহার আরোহী ভাবিতে লাগিল, "তাইতো, পল্টন এখনি এ স্থান হইতে অন্যত্র কুচ করিবে, ঘোটকী হাটিয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু সদ্যোজাত শাবকটিকে কেমন করিয়া লইয়া যাই?" ভাবিয়া চিন্তিয়া শাবকটিকে বহন করিবার জন্য একটি লোকের অন্বেষণে বাহির হইয়াই 'ঘোড়া দেলায় দে রাম'-সাধুর সহিত দেখা হইল এবং সাধুকে বলিষ্ঠ দেখিয়া কোন বিচার না করিয়া একেবারে বলপূর্বক তাঁহাকে দিয়া শাবকটি বহন করাইয়া লইয়া চলিল। সাধু তখন ফাঁপরে পড়িয়া বলিতে লাগিলেন—'উল্টা বুঝিলু রাম!' কোথায় ঘোড়া তাঁহার মোটটি ও তাঁহাকে বহন করিবে, না, তাঁহাকে ঘোটকী-শাবক বহন করিতে হইল।

স্বপক্ষকূল কূটনীতি বা বিষয়বুদ্ধি-সহায়ে চিরকালই অন্যরূপ ভাবিয়া অন্য উদ্দেশ্যে কার্য করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও ভাবিতে ও করিতে থাকিবে! তবে শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থসকলে যেরূপ লিপিবদ্ধ আছে—শত্রুভাবে, ঐ ঐশী শক্তির উদ্দেশ্য ও গতিবিধির বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিয়া যাইতে হয়, আর ভক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত ঐ ঐশী শক্তির অনুগামী হইয়া কখনও কখনও উহার কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে, এই মাত্র; এবং ঐ জ্ঞানের সহায়ে ক্রমে ক্রমে বাসনাবর্জিত হইয়া মুক্তি ও চিরশান্তির অধিকারী হইয়া থাকে। মথুরবাবুর ক্রিয়াকলাপও শেষ ভাবের হইয়াছিল।

অবতার-মহাপুরুষদিগের জীবনেই যে কেবল এই দৈবী শক্তির খেলা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা নহে। তবে তাঁহাদের জীবনে উহার উজ্জ্বল খেলা সহজে ধরিতে পারিয়া আমরা অবাক্ হই—এই পর্যন্ত। নতুবা আপন আপন দৈনন্দিন জীবন এবং জগতের ব্যবহারিক জীবনের ইতিহাসের আলোচনা করিলেও আমরা ঐ বিষয়ের যৎসামান্য প্রকাশ দেখিতে পাই। বহুদর্শিতা বা মানবজীবনের বহু ঘটনার তুলনায়, আলোচনায় ইহা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, মানব ঐ দৈবী শক্তির হস্তে সর্বক্ষণই ক্রীড়াপুত্তলীস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। অবতার-মহাপুরুষ-দিগের জীবনের সহিত সাধারণ মানবজীবনের এরূপ সৌসাদৃশ্য থাকাটাও কিছু বিচিত্র ব্যাপার নহে। কারণ তাঁহাদের অলৌকিক জীবনাবলীই তো ইতরসাধারণের জীবন-গঠনের ছাঁচ (type or model)-স্বরূপ। তাঁহাদের জীবনাদর্শেই তো সাধারণ মানব

সাধারণ মানব-জীবনেও ঐরূপ। কারণ উহার সহিত অবতারপুরুষের জীবনের বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে

আপন জীবনগঠনের প্রয়াস পাইতেছে ও চিরকালই পাইবে। দেখ না, নানা জাতির নানা ভাবের সম্মিলনভূমি বিশাল ভারত-জীবন, রাম, কৃষ্ণ, চৈতন্য প্রভৃতি কয়েকটি মহাপুরুষ কেমন অধিকার করিয়া বসিয়াছেন! আবার ঐ সকল পূর্ব পূর্ব মহা-পুরুষদিগের জীবনাদর্শসকলের একত্র সম্মিলনে অদৃষ্টপূর্ব নূতন ভাবে গঠিত বর্তমান যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনাদর্শ কেমন দ্রুতপদে আপন প্রবাহ বিস্তার করিয়া এই স্বল্পকাল মধ্যেই বর্তমান ভারত-ভারতীর জীবন অধিকার করিয়া বসিতেছে! কালে ইহা কি ভাবে কতদূর যাইয়া দাঁড়াইবে, তাহা তোমার সাধ্য হয়, বল; আমরা কিন্তু, হে পাঠক, উহা বুঝিতে ও বলিতে সম্পূর্ণ অপারক।

মথুর ভক্ত ছিল বলিয়া নির্বোধ ছিল না

আর এক কথা—মথুরবাবু ঠাকুরকে যেরূপ অকপটে 'পাঁচসিকে পাঁচ আনা' ভক্তি-বিশ্বাস করিতেন, তাহা শুনিয়া আমাদের ন্যায় সন্দেহদুষ্ট মন প্রথমেই ভাবিয়া ফেলে—'লোকটা বোকা বাঁদর গোছ একটা ছিল আর কি, নতুবা মানুষকে মানুষ এতটা বিশ্বাস-ভক্তি করিতে পারে কখন? আমরা যদি হইতাম তো একবার দেখিয়া লইতাম—শ্রীরামকৃষ্ণদেব কেমন করিয়া নিজ চরিত্রবলে অতটা ভক্তি-বিশ্বাসের উদয় আমাদের প্রাণে করিতে পারিতেন!'—যেন প্রাণের ভিতর ভক্তি-বিশ্বাসের উদয় হওয়াটা একটা বিশেষ নিন্দার ব্যাপার! সেজন্য ঠাকুরের নিকট হইতে মথুরবাবুর বিষয় আমরা যতটুকু যেরূপ শুনিয়াছি ও বুঝিয়াছি, তাহাই এখানে পাঠককে বলিয়া বুঝাইবার প্রয়াস পাইতেছি যে, মথুরবাবু ঐরূপ স্বভাবাপন্ন ছিলেন না। তিনি আমাদের অপেক্ষা

বড় কম বুদ্ধিমান বা সন্দিগ্ধমনা ছিলেন না। তিনিও ঠাকুরের অলৌকিক চরিত্র ও কার্যকলাপে সন্দেহবান হইয়া তাঁহাকে প্রথম প্রথম প্রতিপদে বড় কম যাচাইয়া লন নাই। কিন্তু করিলে কি হইবে? কখনও, কোন যুগে মানব যেরূপ নয়নগোচর করে নাই, বিজ্ঞাননাদিনী প্রেমাবর্তশালিনী মহা ওজস্বিনী ঠাকুরের ভাব-মন্দাকিনীর গুরুগম্ভীর বেগ মথুরের সন্দেহ-ঐরাবত আর কতক্ষণ সহ্য করিতে পারে? অল্পকালেই স্খলিত, মথিত, ধ্বস্ত ও বিপর্যস্ত হইয়া চিরকালের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছিল! কাজেই সর্বতোভাবে পরাজিত মথুর তখন আর কি করিতে পারে? অনন্যমনে ঠাকুরের শ্রীপদে শরণ লইয়াছিল। অতএব মথুরের কথা বলিলেও আমরা ঠাকুরের গুরুভাবেরই কীর্তন করিতেছি, ইহা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

ঠাকুরের প্রতি মথুরের প্রথমাকর্ষণ কি দেখিয়া—এবং উহার ক্রমপরিণতি

ঠাকুরের সরল বালকভাব, মধুর প্রকৃতি এবং সুন্দর রূপে মথুর প্রথম দর্শনেই তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে সাধনার প্রথমাবস্থায় ঠাকুরের যখন কখন কখন দিব্যোন্মাদাবস্থা আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল, যখন শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজা করিতে করিতে আত্মহারা হইয়া এবং আপনার ভিতর তাঁহার দর্শনলাভ করিয়া তিনি কখন কখন আপনাকেই পূজা করিয়া ফেলিতে লাগিলেন, যখন অনুরাগের প্রবল বেগে তিনি বৈধী ভক্তির সীমা উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রেমপূর্ণ নানারূপ অবৈধ, সাধারণ নয়নে অহেতুক আচরণ দৈনন্দিন জীবনে করিয়া ফেলিয়া ইতর-সাধারণের নিন্দা ও সন্দেহ-ভাজন হইতে লাগিলেন, তখন বিষয়ী

মথুরের তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও ন্যায়পরতা বলিয়া উঠিল, "যাঁহাকে প্রথম দর্শনে সুন্দর সরলপ্রকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া বুঝিয়াছি, স্বচক্ষে না দেখিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে কোন কথা বিশ্বাস করা হইবে না।" সেই জন্যই মথুরের গোপনে গোপনে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে আসিয়া ঠাকুরের কার্যকলাপ তন্ন তন্ন ভাবে নিরীক্ষণ করা এবং ঐরূপ করিবার ফলেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যে, "যুবক গদাধর অনুরাগ ও সরলতার মূর্তিমান জীবন্ত প্রতিমা; ভক্তি-বিশ্বাসের আতিশয্যেই ঐরূপ করিয়া ফেলিতেছেন!" তাই বুদ্ধিমান বিষয়ী মথুরের তাঁহাকে বুঝাইবার চেষ্টা যে, 'যা রয় সয়, তাই করা ভাল; ভক্তি-বিশ্বাস করাটা ভাল কথা, কিন্তু একেবারে আত্মহারা হইলে চলে কি? উহাতে লোকের নিন্দাভাজন তো হইতে হইবেই, আবার দশে যাহা বলে তাহা না শুনিয়া নিজের মনোমত আচরণ বরাবর করিয়া যাইলে বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়া পাগলও হইবার সম্ভাবনা!' কিন্তু ঐ সকল কথা ঐরূপে বুঝাইলেও মথুরের অন্তর্নিহিতা সুপ্তা ভক্তি সংসর্গগুণে জাগরিতা হইয়া কখন কখন বলিয়া উঠিত, 'কিন্তু রামপ্রসাদ প্রভৃতি পূর্ব পূর্ব সাধককুলেরও তো ভক্তিতে এইরূপ পাগলের ন্যায় ব্যবহারের কথা শুনা গিয়াছে; শ্রীগদাধরের ঐরূপ আচরণ ও অবস্থাও তো সেইরূপ হইতে পারে!' কাজেই, মথুর ঠাকুরের আচরণে বাধা না দিয়া কতদূর কি দাঁড়ায় তাহাই দেখিয়া যাইতে সঙ্কল্প করিলেন এবং দেখিয়া শুনিয়া পরে যাহা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হইবে তাহাই করিবেন, ইহাই স্থির করিলেন। বিষয়ী প্রভুর অধীনস্থ সামান্য কর্মচারীর উপর ঐরূপ ব্যবহার কম ধৈর্যের পরিচায়ক নহে।

ভক্তির সংক্রামিকা শক্তিতে মথুরের পরিবর্তন

ভক্তির একটা সংক্রামিকা শক্তি আছে। শারীরিক বিকার-সকলের ন্যায় মানসিক ভাবসমূহেরও এক হইতে অন্যে সংক্রমণ আমরা নিত্য দেখিতে পাই। কারণ, একই পদার্থের বিকারে একই নিয়মে যে স্থূল ও সূক্ষ্ম সমগ্র জগৎ গ্রথিত রহিয়াছে, ইহা আজকাল আর কেবলমাত্র বৈদিক ঋষিদিগের অনুভূতি দ্বারা প্রমাণ করিবার আবশ্যকতা নাই—জড়বিজ্ঞানও একথা প্রায় প্রমাণিত করিয়া আনিয়াছে। অতএব একের ভক্তিরূপ মানসিক ভাব জাগ্রত হইয়া অন্যের মধ্যে নিহিত সুপ্ত ঐ ভাবকে যে জাগ্রত করিবে, ইহাতে আর বিচিত্র কি! এই জন্যই শাস্ত্র সাধুসঙ্গকে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিবার বিশেষ সহায়ক বলিয়া এত করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। মথুরের ভাগ্যেও যে ঠিক ঐরূপ হইয়াছিল, ইহা বেশ অনুমিত হয়। তিনি ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ যতই দিন দিন লক্ষ্য করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার ভিতরের ভক্তিভাব তাঁহার অজ্ঞাতসারে জাগ্রত হইয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার পর পর কার্যসকলে আমরা ইহার বেশ পরিচয় পাইয়া থাকি। তবে বিষয়ী মনের যেমন হয়—এই ভক্তিবিশ্বাসের উদয়, আবার পরক্ষণেই সন্দেহ—এইরূপ বারবার হইয়া অনেক দিন পর্যন্ত দোলায়মান থাকিয়া তবে যে মথুরের হৃদয়ে ঠাকুরের আসন দৃঢ় ও অবিচলিত হয়, ইহা সুনিশ্চিত। সেইজন্য দেখিতে পাই, ঠাকুরের ব্যাকুল অনুরাগ ও আচরণাদি প্রথম প্রথম মথুরের নয়নে ভক্তির আতিশয্য বলিয়া বোধ হইলেও, ঠাকুরের জীবনে দিন দিন ঐ সকলের যতই বৃদ্ধি হইতে লাগিল, অমনি মথুরানাথের

মনে সন্দেহের উদয়—ইহার তো বুদ্ধিভ্রংশ হইতেছে না? কিন্তু এ সন্দেহে তাঁহার মনে দয়ারই উদয় হয় এবং সুচিকিৎসকের সহায়ে ঠাকুরের শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়া যাহাতে ঐ সকল মানসিক বিকার প্রশমিত হয়, মথুর সেই বিষয়েই মনোনিবেশ করেন।

বর্তমান ভাবে শিক্ষিত মথুরের ঠাকুরের সহিত তর্ক-বিচার। প্রাকৃতিক নিয়মের পরিবর্তন ঈশ্বরেচ্ছায় হইয়া থাকে। লাল জবাগাছে সাদা জবা

ইংরাজীতে ব্যুৎপত্তি মথুরবাবুর মন্দ ছিল না এবং ইংরাজী বিদ্যার সহায়ে পাশ্চাত্য চিন্তাপ্রণালী ও ভাবস্রোত মনের ভিতর প্রবেশ করিয়া 'আমিও একটা কেও-কেটা নই, অপর সকলের সহিত সমান'—এইরূপ যে একটা স্বাধীনভাব মানুষের মনে আনিয়া দেয়, সে ভাবটাও মথুরবাবুর কম ছিল না। সেজন্য যুক্তিতর্কাদি দ্বারা ঠাকুরকে ঐরূপে ঈশ্বরভক্তিতে একেবারে আত্মহারা হওয়ার পথ হইতে নিরস্ত করিবার প্রয়াসও আমরা মথুরবাবুর ভিতর দেখিতে পাইয়া থাকি। দৃষ্টান্তস্বরূপ এখানে ঠাকুর ও মথুরবাবুর জাগতিক ব্যাপারে ঈশ্বরকে স্বকৃত নিয়মের (Law) বাধ্য হইয়া চলিতে হয় কি না—এ বিষয়ে কথোপকথনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঠাকুর বলিতেন, "মথুর বলেছিল, 'ঈশ্বরকেও আইন মেনে চল্‌তে হয়। তিনি যা নিয়ম একবার করে দিয়েছেন, তা রদ্ করবার তাঁরও ক্ষমতা নেই!' আমি বল্লুম, 'ও কি কথা তোমার? যার আইন, ইচ্ছে করলে সে তখনি তা রদ্ করতে পারে বা তার জায়গায় আর একটা আইন করতে পারে।' ও কথা সে

কিছুতেই মানলে না। বল্লে, 'লালফুলের গাছে লালফুলই হয়, সাদা ফুল কখনও হয় না; কেননা, তিনি নিয়ম ক'রে দিয়েছেন। কৈ লালফুলের গাছে সাদা ফুল তিনি এখন করুন দেখি?' আমি বললুম, 'তিনি ইচ্ছে করলে সব করতে পারেন, তাও করতে পারেন।' সে কিন্তু ও কথা নিলে না। তার পরদিন ঝাউতলার দিকে শৌচে গেছি; দেখি যে একটা লাল জবাফুলের গাছে, একই ডালে দুটো ফেঁকড়িতে দুটি ফুল—একটি লাল, আর একটি ধপধপে সাদা, এক ছিটেও লাল দাগ তাতে নেই। দেখেই ডালটি শুদ্ধ ভেঙ্গে এনে মথুরের সামনে ফেলে দিয়ে বল্লুম, 'এই দেখ।' তখন মথুর বললে, হাঁ বাবা, আমার হার হয়েছে!'"
এইরূপে, শারীরিক বিকারেই যে ঠাকুরের মানসিক বিকার উপস্থিত হইয়া ঐরূপ ভক্তির আতিশয্যরূপে প্রকাশ পাইতেছে, কখন কখন এ বিশ্বাসে মথুর যে তাঁহার সহিত নানা বাদানুবাদ করিয়া তাঁহার ঐ ভাব ফিরাইবার চেষ্টা করিতেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি।

ঠাকুরের অবস্থা লইয়া মথুরের নিত্য বাধ্য হইয়া আন্দোলন

এইরূপে কতক কৌতূহলে, কতক ঠাকুরের ভাববিহ্বলতাটা শারীরিক রোগবিশেষ মনে করিয়া দয়ায়, এবং কখন কখন ঠাকুরের ঐরূপ অবস্থা ঠিক ঠিক ঈশ্বরভক্তির ফল ভাবিয়া বিস্ময় ও ভক্তিপূর্ণ হইয়া বিষয়ী মথুর তাঁহার সহিত ক্রমে ক্রমে অনেক কাল কাটাইতে এবং তাঁহার বিষয়ে অনেক চিন্তা ও আন্দোলনও যে করিতে থাকেন, ইহা স্পষ্ট বুঝা যায়। আর স্থির নিশ্চিন্তই বা থাকেন কিরূপে? ঠাকুর যে নবানুরাগের প্রবল

প্রবাহে নিত্যই এক এক নূতন ব্যাপার করিয়া বসেন! আজ পূজার আসনে বসিয়া আপনার ভিতর শ্রীশ্রীজগদম্বার দর্শনলাভ করিয়া পূজার সামগ্রীসকল নিজেই ব্যবহার করিয়াছেন; কাল তিন ঘণ্টা কাল ধরিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরতি করিয়া মন্দিরের কর্মচারীদের ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছেন, পরশু ভগবানলাভ হইল না বলিয়া ভূমে গড়াগড়ি দিয়া মুখ ঘস্‌ড়াইতে ঘস্‌ড়াইতে এমন ব্যাকুল ক্রন্দন করিয়াছেন যে, চারিদিকে লোক দাঁড়াইয়া গিয়াছে! এইরূপ এক এক দিনের এক এক ব্যাপারের কত কথাই না ঠাকুরের নিকট আমরা শুনিয়াছি!

'মহিম্নঃস্তোত্র' পড়িতে পড়িতে ঠাকুরের সমাধি ও মথুর

একদিন শিবমন্দিরে প্রবেশ করিয়া ঠাকুর 'মহিম্নঃস্তোত্র' পাঠ করিয়া মহাদেবের স্তব করিতে লাগিলেন। পাঠ করিতে করিতে ক্রমে যখন এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিতে লাগিলেন, তখন একেবারে অপূর্ব ভাবে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা সারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥ ৩২

—হে মহাদেব, সমুদ্রগভীর পাত্রে বিশাল হিমালয়শ্রেণীর মত পুঞ্জ পুঞ্জ কালি রাখিয়া, কোনরূপ অসম্ভব পদার্থের কামনা করিলেও যাঁহার তৎক্ষণাৎ তাহা সৃষ্টি বা রচনা করিয়া যাচকের মনোরথ পূর্ণ করিবার ক্ষমতা আছে—সেই কল্পতরু-শাখার কলম ও পৃথিবী-পৃষ্ঠসদৃশ আয়ত বিস্তৃত কাগজ লইয়া, স্বয়ং বাগ্‌দেবী

সরস্বতীও যদি তোমার অনন্ত মহিমার কথা লিখিয়া শেষ করিবার প্রয়াস পান, তাহা হইলেও কখনও তাহা করিতে পারেন না।

শ্লোকটি পড়িতে পড়িতে ঠাকুর শিবমহিমা হৃদয়ে জলন্ত অনুভব করিয়া একেবারে বিহ্বল হইয়া স্তব, স্তবের সংস্কৃত, পর পর আবৃত্তি করা প্রভৃতি সকল কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়া চীৎকার করিয়া কেবলই বার বার বলিতে লাগিলেন, "মহাদেব গো? তোমার গুণের কথা আমি কেমন করে বলব!" আর তাঁহার গণ্ড বহিয়া দরদরিত ধারে নয়নাশ্রু অবিরাম বক্ষে এবং বক্ষ হইতে বস্ত্র ও ভূমিতে পড়িয়া মন্দিরতল সিক্ত করিতে লাগিল! সে ক্রন্দনের রোল, পাগলের ন্যায় গদগদ বাক্য ও অদৃষ্টপূর্ব আচরণে ঠাকুরবাড়ীর ভৃত্য ও কর্মচারীরা চতুর্দিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া উপস্থিত হইল; এবং ঠাকুরকে ঐরূপ ভাবাপন্ন দেখিয়া কেহ বা অবাক হইয়া শেষটা কি হয় দেখিতে লাগিল, কেহ বা 'ওঃ ছোট ভট্চাজের পাগলামি! আমি বলি আর কিছু—আজ কিছু বেশী বাড়াবাড়ি দেখচি'; কেহ বা 'শেষে শিবের ঘাড়ে চড়ে বসবে না তো হে? হাত ধরে টেনে আনা ভাল' ইত্যাদি নানা কথা বলিতে লাগিল এবং রঙ্গরসের ঘটাও যে হইতে থাকিল, তাহা আর বলিতে হইবে না!

ঠাকুরের কিন্তু বাহিরের হুঁশ আদৌ নাই। শিবমহিমানুভবে তন্ময় মন তখন বাহ্যজগৎ ছাড়িয়া বহু উর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে—সেখানে এ জগতের মলিন ভাবরাশি ও কথাবার্তা কখনও পৌঁছে না। কাজেই কে কি ভাবিতেছে, বলিতেছে বা ব্যঙ্গ করিতেছে, তাহা তাঁহার কানে যাইবে কিরূপে?

মথুরবাবু সেদিন ঠাকুরবাড়িতে ; তিনিও ঐ গোলমাল ভট্টাচার্য মহাশয়কে লইয়া, শুনিতে পাইয়াই সেখানে উপস্থিত হইলেন। কর্ম্মচারীরা সসম্ভ্রমে পথ ছাড়িয়া দিল। মথুরবাবু আসিয়াই ঠাকুরকে ঐ ভাবাপন্ন দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন এবং ঐ সময়ে কোন কর্মচারী ঠাকুরকে শিবের নিকট হইতে বলপূর্বক সরাইয়া আনার কথা কহায় বিশেষ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "যাহার মাথার উপর মাথা আছে, সে-ই যেন এখন ভট্টাচার্য মহাশয়কে স্পর্শ করিতে যায়!" কর্মচারীরা কাজেই ভীত হইয়া আর কিছু বলিতে বা করিতে সাহসী হইল না। পরে কতক্ষণ বাদে ঠাকুরের বাহ্য-জগতের হুঁশ আসিল এবং ঠাকুরবাড়ির কর্মচারীদের সহিত মথুর-বাবুকে সেখানে দণ্ডায়মান দেখিয়া বালকের ন্যায় ভীত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন, "আমি বেসামাল হয়ে কিছু করে ফেলেছি কি?" মথুরও তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বলিলেন, "না বাবা, তুমি স্তব পাঠ করছিলে ; পাছে কেহ না বুঝিয়া তোমায় বিরক্ত করে, তাই আমি এখানে দাঁড়াইয়াছিলাম!"

ঠাকুরের নিকটে অপরের সহজে আধ্যাত্মিক উন্নতিলাভ-বিষয়ে দৃষ্টান্ত

ঠাকুর আমাদের নিকট একদিন তাঁহার সাধনকালের অবস্থা স্মরণ করিয়া বলিয়াছিলেন, "তখন তখন (সাধনকালে) যারা এখানে আসত, এখানকার সঙ্গে থেকে তাদের অতি শীঘ্র ঈশ্বর-উদ্দীপন হোত। বরানগর থেকে দুজন আসত—তারা জেতে খাট, কৈবর্ত কি তামাল এমনি একটা ; বেশ ভাল ; খুব ভক্তি-বিশ্বাস করত ও প্রায় আসত। একদিন পঞ্চবটীতে তাদের সঙ্গে বসে আছি—আর তাদের ভেতর একজনের

একটা অবস্থা হলো! দেখি বুকটা লাল হয়ে উঠেছে, চোখ ঘোর লাল, ধারা বেয়ে পড়ছে, কথা কইতে পাচ্ছে না, দাঁড়াতে পাচ্ছে না; দু'বোতল মদ খাইয়ে দিলে যেমন হয়, তেমনি! কিছুতেই তার আর সে ভাব ভাঙ্গে না! তখন ভয় পেয়ে মাকে বলি, "মা, একে কি কল্লি? লোকে বলবে, আমি কি করে দিয়েছি! ওর বাপ-টাপ সব বাড়িতে আছে; এখনই বাড়ি যেতে হবে।' তার বুকে হাত বুলিয়ে দিই আর মাকে ঐ রকম বলি। তবে কতক্ষণ বাদে একটু ঠাণ্ডা হয়ে বাড়ি যায়।"

ঠাকুরের জ্বলন্ত জীবনের সংস্পর্শে মথুরবাবুরও যে ঐরূপ একটা অদ্ভুত অবস্থার একসময়ে উদয় হইয়া তাঁহার বিশ্বাস-ভক্তি সহস্রগুণে বর্ধিত হইয়া উঠে, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। সর্বদাই আপন ভাবে বিভোর ঠাকুর একদিন তাঁহার ঘরের উত্তর-পূর্ব কোণে যে লম্বা বারাণ্ডাটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত আছে, তথায় আপন মনে গোঁ-ভরে পদচারণ করিতেছিলেন। ঠকুরবাড়ি ও পঞ্চবটীর মধ্যে যে একটি পৃথক বাড়ি আছে, যাহাকে এখনও 'বাবুদের কুঠি' বলিয়া ঠাকুরবাড়ির কর্মচারীরা নির্দেশ করিয়া থাকে, তাহারই একটি প্রকোষ্ঠে মথুরবাবু তখন একাকী আপন মনে বসিয়াছিলেন। মথুরবাবু যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখান হইতে ঠাকুর যেখানে বেড়াইতেছিলেন সে স্থানটির ব্যবধান বড় বেশী না হওয়ায় বেশ নজর হইতেছিল। কাজেই মথুরবাবু কখন ঠাকুরের ঐরূপ গোঁ-ভরে বিচরণ লক্ষ্য করিয়া তাঁহার বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, আবার কখনও বা

মথুরের ঠাকুরকে একাধারে শিব-শক্তি-রূপে দর্শন

বিষয়-সম্বন্ধীয় এ কথা সে কথার মনে মনে আন্দোলন করিয়া ভবিষ্যৎ কার্যপ্রণালী নির্ধারণ করিতেছিলেন। মথুরবাবু যে বৈঠকখানায় বসিয়া ঠাকুরকে মাঝে মাঝে ঐরূপে লক্ষ্য করিতেছেন, ঠাকুর তাহা আদৌ জ্ঞাত ছিলেন না। আর জানা থাকিলেই বা কি?—দুই জনের সাংসারিক, সামাজিক ও অন্য সর্বপ্রকার অবস্থার অন্তর এতদূর যে, জানা থাকিলেও কেহ কাহারও জন্য বড় বেশী ব্যতিব্যস্ত হইবার কারণ ছিল না। সে পক্ষে বরং ঠাকুরই ঈশ্বরীয় ভাবে তন্ময় ও অন্যমনা না থাকিলে, মথুরবাবুর কথা টের পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া সে স্থান হইতে সরিয়া যাইবার কথা ছিল। কারণ, ধনী, মানী, বিদ্যাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু, যাঁহাকে ঠাকুরবাড়ির ও রানীর সমস্ত বিষয়ের মালিক বলিলেও চলে এবং যাঁহার সুনয়নে পড়িয়াছিলেন বলিয়াই ঠাকুর এখনও ঐ স্থান হইতে তাড়িত হন নাই, তাঁহার সম্মুখে একজন সামান্য নগণ্য দরিদ্র পূজক ব্রাহ্মণ, যাঁহাকে লোকে তখন নির্বোধ, উন্মাদ, অনাচারী বলিয়াই জানিত ও বিদ্রূপাদি করিতেও ছাড়িত না, কেমন করিয়া ভীত সঙ্কুচিত না হইয়া থাকে বল? কিন্তু ঘটনা অভাবনীয়, অচিন্তনীয় হইয়া দাঁড়াইল—মথুরবাবুই হঠাৎ ব্যস্তসমস্ত হইয়া দৌড়াইয়া ঠাকুরের নিকট আগমন করিলেন এবং প্রণত হইয়া তাঁহার পদদ্বয় জড়াইয়া ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন!

• ঠাকুর বলেন, "বললুম, তুমি এ কি করচ? তুমি বাবু, রানীর জামাই, লোকে তোমায় এমন করতে দেখলে কি বলবে? স্থির হও, ওঠ। সে কি তা শোনে! তারপর ঠাণ্ডা হ'য়ে সকল কথা ভেঙ্গে বললে—অদ্ভুত দর্শন হয়েছিল। বললে—'বাবা, তুমি বেড়াচ্ছ

আর আমি স্পষ্ট দেখলুম, যখন এদিকে এগিয়ে আসছ, দেখচি তুমি নও, আমার ঐ মন্দিরের মা! আর যাই পেছন ফিরে ওদিকে যাচ্চ, দেখি কি যে সাক্ষাৎ মহাদেব! প্রথম ভাবলুম চোখের ভ্রম হয়েছে; চোখ ভাল ক'রে পুঁছে ফের দেখলুম—দেখি তাই! এইরূপ যতবার করলুম দেখলুম তাই।' এই বলে আর কাঁদে! আমি বল্লুম, 'আমি তো কই কিছু জানি না, বাবু'—কিন্তু সে কি শোনে! ভয় হ'ল, পাছে এ কথা কেউ জেনে গিন্নীকে, রানী রাসমণিকে ব'লে দেয়। সেই. বা কি ভাববে—হয়তো বলবে কিছু গুণ টুন্ করেছে! অনেক ক'রে বুঝিয়ে স্থঝিয়ে বলায় তবে সে ঠাণ্ডা হয়! মথুর কি সাধে এতটা করত—ভালবাসত? মা তাকে অনেক সময় অনেক রকম দেখিয়ে শুনিয়ে দিয়েছিল। মথুরের ঠিকুজিতে কিন্তু লেখা ছিল, বাবু, তার ইষ্টের তার উপর এতটা কৃপাদৃষ্টি থাকবে যে, শরীর ধারণ ক'রে তার সঙ্গে সঙ্গে ফিরবে, রক্ষা করবে।"

ঐ দর্শনের ফল

এখন হইতে মথুরের বিশ্বাস অনেকটা পাকা হইয়া দাঁড়ায়। কারণ, ইহাই তাঁহার প্রথম আভাস পাওয়া যে, প্রথম দর্শনেই যাঁহার প্রতি তিনি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, অপরে না বুঝিয়া নিন্দা করিলেও যাঁহার মনোভাব ও আচরণ তিনি অনেক সময় ধরিতে ও বুঝিতে পারিয়াছেন, সে ঠাকুর বাস্তবিকই সামান্য নহেন; জগদম্বা তাঁহারই প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুরের শরীরের ভিতরে সাক্ষাৎ বর্তমান রহিয়াছেন। এই সময় হইতেই তাঁহার মনে হয়, মন্দিরের পাষাণময়ীই বা শরীর ধারণ করিয়া তাঁহার জন্মপত্রিকার কথামত তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে

ফিরিতেছেন!—এখন হইতে ঠাকুরের সহিত মথুরবাবুর ঘনিষ্ঠতা বিশেষরূপে বৃদ্ধি পাইল।

মথুরের বাস্তবিকই মহাভাগ্যোদয় হইয়াছিল। শাস্ত্র বলেন, যতদিন শরীর থাকিবে ততদিন ভাল-মন্দ দুই-প্রকার কর্ম মানুষকে করিতে হইবেই—সাধারণ মানুষের তো কথাই নাই, মুক্ত পুরুষদিগেরও! সাধারণ মানব স্বয়ং-ই নিজকৃত সুকৃত-দুষ্কৃতের ফল ভোগ করে। এখন মুক্ত পুরুষদিগের শরীরকৃত পাপপুণ্যের ফলভোগ করে কে? তাঁহারা তো আর নিজে উহা করিতে পারেন না? কারণ, সুখ-দুঃখাদি ভোগ করিবে যে অভিমান-অহঙ্কার, তাহা তো চিরকালের মত তাঁহাদের ভিতর হইতে উড়িয়া-পুড়িয়া গিয়াছে; তবে উহা করে কে? আবার কর্মফল তো অবশ্যম্ভাবী এবং মুক্ত পুরুষদিগের শরীরটা যতদিন জীর্ণ পত্রের মত পড়িয়া না যায়, ততদিন তো উহার দ্বারা ভাল-মন্দ কতকগুলি কাজ হইবেই হইবে। শাস্ত্র এখানে বলেন—যে সকল বদ্ধ পুরুষেরা তাঁহাদের সেবা করে, ভালবাসে, তাহারাই মুক্তাত্মাদিগের কৃত শুভকর্মের এবং যাহারা তাঁহাদের দ্বেষ করে, তাহারাই তাঁহাদের শরীরকৃত অশুভ কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে।[১] সাধারণ মুক্ত

মথুরের মহা-ভাগ্য সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ

১ বেদান্তসূত্র, ৩য় অধ্যায়, ৩য় পাদ, ২৬ সূত্রের শাঙ্করভাষ্যে এইরূপ লিখিত আছে—"তথা শাট্যায়নিনঃ পঠন্তি—'তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যাং দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যাম্' ইতি। তথৈব কৌষীতকিনঃ—'তৎ সুকৃতদুষ্কৃতে বিধুনুতে তস্য প্রিয়াঃ জ্ঞাতয়ঃ সুকৃতমুপযন্ত্যপ্রিয়া দুষ্কৃতম্' ইতি।"

পরবর্তী ভাষ্যেও ঐ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

পুরুষদিগের সেবার দ্বারাই যদি ঐরূপ ফললাভ হয়, তবে ঈশ্বরাবতারদিগের ভক্তিপ্রীতিপূর্ণ সেবার যে কতদূর ফল তাহা কে বলিতে পারে?

দিনের পর দিন যতই চলিয়া যাইতে লাগিল, মথুরবাবুও ততই ঠাকুরের গুরুভাবের পরিচয় স্পষ্ট—স্পষ্টতর পাইতে থাকিয়া, ঠাকুরের প্রতি অবিচলা ভক্তি করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা হইয়া গেল; যথা—ভগবদ্বিরহে ঠাকুরের বিষম গাত্রদাহ ও তাহার চিকিৎসা; ব্রাহ্মণী ভৈরবীর দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন ও বৈষ্ণবগ্রন্থ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া মথুরবাবুর দ্বারা আহূত পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মুখে ঠাকুরের অবতারত্ব-প্রতিপাদন, মহাবৈদান্তিক জ্ঞানী তোতাপুরীর আগমন ও ঠাকুরের সন্ন্যাসগ্রহণ, ঠাকুরের বৃদ্ধা জননীর দক্ষিণেশ্বরে আগমন ও বাস ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু পূর্বোক্ত অদ্ভুত দর্শনের দিন হইতে মথুরানাথ ঠাকুরের জীবনের প্রায় সকল দৈনন্দিন ঘটনাবলীর সহিতই বিশেষভাবে সম্বন্ধ। ঠাকুরের চিকিৎসার জন্য মথুর কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺গঙ্গাপ্রসাদ সেন ও ডাক্তার ৺মহেন্দ্রলাল সরকারকে দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়া দিলেন; ঠাকুরের শ্রীশ্রীজগদম্বাকে, পশ্চিমী স্ত্রীলোকেরা যেরূপ পাঁইজর প্রভৃতি অলঙ্কার ব্যবহার করেন সেইরূপ পরাইবার সাধ হইল—মথুর তৎক্ষণাৎ তাহা গড়াইয়া দিলেন; ঠাকুর বৈষ্ণবতন্ত্রোক্ত সখীভাবে সাধনকালে স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় বেশভূষা করিবেন ইচ্ছা হইল—মথুরানাথ তৎক্ষণা

ঠাকুরের দিন-দিন গুরুভাবের অধিকতর বিকাশ ও মথুরের তাঁহাকে পরীক্ষা করিয়া অনুভব

এক 'সুট' ডায়মনকাটা অলঙ্কার, বেনারসী শাড়ি, ওড়না প্রভৃতি আনাইয়া দিলেন; পানিহাটির উৎসব দেখিবার ঠাকুরের সাধ জানিয়া মথুর তৎক্ষণাৎ তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াই যে ক্ষান্ত থাকিলেন তাহা নহে, পাছে সেখানে ভিড়-ভাড়ে তাঁহার কষ্ট হয় ভাবিয়া নিজে গুপ্তভাবে দারোয়ান সঙ্গে লইয়া ঠাকুরের শরীররক্ষা করিতে যাইলেন। এইরূপে প্রতি ব্যাপারে মথুরের অদ্ভুত সেবার কথা যেমন আমরা একদিকে শুনিয়াছি, তেমনি আবার অপরদিকে নষ্টস্বভাবা স্ত্রীলোকদিগকে লাগাইয়া ঠাকুরের মনে অসৎ ভাবের উদয় হয় কি না পরীক্ষা করার কথা, ঠাকুরবাড়ির দেবোত্তর সম্পত্তি ঠাকুরের নামে সমস্ত লিখিয়া পড়িয়া দিবার প্রস্তাবে ঠাকুর ভাবাবস্থায় "কি! আমাকে বিষয়ী করিতে চাস্?" —বলিয়া মথুরের উপর বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহার করিতে যাইবার কথা, জমিদারি-সংক্রান্ত দাঙ্গা-হাঙ্গামায় লিপ্ত হইয়া নরহত্যার অপরাধে রাজদ্বারে বিশেষভাবে দণ্ডিত হইবার ভয়ে ঐ বিপদ হইতে উদ্ধার-কামনায় ঠাকুরের নিকট সকল দোষ স্বীকার করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া মথুরের ঐ বিপদ হইতে নিস্তার পাইবার কথা প্রভৃতি অনেক কথাও ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। ঐ সকল ঘটনাবলী হইতেই আমরা মথুরবাবুর মনে যে ঠাকুরের প্রতি ক্রমে ক্রমে ভক্তি দৃঢ়া অচলা হইয়া আসিতেছিল ইহার পরিচয় পাইয়া থাকি। আর ঐরূপ না হইয়া অন্যরূপই বা হয় কিরূপে? ঠাকুরের অদ্ভুত অলৌকিক দেবদুর্লভ স্বভাব যেমন একদিকে মথুরের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া দিনের পর দিন অধিকতর সমুজ্জ্বল ভাব ধারণ করিল,

অপরদিকে তেমনি ঠাকুরের অপার অহেতুক ভালবাসা মথুরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মথুর দেখিলেন, লক্ষ লক্ষ টাকার সম্পত্তি দিয়াও ইঁহাকে ত্যাগীর ভাব হইতে হটাইতে পারিলাম না, সুন্দরী নারীগণের দ্বারা ইঁহার মনে বিকার উপস্থিত করিতে পারিলাম না, পার্থিব মান-যশেও—কারণ মানুষকে মানুষ ভগবান বলিয়া পূজা করা অপেক্ষা অধিক মান আর কি দিতে পারে—ইঁহাকে কিছুমাত্র টলাইতে বা অহঙ্কৃত করিতে পারিলাম না, পার্থিব কোন বিষয়েরই ইনি প্রার্থী নন—অথচ তাঁহার চরিত্রের সমস্ত দুর্বলতার কথা জানিয়াও তাঁহাকে ঘৃণা করিতেছেন না, আপনার হইতেও আপনার করিয়া ভালবাসিতেছেন, বিপদ হইতে বার বার উদ্ধার করিতেছেন, আর কিসে তাঁহার সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ হয় তাহাই চিন্তা করিতেছেন!—ইহার কারণ কি? বুঝিলেন, ইনি মনুষ্যশরীরধারী হইলেও 'যে দেশে রজনী নাই' সেই রাজ্যের লোক। ইঁহার ত্যাগ অদ্ভুত, সংযম অদ্ভুত, জ্ঞান অদ্ভুত, ভক্তি অদ্ভুত, সকল প্রকার কর্ম অদ্ভুত এবং সর্বোপরি তাঁহার ন্যায় দুর্বল অথচ অহঙ্কৃত জীবের উপর ইঁহার করুণা ও ভালবাসা অদ্ভুত!

আর একটি কথাও মথুরানাথ সঙ্গে সঙ্গে প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন—এ অদ্ভুত চরিত্রের মাধুর্য! এমন অলৌকিক ঐশী শক্তির বিকাশ ইঁহার ভিতর দিয়া হইলেও, ইনি নিজে যে বালক, সেই বালক! এতটুকু অহঙ্কার নাই—এ কি চমৎকার ব্যাপার! নিজের ভিতর যে কোন ভাব উঠুক না কেন, পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় তাঁহার এতটুকু লুকানো নাই! ভিতরে বাহিরে

নিরন্তর এক ভাব! যাহা মনে, তাহাই অকপটে মুখে ও কার্যে প্রকাশ—অথচ অন্যের যাহাতে কোনরূপ হানি হইতে পারে, তাহা কখনও বলা নাই—নিজের শারীরিক কষ্ট হইলেও তাহা বলা নাই! ইহা কি মানবে সম্ভব?

মথুরানাথের কালীঘাটের হালদার পুরোহিত, ঠাকুরের প্রতি মথুরবাবুর অবিচলা ভক্তি দেখিয়া হিংসায় জরজর; ভাবে—'লোকটা বাবুকে কোনরূপ গুণ্ টুন্ করিয়া ঐরূপ বশীভূত করিয়াছে।' ভাবে—'তাই তো, বাবুটাকে হাত করবার আমার এতকালের চেষ্টাটা এই লোকটার জন্য সব পণ্ড? আবার সরল বালকের ভান দেখায়। যদি এতই সরল তো বলে দিক 'বশীকরণের' ক্রিয়াটা। আমার যত বিদ্যা সব ঝেড়ে ঝুড়ে বাবুটা একটু বাগে আসছিল, এমন সময় এ আপদ কোথা হ'তে এল?'

মথুরের ভক্তি-বৃদ্ধি দেখিয়া হালদার পুরোহিত

এদিকে মথুরের ভক্তিবিশ্বাস যতই বাড়িতে থাকিল, ততই ঠাকুরের সঙ্গে সদাসর্বক্ষণ কি করিয়া থাকিতে পাইব, কি করিয়া তাঁহার আরও অধিক সেবা করিতে পাইব—এই সকল চিন্তাই বলবতী হয়। সেজন্য মাঝে মাঝে ঠাকুরকে অনুরোধ-নির্বন্ধ করিয়া কলিকাতায় জানবাজারের বাটীতে নিজের কাছে আনিয়া রাখেন; অপরাহ্নে 'বাবা, চল বেড়াইয়া আসি' বলিয়া সঙ্গে করিয়া গড়ের মাঠ প্রভৃতি কলিকাতার নানাস্থানে বেড়াইয়া লইয়া আসেন। 'বাবাকে কি যাহাতে তাহাতে খাইতে দেওয়া চলে?'—ভাবিয়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের এক সুট বাসন নূতন গড়াইয়া তাহাতে ঠাকুরকে অন্ন-পানীয় দেন; উত্তম উত্তম বস্ত্র পরিচ্ছদ

প্রভৃতি পরাইয়া দেন, আর বলেন—'বাবা, তুমিই তো এই সকলের (বিষয়ের) মালিক, আমি তোমার দেওয়ান বই তো নয়; এই দেখ না, তুমি সোনার থালে, রূপার বাটি-গেলাসে খাইবার পর ঐ সকলের দিকে আর না দেখিয়া ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া গেলে, আর আমি আবার তুমি খাইবে বলিয়া সে সমস্ত মাজাইয়া ঘসাইয়া তুলিয়া রাখি, চুরি গেল কি না দেখি, ভাঙ্গা ফুটা হইল কি না খবর রাখি, আর এই সব লইয়াই ব্যস্ত থাকি।'

বারাণসী শালের দুর্দশা।

এই সময় এক জোড়া বারাণসী শালের দুর্দশার কথা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম। মথুর উহা সহস্র মুদ্রা মূল্যে ক্রয় করেন এবং অমন ভাল জিনিস আর কাহাকে দিব ভাবিয়া, নিজের হাতে ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে উহা জড়াইয়া দিয়া মহানন্দ লাভ করেন। শালজোড়াটি বাস্তবিকই মূল্যবান—কারণ, উহার তখনকার (৫০ বৎসর পূর্বের) দামই যখন অত ছিল, তখন বোধ হয় সে প্রকার জিনিস এখন আর দেখিতেই পাওয়া যায় না। শালখানি পরিয়া ঠাকুর প্রথম বালকের মত মহা আনন্দিত হইয়া এদিক্ ওদিক করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, বার বার উহা নিজে দেখিতে লাগিলেন এবং অপরকে ডাকিয়া দেখাইতে ও মথুরবাবু উহা এত দরে কিনিয়া দিয়াছেন ইত্যাদি বলিতে লাগিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই বালকের ন্যায় ঠাকুরের মনে অন্য ভাবের উদয় হইল! ভাবিলেন—"এতে আর আছে কি? কতকগুলো ছাগলের লোম বই তো নয়? যে পঞ্চভূতের বিকারে সকল জিনিস, সেই পঞ্চভূতেই তো এটাও তৈয়ারী হয়েছে; আর শীতনিবারণ—তা লেপ-কম্বলেও যেমন হয়,

এতেও তেমনি ; অন্য সকল জিনিসের ন্যায় এতেও সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না ; বরং গায়ে দিলে মনে হয় আমি অপর সকলেরই চেয়ে বড়, আর অভিমান অহঙ্কার বেড়ে মানুষের মন ঈশ্বর থেকে দূরে গিয়ে পড়ে ! এতে এত দোষ !" এই সকল কথা ভাবিয়া শালখানি ভূমিতে ফেলিয়া—ইহাতে সচ্চিদানন্দ লাভ হয় না, 'থু, থু' বলিয়া থুতু দিতে ও ধূলিতে ঘষিতে লাগিলেন এবং পরিশেষে অগ্নি জ্বালিয়া পুড়াইবার উপক্রম করিলেন। এমন সময় কে সেখানে আসিয়া পড়িয়া উহা তাঁহার হস্ত হইতে উদ্ধার করে ! মথুরবাবু শালখানির ঐরূপ দুর্দশা হইয়াছে জানিয়াও কিছুমাত্র দুঃখিত হন নাই। বলিয়াছিলেন—'বাবা বেশ করেছেন !'

ঠাকুরের নির্লিপ্ততা

উপরে লিখিত ঘটনাদি হইতেই বেশ বুঝা যায়, মথুরবাবু ঠাকুরকে নানা ভোগ-সুখ ও আরামের ভিতর রাখিবার চেষ্টা করিলেও ঠাকুরের মন কত উচ্চে, কোথায় নিরন্তর থাকিত। যেখানেই থাকুন না কেন, এ মন সর্বদা আপন ভাবে বিভোর ! অপর সকল মন যেখানে কেবল অন্ধকারের উপর অন্ধকাররাশিই পুঞ্জীকৃত দেখে, সেখানে এ মন দেখে—আলোয় আলো—ছায়াবিহীন হ্রাসবৃদ্ধিরহিত আলো—যে আলোর সম্মুখে চন্দ্র-সূর্য-তারকার উজ্জ্বলতা, বিদ্যুতের চক্‌মকানি, অগ্নির তো 'কা কথা'—সব মিটমিটে, প্রায় অন্ধকারতুল্য ! সেই আলোকময় রাজ্যেই এ মনের নিরন্তর থাকা। আর এই হিংসাদ্বেষকপটতাপূর্ণ কামক্রোধের চির-আবাসভূমি এই রাজ্যে, যেন এ মনের দু'দিনের জন্য করুণায় বেড়াইতে আসা, এইমাত্র। অতএব মথুরবাবুর ভোগসুখ-

বিলাসিতাপূর্ণ জানবাজারের বাড়িতে থাকিলেও, যে ঠাকুর সেই ঠাকুর—নির্লিপ্ত, নিরহঙ্কার, আপন ভাবে আপনি নিশিদিন মাতোয়ারা !

হালদার পুরোহিতের শেষ কথা।

জানবাজারের বাড়িতে সন্ধ্যার প্রাক্কালে ঠাকুর একদিন অর্ধবাহ্য দশায় পড়িয়া আছেন, নিকটে কেহ নাই। ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গিতেছে ; বাহ্যজগতের অল্পে অল্পে হুঁশ আসিতেছে। এমন সময় পূর্বোক্ত হালদার পুরোহিত আসিয়া উপস্থিত। ঠাকুরকে একাকী তদবস্থ দেখিয়াই ভাবিল, ইহাই সময়। নিকটে যাইয়া এদিক্ ওদিক্ চাহিয়া ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গ ঠেলিতে ঠেলিতে বার বার বলিতে লাগিল—'অ বামুন, বল্ না—বাবুটাকে কি ক'রে হাত করলি ? কি ক'রে বাগালি, বল্ না ? ঢঙ্ করে চুপ ক'রে রইলি যে ? বল্ না ?' বার বার ঐরূপ বলিলেও ঠাকুর যখন কিছুই বলিলেন না বা বলিতে পারিলেন না—কারণ, ঠাকুরের তখন কথা কহিবার মত অবস্থাই ছিল না—তখন কুপিত হইয়া 'যা শালা বল্লি না' বলিয়া সজোরে পদাঘাত করিয়া অন্যত্র গমন করিল। নিরভিমান ঠাকুর, মথুরবাবু এ কথা জানিতে পারিলে ক্রোধে ব্রাহ্মণের উপর একটা বিশেষ অত্যাচার করিয়া বসিবে, বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে—কিছুকাল পরে—অন্য অপরাধে মথুরবাবুর কোপে পড়িয়া ব্রাহ্মণ তাড়িত হইলে একদিন কথায় কথায় মথুরানাথকে ঐ কথা বলেন। শুনিয়া মথুর ক্রোধে দুঃখে বলিয়াছিলেন, "বাবা, এ কথা আমি আগে জানলে বাস্তবিকই ব্রাহ্মণের মাথা থাকত না।"

ঠাকুরের গুরুভাবে অপার করুণার কথা সস্ত্রীক মথুরবাবু প্রাণে প্রাণে যে কতদূর অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেবতাজ্ঞানে যে কতদূর আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন, তাহার বিশিষ্ট পরিচয় আমরা পাইয়া থাকি—ঠাকুরের নিকট তাঁহাদের উভয়ের কোন কথা গোপন না রাখায়। উভয়েই জানিতেন ও বলিতেন, "বাবা মানুষ নন; ওঁর কাছে কথা লুকিয়ে কি করবো? উনি সকল জানতে পারেন, পেটের কথা সব টের পান।"

মথুরানাথ ও তৎপত্নী জগদম্বা দাসীর ঠাকুরের উপর ভক্তি ও ঠাকুরের ঐ পরিবারের সহিত ব্যবহার

তাঁহারা উভয়ে যে ঐ প্রকারে কথার কথা মাত্র বলিতেন, তাহা নহে—কার্যতঃ সকল বিষয়ে ঠিক ঠিক ঐরূপ অনুষ্ঠান করিতেন। বাবাকে লইয়া একত্রে আহার-বিহার এবং এক শয্যায় কতদিন শয়ন পর্যন্ত উভয়ে করিয়াছেন! বাবা সকল সময়ে সর্বাবস্থায় অন্দরে অবাধ গমনাগমন করিবেন, তাহাতে কি? উনি অন্দরে না যাইলেই বা কি?—বাড়ির স্ত্রী-পুরুষ সকলের সকল প্রকার মনোভাব যে জানেন, ইহার পরিচয় তাঁহারা অনেক সময় পাইয়াছেন। আর পুরুষের, স্ত্রীলোকদের সহিত মিশিবার যে প্রধান অনর্থ—মানসিক বিকার, সে সম্বন্ধে বাবাকে ঘরের দেয়াল বা অন্য কোন অচেতন পদার্থবিশেষ বলিলেও চলে! অন্দরের কোন স্ত্রীলোকেরই মনে তো বাবাকে দেখিয়া, অপর কোন পুরুষকে দেখিয়া যেরূপ সঙ্কোচ-লজ্জার ভাব আসে, সেরূপ আসে না। মনে হয় যেন তাঁহাদেরই একজন, অথবা একটি পাঁচ বছরের

ছেলে! কাজেই সখীভাবে ভাবিত ঠাকুর স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা পরিয়া ৺দুর্গাপূজার সময়ে অন্দরের স্ত্রীলোকদিগের সহিত বাহিরে আসিয়া প্রতিমাকে চামর-বীজন করিতেছেন, কখন বা কোন যুবতীর স্বামীর আগমনে তাহাকে সাজাইয়া-গুজাইয়া বেশভূষা পরাইয়া স্বামীর সহিত কি ভাবে কথাবার্তা কহিতে হয়, তাহা কানে কানে শিখাইতে শিখাইতে শয়নমন্দিরে স্বামীর পার্শ্বে বসাইয়া দিয়া আসিতেছেন—এরূপ অনেক কথা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে জানিয়া আমরা ইঁহাদের ঠাকুরের উপর কি এক অপূর্ব ভাব ছিল, ভাবিয়া অবাক্ হইয়া থাকি। ঠাকুরের গুরুভাবে এই সকল স্ত্রীলোকদিগের মনে তাঁহার প্রতি দেবতাজ্ঞান যেমন সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তেমনি আবার তাঁহার অহেতুক ভালবাসার বিশেষ পরিচয় পাইয়া ইঁহারা তাঁহাকে কতদূর আপনার হইতেও আপনার করিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, কতদূর নিঃসঙ্কোচে তাঁহার নিকটে উঠা-বসা ও অন্য সকল চেষ্টা ব্যবহারাদি করিতেন, তাহা আমরা কল্পনাতেও ঠিক ঠিক আনিতে পারি না!

ঠাকুরে বিপরীত ভাবের একত্র সমাবেশ

একদিকে ঠাকুরের মথুরবাবুর বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত যেমন অমানুষী কামগন্ধহীন স্বার্থমাত্রশূন্য সখীর ন্যায় ভালবাসার প্রকাশ, অপরদিকে আবার বাহিরে পুরুষদিগের নিকট, পণ্ডিতমণ্ডলীর মাঝে দিব্যজ্ঞান ও অনুপম বুদ্ধির সহিত ব্যবহারাদি দেখিলে মনে হয়, এ বহু-বিপরীত ভাবের একত্র সম্মিলন তাঁহার ভিতরে কিরূপে হইয়াছিল? এ বহুরূপী ঠাকুর কে?

গুরুভাব ও মথুরানাথ

দক্ষিণেশ্বর ঠাকুরবাটীতে ৺রাধাগোবিন্দের বিগ্রহমূর্তিদ্বয় তখন প্রতিদিন প্রাতে পার্শ্বের শয়নঘর হইতে মন্দিরমধ্যে সিংহাসনে আনিয়া বসান হইত এবং পূজা ভোগ-রাগাদির অন্তে দুই প্রহরে পুনরায় শয়নমন্দিরে বিশ্রামের জন্য রাখিয়া আসা হইত। আবার অপরাহ্নে বেলা চারিটার পর সেখান হইতে সিংহাসনে আনিয়া পুনরায় সান্ধ্য আরাত্রিক ও ভোগ-রাগাদির অন্তে রাত্রে রাখিয়া আসা হইত।

দক্ষিণেশ্বরে বিগ্রহমূর্তি ভগ্ন হওয়ায় বিধান লইতে পণ্ডিত-সভার আহ্বান

মন্দিরের মর্মর পাথরের মেঝে একদিন জল পড়িয়া পিছল হওয়ায়, ঠাকুর লইয়া যাইবার সময় পড়িয়া গিয়া পূজক ব্রাহ্মণ ৺গোবিন্দজীর মূর্তিটির পা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন! একেবারে হুলস্থুল পড়িয়া গেল। পূজারী তো নিজে আঘাত পাইলেন, আবার ভয়ে কম্পমান! বাবুদের নিকট সংবাদ পৌছিল। কি হইবে? ভাঙ্গা বিগ্রহে তো পূজা চলে না—এখন উপায়? রানী রাসমণি ও মথুরবাবু উপায়-নির্ধারণের জন্য শহরের সকল খ্যাতনামা পণ্ডিতদের সম্ভ্রমে আহ্বান করিয়া সভা করিলেন। যে সকল পণ্ডিতেরা কার্যবশতঃ উপস্থিত হইতে পারিলেন না, তাঁহাদেরও মতামত সংগৃহীত হইতে লাগিল। একেবারে হই-চই ব্যাপার এবং পণ্ডিতবর্গের সম্মানরক্ষার জন্য বিদায়-আদায়ে টাকারও শ্রাদ্ধ। পণ্ডিতেরা পাঁজি-পুঁথি খুলিয়া বারবার বুদ্ধির গোড়ায় নস্য দিয়া বিধান দিলেন—'ভগ্ন মূর্তিটি গঙ্গার জলে ফেলিয়া দেওয়া হউক এবং তৎস্থলে অন্য নূতন মূর্তি স্থাপিত হউক।' কারিগরকে মূর্তিগঠনের আদেশ দেওয়া হইল।

সভাভঙ্গকালে মথুরবাবু রানীমাতাকে বলিলেন, "ছোট ভট্টাচার্য মহাশয়কে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা তো হয় নাই? তিনি কি বলেন জানিতে হইবে"—বলিয়া ঠাকুরকে ঐ বিষয়ে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন! ঠাকুর ভাবমুখে বলিতে লাগলেন, "রানীর জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙ্গে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ ক'রে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসান হ'ত—না তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হতো? এখানেও সেই রকম করা হোক—মূর্তিটি জুড়ে যেমন পূজা হচ্ছে তেমন পূজা করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কিসের জন্য?" সকলে ব্যবস্থা শুনিয়া অবাক! তাই তো, কাহারও মাথায় তো এ সহজ যুক্তিটি আসে নাই? মূর্তিটি যদি ৺গোবিন্দজীর দিব্য আবির্ভাবে জীবন্ত বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তবে সে আবির্ভাব তো ভক্তের হৃদয়ের গভীর ভক্তি-ভালবাসা-সাপেক্ষ, ভক্তের প্রতি কৃপা বা করুণায় হৃদয়ে শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালবাসা থাকিলে সে আবির্ভাব ভগ্ন মূর্তিতেই বা না হইতে পারে কেন? মূর্তিভঙ্গের দোষাদোষ তো আর সে আবির্ভাবকে স্পর্শ করিতে পারে না! তারপর, যে মূর্তিটিতে শ্রীভগবানের এতকাল পূজা করিয়া হৃদয়ের ভালবাসা দিয়া আসিয়াছি, আজ তাহার অঙ্গবিশেষের হানি হওয়াতে যথার্থ ভক্তের হৃদয় হইতে কি ভালবাসার সঙ্গে সঙ্গে হানি হইতে পারে? আবার বৈষ্ণবাচার্যগণ ভক্তকে ঠাকুরের আত্মবৎ সেবা করিতেই উপদেশ দিয়া থাকেন। আপনি যখন যে অবস্থায় যাহা করিতে ভালবাসি, ঠাকুরও তাহাই ভালবাসেন ভাবিয়া

ঠাকুরের মীমাংসা ও ঐ বিষয়ের শেষ কথা

সেইরূপ করিতেই বলেন। সে পক্ষ হইতেও মূর্তিটির ত্যাগের ব্যবস্থা হইতে পারে না। অতএব স্মৃতিতে যে ভগ্ন মূর্তিতে পূজাদি করিবে না বলিয়া বিধান আছে, তাহা প্রেমহীন, ভক্তিপথে সবে মাত্র অগ্রসর ভক্তের জন্যই নিশ্চয়। যাহা হউক, অভিমানী পণ্ডিতবর্গের কাহারও কাহারও ঠাকুরের মীমাংসার সহিত মতভেদ হইল, কেহ বা আবার মতভেদ-প্রকাশে বিদায়-আদায়ের ত্রুটি হইবার সম্ভাবনা ভাবিয়া স্বীয় মত পরিষ্কার প্রকাশ করিলেন না! আর যাঁহারা পাণ্ডিত্যের সহায়ে একটু যথার্থ জ্ঞান-ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাঁহারা ঠাকুরের ঐ মীমাংসা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। পরে ঠাকুর স্বহস্তে মূর্তিটি জুড়িয়া দিলেন ও তাঁহার পূজাদি পূর্ববৎ চলিতে লাগিল। কারিগর নূতন মূর্তি একটি গড়িয়া আনিলে, উহা ৺গোবিন্দজীর মন্দিরমধ্যে একপার্শ্বে রাখিয়া দেওয়া হইল মাত্র, উহার প্রতিষ্ঠা আর করা হইল না। রানী রাসমণি ও মথুরবাবু পরলোকগমন করিলে, তাঁহাদের বংশধরগণের কেহ কেহ কখন কখন ঐ নূতন মূর্তিটির প্রতিষ্ঠার আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন না কোন সাংসারিক বিঘ্ন সেই সেই কালে উপস্থিত হওয়ায় ঐ কার্য স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কাজেই ৺গোবিন্দজীর নূতন মূর্তিটি এখনও সেইভাবেই রাখা আছে।

সপ্তম অধ্যায়

গুরুভাবে মথুরের প্রতি কৃপা

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ॥ গীতা, ১০।২০

এ বৎসর মথুরানাথের জানবাজারের বাটীতে ৺দুর্গোৎসবে বিশেষ আনন্দ। কারণ, শ্রীশ্রীজগদম্বার পূজায় বৎসরে বৎসরে আবালবৃদ্ধবনিতার যে একটা অনির্বচনীয় আনন্দ, তাহা তো আছেই, তাহার উপর 'বাবা' আবার কয়েকদিন হইতে মথুরের বাটী পবিত্র করিয়া ঐ আনন্দ সহস্রগুণে বর্ধিত করিয়াছেন। কাজেই আনন্দের আর পরিসীমা নাই। মা-র নিকটে বালক যেমন আনন্দে আটখানা হইয়া নির্ভয়ে আব্দার, অনুরোধ ও হেতুরহিত হাস্য-নৃত্যাদির চেষ্টা করিয়া থাকে, নিরন্তর ভাবাবেশে প্রতিমাতে জগন্মাতার সাক্ষাৎ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া 'বাবার' সেইরূপ অপূর্ব আচরণে, প্রতিমা বাস্তবিকই জীবন্ত জ্যোতির্ময়ী হইয়া যেন হাসিতেছেন! আর ঐ প্রতিমাতে মা-র আবেশ ও ঠাকুরের দেবদুর্লভ শরীর-মনে মা-র আবেশ একত্র সম্মিলিত হওয়ায় পূজার দালানের বায়ুমণ্ডল কি একটা অনির্বচনীয়, অনির্দেশ্য সাত্ত্বিক ভাবপ্রকাশে পূর্ণ বলিয়া অতি জড়মনেরও

জানবাজারে মথুরের বাটীতে ঠাকুরকে লইয়া ৺দুর্গোৎসবের কথা

অনুভূতি হইতেছে! দালান জম জম করিতেছে—উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে! আর বাটীর সর্বত্র যেন সেই অদ্ভুত প্রকাশে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে!

হইবারই কথা। ধনী মথুরের রাজসিক ভক্তি, ঘর দ্বার ও মা-র প্রতিমা বিচিত্র সাজে সাজাইতে, পত্র পুষ্প ফল মূল মিষ্টান্নাদি পূজার দ্রব্যসম্ভারের অপর্যাপ্ত আয়োজনে এবং নহবতাদি বাদ্য-ভাণ্ডের বাহুল্যে মনোনিবেশ করিয়া বাহিরের কিছুরই যেমন ত্রুটি রাখে নাই, তেমনি আবার এ অদ্ভুত ঠাকুরের অলৌকিক দেবভাব বাহিরের ঐ জড় জিনিসসকলকে স্পর্শ করিয়া উহাদের ভিতর সত্যসত্যই একটা প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়াছে! কাজেই তুষারমণ্ডিত হিমালয়বক্ষে চিরশ্যামল দেবদারুকুঞ্জের গম্ভীর সৌন্দর্যে সাধু-তপস্বীর গৈরিক বসন যে শান্তিময় শোভা আনয়ন করে, সুন্দরী রমণীর কোলে স্তন্যপায়ী সুন্দর শিশু যে করুণামাখা সৌন্দর্যের বিস্তার করে, সুন্দর মুখে পবিত্র মনোভাব যে অপূর্ব প্রকাশ আনিয়া দেয়, মথুরবাবুর মহাভাগ্যোদয়ে তাঁহার ভবনে আজ সেই সৌন্দর্যের বিচিত্র সমাবেশ! পূজাসংক্রান্ত নানা কার্যের সুবন্দোবস্তে নিরন্তর ব্যস্ত থাকিলেও বাবু ও তাঁহার গৃহিণী যে ঐ ভাবসৌন্দর্য প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়া এক অব্যক্ত আনন্দে পূর্ণ হইতেছিলেন, একথা আর বলিতে হইবে না।

দিবসের পূজা শেষ হইল। তাঁহারাও কোনরূপে একটু সময় করিয়া 'বাবার' ও জগন্মাতার শ্রীচরণে মহানন্দে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

সন্ধ্যা সমাগতা। এইবার শ্রীশ্রীজগন্মাতার আরাত্রিক হইবে।

'বাবা' এখন অন্দরে বিচিত্রভাবে আবিষ্ট হইয়া তাঁহার পুরুষ-শরীরের কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন! কথায়, চেষ্টায় কেবলই প্রকাশ—যেন তিনি জন্মে-জন্মে যুগে যুগে শ্রীশ্রীজগন্মাতার দাসী বা সখী। জগদম্বাই তাঁহার প্রাণ-মন, সর্বস্বের সর্বস্ব; মা-র সেবার জন্যই তাঁহার দেহ ও জীবনধারণ। ঠাকুরের মুখমণ্ডল ভাবে প্রেমে সমুজ্জ্বল, অধরে মৃদু মৃদু হাসি, চক্ষের চাহনি, হাত-পা-নাড়া, অঙ্গভঙ্গী প্রভৃতি সমস্তই স্ত্রীলোকদিগের ন্যায়! ঠাকুরের পরিধানে মথুরবাবু-প্রদত্ত সুন্দর গরদের চেলি—স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় করিয়া পরিয়াছেন—কে বলিবে যে, তিনি পুরুষ! ঠাকুরের রূপ তখন বাস্তবিকই যেন ফাটিয়া পড়িত—এমন সুন্দর রং ছিল; ভাবাবেশে সেই রং আরও উজ্জ্বল হইয়া উঠিত, শরীর দিয়া যেন একটা জ্যোতিঃ বাহির হইত! সে রূপ দেখিয়া লোকে চক্ষু ফিরাইয়া লইতে পারিত না, অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিত! শ্রীশ্রীমা-র মুখে শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীঅঙ্গে যে স্বর্ণ-ইষ্টকবচখানি তখন সর্বদা ধারণ করিতেন, তাহার সোনার রঙে ও গায়ের রঙে যেন মেশামেশি হইয়া এক হইয়া যাইত! ঠাকুরের নিজ মুখেও শুনিয়াছি—"তখন তখন এমন রূপ হয়েছিল রে, যে লোকে চেয়ে থাকত; বুক মুখ সব সময় লাল হয়ে থাকত, আর গা দিয়ে যেন একটা জ্যোতিঃ বেরুত! লোকে চেয়ে থাকত বলে একখানা মোটা চাদর সর্বক্ষণ মুড়ি দিয়ে থাকতুম, আর মাকে বলতুম, 'মা, তোর বাহিরের রূপ তুই নে, আমাকে ভিতরের রূপ দে', গায়ে হাত বুলিয়ে বুলিয়ে চাপড়ে চাপড়ে

ঠাকুরের ভাব-সমাধি ও রূপ

বলতুম, 'ভিতরে ঢুকে যা, ভিতরে ঢুকে যা' ; তবে কতদিন পরে ওপরটা এই রকম মলিন হয়ে গেল।"

রূপের কথায় ঠাকুরের জীবনের আর একটি ঘটনা এখানে মনে আসিতেছে। এই সময় প্রতি বৎসর বর্ষার সময় ঠাকুর তিন-চারি মাস কাল জন্মভূমি কামারপুকুরে কাটাইয়া আসিতেন। কামারপুকুরে থাকিবার সময় মাঝে মাঝে শিওড় গ্রামে ভাগিনেয় হৃদয়ের বাড়িতেও যাইতেন। ঠাকুরের শ্বশুরালয় জয়রামবাটী গ্রামের ভিতর দিয়া শিওড়ে যাইবার পথ। সেখানকার লোকেরাও উপরোধ-অনুরোধ করিয়া ঠাকুরকে সেখানে কয়েক দিন এই অবসরে বাস করাইয়া লইতেন। ঠাকুরের পরম অনুগত ভক্ত ভাগিনেয় হৃদয় তখন সর্বদা ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া তাঁহার সর্বপ্রকার সেবা করিতেন।

কামারপুকুরে ঠাকুরের রূপ-গুণে জনতার কথা।

কামারপুকুরে থাকিবার কালে ঠাকুরকে দেখিবার ও তাঁহার মুখের দুটো কথা শুনিবার জন্য সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত গ্রামের স্ত্রী-পুরুষের ভিড় লাগিয়াই থাকিত। প্রত্যুষেই প্রতিবাসী স্ত্রীলোকেরা বাড়ির পাট-ঝাঁট সারিয়া স্নান করিয়া জল আনিবার জন্য কলসী কক্ষে লইয়া আসিতেন ও কলসীগুলি ঠাকুরের বাটীর নিকট হালদারপুকুরের পাড়ে রাখিয়া চাটুয্যেদের বাড়িতে আসিয়া বসিতেন ; এবং ঠাকুরের বাটীর মেয়েদের ও ঠাকুরের সহিত কথাবার্তায় এক-আধ ঘণ্টা কাল কাটাইয়া পরে স্নানে যাইতেন। এইরূপ নিত্য হইত। এই অবকাশে আবার কেহ কেহ রাত্রে বাটীতে কোন ভালমন্দ মিষ্টান্নাদি তৈয়ার করা হইলে, তাহার

অগ্রভাগ তুলিয়া রাখিয়া তাহা লইয়া আসিয়া ঠাকুরকে দিয়া যাইতেন। রঙ্গরসপ্রিয় ঠাকুর ইঁহারা রাত্রি প্রভাত হইতে না হইতে আসিয়া উপস্থিত হন দেখিয়া, কখন কখন রঙ্গ করিয়া বলিতেন—"শ্রীবৃন্দাবনে নানাভাবে নানা সময়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের মিলন হত—পুলিনে জল আনতে গিয়ে গোষ্ঠ-মিলন, সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর যখন গরু চরিয়ে ফিরতেন তখন গোধূলি-মিলন, তারপর রাত্রে রাসে মিলন—এই রকম, এই রকম সব আছে। তা, হাঁগা, এটা কি তোদের স্নানের সময়ের মিলন নাকি?" তাঁহারা ঠাকুরের কথা শুনিয়া হাসিয়া গড়াগড়ি দিতেন। মেয়েরা দিবসের রন্ধনাদি করিতে চলিয়া যাইবার পর পাড়ার পুরুষেরা ঠাকুরের নিকট আসিয়া যাহার যতক্ষণ ইচ্ছা বসিয়া কথাবার্তা কহিত। অপরাহ্নে আবার স্ত্রীলোকেরা আসিত এবং সন্ধ্যার পর রাত্রে আবার পুরুষদের কেহ কেহ আসিয়া উপস্থিত হইত। আর দূর-দূরান্তর হইতে যে সকল স্ত্রী-পুরুষেরা আসিত, তাহারা প্রায় অপরাহ্নেই আসিয়া সন্ধ্যার পূর্বেই চলিয়া যাইত। এইরূপে সমস্ত দিন রথ-দোলের ভিড় লাগিয়া থাকিত।

ঠাকুরের রূপ লইয়া ঘটনা ও তাঁহার দীনভাব

একবার কামারপুকুর হইতে ঐরূপে জয়রামবাটী ও শিওড় যাইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে। অনুক্ষণ ভাবসমাধিতে থাকায় ঠাকুরের অঙ্গ বালক বা স্ত্রীলোকের ন্যায় সুকোমল হইয়া গিয়াছিল। অল্প দূর হইলেও পাল্কি, গাড়ী ভিন্ন যাইতে পারিতেন না। সেজন্য জয়রামবাটী হইয়া শিওড় যাইবার জন্য পাল্কি আনা হইয়াছে। হৃদয় সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তুত। ঠাকুর আহারান্তে

পান খাইতে খাইতে লাল চেলি পরিয়া, হস্তে স্বর্ণ ইষ্ট-কবচ ধারণ করিয়া পাল্কিতে উঠিতে আসিলেন। দেখেন, রাস্তায় পাল্কির নিকটে ভিড় লাগিয়া গিয়াছে; চারিদিকে স্ত্রী-পুরুষ দাঁড়াইয়া আছে! দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন— "হৃদু, এত ভিড় কিসের রে?"

হৃদয়—কিসের আর? এই তুমি আজ ওখানে যাবে, (লোকদিগকে দেখাইয়া) এরা এখন আর তোমাকে কিছুদিন দেখতে পাবে না, তাই সব তোমায় দেখতে এসেছে।

ঠাকুর—আমাকে তো রোজ দেখে; আজ আবার কি নূতন দেখবে?

হৃদয়—এই চেলি পরে সাজলে গুজলে, পান খেয়ে তোমার ঠোঁট দু'খানি লাল টুকটুকে হলে খুব সুন্দর দেখায়; তাই সব দেখবে আর কি?

তাঁহার সুন্দর রূপে ইহারা আকৃষ্ট, শুনিয়াই ঠাকুরের মন এক অপূর্বভাবে পূর্ণ হইল। ভাবিলেন—হায় হায়! এরা সব এই দুই দিনের বাহিরের রূপটা লইয়াই ব্যস্ত, ভিতরে যিনি রহিয়াছেন, তাঁহাকে কেহ দেখিতে চায় না!

রূপে বিতৃষ্ণা তো তাঁহার পূর্ব হইতেই ছিল; এই ঘটনায় তাহা আরও সহস্রগুণে বর্ধিত হইল। বলিলেন—

"কি? একটা মানুষকে মানুষ দেখবার জন্য এত ভিড় করবে? যাঃ, আমি কোথাও যাব না। যেখানে যাব, সেইখানেই তো লোকে এই রকম ভিড় করবে?"—বলিয়াই ঠাকুর বাটীর ভিতরে নিজ কক্ষে যাইয়া কাপড়-চোপড় সব খুলিয়া ক্ষোভে

দুঃখে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। দীনভাবে পূর্ণ ঠাকুর সেদিন বাস্তবিকই জয়রামবাটী ও শিওড়ে যাইলেন না। হৃদয় ও বাটীর সকলে কত মতে বুঝাইল, সকলি ভাসিয়া গেল। আপনার শরীরটার উপর এ অলৌকিক পুরুষের যে কি তুচ্ছ, হেয় বুদ্ধি ছিল, তাহা একবার হে পাঠক, ভাবিয়া দেখ! আর ভাব আমাদের কথা, কি রূপ রূপ করিয়া পাগল!—কি মাজা-ঘষা, আর্শি, চিরুণী, ক্ষুর, ভাঁড়, বেসন, সাবান, এসেন্স, পোমেডের ছড়াছড়ি! আর পাশ্চাত্যের অনুকরণে 'হাড় মাসের খাঁচাটার' উপর নিত্য ভ্রমের বাড়াবাড়ি করিয়া একেবারে উৎসন্ন যাইবার হুড়াহুড়ি! পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিয়া শুদ্ধ পবিত্রভাবে পূর্ণ থাকা, আর এটা—দুই কি এক কথা হে বাপু? যাক্ আমরা জানবাজারের পূর্ব কথাই বলি।

ঠাকুরের সমাধি ভাঙ্গাইতে জগদম্বা দাসীর কৌশল

জগদম্বার আরাত্রিক আরম্ভ হয় হয়, ঠাকুরের কিন্তু সে ভাব আর ভাঙ্গে না! মথুরবাবুর পত্নী শ্রীমতী জগদম্বা দাসী ঠাকুরকে কোনরূপে প্রকৃতিস্থ করিয়া বাটীর স্ত্রীলোকদিগের সহিত আরতি দেখিতে যাইবেন মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশের বিরাম নাই দেখিয়া এবং তাঁহাকে একাকী ফেলিয়া যাওয়াটা যুক্তিসঙ্গত নয় ভাবিয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হইলেন। ভাবিলেন—করি কি? আমি যাহাকেই রাখিয়া চলিয়া যাইব, একবার আরতির বাজনা বাজিয়া উঠিলেই সে নিশ্চয়ই তথায় ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিবে। আর 'বাবা'ও তো ভাবে বিহ্বল হইলে নিজেকে নিজে সামলাইতে পারেন না। একবার তো ঐরূপে বাহ্যজ্ঞানশূন্য অবস্থায় গুলের আগুনের উপর

পড়িয়া যাইয়াও হুঁশ হয় নাই—পরে সে ঘা কতদিনে কত চিকিৎসায় সারিয়াছে। একাকী রাখিয়া যাইলে এ আনন্দের দিনে পাছে ঐরূপ একটা বিভ্রাট হয়—তখন উপায়? কর্তাই বা কি বলিবেন? এইরূপ নানা চিন্তা করিতে করিতে হঠাৎ তাঁহার মনে একটা উপায় আসিয়া জুটিল। তাড়াতাড়ি নিজের বহুমূল্য গহনাসকল বাহির করিয়া বাবাকে পরাইতে পরাইতে তাঁহার কানের গোড়ায় বার বার বলিতে লাগিলেন, 'বাবা, চল; মার যে আরতি হইবে, মাকে চামর করিবে না?'

ঠাকুরের সমাধি হইতে সাধারণ অবস্থায় নামিবার প্রকার শাস্ত্রসম্মত

ভাবাবেশে ঠাকুর যতই কেন বাহ্যজ্ঞানশূন্য হউন না, যে মূর্তি ও ভাবে তাঁহার মন সমাধিস্থ হইয়াছে, তাহা ছাড়া অপর সকল বস্তু, ব্যক্তি ও ভাব-সম্বন্ধ হইতে তাঁহার মন যতই কেন দূরে যাইয়া পড়ুক না, এটা কিন্তু সকল সময়েই দেখা গিয়াছে যে, ঐ মূর্তির নাম বা ঐ মূর্তির ভাবের অনুকূল কথা কয়েকবার ঠাকুরের কানের কাছে বলিলেই, তখনই তাঁহার মন উহাতে আকৃষ্ট হইত এবং উহা ধরিতে বুঝিতে সক্ষম হইত। একাগ্রচিত্তের নিয়ম ও আচরণ যে ঐরূপ হইয়া থাকে, তাহা মহামুনি পতঞ্জলি প্রভৃতির যোগশাস্ত্রে সবিস্তার না হউক সাধারণভাবে লিপিবদ্ধ আছে। অতএব শাস্ত্রজ্ঞ পাঠকের ঠাকুরের মনের ঐরূপ আচরণের কথা বুঝিতে বিলম্ব হইবে না। আর বহু পুণ্যফলে যাঁহারা কিছুমাত্রও চিত্তের একাগ্রতা জীবনে লাভ বা অনুভব করিয়াছেন, তাঁহারা আরও সহজে এ কথা বুঝিতে পারিবেন। অতএব আমরা প্রকৃত ঘটনারই অনুসরণ করি।

মথুরবাবুর পত্নীর কথা ঠাকুরের কর্ণে প্রবেশ করিল। অমনি তিনি অনেকটা প্রকৃতিস্থ হইয়া অর্ধ-বাহ্যদশায় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া তাহার সঙ্গে চলিলেন। তাঁহারা ঠাকুর-দালানে পৌঁছিবামাত্র আরতি আরম্ভ হইল। ঠাকুরও স্ত্রীগণপরিবৃত হইয়া চামরহস্তে প্রতিমাকে বীজন করিতে লাগিলেন। দালানের এক দিকে স্ত্রীলোকেরা এবং অপর দিকে মথুরবাবু-প্রমুখ পুরুষেরা দাঁড়াইয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার আরতি দেখিতে লাগিলেন। সহসা মথুরবাবুর নয়ন স্ত্রীলোকদিগের দিকে পড়িবামাত্র দেখিলেন, তাঁহার পত্নীর পার্শ্বে বিচিত্রবস্ত্রভূষণে অদৃষ্টপূর্ব সৌন্দর্য বিস্তার করিতে করিতে কে দাঁড়াইয়া চামর করিতেছেন! বার বার দেখিয়াও যখন বুঝিতে পারিলেন না তিনি কে, তখন ভাবিলেন, হয়তো তাঁহার পত্নীর পরিচিতা কোন সঙ্গতিপন্ন লোকের গৃহিণী নিমন্ত্রিতা হইয়া আসিয়াছেন।

সখীভাবে ঠাকুরের ৺দুর্গা দেবীকে চামর করা

আরতি সাঙ্গ হইল। অন্তঃপুরবাসিনীরা শ্রীশ্রীজগদম্বাকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নির্দিষ্টস্থানে চলিয়া গেলেন ও নিজ নিজ কার্যে ব্যাপৃতা হইলেন। ঠাকুরও ঐরূপ অর্ধবাহ্য অবস্থায় মথুরবাবুর পত্নীর সহিত ভিতরে যাইলেন এবং ক্রমে সম্পূর্ণ সাধারণ ভাবে প্রকৃতিস্থ হইয়া অলঙ্কারাদি খুলিয়া রাখিয়া বাহিরে পুরুষদিগের নিকট আসিয়া বসিলেন, ও নানা ধর্মপ্রসঙ্গ তুলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা সকলকে সরলভাবে বুঝাইয়া সকলের চিত্তহরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ পরে মথুরবাবু কার্যান্তরে অন্দরে গিয়া কথায় কথায়

তাঁহার পত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আরতির সময় তোমার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া কে চামর করিতেছিলেন?" মথুরবাবুর পত্নী তাহাতে হাসিয়া বলিলেন, "তুমি চিনিতে পার নাই? বাবা ভাবাবস্থায় ঐরূপে চামর করিতেছিলেন। তা হইতেই পারে, মেয়েদের মত কাপড়-চোপড় পরিলে বাবাকে পুরুষ বলিয়া মনে হয় না।" এই বলিয়া মথুরবাবুকে আদ্যোপান্ত সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিলেন। মথুরবাবু একেবারে অবাক হইয়া বলিলেন, "তাইতো বলি—সামান্য বিষয়েও না ধরা দিলে বাবাকে চেনে কার সাধ্য? দেখ না, চব্বিশ ঘণ্টা দেখে ও একত্র থেকেও তাঁকে আজ চিনতে পারলুম না।"

মথুরের তাঁহাকে ঐ অবস্থায় চিনিতে না পারিয়া জিজ্ঞাসা

সপ্তমী, অষ্টমী ও নবমী পরমানন্দে কাটিয়া গিয়াছে। আজ বিজয়া দশমীর প্রাতঃকাল। পুরোহিত তাড়াতাড়ি শ্রীশ্রীজগদম্বার সংক্ষেপ পূজা সারিয়া লইতেছে, কারণ, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে দর্পণ-বিসর্জন করিতে হইবে। পরে সন্ধ্যার পর প্রতিমাবিসর্জন। মথুরবাবুর বাটীর সকলেরই মনে যেন একটা বিষাদের ছায়া—কিসের যেন একটা অব্যক্ত অপরিস্ফুট অভাব—যেন একটা হৃদয়ের অতি প্রিয় বস্তু বা ব্যক্তির সহিত অপরিহার্য আশু বিচ্ছেদাশঙ্কা! পৃথিবীর অতি বিশুদ্ধ আনন্দের পশ্চাতেও এইরূপ একটা বিষাদছায়া সর্বদা সংলগ্ন আছে। এই নিয়মের বশেই বোধ হয় অতি বড় ঈশ্বর-প্রেমিকের জীবনেও সময়ে সময়ে অসহ্য ঈশ্বরবিরহের সন্তাপ আসিয়া উপস্থিত হয়। আর কঠিন মানব, আমাদের হৃদয়ও

বিজয়া দশমী

বিজয়ার দিনে প্রতিমাবিসর্জন দিতে যাইয়া উষ্ণ অশ্রু বর্ষণ করে! মথুর-পত্নীর তো কথাই নাই—আজ প্রাতঃকাল হইতে হস্তে কর্ম করিতে করিতে অঞ্চলে অনেকবার নয়নাশ্রু মুছিয়া চক্ষু পরিষ্কার করিয়া লইতে হইতেছে।

মথুরের আনন্দে ঐ বিষয়ে হুঁশ না থাকা

বাহিরে মথুরবাবুর কিন্তু অত্যকার কথা এখনও ধারণা হয় নাই। তিনি পূর্ববৎই আনন্দে উৎফুল্ল! শ্রীশ্রীজগদম্বাকে গৃহে আনিয়া এবং 'বাবা'র অলোকসামান্য সঙ্গ ও অচিন্ত্য কৃপাবলে তিনি আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপনাতে আপনি ভরপুর হইয়া রহিয়াছেন। বাহিরে কি হইবে না হইবে, তাহা এখন খোঁজে কে? খুঁজিবার আবশ্যকই বা কি? মাকে ও বাবাকে লইয়া এইরূপেই দিন কাটিবে। এমন সময় পুরোহিতের নিকট হইতে সংবাদ আসিল—এইবার মা-র বিসর্জন হইবে, বাবুকে নীচে আসিয়া মাকে প্রণাম বন্দনাদি করিয়া যাইতে বল।

দেবীমূর্তি বিসর্জন দিবে না বলিয়া মথুরের সংকল্প

কথাটা মথুরবাবু প্রথম বুঝিতেই পারিলেন না। পুনরায় জিজ্ঞাসা করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, তখন তাঁহার হুঁশ হইল—আজ বিজয়া দশমী! আর সেই জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে এক বিষম আঘাত পাইলেন। শোকে দুঃখে পূর্ণ হইয়া ভাবিতে লাগিলেন, "আজ মাকে বিসর্জন দিতে হইবে—কেন? বাবা ও মা-র কৃপায় আমার তো কিছুরই অভাব নাই। মনের আনন্দের যেটুকু অভাব ছিল, তাহা তো বাড়িতে মা-র শুভাগমনে পূর্ণ হইয়াছে। তবে আবার কেন মাকে বিসর্জন দিয়া

বিষাদ ডাকিয়া আনি? না, এ আনন্দের হাট আমি ভাঙ্গিতে পারিব না। মা-র বিসর্জন, মনে হইলেও যেন প্রাণ কেমন করিয়া উঠে!" এরূপ নানা কথা ভাবিতে ও অশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

এদিকে সময় উত্তীর্ণ হয়। পুরোহিত লোকের উপর লোক পাঠাইতেছেন, বাবু একবার আসিয়া দাঁড়ান, মা-র বিসর্জন হইবে। মথুর বিষম বিরক্ত হইয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "আমি মাকে বিসর্জন দিতে দিব না। যেমন পূজা হইতেছে, তেমনি পূজা হইবে। আমার অনভিমতে যদি কেহ বিসর্জন দেয় তো বিষম বিভ্রাট হইবে—খুনোখুনি পর্যন্ত হইতে পারে।" এই বলিয়া মথুরবাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া রহিলেন। ভৃত্য বাবুর ঐরূপ ভাবান্তর দেখিয়া সভয়ে সরিয়া দাঁড়াইল এবং পূজার দালানে যাইয়া সকল কথা পুরোহিত মহাশয়কে জানাইল। সকলে অবাক!

তখন সকলে পরামর্শ করিয়া বাবু বাটীর ভিতরে যাঁহাদের সম্মান করিতেন, তাঁহাদের বুঝাইতে পাঠাইলেন। তাঁহারাও যাইলেন, বুঝাইলেন, কিন্তু বাবুর সে ভাবান্তর দূর করিতে পারিলেন না। বাবু তাঁহাদের কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিলেন, "কেন? আমি মা-র নিত্যপূজা করিব। মা-র কৃপায়, আমার যখন সে ক্ষমতা আছে তখন কেন বিসর্জন দিব?" কাজেই তাঁহারা আর কি করেন, বিমর্ষভাবে ফিরিয়া আসিয়া সিদ্ধান্ত করিলেন—মাথা খারাপ হইয়াছে! কিন্তু ঐরূপ সিদ্ধান্ত করিলেই বা উপায় কি? হঠকারী মথুরকে বাটীর সকলেরই ভালরকম জানা ছিল। সকলেই

সকলে বুঝাইলেও মথুরের উত্তর

জানিত, ক্রুদ্ধ হইলে বাবুর দিক্-বিদিক্-জ্ঞান থাকে না। কাজেই তাঁহার অনভিমতে দেবীর বিসর্জনের হুকুম দিয়া কে তাঁহার কোপে পড়িবে বল? সে বিষয়ে কেহই অগ্রসর হইলেন না। গিন্নীর নিকট অতিরঞ্জিত হইয়া সংবাদ পৌঁছিল; তিনি ভয়ে ডরে অভিভূতা হইয়া ঠাকুরকে বুঝাইয়া বলিতে অনুরোধ করিলেন; কারণ, 'বাবা' ভিন্ন তাঁহাদের বিপদ হইতে উদ্ধার করিবার আর কে আছে?—বাবুর যদি বাস্তবিকই মাথা খারাপ হইয়া থাকে।

ঠাকুরের মথুরকে বুঝান

ঠাকুর যাইয়াই দেখিলেন, মথুরের মুখ গম্ভীর, রক্তবর্ণ, দুই চক্ষু লাল এবং কেমন যেন উন্মনা হইয়া ঘরের ভিতর বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই মথুর কাছে আসিলেন এবং বলিলেন, "বাবা, যে যাহাই বলুক, আমি মাকে প্রাণ থাকিতে বিসর্জন দিতে পারিব না। বলিয়া দিয়াছি, নিত্যপূজা করিব। মাকে ছাড়িয়া কেমন করিয়া থাকিব?"

ঠাকুর তাঁহার বুকে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "ওঃ—এই তোমার ভয়? তা মাকে ছেড়ে তোমায় থাকতে হবে কে বল্লে? আর বিসর্জন দিলেই বা তিনি যাবেন কোথায়? ছেলেকে ছেড়ে মা কি কখন থাকতে পারে? এ তিন দিন বাইরে দালানে ব'সে তোমার পূজা নিয়েছেন, আজ থেকে তোমার আরও নিকটে থেকে—সর্বদা তোমার হৃদয়ে ব'সে তোমার পূজা নেবেন।"

কি এক অদ্ভুত মোহিনী শক্তিই যে ঠাকুরের স্পর্শে ও কথায়

ছিল, তাহা বলিয়া বুঝান কঠিন! দেখা গিয়াছে, অনেক সময় লোকে আসিয়া তাঁহার সহিত কোন বিষয়ে বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া খুব তর্ক করিতেছে—তাঁহার সিদ্ধান্ত কিছুতেই লইতেছে না, ঠাকুর তখন কৌশলে কোনরূপে তাহার অঙ্গস্পর্শ করিয়া দিতেন; আর অমনি তখন হইতে তাহার মনের স্রোত যেন ফিরিয়া যাইত এবং ঐ ব্যক্তি কথাটা গুটাইত—ঠাকুরের কথা বা সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ মানিয়া লইয়া! ঐ বিষয়ে তিনি আমাদের কাহারও কাহারও নিকট বলিয়াছেনও—"কথা কইতে কইতে অমন করে ছুঁয়ে দি কেন জানিস? যে শক্তিতে ওদের অমন গোঁ-টা থাকে, সেইটের জোর কমে গিয়ে ঠিক ঠিক সত্য বুঝতে পারবে বলে।" এইরূপে স্পর্শমাত্রেই অপরের যথার্থ সত্য উপলব্ধি করিবার পথের অন্তরায়স্বরূপে দণ্ডায়মান শক্তিসমূহকে নিজের ভিতর টানিয়া লইয়া তাহাদের প্রভাব কমাইয়া দেওয়া বা ঐ সকলকে চিরকালের মত একেবারে হরণ করার সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত ঠাকুরের জীবনে দেখিয়াছি ও শুনিয়াছি। দেখিয়াছি, যে সকল কথা অপরের মুখ হইতে বাহির হইয়া কাহারও মনে কোনরূপ ভাবোদয় করিল না, সেই সকলই আবার তাঁহার মুখনিঃসৃত হইয়া মানবহৃদয়ে এমন অদম্য আঘাত করিয়াছে যে, সেইক্ষণ হইতে শ্রোতার জীবনের গতি পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে! সে সকল পাঠককে সবিস্তারে বলিবার অন্য কোন সময় চেষ্টা করিব। এখন মথুরবাবুর কথাই বলিয়া যাই।

ঠাকুরের কথা ও স্পর্শের অদ্ভুত শক্তি

ঠাকুরের কথায় ও স্পর্শে মথুর ক্রমে প্রকৃতিস্থ হইলেন।

তাঁহার ঐরূপে প্রকৃতিস্থ হওয়া, ঠাকুরের ইচ্ছা এবং স্পর্শে কোনরূপ দর্শনাদি হইয়াছিল কি না, তাহা আমাদের জানা নাই। তবে মনে হয়, উহাই সম্ভব। মনে হয়, শ্রীশ্রীজগদম্বার মূর্তি তাঁহার হৃদয়কন্দর অপূর্ব আলোকে উজ্জ্বল করিয়া বিদ্যমান—দেখিতে পাইয়াই তাঁহার আনন্দ আরও শতগুণে উচ্ছলিত হইয়া উঠিয়া বাহিরের প্রতিমা রক্ষা করিবার মনে যে ঝোঁক উঠিয়াছিল, তাহা কমিয়া গিয়াছিল। যথার্থ গুরু এইরূপে উচ্চতর লক্ষ্যের উজ্জ্বল ছটায় শিষ্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া দেন। কাজেই তখন নিম্নাঙ্গের ভাব দর্শনাদি তাহার মন হইতে আপনা আপনি খসিয়া যায়।

মথুর প্রকৃতিস্থ কিরূপে হইয়াছিল

মথুরের ভক্তি বিশ্বাস আমাদের চক্ষে অদ্ভুত বলিয়া প্রতীত হইলেও উহা যে নানারূপে ঠাকুরকে যাচাইবার ফলেই উপস্থিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। মথুর ধন দিয়া, সুন্দরী রমণী দিয়া, নিজের ও বাটীর সকলের উপর অকুণ্ঠ প্রভুতা দিয়া, ঠাকুরের আত্মীয়বর্গ—যথা, হৃদয় প্রভৃতির জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিয়া, সকল ভাবে ঠাকুরকে যাচাইয়া দেখিয়াছিলেন—ইনি অপর সাধারণের ন্যায় বাহিক কিছুতেই ভুলেন না। বাহিক ভাব-ভক্তির কপটাবরণ ইঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টির কাছে অধিকক্ষণ আত্মগোপন করিয়া রাখিতে পারে না! আর নরহত্যাদি দুষ্কর্ম করিয়াও মন-মুখ এক করিয়া যথার্থ সরলভাবে যদি কেহ ইঁহার শরণ গ্রহণ করে, তবে তাহার সাত খুন মাপ করিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করেন, দিন দিন উচ্চ

মথুরের ভক্তি-বিশ্বাসের অবিচলতা—ঠাকুরকে পরীক্ষার ফলে

লক্ষ্য চিনিবার ও ধরিবার সামর্থ্য দেন এবং কি এক বিচিত্র শক্তিবলে তাহার জন্য অসম্ভবও সম্ভব হইয়া দাঁড়ায়!

মথুরের ভাব-সমাধি-লাভের ইচ্ছা

ঠাকুরের সঙ্গে থাকিয়া এবং ভাবসমাধিতে তাঁহার অসীম আনন্দানুভব দেখিয়া বিষয়ী মথুরেরও এক সময়ে ইচ্ছা হইয়াছিল, ব্যাপারটা কি একবার দেখিবে ও বুঝিবে। মথুরের তখন হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা হইয়াছে, 'বাবা ইচ্ছামাত্রেই ওসকল করিয়া দিতে পারেন। কারণ, শিব বল, কালী বল, ভগবান্ বল, কৃষ্ণ বল, রাম বল—সবই তো উনি নিজে!—তবে আর কি! কৃপা করিয়া কাহাকেও নিজের কোন মূর্তি যে দেখাইতে পারিবেন, ইহার আর বিচিত্র কি!' বাস্তবিক ইহা এক কম অদ্ভুত ব্যাপার নহে। ঠাকুরের দর্শনলাভের পর যাহারাই তাঁহার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়াছে, তাহাদেরই ক্রমে ক্রমে এইরূপ ধারণার উদয় হইত! সকলেরই মনে হইত, উঁহার ইচ্ছায় অসম্ভবও সম্ভব হয়—উনি ইচ্ছামাত্রেই ধর্মজগতের সমস্ত সত্যই কাহাকেও উপলব্ধি করাইয়া দিতে পারেন। আধ্যাত্মিক শক্তি ও নিজ পূত চরিত্রবলে একজনের প্রাণেও ঐরূপ ভাবের উদয় করিতে পারা কঠিন—তো অনেকের প্রাণে! উহা কেবল এক অবতার-পুরুষেই সম্ভবে। তাঁহাদের অবতারত্বের বিশিষ্ট প্রমাণসমূহের মধ্যে ইহা একটি কম প্রমাণ নহে। আর, এ মিথ্যা, শঠতা ও প্রতারণার রাজ্যে তাঁহাদের নামে অনেক ভেল জুয়াচুরি চলিবে দেখিতে পাইয়াই, তাঁহারা সকলের সমক্ষে ডঙ্কা মারিয়া বলিয়া যান, "আমার অদর্শনের পর অনেক ভণ্ড 'আমি অবতার, আমি দুর্বল জীবের শরণ ও

মুক্তিদাতা' বলিয়া তোমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে; সাবধান, তাহাদের কথায় ভুলিও না।"[১]

মথুরের মনে ঐরূপ ভাবের উদয় হইবামাত্র ঠাকুরকে যাইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বাবা, আমার যাহাতে ভাবসমাধি হয়, তাহা তোমায় করিয়া দিতেই হইবে।" ঠাকুর ঐরূপ স্থলে সকল সময়েই যেমন বলিতেন, সেইরূপই বলিয়াছিলেন, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। বলিলেন, "ওরে, কালে হবে, কালে হবে। একটা বিচি পুঁতবামাত্রই কি গাছ হয়ে তার ফল খেতে পাওয়া যায়? কেন, তুই তো বেশ আছিস—এদিক-ওদিক দুদিক চলছে। ও সব হলে এদিক (সংসার) থেকে মন উঠে যাবে, তখন তোর বিষয়-আশয় সব রক্ষা করবে কে? বার ভূতে সব যে লুটে খাবে! তখন কি করবি?"

ঐজন্য ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা

ও সব কথা সেদিন শুনে কে? মথুর একেবারে 'না ছোড়-বান্দা'—'বাবা'কে ভাবসমাধি করিয়া দিতেই হইবে। ঐরূপ বুঝানয় ফল হইল না দেখিয়া ঠাকুর আর এক গ্রাম চড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "ওরে, ভক্তেরা কি দেখতে চায়? তারা সাক্ষাৎ সেবাই চায়। দেখলে শুনলে (ঈশ্বরের) ঐশ্বর্যজ্ঞানে ভয় আসে, ভালবাসা চাপা পড়ে। শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলে গোপীরা বিরহে আকুল! শ্রীকৃষ্ণ তাদের অবস্থা জেনে উদ্ধবকে বুঝাতে পাঠালেন। উদ্ধব জ্ঞানী কি না! বৃন্দাবনের কান্নাকাটি

উদ্ধব ও গোপীদের দৃষ্টান্তে ঠাকুরের তাহাকে বুঝান

[১] ঈশা—(Mathew XXIV—11, 23, 24, 25, 26)

ভাব, খাওয়ান, পরান ইত্যাদি উদ্ধব বুঝতে পারত না। গোপীদের শুদ্ধ ভালবাসাটাকে মায়িক ও ছোট ব'লে দেখত; তারও দেখে শুনে শিক্ষা হবে, সেও এক কথা। উদ্ধব গিয়ে গোপীদের বুঝাতে লাগল—'তোমরা সব কৃষ্ণ, কৃষ্ণ ব'লে অমন কেন করছ? জান তো, তিনি ভগবান, সর্বত্র আছেন, তিনি মথুরায় আছেন আর বৃন্দাবনে নেই, এটা তো হ'তে পারে না। অমন করে হা-হুতাশ না ক'রে একবার চক্ষু মুদে দেখ দেখি, দেখবে, তোমাদের হৃদয়মাঝে সেই নবঘনশ্যাম মুরলীবদন বনমালী সর্বদা রয়েছেন',—ইত্যাদি। তাই শুনে গোপীরা বলেছিল, "উদ্ধব, তুমি কৃষ্ণসখা, জ্ঞানী, তুমি এ সব কি কথা বোলচো! আমরা কি ধ্যানী, না জ্ঞানী, না ঋষি-মুনির মত জপ-তপ ক'রে তাঁকে পেয়েছি? আমরা যাঁকে সাক্ষাৎ সাজিয়েছি-গুজিয়েছি, খাইয়েছি, পরিয়েছি, ধ্যান ক'রে তাঁকে আবার ঐ সব করতে যাব? আমরা তা কি আর করতে পারি? যে মন দিয়ে ধ্যান-জপ করব, সে মন আমাদের থাকলে তো তা দিয়ে ঐ সব করব! সে মন যে অনেক দিন হ'ল, কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করেছি! আমাদের বলতে আমাদের কি আর কিছু আছে যে, তাইতে অহং-বুদ্ধি ক'রে জপ কোরবো?' উদ্ধব তো শুনে অবাক্! তখন সে গোপীদের কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসা যে কত গভীর ও কি বস্তু, তা বুঝতে পেরে তাদের গুরু ব'লে প্রণাম ক'রে চ'লে এল! এতেই দেখ না, ঠিক ঠিক ভক্ত কি তাঁকে দেখতে চায়? তাঁর সেবাতেই তার পরমানন্দ। তার অধিক—দেখা, শুনা, সে চায় না; তাতে তার ভাবের হানি হয়।"

ইহাতেও যখন মথুর বুঝিলেন না, তখন ঠাকুর বলিলেন, "তা কি জানি বাবু? মাকে বলব, তিনি যা হয় করবেন।"

তাহার কয়েক দিন পরেই মথুরের একদিন ভাবসমাধি! ঠাকুর বলিতেন, "আমাকে ডেকে পাঠিয়েছে। গিয়ে দেখি, যেন সে মানুষ নয়! চক্ষু লাল, জল পড়ছে; ঈশ্বরীয় কথা কইতে কইতে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্চে! আর বুক থর থর ক'রে কাঁপচে। আমাকে দেখে একেবারে পা-দুটো জড়িয়ে ধ'রে বল্লে, 'বাবা, ঘাট্ হয়েছে! আজ তিন দিন ধ'রে এই রকম, বিষয়কর্মের দিকে চেষ্টা করলেও কিছুতে মন যায় না! সব খানে খারাপ হ'য়ে গেল। তোমার ভাব তুমি ফিরিয়ে নাও, আমার চাই নে।' বল্লুম—'কেন? তুই যে ভাব হোক, বলেছিলি?' তখন সে বল্লে, 'বলেছিলুম, আনন্দও আছে; কিন্তু হ'লে কি হয়, এদিকে যে সব যায়। বাবা, ও তোমার ভাব তোমাকেই সাজে। আমাদের ওসবে কাজ নেই! ফিরিয়ে নাও।' তখন আমি হাসি আর বলি, 'তোকে তো একথা আগেই বলেছি?' সে বল্লে, 'হাঁ বাবা, কিন্তু তখন কি অত-শত জানি যে, ভূতের মত এসে ঘাড়ে চাপবে? আর তার গোঁয়ে আমায় চব্বিশ ঘণ্টা ফিরতে হবে?' —ইচ্ছা করলেও কিছু করতে পারবো না!' তখন তার বুকে আবার হাত বুলিয়ে দি!"

মথুরেব ভাবসমাধি হওয়া ও প্রার্থনা।

বাস্তবিক ভাব বা সমাধি হইলেই হয় না। উহার বেগ সহ্য করিতে—উহাকে রক্ষা করিতে পারে কয়টা লোক? এতটুকু বাসনার পশ্চাৎ-টান থাকিতে উহা পারা অসম্ভব। ঈশ্বরীয়

পথের পথিককে শাস্ত্র সেজন্যই পূর্ব হইতে নির্বাসনা হইতে বলিয়াছেন—'ত্যাগেনৈকেনামৃতত্বমানশুঃ'—একমাত্র ত্যাগ বৈরাগ্যই অমৃতত্ব দিতে সমর্থ। ক্ষণিক ভাবোচ্ছ্বাসে নিম্নাঙ্গের সমাধি হইল, কিন্তু ভিতরে ধন হোক, মান হোক, ইত্যাদি বাসনার রাশি গজ গজ করিতেছে, এরূপ লোকের ঐ ভাব কখনই স্থায়ী হয় না। আচার্য শঙ্কর যেমন বলিয়াছেন—

ত্যাগী না হইলে ভাবসমাধি স্থায়ী হয় না

> আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষুন্ ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
> আশাগ্রাহো মজ্জয়তেঽন্তরালে, নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্য বেগাৎ॥
>
> —বিবেকচূড়ামণি, ৭৯

অর্থাৎ, যথার্থ বৈরাগ্যরূপ সম্বল অগ্রে সংগ্রহ না করিয়া, ভবসমুদ্রের পারে যাইবার জন্য যাহারা অগ্রসর হয়, বাসনা-কুম্ভীর তাহাদের ঘাড়ে ধরিয়া ফিরাইয়া বলপূর্বক অতলজলে ডুবাইয়া দেয়।

ঐ বিষয়ের কাশীপুরের বাগানে আনীত জনৈক ভক্ত-যুবকের কথা

—বাস্তবিক, কতই না ঐরূপ দৃষ্টান্ত আমরা ঠাকুরের নিকট দেখিয়াছি! কাশীপুরের বাগানে ঠাকুর তখন অবস্থান করিতেছেন; একদিন কয়েকজন বৈষ্ণব ভক্ত একটি উন্মনা যুবককে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত। ইঁহাদের পূর্বে কখন আসিতে আমরা দেখি নাই। আসিবার কারণ, সঙ্গী যুবকটিকে একবার ঠাকুরকে দেখাইবেন এবং তাঁহার আধ্যাত্মিক কি অবস্থা সহসা উপস্থিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে ঠাকুরের মতামত শ্রবণ করিবেন। ঠাকুরের নিকট সংবাদ দেওয়া গেল।

যুবকটিকে দেখিলাম—বুক ও মুখ লাল, দীনভাবে সকলের পদধূলি গ্রহণ করিতেছে; ভগবানের নামে ঘন ঘন কম্পন ও পুলক; এবং দুনয়নে অবিশ্রান্ত জলধারা বহায় চক্ষুদ্বয় রক্তিম ও কিঞ্চিৎ স্ফীতও হইয়াছে। দেখিতে শ্যামবর্ণ, না স্থূল, না কৃশ, মুখমণ্ডল ও অবয়বাদি সুশ্রী এ সুগঠিত, মস্তকে শিখা। পরিধানে একখানি মলিন সাদাধুতি, গায়ে উত্তরীয় ছিল না বলিয়াই মনে হয়; পায়ে জুতা নাই; এবং শরীর-সংস্কার বা রক্ষার বিষয়ে একেবারে উদাসীন! শুনিলাম—হরিসংকীর্তন করিতে করিতে একদিন সহসা এইরূপ উত্তেজিত অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। তদবধি আহার এক প্রকার নাই বলিলেই হয়, নিদ্রা নাই এবং ভগবানলাভ হইল না বলিয়া দিবারাত্র কান্নাকাটি ও ভূমে গড়াগড়ি! আজ কয়েক দিন হইল, ঐরূপ হইয়াছে।

আধ্যাত্মিক ভাবসমূহের আতিশয্যে মানবশরীরে যে সকল বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তদ্বিষয় ধরিবার ও চিনিবার শক্তি ঠাকুরের যেমন দেখিয়াছি, এমন আর কুত্রাপি দেখি নাই! গুরুগীতাদিতে শ্রীগুরুকে 'ভবরোগ-বৈদ্য' ইত্যাদি শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে; তাহার ভিতর যে এত গূঢ় অর্থ আছে, তাহা ঠাকুরের পুণ্যদর্শনলাভের পূর্বে একটুও বুঝি নাই। শ্রীগুরু যে বাস্তবিকই মানসিক রোগের বৈদ্য, এবং ভিন্ন ভিন্ন আধ্যাত্মিকভাবে মানবমনে যে যে বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা দেখিবামাত্র চিনিয়া, লক্ষণ দেখিয়া ধরিয়া অনুকূল হইলে—উহা যাহাতে সাধকের মনে সহজ হইয়া দাঁড়ায় ও

আধ্যাত্মিক ভাবের আতিশয্যে উপস্থিত বিকার-সকল চিনিবার ঠাকুরের শক্তি। গুরু যথার্থই ভবরোগ-বৈদ্য

তাহাকে উচ্চতর ভাবসোপানে আরোহণ করিবার ক্ষমতা দেয়, তাহার এরূপে ব্যবস্থা করিয়া দেন এবং প্রতিকূল বুঝিলে তাহা যাহাতে সাধকের অনিষ্টসাধন না করিয়া ধীরে ধীরে অপনীত হইয়া যায়, তদ্বিষয়েরও ব্যবস্থা করেন, একথা পূর্বে কিছুই জানা ছিল না। ঠাকুরকে প্রতিদিন ঐরূপ করিতে দেখিয়াই মনে সে কথার দৃঢ় ধারণা হইয়াছে। দেখিয়াছি—পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দের প্রথম নির্বিকল্প সমাধিলাভ হইলে অমনি ঠাকুর ব্যবস্থা করিতেছেন, "তুই এখন কয়েকদিন কাহার হাতে খাস নি, নিজে রেঁধে খাস। এ অবস্থায় বড় জোর নিজের মার হাতে খাওয়া চলে, অপর কারও হাতে খেলেই ঐ ভাব নষ্ট হয়ে যায়! পরে ঐটে সহজ হয়ে দাঁড়ালে, তখন আর ভয় নেই।" গোপালের মার বায়ুবৃদ্ধিতে শারীরিক যন্ত্রণা দেখিয়া বলিতেছেন, "ও যে তোমার হরি-বাই, ও গেলে কি নিয়ে থাকবে? ও থাকা চাই; তবে যখন বিশেষ কষ্ট হবে, তখন যা হোক কিছু খেও।" জনৈক ভক্তের বাহ্যিক শৌচে অত্যন্ত অভ্যাস ও অনুরাগের জন্য শবার ভুলিয়া মন একেবারে ঈশ্বরে তন্ময় হয় না দেখিয়া গোপনে ব্যবস্থা করিতেছেন, "লোকে যেখানে মল-মূত্র ত্যাগ করে, সেইখানকার মাটিতে তুমি একদিন ফোঁটা পরে ঈশ্বরকে ডেকো।" একজনের সংকীর্তনে উদ্দাম শারীরিক বিকার তাহার উন্নতির প্রতিকূল দেখিয়া তিরস্কার করিয়া বলিতেছেন, "শালা, আমায় ভাব দেখাতে এসেছেন। ঠিক ঠিক ভাব হ'লে কখন এমন হয়? ডুবে যায়; স্থির হয়ে যায়। ও কি? স্থির হ, শান্ত হ'য়ে যা। (অপর সকলকে লক্ষ্য করিয়া) এ সব কেমন ভাব

জান? যেমন এক ছটাক দুধ কড়ায় ক'রে আগুনে বসিয়ে ফোটাচ্চে; মনে হচ্চে, যেন কতই দুধ, এক কড়া; তারপর নামিয়ে দেখ, একটুও নেই; যেটুকু দুধ ছিল, সব কড়ার গায়েই লেগে গেছে।' একজনের মনোভাব বুঝিয়া বলিতেছেন, 'যাঃ শালা, খেয়ে লে, প'রে লে, সব ক'রে লে, কিন্তু কোনটাই ধর্ম কচ্চিস ব'লে করিস নি" ইত্যাদি কত লোকের কত কথাই বা বলিব!

ঐ যুবকের অবস্থা সম্বন্ধে ঠাকুরের মীমাংসা

সেই যুবককে দেখিয়াই এক্ষেত্রে ঠাকুর বলিলেন, "এ যে দেখচি মধুর ভাবের[১] পূর্বাভাস! কিন্তু এ অবস্থা এর থাকবে না, রাখতে পারবে না। এ অবস্থা রক্ষা করা বড় কঠিন। স্ত্রীলোককে ছুঁলেই (কামভাবে) এ ভাব আর থাকবে না! একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে।" যাহা হউক, আগন্তুক ভক্তগণ ঠাকুরের কথায় যুবকটির যে মাথা খারাপ হয় নাই, এ বিষয়টি জানিয়া কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইয়া ফিরিলেন। তাহার পর কিছু কাল গত হইলে সংবাদ পাওয়া গেল—ঠাকুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহাই হইয়াছে—যুবকটির কপাল ভাঙ্গিয়াছে! সংকীর্তনের ক্ষণিক উত্তেজনায় সে ভাগ্যক্রমে যত উচ্চে উঠিয়াছিল, হায় হায়—

১ বৃন্দাবনে শ্রীমতী রাধারানীর যে সর্বাঙ্গসম্পূর্ণ ঊনবিংশ প্রকার অষ্ট-সাত্ত্বিক শারীরিক বিকার শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে প্রকাশ পাইত, যথা— হাস্য, ক্রন্দন, অশ্রু, কম্প, পুলক, স্বেদ, মূর্চ্ছা ইত্যাদি—বৈষ্ণব-শাস্ত্রে উহাই মধুরভাব বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে। মধুরভাবের পরাকাষ্ঠাকেই 'মহাভাব' বলে। ঐ মহাভাবেই ঊনবিংশ প্রকার শারীরিক বিকার ঈশ্বর-প্রেমে আসিয়া উপস্থিত হয়। উহা জীবের সর্বাঙ্গীণ হওয়া অসম্ভব বলিয়া কথিত আছে।

ভাবাবসাদে দুর্ভাগ্যক্রমে আবার ততই নিম্নে নামিয়াছে! পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ ঐরূপ হইবার ভয়েই সর্বদা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিরই পক্ষপাতী ছিলেন এবং ঐরূপ ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে শিক্ষা দিতেন।

মথুরের যেমন 'বাবা'র নিকট কোন বিষয় গোপন ছিল না, 'বাবা'রও আবার মথুরের উপর ভাবসমাধির কাল ভিন্ন অপর সকল সময়ে, মাতার নিকট বালক যেমন, সখার নিকট সখা যেমন, অকপটে সকল কথা খুলিয়া বলে, পরামর্শ করে, মতামত সাদরে গ্রহণ করে ও ভালবাসার উপর নির্ভর করে, তেমনি ভাব ছিল। পরাবিদ্যার সর্বোচ্চ সোপানে আরোহণ করিলে মানবের অবস্থা যে উন্মাদ, পিশাচ বা বালকবৎ সাধারণ-নয়নে প্রতীত হইয়া থাকে, শাস্ত্রের একথা আমরা পাঠককে পূর্বেই বলিয়াছি। শুধু তাহাই নহে, জগৎপূজ্য আচার্য শঙ্কর এ কথাও স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন যে, ঐরূপ মানব, অতুল রাজ-বৈভব উপভোগ করিয়া বা কৌপীনমাত্রৈকসম্বল ও ভিক্ষান্নে উদরপোষণ করিয়া ইতর-সাধারণে যাহাকে বড় সুখের অবস্থা বা বড় দুঃখের অবস্থা বলিয়া গণ্য করে, তাহার ভিতর থাকিয়াও, কিছুতেই বিচলিত হন না; সর্বদা আত্মানন্দে আপনাতে আপনি বিভোর হইয়া থাকেন।

ঠাকুরের মথুরকে সকল বিষয় বালকের মত খুলিয়া বলা ও মতামত লওয়া

> কচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ কচিদপি মহারাজবিভবঃ
> কচিদ্‌ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ কচিদজগরাচারকলিতঃ।
> কচিৎ পাত্রীভূতঃ কচিদবমতঃ কাপ্যবিদিত-
> শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥
>
> —বিবেকচূড়ামণি, ৫৪২

অর্থাৎ, 'মুক্ত ব্যক্তি কখন মূঢ়ের ন্যায়, আবার কখন পণ্ডিতের ন্যায়, আবার কখন বা রাজবৎ বিভবশালী হইয়া বিচরণ করেন। তাঁহাকে কখন পাগলের ন্যায়, আবার কখন ধীর, স্থির, বুদ্ধিমানের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়। আবার কখনও বা তাঁহাকে নিত্যাবশ্যকীয় আহার্য প্রভৃতির জন্যও যাচ্ঞারহিত হইয়া অজগরের ন্যায় অবস্থান করিতে দেখা যায়। তিনি কোথাও বা বহুমান প্রাপ্ত হন, আবার কোথাও বা অপমানিত হন, আবার কোথাও বা একেবারে অপরিচিত ভাবে থাকেন। এইরূপে সকল অবস্থায় তিনি পরমানন্দে বিভোর ও অবিচলিত থাকেন।' জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের সম্বন্ধেই যখন ঐ কথা, তখন মহামহিম অবতার-পুরুষদিগের ঐরূপে সর্বাবস্থায় অবিচলিত থাকা ও বালকবৎ ব্যবহার করাটা আর অধিক কথা কি? অতএব মথুরের সহিত ঠাকুরের ঐরূপ আচরণ কিছু বিচিত্র নহে। কিন্তু মথুরের তাঁহার সহিত ঐরূপ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকিয়া এত কাল কাটাইতে পারাটা বড় কম ভাগ্যের কথা নহে!

মথুরের কল্যাণের দিকে ঠাকুরের কতদূর দৃষ্টি ছিল

কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুরের মথুরের সহিত ছিল! সাধনকালে এবং পরেও কখন কোন জিনিসের আবশ্যক হইলে, অমনি তাহা মথুরকে বলা ছিল। সমাধিকালে বা অন্য সময়ে যাহা কিছু দর্শনাদি ও ভাব উপস্থিত হইত, তাহা মথুরকে বলিয়া "এটা কেন হ'ল, বল দেখি?" "ওটা তোমার মনে কি হয়—বল দেখি?" ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করা ছিল। তাহার পয়সার যাহাতে সদ্ব্যয় হয়, দেবসেবার পয়সাতে যাহাতে যথার্থ দেবসেবা হইয়া

অতিথি, কাঙ্গাল, সাধু-সন্ত প্রভৃতি পালিত হয় ও তাহার পুণ্যসঞ্চয় হইয়া কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে ঠাকুরের লক্ষ্য থাকিত—এইরূপ সকল বিষয়ে কত কথাই না আমরা শুনিয়াছি। পুণ্যবতী রানী রাসমণি ও মথুরের শরীর যাইবার অনেক পরে যখন আমরা সকলে ঠাকুরের নিকট গিয়াছি, তখনও ঠাকুরের মধ্যে মধ্যে ঐ ভাবের পরিচয় আমরা পাইয়াছি। একটি দৃষ্টান্ত দিলে এখানে মন্দ হইবে না।

মথুরের আমল হইতে বন্দোবস্ত ছিল, ৺মা কালী ও ৺রাধা-গোবিন্দের ভোগ-রাগাদির পর বড় থালে করিয়া এক থাল প্রসাদী অন্নব্যঞ্জন ও এক থাল ফল-মূল-মিষ্টান্নাদি ঠাকুরের ঘরে নিত্য আসিবে ও ঠাকুর নিজে ও তাঁহার নিকট যাঁহারা উপস্থিত থাকিবেন, তাঁহারা প্রসাদ পাইবেন। তদ্ভিন্ন বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে মা কালী ও রাধাগোবিন্দজীকে যে বিশেষ ভোগ-রাগাদি দেওয়া হইত, তাহারও কিয়দংশ ঐরূপে ঠাকুরের নিকট পৌছাইয়া দেওয়া হইত।

ঐ বিষয়ক দৃষ্টান্ত—ফলহারিণী পূজার-প্রসাদ ঠাকুরের চাহিয়া লওয়া

বর্ষাকাল। আজ ফলহারিণী পূজার দিন। এ দিনে ঠাকুর-বাড়িতে বেশ একটি ছোট-খাট আনন্দোৎসব হইত। শ্রীশ্রীজগন্মাতা কালিকার বিশেষ পূজা করিয়া নানাপ্রকারের ফল-মূল ভোগ-নিবেদন করা হইত। আজও তদ্রূপ হইতেছে। নহবত বাজিতেছে। ঠাকুরের নিকট অদ্য যোগানন্দ স্বামীজী প্রভৃতি কয়েকটি ভক্ত উপস্থিত আছেন।

বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে ঠাকুরের শরীর-মনে বিশেষ বিশেষ

দেবভাব প্রকাশিত হইত। বৈষ্ণবদিগের পর্বদিনে বৈষ্ণবভাব এবং শাক্তদিগের পর্বদিনে শক্তিসম্বন্ধীয় ভাব সমূহ প্রকাশিত হইত। যথা, শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময়, বিশেষতঃ ঐ পূজার সন্ধিক্ষণে, অথবা ৺কালীপূজাদিকালে ঠাকুর শ্রীশ্রীজগদম্বার ভাবে আবিষ্ট, নিস্পন্দ ও কখন কখন বরাভয়কর পর্যন্ত হইয়া যাইতেন ; জন্মাষ্টমী প্রভৃতি পর্বদিনে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীমতীর ভাবে আরূঢ় হওয়ায় কম্প-পুলকাদি অষ্টসাত্ত্বিক লক্ষণ তাঁহার শরীরে দেখা যাইত—এইরূপ। আবার ঐ ঐ ভাবাবেশ এত সহজে স্বাভাবিক ভাবে আসিয়া উপস্থিত হইত যে, উহা যে কোনরূপ বিশেষ চেষ্টার ফলে হইতেছে, একথা আদৌ মনে হইত না! বরং এমন দেখা গিয়াছে, ঐরূপ পর্বদিনে ঠাকুর আমাদের সহিত অন্য নানা প্রসঙ্গে কথায় খুব মাতিয়াছেন, ঐ দিনে ঈশ্বরের যে বিশেষ লীলাপ্রকাশ হইয়াছিল, সে কথা ভুলিয়াই গিয়াছেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁহার মন ঐ সকল বাহিরের ব্যাপার হইতে গুটাইয়া একেবারে ঈশ্বরের ঐ ভাবে যাইয়া তন্ময় হইয়া পড়িল! কে যেন জোর করিয়া ঐরূপ করাইয়া দিল! কলিকাতায় শ্যামপুকুরে অবস্থানকালে আমরা ঐরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেখিয়াছি। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার প্রমুখ একঘর লোকের সহিত কথা কহিতে কহিতে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সন্ধিক্ষণে হঠাৎ ঠাকুরের ঐরূপ ভাবাবেশ হইল! তখনকার সেই হাস্যচ্ছটায় বিকশিত জ্যোতিঃপূর্ণ তাঁহার মুখমণ্ডল ও তাহার পূর্বক্ষণের অসুস্থতা-নিবন্ধন কালিমাপ্রাপ্ত বদন দেখিয়া

বিশেষ বিশেষ পর্বদিনে ঠাকুরের ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের ভাবসমাধির স্বভাবতঃ উদয়

কে বলিবে যে, ইনি সেই লোক—কে বলিবে, ইঁহার কোন অসুস্থতা আছে!

অদ্যকার ফলহারিণী পূজার দিনেও ঠাকুরের শরীর-মনে মধ্যে মধ্যে ঐরূপ ভাবাবেশ হইতেছে; কখন বা তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া পঞ্চমবর্ষীয় শিশুর ন্যায় মা-র নাম গাহিয়া আনন্দে নৃত্য করিতেছেন। সকলে মুগ্ধ হইয়া সে অপূর্ব বদনশ্রীর প্রতি চাহিয়া রহিয়াছেন এবং সে অদৃষ্টপূর্ব দেবমানবের সঙ্গগুণে মনে কতপ্রকার অপূর্ব দিব্যভাব অনুভব করিতেছেন। মা-র পূজা সাঙ্গ হইতে প্রায় রাত্রি শেষ হইল। একটু বিশ্রাম করিতে না করিতেই প্রভাত।

বেলা প্রায় ৮।৯টার সময় ঠাকুর দেখিলেন যে, তাঁহার ঘরে যে প্রসাদী ফল-মূলাদি পাঠাইবার বন্দোবস্ত আছে, তাহা তখনও পৌঁছায় নাই। কালীঘরের পূজারী ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে ডাকিয়া উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, তিনি কিছুই বলিতে পারিলেন না; বলিলেন—"সমস্ত প্রসাদী দ্রব্য দপ্তরখানায় খাজাঞ্চী মহাশয়ের নিকট যথারীতি প্রেরিত হইয়াছে; সেখান হইতে সকলকে, যাহার যেমন পাওনা বরাদ্দ আছে, বিতরিত হইতেছে; কিন্তু এখানকার (ঠাকুরের) জন্য এখনও কেন আসে নাই, বলিতে পারি না।" রামলাল দাদার কথা শুনিয়াই ঠাকুর ব্যস্ত ও চিন্তিত হইলেন। "কেন এখনও দপ্তরখানা হইতে প্রসাদ আসিল না?"—ইহাকে জিজ্ঞাসা করেন, উহাকে জিজ্ঞাসা করেন, আর ঐ কথাই আলোচনা করেন। এইরূপে অল্পক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন দেখিলেন—তখনও আসিল না,

তখন চটিজুতাটি পরিয়া নিজেই খাজাঞ্চীর নিকট আসিয়া উপস্থিত! বলিলেন, "হ্যাঁগা, ও ঘরের (নিজের কক্ষ দেখাইয়া) বরাদ্দ পাওনা এখনও দেওয়া হয় নি কেন? ভুল হ'ল নাকি? চিরকেলে মামুলি বন্দোবস্ত, এখন ভুল হ'য়ে বন্ধ হবে, বড় অন্যায় কথা!" খাজাঞ্চী মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন—"এখনও আপনার ওখনে পৌঁছায় নি? বড় অন্যায় কথা! আমি এখনি পাঠাইয়া দিতেছি।"

ঠাকুরের ঐরূপে প্রসাদ চাহিয়া লওয়ায় যোগানন্দ স্বামীর চিন্তা

স্বামী যোগানন্দ তখন বালক। সৎকুলে বনেদী সাবর্ণ চৌধুরীদের ঘরে জন্ম, কাজেই মনে বেশ একটু অভিমানও ছিল। ঠাকুরবাড়ির খাজাঞ্চী, কর্মচারী, পূজারী প্রভৃতিদের একটা মানুষ বলিয়াই বোধ হইত না। তবে ঠাকুরের ভালবাসায় ও অহেতুক কৃপায় তাঁহার শ্রীপদে মাথা বিক্রয় করিয়া ফেলিয়াছেন; এবং রাসমণির বাগানের একপ্রকার পার্শ্বেই তাঁহাদের বাড়ি বলিলেও চলে। কাজেই ঠাকুরের নিকট নিত্য যাওয়া-আসার বেশ সুবিধা। আর না যাইয়াই বা করেন কি? ঠাকুরের অদ্ভুত আকর্ষণ যে জোর করিয়া নিয়মিত সময়ে টানিয়া লইয়া যায়! কিন্তু ঠাকুরকে মানেন বলিয়া কি আর ঠাকুরবাড়ির লোকদের সঙ্গে প্রীতির সহিত আলাপ করা চলে? অতএব 'প্রসাদী ফল-মূলাদি কেন আসিল না' বলিয়া ঠাকুর ব্যস্ত হইলে তিনি বলিয়াই ফেলিলেন—"তা নাই বা এল মশায়, ভারি তো জিনিস! আপনার তো ও সকল পেটে সয় না, ওর কিছুই তো খান না—তখন নাই বা দিলে?" আবার ঠাকুর যখন তাঁহার

ঐরূপ কথায় কিছুমাত্র কর্ণপাত না করিয়া অল্পক্ষণ পরেই নিজে খাজাঞ্চীকে ঐ বিষয়ের কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইলেন, তখন যোগীন ভাবিতে লাগিলেন—'কি আশ্চর্য! ইনি আজ সামান্য ফল-মূল-মিষ্টান্নের জন্য এত ব্যস্ত হ'য়ে উঠলেন কেন? যাঁকে কিছুতে বিচলিত হ'তে দেখি নি, তাঁর আজ এ ভাব কেন?' ভাবিয়া চিন্তিয়া বিশেষ কোনই কারণ না খুঁজিয়া পাইয়া শেষে সিদ্ধান্ত করিলেন—'বুঝিয়াছি! ঠাকুরই হন, আর যত বড লোকই হন, আকরে টানে আর কি! বংশানুক্রমে চাল-কলা-বাঁধা পূজারী ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নিয়েছেন, সে বংশের গুণ একটু না একটু থাকবে তো? তাই আর কি! বড বড় বিষয়ে ব্যস্ত হন না, কিন্তু এ সামান্য বিষয়ের জন্য ব্যস্ত হ'য়ে উঠেছেন! তা নহিলে, নিজে ওসব খাবেন না, নিজের কোন দরকারেই লাগবে না, তবু তার জন্য এত ভাবনা কেন? বংশানুগত অভ্যাস!'

ঠাকুরের ঐরূপ করিবার কারণ-নির্দেশ

যোগীন বা যোগানন্দ স্বামীজী এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময় ঠাকুর ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতে লাগিলেন, "কি জানিস, রাসমণি, দেবতার ভোগ হ'য়ে সাধু-সন্ত ভক্ত লোকে প্রসাদ পাবে ব'লে এতটা বিষয় দিয়ে গেচে। এখানে যা প্রসাদী জিনিস আসে, সে সব ভক্তেরাই খায়; ঈশ্বরকে জানবে ব'লে যারা সব এখানে আসে, তারাই খায়। এতে রাসমণির যে জন্য দেওয়া, তা সার্থক হয়। কিন্তু তার পর ওরা (ঠাকুরবাড়ির বামুনেরা) যা সব নিয়ে যায়, তার কি

ওরূপ ব্যবহার হয়? চাল বেচে পয়সা করে! কারু কারু আবার বেশ্যা আছে; ঐ সব নিয়ে গিয়ে তাদের খাওয়ায়, এই সব করে! রাসমণির যে জন্য দান, তার কিছুও অন্ততঃ সার্থক হবে ব'লে এত ক'রে ঝগড়া করি!" যোগীন স্বামীজি শুনিয়া অবাক্! ঠাকুরের এ কাজেরও এত গূঢ় অর্থ!

মথুরের সহিত ঠাকুরের অদ্ভুত সম্বন্ধ

এইরূপে কি একটা মধুর সম্বন্ধই না ঠাকুর মথুরের সহিত পাতাইয়াছিলেন! মথুরের ভালবাসা ঘনীভূত হইয়া শেষে যে 'বাবা'-অন্ত প্রাণ হইয়াছিল, তাহা যে ঠাকুরের এইরূপ অহেতুক কৃপার ফলে, একথা বেশ বুঝিতে পারা যায়। তাহার পর ঠাকুরের বালকবৎ অবস্থা মথুরকে কম আকর্ষণ করে নাই। সাংসারিক সকল বিষয়ে অনভিজ্ঞ বালকের প্রতি কাহার মন না আকৃষ্ট হয়? নিকটে থাকিলে—ক্রীড়া-মত্ততায় পাছে তাহার কোনও অনিষ্ট হয় বলিয়া ভয়চকিত নয়নে তাহার অকারণ-মধুর চেষ্টাদি দেখিতে ও তাহাকে রক্ষা করিতে কে না ত্রস্তভাবে অগ্রসর হয়? আর ঠাকুরের বালকভাবটাতে তো আর কৃত্রিমতা বা ভানের লেশমাত্র ছিল না। যখন তিনি ঐ ভাবে থাকিতেন, তখন তাঁহাকে ঠিক ঠিক আত্মরক্ষণাসমর্থ বালক বলিয়াই বোধ হইত! কাজেই তেজীয়ান, বুদ্ধিমান মথুরের তাঁহাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করিবার স্বতই যে একটা চেষ্টার উদয় হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? অতএব একদিকে মথুর যেমন ঠাকুরের দৈবশক্তির উপর নির্ভর করিতেন, অপরদিকে তেমনি আবার তিনি 'বাবা'কে অনভিজ্ঞ বালক জানিয়া সর্বদা রক্ষা করিতে

প্রস্তুত থাকিতেন। সর্বজ্ঞ গুরুভাব ও অল্পজ্ঞ বালকভাবের 'বাবা'তে এইরূপ বিচিত্র সমাবেশ দেখিয়া, মথুর বোধ হয় মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন যে, সাংসারিক সকল ব্যাপারে, এমন কি দেহরক্ষাদি-বিষয়েও তাঁহাকে, 'বাবা'কে রক্ষা করিতে হইবে; আর মানব-চক্ষু ও শক্তির অন্তরালে অবস্থিত সূক্ষ্ম পারমার্থিক ব্যাপারে 'বাবা'ই তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। অতএব একই কালে দেব ও মানব, সর্বজ্ঞ ও অল্পজ্ঞ, মহাজটিল বিপরীত ভাবসমষ্টির অপরূপ সম্মিলনভূমি এ অদ্ভুত 'বাবা'র প্রতি মথুরের ভালবাসাটাও যে একটা জটিল ভাব ধারণ করিয়াছিল, একথা আমরা বেশ বুঝিতে পারি। ভাবমুখে অবস্থিত বরাভয়কর 'বাবা' মথুরের উপাস্য হইলেও, বালকভাবাবিষ্ট সরলতা ও নির্ভরের ঘনমূর্তি সেই 'বাবা'কেই আবার সময়ে সময়ে মথুরকে নানা কথায় ভুলাইতে ও বুঝাইতে হইত! বাবার জিজ্ঞাসিত বিষয়সকল বুঝাইবার উদ্ভাবনী শক্তিও মথুরের ভালবাসায় বেশ যোগাইত! মথুরের সহিত কথা কহিতে কহিতে হঠাৎ বহির্দেশে গমন করিয়া 'বাবা' একদিন চিন্তায় মুখখানি শুষ্ক করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মথুরকে বলিলেন, "একি ব্যারাম হ'ল, বল দেখি? দেখলুম, প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে শরীর থেকে যেন একটা পোকা বেরিয়ে গেল! শরীরের ভিতরে এমন তো কারুর পোকা থাকে না। আমার একি হ'ল?" ইতিপূর্বেই যে 'বাবা' হয়ত গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল অপূর্ব সরলভাবে বুঝাইয়া মোহিত ও মুগ্ধ করিতেছিলেন, সেই 'বাবা'ই এখন বালকের ন্যায় নিষ্কারণ

মথুরের কামকীটের কথা বলিয়া বালকভাবাপন্ন ঠাকুরকে বুঝান

ভাবিয়া অস্থির! মথুরের আশ্বাসবাক্য এবং বুদ্ধির উপর নির্ভর করিতেছেন! মথুর শুনিয়াই বলিলেন, "ও তো ভালই হয়েছে, বাবা! সকলের অঙ্গেই কামকীট আছে। উহাই তাদের মনে নানা কুভাবের উদয় ক'রে কুকাজ করায়। মা-র কৃপায় তোমার অঙ্গ থেকে সেই কামকীট বেরিয়ে গেল! এতে এত ভাবনা কেন?" 'বাবা' শুনিয়াই বালকের ন্যায় আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ; ভাগ্যিস্ তোমায় একথা বললুম, জিজ্ঞাসা করলুম!" বলিয়া বালকের ন্যায় ঐ কথায় আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

মথুরের সহিত ঠাকুরের ভক্তদিগের আগমনের কথা

কথায় কথায় একদিন 'বাবা' বলিলেন, "দেখ, মা সব আমায় দেখিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েচেন, এখানকার (ঠাকুরের নিজের) সব ঢের অন্তরঙ্গ আছে; তারা সব আসবে; এখান থেকে ঈশ্বরীয় বিষয় জানবে, শুনবে, প্রত্যক্ষ করবে; প্রেমভক্তি লাভ করবে; (নিজের শরীর দেখাইয়া) এ খোলটা দিয়ে মা অনেক খেলা খেলবে, অনেকের উপকার করবে, তাই এ খোলটা এখনও ভেঙ্গে দেয় নি—রেখেচে। তুমি কি বল? এ সব কি মাথার ভুল, না ঠিক দেখেচি, বল দেখি?"

মথুর বলিলেন, "মাথার ভুল কেন হবে, বাবা? মা যখন তোমায় এ পর্যন্ত কোনটাই ভুল দেখান নাই, তখন এটাই বা কেন ভুল হবে? এটাও ঠিক হবে; এখনও তারা সব দেরী করচে কেন? (অন্তরঙ্গ ভক্তেরা) শীগ্‌গির শীগ্‌গির আসুক না, তাদের নিয়ে আনন্দ করি।"

'বাবা'ও বুঝিয়া গেলেন, মা ওসব ঠিক দেখাইয়াছেন। বলিলেন, "কি জানি বাবু, কবে তারা সব আস্‌বে ; মা বলেছেন, দেখিয়েছেন, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।"

রানী রাসমণির পুত্র ছিল না, চার কন্যা ছিল। মথুরবাবু তাঁহাদের মধ্যে তৃতীয়া ও কনিষ্ঠাকে পর পর বিবাহ করিয়াছিলেন। অবশ্য একজনের মৃত্যু হইলে অপরকে বিবাহ করিয়াছিলেন। জামাতাদিগের ভিতর বিষয় লইয়া পরে পাছে কোন গণ্ডগোল বাধে, এজন্য বুদ্ধিমতী রানী স্বয়ং বর্তমান থাকিতে থাকিতে প্রত্যেকের ভাগ নির্দিষ্ট করিয়া চিহ্নিত করিয়া দিয়া যান। ঐরূপে বিষয়ভাগ হইবার পরে একদিন মথুর-বাবুর পত্নী বা সেজগিন্নী অপরের ভাগের এক পুষ্করিণীতে স্নান করিতে যাইয়া সুন্দর সুষনি শাক হইয়াছে দেখিয়া তুলিয়া লইয়া আসেন। কেবল ঠাকুর তাঁহার ঐ কার্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। তাঁহার ঐরূপ কার্য দেখিয়াই ঠাকুরের মনে নানা তোলাপাড়া উপস্থিত। না বলিয়া ওরূপে অপরের বিষয় সেজগিন্নী লইয়া গেল, বড় অন্যায়। না বলিয়া ওরূপে লইলে যে চুরি করা হয়, তাহা ভাবিল না। আর অপরের জিনিসে ওরূপ লোভ করা কেন বাবু?—ইত্যাদি, ইত্যাদি। ঐরূপ নানা কথা ভাবিতেছেন, এমন সময় রানীর যে কন্যার ভাগে ঐ পুষ্করিণী পড়িয়াছে, তাহার সহিত দেখা। অমনি ঠাকুর তাঁহার নিকট ঐ বিষয়ের আদ্যোপান্ত বলিলেন। তিনি শুনিয়া এবং সেজগিন্নী যেন কতই অন্যায় করিয়াছে বলিয়া ঠাকুরের ঐরূপ গম্ভীর ভাব

ঠাকুরের বালকভাবের দৃষ্টান্ত—সুষনি শাক তোলার কথা

দেখিয়া হাস্যসম্বরণ করিতে পারিলেন না। ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, 'তাই তো বাবা, সেজ বড় অন্যায় করেছে।' এমন সময় সেজগিন্নীও তথায় আসিয়া উপস্থিত। তিনিও ভগ্নীর হাস্যের কারণ শুনিয়া পরিহাস করিয়া বলিলেন, 'বাবা, এ কথাটিও কি তোমার ওকে ব'লে দিতে হয়? আমি পাছে ও দেখতে পায় ব'লে লুকিয়ে শাকগুলি চুরি করে নিয়ে এলুম. আর তুমি কিনা তাই ব'লে দিয়ে আমাকে অপদস্থ করলে!' এই বলিয়া দুই ভগ্নীতে হাস্যের রোল তুলিলেন। তখন ঠাকুর বলিলেন, "তা, কি জানি বাবু, যখন বিষয় সব ভাগ-যোগ হ'য়ে গেল, তখন ওরূপে না ব'লে নেওয়াটা ভাল নয়; তাই ব'লে দিলুম যে, উনি শুনে যা হয় বোঝা-পড়া করুন।" রানীর কন্যারা 'বাবা'র কথায় আরও হাসিতে লাগিলেন এবং ভাবিলেন,. বাবার কি সরল উদার স্বভাব!

সাংসারিক বিপদে মথুরের ঠাকুরের শরণাপন্ন হওয়া

একপক্ষে 'বাবা'র এইরূপ বালকভাব! অপর দিকে আবার অন্য জমিদারের সহিত বিবাদে মথুরের হুকুমে লাঠালাঠি ও খুন হইয়া যাওয়ায় বিপদে পতিত মথুর আসিয়া 'বাবা'কে ধরিলেন, 'বাবা, রক্ষা কর।' 'বাবা' প্রথম চটিয়া মথুরকে নানা ভৎর্সনা করিলেন। বলিলেন, "তুই শালা রোজ একটা হাঙ্গামা বাধিয়ে এসে বলবি 'রক্ষা কর'! আমি কি করতে পারি রে শালা? যা, নিজে বুঝগে যা; আমি কি জানি?" তারপর মথুরের নির্বন্ধে বলিলেন, "যাঃ, মার ইচ্ছায় যা হয় হবে।" বাস্তবিকই সে বিপদ কাটিয়া গেল!

ঠাকুরের উভয় ভাবের পরিচায়ক এইরূপ কত দৃষ্টান্তই না বলা যাইতে পারে! এই সকল দেখিয়া শুনিয়াই মথুরের দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল, বহুরূপী 'বাবা'র কৃপাতেই তাঁহার যাহা কিছু—ধন বল, মান বল, প্রতাপ বল, আর যা কিছুই বল। সুতরাং বাবাকে সাক্ষাৎ ঈশ্বরাবতার বলিয়া রাজসম্মান দেওয়া ও অচল ভক্তি-বিশ্বাস করাটা মথুরের পক্ষে একটা বিচিত্র ব্যাপার হয় নাই। বিষয়ী লোকের ভক্তির দৌড় ভক্তিভাজনের প্রতি অর্থব্যয়েই বুঝিতে পারা যায়। তাহাতে আবার মথুর—সুচতুর হিসাবী বুদ্ধিমান্ বিষয়ী ব্যক্তি সচরাচর যেমন হইয়া থাকে,—একটু কৃপণও ছিলেন। কিন্তু 'বাবা'র বিষয়ে মথুরের অকাতরে ধনব্যয় দেখিয়া তাঁহার ভক্তিবিশ্বাস যে বাস্তবিকই আন্তরিক ছিল, একথা স্পষ্ট বুঝা যায়। 'বাবা'কে যাত্রা শুনাইতে সাজ-গোজ পরাইয়া বসাইয়া, গায়কদের প্যালা বা পুরস্কার দিবার জন্য মথুর তাঁহার সামনে দশ দশ টাকার থাক্ করিয়া একেবারে একশত বা ততোধিক টাকা সাজাইয়া দিলেন। 'বাবা' যাত্রা শুনিয়া যাইতে যাইতে তেমনি কোন হৃদয়স্পর্শী গান বা কথায় মুগ্ধ ও ভাবাবিষ্ট হইলেন, অমনি হয়তো সে সমস্ত টাকাগুলিই একেবারে হাত দিয়া গায়কের দিকে ঠেলিয়া তাহাকে পুরস্কার দিয়া ফেলিলেন! মথুরের তাহাতে বিরক্তি নাই! 'বাবা'র যেমন উঁচু মেজাজ, তেমনি তাহার মতই প্যালা দেওয়া হইয়াছে,' বলিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আবার ঐরূপ টাকা সাজাইয়া দিলেন! ভাবমুখে অবস্থিত 'বাবা'—যিনি 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'

কৃপণ মথুরের ঠাকুরের জন্য অজস্র অর্থব্যয়ের দৃষ্টান্ত

করিয়া একেবারে লোভশূন্য হইয়াছেন—তাঁহার সম্মুখে উহা আর কতক্ষণ থাকিতে পারে? আবার হয়তো ভাবতরঙ্গের উন্মাদ-বিহ্বলতায় আত্মহারা হইয়া সমস্ত টাকা এককালে দিয়া ফেলিলেন! পরে কাছে টাকা নাই দেখিয়া হয়তো গায়ের শাল ও পরনের বহুমূল্য কাপড় পর্যন্ত খুলিয়া দিয়া কেবল মাত্র ভাবাম্বর ধারণ করিয়া নিস্পন্দ সমাধিস্থ হইয়া রহিলেন। মথুর তাঁহার টাকার সার্থকতা হইল ভাবিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া 'বাবা'কে বীজন করিতে লাগিলেন।

ঐ বিষয়ক অন্যান্য দৃষ্টান্ত

কৃপণ মথুরের 'বাবা'র সম্বন্ধে এইরূপ উদারতার কতই না দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়! মথুর 'বাবা'কে সঙ্গে লইয়া ৺কাশী, বৃন্দাবনাদি তীর্থপর্যটনে যাইয়া 'বাবা'র কথায় ৺কাশীতে 'কল্পতরু' হইয়া দান করিলেন, আবশ্যকীয় পদার্থ যে যাহা চাহিল, তাহাকে তাহাই দিলেন! 'বাবা'কে সে সময়ে কিছু চাহিতে অনুরোধ করায় 'বাবা' কিছুরই অভাব খুঁজিয়া পাইলেন না! বলিলেন, "একটি কমণ্ডলু দাও!" 'বাবা'র ত্যাগ দেখিয়া মথুরের চক্ষে জল আসিল।

ঠাকুরের ইচ্ছায় মথুরের বৈদ্যনাথে দরিদ্রসেবা

মথুরের সহিত কাশী বৃন্দাবনাদি তীর্থদর্শনে যাইবার কালে ৺বৈদ্যনাথের নিকটবর্তী কোন গ্রামের ভিতর দিয়া যাইবার সময় গ্রামবাসীর দুঃখ-দারিদ্র্য দেখিয়া 'বাবা'র হৃদয় একেবারে করুণায় পূর্ণ হইল। মথুরকে বলিলেন, "তুমি তো মার দেওয়ান; এদের এক মাথা ক'রে তেল ও একখানা ক'রে কাপড় দাও, আর পেটটা ভ'রে একদিন খাইয়ে দাও।" মথুর প্রথম একটু পেছপাও

হইলেন। বলিলেন, 'বাবা, তীর্থে অনেক খরচ হবে, এও দেখছি অনেকগুলি লোক, এদের খাওয়াতে-দাওযাতে গেলে টাকার অনটন হ'য়ে পড়তে পারে। এ অবস্থায় কি বলেন?' সে কথা শুনে কে? বাবার তখন গ্রামবাসীদের দুঃখ দেখিয়া চক্ষে অনবরত জল পড়িতেছে, হৃদয়ে অপূর্ব করুণার আবেশ হইয়াছে। বলিলেন, "দূর শালা, তোর কাশী আমি যাব না। আমি এদের কাছেই থাকব; এদের কেউ নেই, এদের ছেড়ে যাব না।" এই বলিয়া বালকের ন্যায় গোঁ ধরিয়া দরিদ্রদের মধ্যে যাইয়া উপবেশন করিলেন! তাঁহার ঐরূপ করুণা দেখিয়া মথুর তখন কলিকাতা হইতে কাপড় আনাইয়া 'বাবা'র কথামত সকল কার্য করিলেন। 'বাবা'ও গ্রামবাসীদের আনন্দ দেখিয়া আনন্দে আটখানা হইয়া তাহাদের নিকট বিদায় লইয়া হাসিতে হাসিতে মথুরের সহিত ৺কাশী গমন করিলেন। শুনিয়াছি, মথুরের সহিত রাণাঘাটের সন্নিহিত তাঁহার জমিদারিভুক্ত কোন গ্রামে অন্য এক সময়ে বেড়াইতে যাইয়া, গ্রামবাসীদের দুর্দশা দেখিয়া ঠাকুরের হৃদয়ে ঐরূপ করুণার আর একবার উদয় হইয়াছিল এবং মথুরের দ্বারা আর একবার ঐরূপ অনুষ্ঠান করাইয়াছিলেন।

গুরুভাবমুখে অবস্থিত ঠাকুর এইরূপ মধুর সম্বন্ধে মথুরকে চিরকালের মত আবদ্ধ করিয়াছিলেন। সাধনকালে এক সময়ে ঠাকুরের মনে যে অদ্ভুত ভাবের সহসা উদয় হইয়া তাঁহাকে শ্রীশ্রীজগদম্বার নিকট প্রার্থনা করাইয়াছিল, "মা, আমাকে শুক্‌নো সাধু করিস নি, রসে বশে রাখিস"—মথুরানাথের সহিত এই প্রকার অদৃষ্টপূর্ব সম্বন্ধ তাহারই পরিণত ফলবিশেষ। কারণ,

সেই প্রার্থনার ফলেই ৺জগন্মাতা ঠাকুরকে দেখাইয়া দেন, তাঁহার দেহরক্ষাদি প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য চারিজন রসদ্দার তাঁহার সঙ্গে প্রেরিত হইয়াছে এবং মথুরানাথই তাঁহাদের ভিতর প্রথম ও অগ্রণী। দৈবনির্দিষ্ট সম্বন্ধ না হইলে কি এতকাল এ সম্বন্ধ এরূপ অক্ষুণ্ণভাবে কখন থাকিতে পারিত? হায় পৃথিবী, এরূপ বিশুদ্ধ মধুর সম্বন্ধ এতকাল কয়টাই বা তুমি নয়নগোচর করিয়াছ! আর বলি, হায় ভোগবাসনা, তুমি কি বজ্রবন্ধনেই না মানবমনকে বাঁধিয়াছ! এই শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব অহেতুক ভালবাসার ঘনীভূত প্রতিমা এমন অদ্ভুত ঠাকুরকে দেখিয়া ও তাঁহার সঙ্গে সম্বন্ধ পাতাইয়া এখনও আমাদের মন তোমাকে ছাড়িয়াও ছাড়িতে চাহে না! জনৈক বন্ধু ঠাকুরের নিজমুখ হইতে একদিন মথুরানাথের অপূর্ব কথা শুনিতে শুনিতে তাঁহার মহাভাগ্যের কথা ভাবিয়া স্তম্ভিত ও বিভোর হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "(মৃত্যুর পর) মথুরের কি হ'ল, মশায়? তাকে নিশ্চয়ই বোধ হয় আর জন্মগ্রহণ করতে হবে না!" ঠাকুর শুনিয়া উত্তর করিলেন, "কোথাও একটা রাজা হ'য়ে জন্মেছে আর কি! ভোগবাসনা ছিল।" এই বলিয়াই ঠাকুর অন্য কথা পাড়িলেন।

ঠাকুরের সহিত মথুরের সম্বন্ধ দৈবনির্দিষ্ট; ভোগবাসনা ছিল বলিয়া মথুরের পুনর্জন্ম সম্বন্ধে ঠাকুর

অষ্টম অধ্যায়

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো

মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনং চ।

বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো

বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥ —গীতা, ১৫।১৫

পূর্বেই বলিয়াছি, যিনি গুরু হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, বাল্যাবধিই তাঁহার ভিতর ঐ ভাবের পরিচয় বেশ পাওয়া গিয়া থাকে। মহাপুরুষ অবতারকুলের তো কথাই নাই। তাঁহাদের মধ্যে যিনি জনসমাজে যে ভাব-প্রতিষ্ঠার জন্য জন্মগ্রহণ করেন, বাল্যাবধিই তাঁহাতে যেন ঐ ভাব প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাওয়া যায়! শরীরেন্দ্রিয়াদির পূর্ণতা, দেশকালাদি অবস্থাসকলের অনুকূলতা প্রভৃতি কারণসমূহ ক্রমে ক্রমে উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের জীবনে ঐ ভাব পূর্ণ পরিস্ফুট হইবার সহায়তা করিতে পারে; কিন্তু ঐ সকল কারণই যে তাঁহাদের ভিতর ঐ ভাবের জন্ম দিয়া এ জীবনে তাঁহাদের গুরু করিয়া তুলে, তাহা নহে। দেখা যায়, উহা যেন তাঁহাদের নিজস্ব সম্পত্তি, উহা লইয়াই তাঁহারা যেন জীবন আরম্ভ করিয়াছেন, এবং বর্তমান জীবনে ঐ ভাবোৎপত্তির কারণানুসন্ধান করিলে সহস্র চেষ্টাতেও তাহা খুঁজিয়া পাওয়া যায়

গুরুভাব অবতারপুরুষ-দিগের নিজস্ব সম্পত্তি

না! ঠাকুরের জীবনে গুরুভাবোৎপত্তি অনুসন্ধান করিতে যাইলেও ঠিক ঐরূপ দেখা যায়। বাল্যে দেখ, যৌবনে দেখ, সাধনকালে দেখ, সকল সময়েই ঐ ভাবের অল্পাধিক বিকাশ তাঁহার জীবনে দেখিতে পাইয়া অবাক্ হইতে হয়; আর কিরূপে ঐ ভাবের প্রথম আরম্ভ তাঁহার জীবনে উপস্থিত হইল, এ কথা ভাবিয়া-চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারা যায় না। বাল্যজীবনের উল্লেখ এখানে করিয়া আমাদের পুঁথি বাড়াইতে ইচ্ছা নাই। তবে ঠাকুরের যৌবন এবং সাধনকাল, যে কালের আরম্ভ হইতে শেষ পর্যন্ত মথুরবাবুকে লইয়া কত প্রকার গুরুভাবের লীলার বিকাশ হইয়াছিল, সেই কালেরই অনেক কথা এখনও বলিতে বাকি আছে এবং তাহাই এখন পাঠককে উপহার দিলে মন্দ হইবে না।

ঠাকুরের বহু গুরুর নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ

মন্ত্রদাতা গুরু এক হইলেও উপগুরু বা শিক্ষাগুরু অনেক করা যাইতে পারে—এ বিষয়টি ঠাকুর অনেক সময়ে আমাদিগকে শ্রীমদ্ভাগবতের অবধূতোপাখ্যানের কথা তুলিয়া বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেন। ভাগবতে লেখা আছে, ঐ অবধূত ক্রমে ক্রমে চব্বিশজন উপগুরুর নিকট হইতে বিশেষ বিশেষ শিক্ষা পর পর লাভ করিয়া সিদ্ধ হইয়াছিলেন। ঠাকুরের জীবনেও আমরা ঐরূপে বিশেষ বিশেষ সাধনোপায় ও সত্যোপলব্ধির জন্য বহু বহু গুরুগ্রহণের অভাব দেখি না। তন্মধ্যে ভৈরবী ব্রাহ্মণী, 'ল্যাংটা' তোতাপুরী ও মুসলমান গোবিন্দের নামই আমরা অনেক সময় তাঁহাকে বলিতে শুনিয়াছি। অপরাপর হিন্দুসম্প্রদায়ের সাধনোপায়সমূহ অন্যান্য

গুরুভাবে নিজ গুরুগণের সহিত সম্বন্ধ

গুরুগণের নিকট হইতে শিক্ষা করিলেও ঠাকুর তাঁহাদের নাম বড় একটা উল্লেখ করিতেন না। কেবলমাত্র বলিতেন যে, তিনি অন্যান্য গুরুগণের নিকট হইতে অন্যান্য মতের সাধন-প্রণালী জানিয়া লইয়া তিন তিন দিন মাত্র সাধন করিয়াই ঐ সকল মতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ঐসকল গুরুগণের নাম ঠাকুরের মনে ছিল না, অথবা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে বলিয়াই ঠাকুর উল্লেখ করিতেন না, তাহা এখন বলা কঠিন। তবে এটা বুঝা যায় যে, তাঁহাদের সহিত সম্বন্ধও ঠাকুরের অতি অল্পকালের নিমিত্ত হইয়াছিল। সেজন্য তাঁহাদের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে।

ভৈরবী ব্রাহ্মণী বা 'বামনী'

ঠাকুরের শিক্ষাগুরুগণের ভিতর আবার ভৈরবী ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে বহুকাল বাস করিয়াছিলেন। কত কাল, তাহা ঠিক নির্দেশ করিয়া বলা সুকঠিন, কারণ, ঠাকুরের শ্রীচরণপ্রান্তে আমাদের আশ্রয়গ্রহণ করিবার কিছুকাল পূর্বে তিনি দক্ষিণেশ্বর পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করেন এবং পুনরায় আর ফিরিয়া আসেন নাই। ইহার পরে ঠাকুর তাঁহার আর একবার মাত্র সন্ধান পাইয়াছিলেন; তখন ঐ ব্রাহ্মণী ভৈরবী ৺কাশীধামে তপস্যায় কাল কাটাইতেছিলেন।[১]

ব্রাহ্মণী ভৈরবী যে বহুকাল দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে এবং তন্নিকটবর্তী গঙ্গাতটে—যথা, দেবমণ্ডলের ঘাট প্রভৃতি স্থলে—বাস করিয়াছিলেন, ইহা আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি। শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে চৌষট্টিখানা প্রধান প্রধান তন্ত্রোক্ত যত কিছু সাধন-প্রণালী, সকলই একে একে করাইয়াছিলেন।

১ সাধকভাব (১০ম সংস্করণ), দ্বাদশ অধ্যায়, ২৪৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—প্রঃ

শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবমতসম্বন্ধীয় তন্ত্রাদিতেও সুপণ্ডিতা ছিলেন;

'বামনী'র ঠাকুরকে সহায়তা

তবে ঠাকুরকে সখীভাব প্রভৃতি সাধনকালেও কোন কোন স্থলে সহায়তা করিয়াছিলেন কিনা, ঐ বিষয়ে কোন কথা স্পষ্ট শ্রবণ করি নাই।[১] শুনিয়াছি যে, ঠাকুরকে ঐরূপে সাধনকালে সহায়তা করিবার সময় উত্তীর্ণ হইয়া যাইবার পরেও তিনি কয়েক বৎসর সর্বসুদ্ধ কিঞ্চিদধিক ছয় বৎসর কাল, বহু সম্মানে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়াছিলেন এবং ঐ কালের মধ্যে কখন কখন ঠাকুর এবং তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়ের সহিত ঠাকুরের জন্মভূমি কামারপুকুর পর্যন্ত যাইয়া তাঁহার আত্মীয়দিগের মধ্যেও বাস করিয়া আসিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এই সময় হইতে ব্রাহ্মণীকে আপন শ্বশ্রূর ন্যায় সম্মান এবং মাতৃসম্বোধন করিতেন।

ব্রাহ্মণী বৈষ্ণবদিগের সাধন-প্রণালী অনুসরণ করিয়া সখ্য-বাৎসল্যাদি ভাবসমূহের রসও কিছু কিছু নিজ জীবনে অনুভব

'বামনী'র বৈষ্ণব-তন্ত্রোক্ত ভাবে অভিজ্ঞতা

করিয়াছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে দেবমণ্ডলের ঘাটে অবস্থানকালে তিনি ঠাকুরের প্রতি বাৎসল্যরসে মুগ্ধ হইয়া ননী হস্তে লইয়া নয়নাশ্রুতে বসন সিক্ত করিতে করিতে 'গোপাল' গোপাল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিতেন। আর, এ দিকে দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীতে সহসা ঠাকুরের মন ব্রাহ্মণীকে দেখিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া উঠিত। শুনিয়াছি, তখন তিনি বালক যেমন জননীর নিকট উপস্থিত হয়, তেমনি একছুটে ঐ এক মাইল পথ অতিক্রম

১ সাধকভাব (১০ম সং), দ্বাদশ অধ্যায়, ২৭৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য।—প্রঃ

করিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইতেন এবং নিকটে বসিয়া ননী ভোজন করিতেন! এতদ্ভিন্ন ব্রাহ্মণীও কখন কখন কোথা হইতে যোগাড় করিয়া লাল বারাণসী চেলী ও অলঙ্কারাদি ধারণ করিয়া পাড়ার স্ত্রীলোকদিগের সঙ্গে নানাপ্রকার ভক্ষ্যভোজ্যাদি হস্তে লইয়া গান গাহিতে গাহিতে ঠাকুরের নিকট দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইতেন এবং ঠাকুরকে খাওয়াইয়া যাইতেন। ঠাকুর বলিতেন, তাঁহার আলুলায়িত কেশ এবং ভাববিহ্বল অবস্থা দেখিয়া তখন তাঁহাকে গোপালবিরহে কাতরা নন্দরাণী যশোদা বলিয়াই লোকের মনে হইত।

'বাম্‌নী'র রূপ-গুণ দেখিয়া মথুরের সন্দেহ

ব্রাহ্মণী গুণে যেমন, রূপেও তেমনি অসামান্যা ছিলেন। ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে শুনিয়াছি, মথুরবাবু প্রথম প্রথম ব্রাহ্মণীর রূপলাবণ্য-দর্শনে এবং তাঁহার একাকিনী অসহায় অবস্থায় যথা তথা ভ্রমণাদি শুনিয়া তাঁহার চরিত্রের প্রতি সন্দিহান হইয়াছিলেন। একদিন নাকি বিদ্রূপচ্ছলে বলিয়াও ফেলিয়াছিলেন, "ভৈরবী, তোমার ভৈরব কোথায়?" ব্রাহ্মণী তখন মা কালীর মন্দির হইতে দর্শনাদি করিয়া বাহিরে আসিতেছিলেন। হঠাৎ ঐরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়াও কিছু-মাত্র অপ্রতিভ বা রাগান্বিতা না হইয়া স্থিরভাবে মথুরের প্রতি প্রথম নিরীক্ষণ করিলেন, পরে শ্রীশ্রীজগদম্বার পদতলে শবরূপে পতিত মহাদেবকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া মথুরকে দেখাইয়া দিলেন। সন্দিগ্ধমনা বিষয়ী মথুরও অল্পে ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। বলিলেন, "ও ভৈরব তো অচল।" ব্রাহ্মণী তখন ধীর গম্ভীর স্বরে উত্তর করিলেন, "যদি অচলকে সচল করিতেই না পারিব, তবে

আর ভৈরবী হইয়াছি কেন ?" ব্রাহ্মণীর ঐরূপ ধীর গম্ভীর ভাব ও উত্তরে মথুর লজ্জিত ও অপ্রতিভ হইয়া নির্বাক্ হইয়া রহিলেন। পরে দিন দিন তাঁহার উচ্চ প্রকৃতি ও অশেষ গুণের পরিচয় যতই পাইতে থাকিলেন, ততই মথুরের মনে আর ঐরূপ দুষ্ট সন্দেহ রহিল না।

ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ব্রাহ্মণী পূর্ববঙ্গের কোন স্থলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে দেখিলেই 'বড় ঘরের মেয়ে' বলিয়া সকলের নিঃসংশয় ধারণা হইত। বাস্তবিকও তিনি তাহাই ছিলেন। কিন্তু কোন্ গ্রামে কাহার ঘর পুত্রীরূপে আলো করিয়াছিলেন, ঘরনীরূপে কাহারও ঘর কখন উজ্জ্বল করিয়াছিলেন কি না, এবং প্রৌঢ় বয়সে এইরূপে সন্ন্যাসিনী হইয়া দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করিবার ও সংসারে বীতরাগ হইবার কারণই বা কি হইয়াছিল, তাহা আমরা ঠাকুরের নিকট হইতে কখনও শুনি নাই। আবার এত লেখাপড়াই বা শিখিলেন কোথায় এবং সাধনেই বা এত উন্নতিলাভ কোথায়, কবে করিলেন—তাহাও আমাদের কাহারও কিছুমাত্র জানা নাই।

'ব্রাহ্মণী'র পূর্বপরিচয়

সাধনে যে ব্রাহ্মণী বিশেষ উন্নতা হইয়াছিলেন, একথা আর বলিতে হইবে না। দৈবকর্তৃক ঠাকুরের গুরুরূপে মনোনীত হওয়াতেই তাহার পরিচয় বিশেষরূপে পাওয়া যায়। আবার যখন ঠাকুরের শ্রীমুখ হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে, ব্রাহ্মণী তাঁহার নিকটে আসিবার পূর্বেই যোগবলে জানিতে পারিয়াছিলেন যে, জীবৎকালে তাঁহাকে ঠাকুরপ্রমুখ তিন ব্যক্তিকে সাধনায়

ব্রাহ্মণী উচ্চদরের সাধিকা

সহায়তা করিতে হইবে এবং ঐ তিন ব্যক্তির সহিত ভিন্ন ভিন্ন দেশে ও কালে সাক্ষাৎ হইবামাত্র ব্রাহ্মণী তাঁহাদের চিনিয়া ঐরূপ করিয়াছিলেন, তখন আর ঐ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকে না।

ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাতেই চন্দ্র ও গিরিজার কথা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "বাবা, তাদের দুজনকে ইহার পূর্বেই পেয়েছি; আর তোমাকে এতদিন খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেম, আজ পেলেম। তাদের সঙ্গে পরে তোমায় দেখা করিয়ে দিব।" বাস্তবিকও পরে ঐ দুই ব্যক্তিকে দক্ষিণেশ্বরে আনিয়া ব্রাহ্মণী ঠাকুরের সহিত দেখা করাইয়া দেন। ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি, ইঁহারা দুই জনেই উচ্চদরের সাধক ছিলেন। কিন্তু সাধনার পথে অনেকদূর অগ্রসর হইলেও ঈশ্বরের দর্শনলাভে সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই। বিশেষ বিশেষ শক্তি বা সিদ্ধাই লাভ করিয়া পথভ্রষ্ট হইতে বসিয়াছিলেন।

'বামনী'র যোগলব্ধ দর্শন

ঠাকুর বলিতেন, চন্দ্র ভাবুক ঈশ্বরপ্রেমিক ছিলেন। তাঁহার 'গুটিকা-সিদ্ধি'-লাভ হইয়াছিল। মন্ত্রপূত গুটিকাটি অঙ্গে ধারণ করিয়া তিনি সাধারণ নয়নের দৃষ্টিবহির্ভূত বা অদৃশ্য হইতে পারিতেন এবং ঐরূপে অদৃশ্য হইয়া সযত্নে রক্ষিত, দুর্গম স্থানেও গমনাগমন করিতে পারিতেন। কিন্তু ঈশ্বরলাভের পূর্বে ক্ষুদ্র মানব-মন ঐ প্রকার সিদ্ধাইসকল লাভ করিলেই যে অহঙ্কৃত হইয়া উঠে, এবং অহঙ্কারবৃদ্ধিই যে মানবকে বাসনাজালে জড়িত করিয়া উচ্চ লক্ষ্য

ব্রাহ্মণীর শিষ্য চন্দ্রের কথা

অগ্রসর হইতে দেয় না এবং পরিশেষে তাহার পতনের কারণ হয়, একথা আর বলিতে হইবে না। অহঙ্কারবৃদ্ধিতেই পাপের বৃদ্ধি এবং উহার হ্রাসেই পুণ্যলাভ, অহঙ্কারবৃদ্ধিতেই কর্মহানি এবং অহঙ্কারনাশেই ধর্মলাভ, স্বার্থপরতাই পাপ এবং স্বার্থনাশই পুণ্য, 'আমি ম'লে ফুরায় জঞ্জাল'—এ কথা ঠাকুর আমাদের বার বার কত প্রকারেই না বুঝাইতেন! বলিতেন, "ওরে, অহঙ্কারকেই শাস্ত্রে চিজ্জড়গ্রন্থি বলেছে; চিৎ অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা; এবং জড় অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি; ঐ অহঙ্কার এতদুভয়কে একত্রে বাঁধিয়া রাখিয়া মানব-মনে 'আমি দেহেন্দ্রিয়বুদ্ধ্যাদিবিশিষ্ট জীব'—এই ভ্রম স্থির করিয়া রাখিয়াছে। ওই বিষম গাঁটটা না কাটতে পারলে এগুনো যায় না। ঐটেকে ত্যাগ করতে হবে। আর মা আমাকে দেখিয়ে দিয়েছে, সিদ্ধাইগুলো বিষ্ঠাতুল্য হেয়। ওসকলে মন দিতে নেই। সাধনায় লাগলে ওগুলো কখন কখন আপনা আপনি এসে উপস্থিত হয়, কিন্তু ওগুলোয় যে মন দেয়, সে ঐখানেই থেকে যায়, ভগবানের দিকে আর এগুতে পারে না।" স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যানই জীবনস্বরূপ ছিল; খাইতে শুইতে বসিতে সকল সময়েই তিনি ঈশ্বরধ্যানে মন রাখিতেন, কতকটা মন সর্বদা ভিতরে ঈশ্বরের চিন্তায় রাখিতেন। ঠাকুর বলিতেন, তিনি 'ধ্যানসিদ্ধ' ধ্যান করিতে করিতে সহসা একদিন তাঁহার দূরদর্শন ও শ্রবণের (বহু দূরে অবস্থিত ব্যক্তিসকল কি করিতেছে, বলিতেছে, ইহা দেখিবার ও শ্রবণ করিবার) ক্ষমতা আসিয়া উপস্থিত! ধ্যান করিতে বসিয়া একটু ধ্যান জমিলেই মন এমন এক ভূমিতে

সিদ্ধাই যোগভ্রষ্টকারী

উঠিত যে, তিনি দেখিতেন অমুক ব্যক্তি অমুক বাটীতে বসিয়া অমুক প্রসঙ্গে কথাবার্তা কহিতেছেন! ঐরূপ দেখিয়াই আবার প্রাণে ইচ্ছার উদয় হইত, যাহা দেখিলাম তাহা সত্য কি মিথ্যা, জানিয়া আসি। আর অমনি ধ্যান ছাড়িয়া তিনি সেই সেই স্থলে আসিয়া দেখিতেন, যাহা ধ্যানে দেখিয়াছেন তাহার সকলই সত্য, এতটুকু মিথ্যা নহে! কয়েক দিবস ঐরূপ হইবার পর, ঠাকুরকে ঐ কথা বলিবামাত্র ঠাকুর বলিলেন, "ও সকল ঈশ্বরলাভ-পথের অন্তরায়। এখন কিছুদিন আর ধ্যান করিস নি।"

গুটিকাসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রেরও অহঙ্কার বাড়িয়া উঠিয়াছিল। ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, চন্দ্রের মনে ক্রমে কাম-কাঞ্চনাসক্তি বাড়িয়া যায় এবং এক অবস্থাপন্ন সম্ভ্রান্ত ধনী ব্যক্তির কন্যার প্রতি আসক্ত হইয়া ঐ সিদ্ধাইপ্রভাবেই তাহার বাটীতে যাতায়াত করিতে থাকেন; এবং ঐরূপে অহঙ্কার ও স্বার্থপরতার বৃদ্ধিতে ক্রমে ঐ সিদ্ধাইও হারাইয়া বসিয়া নানারূপে লাঞ্ছিত হন।

সিদ্ধাই-লাভে চন্দ্রের পতন

গিরিজারও অদ্ভুত ক্ষমতার কথা ঠাকুর আমাদের বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, একদিন ঠাকুর তাঁহার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে কালীবাটীর নিকটবর্তী শ্রীযুক্ত শম্ভু মল্লিকের বাগানে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। শম্ভু মল্লিক ঠাকুরকে বড়ই ভালবাসিতেন এবং ঠাকুরের কোনরূপ সেবা করিতে পারিলে আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। শম্ভুবাবু ২৫০৲ দিয়া কালীবাড়ীর নিকট কিছু জমি খাজনা করিয়া লইয়া তাহার উপর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীর থাকিবার জন্য ঘর

'বামনী'র শিষ্য গিরিজার কথা

করিয়া দিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তখন তখন গঙ্গাস্নান করিতে এবং ঠাকুরকে দেখিতে আসিলে ঐ ঘরেই বাস করিতেন। ঐ স্থানে থাকিবার কালে এক সময়ে তিনি কঠিন রক্তামাশয় পীড়ায় আক্রান্তা হন; তখন শম্ভুবাবুই চিকিৎসা, পথ্যাদি সকল বিষয়ের বন্দোবস্ত করিয়া দেন। শম্ভুবাবুর ভক্তিমতী পত্নীও ঠাকুর এবং শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে দেবতাজ্ঞানে পূজা করিতেন; প্রতি জয়মঙ্গলবারে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী এখানে থাকিলে তাঁহাকে লইয়া গিয়া দেবীজ্ঞানে পূজা করিতেন। এতদ্ভিন্ন শম্ভুবাবু ঠাকুরের কলিকাতায় গমনাগমনের গাড়ীভাড়া এবং খাদ্যাদির যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তাহাই যোগাইতেন। অবশ্য মথুরবাবুর শরীরত্যাগের পরেই শম্ভুবাবু ঠাকুরের ঐরূপ সেবাধিকার প্রাপ্ত হন। শম্ভুকে ঠাকুর তাঁহার 'দ্বিতীয় রসদ্দার' বলিয়া নির্দেশ করিতেন এবং তখন তখন প্রায়ই তাঁহার উদ্যানে বেড়াইতে যাইয়া তাঁহার সহিত ধর্মালাপে কয়েক ঘণ্টাকাল কাটাইয়া আসিতেন।

গিরিজার সহিত সেদিন শম্ভুবাবুর বাগানে বেড়াইতে যাইয়া কথায়-বার্তায় অনেক কাল কাটিয়া গেল। ঠাকুর বলিতেন,

গিরিজার সিদ্ধাই

"ভক্তদের গাঁজাখোরের মত স্বভাব হয়। গাঁজাখোর যেমন গাঁজার কল্‌কেতে ভরপুর এক দম লাগিয়ে কল্‌কেটা অপরের হাতে দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে থাকে—অপর গাঁজাখোরের হাতে ঐ রূপে কল্‌কেটা না দিতে পারলে যেমন তার একলা নেশা ক'রে সুখ হয় না, ভক্তেরাও সেইরূপ একসঙ্গে জুটলে একজন ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ, ভাবে

তন্ময় হ'য়ে ব'লে ও আনন্দে চুপ করে এবং অপরকে ঐ কথা বলতে অবসর দেয় ও শুনে আনন্দ পায়।" সেদিন শম্ভুবাবু, গিরিজা ও ঠাকুর একসঙ্গে ঐরূপে মিলিত হওয়ায় কোথা দিয়া যে কাল কাটিতে লাগিল তাহা কেহই টের পাইলেন না। ক্রমে সন্ধ্যা ও এক প্রহর রাত্রি হইল, তখন ঠাকুরের ফিরিবার হুঁশ হইল। শম্ভুর নিকট হইতে বিদায় লইয়া গিরিজার সহিত রাস্তায় আসিলেন এবং কালীবাটীর অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় অন্ধকার। পথের কিছুই দেখিতে না পাওয়ায় প্রতি পদে পদস্খলন ও দিক্‌ভুল হইতে লাগিল। অন্ধকারের কথা খেয়াল না করিয়া, ঈশ্বরীয় কথার ঝোঁকে চলিয়া আসিয়াছেন, শম্ভুর নিকট হইতে একটা লণ্ঠন চাহিয়া আনিতে ভুলিয়া গিয়াছেন—এখন উপায়? কোনরূপে গিরিজার হাত ধরিয়া হাতড়াইয়া চলিতে লাগিলেন। কিন্তু বেজায় কষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার ঐরূপ কষ্ট দেখিয়া গিরিজা বলিলেন, "দাদা, একবার দাঁড়াও, আমি তোমায় আলো দেখাইতেছি।"—এই বলিয়া পশ্চাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠদেশ হইতে জ্যোতির একটা লম্বা ছটা নির্গত করিয়া পথ আলোকিত করিলেন। ঠাকুর বলিতেন, "সে ছটায় কালীবাটীর ফটক পর্যন্ত বেশ দেখা যাইতে লাগিল ও আমি আলোয় আলোয় চলিয়া আসিলাম।"

এই কথা বলিয়াই কিন্তু ঠাকুর আবার ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন, "কিন্তু তাদের ঐরূপ ক্ষমতা আর বেশী দিন রহিল না! এখানকার (তাঁহার নিজের) সঙ্গে কিছুদিন থাকতে থাকতে ঐ সকল সিদ্ধাই চ'লে গেল।" আমরা ঐরূপ হইবার কারণ

জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন, (নিজের শরীর দেখাইয়া) "মা এর ভেতরে তাদের কল্যাণের জন্য তাদের সিদ্ধাই বা শক্তি আকর্ষণ ক'রে নিলেন। আর ঐরূপ হবার পর তাদের মন আবার ঐ সব ছেড়ে ঈশ্বরের দিকে এগিয়ে গেল!"

গুরুভাবে ঠাকুরের চন্দ্র ও গিরিজার সিদ্ধাই-নাশ

এই বলিয়াই ঠাকুর আবার বলিলেন, "ও-সকলে আছে কি? ও-সব সিদ্ধাইয়ের বন্ধনে প'ড়ে মন সচ্চিদানন্দ থেকে দূরে চ'লে যায়। একটা গল্প শোন্—একজনের দুই ছেলে ছিল। বড়র যৌবনেই বৈরাগ্য হ'লো ও সংসার-ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেল। আর ছোট লেখা-পড়া শিখে ধার্মিক বিদ্বান্ হ'য়ে বিবাহ ক'রে সংসারধর্ম করতে লাগলো। এখন সন্ন্যাসীদের নিয়ম—বার বৎসর অন্তে, ইচ্ছা হ'লে একবার জন্মভূমি দর্শন করতে যায়। ঐ সন্ন্যাসীও ঐরূপে বার বৎসর বাদে জন্মভূমি দেখতে আসে এবং ছোট ভায়ের জমী, চাষ-বাস, ধন-ঐশ্বর্য দেখতে দেখতে তার বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়িয়ে তার নাম ধ'রে ডাকতে লাগল। নাম শুনে ছোট ভাই বাইরে এসে দেখে—তার বড় ভাই! অনেক দিন পরে ভাইয়ের সঙ্গে দেখা—ছোট ভায়ের আর আনন্দের সীমা রইল না! দাদাকে প্রণাম ক'রে বাড়িতে এনে বসিয়ে তার সেবাদি করতে লাগল। আহারান্তে দুই ভাইয়ে নানা প্রসঙ্গ হ'তে লাগল। তখন ছোট বড়কে জিজ্ঞাসা করলে, 'দাদা, তুমি যে এই সংসারের ভোগ-সুখ সব ত্যাগ ক'রে এতদিন সন্ন্যাসী হ'য়ে ফিরলে, এতে কি লাভ

'সিদ্ধাই ভগবানলাভের অন্তরায়; ঐ বিষয়ে ঠাকুরের 'পায়ে হেঁটে নদী পারের' গল্প

করলে আমাকে বল।' শুনেই দাদা বললে, 'দেখবি? তবে আমার সঙ্গে আয়।'—বলেই ছোট ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ির নিকটে নদীতীরে এসে উপস্থিত হ'ল এবং বললে, 'এই দেখ।'—ব'লেই নদীর জলের উপর দিয়ে হেঁটে পরপারে চলে গেল! গিয়ে বললে, 'দেখলি?' ছোট ভাইও পার্শ্বের খেয়া নৌকার মাঝিকে আধ পয়সা দিয়ে নদী পেরিয়ে বড় ভায়ের নিকটে গিয়ে বললে, 'কি দেখলুম?' বড় বললে, 'কেন? এই হেঁটে নদী পেরিয়ে আসা?' তখন ছোট ভাই হেসে বললে, 'দাদা, তুমিও তো দেখলে—আমি আধ পয়সা দিয়ে এই নদী পেরিয়ে এলুম। তা তুমি এই বার বৎসর এত কষ্ট স'য়ে এই পেয়েছ? আমি যা আধ পয়সায় অনায়াসে করি, তাই পেয়েছ? ও ক্ষমতার দাম তো আধ পয়সা মাত্র!' ছোটর ঐ কথায় বড ভায়ের তখন চৈতন্য হয় এবং ঈশ্বরলাভে মন দেয়।"

ঐরূপে কথাচ্ছলে ঠাকুর কত প্রকারেই না আমাদের বুঝাইতেন যে, ধর্মজগতে ঐ প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষমতালাভ অতি তুচ্ছ, হেয়, অকিঞ্চিৎকর পদার্থ! ঠাকুরের ঐরূপ আর একটি গল্পও আমরা এখানে না দিয়া থাকিতে পারিলাম না—"একজন যোগী যোগসাধনায় বাক্‌সিদ্ধি লাভ করেছিল। যাকে যা বলতো তাই তৎক্ষণাৎ হোত; এমন কি কাকেও যদি বল্‌ত 'মর্', তো সে অমনি ম'রে যেত, আবার যদি তখনি বল্‌ত 'বাঁচ', তো তখনি বেঁচে উঠত! একদিন ঐ যোগী পথে যেতে একজন ভক্ত সাধুকে দেখতে পেলে। দেখলে, তিনি

সিদ্ধাইয়ে অহঙ্কার-বৃদ্ধি-বিষয়ে ঠাকুরের 'হাতী-মরা-বাঁচান' গল্প

সর্বদা ঈশ্বরের নাম জপ ও ধ্যান কচ্ছেন। শুনলে, ঐ ভক্ত সাধুটি ঐ স্থানে অনেক বৎসর ধ'রে ঐরূপে তপস্যা কচ্ছেন। দেখে-শুনে অহঙ্কারী যোগী ঐ সাধুটির কাছে গিয়ে বললে, 'ওহে, এতকাল ধ'রে তো 'ভগবান ভগবান' করচ, কিছু পেলে বলতে পার?' ভক্ত সাধু বললেন, 'কি আর পাব বলুন। তাঁকে (ঈশ্বরকে) পাওয়া ছাড়া আমার তো আর অন্য কোন কামনা নেই। আর তাঁকে পাওয়া তাঁর কৃপা না হ'লে হয় না। তাই প'ড়ে প'ড়ে তাঁকে ডাকৃচি, দীন হীন ব'লে যদি কোন দিন কৃপা করেন।' যোগী ঐ কথা শুনেই বললে, 'যদি না-ই কিছু পেলে, তবে এ পণ্ডশ্রমের আবশ্যক কি? যাতে কিছু পাও তার চেষ্টা কর।' ভক্ত সাধুটি শুনিয়া চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বললেন, 'আচ্ছা মশায়, আপনি কি পেয়েছেন—শুনতে পাই কি?' যোগী বললে, 'শুন্‌বে আর কি—এই দেখ।' এই ব'লে নিকটে বৃক্ষতলে একটা হাতী বাঁধা ছিল, তাকে বললে 'হাতী, তুই মর।' অমনি হাতীটা ম'রে প'ড়ে গেল! যোগী দম্ভ করে বললে, 'দেখলে? আবার দেখ।' ব'লেই মরা হাতীটাকে বললে, 'হাতী, তুই বাঁচ।' অমনি হাতীটা বেঁচে পূর্বের ন্যায় গা ঝেড়ে উঠে দাঁড়াল! যোগী বললে, 'কি হে, দেখলে তো?' ভক্ত সাধু এতক্ষণ চুপ ক'রে ছিলেন্; এখন বল্লেন, 'কি আর দেখলুম বলুন—হাতীটা একবার মলো, আবার বাঁচলো, কিন্তু বলবেন কি, হাতীর ঐরূপ মরা-বাঁচায় আপনার কি এসে গেল? আপনি কি ঐরূপ শক্তিলাভ করে বার বার জন্ম-মৃত্যুর হাত থেকে মুক্তি পেয়েছেন? জরা-ব্যাধি কি আপনাকে ত্যাগ করেছে? না, আপনার

অখণ্ড-সচ্চিদানন্দস্বরূপ দর্শন হয়েছে?' যোগী তখন নির্বাক হ'য়ে রইল এবং তার চৈতন্য হ'ল।"

চন্দ্র[১] ও গিরিজা এইরূপে ভৈরবী ব্রাহ্মণীর সহায়তায় ঈশ্বরীয় পথে অনেকদূর অগ্রসর হইলেও সিদ্ধকাম হইতে পারেন নাই।

১ ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে পূজ্যপাদ স্বামী বিবেকানন্দ দ্বিতীয়বার ইংলণ্ড ও আমেরিকা যাত্রা করেন। উহারই কিছুকাল পরে বেলুড় মঠে একদিন এক ব্যক্তি সহসা আসিয়া আপনাকে 'চন্দ্র' বলিয়া পরিচয় দেন এবং প্রায় মাসাবধিকাল তথায় বাস করেন। পূজনীয় স্বামী ব্রহ্মানন্দ তখন সর্বদা মঠেই থাকিতেন। তাঁহার সহিত ঐ ব্যক্তির গোপনে অনেক কথাবার্তাও হইতে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি তিনি স্বামীজিকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেন —"আপনি কি এখানে কিছু টের পান? অর্থাৎ, ঠাকুরের জাগ্রত সত্তা কিছু অনুভব করেন?"—ইত্যাদি।

তিনি বলিতেন, ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছিলেন তাহার সমুদয় কথাই সত্য ঘটিয়াছে। কেবল মৃত্যুর পূর্বে তাঁহাকে দর্শন দিতে যে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন ঐ কথাটিই সত্য বলিয়া প্রত্যক্ষ করিতে তাঁহার তখনও বাকি আছে। লোকটি মঠের ঠাকুরঘরে গিয়া প্রতিদিন অনেকক্ষণ অতি ভক্তির সহিত জপ-ধ্যান করিতেন। ঐ সময় তাঁহার চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রুও পড়িত। ঠাকুরের সম্বন্ধে কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে ইনি তৎসম্বন্ধে যাহা জানিতেন তাহা অতি আনন্দের সহিত বলিতেন। ইঁহাকে অতি শান্ত প্রকৃতির লোক বলিয়াই আমাদের বোধ হইয়াছিল। লোকটিকে সর্বদা একস্থানে নিস্তব্ধভাবে বসিয়া থাকিতে এবং সময়ে সময়ে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া থাকিতে দেখিয়া এক সময়ে একজন ইহাকে উপহাসচ্ছলে জিজ্ঞাসা করেন—"মহাশয়ের কি আফিম খাওয়া অভ্যাস আছে?" উহাতে তিনি অতি বিনীতভাবে বলিয়াছিলেন—"আমি আপনাদের নিকট কি অপরাধে অপরাধী হইয়াছি যে ঐরূপ কথা বলিতেছেন?"

ঠাকুরঘরে যাইয়া প্রথম প্রণামকালে তিনি ঠাকুরের শ্রীমূর্তিকে 'দাদা' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং ভাবে-প্রেমে আবিষ্ট হইয়া অজস্র নয়নাশ্রু বর্ষণ করেন। তাঁহাকে দেখিলে সাধারণ লোকের ন্যায়ই বোধ হইত। গৈরিক বা তিলকাদির আড়ম্বর ছিল না। পরিধানে সামান্য একখানি ধুতি ও উড়ানি এবং হাতে ছাতি ও একটি কাম্বিসের ব্যাগ মাত্র ছিল। ব্যাগের ভিতর আর একখানি

ঠাকুরের জ্বলন্ত দর্শনলাভ করিয়া এবং তাঁহার দিব্যশক্তিবলে অহঙ্কারের মূল ঐ সকল সিদ্ধাইয়ের নাশ হওয়াতেই তাঁহাদের ঐ বিষয়ে চৈতন্য হয় এবং দ্বিগুণ উৎসাহে পুনরায় ঈশ্বরীয় পথে অগ্রসর হইতে থাকেন।

'বামনী'র নির্বিকল্প অদ্বৈতভাব লাভ হয় নাই; তদ্বিষয়ে প্রমাণ

ভৈরবী ব্রাহ্মণী স্বয়ং সাধনে বহুদূর অগ্রসর হইলেও অখণ্ড সচ্চিদানন্দলাভে পূর্ণত্বপ্রাপ্ত যে হন নাই, তাহারও পরিচয় আমরা বেশ পাইয়া থাকি। বেদান্তের শেষভূমি, নির্বিকল্প অবস্থার অধিকারী 'ন্যাংটা' তোতাপুরী যখন ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটীতে প্রথম আগমন করেন, তখন ঠাকুরের ব্রাহ্মণীর সহায়তায় তন্ত্রোক্ত সাধনসমূহে সিদ্ধিলাভ হইয়াই গিয়াছে। তোতাপুরী ঠাকুরকে দেখিয়াই বেদান্ত-পথের অতি উত্তম অধিকারী বলিয়া চিনিতে পারিয়া যখন তাঁহাকে সন্ন্যাস-দীক্ষা প্রদান করিয়া নির্বিকল্প সমাধিসাধনের বিষয় উপদেশ করেন, তখন ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে ঐ বিষয় হইতে নিরস্ত করিবার অনেক প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন, "বাবা, (ব্রাহ্মণী ঠাকুরকে পুত্রজ্ঞানে ঐরূপ সম্বোধন করিতেন) ওর কাছে বেশী যাওয়া-আসা ক'রো না, বেশী মেশামেশি ক'রো

পরিধেয় ধুতি, গামছা ও বোধ হয় একটি জল খাইবার ঘটি মাত্র ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন, তিনি ঐরূপে প্রায়ই তীর্থে তীর্থে পর্যটন করিয়া বেড়ান। স্বামী ব্রহ্মানন্দ ইঁহাকে বিশেষ আদর-সম্মান করিয়া মঠেই চিরকাল থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। ইনিও সম্মত হইয়া বলিয়াছিলেন, "দেশের জমীগুলোর একটা বন্দোবস্ত করিয়া আসিয়া এখানে থাকিব।" কিন্তু তদবধি আর ঐ ব্যক্তি এ পর্যন্ত মঠে আসেন নাই। প্রসঙ্গোক্ত চন্দ্র সম্ভবতঃ তিনিই হইবেন।

না ; ওদের সব শুষ্ক পথ। ওর সঙ্গে মিশলে তোমার ঈশ্বরীয় ভাব-প্রেম সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।" ইহাতে বেশ অনুমিত হয় যে, বিদুষী ব্রাহ্মণী ভগবদ্ভক্তিতে অসামান্যা হইলেও একথা জানিতেন না বা স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, বেদান্তোক্ত যে নির্বিকল্প অবস্থাকে তিনি শুষ্কমার্গ বলিয়া নির্দেশ ও ধারণা করিয়াছিলেন, তাহাই যথার্থ পরাভক্তি-লাভের প্রথম সোপান—যে, শুদ্ধ-বুদ্ধ আত্মারাম পুরুষেরাই কেবলমাত্র ঈশ্বরকে সকল প্রকার হেতুশূন্য হইয়া ভক্তি-প্রেম করিতে পারেন, এবং ঠাকুর যেমন বলিতেন—'শুদ্ধাভক্তি ও শুদ্ধজ্ঞান—দুইই এক পদার্থ।' আমাদের অনুমান, ব্রাহ্মণী একথা বুঝিতেন না এবং বুঝিবেন না বলিয়াই ঠাকুর মস্তক মুণ্ডিত করিয়া গৈরিক ধারণ ও পুরী স্বামীজির নিকট হইতে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষাগ্রহণপূর্বক নির্বিকল্প সমাধি-সাধনের সময় নিজ গর্ভধারিণী মাতার নিকট যেমন উহা গোপন করিয়াছিলেন, ভৈরবী ব্রাহ্মণীর নিকটেও তেমনি ঐ বিষয় গোপন রাখিয়াছিলেন। শুনিয়াছি, ঠাকুরের বৃদ্ধা মাতা ঐ সময়ে দক্ষিণেশ্বরের উত্তর দিকের নহবতখানার উপরে থাকিতেন এবং ঠাকুর ঐরূপে বেদান্তসাধনকালে তিন দিন গৃহমধ্যে আবদ্ধ থাকিয়া সকলের চক্ষুর অন্তরালে অবস্থান করিয়াছিলেন। কেবল পুরী গোস্বামী মাত্র ঐ সময়ে তাঁহার নিকট মধ্যে মধ্যে গমনাগমন করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ঠাকুর ব্রাহ্মণীর ঐ কথায় কর্ণপাতও করেন নাই।

ঠাকুরের মুখে যতদূর শুনিয়াছি, তাহাতে ভৈরবী ব্রাহ্মণী তন্ত্রোক্ত বীরভাবের উপাসিকা ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। তন্ত্রে

পশু, বীর ও দিব্য এই তিন ভাবে ঈশ্বরসাধনার পথ নির্দিষ্ট আছে। পশুভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের আধিক্য থাকে; সেজন্য তিনি সর্বপ্রকার প্রলোভনের বস্তু হইতে দূরে থাকিবেন এবং বাহ্যিক শৌচাচার প্রভৃতির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া ভগবানের নামজপ, পুরশ্চরণাদিতে প্রবৃত্ত থাকিবেন। বীর-ভাবের সাধকে কাম-ক্রোধাদি পশুভাবের অপেক্ষা ঈশ্বরানুরাগ প্রবল থাকে। কাম-কাঞ্চন, রূপ-রসাদির আকর্ষণ তাঁহার ভিতর ঈশ্বরানুরাগকেই প্রবলতর করিয়া দেয়। সেজন্য তিনি কাম-কাঞ্চনাদির প্রলোভনের ভিতর বাস করিয়া উহাদের ঘাত-প্রতিঘাতে অবিচলিত থাকিয়া ঈশ্বরে সমগ্র মন-প্রাণ অর্পণ করিতে চেষ্টা করিবেন। দিব্যভাবের সাধক কেবলমাত্র তিনিই হইতে পারেন, যাঁহাতে ঈশ্বরানুরাগের প্রবল প্রবাহে কাম-ক্রোধাদি একেবারে চিরকালের মত ভাসিয়া গিয়াছে, এবং নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায়-যাঁহাতে ক্ষমাজব-দয়া-তোষ-সত্যাদি সদ্গুণসমূহের অনুষ্ঠান স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মোটামুটি বলিতে গেলে ঐ তিন ভাব সম্বন্ধে ইহাই বলা যায়। বেদান্তোক্ত উত্তম অধিকারীই তন্ত্রোক্ত দিব্যভাবের ভাবুক, মধ্যম অধিকারীই বীরভাবের এবং অধমাধিকারীই পশুভাবের সাধক।

তন্ত্রোক্ত পশু বীর ও দিব্যভাব-নির্ণয়

বীরভাবের সাধকাগ্রণী হইলেও ভৈরবী ব্রাহ্মণী তখনও দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে পারেন নাই। ঠাকুরের জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া এবং তাঁহার সহায়তালাভ করিয়াই ব্রাহ্মণীর ক্রমে দিব্যভাবের অধিকারলাভের বাসনা আসিয়া উপস্থিত হয়।

ব্রাহ্মণী দেখিলেন—গ্রহণের কথা দূরে থাকুক, সিদ্ধি বা কারণের নাম মাত্রেই ঠাকুর জগৎকারণ-ঈশ্বরভাবে বিহ্বল হইয়া পড়েন; সতী বা নটী কোন স্ত্রীমূর্তি দেখিবামাত্রই তাঁহার মনে শ্রীশ্রীজগদম্বার হ্লাদিনী ও সন্ধিনী শক্তির কথার উদয় হইয়া তাঁহাতে সন্তানভাবই আনিয়া দেয়, এবং কাঞ্চনাদি-ধাতুসংস্পর্শে সুপ্তাবস্থায়ও তাঁহার হস্তাদি অঙ্গ সঙ্কুচিত হইয়া যায়! এ জ্বলন্ত পাবকের নিকট থাকিয়া কাহার না ঈশ্বরানুরাগ প্রদীপ্ত হইয়া উঠে? কে না এই দুই দিনের বিষয়-বিভবাদির প্রতি বীতরাগ হইয়া ঈশ্বরকেই আপনার হইতে আপনার, চিরকালের আত্মীয় বলিয়া ধারণা না করিয়া থাকিতে পারে? এজন্যই ব্রাহ্মণীর জীবনের অবশিষ্টকাল তীব্র তপস্যায় কাটাইবার কথা আমরা শুনিতে পাইয়া থাকি।

শিবসাধিকা 'বামনী' দিব্যভাবের অধিকারিণী হইতে তখনও সমর্থা হন নাই

ঠাকুর অপর কাহারও সহিত বেশী মেশামেশি করিলে বা অন্য কোন ঈশ্বরভক্ত সাধককে অধিক সম্মান প্রদর্শন করিলে ব্রাহ্মণীর মনে হিংসার উদয় হইত, একথাও আমরা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছি। ন্যাওটো ছেলে বড় হইয়া বাটীর অপর কাহাকেও ভালবাসিলে বা আদর-যত্ন করিলে তাহার ঠাকুরমা বা অন্য কোন বৃদ্ধা আত্মীয়ার (যাহার নিকটে সে এতদিন পালিত হইয়া আসিয়াছে) মনে যেরূপ ঈর্ষা, দুঃখ ও কষ্ট উপস্থিত হয়, ব্রাহ্মণীরও ঠাকুরের প্রতি ঐ ভাব যে সেই প্রকারের, ইহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি! কিন্তু ব্রাহ্মণীর ন্যায় অত উচ্চদরের সাধিকার

ঐ বিষয়ে প্রমাণ

মনে ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। যিনি ঠাকুরকে খাইতে, শুইতে, বসিতে, দিবারাত্র চব্বিশ ঘণ্টা এতকাল ধরিয়া সকল অবস্থায় সকল ভাবে দেখিবার অবসর পাইয়াছিলেন, তাঁহার ঐরূপ হওয়া উচিত ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুরের ভালবাসা ও শ্রদ্ধাদি অপরের ন্যায় 'এই আছে এই নাই' গোছের ছিল না। তাঁহার জানা উচিত ছিল যে, ঠাকুর তাঁহার উপর যে ভক্তি-শ্রদ্ধা একবার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাহা চিরকালের মতই অর্পিত হইয়াছিল—তাহাতে আর জোয়ার-ভাঁটা খেলিত না। কিন্তু হায়, মায়িক ভালবাসা ও স্ত্রীলোকের মন, তোমরা সর্বদাই ভালবাসার পাত্রকে চিরকালের মত বাঁধিয়া নিজস্ব করিয়া রাখিতে চাও! এতটুকু স্বাধীনতা তাঁহাকে দিতে চাও না। মনে কর স্বাধীনতা পাইলেই তোমাদের ভালবাসার পাত্র আর তোমাদের থাকিবে না, অপর কাহাকেও তোমাদের অপেক্ষা অধিক ভালবাসিয়া ফেলিবে। তোমরা বুঝ না যে, তোমাদের অন্তরের দুর্বলতাই তোমাদিগকে ঐরূপ করিতে শিখাইয়া দেয়। তোমরা বুঝ না যে, যে ভালবাসা ভালবাসার পাত্রকে স্বাধীনতা দেয় না—যাহা আপনাকে সম্পূর্ণরূপে ভুলিয়া সে যাহা চাহে তাহাতেই আনন্দানুভব করিতে জানে না বা শিখে না, তাহা প্রায়ই স্বল্পকালে বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব যদি যথার্থই কাহাকেও প্রাণের ভালবাসা দিয়া থাক, তবে নিশ্চিন্ত থাকিও, তোমার ভালবাসার পাত্র তোমারই থাকিবে এবং ঐ শুদ্ধ স্বার্থসম্পর্কশূন্য ভালবাসা শুধু তোমাকে নহে, তাহাকেও চরমে ঈশ্বরদর্শন ও সর্ববন্ধনবিমুক্তি পর্যন্ত আনিয়া দিবে।

ব্রাহ্মণী উচ্চদরের প্রেমিক সাধিকা হইলেও যে পূর্বোক্ত কথাটি বুঝিতেন না, বা বুঝিয়াও ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই, ইহা নিতান্ত আশ্চর্যের বিষয় বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিকই তাঁহার ঐ ধারণার অভাব ছিল; এবং শ্রীরামকৃষ্ণদেবের গুরুপদে ভাগ্যক্রমে বৃত হইয়া 'তিনি সর্বাপেক্ষা বড়, তাঁহার কথা সকলে সর্বদা মানিয়া চলুক, না চলিলে তাহাদের কল্যাণ নাই'—এই প্রকার ভাবসমূহও তাঁহার মনে ধীরে ধীরে আসিয়া উপস্থিত হইতেছিল। আমরা শুনিয়াছি, ঠাকুর শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানীকে যে কখন কখন শিক্ষা প্রদান করিতেন, তাহাতেও তিনি ঈর্ষান্বিতা হইতেন। শুনিয়াছি, শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরানী তাঁহার ঐ প্রকার ভাবপ্রকাশে সর্বদা ভীতা, সঙ্কুচিতা হইয়া থাকিতেন। যাহা হউক, পরিশেষে ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণী তাঁহার মনের এই দুর্বলতার কথা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন, এ অবস্থায় ঠাকুরের নিকট হইতে দূরে থাকিলেই তবে তিনি তাঁহার এই মনোভাব-জয়ে সমর্থা হইবেন; এবং বুঝিয়াছিলেন যে, ঠাকুরের প্রতি তাঁহার এই প্রকার আকর্ষণ সোনার শিকলে বন্ধনের ন্যায় হইলেও, উহা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অভীষ্ট পথে অগ্রসর হইতে হইবে। আমরা বেশ বুঝিতে পারি, এজন্যই ব্রাহ্মণী পরিশেষে দক্ষিণেশ্বর ও ঠাকুরের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন এবং 'রম্‌তা সাধু ও বহ্‌তা জল কখন মলিন হয় না'[১] ভাবিয়া অসঙ্গ হইয়া তীর্থে তীর্থে পর্যটন ও তপস্যায়

ঠাকুরের কৃপায় ব্রাহ্মণীর নিজ আধ্যাত্মিক অভাব-বোধ ও তপস্যা করিতে গমন

১ সংসারবিবাগী সাধুদিগের ভিতর প্রচলিত একটি উক্তি। 'রমতা'—

কালহরণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের গুরুভাবসহায়েই যে ব্রাহ্মণীর এইপ্রকার চৈতন্যের উদয় হয়, ইহা আর বলিতে হইবে না।

তোতাপুরী গোস্বামীর কথা

তোতাপুরী লম্বা-চওড়া সুদীর্ঘ পুরুষ ছিলেন। চল্লিশ বৎসর ধ্যান-ধারণা এবং অসঙ্গভাবে বাস করিবার ফলে তিনি নির্বিকল্প সমাধিতে মন স্থির, বৃত্তিমাত্রহীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তত্রাপি তিনি নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান এবং সমাধিতে অনেককাল কাটাইতেন। সর্বদা বালকের ন্যায় উলঙ্গ থাকিতেন বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে 'ল্যাংটা' নামে নির্দেশ করিতেন। বিশেষতঃ আবার গুরুর নাম সর্বদা গ্রহণ করিতে নাই, বা নাম ধরিয়া তাঁহাকে ডাকিতে নাই বলিয়াই বোধ হয় ঐরূপ করিতেন। ঠাকুর বলিতেন, ল্যাংটা কখন ঘরের ভিতর থাকিতেন না এবং নাগাসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া সর্বদা অগ্নিসেবা করিতেন। নাগা-সাধুরা অগ্নিকে মহা পবিত্রভাবে দর্শন করে; এবং সেজন্য যেখানেই যখন থাকুক না কেন, কাষ্ঠাহরণ করিয়া নিকটে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখে। ঐ অগ্নি সচরাচর 'ধুনি' নামে অভিহিত হয়। নাগা সাধু ধুনিকে সকাল সন্ধ্যা আরতি করিয়া থাকে এবং ভিক্ষালব্ধ আহার্য-সমুদয় প্রথমে ধুনিরূপী অগ্নিকে নিবেদন করিয়া তবে স্বয়ং গ্রহণ করে। দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে 'ল্যাংটা' সেজন্য

অর্থাৎ নিরন্তর যিনি একস্থানে না থাকিয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, এই প্রকার সাধুতে এবং যে জলে প্রবাহ বা নিরন্তর স্রোত বহিতেছে, এইরূপ জলে কখনও মলিনতা দাঁড়াইতে পারে না। নিত্যপর্যটনশীল সাধুর মন কখনও কোন বস্তু বা ব্যক্তিতে আসক্ত হয় না, ইহাই অর্থ।

পঞ্চবটীর বৃক্ষতলেই আসন করিয়া অবস্থান করিতেন এবং পার্শ্বে ধুনি জ্বালাইয়া রাখিতেন। রৌদ্র হউক, বর্ষা হউক 'ল্যাংটা'র ধুনি সমভাবেই জ্বলিত। আহার বল, শয়ন বল 'ল্যাংটা' ঐ ধুনির ধারেই করিতেন। আর যখন গভীর নিশীথে সমগ্র বাহ্যজগৎ বিরামদায়িনী নিদ্রার ক্রোড়ে সকল চিন্তা ভুলিয়া মাতৃ-ক্রোড়ে শিশুর ন্যায় সুখশয়ন লাভ করিত, 'ল্যাংটা' তখন উঠিয়া ধুনি অধিকতর উজ্জ্বল করিয়া অচল অটল সুমেরুবৎ আসনে বসিয়া নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির মনকে সমাধিমগ্ন করিতেন। দিনের বেলায়ও 'ল্যাংটা' অনেক সময় ধ্যান করিতেন। কিন্তু লোকে না জানিতে পারে এমন ভাবে করিতেন। সেজন্য পরিধেয় চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করিয়া ধুনির ধারে শবের ন্যায় লম্বা হইয়া 'ল্যাংটা'কে শয়ন করিয়া থাকিতে অনেক সময় দেখা যাইত। লোকে মনে করিত, 'ল্যাংটা' নিদ্রা যাইতেছেন।

'ল্যাংটা' নিকটে একটি জলপাত্র বা 'লোটা', একটি সুদীর্ঘ চিম্‌টা এবং আসন করিয়া বসিবার জন্য একখণ্ড চর্মমাত্র রাখিতেন এবং একখানি মোটা চাদরে সর্বদা স্বীয় দেহ আবৃত করিয়া থাকিতেন। লোটা ও চিম্‌টাটি 'ল্যাংটা' নিত্য মাজিয়া ঝকঝকে রাখিতেন। 'ল্যাংটা'র ঐরূপ নিত্য ধ্যানানুষ্ঠান দেখিয়া ঠাকুর একদিন তাঁহাকে জিজ্ঞাসাই করিয়া বসিলেন, 'তোমার তো ব্রহ্মলাভ হয়েছে, সিদ্ধ হয়েছ, তবে কেন আবার নিত্য ধ্যানাভ্যাস কর?' 'ল্যাংটা' ইহাতে ধীরভাবে

ঠাকুর ও পুরী গোস্বামীর পরস্পর ভাব-আদান-প্রদানের কথা

ঠাকুরের দিকে চাহিয়া অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া লোটাটি দেখাইয়া বলিলেন, 'কেমন উজ্জ্বল দেখছ? আর যদি নিত্য না মাজি?—মলিন হ'য়ে যাবে, না? মনও সেইরূপ জানবে। ধ্যানাভ্যাস ক'রে মনকেও ঐরূপে নিত্য না মেজে-ঘ'ষে রাখলে মলিন হয়ে পড়ে।' তীক্ষ্ণদৃষ্টিসম্পন্ন ঠাকুর 'ল্যাংটা' গুরুর কথা মানিয়া লইয়া বলিলেন, "কিন্তু যদি সোনার লোটা হয়? তা হলে তো আর নিত্য না মাজলেও ময়লা ধরে না।" 'ল্যাংটা' হাসিয়া স্বীকার করিলেন, "হাঁ, তা বটে।" নিত্য ধ্যানাভ্যাসের উপকারিতা সম্বন্ধে 'ল্যাংটা'র কথাগুলি ঠাকুরের চিরকাল মনে ছিল এবং বহুবার তিনি উহা 'ল্যাংটা'র নাম করিয়া আমাদের নিকট বলিয়াছিলেন। আর আমাদের ধারণা—ঠাকুরের 'সোনার লোটায় ময়লা ধরে না' কথাটি 'ল্যাংটা'র মনেও চিরাঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। 'ল্যাংটা' বুঝিয়াছিল, ঠাকুরের মন বাস্তবিকই সোনার লোটার মত উজ্জ্বল! গুরু-শিষ্যে এইরূপ আদান-প্রদান ইঁহাদের ভিতরে প্রথমাবধিই চলিত।

বেদান্তশাস্ত্রে আছে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই মানুষ একেবারে ভয়শূন্য হয়। সম্পূর্ণ অভীঃ হইবার উহাই একমাত্র পথ। বাস্তবিক কথা। যিনি জানিতে পারেন যে, তিনি স্বয়ং নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-স্বভাব, অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ সর্বব্যাপী অজরামর আত্মা, তাঁহার মনে ভয় কিসে, কাহারই বা দ্বারা হইবে? যিনি, এক ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু বা ব্যক্তি জগতে নাই, ইহা সত্য সত্যই দেখিতে পান, সর্বদা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেন, তাঁহার ভয় কি করিয়া, কোথায়ই বা

ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষের নির্ভীকতা ও বন্ধনবিমুক্তি সম্বন্ধে শাস্ত্র

হইবে? খাইতে, শুইতে, বসিতে, নিদ্রায়, জাগরণে, সর্বাবস্থায়, সকল সময়ে তিনি দেখেন—তিনি অখণ্ড সচ্চিদানন্দস্বরূপ; সকলের ভিতর, সর্বত্র, সর্বদা তিনি পূর্ণ হইয়া আছেন; তাঁহার আহার নাই, বিহার নাই, নিদ্রা নাই, জাগরণ নাই, অভাব নাই, আলস্য নাই, শোক নাই, হর্ষ নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, অতীত নাই, ভবিষ্যৎ নাই—মানব পঞ্চেন্দ্রিয় ও মন-বুদ্ধি সহায়ে যাহা কিছু দেখে, শুনে, চিন্তা বা কল্পনা করে, তাহার কিছুই নাই। এই প্রকার অনুভবকেই শাস্ত্র 'নেতি নেতি'র বিরামাবস্থা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং ইহারই পরে পূর্ণস্বরূপ আত্মার অবস্থান ও প্রত্যক্ষদর্শন বলিয়াছেন। এই আত্মদর্শন সদা-সর্বক্ষণ হওয়ার নামই 'জ্ঞানে অবস্থান', এবং এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান হইলেই সর্ববন্ধনবিমুক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ঠাকুর বলিতেন, এই প্রকার জ্ঞানে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে হইলে জীবের শরীর একুশ দিন মাত্র থাকিয়া শুষ্ক পত্রের ন্যায় পড়িয়া যায় বা নষ্ট হইয়া যায় এবং আর সে এ সংসারের ভিতর অহং-জ্ঞান লইয়া ফিরিয়া আসে না। জীবন্মুক্ত পুরুষদিগের মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের নিমিত্ত এই জ্ঞানে অবস্থান ও আত্মার দর্শন হইতে হইতে পরিশেষে পূর্ণ অবস্থান ও দর্শন আসিয়া উপস্থিত হয়। আর নিত্যমুক্ত ঈশ্বরকোটি পুরুষ, যাঁহারা কোন বিশেষ সত্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া বহুজনের কল্যাণসাধন করিতেই জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহারাও বাল্যাবধি মধ্যে মধ্যে স্বল্পকালের জন্য এই জ্ঞানে অবস্থান করেন এবং যে কর্মের জন্য আসিয়াছেন, সেই কর্ম শেষ হইলে পরিশেষে সম্পূর্ণরূপে জ্ঞানস্বরূপে অবস্থান করেন। আবার, যাঁহাদের অলৌকিক

আধ্যাত্মিক শক্তি দেখিয়া জগৎ এ পর্যন্ত ধারণা করিতে পারে নাই, তাঁহারা ঈশ্বর স্বয়ং মানব-কল্যাণের নিমিত্ত মূর্তিপরিগ্রহ করিয়া আসিয়াছেন, অথবা অত্যদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন মানব; সেই অবতার পুরুষেরা এই পূর্ণ জ্ঞানাবস্থায় বাল্যাবধি ইচ্ছামাত্র উঠিতে, যতকাল ইচ্ছা থাকিতে এবং পুনরায় ইচ্ছামত লোক-কল্যাণের নিমিত্ত জন্ম-জরা-শোক-হর্ষাদির মিলনভূমি সংসারে আসিতে পারেন। ঠাকুরের শিক্ষাগুরু শ্রীমৎ তোতাপুরী গোস্বামী চল্লিশ বৎসর কঠোর সাধনের ফলে পূর্বোক্ত জীবন্মুক্তাবস্থা লাভ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য তাঁহার আহার বিহার শয়ন উপবেশন প্রভৃতি সকল কার্যই মানব-সাধারণের ন্যায় ছিল না। নিত্যমুক্ত বায়ুর ন্যায় তিনি বাধাশূন্য হইয়া যত্র তত্র বিচরণ করিয়া বেড়াইতেন; বায়ুর ন্যায়ই তাঁহাকে সংসারের দোষ-গুণ কখনও স্পর্শ করিতে পারিত না এবং বায়ুর ন্যায়ই তিনি কখন একস্থানে আবদ্ধ হইয়া থাকিতে পারিতেন না। কারণ ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছি, তোতা তিন দিনের অধিক কোথাও অবস্থান করিতে পারিতেন না। ঠাকুরের অদ্ভুতাকর্ষণে কিন্তু তোতা দক্ষিণেশ্বরে একাদিক্রমে এগার মাস কাল অবস্থান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের কি অদ্ভুত মোহিনী শক্তিই ছিল!

তোতাপুরীর উচ্চ অবস্থা

তোতার নির্ভীকতা সম্বন্ধে ঠাকুর অনেক কথা আমাদের বলিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটি ভুতুড়ে ঘটনাও বলেন, তাহা এই—গভীর নিশীথে তোতা একদিন ধুনি উজ্জ্বল করিয়া ধ্যানে

বসিবার উপক্রম করিতেছেন ; জগৎ নীরব, নিস্তব্ধ ; ঝিল্লী ও মধ্যে মধ্যে মন্দির-চূড়ায় অবস্থিত পেচকের গম্ভীর নিঃস্বন ভিন্ন আর কোন শব্দই শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বায়ুরও সঞ্চার নাই। সহসা পঞ্চবটীর বৃক্ষশাখাসকল আলোড়িত হইতে লাগিল এবং দীর্ঘাকার মানবাকৃতি এক পুরুষ বৃক্ষের উপর হইতে নিম্নে নামিয়া তোতার দিকে স্থির দৃষ্টিতে দেখিতে দেখিতে ধীর পদবিক্ষেপে পুরী গোস্বামীর ধুনির পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। 'ল্যাংটা' নিজেরই ন্যায় উলঙ্গ সেই পুরুষপ্রবরকে দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে তুমি ?' পুরুষ উত্তর করিলেন, 'আমি দেবযোনি, ভৈরব ; এই দেবস্থানরক্ষার নিমিত্ত বৃক্ষোপরি অবস্থান করি।' 'ল্যাংটা' কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন, 'উত্তম কথা, তুমিও যা, আমিও তাই ; তুমিও ব্রহ্মের এক প্রকাশ, আমিও তাই , এস, বস, ধ্যান কর।' পুরুষ হাসিয়া বায়ুতে যেন মিলাইয়া গেলেন ! 'ল্যাংটা'ও ঐ ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া ধ্যানে মনোনিবেশ করিলেন। পরদিন প্রাতে 'ল্যাংটা' ঠাকুরকে ঐ ঘটনা বলেন। ঠাকুরও শুনিয়া বলিলেন, "হাঁ, উনি ঐখানে থাকেন বটে ; আমিও উঁহার দর্শন অনেকবার পেয়েছি। কখন কখন কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার বিষয়ও উনি আমাকে ব'লে দিয়েছেন। কোম্পানি, বারুদখানার (Powder Magazine) জন্য পঞ্চবটীর সমস্ত জমিটি একবার নেবার চেষ্টা করে। আমার তাই শুনে বিষম ভাবনা হয়েছিল ; সংসারের কোলাহল থেকে দূরে নির্জন স্থানটিতে ব'সে মাকে ডাকি, তা আর হবে না—সেই জন্য।

তোতার নির্ভীকতা—ভৈরব-দর্শনে

মথুর তো রাণী রাসমণির তরফ থেকে কোম্পানির সঙ্গে খুব মামলা লাগিয়ে দিলে, যাতে কোম্পানি জমিটি না নেয়। সেই সময়ে একদিন ঐ ভৈরব গাছে ব'সে আছেন দেখতে পাই; আমাকে সঙ্কেতে বলেছিলেন, 'কোম্পানি জায়গা নিতে পারবে না; মামলায় হেরে যাবে।' বাস্তবিকও তাই হ'ল!"

তোতাপুরীর গুরুর কথা

'ল্যাংটা'র জন্মস্থান পশ্চিমে কোন্ স্থানে ছিল, ঠাকুরের নিকট সে সম্বন্ধে আমরা কিছু শুনি নাই। ঠাকুরও হয়তো ঐ বিষয়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিবার কোন আবশ্যকতা বিবেচনা করেন নাই। বিশেষতঃ, আবার পূর্ব নাম-ধাম-গোত্রাদি বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে সন্ন্যাসীরা উহার উল্লেখ করেন না; বলেন, 'সন্ন্যাসীকে ঐ সকল বিষয়ে প্রশ্ন করা এবং সন্ন্যাসীর তদ্বিষয়ে উত্তর দেওয়া—উভয়ই শাস্ত্র-নিষিদ্ধ!' ঠাকুর হয়তো সেইজন্যই ঐ প্রশ্ন 'ল্যাংটা'কে কথন করেন নাই। তবে বেলুড় মঠস্থ ঠাকুরের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ঠাকুরের দেহান্তের পর ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে পরিভ্রমণ-কালে প্রাচীন সন্ন্যাসী পরমহংসগণের নিকট জিজ্ঞাসায় জানিতে পারিয়াছিলেন যে, সম্ভবতঃ পুরী গোস্বামী পঞ্জাব প্রদেশের নিকটবর্তী কোন স্থানের লোক ছিলেন। তাঁহার গুরুস্থান বা গুরুর আবাস কুরুক্ষেত্রের নিকট লুধিয়ানা নামক স্থানে ছিল। তাঁহার গুরুও একজন বিখ্যাত যোগী পুরুষ ছিলেন এবং ঐ স্থানে একটি মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। উক্ত মঠটি তিনি নিজে স্থাপন করেন বা তাঁহার গুরুর গুরু কেহ স্থাপন করেন, সে বিষয়ে ঠিক জানা যায় নাই। তবে শ্রীমৎ

তোতাপুরীর গুরু যে ঐ মঠের মোহন্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার সম্মানে এখনও যে ঐ স্থানে বৎসর বৎসর চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামবাসীদের একটি মেলা হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে প্রাচীন সাধুগণ তাঁহাদের বলিয়াছিলেন। তিনি তামাক খাইতেন বলিয়া গ্রামবাসীরা মেলার সময় তামাক আনিয়া তাঁহার 'সমাজে' এখনও উপহার দিয়া থাকে। গুরুর দেহান্তে শ্রীমৎ তোতাপুরীই ঐ মঠের মোহন্তপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

শ্রীমৎ তোতাপুরীর নিজের কথাতেও মনে হয়, তিনি সন্ন্যাসিমণ্ডলীর অধীশ্বর নিজ গুরুর নিকট বাল্যেই বেদান্ত-শাস্ত্রোপদেশ পাইয়াছিলেন এবং বহুকাল তাঁহার অধীনে বাস করিয়া স্বাধ্যায়রত থাকেন ও সাধন-রহস্য অবগত হন। কারণ,

নিজ গুরুর মঠ ও মণ্ডলীসম্বন্ধে তোতাপুরীর কথা

ঠাকুরকে তিনি বলিয়াছিলেন, তাঁহার মণ্ডলীতে সাত শত সন্ন্যাসী বাস করিয়া গুরুর আদেশমত বেদান্তনিহিত সত্যসকল জীবনে অনুভবের জন্য ধ্যানাদি নিত্যানুষ্ঠান করিত। উক্ত মণ্ডলীতে ধ্যান-শিক্ষাদিদানও যে বড় সুন্দর প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইত, এ বিষয়েও 'ল্যাংটা' ঠাকুরকে কিছু কিছু আভাস দিয়াছিলেন। ঠাকুর ঐ কথা অনেক সময়ে আমাদের নিকট গল্প বা উপদেশচ্ছলে বলিতেন। বলিতেন, "ল্যাংটা বলত, তাদের দলে সাতশ ল্যাংটা ছিল। যারা প্রথম ধ্যান শিখতে আরম্ভ করচে, তাঁদের গদির উপর বসিয়ে ধ্যান করাত। কেননা কঠিন আসনে ব'সে ধ্যান করলে পা টনটন করবে; আর ঐ টনটনানিতে অনভ্যস্ত মন ঈশ্বরে না গিয়ে শরীরের দিকে এসে পড়বে। তারপর তার

যত ধ্যান জমত ততই তাকে কঠিন হ'তে কঠিনতর আসনে ব'সে ধ্যান করতে দেওয়া হ'ত। শেষকালে শুধু চর্মাসন ও খালি মাটিতে পর্যন্ত ব'সে তাকে ধ্যান করতে হ'ত। আহারাদি সকল বিষয়েও ঐরূপ নিয়মে অভ্যাস করাত। পরিধানেও শিষ্যদের সকলকে ক্রমে ক্রমে উলঙ্গ হ'য়ে থাকতে অভ্যাস করান হ'ত। লজ্জা, ঘৃণা, ভয়, জাত, কুল, শীল, মান ইত্যাদি অষ্টপাশে মানুষ জন্মাবধি বদ্ধ আছে কি না? এক এক ক'রে সেগুলোকে সব ত্যাগ করতে শিক্ষা দেওয়া হ'ত। তারপর ধ্যানাদিতে মন পাকা হ'য়ে বসলে তাকে প্রথম অপর সাধুদের সঙ্গে, তারপর একা একা, তীর্থে তীর্থে ঘুরে বেড়িয়ে আসতে হ'ত। ল্যাংটাদের এই রকম সব নিয়ম ছিল।" ঐ মণ্ডলীর মোহন্ত-নির্বাচনের প্রথাও ঠাকুর পুরীজীর নিকট শুনিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে ঐ সম্বন্ধে আমাদের একদিন এইরূপ বলেন, "ল্যাংটাদের ভেতর যার ঠিক ঠিক পরমহংস অবস্থা হয়েছে দেখতো, গদি খালি হ'লে তাকেই সকলে মিলে মোহন্ত ক'রে ঐ গদিতে বসাত। তা না হ'লে টাকা, মান, ক্ষমতা হাতে প'ড়ে ঠিক থাকতে পারবে কি ক'রে? মাথা বিগ্‌ড়ে যাবে যে? সে জন্য যার মন থেকে কাঞ্চন ঠিক ঠিক ত্যাগ হয়েছে দেখতো, তাকেই গদিতে বসিয়ে টাকা-কড়ির ভার দিত। কেননা, সে-ই ঐ টাকা দেবতা ও সাধুদের সেবায় ঠিক ঠিক খরচ করতে পারবে।"

পুরী গোস্বামীর ঐসকল কথায় বেশ বুঝা যায়, তিনি বাল্যাবধি সংসারের মায়া-মোহ-ঈর্ষা-দ্বেষাদি হইতে দূরে যেন এক স্বর্গীয় রাজ্যে গুরুর স্নেহে লালিত-পালিত হইয়াছিলেন।

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রথা আছে যে, যে দম্পতির যথাসময়ে সন্তান জন্মে না, তাঁহারা দেবস্থানে কামনা করেন যে, তাঁহাদের প্রণয়ের প্রথম ফলস্বরূপ সন্তানকে সন্ন্যাসী করিয়া ঈশ্বরের সেবায় অর্পণ করিবেন এবং কার্যেও ঐরূপ অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। পুরী গোস্বামী কি সেইরূপে গুরুর নিকট অর্পিত হইয়াছিলেন? কে বলিবে! তবে তাঁহার পূর্বাশ্রমের পিতা-মাতা, ভ্রাতা-ভগ্নী প্রভৃতির কোন কথা ঠাকুরের নিকট কখনও উল্লেখ না করাতে ঐরূপই অনুমিত হয়।

তোতাপুরীর পূর্বপরিচয়

পূর্বকৃত পুণ্যসংস্কারের ফলে গোস্বামীজীর মনটিও তেমনি সরলবিশ্বাসী ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল। আচার্য শঙ্কর তৎকৃত 'বিবেক-চূড়ামণি' গ্রন্থের প্রারম্ভেই বলিয়াছেন, 'জগতে মনুষ্যত্ব, ঈশ্বরলাভেচ্ছা এবং সদ্গুরুর আশ্রয়—এই তিন বস্তু একত্রে লাভ করা বড়ই দুর্লভ; ভগবানের অনুগ্রহ ব্যতীত হয় না।' পুরী গোস্বামী শুধু যে ঐ তিন পদার্থ ভাগ্যক্রমে একসঙ্গে পাইয়াছিলেন তাহা নহে, কিন্তু ঐ সকলের যথাযথ ব্যবহারের সুযোগ পাইয়া মানবজীবনের চরমোদ্দেশ্য মুক্তিলাভেও সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু তাঁহাকে যেমন যেমন উপদেশ করিতেন, তাঁহার মনও ঠিক ঠিক উহা ধারণা করিয়া সর্বদা কার্যে পরিণত করিত। মনের জুয়াচুরি ভণ্ডামিতে তাঁহাকে কখনও বেশী ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। বৈষ্ণবদিগের ভিতর একটি কথা আছে—

তোতাপুরীর মন

> "গুরু কৃষ্ণ বৈষ্ণব তিনের দয়া হ'ল।
> একের দয়া বিনে জীব ছারেখারে গেল॥"

—'একের' অর্থাৎ নিজ মনের দয়া না হওয়াতে জীব বিনষ্ট হইল। পুরী গোস্বামীকে এরূপ পাজী মনের হাতে পড়িয়া কখনও ভুগিতে হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার সরল মন, সরলভাবে ঈশ্বরে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া গুরুনির্দিষ্ট গন্তব্য পথে ধীরপদে অগ্রসর হইয়াছিল, যাইতে যাইতে একবারও পশ্চাতে সংসারের পাপ-প্রলোভনাদির দিকে অতৃপ্ত লালসার কটাক্ষপাত করে নাই। কাজেই গোসাঁইজী নিজ পুরুষকার, উত্তম, আত্মনির্ভরতা ও প্রত্যয়কেই সর্বেসর্বা বলিয়া জানিয়াছিলেন। মন বাঁকিয়া দাঁড়াইলে ঐ পুরুষকার যে প্রবল প্রবাহের মুখে তৃণগুচ্ছের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যায়, ঐ আত্মনির্ভর ও আত্মপ্রত্যয়ের স্থলে যে আপনার ক্ষমতার উপর ঘোর অবিশ্বাস আসিয়া জীবকে সামান্য কীটাপেক্ষা দুর্বল করিয়া তুলে—একথা গোসাঁইজী জানিতেন না। ঈশ্বরকৃপায় বহির্জগতের সহস্র বিষয়ের অনুকূলতা না পাইলে জীবের শত-সহস্র উত্তম যে আশানুরূপ ফল প্রসব না করিয়া বিপরীত ফলই প্রসব করিতে থাকে এবং তাহাকে বন্ধনের উপর আরও ঘোরতর বন্ধন আনিয়া দেয়, পুরী গোস্বামী নিজ জীবনের দিকে চাহিয়া একথা কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই। কেনই বা ভাবিবেন? তিনি যখনই যাহা ধরিয়াছেন—আজন্ম, তখনই তাহা করিতে পারিয়াছেন, যখনই যাহা মানবের কল্যাণকর বলিয়া বুঝিয়াছেন—তখনই তাহা নিজ জীবনে কার্যে পরিণত করিতে পারিয়াছেন। কাজেই 'মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না' এমন একটা অবস্থা যে মানবের হইতে পারে, 'মন মুখ এক' করিতে না পারিয়া সে যে

শত বৃশ্চিকের দংশনজ্বালা ভিতরে নিরন্তর অনুভব করিতে পারে, মনের ভিতর সহস্রটা কর্তা এবং শরীরের প্রত্যেক ইন্দ্রিয়টা স্ব স্ব প্রধান হইয়া কেহ কাহারও কথা না মানিয়া চলিয়া তাহাকে যে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়া হতাশার অন্ধতমিস্রে ফেলিয়া ঘোর যন্ত্রণা দিতে পারে—একথা গোসাঁইজী কখনও কল্পনায়ও আনিয়াছিলেন কি না সন্দেহ। অথবা আনিতে পারিলেও শুনে শিখা, দেখে শিখা ও ঠেকে শিখার ভিতর অনেক তফাত। কাজেই পুরী গোস্বামীর মনে অবস্থিত মানবের ঐরূপ অবস্থার ছবিতে এবং যে ঐ প্রকারে বাস্তবিক নিরন্তর ভুগিতেছে, তাহার মনের ছবিতে ঐরূপ আকাশ-পাতাল প্রভেদ ছিল। পুরী গোস্বামী সেজন্য পরমেশ-শক্তি অনাদ্যবিদ্যা মায়ার দুরন্ত প্রভাববিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞই ছিলেন; এবং সেজন্য দুর্বল মানব-মনের কার্যকলাপের প্রতি তিনি কঠোর দ্বেষ-দৃষ্টি ভিন্ন কখন করুণার সহিত দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। ঠাকুরের গুরুভাবের সম্পর্কে আসিয়াই তাঁহার এই অভাব অপনীত হয় এবং তিনি পরিশেষে মায়ার শক্তি মানিয়া ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ জানিয়া ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে অবনত মস্তকে দক্ষিণেশ্বর-কালীবাটী হইতে বিদায়গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। আমরা এক্ষণে ঐ বিষয়েই বলিতে আরম্ভ করিব।

ব্রাহ্মণী ভৈরবী ঠাকুরকে যেমন বলিয়াছিলেন, আকুমার ব্রহ্মচারী কঠোর যতি তোতার বাস্তবিকই ভগবদ্ভক্তিমার্গকে একটা কিম্ভূতকিমাকার পথ বলিয়া ধারণা ছিল। ভক্তি-ভালবাসা

যে মানবকে ভালবাসার পাত্রের জন্য সংসারের সকল বিষয়, এমন কি আত্মতৃপ্তি পর্যন্ত ধীরে ধীরে ত্যাগ করিতে শিখাইয়া চরমে ঈশ্বর-দর্শন আনিয়া দেয়, যথার্থ ভক্তসাধক যে ভক্তির চরম পরিণতিতে শুদ্ধাদ্বৈতজ্ঞানেরও অধিকারী হইয়া থাকেন এবং সেজন্য তাঁহারও সাধনসহায় জপ-কীর্তন-ভজনাদি যে উপেক্ষার বিষয় নহে—একথা তোতা বুঝিতেন না। না বুঝিয়া গোসাঁইজী ভক্তের ভাববিহ্বল চেষ্টাদিকে সময়ে সময়ে বিদ্রূপ করিতেও ছাড়িতেন না। অবশ্য এ কথায় পাঠক না বুঝিয়া বসেন যে, পুরী গোস্বামী এক প্রকার নাস্তিক গোছের ছিলেন বা তাঁহার ঈশ্বরানুরাগ ছিল না। শমদমাদিসম্পত্তিসহায় শান্তপ্রকৃতি গোসাঁইজী স্বয়ং ভক্তির শান্তভাবের পথিক ছিলেন এবং অপরে ঐ ভাবের ঈশ্বরভক্তিই বুঝিতে পারিতেন। কিন্তু কল্পনাসহায়ে জগৎকর্তা মহান্ ঈশ্বরকে নিজ সখা, পুত্র, স্ত্রী বা স্বামি-ভাবে ভজনা করিয়াও সাধক যে তাঁহার দিকে দ্রুতপদে অগ্রসর হইতে পারে, একথা পুরীজীর মাথায় কখন ঢোকে নাই। ঐরূপ ভক্তের নিজ ভাবপ্রণোদিত ঈশ্বরের প্রতি আবদার-অনুরোধ, তাঁহাকে লইয়া বিরহ, ব্যাকুলতা, অভিমান, অহঙ্কার এবং ভাবের প্রবল উচ্ছ্বাসে উদ্দাম হাস্য-ক্রন্দন-নৃত্যাদি চেষ্টাকে তিনি পাগলের খেয়াল বা প্রলাপের মধ্যেই গণ্য করিতেন; এবং উহাতে যে ঐরূপ অধিকারী সাধকের আশু অভীষ্ট ফললাভ হইতে পারে, একথা তিনি কল্পনায়ও আনিতে পারিতেন না। কাজেই ব্রহ্মশক্তি জগদম্বিকাকে হৃদয়ের সহিত ভক্তি করা এবং

তোতাপুরীর ভক্তিমার্গে অনভিজ্ঞতা

ভক্তিপথের ঐরূপ চেষ্টাদির কথা লইয়া পুরীজীর সহিত ঠাকুরের অনেক সময় ঠোকাঠুকি লাগিয়া যাইত।

ঐ বিষয়ে প্রমাণ—'কেঁও বোটী ঠোক্‌তে হো'

ঠাকুর বাল্যাবধি সকাল-সন্ধ্যায় করতালি দিতে দিতে এবং সময়ে সময়ে ভাবে নৃত্য করিতে করিতে 'হরিবোল হরিবোল', 'হরি গুরু, গুরু হরি', 'হরি প্রাণ হে, গোবিন্দ মম জীবন', 'মন কৃষ্ণ—প্রাণ কৃষ্ণ—জ্ঞান কৃষ্ণ—ধ্যান কৃষ্ণ—বোধ কৃষ্ণ—বুদ্ধি কৃষ্ণ', 'জগৎ তুমি—জগৎ তোমাতে', 'আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী' ইত্যাদি উচ্চৈঃ-স্বরে বার বার কিছুকাল বলিতেন। বেদান্তজ্ঞানে অদ্বৈতভাবে নির্বিকল্প সমাধিলাভের পরও নিত্য ঐরূপ করিতেন। একদিন পঞ্চবটীতে পুরীজীর নিকট অপরাহ্ণে বসিয়া নানা ধর্মকথা-প্রসঙ্গে সন্ধ্যা হইল। সন্ধ্যা সমাগত দেখিয়া ঠাকুর বাক্যালাপ বন্ধ করিয়া, করতালি দিয়া ঐরূপে ভগবানের স্মরণ-মনন করিতে লাগিলেন। তাঁহাকে ঐরূপ করিতে দেখিয়া পুরীজী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—যিনি বেদান্তপথের এত উত্তম অধিকারী যে, তিন দিনেই নির্বিকল্প সমাধি লাভ করিলেন, তাঁহার আবার হীনাধিকারীর মত এ সব অনুষ্ঠান কেন? প্রকাশ্যে বিদ্রূপ করিয়া বলিয়াও ফেলিলেন, 'আরে, কেঁও রোটী ঠোক্‌তে হো?'—অর্থাৎ, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে স্ত্রীপুরুষে অনেক সময়ে চাকি-বেলুন প্রভৃতির সাহায্য না লইয়া ময়দার নেচি হাতে লইয়া পটাপট আওয়াজ করিতে করিতে চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে যেমন রুটি তৈয়ার করে, সেই রকম কেন করচ? ঠাকুর শুনিয়া হাসিয়া বলিলেন, "দূর শালা! আমি ঈশ্বরের নাম করচি,

আর তুমি কিনা বলছ—আমি রুটি ঠুকচি!" পুরীজীও ঠাকুরের বালকের ন্যায় কথায় হাসিতে লাগিলেন এবং বুঝিলেন, ঠাকুরের ঐরূপ অনুষ্ঠান অর্থশূন্য নহে; উহার ভিতর এমন কোনও গূঢ়ভাব আছে, যাহা তাঁহার রুচিকর নয় বলিয়া তিনি ধরিতে-বুঝিতে পারিতেছেন না। উঁহার ঐরূপ কার্যে প্রতিবাদ না করাই ভাল।

তোতাপুরীর ক্রোধত্যাগের কথা

আর একদিন সন্ধ্যার পর ঠাকুর পুরীজীর ধুনির ধারে বসিয়া আছেন। ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ঠাকুর এবং গোসাঁইজী উভয়েরই মন খুব উচ্চে উঠিয়া অদ্বৈতজ্ঞানে প্রায় তন্ময়ত্ব অনুভব করিতেছে। পার্শ্বে ধক ধক করিয়া জ্বলিয়া জ্বলিয়া ধুনির অগ্নিমধ্যস্থ আত্মাও যেন তাঁহাদের আত্মার সহিত একত্বানুভব করিয়া আনন্দে শত জিহ্বা প্রকাশ করিয়া হাসিতেছেন। এমন সময় বাগানের চাকরবাকরদিগের একজনের তামাক খাইবার বিশেষ ইচ্ছা হওয়ায়, কল্‌কেতে তামাক সাজিয়া অগ্নির জন্য সেখানে উপস্থিত হইল এবং ধুনির কাঠ টানিয়া অগ্নি লইতে লাগিল। গোসাঁইজী ঠাকুরের সহিত বাক্যালাপে ও অন্তরে অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দানুভবেই মগ্ন ছিলেন, ঐ লোকটির আগমন ও ধুনি হইতে অগ্নি লওয়ার বিষয় এতক্ষণ জানিতেই পারেন নাই। হঠাৎ এখন সেদিকে লক্ষ্য পড়ায় বিষম বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে গালিগালাজ করিতে লাগিলেন! এমন কি চিম্‌টা তুলিয়া তাহাকে দুই এক ঘা দিবার মতও ভয় দেখাইতে লাগিলেন। কারণ, পূর্বেই বলিয়াছি, নাগা সাধুরা ধুনিরূপী অগ্নিকে পূজা ও বিশেষ সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন।

ঠাকুর পুরীজীর ঐরূপ ব্যবহারে অর্ধবাহ্যদশায় হাস্যের রোল তুলিয়া তাঁহাকে বলিয়া উঠিলেন, "দূর শালা, দূর শালা!" ঐ কথা বারবার বলেন ও হাসিয়া গড়াগড়ি দেন। তোতা ঠাকুরের ঐরূপ ভাব দেখিয়া আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, "তুমি অমন করচ যে? লোকটির কি অন্যায় দেখ দেখি?" ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তা তো বটে, সেই সঙ্গে তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের দৌড়টাও দেখচি! এই মুখে বলছিলে—ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় সত্তাই নেই, জগতে সকল বস্তু ও ব্যক্তি তাঁরই প্রকাশ, আর পরক্ষণেই সব কথা ভুলে মানুষকে মারতেই উঠেচ। তাই হাসছি যে, মায়ার কি প্রভাব!" তোতা ঐ কথা শুনিয়াই গম্ভীর হইয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন, পরে ঠাকুরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠিক বলেছ, ক্রোধে সকল কথা বাস্তবিকই ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ক্রোধ বড় পাজী জিনিস। আজ থেকে আর ক্রোধ কোরবো না, ক্রোধ পরিত্যাগ করলুম।" বাস্তবিকই স্বামীজিকে সেদিন হইতে আর ক্রুদ্ধ হইতে দেখা যায় নাই।

মায়া কৃপা করিয়া পথ না ছাড়িলে মানবের ঈশ্বরলাভ হয় না।

ঠাকুর বলিতেন, "পঞ্চভূতের ফাঁদে, ব্রহ্ম প'ড়ে কাঁদে—চোখ বুজে তুমি 'কাঁটা নেই, খোঁচা নেই', যতই কেন মনকে বুঝাও না, কাঁটায় হাত পড়লেই প্যাঁট করে বিঁদে গিয়ে উহু উহু ক'রে উঠতে হয়; তেমনি, যতই কেন মনকে বুঝাও না—তোমার জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, পাপ নেই, পুণ্য নেই, শোক নেই, দুঃখ নেই, ক্ষুধা নেই, তৃষ্ণা নেই—তুমি জন্ম-জরা-রহিত নির্বিকার সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মা—কিন্তু যাই শরীরে অসুস্থতা এল, যাই মন

সংসারের রূপ-রসাদি প্রলোভনের সামনে পড়ল, যাই কাম-কাঞ্চনের আপাত সুখে ভুলে কোন একটা কুকাজ ক'রে ফেল্লে, অমনি মোহ, যন্ত্রণা, দুঃখ সব উপস্থিত হ'য়ে সব বিচার-আচার ভুলিয়ে একেবারে তোমাকে ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবে! সেজন্য ঈশ্বরের কৃপা না হ'লে, মায়া দোর ছেড়ে না দিলে কারুর আত্ম-জ্ঞানলাভ ও দুঃখের নিবৃত্তি হয় না—জানবি। চণ্ডীতে আছে শুনিস নি?—'সৈষা প্রসন্না বরদা নৃণাং ভবতি মুক্তয়ে'—অর্থাৎ মা কৃপা ক'রে পথ ছেড়ে না দিলে কিছুই হবার জো নেই।"

ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্ত—রাম, সীতা ও লক্ষ্মণের বনে পর্যটনের কথা

"রাম, সীতা ও লক্ষ্মণ বনে যাচ্চেন। বনের সরু পথ, এক জনের বেশী যাওয়া যায় না। রাম ধনুকহাতে আগে আগে চলেছেন; সীতা তাঁর পাছু পাছু চলেছেন; আর লক্ষ্মণ সীতার পাছু পাছু ধনুর্বাণ নিয়ে যাচ্চেন। লক্ষ্মণের রামের উপর এমনি ভক্তি-ভালবাসা যে, সর্বদা মনে মনে ইচ্ছা নবঘনশ্যাম রামরূপ দেখেন; কিন্তু সীতা মাঝখানে রয়েছেন, কাজেই চলতে চলতে রামচন্দ্রকে দেখতে না পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। বুদ্ধিমতী সীতা তা বুঝতে পেরে, তাঁর দুঃখে কাতর হ'য়ে চলতে চলতে একবার পাশ কাটিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এই ছাখ্।' তবে লক্ষ্মণ প্রাণভরে একবার তাঁর ইষ্টমূর্তি রামরূপ দেখতে পেলেন! সেই রকম জীব আর ঈশ্বরের মাঝখানে এই মায়ারূপিণী সীতা রয়েছেন। তিনি জীবরূপী লক্ষ্মণের দুঃখে ব্যথিত হ'য়ে পথ ছেড়ে পাশ কাটিয়ে না দাঁড়ালে জীব তাঁকে দেখতে পায় না, জানবি। তিনি যাই কৃপা করেন,

অমনি জীবের রামরূপী নারায়ণের দর্শন হয় ও সে সব যন্ত্রণার হাত থেকে এড়ায়। নৈলে, হাজারই বিচার-আচার কর না কেন, কিছুতে কিছু হয় না। কথায় বলে—এক একটি জোয়ানের দানায় এক একশটি ভাত হজম করিয়ে দেয়, কিন্তু যখন পেটের অসুখ হয়, তখন একশটি জোয়ানের দানাও একটি ভাত হজম করাতে পারে না—সেই রকম জান্‌বি।”

জগদম্বার কৃপায় তাঁহার উচ্চাবস্থা—তোতা একথা বুঝেন নাই

তোতাপুরী স্বামীজি ৺জগদম্বার আজন্ম কৃপাপাত্র। সংসংস্কার, সরল মন, যোগী মহাপুরুষের সঙ্গ, বলিষ্ঠ দৃঢ় শরীর, বাল্যাবধিই লাভ করিয়াছিলেন। ভাগবতী মায়া তো তাঁহাকে কখন তাঁহার করাল, বিভীষিকাময়ী, মৃত্যুর ছায়ার ন্যায় সর্বগ্রাসী মূর্তি দেখান নাই—তাঁহার অবিদ্যারূপিণী মোহিনী মূর্তির ফাঁদে তো কখন ফেলেন নাই—কাজেই গোসাঁইজীর নিকট পুরুষকার ও চেষ্টাসহায়ে অগ্রসর হইয়া নির্বিকল্প সমাধিলাভ, ঈশ্বরদর্শন, আত্মজ্ঞান সব সোজা কথা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। সে পথে অগ্রসর হইবার যত কিছু বিঘ্ন-বাধা, মা যে সে-সব নিজ হস্তে সরাইয়া তাঁহাকে পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন—একথা তিনি বুঝিবেন কিরূপে? এতদিনে সে বিষয় পুরী স্বামীজিকে বুঝাইবার জগদম্বার ইচ্ছা হইল। এতদিনে তিনি মনের ঐ ভ্রম বুঝিবার অবসর পাইলেন।

পুরীজীর পশ্চিমী শরীর; রোগ, অজীর্ণ, শরীরে শতপ্রকার অসুস্থতা কাহাকে বলে তাহা কখন জানিতেন না। যাহা খাইতেন, তাহাই হজম হইত; যেখানেই পড়িয়া থাকিতেন,

সুনিদ্রার অভাব হইত না। আর ঈশ্বর-জ্ঞানে ও দর্শনে মনের উল্লাস ও শান্তি শতমুখে অবিরামধারে মনে প্রবাহিত থাকিত। কিন্তু বাঙ্গালার জল, বাঙ্গালার বাষ্পকণাপূরিত গুরুভার উত্তপ্ত বায়ুতে, ঠাকুরের শ্রদ্ধাভালবাসায় মোহিত হইয়া কয়েক মাস বাস করিতে না করিতেই সে দৃঢ় শরীরে রোগ প্রবেশ করিল। পুরীজী কঠিন রক্তামাশয়-রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন। দিবারাত্র পেটের মোচড ও টনটনানিতে পুরীজীর ধীর, স্থির, সমাধিস্থ মনও অনেক সময়ে ব্রহ্মসদ্ভাব হইতে বিচ্যুত হইয়া শরীরের দিকে আসিয়া পড়িতে লাগিল! 'পঞ্চ ভূতের ফাঁদে' ব্রহ্ম পড়িয়াছেন, এখন সর্বেশ্বরী জগদম্বিকার কৃপা ব্যতীত আর উপায় কি?

তোতাপুরীর অসুস্থতা

অসুস্থ হইবার কিছুকাল পূর্ব হইতেই তাঁহার সতর্ক ব্রহ্মনিষ্ঠ মন তাঁহাকে জানাইয়াছিল যে, এখানে শরীর ভাল থাকিতেছে না, আর এখানে থাকা যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু ঠাকুরের অদ্ভুত সঙ্গ ত্যাগ করিয়া শরীরের মায়ায় তিনি চলিয়া যাইবেন? 'শরীর—হাড়-মাসের খাঁচা'—রসরক্তপূর্ণ, কৃমিকুলসঙ্কুল, তুই দিন মাত্র স্থায়ী দেহ—যেটার অস্তিত্বই বেদান্তশাস্ত্রে ভ্রম বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার প্রতি মমতা-দৃষ্টি করিয়া তিনি কি না অশেষ-আনন্দ-প্রসূ এই দেব-মানবের সঙ্গ সহসা ত্যাগ করিয়া যাইবেন? যেখানে যাইবেন সেখানেও শরীরের রোগাদি তো হইতে পারে? আর রোগাদি হইলেই বা তাঁহার ভয় কি? শরীরটাই ভুগিবে, কৃশ হইবে, বড় জোর বিনষ্ট হইবে—তাহাতে তাঁহার কি আসে

তোতার নিজ মনের সঙ্কেত অগ্রাহ্য করা

যায়? তিনি তো প্রত্যক্ষ জানিয়াছেন, দেখিয়াছেন—তিনি অসঙ্গ নির্বিকার আত্মা, শরীরটার সহিত তাঁহার কোনও সম্বন্ধই নাই—তবে আবার ভয় কিসের? এইরূপ নানা কথা ভাবিয়া পুরীজী মনকে ব্যস্ত হইতে দেন নাই।

তোতার ঠাকুরের নিকট বিদায় লইতে যাইয়াও না পারা ও রোগবৃদ্ধি

ক্রমে রোগের যখন সূত্রপাত ও কিছু কিছু যন্ত্রণার আরম্ভ হইল, তখন পুরীজীর স্থানত্যাগের ইচ্ছা মধ্যে মধ্যে প্রবলতর হইতে লাগিল। ঠাকুরের নিকট হইতে বিদায় লইবেন ভাবিয়া কখন কখন তাঁহার নিকট উপস্থিতও হইলেন, কিন্তু অন্য সৎপ্রসঙ্গে মাতিয়া সে কথা বলিতে ভুলিয়াই যাইলেন। আবার যদি বা বিদায়ের কথা বলিতে মনে পড়িল তো তখন যেন কে ভিতর হইতে তাঁহার সে সময়ের জন্য বাক্য রুদ্ধ করিয়া দিল, বলিতে বাধ বাধ করায় পুরীজী ভাবিলেন, 'আজ থাক্, কাল বলা যাইবে।' এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে স্বামীজি ঠাকুরের সহিত বেদান্তালাপ করিয়া ঘুরিয়া-ফিরিয়া পঞ্চবটীতলে আসনে ফিরিলেন। দিন কাটিতে লাগিল। স্বামীজির শরীরও অধিকতর দুর্বল এবং ক্রমে রোগ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ঠাকুর, স্বামীজির শরীর ঐ প্রকার দিন দিন শুষ্ক হইয়া যাইতেছে দেখিয়া বিশেষ পথ্য ও সামান্য ঔষধাদি-সেবনের বন্দোবস্ত ইতিপূর্বেই করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও ফলোদয় না হইয়া রোগ বাড়িয়াই যাইতে লাগিল। ঠাকুরও মথুরকে বলিয়া তাঁহার আরোগ্যের জন্য ঔষধপথ্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করিয়া তাঁহাকে যথাসাধ্য সেবা-যত্ন করিতে লাগিলেন। এখনও

পর্যন্ত স্বামীজি শরীরেই বিশেষ যন্ত্রণানুভব করিতেছিলেন, কিন্তু চিরনিয়মিত মনকে ইচ্ছামাত্রেই সমাধিমগ্ন করিয়া দেহের সকল যন্ত্রণার কথা এককালে ভুলিয়া শান্তিলাভ করিতেছিলেন।

রাত্রিকাল—আজ পেটের যন্ত্রণা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে। স্বামীজিকে স্থির হইয়া শয়ন পর্যন্ত করিয়া থাকিতে দিতেছে না। একটু শয়ন করিয়া থাকিবার চেষ্টা করিয়াই তিনি আবার উঠিয়া বসিলেন। বসিয়াও সোয়াস্তি নাই। ভাবিলেন, মনকে ধ্যানমগ্ন করিয়া রাখি, শরীরে যাহা হইবার হউক। মনকে গুটাইয়া শরীর হইতে টানিয়া লইয়া স্থির করিতে না করিতে পেটের যন্ত্রণায় মন সেই দিকেই ছুটিয়া চলিল। আবার চেষ্টা করিলেন, আবার তদ্রূপ হইল। যেখানে শরীর ভুল হইয়া যায়, সেই সমাধিভূমিতে মন উঠিতে না উঠিতে যন্ত্রণায় নামিয়া পড়িতে লাগিল। যতবার চেষ্টা করিলেন, ততবারই চেষ্টা বিফল হইল! তখন স্বামীজি নিজের শরীরের উপর বিষম বিরক্ত হইলেন। ভাবিলেন—এ হাড়-মাসের খাঁচাটার জ্বালায় মনও আজ আমার বশে নাই। দূর হ'ক, জানিয়াছি তো শরীরটা কোনমতেই আমি নই, তবে এ পচা শরীরটার সঙ্গে আর কেন থাকিয়া যন্ত্রণা অনুভব করি? এটা আর রাখিয়া লাভ কি? এই গভীর রাত্রিকালে গঙ্গায় এটাকে বিসর্জন দিয়া এখনি সকল যন্ত্রণার অবসান করিব। এই ভাবিয়া 'ল্যাংটা' বিশেষ যত্নে মনকে ব্রহ্মচিন্তায় স্থির রাখিয়া ধীরে ধীরে জলে অবতরণ করিলেন এবং ক্রমে ক্রমে গভীর

মনকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া তোতার গঙ্গায় শরীর বিসর্জন করিতে যাওয়া ও বিশ্বরূপিণী জগদম্বার দর্শন

জলে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু গভীর ভাগীরথী কি আজ সত্য সত্যই শুষ্কা হইয়াছেন? অথবা তোতা তাঁহার মনের ভিতরের ছবির বহিঃপ্রকাশে ঐরূপ দেখিতেছেন? কে বলিবে? তোতা প্রায় পরপারে চলিয়া আসিলেন, তত্রাচ ডুবজল পাইলেন না! ক্রমে যখন রাত্রির অন্ধকারে অপর পারের বৃক্ষ ও বাটীসকল ছায়ার মত নয়নগোচর হইতে লাগিল, তখন তোতা অবাক হইয়া ভাবিলেন, 'একি দৈবী মায়া! ডুবিয়া মরিবার পর্যাপ্ত জলও আজ নদীতে নাই! একি ঈশ্বরের অপূর্ব লীলা।' অমনি কে যেন ভিতর হইতে তাঁহার বুদ্ধির আবরণ টানিয়া লইল! তোতার মন উজ্জ্বল আলোকে ধাঁধিয়া যাইয়া দেখিল—মা, মা, বিশ্বজননী মা, অচিন্ত্যশক্তিরূপিণী মা; জলে মা, স্থলে মা; শরীর মা, মন মা; যন্ত্রণা মা, সুস্থতা মা; জ্ঞান মা, অজ্ঞান মা, জীবন মা, মৃত্যু মা; যাহা কিছু দেখিতেছি, শুনিতেছি, ভাবিতেছি, কল্পনা করিতেছি—সব মা! তিনি হয়কে নয় করিতেছেন, নয়কে হয় করিতেছেন! শরীরের ভিতর যতক্ষণ, ততক্ষণ তিনি না ইচ্ছা করিলে তাঁহার প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে কাহারও সাধ্য নাই—মরিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই! আবার শরীর-মন-বুদ্ধির পারেও সেই মা—তুরীয়া, নির্গুণা মা! এতদিন যাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করিয়া তোতা প্রাণের ভক্তি-ভালবাসা দিয়া আসিয়াছেন, সেই মা! শিব-শক্তি একাধারে হরগৌরী-মূর্তিতে অবস্থিত—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মশক্তি অভেদ!

গভীর নিশীথে তোতা ভক্তিপূরিত চিত্তে জগদম্বার অচিন্ত্য অব্যক্ত বিরাট রূপের দর্শন করিতে করিতে, গম্ভীর অম্বারবে

দিকসকল মুখরিত করিয়া তুলিলেন এবং আপনাকে তৎপদে সম্পূর্ণরূপে বলি দিয়া পুনরায় যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি জল ভাঙ্গিয়া ফিরিয়া চলিলেন! শরীরে যন্ত্রণা হইলেও এখন আর তাহার অনুভব নাই। প্রাণ, সমাধি-স্মৃতির অপূর্ব উল্লাসে উল্লসিত! ধীরে ধীরে স্বামীজি পঞ্চবটীতলে ধুনির ধারে আসিয়া বসিয়া সমস্ত রাত্রি জগদম্বার নামে ও ধ্যানে কাটাইলেন।

তোতার পূর্ব সংকল্প ত্যাগ

প্রভাত হইলেই ঠাকুর স্বামীজির শারীরিক কুশল-সংবাদ জানিতে আসিয়া দেখেন, যেন সে মানুষই নয়! মুখমণ্ডল আনন্দে উৎফুল্ল, হাস্যপ্রস্ফুটিত অধর, শরীরে যেন কোন রোগই নাই! তোতা ঠাকুরকে ইঙ্গিতে পার্শ্বে বসিতে বলিয়া ধীরে ধীরে রাত্রের সকল ঘটনা বলিলেন। বলিলেন, রোগই আমার বন্ধুর কাজ করিয়াছে, কাল জগদম্বার দর্শন পাইয়াছি এবং তাঁহার কৃপায় রোগমুক্তও হইয়াছি। এতদিন আমি কি অজ্ঞই ছিলাম! যাহা হউক, তোমার মাকে এখন বলিয়া কহিয়া আমাকে এ স্থান হইতে যাইতে বিদায় দাও। আমি এখন বুঝিয়াছি, তিনিই আমাকে এই শিক্ষা দিবার জন্য এতদিন ঘুরাইয়া ফিরাইয়া আমাকে এখানে আবদ্ধ রাখিয়াছেন। নতুবা আমি এখান হইতে অনেক কাল পূর্বে চলিয়া যাইব ভাবিয়াছি, বিদায় লইবার জন্য তোমার কাছেও বার বার গিয়াছি, কিন্তু কে যেন প্রতিবারেই বিদায়ের কথা বলিতে দেয় নাই! অন্য প্রসঙ্গে ভুলাইয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া রাখিয়াছে। ঠাকুর শুনিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "মাকে যে

অসুস্থতায় তোতার জ্ঞান—ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তি এক

আগে মানতে না, আমার সঙ্গে যে শক্তি মিথ্যা 'ঝুট্' ব'লে তর্ক করতে? এখন দেখলে, চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ঘুচে গেল। আমাকে তিনি পূর্বেই বুঝিয়েছেন, 'ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ, অগ্নি ও তার দাহিকা শক্তি যেমন পৃথক নয়, তেমনি!' '

তোতার জগদম্বাকে মানা ও বিদায়গ্রহণ

অনন্তর প্রভাতী সুরে নহবত-ধ্বনি হইতেছে শুনিয়া শিবরামের ন্যায় গুরুশিষ্য-সম্বন্ধে আবদ্ধ উভয় মহাপুরুষ উঠিয়া জগদম্বার মন্দিরে দর্শনার্থ যাইলেন এবং শ্রীমূর্তির সম্মুখে প্রণত হইলেন। উভয়েই প্রাণে প্রাণে বুঝিলেন, মা তোতাকে এইবার এখান হইতে যাইতে প্রসন্ন মনে অনুমতি দিয়াছেন। ইহার কয়েক দিবস পরেই তোতা ঠাকুরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিয়া দক্ষিণেশ্বর কালীবাটী পরিত্যাগ করিয়া পশ্চিমে রওনা হইলেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাটীর ইহাই তাঁহারা প্রথম ও শেষ দর্শন—কারণ ইহার পর পুরী গোস্বামী আর কখনও এদিকে ফিরেন নাই।

তোতার 'কিমিয়া' বিদ্যায় অভিজ্ঞতা

আর একটি কথা বলিলেই তোতাপুরী সম্বন্ধে আমরা যত কথা ঠাকুরের শ্রীমুখে শুনিয়াছিলাম, তাহার সকলই প্রায় পাঠককে বলা হয়। পুরী গোস্বামী 'কিমিয়া' বিদ্যায় বিশ্বাস করিতেন। শুধু যে বিশ্বাস করিতেন তাহা নহে, ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন তিনি ঐ বিদ্যাপ্রভাবে তাম্রাদি ধাতুকে অনেকবার স্বর্ণে পরিণত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তোতা বলিতেন, তাঁহাদের মণ্ডলীর প্রাচীন পরমহংসেরা উক্ত বিদ্যা অবগত আছেন এবং গুরুপরম্পরায় তিনি উহা পাইয়াছেন। আরও বলিতেন, 'ঐ বিদ্যাপ্রভাবে নিজের

স্বার্থসাধন বা ভোগবিলাস করিতে একেবারে নিষেধ আছে, উহাতে গুরুর অভিসম্পাত আছে। তবে মণ্ডলীতে অনেক সাধু থাকে, উহাদের লইয়া কখন কখন মণ্ডলীশ্বরকে তীর্থ হইতে তীর্থান্তরে গমনাগমন করিতে হয় এবং তাঁহাদের সকলের আহারাদির বন্দোবস্ত করিতে হয়। গুরুর আদেশ—ঐ সময়ে অর্থের অনটন হইলে ঐ বিদ্যার প্রয়োগ করিয়া তাঁহাদের সেবার বন্দোবস্ত করিতে পার।'

উপসংহার

এইরূপে ঠাকুরের গুরুভাবসহায়ে ভৈরবী ব্রাহ্মণী ও ব্রহ্মজ্ঞ তোতাপুরী নিজ নিজ গন্তব্য পথে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া ধন্য হইয়াছিলেন। ঠাকুরের অন্যান্য শিক্ষাগুরুগণও যে তাঁহার সহায়ে এইরূপে আধ্যাত্মিক উদারতা লাভ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ও আমরা ইহাতেই বেশ অনুমান করিতে পারি।

ওমিতি—

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ—গুরুভাবপর্বে

পূর্বার্ধ সম্পূর্ণ ॥ ওঁ ॥